

বাংলার ছোটগল্প

চতুর্থ খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ



স্বদেশ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
4th Volume
Edited by
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ISBN 81-7332 376 7

দাম : ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী বোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে
সন্দীপ নাথক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট গ্র্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন
ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী বোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

‘ভালোবেসে, সখী, নিভুতে যতনে
আমার নামটি লিখো-তোমার
মনেব মন্দিবে।

ধবিয়া বাখিযো সোহাগে আদবে
আমাব মুখব পাখি-তোমাব
প্রাসাদপ্রাপ্তগে।

আমাব মনেব মোহেব মাধুবী
মাখিযা বাখিযা দিযো—তোমাব
অঙ্গসৌবভে।’

প্রিয় বন্ধু
শাম্ভতী মিত্র বসু-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা : চতুর্থ খণ্ড

চতুর্থ খণ্ডের শুরু বাংলা ছোটগল্প ধারার এক বিশিষ্ট কথাশিল্পী সুনীল জানার অসামান্য নির্মাণ 'সখা' গল্পটি দিয়ে। এক-একজনের একের বেশি গল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি বলেই সুনীলবাবু 'আম্মা', 'খুনী'-র মতো অনন্যসাধারণ গল্পকে নির্বাচনের বাইরেই রাখতে হয়েছে। এই খণ্ড শেষ হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের গল্প দিয়ে।

একটি কবে অসাধারণ গল্প নিয়েও যাদের একাধিক শ্রেষ্ঠ গল্পকে গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য : নবেন্দু ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার', 'বন্ধুঃ দেহী', 'ছিন্নমস্তা', 'কঙ্কি', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'এক পো দুধ', 'মহাশ্বেতা', 'শ্বেতময়ূর', 'টিকিট', 'ধূপকাঠি', 'ঘব', 'ঝড়', 'কৈশ্ব দেবায়ঃ', 'অবতরণিকা', 'রস', 'অভিনেত্রী', 'যবনিকা', 'গুণগ্রাহী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইদু মিঞার মোরগা', 'নায়কের জন্ম', 'হাঁস', 'মর্যাদা', 'বনজোৎস্না', 'টোপ', 'হাড়', 'উদ্ভাদ মেহেরা খা', 'তীর্থযাত্রা', 'বীতংস', 'দৃষ্টাসন', 'অধিকার', 'সুখ', 'বন্দুক', 'রেকর্ড', 'বনক্ৰচরিত', 'নীলা' প্রভৃতি অসাধারণ গল্পগুলি।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'উকণ্ঠী', 'একটি বিপ্লবের মৃত্যু', 'দীপিকার ঘরে রাত্রি', 'ভূমিকম্প', 'প্রতিবেশী', 'চাঁদবেণে'; বাণী রায়েব 'নার্সিসাস', 'কোনও এক মলি দন্ত', 'সীমেন্টের ছাতার নীচে', 'সন্তোষকুমার ঘোষের 'যাত্রাভঙ্গ', 'দুইরাত্রি', 'সত্যসঙ্ক', 'কস্তুরীমৃগ', 'পনের টাকার বৌ', 'একমেব', 'শনি', 'বিষ', 'যাদুঘর', 'কানাকড়ি', 'নিহতের নাম', 'পাখির বাসা', 'প্রাচীর', 'সে আমার প্রেম', 'চিনে মাটি', 'শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধিলিপি বনাম পুরুষকার', 'বিকল্প', 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'যৌবন', 'তপ', 'কুমারী মাতা', 'চোখ', 'মৃত্যু', 'কাল্পা', 'ব্যক্তিত্ব', 'দ্বীপ', 'অভিরতি', 'সোমেন চন্দ্রের 'দাংগা', 'ইদুব', 'বনস্পতি', 'সলিল চৌধুরীর 'চালচোর', 'বিমল কবের 'শোকসভার পরে', 'বৃদ্ধস্য ভার্যা', 'আত্মজা', 'জানোযাব', 'মৃত ও জীবিত', 'নিষাদ', 'বনবাসী', 'সুখ', 'কলহ', 'মিলনোৎসব', 'কাচঘর', 'জননী', 'পলাশ', 'অশ্বখ', 'সুধাময়', 'ইদুব', 'মানবপুত্র', 'উদ্ভিদ', 'সোপান', 'ননী ভোমিকের 'পূর্বক্ষণ', 'কাফেব', 'বাছা', 'অন্যবিধ', 'চৈত্রদিন', 'গান্ধাবী', 'হটাবাহার', 'ধানকানা', 'সত্যজিৎ বায়েব 'আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু', 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি', 'দুই বন্ধু'; রমাপদ চৌধুরীর 'দিনকাল', 'বড়বাজার', 'ডাউন ট্রেন', 'উদয়াস্ত', 'ভারতবর্ষ', 'দরবারী', 'রেবেকা সারণের কবব', 'মানুষ অমানুষের গল্প', 'মেকি', 'চাবি', 'একটি মনিবাগ ও একফালি হাসি', 'স্নেহ', 'অপরাজু', 'অঙ্গপালি', 'গৌরকিশোর ঘোষের 'আলমাবি', 'তলিয়ে যাওয়ার আগে', 'লোকটা', 'বাঘবন্দী', 'ব্রজদার গল্প', 'বাণী বসুর 'শতাব্দী এক্সপ্রেস', 'সমরেশ বসুর 'উত্তাপ', 'আবাদ', 'বিবরমুক্ত', 'নিমাইয়ের দেশভাগ', 'পাড়ি', 'সিদ্ধান্ত', 'স্বীকাব্যোক্তি', 'কিমলিস', 'সূচাদের বারোমাসা', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'মানুষ রতন', 'ছেঁড়া তমসুক', 'অকাল বসন্ত', 'ধর্ষিতা', 'প্রতিরোধ', 'বিহিত', 'আদাব', 'শহিদের মা'; তৃপ্তি মিত্রের 'পুরনো গন্ধ', 'কী যেন স্টেশনটাব নাম', 'মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী', 'স্তনদায়িনী', 'চড়ক', 'জল', 'দৃশ্যপটে আমিই নায়ক', 'জলসত্র', 'বিছন', 'এজাহাব',

‘বায়েন’, ‘আজীর’, ‘কুসুমা’, ‘কানাই বৈবাগীর মা’, ‘পিণ্ডদান’, ‘অপারেশন বসাই টুডু’, মিহির আচার্যের ‘হিংস্রতা বর্জন করুন’, ‘লোহাব ক্ষুর’; ঋত্বিক ঘটকের ‘ভূস্বর্গ অঞ্চল’, ‘সড়ক’, ‘কপকথা’ প্রভৃতি গল্পগুলি পাঠক-হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেয়ে গেছে।

এই খণ্ডেব গল্পের সংখ্যা ৪৬। সময়সীমা ১৯১৬ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত।

পুনশ্চ : বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের ‘বাংলার ছোটগল্প’ গ্রন্থের কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা। সেখানে আছে বাংলা গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প; ছোটগল্পের আবির্ভাব ; তার জন্ম ও উৎস সন্ধান, সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের বাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামল্লভূত্রে ভেঙেপড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্ত-শ্রোত, সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পেব সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডেব ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা কবেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা ‘গ্রেট ক্যালকাতা কিলিং’ আব ঠিক তাব পবই তেভাগা আন্দোলন; পরবর্তীকালে ‘নকশাল আন্দোলন’, ‘জরুরী অবস্থা’, বাব বাব নিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, — এ-সব কিছুই বাংলাব গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তাবও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে কবেছি আমি।

আবাব বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (‘কল্লোল’, ‘শ্রুতি’, ‘হাবরি জেনারেশন’, ‘শান্তিবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন’, ‘এই দশক’, ‘নিম সাহিত্য-আন্দোলন’, ‘নতুন বীতিব গল্প আন্দোলন’ ইত্যাদি), লেখক-পাঠক সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বেব কথা, সর্বোপরি পাঠকেব কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পেব প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণেব সম্ভাব্য কাবণগুলিও বিশ্লেষিত ইয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবাব দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকেব শ্রমেব ভাব কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

সুশীল জানা	সখা	১১
নবেন্দু ঘোষ	শ্যামবায়ের মৃত্যু	১৯
নবেন্দ্রনাথ মিত্র	বিকল্প	২৯
শওকত ওসমান	আলোক অন্বেষণ	৪৬
নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	মাননীয় পবীক্ষক মহাশয় সমীপে	৫৩
অমিয়ভূষণ মজুমদার	পুকুরের মুক্তো	৬০
বাণী বায়	লুক্রেশিয়া	৭০
মিবজা আবদুল হাই	মেহেবজানের মা	৭৯
আবু কশদ	ছেদ	৮৮
অরুণ চৌধুরী	হাল্লাল	৯৬
গোলাম কুদ্দুস	লাখে না মিলয়ে এক	১০৬
সন্তোষকুমার ঘোষ	কানাকড়ি	১২২
টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ	প্রতিপক্ষ	১৩৮
গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্য	কল্যাণী	১৪৭
শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	অঙ্কজনে দেহ আলো	১৫৩
ধীরেন্দ্রলাল ধব	ছবি	১৫৯
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বামাই দাবোগাব কার্যকলাপ	১৬৩
শক্তিপদ বাজগুরু	একসূত্রে বাঁধা	১৭৬
শম্ভু মিত্র	অসাময়িক	১৮৮
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়	অনুপমা	১৯৯
কুমারেশ ঘোষ	সজনের উঁটা	২০৪
বঙ্কন	নবীনা	২০৬
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ব্যক্তিত্ব	২১৬
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	বাবাব ছবির খোঁজে	২২৩
সোমেন চন্দ	সংকেত	২২৯
সলিল চৌধুরী	ড্রেসিং টেবিল	২৪০
বিমল কব	আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন	২৪৮
ননী ভৌমিক	সলিমের মা	২৫৮
সত্যজিৎ রায়	পিকুর ডায়বি	২৬৬
রমাপদ চৌধুরী	আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া	২৭০
চাণক্য সেন	পিতা	২৮১

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ	স্তন	২৯১
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	মুক্তামালা	২৯৮
গৌরকিশোর ঘোষ	সাগিনা মাহাতো	৩০৬
বাণী বসু	নন্দিতা	৩২৬
সমরেশ বসু	ষষ্ঠ ঋতু	৩৪০
ছবি বসু	জীবন ও জীবিকা	৩৫২
তৃপ্তি মিত্র	অব্যক্ত	৩৫৭
শাহেদ আলী	আতশী	৩৭১
মুনির চৌধুরী	খড়ম	৩৮৩
মহাশ্বেতা দেবী	ভাতুয়া	৩৮৮
মানবেন্দ্র পাল	পেয়ারা	৪০৪
আবু ইসহাক	জৌক	৪১০
মিহির আচার্য	আজ কাল পরশু	৪১৬
মৃণাল চৌধুরী	রৌদ্রদীপ্ত	৪২৩
ঋত্বিক ঘটক	কমবেড	৪৩১

**Click Here For
More Books>>**

সখা

সুশীল জানা

“লগর মাঝিব সঙ্গে তোমাব সাদি হবে!” বন্শী সকৌতুকে ব’ললে, “তবে যে তুমি হলে মোব সখা। লগর যে মোব সাঙাং ছিল।”

মংলা কেমন অনামনে বললে, “সে কথার পর চার-পাঁচ বছর কেটে গেল।”

“লগব এখন কোথায়?”

“সে তো চলে গেল কয়লাব খাদে।” মবা গলায় আস্তে আস্তে বলে মংলা, “হঠাৎ একদিন চলে গেল খেপে।”

“তাবপর?”

“তাবপর চাব-পাঁচ বছর কেটে গেছে।”

“মন খাবাপ কোরোনি হে সখা— সে আসবে।” বন্শী লগর মাঝির কথা বলে, “ছোট যখন ছিলাম—মহিষের পাল নিয়ে চবাতে আসতাম জংগলেব ধারে ডাহীতে, সে-ও আসত। মোরা লাচতাম, গাইতাম, বাঁশি বাজাতাম, শালবনে ফুল পাডতাম মছ্যাব। সে সব দিন মনে পড়ে যাচ্ছে হে সখা।”

মংলা কিন্তু আব কোনো কথা ব’ললো না। চুপ ক’রে রইলো দুবের দিগন্তছোঁয়া প্রান্তবের দিকে চেয়ে। তাব উজ্জ্বল কালো চোখে এই শূন্য পোড়া প্রান্তবের শূন্যতা প্রতিবিম্বিত হয় বুঝি কয়েক মুহূর্তেব জনো, তাবপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললো, “সেদিন উড়ে পুড়ে গেছে। জংগল নিয়েছে জমিদাব, গোঙব ডাহী নিয়েছে কাগজকে কল, জমিন গেছে, গো-মহিষ গেছে, সুখ গেছে—শান্তি গেছে হে বিদেশী। আমি এখন কাগজকলেব ঘাস কেটে মরি—আব তুমি কিনা গাঁ ছেড়ে আজ লুকিয়ে আছ মোব ঘরে।”

“হাঁ—আছি। কিন্তু চিবদিন কি লুকিয়ে থাকব সখা? আবাব যুবে আসবে সেদিন।”

“কি জানি বিদেশী।”—

“মোকে তুমি এখনো বিদেশী বলেই ডাকবে সখা?”

মংলা হেসে ব’ললে, “তুমিতো তাই বলেছিলে একদিন মাঝি।”

“আজ তো একটা সম্পর্ক বেবিযে পড়লো সখা।”

হঠাৎ একটা বিষম্ভাব ছোঁয়া লাগে মংলার মুখটায়। তবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে ব’ললো—“যাই, গরম জল আনি, তোমার ঘা ধুয়ে দিতে হবে।”

ঘুরে এল খানিক বাদে মংলা গরম জল নিয়ে—পাযেব ঘা ধুতে বসলো বন্শীব।

বন্শী নিজের ঘাযেব দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, “শালাদের গুলিটা ভাগ্যে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। না হলে পচে মরতে হত তোমার ঘবে সখা।”

মংলা কোনো কথা ব’ললো না—মুখ নীচু কবে একমনে জলের ছিটে দিয়ে ঘা ধুতে লাগল।

বন্শী ফের বললে, “সেবে এসেছে—না কি বল?”

মংলা অনা মনে শুধু বললে, “হঁ।”

হঠাৎ বন্শী মুখ খিচিয়ে আর্তনাদ কবে উঠল, “আস্তে আস্তে—আস্তে হে সখা।”

মংলা বোধহয় নিঃশব্দে একটু ফিককরে হেসে ফেলেছিল। বনশী বললে, “হাসলে যে।” —
“এমনি”, মংলা মুখটা আরও গৌজ করে যা ধুতে লাগল।
“এমনি হাসলে?”

মংলা আর কোনো কথা বললে না। এমনি সে হাসেনি ঠিক— ভাবছিল, এই লোকটাকে
প্রথম যেদিন সে আবিষ্কার কবলো তার জ্বালানিব মাচার মধ্যে— সেদিনকেব কথা। ঠ্যাংটা
দেখা যাচ্ছিল শুধু—আর এক জায়গা থেকে বস্তু চুইয়ে পড়ছিল মাটিতে। মনে হবে বুঝি—
ওই রকম একটা ঠ্যাং কে যেন জ্বালানির মধ্যে কেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

চমকে উঠেছিল—ঠিক ভয় পায়নি মংলা, নিঃশব্দে ঘুরে গিয়ে চাল থেকে টাঙিটা নামিয়ে
ফিরে এসে বলেছিল, “কে ঢুকেছিস বটে— বেরিয়ে আয়, না হলে দিলাম ঠ্যাং কেটে।”
প্রথমে ঠ্যাংটা নড়েও না চড়েও না।

“তবে দিলাম টাঙির কোপ।” মংলা ধমকেছিল। একটা জোয়ান মবদ বেরিয়ে এল
তাবপব—তাব জাতের মানুষ, শুধু মাথায় নেই যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেরিয়ে এল ঠ্যাং
ঘষটে ঘষটে। তাবও হাতে টাঙি।

“কে তুই বটে?” মংলা কথ্যে দাঁড়িয়েছিল।

“চিনবেনি মোকে, আমি বিদেশী।”

“বিদেশী! কুন গায়েব লোক বটে হে?”

লোকটা মংলাব কুঁড়ের পেছনের জংগলটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, “জংগলেব
ওপাব—গিবাধিনি।”

“তো মোব মাচাব মধ্যে ঢুকলি কানে?”

লোকটা অক্রেশে বললে, “রাতটা থাকতাম।”

“আব দিন এখনও শেষ হয়নি। ঢুকেচিস মোব মাচাব মধ্যে।” মংলা বাজে কথায়
ভুলবাব মেয়ে নয়। বাপ মরে যাওয়াব পব একাই সে ঘব কবছে। উনিশ কুড়ি বছবেব
গাট্রা-গোট্রা জোয়ান সাঁওতাল মেয়ে। ধমকে বলেছিল, “কে তুই বল ঠিক ঠিক।”

“বিদেশীর নাম জেনে কি হবে। বাতটুকুন তো শুধু মাথা গুঁজে থাকতাম।”

“মোব মাচাব মধ্যে ঢুকলি আর নাম বলবিনি। গিরাধিনিব লোকত ইদিকে এসেছিস কানে।”

“এই—কাঠ কাটতে।”

“হুঁ— তোদেব জমিদার জংগল কেডে লেবনি?”

“লিয়েছে। তাইত বেরিয়ে পড়েছি।”

“তো মোদেবও তো লিয়েছে।”

“তবে চাষের জমিন পাই যদি—”

“জমিন। হুই দ্যাখগা—বাবুই ঘাস। কাগজকলেব মালিক গোচব ডাই আব ধানী জমি
সব কেড়ে লিয়ে ঘাসেব চাষ কবেছে।”

“মোদেবও তাই।”

“তবে! সব জেনেওনে ন্যাকামি করছিস্ কানে তবে?”

এত জেরাতেও এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না লোকটা। তার এস্তার মিছে কথা যে বুঝতে
পারছিল না মংলা তা নয়। তবে মনে মনে নিজেও সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল—কি করবে সে
এ লোকটাকে নিয়ে।

লোকটা আরও বললে, “আজ বাতটা মোকে থাকতে দিলে ভোর-ভোর আমি চলে
যাব। পায়ে ববায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, বড় ব্যথা হচ্ছে।”

“হুঁ। কুথায় ছিল বরা?”

“বনে।”

“বনে! সতি কথা বল—কুথায় দেখেছি যেন তোকে। ঠিক দেখেছি মনে হচ্ছে।” মংলা
পাকড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত।

লোকটা হেসে বলেছিল, “কুথায় দেখবে আবার মোকে। আমি বিদেশী। তোমার দাওয়ায় পড়ে থাকতে দাও শুধু রাতটা— ভোর-ভোব যেখানে হোক চলে যাব। আমি তোমার জাতের লোক—দুঃখী লোক। মোকে অবিশ্বাস কোরোনি। ভয় কোরোনি।”

“আবে দূর! তোকে আবাব ভয়।” ঠোঁট বঁকিয়ে মংলা বলেছিল, “তবে থাক গে যা— হোই চ্যাটাই পাতা আছে দাওয়ায়।”

“চ্যাটাই-মেটাই মোব দরকাব নাই। —হোই জ্বালানীৰ মাচাং-এ থেকে যাব।”

“ঈ। লুকাতৈ চাস ৬ তুই ঠিক চোবাই, হাঁড়িয়া চোলাই কবতিস, আর পুলিস তাই তোকে তাড়া কবেছে।”

“তাই যদি হয়। জেতের লোককে পুলিসে ধৰিয়ে দিবি?”

নাঃ— লোকটা অসম্ভব।— তাকে আপাদমস্তক একবার যাচাই কবে দেখেছিল মংলা চোখ কঁচক্কে। তারপর বলেছিল— “নাঃ, পুলিস বড় হাবাম। মোদের বন্শী মাঝিকে ধববে বলে তল্লাট টুড়ে ফেলেছে।”

“বন্শী মাঝিটা আবাব কে হে?”

“দূব ভূত কোথাকার। তাব নামও শুনিস নাই?” মংলা অবাক হয়ে বলেছিল, “সে বড় ভালো চ্যাংডা হে।”

“তবে ভালো। আমি বিদেশী— মোব অত কথায় কাজ কি।”

“কাজ কি।” মংলা কথৈ বলেছিল, “এই যে মোদের বন কেড়ে লিলে, ডাই জমিন সব কেড়ে লিলে, মোদের মরদওলান বিদেশে পালালো— তা ঘুবোং চাস না?”

“চাই তো। কিন্তু দেয কে।”

“বন্শী মাঝি বলে—সব আবাব ঘুবোং হবে। মোবা লড়াই করে কেড়ে লেব।”

“তো লে কেড়ে।” লোকটি বলেছিল গা ছেড়ে, “আমি কী না বলছি?”

তাব এই গা-ছাড়া জবাবে মংলা আবাব গাল দিয়েছিল, “বিদেশী ভূত!”

বাতের বেলা সেই বিদেশী ভূতটাকে বাইবেব ঘুপটি দাওয়ায় একটা চ্যাটাই পেতে শুতে দিয়েছিল মংলা। নিজে শুয়েছিল কুঁড়েব ভেতরে বাশের দবোজায় ভালো করে খিল এঁটে। কে জানে, বিদেশী শয়তানটাব মনে কি আছে!

হঠাৎ যোপ বাস্তিবে বেলা বন্ধ দরোজায় যা। আব চাপা গলায় ডাক :

“আহে—আহে—আহে”—

ঘুম ভাঙাব সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় লেগেছিল বৈকি মংলাব— কে জানে কি মতলবে ডাকছে লোকটা। দম বন্ধ কবে বলেছিল— “শয়তানিব মতলব থাকলে কেটে ফেলাব একেবাবে।”

লোকটা ককিয়ে বলেছিল — “না গো—একটু জল দিতে পাবো ৬ ছাতি ফেটে যাচ্ছে।”

হাতে টাঙি নিয়ে দবজা খুলেছিল মংলা। দেখে— লোকটা ঈ-ঈ কবছে। জিজ্ঞেস করেছিল, “কি হল তোব।”

“জ্বর। বড় তেপ্টা। আব মোর জখম পা-টা যেন খসে যাচ্ছে হে।”

দেখতে দেখতে পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। অতএব ভোব-ভোর যে-বিদেশীর চলে যাওয়াব কথা, তা আব হলো না। অধিকন্তু লোকটার ফাই-ফবমাস খাটতে হল মংলাকে। সৈদিন ঘাস কাটতে যাওয়া হলোনা আব। লোকটা বললে, “যাবে একবার পিয়াবডোবা গায়ে— মোব কুটুম আছে, ওবাই মাঝি। তাকে বলবে যেয়ে শুধু— ত্রোব মামাত ভাইয়ের অসুখ। দেখবে—ই খবর আব কাবকে দিবেনি কিন্তুক।”

কি করে মংলা আর—যেতে হলো। বিদেশী লোক বিপদে পড়ে গেছে। লোকটার কি বহসা আছে কে জানে ; তবে আছেই কিছু।

খবর দেওয়ার পব গুরাই মাঝি আর একটি ছোকবা এলো বাতের অন্ধকাবে ঘুপটি মেবে। দেখে মংলা তো আওন। বললে, “কি বকম লোক বটে হে তোমবা। খবর দিলাম সকালে—এলে বাতের বেলা। ইদিকে কাহিল হয়ে পড়েছে তোমাদের বণী।”

বিদেশী বললে, “চেষ্টাও নি হে।”—

মংলা গৰ্জ্জ করত করত চলে গিয়েছিল। তারপর ফিস্-ফাস্ গুজ্জ-গাজ্জ কথা ওদের হলো অনেকক্ষণ ধরে। খানিক বাদে চলে গেল দুজন—কুগী রইল পড়ে যেমন যেখানে ছিল। লোক দুজন চলে যেতেই ছুটে এসেছিল বিদেশীর সামনে মংলা—রাগে নয়, শ্রদ্ধায়—আনন্দে, মর্মজ্বালায় জ্বলে।

“এতক্ষণ বলানি কেন মোকে—বলানি কেন! যদি বিপদ হত!”

“কি বলবো হে?”

“তুমি বনশী মাঝি!”

“কে বললে?”

“এই যে আমি আড়ি পেতে শুনলাম।”

এবাব বিদেশী চূপ।

“সারাদিন তোমাকে আমি দাওয়ায় ফেলে রাখলাম।” অনুশোচনায় এবার যেন কান্না পেয়েছিল মংলার। বললে, “চলো ঘরের ভেতরে।” ঘরের ভেতরে শোয়ার জায়গা করে দিয়ে বনশীকে শুইয়ে দিল মংলা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে মাথা নীচু কবে—কি যেন ভাবল একটু। বললো আস্তে আস্তে, “মোকে ক্ষ্যামা কব।”

বনশী কাংবে বললে, “এদিকে পা-টা মোর খসে গেল।”

মংলা আবাব বললে, “কাল থেকে মোর ঘবে তোমাব অনেক কষ্ট গেছে।”

“ও সব কিছু না হে।”

“দেখি তোমাব পা?” মংলা এতক্ষণে পায়েব ঘা-টা দেখতে দেখতে বললে, “বন্দুকের ওলি লেগেছিল কাল।”

“কি কবে জানলে হে?”

“শুনেছি। সবাই জানে। বনশী মাঝিকে কাল জংগল ঘেবাও কবে পুলিশ ধবতে গেছল—পাবেনি। কোথায় নাকি পালিয়ে গেছে।” মংলা আবিষ্ট ভাবে বললে, “কিস্তি সে যে মোব ঘরে।”—

“মোব কথা কারকে আর বলানি তো?”

“না। আমি ভাবলাম, হোক বিদেশী—জৈতের লোক ত। লোকে জানলে হয়তো কোন বিপদ আপদ হয়ে যেতে পাবে। থাকবে তো একটা বাত মোটে— তো থাক। তাই বলিনি।”

“খুব বুদ্ধি তোমার হে।”

“আমি যাই এখন—বেতের বেলা ঘায়ের পাতা খুঁজে পাই কোথায় দেখি আবাব।”

“বাত্তে থাক না।”

“উঁ হুঁ— খাবাপ হতে পাবে, ঘায়ের ভেতরে বস ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে পাতা বসিয়ে দিলে ভেতরে যদি কিছু থাকে ত সব ঠেলে বেবিয়ে আসবে। ফুলা কমে যাবে, দবদ থাকবেনি। আমি যাই।”—

সেই বিদেশী—বনশী মাঝি। দ্বিতীয় দিনে বাত্বে শোবাব ব্যবস্থা উন্টে গেল। বনশীকে ঘবে দিয়ে দরজা আগলে শুলো মংলা, পাশে টাঙি। শুলো বটে—ঘুম হল না সারা বাত। বাইবের প্রতিটি শব্দে চমকে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

বনশী বলেছিল একবাব, “বাইবে শুলে যে তুমি!”

“হাঁ, কেউ এলে বইলাম আমি। তুমি ততোক্ষণে ঘবেব দেয়াল ভেঙে চলে যেতে পারবে বানব দিকে।”

বনশী মাঝিব এত কাণ্ডে হাসবে না মংলা। ঘা এখন সেরে আসছে— আব কদিন বাদে দিবি চলে বেড়াতে পাববে। খোঁড়া হয়ে যাওয়াব বিপদ কেটে গেছে। প্রথম দিনেই পাতা বেঁধে দিনে এত কাণ্ড হত না। - ঘা পচে বিষিয়ে উঠতো না। কিছু প্রথম দিন লোকটা মাচা থেকে খষটে খষটে বাব হয়ে এসে বললে কিনা, “বিদেশী।”

যা ধুয়ে নতুন করে তাতে কী একটা বুনো পাতা বসিয়ে দিয়ে উঠলো মংলা। বললে, “পা এবাব সেবে উঠেছে মাঝি—কিন্তু খবরদার বাইরে বেবিয়নি।”

কৌতুক কবে বন্শী বললে, “কোথায় যাব আব সয়া, অমন শুইয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে। মংলার ই ঘরের কোণ ছেড়ে কোথাও যেতে আর মন নাই মোর।”

“মনে রইলো মাঝি”—বলে নিজের একটা আবেগ চাপবার জন্যে তাড়াতাড়ি উছলানো মুখটাকে ঘুবিয়ে নিল মংলা অন্যদিকে। আশ্তে আশ্তে বললে, “এবার যাই আমি ঘাস কাটতে, দেবি হলে পয়সা কাটবে চোবগুলান।”

দিনের শেষে মংলা সেদিন যখন ঘুরে এল তখন খোঁপায় তাব কৃষ্ণচূড়াব এক থোকা ফুল গোঁজা। এসে দাঁড়ালো বন্শীব সামনে—সাবা দিনের ক্লান্ত মুখটাও যেন মিষ্টি হাসিতে ভরে আছে। শুধোলে, “বাইরে বেরোয়নি ত বিদেশী?”

কৌতুক কবে বন্শী বললে, “হ্যাঁ—ঘুরে এলাম তোমাদের গাঁয়েব বসুতি।”

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল মংলার মুখ।

বন্শী হাসলো।

মংলা বললে, “তুমি ত জান না মাঝি, তোমাকে ধবাব জন্য দু'কুড়ি দশ টাকা দেবে বলে সবকার ঢোল দিয়েছে। যদি কেউ—” মংলা ভয়ে থেমে গেল।

বন্শী বললে, “বলো কি গো সয়া। তবে তুমি খপব দিয়ে এসো সবকাবকে, তাবপব ওই দু'কুড়ি দশ টাকা দিয়ে চলে যাও সাঙাতেব কাছে বেলগাড়িতে চেপে।”

“ই কথা তুমি বললে মাঝি” মংলা ভাবি চোখ তুলে তাকালো এক দৃষ্টে বন্শীব দিকে।

বন্শী হেসে উঠলো। বললে, —“আচ্ছা মোব কথা নয় ঘুৰোং দাও। যেওনি তুমি। কিন্তু সয়া, মাথায় ফুল দিয়েছ। মুখ-চোখ যেন কেমনধাব। আজ ঠিক মোর সাঙাতেব কথা মনে পড়েছে তোমাব।”

মুখ-চোখ ভাবি হয়ে উঠলো মংলার—বন্শীব সামনে যেন দাঁড়াতে আব সে পারছিল না। যাওয়াব সময় বলে গেল শুধু, “সে মোব কাছে মরে গেছে।”

ডেকে আব হালকা কথা বলতে সাহস হলো না বন্শীব। মংলা বাইবে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে বইলো অন্ধকাবে। তাবপব খোঁপাব ফুলগুলো টেনে কি ভেবে অন্ধকাবে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সহসা কেন তাব মনে হলো—ফুলেব তার আব দবকার নেই।

দাঁড়িয়েছিল যে এক ভাবে, এমন সময় সস্কাব অন্ধকাবে গা-ঢাকা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল এক সাঁওতাল আধবুড়ো। বললে, “বলো বন্ মাঝিকে—পিয়াশাল থেকে এসেছি।”

মংলা বললে, “চলে যাও ঘবেব ভিতবে।”

কিছুক্ষণ বাদে আাবাব একাটি লোক বেবিয়ে এল, বনেব ভিতব থেকে ঘুপাটি মেবে বললে, “শালাবোনি থেকে এসেছি—বন্ মাঝিকে বলো।”

এমনি কবে লোক এল আবও কয়েকজন। গোদা, পিয়াশাল, শালবোনি, পিয়াবডোবা, কালি পাখবি, চন্দ্রকোনা, জমায়েত হলো এসে একে একে। এমনি হয় এক-একদিন। বিবাটি এক পাহাড়ী জংগলেব কিনাবা যিবে আদিবাসী এলাকা—লাঙ্কিত, লুপ্তিত, দবিদ্র। গব্ গব্ কবছে আবগ্যক জীবন—আগুন জ্বলে ওঠাব আগে গুমবে-মবাব ধোঁয়াব মত। সেই অসন্তুষ্ট ঘূর্ণাবেগ ধোঁয়াব তালে যেন ঘব ভবে যায় মংলাব। সেদিন অনেক কী সব শলাপরামর্শ কবে ওবা চলে গেল একে একে রাত যখন গভীর হলো।

মংলা এতক্ষণ বসেছিল দাওযাব এক কোণে। এসব কথাব মাঝখানে বন্শী মাঝি তাকে ডাকে না, ববং কথার ছলে যেন সবিয়ে দেয়। হয়তো কোন গোপন কথা হয়। বাগ হয়, অর্ভিমান হয় মংলাব—তারই ঘরে লুকিয়ে থেকে বন্শী মাঝি তাকে বিশ্বাস কবে না!

সেদিন সবাই চলে যাবাব পব মংলা উঠি উঠি কবছিল ঘবেব ভেতবে যাবে বলে—এমন সময় চমকে উঠে দেখে, বপ্ বপ্ কবে খোঁড়া পা টেনে স্বয়ং বন্শী মাঝিই এসে হাজির বাইরেব দাওশায়।

“সয়া!”—

মংলা তাড়াতাড়ি তার সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

বনশী মাঝি দু’টো হাত মুঠো করে ধরল তা’র। ব’লে উঠলো—“তুমিই হলে মোর খাঁটি সয়া। মুখ ফুটে বলতে হয় না কিছু—প্রাণের কথা আপনি বুঝে লাও।”

“কি হলো মাঝি?” মংলা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকালো তাব মুখের দিকে।

“কি হলো সয়া? এত কাণ্ড করছে তলায় তলায়—বলোনি ত মোকে একদিন?”

“কি করলাম মাঝি।”

“এব মধ্যে একদিন চন্দ্রকোনা গেছে?”

“গেছলাম মাঝি।”

“সেখানে বলে এসেছ—ও গাঁয়ের তোমবাও যাবে জংগলে দখল নিতে?”

“হ্যাঁ মাঝি।”

“এব মধ্যে কবে ঘাস কাটাব মজুবি বাড়ানোর জন্যে দু-দিন কাজ বন্ধ কবেছিলে নাকি?”

“করেছিলাম মাঝি।”

“সবাই তোমাব কথা শোনে?”

“কথাটা যে সকলের মাঝি।”

“এসব কথা নিয়ে মোর সঙ্গে তো শলাপরামর্শ কবোনি কোনদিন।”

“তোমাদের শলাপরামর্শে মোকেও তো ডাকনি কোনদিন মাঝি।”

“মোর ঘাট হয়েছে সয়া। আব একটা কথা, আমি তোমাব ঘবে আছি—এখানে তোমাদের সবাই কি তা জানে?”

“তা জানে না।”

“কি বলেছ তাদের?”

“বলেছি—ফেবাব। বলেছি—লুকিয়ে আছে। আব বলেছি—চিবকাল কি সে অন্ধকাবে লুকিয়ে থাকবে—দিনেব আলোর মুখ কি দেখবে নি?”

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইলো বনশী মাঝি। অন্ধকাবেও যে উদ্দীপ্ত আবেগ ঢাকা পড়ে না সেই স্মৃতির আবেশ কেঁপে উঠতে শুনলো তার গলায়, ধলকে উঠতে দেখলো তার চোখে। এই মেয়েটা কোথায় কোন গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, গেছে চন্দ্রকোনার মাতব্বরদের কাছে লুকিয়ে, একজোট কবেছে তাদের মেয়ে মবদকে, অথচ কিছুই জানার্যনি তারে। মেয়েটাকে হঠাৎ মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে বনশী।

বনশী মংলাব কথাব ভেব টেনে আস্তে আস্তে বললে, “ঠিক—অন্ধকাব চিরদিন থাকবোনি সয়া—সবাই মোবা আলোব মুখ দেখবো।” তারপব হঠাৎ চোখ পড়লো বনশী, মংলাব খোঁপায় কৃষ্ণচূড়াব থোকাটা তো নেই। বনশী বলে উঠলো, “তোমাব মাথাব ফুল গেল কোথায় সয়া?”

মেয়েটা কেঁপে উঠলো যেন সহসা। বললে, “ফেলে দিয়েছি।”

“কেন সয়া। বহুদিন পবে ফুল দিয়েছিলে—আমি এসে দেখিনি আর কোনদিন।”

মংলা কোন জবাব দিল না সে কথার। বনশীব কোমরটা শক্ত করে ধবে বললে, “চল—যবে চল মাঝি। কাঁধে ভব দিয়ে চল মোর। লাঠি ছেড়ে হাঁটা তোমাব উচিত হয় নি।”

বনশী বললে, “সকলের মুখে তোমাব কথা শুনে লাঠিব কথা ভুলে গেলোম সয়া। মনে হলো—লাফ দিয়ে আজ ছুটে যেতে পারি।”

“চুপ করো মাঝি।”—

মংলাব কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বনশী বললে, “না হে সয়া—কথা বলতে দাও। তোমার দিকে চেয়ে কথা বলতে দাও আজ। চুপ ত অনেক দিনই করে ছিলাম। বাপ-ঠাকুবদাদা পাথরের চাঙা কেটে কেটে ধানের জমি করেছিল—সেখানে মোরা আজ উটবন্দী চাষী। উঠ বললে যা চলে কোথায় যাবি। বনের লোক মোবা বনে ছিলাম। কাঠ কাটতাম—ফুল পাড়তাম

মহাযাব, খেতাম তাই বেচে। তাও কেডে কুড়ে ব্যবসা কবছে খোড়া জমিদার। গোচর ডাহীতে গোরু মোষ চলাতাম—তাও কেডে নিয়ে বাবুই ঘাসেব চাষ করলো কাগজ কলের মালিক আর পাশে খুলে দিল গোরু ধবা খোঁয়াড়। গোরু ধবে ধবে সব নীলাম করে লিলে। চূপ কবে ফৌত হয়ে গেল গরিব বাপ ঠাকুরদাদা। আর কত চূপ কবে থাকবো বল সয়া?”—

জংগলের মানুষ কণা কয়ে উঠছে। আশ্চর্য সেই দীপ্তিতে ঝকমক কবে ওদের চোখ।

শাল মহাযাব জংগল ধোঁষে একটা মবা গাঁয়ের কোণ দেখে যেখানে একদিন গা ঢাকা দিতে এসেছিল বনশী— দেখতে দেখতে সে জায়গাটা নতুন এক প্রাণস্পর্শে যেন নড়েচড়ে উঠলো। অবগেব লুকানো আগুন ধুইয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে নিঃশব্দ অসন্তোষেব মাঝখানে।

তারপর সে আগুন জ্বলে উঠলো একদিন। কাজে বেরোবাব আগে মংলা বনশী'ব পায়েব যা ধুতে বসেছিল—এমন সময় একটি মেয়ে ছুটে এলো হাউ মাউ কবে।

“মোদেব গোক চালান কবে দিনে শয়তানবা গো দিদি—সব কটা গোরু।”

মংলা চকিতে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটার দিকে।

“ঘাসে মুখ দেখ নাই—কিছু না।” মেয়েটি হাত কচলাতে কচলাতে অসহ্য গলায় বললে, “চবাত্তে যাচ্ছিলাম—জবরদস্তি ধবে খোঁয়াড়ে লিয়ে গেল হাসতে হাসতে।”

চোখে চোখে তাকাল মংলা আব বনশী, নীরবেই বুঝলে ওরা—এ জবরদস্তির মান্নে কী। এ গাঁয়ের বস্তি উজাড় কবে চলে গেল সব কটা গোরু। মোটা মুনাফা লুটবে ঘাস-ক্ষেতের খোড়া মালিক, মুনাফা লুটবে সরকারী খোঁয়াড়, শুধু ভিটে মাটি চাটি হয়ে যাবে এ গাঁয়েব মানুষগুলোব। চালান হয়ে যাবে গোকগুলো কোথায়।

তারপর সেগুলো শহর কারখানায় বিকোবে গোস্তে হয়ে।

মংলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বনশীর ঘায়েব দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, “যা প্রায় সেবেই এসেছে মাঝি—কিন্তু হাঁটা বোঝে ঘরের বার হয়ে প'ড়ো না যেন। আমি যাচ্ছি—সাবধানে থাকবে। বেশি হাঁটাইটি”—বলে বনশীর স্তব্ধ শুকনো চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। সেখানে নিঃশব্দ ভর্ৎসনা। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মংলা।

“মোদেব মবদগুলান কোথায়?”

বাচ্চা সাঁওতাল মেয়েটা কাদতে কাদতে বললে, “কাজে চলে গেল।”

“চল কোথায় দেখি।”

এদিকে বনশী বসে বইলো কান পেতে। ওর চোখে চাপা ঔৎসুক্য। অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেল সে একটা হল্লা—গোলমাল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এসে দাঁড়ালো বনশী। দূর থেকে শুধু হল্লাটাই শোনা যায়—এখানকাব নিঃশব্দ আকাশের শূন্যতা শিউরে উঠছে তাতে ক্ষণে ক্ষণে। আর কিছু বোঝাবার উপায় নেই। বনশী খোঁড়া পা টেনে টেনে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলো শুধু। এক সময় গোথুলি নামল অবগাপ্রাপ্তে। বনশী সাগ্রহে চোখ মেলে আছে ঘব-মুখো গোরু ভইসেব ডাক শোনাবাব জন্য। কিন্তু চমকে উঠলো সে ধোঁয়ার তাল দেখে। সেগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশে—তারপর শোনা গেল হাওয়ায গোরু মহিষেব বুকফাটা আর্তনাদ, আব মানুষেব হল্লা। বাঁশ ফাটাব শব্দ।

এমন সময় মংলা এলো ছুটে ছুটে —সারা দিনের ক্লান্ত কঠিন মুখ ধুলি-ধূসব। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, “শয়তানগুলান খোঁয়াড়ে আগুন লাগিয়ে দিলে মাঝি। মোবা সবাই গোরুর জন্যে ক্ষেতের কাজ বন্ধ কবে বসেছিলাম। ওরা আগুন লাগিয়ে দিলে।” ক্ষোভে, ব্যর্থতায় যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ওব শুকনো চোখ থেকে।

বনশী তাকিয়ে আছে নীরবে স্তব্ধ চোখে।

মংলা বললে, “এবাব তুমি পালাও মাঝি। হাবামিবা পুলিশ ডাকবে। পালাও তুমি—না হলে ধরা পড়ে যাবে।”

“চলে যাবো বলছ?”

“হাঁ আজই পালাও।”

“তাই ভালো। চলে যাই তবে জংগলের ওপার।”

“কিন্তু তোমার পা যে এখনও ভালো করে সারেনি মাঝি।”—

“ও ঠিক আছে সয়া। চলে যেতে পারব। ভাবছি শুধু তোমাদের বনের ধারের মাতলা নদীটা পাব হবো কি কবে। অথচ জংগলের ভেতর দিয়ে গেলেই ভালো হয়।”

মংলা বললে, “ক্লাব মান্দাস করে দেব—ভেবোনি মাঝি।”

চললো পালাবার তোড়জোড়। সম্ভ্রার অন্ধকাবে কলাগাছ কেটে ভেলা তৈরী করে লুকিয়ে রেখে এলো মংলা ঝাঁটি বনের ভেতবে। বনশীব নির্দেশ মতো বাঁশের মোটা একটা লাঠি কেটে রাখলে। কয়েকজনকে পাহারায় রাখলে দুবে দুবে। বনশীব সঙ্গে দেওয়া ব জন্যে বাঁধলো ছোট ছোট গুটি দুই পুটলি। আজ সারা সম্ভ্রাটা কেবলি মনে হতে লাগলো তাব—একটি লোক আজ চলে যাবে এতদিন যে ছিল তার ঘরে।

রাত যখন গভীর হলো তখন ডাকলো মংলা, “মাঝি।”

গলার স্ববটা বড় ভাবি লাগে নিজেবই কানে। বনশী মুখ তুলে তাকালো। মনে হল — মেয়েটা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। অনেক কাজ কবেছে হয়তো।

পুটলি দুটোর দিকে চেয়ে বনশী বললে, “ই সব কি সয়া?”

“দুটো মুড়ি চিড়ে—আর ওটায় আছে গুড়, পাটালি, নারকেল। বাস্তায় খাবে।”

“ই সব কবেছ আবার!”

“বনেই যে দুদিন কেটে যাবে মাঝি।”

“তোমাব দেওয়া শুধু এই লাঠিটা ধবে আমি হেঁটে যেতে পাবতাম সাবা বন।” বলে বনশী লাঠিটা তুলে নিল।

মংলা পুটলি দুটো লাঠিতে বেঁধে বুলিয়ে দিয়ে সামনে থেকে সবে দাঁড়ালো—তাকালো শুকনো চোখে বনশীব দিকে কয়েক মুহূর্ত। ফিস ফিস কবে বললে, “যাও মাঝি।”

বনশী পুটলি-বাঁধা লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, “যাই তবে সয়া। দিনেব আলোখ দেখতে আসব আবার—দিন যেদিন আসবে। আজ পালাচ্ছি অন্ধকাবে। ভেবোনি তুমি। আমি জানি সাঙাং ভাব একদিন আসবেই—মোদের জংগল যেদিন ঘুরিয়ে নেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে। সেদিন কেউ ছেড়ে যাবেনি আব গাঁয়েব মাটি।”

একদৃষ্টে গভীর কালো চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইলো মংলা। পাথর কুঁদো মুখে ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো একবার — কিন্তু কিছু বললে না।

বনশী দাঁওয়া থেকে নেমে আস্তে আস্তে অন্ধকাবে মিশে গেল।

সেই দিকে শুকনো চোখ মেলে চেয়ে ছিল মংলা। হঠাৎ মনে পড়লো, তাইতো—সেই যে বিদেশীব হাতে টাঙিটা ছিল একদিন। সেটা তো দেওয়া হলো না।—

সামনেব চালোই গোঁজা ছিল সেটা। তাডাতাড়ি সেটা পেড়ে নিয়ে ছুটলো সে বনের দিকে। সামনে বনশী যাচ্ছে।

পেছন থেকে ডাকলো মংলা, “মাঝি।”

বনশী ঘুরে দাঁড়াল।

মংলা বললে, “তোমাব টাঙি।”—

“টাঙি!” বনশী বললে, “থাক সয়া ওটা তোমাব কাছে। তোমাব তেলে হলো তাব হাতে দিয়ে বোলো মোব কথা। বোলো মোর সাঙাংকে।” এক মুহূর্তেব জন্যে থমকে দাঁড়ালো মংলা।

তারপর টাঙিটা নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলো ঘবে। এসে কুঁড়েব ঝাঁপ বন্ধ কবে হু হু কবে কাঁদতে লাগলো উপুড় হয়ে। কেন যে কাঁদলো মেয়েটা—শুধু সেই জানে।

শ্যামৰায়েৰ মৃত্যু

নবেন্দু ঘোষ

শ্যামৰায়েৰ মন্দিৰ। মন্দিৰেৰ গা বেয়ে হাটপুষ্টি অশ্বথের চাবা বেরিয়ে এসেছে, চুন সুবকি খসে পড়ে পড়ে মন্দিরের প্রাচীনত্ব তথা আভিজাত্যকে দিনেৰ পৰ দিন বাড়িয়ে তুলছে। খুব বড় নয, মাঝাৰি আকাবের মন্দিৰটি। আকৃতিৰ চেয়ে মাহাত্ম্যই বেশী তার।

বিগ্ৰহ শ্যামৰায়েৰ। কিশোর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন—পরিধানে বাখাল বেশ। মন্দিরের ভিতৰকাৰ অবস্থাও তার বাহ্যিক আকৃতিৰ মতেই। শ্যামৰায়েৰ সিংহাসনেৰ পঞ্জরে উইপোকাৰা দলে দলে বাসা বেঁধেছে, তাঁৰ পোশাক-পৰিচ্ছদ আৰ আসৰাব-পত্রে মলিনত্বের ছায়া।

কিন্তু মাহাত্ম্য আছে শ্যামৰায়েৰ। প্ৰায় একশ বছৰ আগে বৰ্তমান পূজাবীৰ প্ৰপিতামহ বাসুদেব ভট্টাচাৰ্য একদিন স্বপ্নঘোৰে দেখেছিলেন ঐ শ্যামৰায়কে— দেখেছিলেন যে শ্যামৰায় যেন তাঁকে বলছেন, “বড় কষ্টে আছি বাসুদেব। তোমাৰ ৰাঙা বিলেৰ নাম সুন্দৰ হলেও তা আমাৰ থাকবাৰ জায়গা নয়, জল, কাদা, সাপ-খোপেৰ মধ্যে কি কৰে থাকি বলত? আমাৰ শিৰ্গাৰিৰ শিৰ্গাৰিৰ উদ্ধাৰ কৰ।”

শ্যামৰায়কে পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধাৰ কৰে বাসুদেব ভট্টাচাৰ্য ৰাতাৰাতি দেশবিদেশে সিদ্ধপূৰুষ বলে খ্যাতিলাভ কৰলেন। সে খ্যাতিৰ সংবাদ ঐ এলাকাৰ, মানে লক্ষ্মীপুৰেৰ জমিদাৰ শিবেশ্বৰ ৰায়েৰ কানে পৌঁছাল। বাসুদেব ভট্টাচাৰ্যকে নিষ্কৰ ভূমিদান কৰে শ্যামৰায়েৰ জনা তিনি একটি মন্দিৰ তৈৰি কৰে দিলেন। যে মন্দিৰেৰ বলিবেথা ভেদ কৰে আত হাটপুষ্টি অশ্বথের চাবা বেরিয়ে এসেছে, ওইটিই সেই মন্দিৰ। দেশ-দেশান্তৰে ছড়িয়ে গেল শ্যামৰায়েৰ কথা। এলো অগণন ভক্তেৰ দল। এলো অসংখ্য অনুগ্ৰহ-লোভীৰ দল। কত লোকেৰ দুবাবোগা ব্যাধি সাবল, কত মানুষেৰ মোকদ্দমাৰ জয়লাভ হলো, কত নাবীৰ বক্ষাত্ব ঘটল শ্যামৰায়েৰ কৃপায়। কৃতজ্ঞ ভক্তেৰ দল পৰিবৰ্তে নানা অৰ্থা দিল—ঘি, দুধ, ফল, মিষ্টি, দক্ষিণা। প্ৰতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তুমুল কীৰ্তনেৰ বোল উঠত শ্যামৰায়েৰ মন্দিৰ প্ৰাঙ্গণে— চোখেৰ জল ফেলে ভক্তেৰা লাফাত, নযতো ঝিম মেৰে বসে থাকত। কষ্টিপাথৰেৰ শ্যামৰায় বহু ভক্তেৰ কৃতজ্ঞতাকে স্বীকাৰ কৰে নিয়ে পৰিতৃপ্তিৰ হাসি হাসতেন। কিন্তু সেদিন আৰ নেই। একশ' বছৰ আগেকাৰ ইতিহাস এখন ৰাপসা হয়ে এসেছে।

মডক এসেছিল। শ্যামৰায় বৰ্তমান থাকতেও মৃত্যু বিতীৰ্ণকাৰ আচ্ছন্ন হয়েছিল তাঁৰ গ্ৰামা ভক্তেৰা। বেশীৰ ভাগই মাৰা গেল, যাবা বাঁচল তাৰা শেষে গ্ৰাম ছেড়ে পালালো। নিৰ্জন গ্ৰামা মন্দিৰে শ্যামৰায় একা পড়ে বহিলেন, আৰ বহিলেন তাঁৰ সেবক বলৰাম ভট্টাচাৰ্য— বাসুদেবেৰ ছেলে— বৰ্তমান পূজাবী জনাৰ্দনেৰ পিতা।

তখন থেকেই একটু ভাঁটা পডল ভক্ত শ্ৰোতে।

তাৰপৰ একটা ব্যাপাৰ ঘটল। দশ মাইল দূৰে, যে মহানগৰীটা ছিল তা ক্ৰমশ ৰাছৰ মতো গ্ৰাস কৰে চললো অন্যান্য গ্ৰাম এবং অবশেষে লক্ষ্মীপুৰেৰ প্ৰান্তে এসে থামল।

তাৰপৰ ইতিহাসেৰ ঘূৰ্ণমান চাকাৰ সঙ্গে এলো নূতন নূতন লোক, গড়ে উঠল বড় বড় অট্টালিকা, নিৰ্মিত হলো বড় বড় ফাঙ্কটী আৰ ডুটমিল। দানী অখোৰ স্থপ কমে এলো বটে,

কিন্তু নূতন ভক্ত জুটল শ্যামবায়ের। কুলি, মজুর, চোব, দালাল। কিছু দেয় না, শ্যামবায়ের কাছে তারা শুধু নিবস্তব চায়। শ্যামবায়ের চোখের তাবা স্তিমিত হয়ে এলো। গায়ে ভ্রমল ধুলোর আন্তরণ, বেনাবসী চেলির গায়ে পচন ধবল, ভোগবাগেব দৈব আভিজাত্য কমে এলো। সিংহাসনের গা টিপলে এখন মচ মচ করে ভেসে যায়, মন্দিরের গা থেকে ঝপ ঝপ করে চুন-সুবকি খসে পড়ে, প্রায়াক্ষকাব মন্দিরাভ্যন্তরে সংস্কারহীনতার চাপা ও ভ্যাপসা গন্ধ অনবরত থম থম করে।

কিন্তু ভূমিকা থাক।

মন্দির থেকে দু'শো গজ দূরবর্তী যে পাটকলটাব চিম্ননী বেয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেকছে তার মালিক নাগবমলজী একদিন তাব অফিসঘরে দ্রুত ও উত্তেজিতভাবে পাখচাষি কবজিন।

বাহুব মতো এই মহানগরীটা যখন দূরে ছিল—তখনকার কথা—পঞ্চাশ বছর আগেকাব কথা বলছি। নাগবমলের বাবা সাগবমল আব তার বাবা সুবমলের কাহিনী। সে কাহিনী সবাই জানে। তিল থেকে তাল আব প্রবালকীট থেকে প্রবালদ্বীপ তৈরি করার কাহিনী। ধান-চাল আর পাটের মহাজন থেকে অজুত জোত, অসংখ্য অট্টালিকা ও বহু জুটমিলের মালিক হওয়ার অতি দীর্ঘ কাহিনী। জটিল মস্তিষ্কের জট-পাকানো বুদ্ধি, সর্বগ্রাসী লোভের বহুদূর প্রসারিত বাহু আব জালিয়াতির কাহিনীকে সবিস্তারে বলে ইতিহাসের নিবস ও শুকনো সাদ পেয়ে লাভ কি? তার চেয়ে কাহিনীতেই ফিরে আসি।

মিলেব ম্যানেজার বাঙালী বাবু। অবিকল সাহেবদেব মতো মেজাজ তাব, তামাটে চেহাবাতেও সাহেবী চেকনাই। নাম মিঃ বাসু।

বাসু বললো, “যুগ বদলেছে নাগবমলজী, মজুরদেব তেজ দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে।”

নাগবমল হাসল, “যুগ বদলেছে—তা বটে”—

বাসু বললো, “মিলেব মজুররা আজকাল একজোট হয়েছ—দিনরাত দল পাকিয়ে ফুসফাস করে”—

“হুঁ”—নাগবমল মাথা নাড়ল, পাগড়ীটাকে খুলে টেবিলের উপর বাখল, তাবপবে পকেট থেকে রুমাল বার করে টাকের ঘাম মুছে বললো, “মিঃ বাসু”—

“বলুন”—

“যুগ বদলায় তা মানি, কিন্তু তাই বলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে কি চলবে?”

“আজ্ঞে না”—

“মজুর-কুলি ছোটলোকদেব দল আজ মাথায চড়তে চাইলেই কি মাথাটাকে নীচু করে দিতে হবে?”

“Certainly not”—

“তবে ইঁশিয়ার হেন, খোঁজ লিন কে এদেব দলের সর্দার?”—

“তা আমি জানি”—

“কে সে? কি নাম তার?”

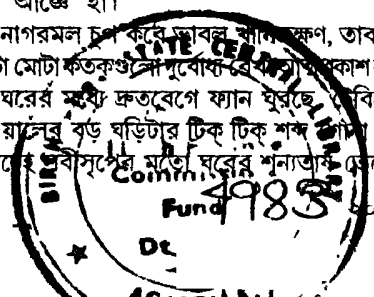
“ত্রিলোচন দাস।”

“সেই কানা লোকটা, তাই না?”

“আজ্ঞে হাঁ।”

নাগবমল চাপ করে মাঝল কানিস্কণ, তাব ধবধবে সাদা ললাটদেশে কানসাপের মতো মোটা মোটা কতকগুলো দাঁদবোকা বে কটা অক্ষয় কবল। বেশ কিছুক্ষণ চাপ করে বইল নাগবমল।

ঘরের মধ্যে দ্রুতবেগে ফ্যান ঘুরছে, টেবিলেব উপরকার কাগজগুলো সশব্দে নড়ছে, দেওয়ানের বড় ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে, মিঃ বাসু টার্কিশ সিগারেটেব ধোঁয়া কীর্ণগত হুঁবাসুপের মতো ঘরের শূন্যতায় ঘেসে বেড়াচ্ছে।



“মিঃ বাসু”—

“ইয়েস্ ব্রীজ্?”

“খবর লিন, আবও ভালভাবে খবর লিন, খবর লিন ত্রিলোচনের দুর্বলতা কোথায়—কোথায় আঘাত কবলে এক মুহূর্তে কমিয়াব হওয়া যাবে।”

আবাব টাক মুছল নাগরমল, ললাটের কালসাপওলো হঠাৎ অস্তিত্বিত হয়ে গেল, তাব মুখে দেখা দিল পশান্ত হাসি— সে বললো, “ঘাবড়াবেন না বাসুবাবু, হিম্মৎ চাই—তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”

বসন্ত হয়, মাঝীণ্ডটিকায় আচ্ছন্ন মুখমণ্ডলে মৃত্যুর ঘোষণা। শ্যামরায়েব ওখানে অর্য্য পড়ে।

কলেবা হয়, তরল, বিবর্ণ ভেদবমিব মাঝে অসহায়ভাবে কাংবায় ওরা। শ্যামবায়েব উদ্দেশে প্রার্থনা কবা হয়। শ্যামবায়, রক্ষা কব।

দাবিহ্রা, মৃত্যু, ব্যাধি, দুঃখ। শ্যামবায়, বাঁচাও, মঙ্গল কব, বক্ষা কব।

জনার্দন ভট্টাচার্য শ্যামবায়ের চরণামৃত বিতরণ কবেন, তুলসীচন্দন আর পবিত্র বস্ত্র দিয়ে আশীর্বাদ কবেন, “শ্যামবায় তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কববেন, শ্যামবায় আমাব জাগ্রত দেবতা।”

ত্রিলোচন—কানা ত্রিলোচন। ডান চোখটা তাব বসন্তেব ঘায়ে বসে গেছে, মুখমণ্ডলে আহত স্বাপদেব হিংসা। বা চোখেব তাবাটাকে বড় বড় কবে উত্তেজিত কণ্ঠে সে সবাইকে বলে, “শ্যামবায়, শ্যামবায় বাঁচাবে তোদেব, ওবে বোকাবা, আমাব কথা শোন—বেচাবী ঠাকুর দেবতাবা মানুশের কিছু কবতে পারে না —আমাদের দুঃখ দূর করাব ভাব আমাদেরি হাতে”—

সব কাজে সবাই মাথা নীচু কবে যে-ত্রিলোচনের কাছে, তাব মুখে একথা শুনে লোকেরা বাগ কবতে পারে না, কেবল হাসে। পাগল, ত্রিলোচনটা পাগল, দশজনের কথা ভেবে ভেবে ওব মাথা খাবাপ হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, দশজনের কথাই ভাবে ত্রিলোচন। দিনবাত।

ম্যানেজাব বাসু সেদিন মঙ্গলকে ধরে মাবল।

ত্রিলোচন গিয়ে সামনে দাঁড়াল, বললো, “খববদার ম্যানেজারবাবু—ওসব চলবে না।”

“হোয়াট্?” বাসু গর্জন কবে এগিয়ে এলো। কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ত্রিলোচনের পেছনে আবও একশ জন এসে দাঁড়িয়েছে। একচক্ষু ত্রিলোচন যেন একটা সেনাপতিব চেয়ে কম নয়। তার পশ্চাদ্বর্তী বাকী সবাই যেন এক-একজন সৈনিক। তাদের চোখে শাগিত ইঙ্গিত, অনর্থের সঙ্কেত।

বাসু পিছিয়ে গেল।

যখন খাটুনীর ঘণ্টা বাড়ল তখন তার অনুপাতে মজুরী বাড়ল না।

মজুরেবা তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। একটা চোখ না থাকলেই বা কি? একটা চোখ দিয়েই অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায় ত্রিলোচন।

ত্রিলোচন বললো, “শালারা ভেবেছে যে তোদের নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়”—

“তাহলে কি হবে?”

“কি হবে তা কি জানিস না হতভাগারা? কাজ বন্ধ কর—ধর্মঘট”—

ত্রিলোচনের একটা কথায় যন্ত্রের গান বন্ধ হয়ে গেল।

সেই ত্রিলোচন যদি ভগবানকে না মানে, যদি-শে শ্যামরায়ের মতো জাগ্রত দেবতাকে উপহাস কবে, তাহলে কি ভাবে লোকেরা? পাগল, পাগল আমাদের ত্রিলোচন দাস।

খবর এলো।

আর একটু হলে নাগরমল লাফিয়ে উঠত, কিন্তু সে নিজেকে সামনে নিল।

সে বললো, “কাজ হয়েছে বাসুবাবু— কেবলা মেরে দিয়েছি।”
 বাসু বুঝতে পারল না, ডান চোখের ভূঁ তুলে প্রশ্ন করল, “মানে?”
 “মানে আপনি যান আর জিতেনকে পাঠিয়ে দিন।”
 “আচ্ছা। কিন্তু আমি বলছিলাম কি জানেন?”
 “কি?”
 “ত্রিলোচনকে ববখাস্ত কবলে কেমন হয়?”
 “আপনি পাগল মিঃ বাসু। আবও ধর্মঘট চান? না না, যা বললাম তাই কবন গে।”
 জিতেন এলো। সাহেবদের পোষা বুলডগেব মতো দেখতে। খায়-দায় বসে থাকে, দবকাব
 হলে মনিবের ইস্তিতে শত্রুর টুটি লক্ষ্য করে লাফিয়ে পড়ে।
 জিতেন অনেকক্ষণ ধবে নাগরমলেব কাছে বসে রইল। অনেক কথা শুনল।
 কথা শেষ হলে হেসে বললো, “শেঠজী —নির্ভাবনায় থাকুন।”

জনার্দন ভট্টাচার্য শ্যামবায়ের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছিলেন।
 “শোন—শোন আমাব জাগ্রত শ্যামেব কীর্তি”—
 পিতা বলবাম ভট্টাচার্যেব সময়কাব কাহিনী। প্রতিদিন নৈশভোগেব পবে শ্যামবায়কে
 শোষাতেন তিনি—রীতিমত তাকিয়া বালিশ, লেপ তোষকেব মাঝে।
 তখন শীতকাল—একদিন একটা ভুল কবে বসলেন বলরাম। পারিবারিক কাবণে মনটা
 বিক্ষুব্ধ ছিল বলে তাড়াতাড়ি করে শ্যামরায়কে শুইয়ে তিনি বাড়ি ফিবলেন। খানিকবাদে
 শুয়ে পড়লেন, ঘুমোলেন। ঘুমেব ঘোবে হঠাৎ যেন লাঠির ঘা খেলেন তিনি। স্বপ্ন দেখলেন
 যে, শ্যামবায় যেন তাঁর গোক-খেদানো লাঠি দিয়ে তাঁকে মাবছেন আব বলছেন—“লেপটা
 গায়ে না দিয়েই শুইয়ে এসেছিঁস তুই, আমায় খাতির কবতে বুঝি তোব ভালো লাগে না?”
 অত সহজে নিদ্ৰুতি পাৰি না—খা লাঠির ঘা— কেমন, শিক্ষা হয়েছে?” উত্তেজিত ক্রোধাধ্ব
 শ্যামবায়কে তখন যেন আব চেনাই যায় না।
 ধডমড়িয়ে উঠে বসলেন বলরাম। সৰিস্ময়ে দেখলেন যে দেহেব উপব লাঠিব ঘায়ে
 কালচে কালচে দাগ পড়েছে—স্বপ্ন মিথ্যা নয়। তিনি মন্দিবেব দিকে দৌড়ে গেলেন। সতি,
 শ্যামবায়ের অভিযোগ মিথ্যা নয়।
 কাহিনী শেষ হলো। বিমুগ্ধ মজুরেবা নির্বাক হয়ে বসে বইল। এমন জাগ্রত দেবতা
 এই শ্যামবায়!

ত্রিলোচন হেসে বললো, “যত সব গাঁজাখুরি গল্প বলছ ঠাকুর—মানুষগুলোর মাথা তো
 খেয়েইছ আবাব তাদের হাড়গুলোকেও চিবোচ্ছ মাইরি”—
 জিতেন বলে উঠল, “ছিঃ ছিঃ, এমন পাপকথা বলো না”—
 অন্যান্য মজুরেবাও আজ একটু ক্ষুব্ধ হলো।
 জিতেন বলে চললো, “ঠাকুর দেবতা, ঐদের নিয়ে অমন কথা বলতে নেই, আর অমন
 কথা শোনাও মহাপাপ”—ললাটে হাত তুলে সে শ্যামরায়কে প্রণাম জানাল।
 জনার্দন বললেন, “হ্যাঁ, সতি ত্রিলোচন, অতটা নাস্তিক হওয়া ভালো না।”
 অন্যান্য মজুরেবাও শ্যামরায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।
 ত্রিলোচন উঠে দাঁড়াল, একটা বিড়ি ধরিয়ে সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, “জোঁরা যত সব
 জানোষাবের দল— তোদের বোঝাবে কোন্ শালা? যাঃ মরণে—চুলোয় যা হতভাগারা”—
 সে চলে গেল।
 জিতেন বললো, “এতটা ভালো না মাইরি, সতি বলছি—এটা বাড়াবাড়ি। তুই সবাব
 সর্দার কিন্তু তাই বলে ঠাকুর দেবতাকে গেরাখি করবি না—তা কি হয়?”

জনার্দন সায় দিলেন, “ঠিক— কথা বলেছ”—

মজুরেরা স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যি, ত্রিলোচন বড় অন্যায় কথা বলে, ওর এতটা বাড়াবাড়ি ভালো না। হলেই বা সর্দার, সব কিছুতে সর্দারী কি সহ্য করা যায়?

ব্যাপারটা একদিন আরও বেড়ে গেল।

কলেরা—বস্তিতে কলেরা দেখা দিয়েছে। আর্থ কোলাহলটা ক্রমশ এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে সংক্রামিত হচ্ছে তখন।

শ্যামরায়েব ওখানে গিয়ে সবাই ভিড কবল।

“ঠাকুর, চন্মামেবত দাও—বাঁচাও”—

সহ্য হয় না ত্রিলোচনের।

“চন্মামেরত! চন্মামেবত’তে কলেবা। সাববে? ওবে পাগলেবা—ববং চল ডাক্তার ডাকিগে”—

জনার্দন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। প্রাচীন পূজাবীবাংশেব বংশধরের মুখে ক্রোধ বনিয়ে এলো। তাঁর উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে অকস্মাৎ একটা বস্ত্রের উচ্ছ্বাস খেল গেল।

ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, “সাবধান, সাবধান ত্রিলোচন—নার্স্তিকতারও সীমা আছে”—

মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ মজুবদের চোখেও বিবাক্তি বনিয়ে এলো। তাব সঙ্গে ক্রোধ।

জিতেন বললো, “তোমাব বাড়াবাড়ি কিন্তু আমবা আর সহিব না ত্রিলোচন”—

এক চোখ পাকিয়ে ত্রিলোচন হেসে বললো, “কি করবি? মাঝি? মাঝ—কিন্তু যা সত্যি তা বলতে আমি ডবাইনাবে শালা। আবাব বলছি শোন, বুদ্ধিব মোড যোবা— দেবতা ফেব্‌ততে কিছু হবে না।”

জনার্দন এবাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, উদ্বেজনাব আতিশয়ো তাঁব দেহ থেকে উত্তরীয়টা খসে পড়ল, আওনের মতো টক্টকে বঙেব ঝড়ু দেহটাকে কঠিন কবে তুলে তিনি বললেন, “শ্যামবায, আনাব জাগ্রত ঠাকুর শ্যামরাযকে তুই বিশ্বাস কবিস না?!”

ত্রিলোচনও যেন গবম হয়ে উঠেছে, দুই হাতের বৃদ্ধাস্থুষ্ঠ নাচিয়ে, ভেংচি কেটে সে বললো, “জাগ্রত না কচু, পাথবাকে তেলচন্দন আব খাবাব দিলেই জাগ্রত হয়ে গেল আব কি!”

“খববদাব”—জিতেন লাফিয়ে এগিয়ে এলো।

হঠাৎ যেন বাঁভংস হয়ে উঠল ত্রিলোচন, “তোমাদের জনাই তো দেশটা উচ্ছন্ন গেল ঠাকুর—কি আফিংই যে খাইয়েছ এই জানোয়ারগুলোকে—উঃ”—

“খববদার”—অনুগ্রহপ্রার্থী ভক্ত মজুরেরাও চেষ্টায়ে উঠল।

“তবেবে শালা”—আচম্কা জিতেন এবং আরও দু’তিনজন এসে ত্রিলোচনের উপর লাফিয়ে পড়ল। মাটির উপব আছড়ে পড়ল সে, আর আক্রমণকাবীবা অজস্র কিলচড় বর্ষণ করে চললো তাব উপব।

জনার্দন বললেন, “থাম, থাম।” মজুবদের ক্ষিপ্ততা দেখে হঠাৎ তাঁর ভয় হলো, ত্রিলোচনের উপর একটু সহানুভূতির উদ্রেক হলো।

শেষ পর্যন্ত থামল বটে ওরা, কিন্তু তখন ত্রিলোচনের দু’কশ বেয়ে রক্তের ধারা নেমেছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলে ও চোখের তারাতে একটা আওঙ্ক ফুটে উঠেছে।

ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল, আততায়ী বন্ধুদের দিকে দৃষ্টিপাত কবে মৃদুকণ্ঠে সে হেসে বললো, “শেষ পর্যন্ত মারলি আমাকে, ঐ্যা? আমায মাঝি?”

কেউ জবাব দিল না।

টলতে টলতে চলে গেল ত্রিলোচন। আড়ালে গেল সে। যেন পরম একটা লজ্জার হাত থেকে সে আত্মরক্ষা করতে চায়, যেন একটা পশুর মতো একা একা সে নিজের ক্ষতকে লেহন কবতে চায়। হঠাৎ মুষড়ে পড়ল, শক্তিহীন হয়ে পড়ল ত্রিলোচন—আকাশেব বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ তাকে অসাড় করে ফেলেছে।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা থামে না, মজুবদের শক্তি কমে না। ত্রিলোচন সবে গেছে, তাব প্রতাপেব ফণা আজকাল আর নেই, তাকে আব আজকাল কেউ আমল দেয় না। তবু নাগরমলেব প্রাণে স্বস্তি নেই—মজুরেরা দমে নাই।

কিন্তু কেন?

“বাসুবারু”—

“ইয়েস স্লীজ্?”

“আবো ব্যাপার আছে—খবব লিন—খবব লিন—দেখুন, এখন ওদেব কে উসকানি দিচ্ছে।”

তজনীর আঘাতে টার্কিশ সিগারেটের ছাই বেড়ে ফেলে মিঃ বাসু বললো, “আচ্ছা।”

নাগরমল—কোটি কোটি টাকার মালিক নাগরমল। কুবেবেব মতেই যাব ঐশ্বর্যেব ভাণ্ডাব আব ঝুঁড়ি। সেই নাগরমলেব বিকল্পে কে উস্কাচ্ছে মজুবদেব? ত্রিলোচনেব শূন্যস্থান কে পূরণ কবল?

নাগরমল অতিবক্ত ভাতা দিচ্ছে না, কাজে ‘নাগা’ হলে মাইনে কাটে সে। তাব এই জুলুমেব বিরুদ্ধে মজুবেরা রুখে দাঁড়াল। কি কবে সম্ভব হলো তা? আজ তো ত্রিলোচন নেই, সে আজকাল আহত পশুর মতো শুধু আড়ালে আড়ালে ঘুবে বেড়ায়।

কিন্তু আছেন জনার্দন ভট্টাচার্য। জাগ্রত শ্যামবায়েব একনিষ্ঠ পূজাবী—যাঁব আগুনেব মতো টকটকে দেহবর্ণে দেবতাব জ্যোতিঃশিখা, মাথাব কেশে যাঁব অনেক জ্ঞানেব শুভ্রতা।

“ঠাকুর—বড় অত্যাচার হচ্ছে”—

“কি অত্যাচার? কার?”

“মালিকেব।”

“কি হলো?” জনার্দন বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন কবলেন।

মজুবেরা সব নিবেদন করল।

জনার্দন প্রথমে শ্যামবায়েব দিকে তাকালেন, তাবপবে তাকালেন ভক্তদেব দিকে, বললেন, “এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও, লড়াই কব তোমরা—শ্যামরায তোমাদেব সহায় হবেন।”

নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল মজুরেরা, তাদেব চোখগুলো জ্বলে উঠল।

কিন্তু আড়ালে ত্রিলোচন বিকৃত হাসি হাসল। পণ্ডিতও আজ তাব পথ ধরেছে, কিন্তু শ্যামবায়েব দোহাই কেন? কেন, কেন ঐ পাথরটার দোহাই? পাথর—হ্যাঁ, পাথরই তো। তাব চোখ দিয়ে এবাব আগুন ঠিকবে বেবোষ। মনে পড়ে নিজের জীবনের কথা। স্ত্রী, পুত্র, সংসার, আশা—সব ছিল ত্রিলোচনেব। একচক্ষু ত্রিলোচনেব দুটো চোখই ছিল। আর—আর সে এককালে পাথরেও দেবতাকে খুঁজত। কিন্তু দেবতাকে ডেকেও যখন স্ত্রী গেল, পুত্র গেল, সংসার হাওয়ায মিলালো, আশা শুধু ছাই হলো, দু’চোখেব একটা গলে গেল, তখন থেকেই ত্রিলোচনেব জ্ঞান হলো। একচোখেই সে পূর্ণ দৃষ্টি পেল। ভুল ভেবেছিল সে, এত দিন মিথ্যে সে বাতাসে প্রার্থনা ভাসিয়েছে, মিথ্যে সে লবণাক্ত অশ্রুশি বর্ষণ করেছে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, দুরদৃষ্ট—পাথরের মূর্তি কোনটাতাই কাজে লাগে না। পাথর পাথরই আর কিছু নয়। অতএব? কেন ঐ পাথরটার দোহাই?

ত্রিলোচন না বুঝলেও নাগরমল বুঝল সেকথা। বুঝল যে নেতৃত্ব নয়, ব্যক্তিত্ব নয়—
এখন একটা পাথবেব মূর্তিই ওদের উস্কাচ্ছে। হঠাৎ বুদ্ধির জগতে বিদ্যুতের মতো একটা
বখা বালসে উঠল।

“বাসুবাবু।”

“বলুন।”

“শহবেব সেবা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন।”

“কেন?”

“কাজ আছে।”

“কিন্তু শেঠজী—একটা কথা আছে। মজুবেরা যে আবাব বিগড়ে যাচ্ছে—স্ট্রাইক কববে
বলে শাসাচ্ছে”—

“কোনও ভাবনা নেই, আপনি ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকুন আব চাবদিকে বাত্ব কবে দিন যে ঐ
শ্যামবায়ের মন্দিরের কাছেই বিবাট একটা মন্দির গড়ব আমি।”

“মন্দির! মানে টেম্পল?” বাসুব গলায় টার্কিশ সিগারেটের ধোঁয়া যেন আটকে গেল।

“হ্যাঁ, মন্দির। কেন, আপনি কি ঠাকুর-দেবতা মানেন না?”

“নিশ্চয়ই, Surc—মানি বইকি।”

“তবে যান—”

সবাই শুনল সেকথা। কোটি কোটি টাকার পাহাডের উপর যে নাগরমল বসে আছে, সে
যদি আজ চাব লাখ টাকা দিয়ে একটা মন্দির গড়ে তোলে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

কিন্তু তবু আশ্চর্য হয় মজুবেরা। নাগরমল লোকটার তো ভক্তি আছে! কোটি কোটি
টাকা থাকলেই বা দেবতার জন্য লাখ লাখ টাকা ক’জন খরচ করে? এটা কম কথা নয়। শুধু
আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হয়ে যায় মজুবেরা।

কিন্তু কোন্ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা কববে নাগরমল? কেউ তা জানে না।

শুধু নাগরমল জানে সেকথা।

সন্ধ্যার পরে জনার্দন এসে নাগরমলের কাছে হাজির হলেন। নাগরমল তাঁর পদধূলি
মাথায় নিল, বিনয়ানতাব হয়ে বললো, “বসুন পণ্ডিতজী—”

জনার্দন প্রশ্ন কবলেন, “কি জন্যে ডেকেছেন শেঠজী?”

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে নাগরমল বললো, “খোলাখুলি বলব পণ্ডিতজী?”

“বলুন।”

“আমি মন্দির কবছি, জানেন?”

“শুনেছি—খুব সাধু সঙ্কল্প আপনার।”

“আমি এ মন্দিরে আপনার শ্যামরায়কে প্রতিষ্ঠিত কবতে চাই।”

“পাগল!” জনার্দন সহাসে উঠে দাঁড়ালেন। পৃথিবীতে আজ কেউ নেই জনার্দনের।
স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, ঐশ্বর্য—সব কিছুই আজ ঐ শ্যামবায়! একেব পর একটা করে পার্থিব
সম্বন্ধ যতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই জনার্দন বুঝতে পেরেছেন যে, ঐ বিবাট বিশ্ব-জগতে
একমাত্র শ্যামবায় ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। সেই শ্যামরায়কে তিনি অন্যের হাতে সঁপে
দেবেন। পাগল!

নাগরমল গম্ভীরকণ্ঠে বললো, “উঠবেন না, বসুন—কথাটা উড়িয়ে দেবেন না। আপনার
মন্দির প্রাচীন, আমার নূতন মন্দিরে নববেশে শ্যামবায় বিবাজ করবেন, আর আপনিই তাঁর
পজারী হবেন—”

“না।”

“কিস্তি কেন?”

“বড়লোকের প্রাসাদে গেলেই দেবতার মাহাত্ম্য বাড়ে না। তাছাড়া শ্যামবায় আমার—
আমার বৃকের পাজরা—”

“কিস্তি আপনার জীর্ণ মন্দির—”

“জীর্ণতাই তো তার মাহাত্ম্য—”

নাগরমল হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, “পণ্ডিতজী—”

“কি?” জনার্দনের চোখ জ্বলজ্বল করছে।

“টাকা দেব আপনাকে—”

“চাই না—”

“হাজার—পাঁচ হাজার—”

“না।”

“দশ হাজার—”

জনার্দন হাসলেন, “টাকা দিয়ে ভগবানকে কেনা যায়? না আব না, আমি
চললাম শেঠজী—”

আর কোনো কথা না বলে, কোনো উত্তরের প্রত্যাশা না করে জনার্দন ভট্টাচার্য ঘব
থেকে বেবিয়ে গেলেন। নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে দেয়ালঘড়ির টিক টিক শব্দটা
শোনা যেতে লাগল, একটা অর্বাচীনীর খিক খিক হাসিব মতো।

জনার্দনের গমন-পথেব দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাগরমলের ধবধবে সাদা
ললাটদেশে আঁকাবাঁকা কালসাপদেব দেখা গেল। একটা ক্রুব বীভৎসতায় হঠাৎ তাব
মুখমণ্ডলটা ভয়ানক হয়ে উঠল।

বিলেত-ফেবত ইঞ্জিনিষাব এসেছে। এসেছে সব ওস্তাদ কাবিগবেবা। জয়পুব থেকে
পাথব এসেছে, বাঙলা বোম্বাই থেকে শিল্পীবা। নাগবমলের বিবাট মন্দিব যেন মানুষদেব
ভক্তি-মনলে ইন্ধন জোগায়।

তাই হলো। ছ'মাসেব মধ্যে বিবাট মন্দিব গড়ে উঠল। শ্বেতপাথব আব কণ্ঠিপাথবেব
মেঝে, প্রাচীবগাত্রে পৌরাণিক দেবদেবীদের অপূর্ব চিত্রকাহিনী। চন্দনকাঠ, সোনা আব কাপো
দিয়ে বিগ্রহেব সিংহাসন নির্মিত- হলো, দেবতাব পবিচ্ছদেব জন্য এলো দামী দামী বেশম।
মনে হলো যে বৈকুণ্ঠেব বিষ্ণুকেও বুঝি টলানো যাবে।

মনেব বিদ্রোহ দমিত হয়। অভ্রভেদী মন্দিবেব ধোঁয়াটে চূডাকে দেখে ভয় হয়, ভক্তি হয়,
দেবতাব অপ্রতিহত ক্ষমতাব কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নাগবমলেব উপর রাগটা যেন
কমে আসতে চায়।

আড়ালে ত্রিলোচন মনে মনে গর্জায়। অন্ধ, ওরা অন্ধ। আফিংয়ের নেশায় আচ্ছন্ন,
সম্মোহিত হয়ে আছে ওবা। ওবা অসহায়, নিজেদের অপবিসীম ক্ষমতাব কথা জানে না
বলেই ওবা অমনভাবে মাথা খোঁড়ে।

রাত হয়েছে তখন। শ্যামবায়েব পূজা, আরতি, ভোগ, শযান সব শেষ বন্ধে জনার্দন
বাড়ি ফিরছিলেন। একশ' বছরেব শ্যামরায়ের মনভোলানো হাসিটা তখনো তাঁব চোখেব
সামনে ভাসছিল।

এমনি সময়ে কালো যবনিকা নেমে এল।

অন্ধকারের মাঝখান থেকে সজোরে একটা রামদা এসে তাঁর ঘাড়ে পড়ল। কোনো কিছু
ভাববাব আগে, ‘শ্যামরায়’ বলে ডাকবাব আগেই জনার্দন ভট্টাচার্যের মাথাটা তিনহাত দুবে
ছিটকে পড়ল। মাটিতে ইট পড়লে যেমন শব্দ হয় রাম দত্তদেব বাগানে তেমনি একটা শব্দই শুধু
শোনা গেল আব লাল রক্তের মদির গন্ধে বাতের অন্ধকাব বিহ্বল হয়ে উঠল। আর কিছু নয়।

তারপরেই হঠাৎ একদিন এক অপূর্ব কাহিনী শোনা গেল।

শ্যামরায়ের মন্দিরকে এখন যাবা দেখা-শোনা করছিল নাগরমল তাদের ডেকে পাঠাল।
দীনভক্তের মতো নশ্রভাবে, বিনীতকণ্ঠে সে তাদের এক বিচিত্র স্বপ্নকথা বললো। কাল
রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে। দেখেছে যে শ্যামরায়—জাগ্রত দেবতা শ্যামরায় যেন তাকে করুণকণ্ঠে
মিনতি কবে বলছেন, “আমায় নিয়ে যা নাগব—আমায় এ ভাঙ্গা মন্দির থেকে উদ্ধার
কব—সবাইকে বল্—”

“আপনাবা এবার আমায় কি করতে বলেন?” মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল নাগরমল। একমুহূর্ত
চুপ করে রইল ওবা, তাবপরেই সবাই সম্মিলিতকণ্ঠে বলে উঠল, “নিয়ে যান, শ্যামবায়কে
আপনার মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত করুন শেঠজী—”

নাগবমলের কণ্ঠে আবেগ, চোখে জল। সে বললো, “আমি ধনা হলাম। তবে ও মন্দিরকেও
সারিয়ে দেব আমি, নূতন মূর্তির প্রতিষ্ঠা করব ওখানকার শূন্য সিংহাসনে — যে টাকা
লাগে—আমি, আমি দেব তা।”

সারা শহবে ছড়িয়ে পড়ল এই দিব্য কাহিনী।

প্রেতের মতো ঘুবে বেড়াচ্ছিল যে ত্রিলোচন তার কানেও একথা গেল। মুহূর্তে সে আজ
শ্যামবায়ের ক্ষমতাকে উপলব্ধি কবল—কি অদ্ভুত সে ক্ষমতা।

খুঁখু ফোলে সে গাল দিয়ে বললো, “শালা—প্যাচার বাচ্চা”—

তাবপবে একদিন মহাসমারোহে নাগবমলের মন্দিবে শ্যামবায়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।
সেদিন পাটকল বন্ধ বইল, মজুবেবা ছুটি পেল।

আঃ, কি অপকপ দেখাচ্ছে শ্যামবায়কে।

তখন সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। শ্যামবায়ের বয়স হয়েছে—একশ’ বছর— তবু বার্ধক্যবিহীন
প্রস্তবেব মাঝে অনন্তকালের কৈশোরকে যেন শিল্পী অমব কবে তুলেছে। সোনা, কাপো,
জবি, বং আব আলোব উৎসব। কে এককোণে ফ্রপদ গাইছিল—তার সঙ্গে একজন ঝাঁপতালে
পাখোয়াজ বাজাচ্ছে— সেই ওক ওক শব্দে মন্দিব যেন মদ্রিত হয়ে উঠেছে। বহু বছবেব
বুড়ুক্ষু শ্যামরায় তাঁর কোটিপতি ভক্তের অর্ঘ্যেব দিকে তাকিয়ে আছেন—তাঁর রসনায় জল
এসেছে, তাঁর পবিপুষ্ট ও ধনুকেব মতো বাঁকা ঠোটেব কোণে চঞ্চল কিশোরের দুটামিভবা
হাসি। অপকপ!

ত্রিলোচন হুলে পুড়ে মবে। কি কবে ওদেব জাগানো যায়?

দিনেব পর দিন কাটে।

কি কবে, কি কবে ওদেব জাগানো যায়?

আবার সেই এক হাঁতিহাস। ব্যাধি, মড়ক, দারিদ্র্য। শ্যামরায় বাঁচাও, বক্ষা কবো। চবগামৃত
আব তুলসী-চন্দন। প্রস্তবেব আশীর্বাদ। আফিং খেয়ে ঝিমোয় সবাই। আর সেই অবসরে
নাগরমলের ভুঁড়ি বাড়ে, ধীবে ধীবে বসিয়ে বসিয়ে সে হতভাগাদেব গলা কাটে। আজ আর
ভয় নেই—আজ নাগরমল সেই শ্যামরায়ের পূজাবী— যে জাগ্রত মজুরদেব অনাহাব
থেকে বাঁচান, মৃত্যু থেকে বক্ষা কবেন, দারিদ্র্য থেকে উদ্ধাব করেন।

অসহায়ভাবে ছটফট করে ত্রিলোচন। কি কবা যায়, কি করা যায়? কি করে ওদেব
জাগানো যায়?

আগুন।

শেষরাতে কোলাহল ধ্বনিত হলো।

ছুটে এলো শত শত মজুর।

“আগুন—শ্যামবায়ের নতুন মন্দিরে আগুন লেগেছে—”

“কেরোসিন তেল আব পেট্রোল ঢেলে আওন লাগিয়েছে কেউ—”

“দমকল ডাকো— ফোন করো—”

“শ্যামবায়কে উদ্ধার কর।”

এমনি সময়ে ছুটে এলো ত্রিলোচন। তাব একচোখ উত্তেজনায জ্বলছে, সে কাঁপছে।

“যাচ্ছি—আমি উদ্ধার কবছি শ্যামবায়কে—”

কাউকে কিছু বলাব সুযোগ না দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের ভিতরে ছুটে গেল সে। শ্যামবায়ের প্রকোষ্ঠের শালকাঠের দবজাটা তখন পুড়ে গেছে, আওন বিস্তৃত হয়েছে ভিতবেব দিকে, স্পর্শ করেছে সিংহাসনকে।

ভয়াবহ বীভৎসতায় কুটিল হয়ে উঠেছে ত্রিলোচনের মুখমণ্ডল। দুটো হাত বাড়িয়ে সে শ্যামবায়কে তুলে নিল।

মৃদু, মোলায়েম কণ্ঠে সে বললো, “একশ” বছর বয়েস হয়েছে তোমাব—আর নেক্টে লাভ নেই শ্যামবায়—”

শ্বেতপাথরের মোঝেব উপর কষ্টিপাথরের কিশোর মূর্তিটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আওনের ঝাপটা এসে চামড়া লাগছে, পড়ছে ফোঁস্কা, তবু হাসল ত্রিলোচন। আঃ, আজ সে তৃপ্ত।

সমস্ত মন্দিরে তখন দীপাবিতা উৎসব শুরু হয়েছে। কাঠের দবজা জানালাব চটাচট শব্দ শোনা যায়। শ্যামবায়ের সোনা রূপো দিয়ে মোড়া চন্দনকাঠের সিংহাসনটা তখন কাগজেব মতো দাউ দাউ কবে জ্বলছে। বাতাসে চন্দনের একটা সুতীর সুগাণ।

লেলিহান হয়ে উঠেছে—ক্ষুধার্ত বাক্ষসেব মতো চমৎকার আহার্য পেয়ে সেই অগ্নিবাহি যেন পরিতৃপ্তিব বাক্ষসী নিঃশ্বাস ফেলছে। আঃ—আঃ! ধোঁয়া উডছে, আওনের সর্প-ভিত্তা বাতাসকে লেহন কবেছে—ব্রহ্ম, বাস্ত, ভয়ার্ত মজুবোবা দৌড়াদৌড়ি করছে।

বেরিয়ে এলো ত্রিলোচন। জামা কাপড় পুড়ে গেছে, অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দগ্ধগে যা আব ফোঁস্কা নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো ত্রিলোচন।

মজুরেরা সবাই ছুটে এলো কাছে।

“পাবলাম না—ভাইসব, পারলাম না—” বিচিত্র হাসি হেসে বললো ত্রিলোচন।

সবাই তাকাল ত্রিলোচনের দিকে। তাকে দেখে তাদের ভয় হয়, ভক্তি হয়। শ্যামবায়কে উদ্ধার করা গেল না! হঠাৎ ওরা দুর্বলবোধ কবে। এবাব? এবার কি হবে?

“ত্রিলোচন—কি কবি তবে?”

“কিছু না—শুধু দেখ— দেখ কি চমৎকাব আওন জ্বলছে—”

হিব হয়ে দাঁড়াল সে। যা, ফোঁস্কা—কিছু যায় আসে না। সেই ভীতজনক আওনের আলো এসে তার মুখের ওপর পড়েছে, বসন্তের দাগে বিকৃত মুখমণ্ডলের উপর এক বিচিত্র বীভৎস হাসির রেশ। আওনের অপরূপ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে। পুড়ুক, শ্যামবায়ের অস্ত্যোস্তিক্রিয়া সুসম্পন্ন হোক। মিষ্টি চেহারার অন্তরালে পাথরের মতো নিষ্ঠুর ও নির্লিপ্ত মন যে শ্যামবায়ের তার অনেক বয়স হয়েছে—শ্যামবায় মরুক। দেবতার সব রক্তবীজের মতো—মরেও মরে না। দেবতার না মরুক, অন্তত শ্যামবায়ের মতো দেবতার মরুক। শ্যামবায়কে আব নয়। নূতন দেবতা চাই এবাব—যাঁকে টাকা দিয়ে কেনা যাবে না, যাঁকে বিশ্বাস করার জন্য বুদ্ধি ও মানবত্বকে বলি দিতে হবে না।

এক চোখ—মাত্র একটা চোখ ত্রিলোচনের। ডান চোখটা তার বসন্তের ঘায়ে গলে গেছে, গায়ে তার যা আর ফোঁস্কা, তবু তার মুখে আজ পরিতৃপ্ত স্বাপদের উল্লাস। একটা চোখ—মাত্র বাঁ চোখটা আছে তার। আর সেই বাঁ চোখের উপর সেই অগ্নিলীলার আলো এসে পড়েছে—ঝকঝক করছে সেটা—অনির্বাক সূর্যকান্ত মণির মতো।

বিকল্প

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

তিনজনের ছোট্ট সংসারে কোন অশান্তি ছিল না। সুধা, তার বাবা হরগোবিন্দ আর সুধার ছোট্ট ভাই হাবুল—তিনজনে মিলে শহরের সীমান্তে যে একটুখানি সংসার রচনা করেছিল তাতে অভাব অনটন অসুবিধে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু অশান্তির কথা কারও মনে হয় নি। সরু গলির মধ্যে পুরনো দোতলা ভাড়াটে বাড়ি। তার একতলায় একখানি মাত্র ঘর তিনজনের ভাগে জুটেছে। এই ঘরখানির মধ্যেই রান্না খাওয়া শোওয়া সব। আবার এই ঘরে ব'সেই হাবুল তার স্কুলের পড়া পড়ে। অসুবিধে খুবই হ'ত। সুধা মাঝে মাঝে হরগোবিন্দকে বলত, “বাবা, আর একটা ভাল বাড়ি দেখ। এই একখানা ঘরে কি চলে?”

হরগোবিন্দ বলতেন, ‘তা ঠিক। তোদের ভারি কষ্ট হচ্ছে। বাড়িটা বদলাতে হবে।’

কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে বদলানো আর হয়ে ওঠে নি। অবশ্য ভাল বাড়ির খোঁজ অনেকবারই এসেছে। দুখানা ঘর আর রান্নাঘর, বাথরুম সমেত ফ্ল্যাটের খবর কয়েকবারই নিয়ে এসেছে হাবুল। হরগোবিন্দ চাটুযো উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িও দেখে এসেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাড়া, সেলামি আর অ্যাডভান্সের অঙ্ক শুনে আর এগোন নি। পুরনো বাসায় ফিরে এসে ছেলে-মেয়েকে বলেছেন, “দূর মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করা। তার চেয়ে এই কুড়ি টাকার ঘর আমাদের ঢের ভাল। আর এর চেয়ে বেশি জায়গায় আমাদের হবেই বা কি?”

সুধা হেসে বলত, ‘আমি, জানতুম বাবা। তুমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও নড়বে না।’

হরগোবিন্দ জবাব দিতেন, ‘নড়ব রে নড়ব। আগে দায়মুক্ত হই, তারপর অন্য দিকে তাকাব। এখন কি আমার বাজে খরচ করবার সময় আছে?’

বাবার কথার মানে যে কি তা ভাইবোন দুজনেই বুঝতে পারত। হাবুল পড়তে পড়তে দিদির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ মুচকে হেসে ফের বইয়ে মন দিত।

সুধা লজ্জিত হয়ে বলত, ‘বাবা আমি বুঝি তোমার একটা দায়? তুমি কেবলই ওই এক কথা বল।’

হরগোবিন্দ বলতেন, ‘দায়ই তো। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়। কিন্তু তোকে বিদায় দিয়ে কি ক’রে যে আমি থাকব তাই ভাবি।’

সুধা একটুকাল চুপ ক’রে থেকে বলত, ‘আমাকে বিদায় দেওয়ার কথা তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমি চ’লে গেলে তোমাদের চলবে কি ক’রে? হাবুল তো এখনও কত ছোট। ও কি তোমার যত্ন-আশ্রিত করতে পারবে? ও বড় হোক, বিয়ে-থা করুক, তারপর—’

হরগোবিন্দ হাসতেন, ‘পাগলী। ততদিনে তুই যে একেবারে বুড়ী হয়ে যাবি।’

সুধা বলত, ‘তা হ’লে তো ভাবনাই চুকে গেল। চিরকালের জন্যে তোমার বুড়ীমা হয়ে তোমাব কাছে থেকে যাব। আমাকে কাছছাড়া করবার কথা তুমি আর তখন ভাবতেই পারবে না।’

কিন্তু ওই একটিমাত্র কথা ছাড়া হরগোবিন্দের আর কোন ভাবনাই যেন নেই। দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসের কাজে কাটে। বাকি সময়টুকু সুধার বিয়ের চিন্তা, চেষ্টা আর আলোচনা নিয়েই থাকেন হরগোবিন্দ।

পাড়ায় কৃপণ ব'লে বদনাম আছে তাঁর। কোন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্যে চাঁদা চাইতে গেলে সিকি-আধুলির বেশি তাঁর হাত দিয়ে গলে না। নিজের জামা কাপড় জীর্ণ হয়, ময়লা হয় ; সে সম্বন্ধে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু ছেলের পোশাক আর মেয়ের শাড়ি গয়না কিনে দেওয়ার দিকে দারুণ বোঁক। ফুরসৎ পেলেই মেয়েকে নিয়ে স্যাকরার দোকানে যান। পুরনো গয়না ভেঙে নতুন ডিজাইনের ফরমায়েস দেন। বছরে দু-চারখানা ক'রে নতুন গয়না না গড়ালে হরগোবিন্দের তৃপ্তি হয় না। সুধা প্রায়ই আপত্তি করে, 'এত গয়না কেন করছ বাবা?'

হরগোবিন্দ জবাব দেন, 'সব তো এক সঙ্গে করতে পারব না, আস্তে আস্তে ক'রে রাখি। তোর মার তো কিছুই পেলিনে।'

প্রায় বছর তিনেক যক্ষ্মায় ভুগে সুধার মা নির্মলা মারা গেছেন। সেও বছর দশেক হ'ল। তখন মাইনে বেশি ছিল না হরগোবিন্দের। স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যে খরচ জোগাতে তাঁর গায়ের গয়না থেকে শুরু ক'রে নিজের ঘড়ি বোতাম পর্যন্ত গেছে। আরও প্রায় সাত-আট শ'টাকা দেনা হয়েছিল। কষ্ট করে থেকে বিলাস-ব্যসন তাগ ক'রে সব দেনাদায় শোধ দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন হরগোবিন্দ। তাঁর মত একজন দেড় শো টাকার কেবানীর পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। সুধাকে ভাল ঘরে-ববে দেবেন—এখন এই তাঁর একমাত্র সাধ। সেই সাধ মেটাবার জন্যে তিনি অসাধ্য সাধন করছেন। অফিসের চাকরিব পরে একটি পার্টটাইম কাজ নিয়েছেন। সংসার খরচের জন্যে যা লাগে মেয়ের হাতে তুলে দেন, বাকী টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখেন। গয়নাও অল্প স্বল্প মেয়ের গায়ে থাকে। পাছে হারিয়ে যায় কি চুবি যায়, সেই আশঙ্কায় বিদেশী ব্যাঙ্কে বেশি ভাড়া দিয়ে বাকীগুলি নিরাপদে রাখেন হরগোবিন্দ।

মাঝে মাঝে হাবলু সুধাকে বলে, 'দিদি, বাবা তোকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।'

সুধা হেসে জবাব দেয়, 'ভারি হিংসুটে তোঁ তুই। কিসে প্রমাণ পেলি? বাটখারায় ওজন ক'রে দেখেছিস?'

হাবলু বলে, 'দেখেছি বই কি। অম্মাব যেখানে এক পো, তোর সেখানে এক সের। তোব বিয়ের জনোই তো বাবা কেবল টাকা জমাচ্ছেন।'

সুধা বলে, 'ও, তোর বুঝি সেই দুঃখ। তোর বিয়ের জন্যেও আব একজনের বাবা এব চেয়ে বেশি টাকা জমিয়ে তুলছে তা জানিস?'

টাকাও জমে, গয়নাও জমে। বিয়েই শুধু হয় না সুধার। তিন-চাব বছর ধ'রে এত সম্বন্ধ এল গেল, কিন্তু হরগোবিন্দের মোটে পছন্দই হয় না। যে ছেলের রূপ আছে তার বিদ্যা কম, যার বিদ্যা আছে তার আবার বিদ্যা বিক্রির সামর্থ্য কম, যার অর্থ আছে তার আবার কুল নেই; এমনি বাছাই করতে করতে সুধার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেল।

সুধার মাসীমা থাকেন বউবাজারে। তিনি প্রায়ই এসে হরগোবিন্দকে তিরস্কার ক'রে যান, 'জামাইবাবু, এ করছেন কি? দেখে শুনে মেয়ের এবার বিয়ে দিন। বয়স হয়ে গেছে! এখন বেশি বাছবিচার করা কি ভাল?'

হরগোবিন্দ জবাব দেন, 'কি করব বল কমলা? তোমার মত চার-পাঁচটি 'তো নয়, আমার ওই একটি মাত্রই মেয়ে। বাছবিচার একেবারে ছেড়ে দিলে কি চলে? তা ছাড়া হিন্দুব ঘর। একবার ভুলভ্রান্তি হ'লে তো আর শোধরাবার জো নেই।'

সুধাও বাপের পক্ষ টেনে কথা বলে। তারও বিয়েতে ভারি অমত। হাবলু আরও বড় হোক, স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকুক, নিজের শরীরের আর জিনিসপত্রের যত্ন নিতে শিখুক, তাবপব বিয়ে করবে সুধা। এখন দিদিকে না হ'লে হাবুলের যে একদিনও চলে না।

মেয়ের এই যুক্তিতর্কে মনে মনে খুশিই হন হরগোবিন্দ। শুধু বাইবের চেহারাই নয়, হৃদয়টাও মায়ের মতই পেয়েছে সুধা। ভারি কোমল মন, স্নেহভরা বুক। হবগোবিন্দ অফিসে বের করার আগে লন্ডি থেকে ধুইয়ে আসা শার্টে যখন বোতাম পবাতে বসে সুধা, কি উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের জুতা ব্রাশ করতে থাকে, দেয়ালে টাঙানো নির্মলার প্রথম যৌবনের ফোটোর সঙ্গে মেয়েকে মিলিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। আকৃতি-প্রকৃতিতে ঠিক একেবারে দ্বিতীয় নির্মলা। তেমনি পিঠভবা কালো চুলের রাশ, তেমনি শ্যামলা গায়ের বঙ, আর ঠিক তেমনি নাক চোখ ঠোঁটের চিবুকের ছাঁদ। সুধার মায়ের সঙ্গে তাব যে এত মিল আছে, তা ওর মাসী মেসো স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু নির্মলাকে কি হরগোবিন্দের চেয়ে তাবা বেশি দেখেছে, না, বেশি জেনেছে?

শুধু বাপকেই নয়, ভাইকেও ভাবি যত্ন কবে সুধা। হরগোবিন্দের মনে হয়, নির্মলা বেঁচে থাকলেও যেন হাবুলের এত বেশি যত্ন হ'ত না। এই সেদিন পর্যন্ত গামছা দিয়ে ভিজে মাথা মুছে তাব টেরি কেটে দিয়েছে সুধা। আজকাল হাবুল দিদিব চেয়ে ইঞ্চি দুই লম্বা হয়ে গেছে ব'লে সুধার পক্ষে ভাইয়ের মাথা আঁচড়ে দেওয়ার সুবিধে হয় না। কিন্তু এখনও নাওয়াব খাওয়াব সব ব্যাপাবেই হাবুল দিদিব ওপব নির্ভরশীল। খার্ড ক্লাসে পড়লে হবে কি, বয়স চোদ্দ উতবে পনেরোয় পড়লেই বা কি হবে, স্বভাবে এখনও হাবুল প্রায় আট-দশ বছরের বালক। যেমন অগোছালো, তেমন অনামনস্ক। ওব বইপতর খাতা-কলম কোথায় থাকে, স্কুলের সময় সব খোঁজ পড়ে। অফিসে যাওয়ার সময় হরগোবিন্দ যেমন ব্যস্ত হতে থাকেন— সুধা, সুধা, হাবুলও তেমনি স্কুলে যাওয়ার সময় ডাকে— দিদি, দিদি।

বান্না বেখে, কি হাতেব অন্য কাজ ফেলে সুধাকে তৎক্ষণাৎ উঠে আসতে হয়। বিয়ের কথায় ও যে হাবুলের নাবালকত্বেব দোহাই দেয় তা একেবারে অযথা বলা চলে না।

হরগোবিন্দও সন্তানবৎসল কম নন। ঠিকে-ঝি যেদিন কাজ কামাই কবে তিনি নিজের হাতে বালতিতে ক'বে জল টানেন, মেয়েব উনুন ধরিয়ে দেন।

সুধা আপত্তি ক'বে বলে, ‘আচ্ছা বাবা, তুমি যদি এসব কববে তো আমি আছি কি জন্মো? দু বালতি জল কি আমি তুলতে পারি না?’ হবগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেন, ‘না পার না। জল তুলতে গিয়ে তোমাব মোমেব মত তুলতুলে হাতে যদি কড়া প'ড়ে যায় তোমার শ্বওব শাশুড়ী কি আমাকে খোঁটা দিতে ছাড়বেন? আর শুধু কি শ্বওর শাশুড়ী? তাঁদের সুপুত্রটিও আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন না।’ সুধা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু ক'বে বলে, ‘কি যে বল বাবা!’

উনুন ছাড়াও একটি স্টোভ আছে ঘরে। কিন্তু পারতপক্ষে সেটা সুধাকে হরগোবিন্দ ধবাতে দেন না। যদি কোন বিপত্তি ঘটে। যদি কোন খুঁত হয়ে যায় মেয়ের, তা হ'লে কি বক্ষা আছে। প্রথম প্রথম ঘবের মেয়েয ঢালা বিছানা ক'বে ছেলেমেয়েকে নিয়ে একসঙ্গেই শুতেন হবগোবিন্দ। এক পাশে তিনি, মাঝখানে হাবুল, আর একপাশে সুধা। কিন্তু একদিন ঘুমের যোবে ‘গোল’ ‘গোল’ ক'বে দিদিব গায়ে লাথি ছুঁড়ল হাবুল। সুধা না ঠেকালে হাবুলের কপালে যে সেদিন কি হ'ত তা বলা যায় না। মেয়ের জন্মো ছেলেকে মাবতে পারলেন না হবগোবিন্দ, কিন্তু আচ্ছা ক'রে বকুন লাগালেন। তাবপব ছোট একখানা তত্তপোশ কিনে এনে সুধাব আলাদা বিছানাব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তাব কোনও আপত্তি শুনলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, যদি চোখেমুখে লেগে যেত তা হ'লে কি হ'ত।

সুধা বলেন, ‘ম'রে যেতাম একেবারে। আমার কি এমনই মোমেব শবীর যে, একটা টোকা পর্যন্ত সহিতে পারি না!’

হরগোবিন্দ বললেন, ‘কেন সহিবি?’ মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস জীবনভোব কত কি সহিত হবে। কিন্তু আমার কাছে যতদিন আছিস, একটু আঁচডও তোর গায়ে আমি লাগতে দেব না।’

তত্ত্বপোশে শোষ সুধা। আর নীচে হাবুলকে নিয়ে থাকেন হবগোবিন্দ। কিন্তু হরগোবিন্দ ঘুমোন না। শুয়ে শুয়ে মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। তাঁর সেই প্রথম জীবনের গল্প, প্রথম যৌবনের গল্প। স্কুল-কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, সাতার, শিকাব, দেশভ্রমণ, আব দুঃসাহসিকতাব কাহিনী। সুধার মায়েব কথাও ওঠে। মেয়েব কাছে কিছুই গোপন করেন না হবগোবিন্দ। মেয়ে এখন তাঁর বান্ধবীব মত। নির্মলার সেই প্রথম বয়সেব মান-অভিমান, শাডি-গয়নার আবদাব, খুঁটিনাটি নিয়ে কলহ-মিলনের কাহিনী। এসব গল্প সুধা বহুবার শুনেছে। কিন্তু কোন কথা ব'লে বাবাকে একবারও বাধা দেয না। তারপর অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলে যান হবগোবিন্দ। সুধার ভাবী ঘর-সংসারের চিত্র আঁকেন। মেয়েব স্বশুর-বাড়িতে কত ছলে কতবাব ক'রে যাবেন, শ্রদ্ধাভাজন হয়েও জামাইয়েব সঙ্গে কি রকম বন্ধুব মত ব্যবহার করবেন, বছরে কবার ক'বে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে কলকাতার বাইরে সমুদ্র কি পাহাড়েব ধাবে বেড়াতে বেরুবেন, তার জল্পনাকল্পনা চলে। জামাই পেশায় কি হবে—ডাক্তার না উকিল, প্রফেসর না ইঞ্জিনিয়ার, সে সম্বন্ধে মেয়েব মতামত জিজ্ঞেস করেন হরগোবিন্দ। তার গায়ের বঙ, চোখ-মুখেব গড়ন, শবীরেব দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও মেয়ের মত নিতে ছাড়েন না। হবগোবিন্দের এত জিজ্ঞাসাব, এত জল্পনা-কল্পনাব উত্তরে সুধা সংক্ষেপে বলে, 'তোমাব পছন্দেই আমার পছন্দ বাবা। তুমি যেমন চাইবে তেমনি হবে।'

ছেলে-মেয়ে নিয়ে হবগোবিন্দ বেশ ছিলেন। তাঁদের এই ছোট্ট সংসাবে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুরই বিশেষ কোন স্থান ছিল না। যেন বাইবেব জগতেব কাউকে দিয়ে তেমন কোন প্রয়োজন নেই হবগোবিন্দের। কিংবা যেটুকু প্রয়োজন আছে সেটুকু শুধু বাইবেবই প্রয়োজন। কাগজেব হকার, দুধওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদী আব ট্রামবাসেব কণ্ডাক্টাবেব মতই স্বজনবন্ধু পাড়াপড়শীব সঙ্গে ব্যবহার কবতেন হবগোবিন্দ। তাঁবা কেউ এলে দু মিনিট যেতে না যেতেই তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন, তৃতীয় কি চতুর্থ মিনিটে তাঁদের ঘবে আগন্তুকেব আর থাকবার দবকার নেই। হরগোবিন্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে সবচেয়ে যাবা কাছে থাকেন—তাঁব শ্যালিকা কমলা আর ভাযরাভাই মণিময় চক্রবর্তী—তাঁবা পর্যন্ত এসে অস্বস্তি বোধ করতেন। বেশিক্ষণ টিকতে পাবতেন না। কমলা বোনপো-বোনঝিকে মাঝে মাঝে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে চাইতেন, কিন্তু 'আজ নয, কাল' ব'লে একটা-না-একটা অভূহাতে হরগোবিন্দ প্রায়ই তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন। ইদানীং অভিমানে কমলা আব তাদের নেওয়ার কথা মুখে আনতেন না।

ছুটিছাটাব দিনে হরগোবিন্দ নিজেই মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতেন। কোনদিন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি, কোনদিন চিড়িয়াখানা, যাদুঘব, কোনদিন বা গঙ্গাব ধাব দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। বছবে একবার ক'বে সিনেমা আর একবাব ক'রে সার্কাস বরাদ্দ ছিল সুধা-হাবুলের জন্যে। হরগোবিন্দ নিজেই ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। তাদের মাঝখানে আর কেউ আসুক আর কেউ থাকুক, তা তিনি বড় একটা পছন্দ কবতেন না।

তবু চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল।

ডাক্তার নয, উকিল নয, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার কিছু নয, সে নেহাতই সাধারণ একজন প্রাইভেট টিউটর, নাম ইন্দুভূষণ দাস। তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ, বঙ কালো, আকার মাঝারি, চোখ ছোট, নাক চ্যাপ্টা। সুপুুষ তাকে কিছুতেই বলা চলে না, বরং স্বভাৱ এত শান্ত আব নিরীহ যে পুরুষ বলতেও দ্বিধা হয়।

থার্ড ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন পেল বটে হাবুল, কিন্তু কোম বিষয়েই নম্বব ভাল পেল না। ইংবেলীতে টেনে-টুনে পাশ কবেছে, অঙ্কে পাশের নম্বব পর্যন্ত পায নি।

সুধা বলল, "বাবা, আমাকে না হয সেকেণ্ড ক্লাস থেকেই পড়া ছাড়িয়ে এনে ঘরে বসিয়ে বেখেছ, হাবুলকে তো আব তা পাববে না। ওকে পড়াতেই হবে। কিন্তু শুধু স্কুলের ওপব যদি ভবসা কব, ওব কিছু হবে না তা ব'লে দিচ্ছি।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'তা হ'লে কি করতে হবে?'

সুধা বলল, 'প্রাইভেট টিউটর রাখ।'

হরগোবিন্দ বললে, 'ওরে বাবা, সে যে বহু টাকাব ধাক্কা।'

সুধা বলল, 'হোক। ও যদি মানুষ না হয়, টাকা দিয়ে করবে কি? তোমার দেখবার যখন সময় নেই, মাস্টার একজন না বাখলে চলবে না।'

প্রথম খোঁজ পড়ল পাকা দাড়িওয়ালা অভিজ্ঞ শিক্ষকের, কিন্তু তাদের দক্ষিণা অনেক। চাক্ষুশ-পঞ্চাশের কমে কেউ সব বিষয়ে পড়িয়ে যেতে রাজী নন। শেষ পর্যন্ত দরকারকর্মী ক'বে কুড়ি টাকায় ইন্দুভূষণকে পাওয়া গেল। সে শ্যামবাজারেব একটা মেসে থাকে। ওদিকেবই কোন একটা হাই-স্কুলে পড়ায় আর টিউশনি করে। বেলগাছিয়ার এদিকে আবও দু-এক বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে সুন্মান কিনেছে। হরগোবিন্দের দু'তিনজন প্রতিবেশী তার জন্য সুপারিশ করলেন।

হরগোবিন্দ ইন্দুভূষণকে নিজের ঘরে নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাবপর হেসে বললেন, 'আপতত কুড়ি টাকা ক'রেই দেব। তারপর ছেলের রেজাল্ট যদি ভাল হয় তখন আলাদা বকশিস আছে। মিথো বলছিনে, তখন যা চাইবেন—'

ঘরের এক কোণে ব'সে তবকারি কুটছিল সুধা, বাবার কথা শুনে ভারি লজ্জা পেল! ছি-ছি, একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি অমন ক'রে কথা বলতে হয়।

ইন্দুভূষণ হেসে বলল, 'ও যদি ভাল রেজাল্ট করে, সেই তো আমার সবচেয়ে বড় বকশিস হরগোবিন্দবাবু।'

বাঁটি থেকে চোখ তুলে ইন্দুভূষণেব দিকে তাকাল সুধা। তার ঠোটে তখন একটু হাসি লেগে রয়েছে। সুধাব মনে হ'ল, এমন শান্ত সুন্দর হাসি সে জীবনে আব কারও মুখে দেখে নি। তা'ছাড়া পাণ্টা জবাবটাও ভারি চমৎকার লাগল। এমন কথা যে-কোন পেশাদার শিক্ষকই হয়তো বলেন, বলতেন। কিন্তু সুধার মনে হ'ল, এমন অন্তর দিয়ে কেউ বলতে পাবতেন না।

পরদিন থেকে রোজ সন্ধ্যায় ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে আসে। সুধা নিজের খাটের ওপর ফরসা চাদর পেতে শিক্ষক-ছাত্রের বসবার আসন করে দেয়। ইন্দুভূষণ হাবুলকে একমনে পড়াতে থাকে। ঘরে যেন আর দ্বিতীয় কেউ নেই। এতটা মনোযোগ সুধার কেন যেন ভাল লাগে না। ডালে সম্ভবা দিতে দিতে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'রান্নাব গন্ধে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

ইন্দুভূষণ হাবুলেব অঙ্কেব ভুল বাব করে দিয়ে সুধার দিকে তাকায়, 'আমাকে বলছেন?'

সুধা হেসে বলে, 'নয়তো কাকে? আপনি কি ভেবেছেন হাবুলের সঙ্গে এতক্ষণ ভদ্রতা করছিলাম?'

ইন্দুভূষণও না হেসে পারে না; বলে 'ও! ভদ্রতা! তা হলে তো ভদ্রতা করে আমাকেও জবাব দিতে হয়—না, না, মোটেই কষ্ট হচ্ছে না, ভারি চমৎকার লাগছে।'

সুধা হাসিমুখে বলে, 'আর যদি ভদ্রতা বাদ দিয়ে বলেন, তাহলে?'

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, 'তা হলেও আমার বক্তব্যটা বদলায় না। আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। রান্নার গন্ধ আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন। এমন জায়গায় বসে কেউ পড়াতে পারে?'

ইন্দুভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'না ঠাট্টা নয়। আপনাকে বাঁধতে দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন পড়াতুম না, পড়তুম। বাবা ছিলেন ওষুধের কান্‌ভাসার। বাইরে বাইরে ঘুরতেন। মার ওপর ছিল সব ভার। তিনি জোর করে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে বসাতেন। হলুদ-মাখা হাতে কালো প্লেটের ওপর অঙ্ক লিখে দিতেন। অনেক দিন পরে ঠিক সেই রান্নার ঝাঁক, রান্নার গন্ধ আজ পেলাম এখানে।'

শুনতে শুনতে সুধার গা কেন যেন সিরসির ক'রে ওঠে। আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করে,
'আপনার মা এখন কোথায় আছেন?'

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, 'আমার স্মৃতিতে।'

'আর বাবা?'

'বছর পাঁচেক হল তিনিও চলে গেছেন।'

সুধা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। কড়ার মধ্যে অনড় হয়ে থাকে খুস্তি। একটু বাদে ফেব
সে জিজ্ঞাসা করে, 'আর কে কে আছেন আপনার? ভাই বোন?'

ইন্দুভূষণ বলে, 'কেউ না।'

সুধা যেন আত্ননাদ ক'রে ওঠে, 'কেউ না! কেউ না-থাকলে মানুষ থাকে কি কবে?
আমারও মা নেই, কিন্তু বাবা আছেন, ভাই আছে। আর আপনাব সতিই কেউ নেই?'

ইন্দুভূষণ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সুধার সেই মমতাভরা করুণা-ভরা কালো বড়
বড় চোখ দুটির দিকে অবাক হয়ে একটুকাল তাকিয়ে থাকে। তারপর চোখ ফিবিয় নিয়ে
ছাত্রকে বলে, 'হাবুল, এবার রেকারিংয়ের অঙ্কটা কর তো।'

এমনি করে আন্তে আন্তে আলাপ জমে, আলাপ এগোয়।

একদিন সুধা বলে, 'আপনি তো রোজ শুধু রান্নার গন্ধ নিয়েই যান। আজ আপনাকে
খেয়ে যেতে হবে।'

ইন্দুভূষণ আপত্তি করে, 'না, না।' তারপর একটু হেসে বলে, 'স্বাণেই তো রোজ অর্ধভোজন
হয়ে যায়।'

সুধা বলে, 'কিন্তু দু-একদিন পূর্ণভোজনও হতে পারে। তাতে আপনাব জাত যাবে না।'

ইন্দুভূষণ বলে, 'আমাদের জাতের জন্যে তো ভয় নেই।'

সুধা বলে, 'আমাদের জাতের জন্যেই বুঝি ভয়! আপনি ভাববেন না, অত বাছবিচার
আমবা করি নে। তা হ'লে কি আব এ ভাবে থাকতে পারি?'

পড়ানো হয়ে গেলে ইন্দুভূষণকে খেতে বসতে হয়। আয়োজনে পরিবেশনে খুবই যত্ন
নেয় সুধা। দু-একটা নতুন তরকারি রাঁধে। যেন কোন উৎসবের দিন এসেছে। এ ধবনের
নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ মাসে দু-তিন দিন লেগেই থাকে।

একদিন হাফিসে বেরবার সময় হবগোবিন্দ ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কি রে
হাবুল, মাস্টারমশাই কেনন পড়াচ্ছে তোকে?'

হাবুল বললে, 'ভালই পড়াচ্ছেন বাবা।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'আচ্ছা, তুই আমার জন্যে একটা সিগারেট নিয়ে আয় তো।'

হাবুল বেঁবিয়ে গেলে মেয়েকে বললেন, 'সুধা, তোকে একটা কথা বলি।'

'বল।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'মাস্টার যাতে ফাঁকি না দেয়, যতক্ষণ থাকে যাতে মন দিয়ে পড়ায়
তুইই তা দেখাবি। কিন্তু তুই নিজে নিজেই নাকি তার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করিস?'

বাপের শাসনে সুধার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এ নালিশ
তোমাব কাছে কে করেছে বাবা? হাবুল?'

'হাবুল কেন করবে? সে করলে কোন দোষের হত না। কলতলার অন্য ছাড়াটেবা সব
আলোচনা করছিল, তাই কানে গেল।'

সুধা বললে, 'এর আগে অন্য কারও কথা তো তুমি কানে তুলতে না বাবা।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'এখনও তুলি নে। তবে জানিস তো, বাড়িটায় যত সব বাজে
লোকের আড্ডা। তা ছাড়া আমার ঘরে আর তো কোন মেয়েছেলে নেই। তাই আমাদের
একটু সাবধান হয়ে চলাই ভাল।'

'বেশ তুমি যদি বল, তাই চলব বাবা।'

‘হ্যাঁ, তাই চলিস্। আর অত খাওয়ানো-দাওয়ানোরই বা দরকার কি। কোন উপলক্ষ-টপলক্ষ হলে বললি, সে এক কথা’।

সুধা বলল, ‘বেশ।’

কলতলায়, বাথরুমে, বাড়ির আরো সব ভাড়াটের ঘরে ইন্দুভূষণের সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যে ফিসফিস গুজুগুজু শুরু হয়েছে, তা সুধারও কানে গেছে। তারই প্রায় সমবয়সী কোণের ঘরের রেণু সেদিন গায়ে পড়ে হেসে বলেছে, ‘কি ভাই, মাস্টারমশাই শুধু হাবুলকে পড়ান, না তোমাকেও পড়ান?’

সুধা গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছে, ‘আমাকেও পড়ান।’

দোতলার সরকারদের ছোট বউ সুলতা কাছেই ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, ‘ও মা, তাই বল। তা কোন ক্লাসের পড়া পড়ান তোমাকে— বি. এ ক্লাসের বুঝি?’ বলতে বলতে হেসে রেণুর গায়ে গাড়িয়ে পড়েছিল সুলতা।

সুধা কোন কথা না বলে জল নিয়ে ঘবে চ’লে এসেছে।

কিন্তু শুধু বউ-ঝিরাই নয়, এ বাড়ির পাঁচঘর ভাড়াটেব নানাবয়সী পুরুষরা পর্যন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সুধা যাদের কাকাবাবু আর মেসোমশাই বলে সেই খ্রীষ্ট কম্পাউণ্ডাব পঞ্চানন সরকার, পোস্ট-অফিসের কেবানী হীরালাল গাদুলি, রেল-অফিসের বীরেশ্বর মিত্র, সুধা যাদের নামের সঙ্গে দাদা যোগ করে ডাবে, সেই বাসু, রণজিৎ আর সুবেন সকলেরই কানে গেছে, চোখে পড়েছে বিষয়টা। তাদের ভাবভঙ্গি, হাসি আর তাকবার ধরন দেখলেই সুধা টের পায়, সকলেই যেন কিছু একটা মনে মনে আন্দাজ করেছে।

এতদিন হরগোবিন্দকে সবাই বলত দান্তিক, অমিশুক, অসামাজিক। সুধাকেও তাই বলত। বেশিবকম দোমাকী, অহংকারী। তারপর সকলেই তাদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকত। সুধা আজও সেই উদাসীনই রয়েছে, কিন্তু অন্য সবাই যেন আগের মত আব দূরে স’রে থাকতে পারছে না। বাবা আর ভাই ছাড়া তৃতীয় আর একটি পুরুষের সঙ্গে সুধার সামান্য আলাপ হয়েছে বলে এই গোটা বাড়িটা যেন তার ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে। শুধু যে তারাই সুধার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে তাই নয়, সুধাও তাদের সম্বন্ধে অচেতন থাকতে পারছে না। এ বাড়িতে যে এতগুলি লোক থাকে তা কি সুধাই এতদিন টের পেয়েছে! শুধু এ বাড়িটাই বা কেন, তাদের গলিব আরও দু-তিনখানা বাড়ির মেয়ে-পুরুষে পর্যন্ত জেনে ফেলেছে কথাটা। ইন্দু মাস্টার সম্বন্ধে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার ধরন দেখেই সুধা তা বুঝতে পেরেছে। যেন প্রাইভেট টিউটর আর কারও বাড়িতে আসে না, তার সঙ্গে বাড়ির আর কোন মেয়ে কি বউ কথা বলে না, যেন এ পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের এই সর্বপ্রথম আলাপ হয়েছে।

কিন্তু অন্য কারও বাঁকা কটাক্ষে, খোঁচা দেওয়া কথায় সুধার কিছু এসে যায় না। বাবা যে তাকে আরও একদিন সতর্ক করে দিলেন, তাতেই সুধাব মনে একটু লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, ‘সুধা, একটু সাবধান হয়ে চলিস্। তোর ঘরে তো মা নেই, আর কাজকর্ম ফেলে বেশিক্ষণ ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। তোর নিজেকেই বুঝে সমঝে চলতে হবে।’

সুধার ভারি দুঃখ হল, মনে মনে ঠিক করল ইন্দুভূষণের সঙ্গে সে আর কোন কথা বলবে না। চায়ের কাপটি পর্যন্ত হাবুলকে দিয়ে দেওয়াবে।

কিন্তু সঙ্কল্প রাখা গেল না। সুধা কথা না বললে কি হবে, আজ অন্যপক্ষ থেকে কথা শুরু হল। হাবুলকে এক পাসেজ ট্রান্সেশন করতে দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্দুভূষণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ‘আজ বড গম্ভীর হয়ে রয়েছেন যে? শরীর খারাপ করেছে নাকি?’

শেষের কথাটুকুতে ভারি মমতা প্রকাশ পেল ইন্দুভূষণের। সে নিজে থেকে সহজে আগে আলাপ করে না। আজ করল। এটাও ভারি নতুন লাগল সুধার, ভারি ভাল লাগল। বাড়িসুদ্ধ লোকের বিরূপতা ইন্দুভূষণের ওই এক ফোঁটা দরদে যেন সব ধুয়ে মুছে গেছে।

প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে সুধা বলে ফেললে, ‘মানুষের শবীরটাই বুঝি সব?’

সুধার অভিযোগের ভঙ্গিতে ইন্দুভূষণ মৃদু হাসল, “ও, আপনি বুঝি মন খাবাপ করার কথা বলছেন। সত্যি মন খারাপ হওয়াটা শরীর খারাপ হওয়ার চেয়ে ঢের কষ্টের।’

মন খারাপ হওয়ার কথা শুনেও এত ভাল লাগে!

সুধা হেসে বলল, ‘আপনি কি করে জানলেন? আপনারও মাঝে মাঝে মন খাবাপ হয় নাকি?’

‘হয় বৈকি।’

‘তখন কি করেন?’

‘চুপচাপ বসে থাকি, না হয় বই পড়ি। আচ্ছা, আপনি কি কেবলই রামাবান্না ঘবসংসার নিয়ে থাকেন, বইটাই পড়েন না?’

‘পড়ি বই কি, হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ি।’

ইন্দুভূষণ হাসল, ‘আপনি বুঝি প্রতিজ্ঞা করেছেন, হাতের কাছে যা পাবেন শুধু তাই পড়বেন?’

সুধা মুখ তুলে একবার তাকাল, তারপর চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, ‘কেউ যদি খুঁজে পেতে এনে দেয় তাও পড়তে পারি।’

ইন্দুভূষণ যেন শুধু এইটুকুর অপেক্ষায় ছিল। তারপর থেকে প্রায় রোজ সে বই আনতে লাগল। সব গল্প-উপন্যাস নয়। জীবন-চরিত, ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। কিন্তু সুধার গল্প-উপন্যাস ছাড়া আব কিছুতে মন ওঠে না।

আস্তে আস্তে সুধার কাছে আর এক জগতের দ্বার খুলে যেতে লাগল। সে জগৎ এই ভাড়াটে বাড়ির লোকজনের মত অনুদার নয়, প্রতিকূল নয়, সে জগৎ বড় মনোরম আর মধুর। এর আগে কে জানত পৃথিবীতে এত ভাল ভাল বই আছে। আর সে সব বইয়ের লেখকেরা সুধারই মনের কথা চুরি ক’রে নিয়ে লিখেছে। এর আগে কে জানত তাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট পুকুরটার ধারে যে দুটো নারকেলগাছ রয়েছে তাদের পাতাগুলি সবুজ, বোসেদের বাড়ির ছাদে সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকার টবগুলি এত সুন্দর। তারও ওপরে অগণিত তারাভরা আরও সুন্দর আকাশ কি চোখে পড়েছে এর আগে!

মাঝে মাঝে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে এই রাস্তায় ফুল ফিঁচি করতে আসে, তার নাম সুখন। ওর নামটি যে এত ভাল, এমন ধ্বনিময়, অর্থময়, কই, এর আগে তো সুধার খেয়াল হয় নি। তার কাছ থেকে প্রায়ই চার আনা ছ’ আনার ফুল কিনে নেয় সুধা। কোনদিন সাদা বেল কি রজনীগন্ধা। কোনদিন বা রক্তগোলাপ। কোনদিন সে ফুলে ফুলদানি সাজায়, কোনদিন নিজের খোঁপায় গোঁজে।

হরগোবিন্দের কিছুই চোখ এড়ায় না। মনে মনে ভাবেন, আজকালকার মেয়েগুলির লজ্জা-শরম বড় কম। একদিন স্পষ্ট করেই বললেন, ‘মিছিমিছি ফুলের পেছনে এত পয়সা নষ্ট করিস কেন সুধা?’

সুধা জবাব দেয়, ‘কই ফুল তো বেশি কিনি নে বাবা।’

হরগোবিন্দ ভিজে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে বলেন, ‘এতেও তোর বেশি কেনা হয় না। তুই কি বাগানসুদ্ধ কিনতে চাস? হ্যাঁ, আর এক কথা। গয়না যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল, ভন্ট থেকে সব নিয়ে আসি। ওসব ফুলের সাজ-টাজ ভাল না। ভদ্রলোকের মেয়েরা ও ভাবে সাজে না। ও সব করে—’, রূঢ় কথাটা পালটে নিয়ে হরগোবিন্দ বলেন, ‘ইয়েরা।’

সুধা হয় নিরুত্তর থাকে, না হয় অন্য কথা পড়ে। মনে মনে খুবই রাগ হয় তার। বাবা যেন আজকাল কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। সে খোঁপায় ফুলের মালা জড়াল কি না জড়াল তা

কেন বাবা দেখতে আসবেন। সংসারের কাজ-কর্ম কি সেবাযন্ত্রের যদি কোন ত্রুটি হয় তবেই তিনি রাগ করবেন। মেয়ের সাজসজ্জার দিকে কেন তাঁর চোখ পড়বে।

কিন্তু হরগোবিন্দ পছন্দ না করলে কি হয়, ইন্দুভূষণ যে খুল খুব ভালবাসে তা সুধার বুঝতে বাকি নেই। সে প্রশংসা-ভরা চোখে সুধার ফুলদানি'ব দিকে তাকায, ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য বোঝাতে বোঝাতে এক-একবার খোঁপাব গোলাপটির দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

সুধা সন্কার আগেই রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়ে টুল পেতে বোনা'ব কাজ নিয়ে বসে, না ইন্দুভূষণ'ব এনে-দেওয়া গল্পে'ব বই পড়তে থাকে।

হরগোবিন্দ এক-একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সুধাকে অমন ইন্দ্রাণীর মত বসে থাকতে দেখে গম্ভীর হয়ে যান। মেয়েকে কাজে'ব ফরমায়েস কবে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেন। তা'বপ'ব ইন্দুভূষণের দিকে চেয়ে বলেন, 'কি মাস্টার, পড়ানো-টড়ানো কেমন চলছে?'

ইন্দুভূষণ সংক্ষেপে বলে, 'ভাল।'

‘ঠ, কি রকম ভাল, ছেলের পবীক্ষার ফল দেখলেই তা টের পাব।’

ইন্দুভূষণ হেসে বলে, 'বেশ তো, দেখবেন।'

ও'ব এই নিশ্চিত হাসিতে ভিতবে ভিতবে হরগোবিন্দ কেমন যেন একটা অপমান বোধ করেন। মনে মনে ভাবেন, এত জো'ব ও কোথেকে পায়! ও কি বোঝে না হরগোবিন্দ সব টের পেয়েছেন। বা'মন হয়ে যদি চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্ধা হয়ে থাকে হরগোবিন্দ যে কোন মুহূর্তে সেই হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলতে পাবেন। মিটমিটে শযতান ছোক'বা। কি করে সুধার সঙ্গে কথা বলবে সেই ছিল খোঁজে। সুধা যখন হরগোবিন্দের সঙ্গে কথা বলে, ও কান খাড়া করে থাকে, সুধা যখন ওকে কিছু বলে, ও যেন হাতে স্বর্গ পায়।

যে কোন সময় হরগোবিন্দ ওকে আড়িয়ে দিতে পারেন, বলতে পাবেন, তো'মার পড়ানো ভাল হচ্ছে না মাস্টার, তো'মাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

বিশুদ্ধ এইটুকু অপমানে যেন বড় লঘু শাস্তি হয়ে যায়। হরগোবিন্দে'ব ইচ্ছা আ'বও কঠিন শাস্তি দেন ওকে। শূদ্র হয়ে বা'মুনের মেয়ের দিকে তাকাবার গুরু দণ্ড। না, কাজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে দেবেন না হরগোবিন্দ। কাজে বহাল রেখেই ওকে অপমান করবেন। ও'র চোখের সামনে সুধা'ব বিষে দিয়ে দেবেন। বিষের দিন নিমন্ত্রণ করে এনে চাক'বে'ব মত ফাই-ফরমায়েস খাটাবেন। সুধা শ্বে'ব বাড়ি চলে গেলে ও'র আ'বও পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে টিউটরের চাক'বরতে বহাল রাখবেন। তারপ'র ছোক'রা খালি ঘরে কি ভাবে হটফট কবে দেখবেন চেয়ে চেয়ে। ও'র আগে মশা মে'রে হাত নষ্ট করে লাভ নেই।

শত্রুনির্ঘাতনে'ব সহজ পথ হরগোবিন্দে'ব মনঃপূত নয়। অফিসে যা'বা তাঁ'ব বিবন্ধে ক্রিক করে এদেরও তিনি এমনি বৎ দিন ধ'বে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জন্ম করেন। এতে শত্রুকে শাস্তি দেওয়া'ব সুখানুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। যে লজেন্স চুষে খাওয়া'ব তনো, এ'রা তিনি চি'বিয়ে খেতে চান না। ব'বানগরে মুখ্যেদের সঙ্গে যে সম্বন্ধটা চলছিল তা তিনি পাকা করে ফেললেন। ছেলোট এ. জি. বেঙ্গলে চাক'বর কবে। নিজস্ব বাড়ি আছে শহ'বে। তার বা'বা মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেছেন। ছেলে নিজেও এসে দেখবে কি না জিজ্ঞাসা ক'বায় বলেছেন, 'ওস'ব বয়োভাপনা আমাদের ফার্মিলিতে নেই মশাই। ছেলে আগে দেখবে কি। দেখবে সেই শুভদৃষ্টির সময়।' সুধার ঠিকুজী নিয়ে মুখ্যজো মশাই কুলপু'বোহিত দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছেন একেবারে রাজঘোটক। এমনি মিল আ'ব কোন কনে'ব ঠিকুজীতে পান নি। সুধার মত এমন সুলক্ষণ আর কোন মেয়ের মধ্যে মেলে নি। ঠিকুজী আর মেয়ের মুখশ্রী দেখেই এগিয়েছেন মুখ্যজো মশাই। নইলে হরগোবিন্দে'র সামাজিক অবস্থা বিচার করলে এতদূ'ব অগ্রসর হওয়ার কারণ ছিল না।

রা'ত্রে খাওয়াদাওয়া সে'রে ঘরে'ব মোঝে'য় যখন বা'বা তাঁ'র হাবুলে'র জনো বিছানা পাতবার উদ্যোগ করছিল সুধা, হরগোবিন্দ তক্তপোশে পা'বুলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বললেন,

‘বরানগরের সম্বন্ধটাই ঠিক করলাম সুধা। বেশি বড়লোকের পেছনে ছুটোছুটি করে লাভ নেই। নিজের শক্তিসামর্থ্যে যা কুলোয় তাই করা ভাল। দেখে শুনে মনে হল ওরা আমাদের মতই গেরস্থ। ঠাকুর-দেবতা ধর্ম-কর্ম মানে। আমাদের সঙ্গে বেশ মিলবে। পাকা দেখার দিন ঠিক করার আগে তোর মাসীকে একবার খবর দিতে হবে। শত হলেও এসব কাজ মেয়েছেলে না হ’লে —’

হাবুলের জন্যে একটি আর হরগোবিন্দের জন্যে জোড়বালিশ পেতে দিয়ে সদা সাবান-কাচা পরিষ্কার ঢাকনি সেই বালিশের ওপর বিছিয়ে দিল সুধা। ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, ‘বসে বসে ঝিমুচ্ছিস কেন হাবুল, এবাব শুয়ে পড়।’

তারপর ফের বিজ্ঞানার চারদিকে চাদর ঝুঞ্জে দিতে লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, ‘আমাব কথাব ভাবাব দিচ্ছিস নে যে?’

সুধা বললে, ‘ভাবাব দেওয়ার আব কি আছে? ওসব বিয়ে-টিয়ের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই।’

‘গিয়ে কাজ নেই মানে? কেন, সম্বন্ধ কি তোব পছন্দ হচ্ছে না? ছেলেকটির ফোটো তো আমি তোকে দেখিয়েছি। বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। আমাব অফিসেব বন্ধুরাও এ সম্বন্ধেব বেশ তাবিস করল।’

সুধা বললে, ‘সে জন্যে নয় বাবা। আমি কোনদিন বিয়ে কবব না। আমি তোমাব কাছেই থাকব।’

হরগোবিন্দ সম্মুখে বললেন, ‘তাই কি হয় বে পাগলী! তুই চলে যাবি ভেবে আমাবও কি কষ্ট হয় না? খুবই হয়। কিন্তু হলে কি কবব! এই তো সংসারের নিয়ম। মেয়েকে পেরেব ঘরে পাঠাতেই হবে। সেই পরই তাব আপন। সেই ঘরে গিয়ে তুই যদি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে পাবিস সুধা, আমাব তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।’

সুধা বাবার মশাবি টাঙিয়ে দিতে দিতে বললে, ‘তুমি এবার শুতে যাও বাবা।’

হরগোবিন্দ বললেন, ‘যাচ্ছি বে যাচ্ছি। আমাব কথাব ভাবাব দে। তা হলে বরানগরের-’

সুধা বললে, ‘না বাবা। আমি ও-ধরনের স্থখশান্তি চাই নে।’

সিগারেটের টুকরোটো জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়াব জন্যে হরগোবিন্দ তক্তাপোশ ছেড়ে উঠে এসেছিলেন, সেই অবসরে আলো নিবিয়ে নিজের মশাবিটা ফেলে দিয়ে সুধা নিজেই শুয়ে পড়ল যেন সব আলোচনায এতই ছেদ পড়ে যাবে।

মেয়েব এই অভব্যতা দেখে মনে মনে ভাবি চটলেন হরগোবিন্দ। এত স্পর্ধা ওব হ’ল কোথেকে! অবশ্য বিয়ের নামে সুধা এব আগেও আপত্তি কবত। কিন্তু সে আপত্তির সুব ছিল অন্য ধরনের, এখনকার মত এমন একান্তই সম্ভাব তে তখন ছিল না সুধার! এমন উদ্ধত ভঙ্গিও তখন দেখা যায় নি।

হরগোবিন্দ ওতে গেলেন না। মেয়েব মশারির কাছে দাড়িয়ে গলা যথাসাধ্য নরম কবে বললেন, ‘তুই না চাইলেই তে আমি না চেয়ে পারি নে। বাপ হয়ে নিজের স্বার্থেব জন্যে ত্রোকে চিবকাল আঁহিবুড়া কবে রাখব, তোর জীবনটাকে নিম্মল ক’বে দেব—এ কথা যে আমি ভাবতেও পারি নে সুধা। তোর কিসে অন্ত তাই বল, বরানগরের ওই সম্বন্ধ যদি তোর পছন্দ না হয়, ভবানীপুরের সেই ওভারসীয়ার ছেলেকটাই তা হলে ফের খোঁজ করি।’

সুধা মশারির ভেতর থেকে বললে, ‘না বাবা, তোমার আর কোন খোঁজখবর করতে হবে না।’

হরগোবিন্দ ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন, ‘তার মানে? তুমি নিজেই বুঝি খোঁজ-খবর করে রেখেছ? ওগবতী মেয়ে কিনা! বেশ, কাকে পছন্দ করেছ তুমিই বল।’

সুধা চুপ ক’রে রইল।

হরগোবিন্দ বললেন, 'বলে ফেল। আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বলি, তার নাম-ধাম তো আমাকে জানাবি, না কি?'

সুধা বললে, 'তুমি শুয়ে পড় বাবা। চৈচামেচিতে হাবুলের ঘুম ভেঙে যাবে।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'ভাঙে ভাঙুক। আমি সব জানতে চাই। তুই সব আমাকে খুলে না বললে আমি কিছুতেই আজ ঘুমোতে পারব না।'

সুধা মৃদুস্বরে বললে, 'তোমার সে সব কথা জেনে দরকার নেই বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'জেনেও দরকার নেই। আমাকে না জানিয়ে শুনিষেই বুঝি তুই বিয়ে করবি?'

সুধা বললে, 'না বাবা, তা কোনদিনই করব না। আমি কোনদিনই জীবনে বিয়ে করব না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।'

হরগোবিন্দ চটে উঠে বললেন, 'বিয়ে করবি কেন, দিনরাত সেই মাস্টারের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করবি। নিন্দেয় পাড়া ভরে গেল। কাকে পছন্দ করেছিস তাই শুনি?'

সুধা তেমনি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে বলল, 'তোমার শুনে লাভ নেই বাবা। তাব সঙ্গে তুমি কোনদিন আমার বিয়ে দেবে না। আর তোমার অমতে আমিও তাকে বিয়ে করব না। যেমনি আছি তেমনিই থাকব।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন হরগোবিন্দ, বললেন, 'থাক না-থাক বুঝি তোমার ইচ্ছে? হাবামজাদী! ওই হতভাগা মাস্টার ছোকরাকে তুমি সব সমর্পণ কবে বসেছ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।'

সুধা শান্তভাবে বলল, 'বুঝতে তুমি অনেক আগেই পেবেছ বাবা। বাতদুপুরে আব চৈচামেচি করো না—বাড়িসুদ্ধ লোক সব শুনতে পাচ্ছে। তুমি যাও, শুয়ে ঘুমোও গিয়ে।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'হ্যাঁ, ঘুমোব। ঘুমোবাব তুমি কত ব্যবস্থা কবে বেখেছ!'

সুধা কোন কথা না বলে পাশ ফিৰল। যেন গভীর ঘুম পেয়েছে তাব।

হবগোবিন্দ ফিরে এসে নিজের বিছানায় ঢুকলেন। হাবুল ঘুমের যোবে পাশবালিশ ভেবে বাপকে জড়িয়ে ধবল। বছর চোদ্দ-পনের হ'ল বয়স। কিন্তু এই বয়সেও ওর মুখ থেকে লাল পড়ে। সেই লাল লাগল হবগোবিন্দের গায়ে। কিন্তু তাঁব মনে মোটেই বাৎসল্যবস উদ্ভিক্ত হ'ল না। ঘৃণা বিরক্তি আব বিদ্বেষে তিনি ঠেলে দুবে সরিয়ে দিলেন ছেলেকে। সব শত্রু, সব শত্রু। অল্পবয়সে সুধাও তো এমনি কবে তাঁকে জড়িয়ে ধবত। তাঁব বৃকের সঙ্গে মিশে না থাকলে, তাঁব বৃকের মধ্যে মুখ গুঁজে না থাকলে সুধাব ঘুম আসত না। সুধাব মা নির্মলা হাসত, কি পাজী আব হিংসুটে মেয়ে দেখেছ? হবগোবিন্দের সেই বৃকের সুধা আজ বিষ হয়ে গেছে।

একটা মশা কি করে যেন ঢুকেছে মশাবিৰ মধ্যে। ওগ ওগ কবে অনেকক্ষণ ধরে বিবস্ত্র কবছে কানেক কাছে। হবগোবিন্দ সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তারপৰ সেই অন্ধকারেই দু হাতের তালুতে প্রচণ্ড শব্দ ক'বে স্তব্ধ কবে দিলেন সেই ওগওগানি। মনে মনে হাসলেন হবগোবিন্দ। তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ।

ভোব-ভোব সময়ে ডেকে ডুললেন ছেলেকে, 'এই ওঠ ওঠ। কত আব ঘুমবি?'

হাবুল বললে, 'আর একটু পবে উঠব বাবা।'

'না, ওঠ। সকালে ওঠা ভাল।'

হাতমুখ ধোয়ার পর হাবুলকে বললেন, 'চল, বেড়িয়ে আসি। সকালের হাওয়া গায়ে লাগলে শরীর ভাল থাকে।'

পুকুর ছাড়িয়ে ছোট্ট মাঠ। সেই মাঠে নেমে হঠাৎ ছেলের হাতখানা নিজের মুঠিৰ মধ্যে তুলে নিলেন হরগোবিন্দ।

হাবুল ভয়ে আঁতকে উঠল, বলল, 'আমার কোন দোষ নেই, আমাকে মেরো না। আমি দিদিকে গোড়াতেই বারণ করেছিলাম।'

হরগোবিন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। পরনে হাফপ্যান্ট, ছিপছিপে রোগা চেহারা। গায়ের রঙ খুব ফবসা। মাথাব চুলগুলি কটা আব কৌকড়ানো। ছেলেটার চোখ দুটো ঠিক ওব মাঝ মত বড় বড় হয়েছে। কিন্তু এই মুহুর্তে স্নেহের পবিত্রতাই নির্মম কৌতুক আর কৌতুহল উদগ্ৰ হয়ে উঠল হরগোবিন্দের। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানি, তোর কোন দোষ নেই। তুই খুবই ভাল ছেলে। আমাকে সব খুলে বল। ভয় নেই, সুধা কিছু জানতে পারবে না।'

হাবুল তবু বলতে চায় না। কেবল আমতা আমতা করে। কিন্তু বানু উকিলের মত জেরা করে সব বেব ক'বে নিলেন হবগোবিন্দ। বই এনে দেওয়ার আর ফিবিয় দেওয়ার সময় কি করে টুকরো চিঠির আদান-প্রদান চলেছে দুইজনের মধ্যে, কবে সহপাঠিনী সখী সঙ্গ দেথা কবার নাম ক'রে দেশবন্ধু পার্কে সুধা সাক্ষাৎ করেছে ইন্দু মাস্টারের সঙ্গে। কবে একদিন ম্যাটিনি শোতে ওরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, হাবুলের যাওয়ার কথা ছিল সেই সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ ওরা তাকে আর এক বন্ধুর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় নতুন বাঘ দেখতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হাবুল কিছুই গোপন করল না, গোপন করতে পারল না।

ফেরবার সময় মোড়ের দোকান থেকে এক ঠোঙা কচুবি, জিলিপি আর হালুয়া কিনে নিলেন হরগোবিন্দ। এসব খাবারের ওপর হাবুলের দাক্ষণ লোভ। কিন্তু কোনদিন তিনি ছেলেমেয়েকে এগুলি খেতে দেন না। আজ দিলেন।

হাবুল কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলে, 'ওসব কেন নিচ্ছ বাবা?'

হবগোবিন্দ বললেন, 'খা একদিন। এসব তো তোরা ভালবাসিস।'

হাবুলের মনে হল মুখে ও-কথা বলছেন বটে বাবা, কিন্তু চোখ দুটো সদা-ধ'বে-অনা চিড়িয়াখানার সেই বাঘের মতই জ্বলজ্বল করছে। ভয়ে ভয়ে বাপের পিছনে পিছনে সে বাড়িতে ঢুকল। না জানি কি কাণ্ড ঘটে চা খাওয়ার সময়।

কিন্তু হরগোবিন্দ সুধাকে কিছু বললেন না। শুধু চা আব খাবার খেতে খেতে মেয়ের দিকে বার কয়েক চোখ তুলে তাকালেন। সেই চোখের দিকে চেয়ে সুধা একবার শুধু শিউবে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর ভয় পেল না। তাব দু চোখ থেকেও ঘৃণা আব বিদ্বেষ আগুনের হলকাব মত বাপের ওপর ঝবে পড়তে লাগল। বাপ আর মেয়ের মধ্যে যেন কোনদিন কোন মধুর সম্পর্ক ছিল না, স্নেহ আব শ্রদ্ধার স্বাদ যেন কেউ কোনদিন পায় নি। দুজনে যেন দুজনের শত্রু হয়েই জন্মেছে।

হবগোবিন্দ মুখে কিছুই বললেন না, মেয়ের কাছে কোন কৈফিয়ত চাইলেন না। অন্য দিনের মতই বাজার করলেন, ফিরে এসে দাড়ি কামালেন, নাওয়া-খাওয়া শেষ কবে অফিসেব জন্য তৈরি হলেন। সুধা অন্য দিনের মতই ঘবেব কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সারল, ঠাই ক'রে বাপ আব ভাইকে ভাত বেড়ে দিল। তবু হাবুলের মনে হতে লাগল আজকার দিনটা আলাদা। কেমন যেন থমথমে ভয়-ভয় ভাব তাকে সাবান্দিন আচ্ছন্ন করে রাখল। খেয়েদেয়ে স্কুলে যাওয়ার পরেও বাবার জ্বলন্ত চোখ আর দিদিব নিবন্ত মুখের কথা হাবুলের বাব বার মনে পড়তে লাগল।

হরগোবিন্দ বলে গিয়েছিলেন, অফিস থেকে তাঁর ফিরতে অনেক রাত হবে। কিন্তু দেখা গেল অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকাল সকাল, সম্ভ্যার বেশ একটু আগেই ফিরে এলেন তিনি। সুধা বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু কোন কৌতুহল প্রকাশ করল না, কি কোন কারণ জিজ্ঞাসা করল না, নিঃশব্দে চা করল, ঝাঁবারের প্লেট হরগোবিন্দের সামনে ধরে দিল, কিন্তু অন্য দিনের মত কোন কথা বলল না। হরগোবিন্দ ভেবেছিলেন মেয়ে ক্ষমা চাইবে, ভিত্তিহীন কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। মৌনতার মধ্যে সুধাব যে বেপরোয়া ভাব ফুটে বেরল তাতে ভিতরে

ভিতরে হরগোবিন্দ ছলতে লাগলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, হাবুল ফিরল না?' সুধা বললে, 'খেলতে গেছে, ফিরবে এখনি।'

খানিক বাদেই হাবুল ফিরে এল। বাবাকে দেখে চমকেও গেল একটু। কিন্তু হরগোবিন্দ সংক্ষেপে শাস্তভাবে বললেন, 'পড়তে বস।'

আব তার একটু পরেই এল ইন্দুভূষণ। হাতে এক ডজন রত্ননাগন্ধা। দিনকয়েক আগে সুধাব খালি ফুলদানি লক্ষ্য করে ইন্দুভূষণ বলেছিল, 'কি, ফুলের সখ মিটে গেল নাকি? মাংসকাল যে আর ফুল দেখি নে!'

সুধা জবাব দিয়েছিল, 'সখ মিটেবে কেন? কিন্তু কদিন ধরে সুখন এ পাড়ায় আসে না, ফুলও বাখতে পারি নে। বোধ হয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে ওর?' ইন্দুভূষণ হেসে বলেছিল, 'যদি আপত্তি না থাকে সুখনের অসুখ না সারা পর্যন্ত তাব কাড়টা আমিও নিতে পারি।'

সেই ফুল আভু নিয়ে এল ইন্দুভূষণ। কিন্তু ঘবেব ভিতরে হরগোবিন্দকে দেখে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তার আসাব সময় সাধারণও তিনি থাকেন না। প্রায়ই ইন্দুভূষণের বোবোবাব মুখে তিনি ঘরে ঢোকেন। তা ছাড়া সুধাব মুখ আভু বড়ই গম্ভীর, আব বিষম। কেউ কোন কথা বলছে না দেখে ইন্দুভূষণ বললে, 'হাবুল, ফুলগুলি তুলে রাখ।'

হরগোবিন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি রাখছি। বাঃ, চমৎকার মোটা-মোটা উঁটাগুলি তো! এ ফুল বোধ হয় ধারে কাছে পাওয়া যায় না, কি বলেন মাস্টারমশাই?' ইন্দুভূষণ নতিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না। কলেক্ট স্ট্রীট মার্কেট থেকে এনেছি।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'ভাবি চমৎকার ফুল।'

ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়তে ওক করল। আর সেই ফাঁকে হরগোবিন্দ উঠে একবার বাড়িব ভিতরে চলে গেলেন। অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন আলাপ করলেন।

ইন্দুভূষণ সুধার দিকে চেয়ে বলল, 'কি ব্যাপাব? আভু যে এমন—'

সুধা ভাইকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ঠোটে আঙুল ছোঁয়াল। তাব মানে আভু হাবুলও বে-দলী হয়েছে। আবও সাবধান আরও সতর্ক হবাব প্রয়োজন হয়েছে সুধা আব ইন্দুভূষণের।

খানিকক্ষণ বাদে হরগোবিন্দ ফিরে এসে নিজের জায়গায় তেমনি স্থির হয়ে বসলেন। ইন্দুভূষণ অন্য দিনের তুলনায় আভু কিছুক্ষণ বেশি সময় নিয়ে বেশি যত্ন করে পড়ল ছাত্রকে। তাবপর পবের দিনের জন্যে অঙ্ক আব ট্রান্সপেনের টাস্ক দিয়ে বিদায় নিয়ে বোবোতে হরগোবিন্দ এলেন পিছনে পিছনে, 'মাস্টার, চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। তোমাব সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

সুধা এতক্ষণ চুপ কবে ছিল। এবাব দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'ওঁকে যা বলবার আমার সামনে বল বাবা। ওঁকে তুমি কিছুতেই অপমান কবতে পারবে না।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'অপমান কবব কেন? শুধু দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা কবে নেব। কি মাস্টার, তোমার কি ভয় হচ্ছে?'

ইন্দুভূষণ একবার সুধাব দিকে তাকাল, তারপর হরগোবিন্দের দিকে চেয়ে বলল, 'না, ভয় কিসেব, চলুন।'

পুকুর ছাড়িয়ে সেই ছোট মাঠ। মাঠ পেরিয়ে নির্জন সরু অন্ধকার গলি। সেই গলির মুখে হরগোবিন্দ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন। তারপর ইন্দুভূষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'মাস্টার, তোমার পেশাটা কি সত্যি করে বল তো? ছেলে-পড়ানো না মেয়ে-বখানো?'

ভয়ে ইন্দুভূষণের বুক কাঁপছিল, কিন্তু মুখের বড়াই অত সহজে ছাড়ল না। 'আপনার ও-ধরনের কথার জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

'আচ্ছা, আমরা তোমাকে প্রস্তুত করে নিচ্ছি।' —বলে জনাকয়ক ছায়ামূর্তি মাঠের ভিতর থেকে এগিয়ে এল। এদের কাউকে কাউকে চিনতে পারল ইন্দুভূষণ। এবা সুধার সেই প্রতিবেশী দাদার দল। একই বাড়ির ভাড়াটে।

ইন্দুভূষণ ভয় পেয়ে বলল, 'কি মতলব আপনাদের? মারবেন নাকি?'
 একজন বলল, 'না না না, আমরা শুধু জবাবটুকু বের ক'রে নেব।'
 আর একজন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলল, 'টিউব টিপে শুধু পেস্টটুকু বের করে নেব দাদা।'
 হরগোবিন্দ তাদের সঙ্গে আসছিলেন। একজন বলল, 'মেসোমশাই, আপনাকে আর আসতে হবে না। আমরা আপনাকে ঠিক সময়ে খবর দিয়ে আসব।'

খবর পাওয়া গেল সপ্তাহ খানেক বাদে। হাসপাতালে জ্বরবিকারে মৃত্যু হয়েছে ইন্দুভূষণের।
 প্রথমে দিন কয়েক মেসেই পড়ে ছিল। আহত অবস্থায় কারা যেন মেসবাড়ির দবজায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তাকে। প্রথমে মেসের লোকেরা তেমন গ্রাহ্য করে নি। তারপরে অবস্থা খারাপ হওয়ায় কয়েকজনে তাকে হাসপাতালেব জেনারেল ওয়ার্ডে ভরতি ক'বে দিয়ে আসে।

সুধা সাত দিন ধরেই ছটফট করছিল। কিন্তু হরগোবিন্দ কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন দোরগোড়ায়। কেউ তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি। খবরটা সকলেই চাপতে চেষ্টা করেছিল। তবু চাপা রইল না। বাড়ির ছেলেদের ফিসফিসানির ভিতর দিয়ে সে খবর সুধাব কাছে ভেসে এল।

সুধা কাঁদল না, চোঁচানিচি করল না, শুধু দিন দুই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে বইল। শুকনো কালো একরাশ চুল পিঠের ওপরে ছড়ানো। তার ঝাঁকে সুন্দর তনুদেহ থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

হরগোবিন্দ পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'সুধা!'

সুধা কোন জবাব দিল না।

হরগোবিন্দ মেয়েব পিঠে আস্তে আস্তে হাতখানা রাখলেন। সুধা কোন সাড়া দিল না।

হরগোবিন্দ বললেন, 'সুধা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর, এতটা যে হবে আমি ভাবতেই পারি নি। আমবা ওকে শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম, সরিয়ে দিতে চাইনি।'

সুধা কোন মন্তব্য কবল না।

তৃতীয় দিনে সুধা ফের উঠে দাঁড়াল। আবার সংসারের কাজে হাত দিল, ভাইয়ের স্কুল আর বাপের অফিসের রান্না রাখতে বসল। ওপর থেকে সবই ঠিক আগের মতই চলতে লাগল, কিন্তু ভিতর থেকে কোন কিছুই আব আগের মত বইল না। একটি মেয়ে বাঁধে বাঁধে, ঘর গুছায়, বিছানা পাতে —সবই কবে। হরগোবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ যেন তাঁর চির-আদরের সুধা নয়, তারই একখানা অবিবর্তিত পাথরের প্রতিমূর্তি। সেই মূর্তিব চোখ আছে, তাতে পলক নেই, সে মূর্তিব অপকণ দৃষ্টি সুন্দর বক্তব্য ঠোট আছে, কিন্তু তাতে স্নেহ-মমতা-প্রীতি-শ্রদ্ধার চিহ্নমাত্র নেই।

এই পাথর আব বরফের দেশে হাবুল বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তাব যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া সারাটা দিন বাইরে বাইরে থাকে। কিন্তু হরগোবিন্দকে তাব চেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হয়। মেয়েব ভাবভঙ্গি দেখে এখনও তাঁব গায়ে জ্বালা ধরে, মনে রাগ হয়; কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে কোথায় যেন বাধে। আস্তে আস্তে সব দাহ প্রদাহ, সব উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এক সীমাহীন শীতল সমুদ্রের মধ্যে তাঁবা দুজনে যেন জনপ্রাণীহীন তৃণশস্যহীন দুই দ্বীপ। শুধু দূর থেকে একজনকে আব একজনেব চোখে পড়ে। পারাপার হবার মত মাঝখানে কোন সেতু নেই, খোয়া নেই।

একদিন হরগোবিন্দের চোখে পড়ল, সুধা বেশভূষা সব ছেড়ে দিয়েছে। কালোপেড়ে শাড়ি পরে। হাতে দুর্গাছি চুড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন গয়না নেই। সোনার গয়নাও নয়, ফুলের গয়নাও নয়। আর একদিন খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন, সুধা শুধু ডাল-তরকারি দিয়ে খেয়ে উঠছে। মাছ-মাংস ছুঁয়েও দেখছে না। সব বাপ আর ভাইকে দিয়ে দিচ্ছে।

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'মাছ খেলি নে কেন সুধা?'

সুধা বললে, 'খেতে ইচ্ছে করে না।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'কিন্তু কেন ইচ্ছে করে না শুনি? তুই কি বিধবা? তোদের কি বিয়ে হয়েছিল?'

সুধা বলল, 'মদ্রপড়া বিয়েটাই কি সব?'

হরগোবিন্দ বললেন, 'ছি ছি ছি। বাপের সামনে এ কথা বলতে তোর লজ্জা হল না?'

সুধা নির্বিকারভাবে বলল, 'তুমি গুনতে চাইলে, তাই বললাম। জিজ্ঞেস করতে তোমারও তো লজ্জা হয় নি বাবা।'

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোর সব কথা মিথ্যে সুধা। কেবল জেদ করে এসব কথা বলছিস। এমনি ক'রে আমার ওপর শোধ নিতে চাচ্ছিস। কিন্তু তুই আমাকে দিনবাত পুড়িয়ে মারছিস কেন? তোর যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, তুই এব চেয়ে থানা-পুলিশ কব, আইন-আদালত কর, সে অনেক ভাল।'

একটু যেন হাসি ফুটল সুধার মুখে। সুধা বলল, 'সে সব যারা কবতে পারত তেমন আত্মীয়স্বজন তাঁর কেউ নেই। থাকব মধ্যে আছি আমি। কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে! তুমি খুন করে এ'লে তোমার সেই হাত আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেব। সে হাতে শিকল পাবাব কেন? আমি যে তোমার মেয়ে।'

হরগোবিন্দ আত্ননাদ করে উঠলেন, 'তুই আমার কেউ নস্, কেউ নস্। তুই আমার শত্রু, চিরহুম্মেব শত্রু।'

কিছুদিন চুপচাপ থাকবার পর হরগোবিন্দই ফের এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেন, মৃত সম্পর্কে আবার যেন উজ্জীবিত করে তুলতে চান। নিভের থেকেই কথা আরম্ভ করেন হরগোবিন্দ। বাত্রে গুয়ে গুয়ে আগেব মতই পুরনো দিনেব কথা তোলেন। সুধার মাযের গল্প, মামাবাড়িৰ গল্প। কিন্তু বাপেব স্মৃতিকথায় সুধার আর কোন আগ্রহ নেই। হরগোবিন্দ কথা বলে যান। তন্ত্ৰপোশ থেকে সুধার কোন সাদা মেলে না।

হরগোবিন্দ বলেন, 'ও সুধা, ঘুমোলি নাকি?'

সুধা অতি সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'হুঁ'।

মাছধরার গল্প, নৌকাডুবিব গল্প, বিদেশ বিভূইয়ের নানা রকম দুঃসাহসিক বোমাপ্রকর কাহিনী গুর কবেন হরগোবিন্দ। যে সব কাহিনী সুধা উৎকর্ণ হয়ে রক্তশ্রাসে গুনত, আজ তার সে সব গল্পে তার কৌতূহল নেই। গাসির গল্পে সুধা আব হাসে না, ভূতের গল্পে ভয় পায় না, ঘব সংসারেব ভালোচনায় কোন উৎসাহ আগ্রহ প্রকাশ কবে না। কিছুতেই সেই আগেব মত আলাপ জমাতে পাবেন না হরগোবিন্দ।

সোদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিবে এলেন তিনি। তিনখানা সিনেমাৰ টিকিট একেবারে কিনে নিয়ে এসেছেন।

হরগোবিন্দ বললেন, 'চল যাই সুধা, কতদিন ছবি দেখি নে। মধুমালতীৰ মত এমন চমৎকার বই শিগাগির আর আসে নি। কথায় কথায় গান। তুই গো গান ভালবাসিস্।'

ছেলেকে ইশারা করেন হরগোবিন্দ। হাবুন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'চল না দিদি।'

সুধা জবাব দেয়, 'আমাকে বিবদ্ধ কবিস নে হাবুল। তোদের ইচ্ছে হয় তোরা যা।'

অনুবোধ উপবোধ ছেড়ে হরগোবিন্দ ফেব রাগারাগি শুরু করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত টিকিট তিনখানা টুকরো টুকরো কবে ছিড়ে ফেলেন তিনি।

যাদুঘর, চিড়িয়াখান, লেক কি গঙ্গাব ধারে বেড়াতে যাওয়ার পস্তাবেও আর কান দেয় না সুধা। বলে, 'তোমবা যাও।'

আর একদিন ভরি তিনেক ওজনের একগাছি হার নিয়ে এলেন হরগোবিন্দ। ধানের ছড়ার ডিজাইন। নতুন উঠেছে। বললেন, 'পরে দেখ্ সুধা, তোকে ভাবি চমৎকার মানাবে।'

সুধা বাপের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেন মিছিমিছি টাকাগুলি নষ্ট করলে বাবা! আমি তো ওসব ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছি।' দাঁত কিড়মিড় করতে থাকেন হরগোবিন্দ। কিন্তু কোন ফল হয় না। বাপের স্নেহের যেমন প্রত্যাশা করে না সুধা তেমনি শাসনকেও ভয় করে না আর। নিষ্ফল আক্রোশে হরগোবিন্দ মাঝে মাঝে আঙনের মত জ্বলে ওঠেন, আবার গভীর নৈবাস্যে ববফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যান।

একদিন বউবাজার থেকে সুধার মাসী কমলা এল খোঁজ নিতে। সুধাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সাধাসাধি করল। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কমলা হরগোবিন্দকে তিবস্কাব কবে বলল, 'জামাইবাবু, আপনিই বা কি ধারাব মানুষ। এমন হাত-পা কোলে করে বসে আছেন কেন? জোব করে বিয়ে দিন মেয়েটাব। যেমন ক'বে হোক, যার সঙ্গে হোক, বিয়ে দিন।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'সেই বরানগরের মুখুয়োবা তো পিচ্চিয়ে গেল।'

কমলা বলল, 'যাবে না? ভাংচি দেওয়ার লোকের অভাব আছে এখানে? ভাল চান তো এই বাড়ি ছাড়ুন, পাড়া ছাড়ুন। কলকাতা শহরে কি আর ভাবগা নেই?'

কমলা শুধু রূপবতীই নয়, বুদ্ধিমতীও। ভেবেচিন্তে তাব পবানর্শ নেওয়াই ঠিক কবলেন হরগোবিন্দ। উত্তর ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণে। কালীঘাটের সদানন্দ রোডে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে ফ্রাটি ভাড়া করলেন। দুখানা শোবার ঘর। বাগ্নাঘর, বাথরুম সব আলাদা। মেয়ে জামাই এসে মাঝে মাঝে যদি বাস করে, কোন অসুবিধে হবে না।

বাড়ি বদলানোর ব্যাপারে সুধা কোন আপত্তি করল না, কিন্তু বিয়েব কথায ফেব বেকো বসল।

সুধা বলল, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার, সরিয়ে দিতে পার, কিন্তু জোব করে বিয়ে তুমি আমার কিছুতেই দিতে পারবে না। তা হলে চবম কেনেঙ্কারি হবে।'

মেয়ের মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন হরগোবিন্দ। 'ওকে বিশ্বাস নেই, ও এখন সব করতে পারে।'

আবার কিছুদিন চূপ করে বইলেন হরগোবিন্দ। চূপ করে বইল সুধা। দুজনের মাঝখানে শব্দহীন দুঃসহ শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।

সুধাকে এখন আর বাপ-ভাইয়েব সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয় না। সে আলাদা ঘর পেয়েছে। মাঝে মাঝে ভানানা দিয়ে মেয়ের সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। দেখবার মত কিছু নেই। দামী কোন আসবাবপত্র সে ঘরে বাথতে দেয় নি সুধা। এমন কি, একখানা তন্তুপোশ পর্যন্ত না। ঘরের এক কোণে দেওয়ালের ধারে বিছানা ওটানো। ডান দিকে ছোট একটি বইয়েব শেল্ফ। বইগুলি না খুলেও হরগোবিন্দ বুঝতে পারেন এগুলি তার দেওয়া, যে শত্রু ম'বেও মরে নি। তাকের ওপরে একটি শূন্য ফুলদানি। সেদিন ফিবে এসে হরগোবিন্দ রক্তনীগন্ধাগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর ফুলদানিতে আর কোন ফুল রাখে নি সুধা।

আবার একদিন মেয়েকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন হরগোবিন্দ, বললেন 'সুধা, আমি তোব বাপ।'

সুধা বলল, 'কি বলছ বল।'

হরগোবিন্দ খানিকক্ষণ চূপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমাকে কি তুই ক্ষমা করতে পারিস নে?'

সুধা মুখ নীচু করে বলল, 'ওসব কথা থাক বাবা।'

এর পর হরগোবিন্দ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

আবও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে সুধা এক সময় উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

ছোট টেবিলটিতে বসে হাবুল নিজের মনে পড়ছিল। আজকাল ও একা-একাই পড়ে। নিজের মনেই থাকে। বাড়ির এই নিঃসঙ্গ একক জীবনে হাবুলও এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাবা আব দিদিব মাঝখানে সে আব যোজক নয়, সেও যেন স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি দ্বীপ।

ছেলের দিকে হরগোবিন্দ অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে বইলেন। আবও লম্বা হয়েচে। কিন্তু রোগাটে ভাবটি যায় নি। দেখলে কেন্ন যেন মায়া হয়। হবগোবিন্দ বললেন, 'হাবুল, শোন।'

হাবুল বলল, 'কি বাবা?' হবগোবিন্দ বললেন 'আয়, আমাব কাছে আয়।'

হাবুল বিস্মিত হয়ে উঠে এল। বাবা অনেক দিন হল এমন কবে ডাকেন না। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। হবগোবিন্দ হঠাৎ তক্তপোশ ছেড়ে উঠে এসে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, 'হাবুল, আমাব হাবুল—'

হাবুল কিছুক্ষণ আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাবপর অতিকষ্টে দম ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড লাগছে। ব্যথা পাচ্ছি।'

হবগোবিন্দ যেন চমকে উঠলেন, ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুইও ব্যথা পাচ্ছিস? আচ্ছা যা।'

হাবুল ফেব গিয়ে পড়তে বসল। হবগোবিন্দ পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু জানালাটা আব খুললেন না। খুললেই সুধাকে দেখা যাবে। দেয়ালের কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উৎকর্ষ হয়ে যেন কিছু একটা শুনতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না। শুধু নিজের দীর্ঘশ্বাসেব শব্দই কানে ভেসে এল।

পবদিন সকাল সকাল অফিসে বেকলেন হবগোবিন্দ। একই টেবিলে বসে কাজ করবেন সুবেন সমাদ্দাব। হরগোবিন্দেব সহকর্মী সমবয়সী, খুব সামাজিক আব সদালাপী মানুষ। চাবদিক্বেব খোঁজখবব রাখেন। সাধ্যমত উপকাব করবেন সহকর্মীদেব। অবিবাহিত ছেলেব জন্যে মেয়ে খুঁজে দেন, মেয়েব জন্যে ছেলে। মনিবদেব জন্যে ঝি আব ঠাকুব-চাকবেব খোঁজ আনেন, কর্মপ্রার্থী বেযারাদেব মনিব জুটিয়ে দেন। এতদিন তাঁব কাছে মুখ খোলেন নি হবগোবিন্দ, আজ মন খুললেন।

ফাইল-পত্র ভাগ ক'রে নিতে নিতে বললেন, 'ভাই সুরেন, আমার একটা কাজ ক'রে দেবে?'

সুবেনবাবু বললেন, 'কি কাজ?'

'একটি ছেলে দেখে দেবে আমাকে?'

'কি রকম ছেলে?'

'বামুনেব ছেলে হলেই ভাল হয়। অন্য জাত হ'লেও—'

'অন্য জাত হবে কেন? তুমি বামুন, তোমাকে বামুনের ছেলেই দেব। বামুনের অভাব আছে নাকি? তারপব?'

'ছেলেটি এম. এ পাস হলেই ভাল হয়, বি. এ. পাস হলেও ক্ষতি নেই।'

সুরেনবাবু বললেন, 'কেন, এম. এ পাস ছেলের অভাব আছে নাকি? তারপব?'

হবগোবিন্দ বললেন, 'কাজ-কর্ম যা করে করুক। খেয়ে দেয়ে থাকতে পাবলেই হল।'

সুরেনবাবু হেসে বললেন, 'বিলক্ষণ! তাবপর? কার জন্যে হে? নিজের মেয়েব জন্যে নাকি? আরে ভাই, খুলেই বল না জামাই চাই একটি। আছে আমার হাতে। জামাই কবতে চাও তো বল।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'না ভাই, জামাই নয়, জামাই নয়।'

সুরেনবাবু বললেন, 'তবে?'

হরগোবিন্দ বন্ধুব চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'একজন প্রাইভেট টিউটর — জেলের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটর।'

আলোক অঘোষা

শওকত ওসমান

চোখের উপর একটু আলতো হাত বুলাতে পারলেও যেন এখন কিছুটা যন্ত্রণাব উপশম হতো।

অসহ্য অস্থিরতা ভেতরে ভেতরে এত ঘুরপাক রত যে, সালামং আলি ঠিক হৃদিস কবতে পারছিল না। এই মুহূর্তে যথা-প্রতিবেদ তার জনো কী আছে। হঠাৎ-ই মনে পড়ল অমন করম্পর্শের কথা, যদিও সচেতন ভাবে কিছু নয়।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে হাত তুলতে গিয়ে সালামং নিদাকণ ভাবে অনুভব করলে, তাব যো নেই।

হাতকড়ার শাসন ধমকে সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

কিন্তু সালামং সহজে পেছপা হয় না। মাথা নিয়ে গেল সে নিজের হাতের চেটোব মধ্যে। সেখানে দুই ফেটি-বাঁধা চোখ ঘবতে লাগল।

হঠাৎ তাব এমন নতমুখ পাঞ্জাবী প্রহরীর চোখ এড়ায় নি। সে ব্যাপাবটা দেখেই চূপ করে যেতে পাবত। কিন্তু তা দুবের কথা, বরং উশ্টো গালাগাল ছুঁড়লে, “এই শালা, বাঙালীকা বাচ্চা।”

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সালামং আলি। কিন্তু কান তো খোলা। তাব বুঝতে দেরী হয় না, শাস্ত্রর চোখ তার দিকে ঠিকই আছে। কিন্তু মাথা খসে পড়ছে, যে-মাথা কবতালুর মধ্যে বন্দী, তবু কিছু সোয়াস্তি পাচ্ছিল।

সালামং আলি তখন হঠাৎ পবিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে, তার চোখ এমনি ফেটি-বাঁধা।

পৃথিবী কেমন দেখতে? নিজেকে সে জিজ্ঞেস কবে বসে। তাবপব ভবাব নিজেই দিতে এগোয়। বহু অতীত তখন হুড়াহুড়ি ধাক্কা দিতে থাকে তার মনের ভাসমান সমতলে জায়গাব জনো। এই গুঁতোওতি অনেকক্ষণ চলে।

ওদিকে চোখের যন্ত্রণাও চেপে বসছে। তবু হাতড়ে-ফেবা দৃষ্টি ফেটিব মধ্যেই ছবি আঁকতে থাকে। অজস্র বৃদ্ধব, অজস্র বঙেব শ্রোত কেবল অক্ষিপটেব ভেতর দিয়ে হুহু ঢুকে যাচ্ছে, গন্তব্যহীন যাত্রায়।

কিন্তু সে তো এক ঠিকানায় এসে পৌঁছেছে।

কোন জায়গায় তাকে মিলিটারিরা এখন আস্তানা দিয়েছে? তাব একটা হৃদিস কবা যেত। তবু কিছু শাস্তি। ঢাকা শহবে তাব জন্ম সেই একাল সনে। কুড়ি বছরে এই ছোট শহব জরীপে কিছু বাদ নেই তাব। একটা জায়গাব নাম পেলে সে যেন সব যন্ত্রণা ভুলে যেত। শাস্ত্রিগব, মালিবাগ, শাখাবিপিটি, ইসলামপুব, বমনাব কোন এলাকা? এ জায়গা ধানমণ্ডিব নষ্টাবাদ অভিজাত-পল্লীর কাছাকাছি কোথাও হোতে পাবে না। বন্দীশিবিব আব কোণাও নিশ্চয়। শহবেব মাঝখানে এত লোক ধবে বাখবে, অন্যান্য মানুষকে ভয় দেখাতে, এমনও হোতে পাবে। কিন্তু হাতড়ে কিছু হেঁটে যেতে পাবলে সে বুঝতে পাবত, তার আস্তানাব হৃদিস কী? মেঝে পাকা। আর কিছু বোঝাব উপায় নেই। কাবণ, ঠায় বসে অথবা দাঁড়িয়ে থাকা। কড়া হুকুম। এদিক

ওদিক করলে সাইকেলের চেন-পেটা কববে। দু'বার শান্তির রোলার তার দেহের উপর দিয়ে ঘষড়ে ঘষড়ে কিছু কাপড়, কিছু রক্ত, কিছু ছাল নিয়ে গেছে।

আর তাগদ বেশী নেই।

আটচল্লিশ ঘণ্টা একটা দানা পড়ে নি পেটে। তার জন্যে কোন আফশোস নেই। একবার দেখতে পেত সে পৃথিবী কেমন, তা হোলেই ক্ষুধাপিপাসা সব মিটে যেত।

বাইবের জগৎ শব্দ দিয়ে চেনা যায়। এখানে শব্দ বড় সীমাবদ্ধ। জীপের যাতায়াত, স্টার্ট-ধনি আব ভারী বুটের আওয়াজ, কালেভদ্রে কথাবার্তা। এখানে যা মনুষ্যকণ্ঠ উচ্চারিত হয়, তা শুধু হুকুম। আর কিছু না।

নিকটে আশেপাশে লোক থাকলে, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা না হোক নিঃশ্বাসের বাতাস অন্তত কিছু জানান দিয়ে যেত। 'সেদিক' পর্যন্ত শূন্য। শাস্ত্রীব সঙ্গে একটা যোগাযোগ হোতে পারত আহারের ব্যবস্থা থাকলে, তাও নেই।

অবিশী ক্ষুধা যা প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সালামং আলি একবার অনুভব করেছিল। তারপর তাব দেহ-যন্ত্রের আর কোন চাহিদা নেই। কেবল চোখ বেয়াড়া জিন্দী ছেলের মত বায়না নিয়ে মেতে আছে : আলো, এতটুকু আলো দাও। অতি ঝাপসা। হিম-প্রভৃষের কুয়াশা-লেপা ক্ষীণতম আলো যা চোখ তেড়ে ধবতে হয়, এমন আলো।

এই প্রার্থনার জবাবে কিন্তু অন্ধকার কেবল ধেয়ে আসে, ঘনীভূত হয়—শেষে পুরু কালো পর্দাব মত সামনে ঝুলে থাকে, আর নড়ে না। এমন ঘনত্বের ধাক্কা সালামং আলি মূর্ছা যেতে যেতে আবার সামলে নিত। অত সহজে নয়। একদিকেব ঘাড় কাং করে কিছু বিশ্রাম। তার পবে আবার অন্য ঘাড়ে আশ্রয়।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টাব হেবফের।

তাব জীবনে এখন শুধু বর্তমান আছে। মনে হয়, অতীত মুছে গেছে। অতীতের তাই ধর্ম। কিন্তু তাব মবা দেহ, বকলফুলের মত শুকিয়ে গেলেও সহজে সৌবভ হারায় না। বর্তমানে অতীত আব পূর্বব কলেববে নেই। স্মৃতি যখন কসায়ের চাপট এবং যাব উপর আঘাত হানে কুঁচি কুঁচি কবে ছাড়ে আস্ত হাড়, তখন চোখ বুঁজে, নিঃশ্বাস বন্ধ কবে রেহাই পেতে চাইলেও অসুবিধার মাত্রা শুধু বাড়ে। তাব চেয়ে খামখা চীংকাব দাও না কেন ? ডুকবে কান্না বা গোঙানি যন্ত্রণা লাঘব করে এই ক্ষেত্রে। কিন্তু কান্না পুবষ মানুষের অলঙ্কাব নয়। সালামং আলি তাই সাইকেলেব চেন-পেটা হওয়ার সময় নিঃশব্দে কাংবেছে। পেশী, মুখেব বা যন্ত্রণাসিত অন্য অঙ্গব, সঙ্কুচিত করেছে বার বাব, কিন্তু শব্দব ভুবনে ধবা দেয নি।

এখন সঙ্গীরা অনুপস্থিত, কিন্তু ধরা পড়ার সময় তাব কাছে ছিল। তিন চাব জন। এমনি পথে তাদের সঙ্গে আলাপ। আব বিপদ তো পথেই তাদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। সবাই একে একে সবে গেছে। তা আব চোখে দেখা হয় নি, কারণ ফেটি বাঁধা। অনুভব কবতে হয়েছে সালামংকে। অপবাধ এখানে সাধারণ সংজ্ঞায় চালু নয়—মার খেয়েছিল। বেদম মার। তখন গোঙাতে শুব কবেছিল। বিদূপ করে উঠেছিল পাঞ্জাবী-গ্রহরী 'এই শালা বাঙালী কা বাচ্চা আওবং কা তবেই বোতা হায . না-মরদ, বুজদীল (ভীক) ..।' সেই জন্যে সালামং চূপ করে আছে ? না। সে জানে, শত্রু যেখানে জন্তুব অধম, সেখানে মানুষের মত ব্যবহার অনুচিত, অসঙ্গত। জন্তুকে পিটে শায়েস্তা কবতে হয়। আর অন্য কোন বাস্তব সেখানে বন্ধ, তার তো সে যো নেই। তাব হাত বাঁধা। কাছাকাছি গ্রহরী আসে না। এলে একটা লাথি অন্তত দিত। তারপর যা হয় হোক। একবার সালামং আলিব মনে হয়েছিল, খুব কাছে পাঞ্জাবী নেকড়েটা, তাব কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু কিছু তো দেখতে পাচ্ছে না সে। লাথি যদি ফস্কে যায়, খামখা হেনস্থা ডেকে এনে লাভ কি? সেই জন্যেই তো আলোর জন্যে যত প্রার্থনা। একটু আলো, চোখ ঈষৎ ফেটিমুণ্ড হোক, সে তো ধৃতবাস্তব নয়। আলিনগ্নবে

মধ্যে শত অসুবের শক্তি জমাট। সালামং আলি তবু ভেবেছিল, একবার জাপটে ধবব, তাবপর কয়েকটা ঘুষি। হাত ঠুটো, তা হিসেবের মধ্যে ধবে নি। নিছক প্রতিশোধপবায়ণতা মগজ ঘুলিয়ে দেয়।

চোখেব কোটরেব পেশীগুলো তড়পে উঠল, প্রথমে ধিকিধিকি, তাবপর হঠাৎ দ্রুত কম্পন শুরু হয় চাবিদিকে। কন্ধকাটা ভূত প্রেত ঢের বেশী সুখী। সালামং আলিব মনে কথাটা খেলে গেল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। তাকে কিছু ভাবতে হয় নি।

এখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সে খুলি চুবমাব করে ফেলতে পারত।

কিন্তু কোথায দেওয়াল? প্রাচীরেব এত ভয় মানুবেব, যদিও আততায়ীব আশঙ্কায় সে নিজের চারদিকে অমন কঠিন বেষ্টিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। আভব ধাঁধা অস্তিত্বেব। যা বিষ, তাই আবাব বিষ-হর। মাত্রা, সময়, স্থান, পবিববেশেব নকশা অনুযায়ী মূল্য বিচাবেব সব হেরফের হয়ে যায়।

আশেপাশে কোন দেওয়াল আছে কী? শাস্ত্রীকে ভিজ্জেস কবা যায়। কিন্তু প্রপ্নেব কোন বালাই ছিল না। পিপাসায় একসময় ছাতি ফাটাব উপক্রম, তবু পানি চায় নি সে প্রহবীর কাছ থেকে। গ্রামে এক খাল পার হওয়াব সময়ে সে শ্রোতে মুখ ডুবিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। সেই একবার মাত্র পিপাসাব মোকাবিলায জয়ী। এখনও জয়ী। কাবণ আব পানির দরকাব হয় নি।

ক্ষুধাব মত পিপাসাও নেই। সব কামনা এখন আলোব জন্যে।

পৃথিবীকে দেখতে চাই একবার। কাবণ, জন্মভূমি বাংলাদেশকে শেষবার না দেখলে মৃত্যু অর্থহীন থেকে যাবে। তাই ত আলোকপ্রার্থী আমি। হে পৃষণ, তোমাব সপ্ত অশ্ববাহিত রথের ঘর্ষব আর আমি গুনতে পাই না কেন?

সালামং আলি আবৃত্তির আকারে উচ্চাবণ করতে গেলে, গ্রীবায খস্খস্, যেহেতু নীবস, খুক খুক কাশি এসে যায় সহসা। কিন্তু প্রাণেব প্রতিধ্বনি-মুখে কে হাত চাপা দিতে পারে? আলো, আলো নয়। তবঙ্গের সঙ্গী। একে অপবেব বিকল্প না হলেও, আলো ছাড়া আব কোন ঢেউ দেখা অসম্ভব। তাই ত এত প্রার্থনা, হে জবাকুসুমসঙ্কশ মহাদুতি, একবার স্পর্শ দিয়ে যাও। ভক্তের নিবেদন শোনো।

মুখের পেশী বিকৃত হতে লাগল সালামং আলিব। এইবার মাথা বুঝি খসে মাটিতে পডবে। হ্যাণ্ডকাফেব উপব সে কপাল রেখে স্থিব দাঁড়িয়ে বইল। একবার ঠেস দেওয়াব ইচ্ছায় সে একটু হেলেছে কি, তখনই সোজা হয়ে পডল আবাব। এখানে দেওয়াল নেই, থাম নেই, হয়ত গরাদ নেই, যাব উপর হাত বেখে মাথা রেখে কয়েদীবা চিবদিন সব অভিলাষ পবিপূর্ণ ভাবমূর্তি রূপে বেখে গেছে পৃথিবীব সব দেশে।

সালামং আলির ঝঁশ আবাব সহজ ভাবে ফিবে আসে।

এই এক বিচিত্র শত্রু। নিপীড়নের ফন্দি ফিকির নয়, তাব বর্বরতম পস্থা পর্যন্ত আবিস্কাব কবেছে। শরীরের সহন-ক্ষমতা অনেক দূব যায়, যদি অনুপ্রেরণা নয়, কেবল ছোটখাট অবলম্বন মেলে দুঃসহ যন্ত্রণার সময়। কয়েদখানার জানালাব শিক, উদাহরণত, এই ধবনেব সামগ্রী।

কিন্তু এখানে কিছু নেই। মরুভূমিব মধ্যে একচিলতে মেঘ পথভ্রান্তের শক্তি যোগাতে পারে। সালামং আলির অনুভূতি তাই হাতড়ে বেড়ায়, যদি কোথাও কিছু পাওয়া যায়।

একবার চোখমুখ কঁচকে সে দমকা নিঃশ্বাস নিলে। বৃকেব পাঁজরে ফিক বাধা এসে জুটল, হাত দিয়ে সংবাহনের কাজ এখানে অল্প উপকাবী। কিন্তু ঠুটো অবস্থায় সে কী করবে? তাই হাতকড়া নিয়েই দুই হাত বৃকেব উপর রাখলে। দম আটকে আসে থেকে থেকে। সালামং আলি গলার ভেতর ঘড়ি ঘড় একটা আওয়াজ তুললে, জ্বাই ছাগলেব ক্ষেত্রে যেমন ঘটে। এই গুমবানি অনেকখানি সোযাশি। কিন্তু শত্রু তাব হাসহাযতা দেখে

আনন্দ পাবে, তা হয় না। আবার গ্রীবাদেশ শব্দহীন। বন্ধ চক্ষু তেড়ে তেড়ে ফেটির কিনাবা ছোঁয় মাত্র এবং ব্যথায় আরো নোতিয়ে পড়ে। সালামং আলির বক্ষস্পন্দন পর্যন্ত অতি টিনে হয়ে যায়। মাথাব ভেতব চক্কর লাগে। সালামং ভাবলে, বোধ হয় মৃত্যু সন্নিহিত। কিন্তু এই চিন্তা এক জায়গায় আটকা থাকতে পাবে না, বরং হঠাৎ উবে যায়।

স্মৃতির পদ্মপাল মগজের চাবপাশ ছেয়ে বসে পড়ে।

বিশ্বাসঘাতকতা তাকে ভল্লাদেব হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাগী মুসলিম লীগারের মুখটা সে দেখতে পেনে। ফিচেল ছুঁচোলো মুখ, কুশ চেহাবা, তাই আবার বোঁটে-খাটো এই ওমোবেব পাচা আবার তার প্রভুদেব কায়দায় নামেব শেষে বিব্রমপুবী ভুড়েছিল। ধূর্তামি ওব চোখেমুখে স্পষ্ট। চিবকুমার। সমাজের জন্য জীবন বিকিয়ে দিতে পারত খুব সহজে। মহং নামে পর্বচিত্ত হোত। কিন্তু সব সময় সে সমাজ-বিবোধীদের দোসব। ছোকবাবাড কপে প্রাসদ্ধ ছিল সে বিব্রমপুব ওমোটে। আজও খসলং বর্তমান আছে। এই বয়সে, যাটবে উর্ধে, এখনও বিব্রমপুবী কারো ক্ষতিসাধন, বিশেষত দেশেব ক্ষতিসাধন কববে, বাংলাদেশে যখন কসাইয়েব দোকান তা ভাবা যায় নি। কিন্তু সে-ই পাঞ্জাবী প্রভুদেব আমন্ত্রণ দিয়ে এনোছিল এই অঞ্চলে।

ইসলাম পার্টিং ধর্মধ্বস্তী দানালওলো সঙ্গে ভুটেছিল। নচেং অমন অখ্যাত পাড়াগায়ে এব খোঁজে বাএ পঞ্চনদবাসী মিলিটারি হাজির হতে পাবে, তা অবিশ্বাস্য।

কত মুখেব মিছিল দ্রুত শূন্যতাব বাস্তা অতিক্রম কবে। মানুষের আধিপত্য সেখানে প্রধান নয়। বাড়বে পোবা কুকুরটা, অস্বাভাবিক শব্দ তুলে তাব অনুগমনে কতো দূরে এসেছিল। এক সিপাই গুলি কবে তার প্রভুবিচ্ছেদেব বেদনা আব স্থায়ী হতে দেখ নি। নভোচাবী রুশ সাবমেয লাইকার নামে সেও কুকুরেব নাম বেখেছিল। একটা জন্তুমুখ এই অন্ধকার, এই আলো— এমন ছাড়াছাড়া খাদ আব পথেব পালাত্রম সান্নিধ্যেব মত— ভেসে উঠতে লাগল, যেমন নদাঙে স্নানেব সময় তাব অভোস ছিল। কুকুরেব মধোও মানবিকতাব স্পর্শ পাওয়া যায়। আব তাব সঙ্গী দশজন পাঞ্জাবী সিপাই, এওলো মুসলমান মুসলমান .. কুকুরেব কাছাকাছি কোন কালেও যেতে পাববে না।

চাঁৎকাব দিতে গিয়ে ঢোক গিললে সালামং আলি। মগজ এখন বড় পবিদ্ধাব। কিন্তু চিবকালের কবগাপরায়ণ মন এবং যাব জন্যে সে রাজনীতিব ভেতব ঢুকেছিল, হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নিলে আপন স্বভাবেব বেগে। এ ওলোব আব অপবাব কতটুকু। এই কুকুরদেব মনিবওলো বসে আছে ইসলামাবাদ শহবে — সেওলোই আসল জন্তু। নিজেব মনে হেসে উঠল সালামং আলি এই সময়। রাজধানীব নাম ইসলামাবাদ। ইসলামকে যাবা বববাদ কবেছে গত পঞ্চাশ বছর ধবে এবং যার ঝোপেব আডাল থেকে নিজেদের অর্থলালসা, কামলালসা, আয়েস আরামের ঘৃণা প্রবৃত্তিব রোলার নির্দয় গতি চালু বেখেছে, তারাই শুধু এমন কৌতুক বিতবণে সক্ষম। ইতিহাসেব পুনবাবৃত্তি মাঝে মাঝে কী আশ্চর্য ভাবে না ঘটত। আজ যেখানে ইসলামাবাদ শহর গড়ে উঠছে তার নাম পাটোয়াব ডালি। এই অধিতাকা বিশ বছর আগে ডাকাতদের আস্তানা ছিল। বড় ডাকাতরা ছোটদের ভাগিয়ে দিলে। এদের তুলনায় যদিও তাবা ছিল দেবদূত বা ফেরেস্তা। তারা একটা দুটো গেবস্থ লুট করে ক্ষান্ত দিত। এরা একটি জাতির সম্পদ লুণ্ঠন নয় শুধু তাংদের নিশ্চিহ্ন কবার জন্যে হত্যা তাওবে মেতেছে, সেখানে বর্বরতায় নাদিব শাহ, চেঙ্গিজ খান, বা হিটলাব দুহ্মপোষা শিশু। বাংলাদেশেব অধিবাসীদের হাড়ের উপর ষোল শ কোটি টাকার শহরের পঙ্কন। তারই প্রতিবাদেব খেসাবং দিচ্ছ নিজেব জীবন যৌবন দিয়ে ...। সালামং আলিব মনে হ'ল মাথাব ভেতব কি যেন সিদ্ধি ঘোঁট ঘোঁট পাকাচ্ছে। আর ত' মাথা কোথাও রাখতে পাবব না। এখনই হয়ত মুখ খুবদে পডব। কিছু ধরা দবকার। শূন্যতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার উপায় পর্যন্ত নেই। আলো

দাও, আমাকে একটু আলো দাও যেন বাংলার মুখ আমি দেখতে পাই আব একবার। আর একটু বার। এমন চীৎকার ভেতরে নিষ্কমণ-পথের জন্য মাথা কুটছিল।

আর্তনাদ দ্বারা শব্দকে অনুবোধ করবঃ

সালামং আলি এটুকু ভাবতে পাবলে হাজার যন্ত্রণার মধোও। কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যাদের জীবন তারা অত সহজে নিজেব ইচ্ছার বশবর্তী হয় না। না, জন্তুব কাছে মানুষ কিছু চাইতে পারে—এ অস্বাভাবিক। মানুষেব ইচ্ছা আদেশকপে জন্তুব কাছে যায়। এখানে তেমন ব্যবস্থা যখন নেই, নিঃশব্দতাই পবম সঙ্গী।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পাববঃ

নিজেব কাছে প্রশ্ন এবাব সোজাসুজি কবে বসে সালামং আলি। কিন্তু জবাবেব জন্য অপেক্ষা কবে না। কাবণ অনেক ছায়াছবি সে যেন চক্ষুসংলগ্ন ফেটিব সমতলে দেখতে পায় ধেয়ে ধেয়ে আসছে, আছড়ে পড়ছে, ভেঙে চুরমাব, এবং আবাব খণ্ড খণ্ড দিগ্বিদিক বেবিয়ে যাচ্ছে অতি দ্রুতবেগে, তখন সবই যেন অনুপ্রবাহ এবং শ্রোতেব মত তাব অভিযাত, সামনে যা পড়ে টেনে নিয়ে যায়। হযত ছমডি খেয়ে পড়ে যেত সালামং আলি। কিন্তু কয়েকটি ওজবে-যাওয়া ঘটনাব গুঞ্জবন কানেব কাছে শুধু শব্দমূর্তি বেখে গেল না, আবাব ছবি হয়ে উঠল। সর্বপ্রাচীন ছায়াচিত্রেব ধারায় নির্বাক।

সামাজিক কাজকর্মেব মধো একটি সহপাঠিনী তাব কাছে বেশ ঘন ঘন যাতায়াত কবেছিল। সালামং আলি সহকর্মীব মর্যাদা দিয়েছিল তাকে। পাবস্পবিক শ্রদ্ধা যেখানে একমাত্র যোগ সেতু। তাবপর ধাপে ধাপে বৃহত্তর সমাজ ভ্রগতেব এলাকায় নিজেব ভ্রায়গা কবে নিয়েছিল সালামং আলি। ফলে, কাজ অনেক বেশি। এ-জেলা সে-জেলা, এ-মহকুমা সে-মহকুমা ছুটোছুটি, পার্টিব কর্মী সম্মেলন ইত্যাদিব চাকায় বাঁধা জীবনে ফুবসং ছিল না। মাত্র গত সপ্তাহে সহপাঠিনী তাব কাছে খোলাখুলি হৃদয় উন্মোচন কবেছিল পত্রযোগে। কাজেব ভিড়ে সাক্ষাতেব যো ছিল না। তাব মধো হঠাৎ দেশেব উপব হানাদাবদেব হামলা-জনিত সঙ্কট। কে কোথায় যে ছিটকে পডল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বসে গেল। নিজেব ব্যক্তিত্বেব প্রতি তারিকয়ে ফল্গু আনন্দেব বেশ সহ মৃদু হেসেছিল সালামং আলি। একটি মুখ তাকে আজ বাববাব বাধিত কবে এই ভেবে যে, সে প্রলয়কালেব চূড়ায় হাসীন, কিন্তু শেষ চীৎকার দেওয়াল সময় অতিবাহিত। ইথাবে কোন বাণী কম্পন আব থাকবে না। বস্তু পিণ্ডেব সঙ্গে সেও ভেড়ে পবণত হবে। হিমবাহ পাহাড়ী তববন্দ সব ভেতরে গুডিয়ে দিয়ে ববফ আবৃত কবে চলে গেল কোন গবিখাদে সমাহিত হতে।

এত অন্ধকার কেন পৃথিবী হুড়ে ? আমাকে আলো দাও, অতি অস্পষ্ট আলো, যাব কাছে জেনাকি মনে পলে প্রদীপ। শুধু নিমেবেব জন্য। বাংলার মুখ তাব সাহায্যেই দেখা হয়ে যাবে। বুকেব ছবি যত ক্ষীণ বর্ণাই হোক চোখেব সামনে, দৃশ্যাকাব্য কাপে গীত হয়ে উঠবে হাজার যাত্রাব ত্রিঘোণিত স্পন্দনে। এক ফোঁটা আলো পাঠাও, হে মার্তণ্ড দেব, তোমাব অন্তহীন তেজভাণ্ডাল থেকে। এই তমসার অবসান ঘটুক। এক ফোঁটা আলো ।

চোখ তেড়ে কালো ফেটিব মধো তাকাতে গেলে সালামং আলিব মনে হল, মস্তিস্কেব ভেতবে কোথায় যেন কি ছিঁড়ে গেছে এবং তাব পক্ষে আব এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু যদি চোখ নোলে চাইতে পাবত, অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য কিছু ছিল না।

কিন্তু কে দেবে তাকে আলোঃ

অনুরোধ করব শাস্ত্রীদেবঃ ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে এলেও অসহ্য লাগছিল সালামং আলিব কাছে শাস্ত্রীদিক যন্ত্রণাব বাক্য, যা পথে কতবার না অকাবণ শাস্তি মাবফঃ পুরস্কাব পাওয়া। না, আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কী হবে যদি এতটুকু মেহেববানী গ্রহণ কঁবা যায়ঃ অতি সামান্য দয়া। একবার আমাব চোখটা খুলে দাও। এই মিনতি কি জন্তুব কাছে পবাজয় স্বীকারঃ

এই জবাবের পূর্বে সালামং আলির মৃত ক্ষুধাপিপাসার্ত, প্রহৃত গোটা দেহ জুড়ে এমন তাণ্ডব গুরু হল তার কোন খেয়ালই ছিল না যখন সে চাঁৎকার দিয়ে উঠল, এই সেপাই, জারা মেহেরবানী—।

—কিয়া মাংতা—?

—মেরা আঁখ কা পট্টি খোল দিজিয়ে।

—কিউ। ..

—তকলীফ কা ওয়াজেহ সে নাই। মাই জারা দুনিয়াকে দেখলে মাংতা।

থোড়া রোশনাই। কষ্টের জন্য নয়। আমি দুনিয়াটা একটু দেখে নিতে চাই। একটু আলো।

—রোশনাই। —আচ্ছা—আফসার সে পুছে।

বুটের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

আবার বুটের আওয়াজ নিকটবর্তী।

উর্দু ভবান দস্ত ঘোষণা করলে, “এই কয়েদী চলো। তোমকা রোশনাই মেলে উস্কা বন্দোবস্ত করে।” (তুমি আলো পাও তার বন্দোবস্ত করি।) ”

—মেহেরবানী।

—মেরা সাথ আও। এই বশি পাকড়ো। বাঙালী কা বাচ্চা ইধাব উধাব করেগা তো পেট মে কিবীচ ঘুসা দুংগা।

—চার্লিয়ে।

বন্ধ চক্ষু সময় আন্দাজের বিশেষ বাগডা। সালামং আলি ঠাউব কবতে পাবে না, কতক্ষণ সময় গেল। তবে সে সহজে ধবে ফেলে, কোন দালানোব এক বাবান্দা থেকে আর এক বারান্দা, কবিডব থেকে কবিডরে, যেখানে সিঁড়ি—সুতরাং তলা—এক বা দুই বা তিন তলা পাব হচ্ছে।

হয়ত দশ পনব মিনিট।

সালামং তাব হৃদিস দিতে পারবে না, কিন্তু তাব পায়ে কোন ঝড়তা ছিল না। প্রতীক্ষিত আশা যখন হাতে, কাছে আসে আসে, তখন দ্রুততার গুণ্ডা যে-কোন মানুষকে উদ্দিগ ব্যস্ততায় কাবু করে ফেলে। সালামং আলি তার কোন ব্যতিক্রম নয়। সজীবতা ফিবে এসেছিল তাব দুই পায়ে, যদিও লুঙিব তলায় ঠিক হাঁটুর নীচে সাইকেল চেনের পটাপট আঘাতে শুধু লুঙি নয় চামড়া পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়েছিল দগদগে ঘায়েব পরিণতি সহ। জ্বালা ধবে বৈকি ওই সব ভায়গায় চলাকালীন লুঙিব ঘষডানিব চোটে। সালামং আলি কিন্তু যেন সব যন্ত্রণার উর্ধ্বলোকবিহারী। আর একটু পরেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তারপর আসন্ন নয় অবধারিত মৃত্যুব প্রতীক্ষা। কারণ, এ পর্যন্ত এমন জন্তুদেব কবল থেকে কেউ আর ফিরে আসে নি, দাঙে বর্ণিত দোভুখ দরজাব সাইনবোর্ড এরা গোটা বাংলাদেশের উপর টাঙিয়ে দিয়েছে। ‘সর্ব আশা পরিত্যাগ করিয়া আসিও যাহারা প্রবেশার্থী।’

—রোকো। সহসা শাস্ত্রী হৈকে উঠল।

থামলে সালামং আলি।

একটা দরজা খোলার শব্দ। কিছু কিছু ফিসফাস রব।

সিপাই তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে, সালামং আলি তা পরিষ্কার টের পায়। হাতে, হ্যাণ্ডকাফ যথারীতি মজুদ।

—তোম রোশনাই মাংতা?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আব তোমরা ফেটি খোল্ দেতা।

বাকুলতা সালামং আলির আঙুলগুলো মৃদু কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, যেন সকালের হাওয়া।

—আচ্ছা, আব রেডি হো যাও।

সিপাইয়ের কণ্ঠস্বর।

—ঠিক হায়।

খুব স্বাভাবিক গলায় জবাব দিলে সালামং আলি।

একটানে সালামং আলির চোখের ফেটি খুলে গেল। আগ্রহী অবীর বন্ধ চক্ষুর ফেটি উন্মোচন মাত্র তাব মনে হ'ল যেন জ্বলন্ত তীর অক্ষিপটে এসে বিঁধল। মাথায় বোঁ বোঁ চক্ষু অতি দ্রুত এবং ক্রমশ বেগবর্ধিত ঝঁশের বনিয়াদ ভেঙে খানখান করে ফেলছে।

মূর্খ বেদ-উপনিষদের ঋষিবৃন্দ, যাঁরা লিখেছিলেন, “অন্ধকার থেকে আমাদের আলোব দিকে নিয়ে যাও, তমসো মা জ্যোতির্গময়।”

প্রায় অচেতন তবু একেবারে মুর্ছিত, চেয়াব থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়াব আগে সালামং আলি চেতনার স্বাক্ষর পাঠ করে ফেললে নিমেষেই। জায়গাটা টর্চাব চেম্বাব বা নির্যাতন কক্ষ। স্থানীয় ভাষায় ধোলাইখানা। তার মাথার উপর পাঁচশ পাওয়ারেব বাল্ব জ্বলছে। যা হেঁকে হেঁকে বলছে—“দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না, হয় তাদের ধ্বংস করো অথবা ধ্বংস হও।”

মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্যাব,

আমার এই খাতা শেষ পর্যন্ত আপনি পড়বেন কি না জানি না। কাবণ, আপনি দেখেছেন যে আমি একটি প্রস্তাবও উত্তর লিখি নি, আগাগোড়া এই চিঠিটাই লিখেছি আপনাকে। আপনি হয়তো লাইন কয়েক পড়েই ভুলটি করবেন, একটা জিবো বসিয়ে দেবেন, তাবপব ননসেন্স রাইটিঙের জন্য আমার নামে ইউভার্সিটিতে একটা বিপোর্ট পাঠাবেন। জিবো দিন, বিপোর্ট কবন, সেজন্যে ভাবছি না। হয়তো বা ধৈর্য হবে লেখাটা আপনি পড়েও ফেলতে পাবেন, এই আশাতেই আপনাব কাছে এই নিবেদন পেশ করছি।

দু একটা প্রণেয় ভাবাব হয়তো দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে পাশনার্ক পাওয়া দুবে থাক, বুড়িব ঘরেও পৌছত না। তাই ও চেষ্টা আর কবব না। তা ছাড়া আজ সন্ধ্যার পবেই তো আমি পাশ ফেলিব বাইবে চলে যাব। কলকাতাব আশপাশ দিয়ে যে অসংখ্য ট্রেন আসে যায়, তাদেবই কাবো চাকব তলায় শেষ হিসেব মিটিয়ে দেব আনাব। এই খাতা যখন আপনি দেখাবেন, তখন ট্রেনে কাটা-পড়া অপবিচিত যুবকের মতুব ছোট্ট আব পুবোনো সংবাদটুকু আপনাব স্মৃতি থেকেও নুছে গেছে।

আপনাব অধ্যাপক-বিবেক এইখানে এসে একবাব থমকে দাঁডাবে। বলবেন, ছিঃ—ছিঃ, পরীক্ষায় পাশ না কবতে পেবে আত্মহত্যা। এব চাইতে অধম কাপকষতা কি কল্পনাও কবা চলে? দেশেব তবণদেব যদি এইটুকুও নৈতিক বল না থাকে—তা হলে বাঙালী কোথায় দাঁডাবে—জাতির ভবিষ্যৎ কী।

বিশ্বাস কবন স্যাব, এ সব কথাই আমি জানি। আবে বিশ্বাস কবন, আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমাবই হাতের ছোঁষায় সাঁওতাল পরগনায় বান-ডাকানো খাপা পাহাড়ী নদী বিশাল ব্যাচমেন্ট এবিযাব মধ্যে থমকে দাঁডাবে, আমি সুইচ্ টিপলে হাইড্রো-ইলেকট্রিকের হাজার হাজার আলোয় বলমল কবে উঠবে বিহার-পশ্চিম বাংলাব সেবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বেস্ট—ব্লাস্ট ফার্নেসেব রক্তিম আভায় আমিই গলিত ইস্পাতে আগামী ভাবতবর্ষের ভিত্তি রচনা কবে দেব। স্যাব, আত্মহত্যা আমি করতে চাই নি।

আমাব চাবদিকে ছেলেবা দ্রুত বেগে পরীক্ষাব খাতা লিখে চলছে, তাদের অনেকেই আমাব মতো এখনো স্বপ্ন দেখছে এবং কিছুদিন পরে ক্রশ-লিস্টে অনেকেরই সে স্বপ্ন খান-খান হয়ে যাবে। তবু ওদেব মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো জীবনে কৃতী হবে—ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আশার মশাল জ্বলিয়ে নেবে হাতে। ওবা ভাগ্যান—এগিয়ে চলুক। আমার মতো যে অসংখ্যো এমনি কবে হাবিয়ে যাবে, কিংবা বেঁচেও বেঁচে থাকবে না, তাদের কথা কোনো পঞ্চবার্ষিকী সাফল্যেব খতিয়ানে লেখা থাকবে না। আমি আপনাকে চিনি না, কখনো দেখি নি, কোনদিন দেখব না, কিন্তু এটুকু জানি, আপনি অধ্যাপক। ছাত্রদেব কাছাকাছি

আপনাকে থাকতে হয়, তাদের জীবনের ডেউ আপনাকে ছোঁয়, হয়তো তাদের আপনি ভালোও বাসেন। তাই শেষ পর্যন্ত আপনি পড়ুন বা না-ই পড়ুন, আমাদের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব।

সাব, স্বপ্ন যখন দেখেছিলাম তখন এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামের চাষীর ছেলে। কিন্তু আমার বাবা চাষী হলেও দিল্লি-আলো-কবা নেতাদের কাবব চাইতে তাঁর দেশপ্রেম এতটুকুও কম ছিল না। আমার জন্ম হয়েছিল উনিশশো বের্যাল্লিশের সেপ্টেম্বরের মাঝ বাতে এক জঙ্গলের ভেতর। কাবণ, তখন মিলিটারীরা আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছিল আর জাতীয় পতাকা আঁকড়ে ধরে বুলেটবের্ব বুক নিয়ে আমার বাবা নুটিয়ে পড়েছিলেন এক ধানক্ষেতের ভেতর।

বাবার ইচ্ছে ছিল, ছেলে হলে তার নাম রাখবেন স্বাধীনকুমার। সেই আওনজ্বলা প্রলয়ের রাতে বাবাব রক্তের আশীর্বাদ নিয়ে স্বাধীন আকাশের তলাতেই আমি জন্মেছিলাম। কাবণ, মিলিটারীর সমস্ত তাণ্ডব সঙ্কেও দেশের একটি মানুষের মনও সেদিন পবাসীন ছিল না।

কিন্তু এ-সব ইতিহাস থাক সাব। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তাহলে এবাব আপনার নিশ্চয়ই ধৈর্যচূড়তি হবে—আমার বংশপরিচয় শোনাবাব কী মাথাব্যথা আছে আপনার। তা ছাড়া এমনিতেও আমি তো তিন ঘণ্টাব বেশি সময় পাব না—এতে খাতা কেড়ে নেবে। তাই সংক্ষেপেই বলতে চেষ্টা কবি।

চাষী ছেলে, চাষবাস কবে কোন মতে বাঁচতে পাবতাম, কিংবা আকাল এলে অনেককে যেমন না খেয়ে বা অখাদ্য খেয়ে মবে, তেমনি কবে মবে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার বরাত খাবাপ— কাকা আমাকে গ্রামের মাইনাব স্কুলে ভর্তি কবে দিলেন আর— আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি একটা স্কলার্শিপও পেয়ে গেলাম।

সাব, সেই স্কলার্শিপই আমার কাল হল। আমি স্বপ্ন দেখতে শুক কবলাম। মা আমাকে বুকে টেনে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন। বাবাব জনো মা-কে কাঁদতে দেখলাম এই প্রথমবাব। তাবপব দু-চোখ ভবা আলো নিয়ে কাকাব সঙ্গে বওনা হলাম আট মাইল দূবের বড়গঞ্জেব হাই স্কুলে ভর্তি হতে।

হোস্টেলে থাকবাব পযসা ছিল না। জায়গা পেলাম এক ধান-চালের আড়তদাব সামন্তদের বাড়িতে। সামন্তরা দূব সম্পর্কে আমাদের আদ্বীয় হত—কিন্তু গবীর চাষীর সঙ্গে সে আদ্বীয়তা তাবা দীকাব কবত না। আসল সম্পর্ক ছিল জোতদাব আব প্রভাব, মহাজনা আব খাতকের। কাকাই হাতে পায়ে ধবে ওদের ওখানে আমার থাকাব ব্যবস্থা কবে দিলেন। তাই স্কুলে ভর্তি হলাম, ফ্রীও পেলাম।

সাব, সামন্তদের যবে লক্ষ্মী বাঁধা। দুটো লবী, তিনটে মোকাম। কিন্তু বাবসা যাবা কবে, তাবা কোনদিন পাই পযসাও নাঞ্জে খবচ হতে দেয না। পাঁচশো টাকা দান কবে পঁচিশ হাজার টাকাব আখের ওছিয়ে নেয। আমাকেও খেতে থাকতে দিত বটে, কিন্তু তাব দানও আদায় কবে নিত।

এই খাতা দেখেই বুঝতে পাবছেন আমার হাতের লেখা খাবাপ নয়, তাব ঊপরে অঙ্কে আমার মাথা ছিল, মাইনাব পবীক্ষায় অঙ্কে একশোর ভেতর একশো পেয়েছিলাম। ওবাও সুযোগ ছাড়ল না। প্রথম-প্রথম আমাকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখাত, তাবপব খাতা লেখাত, তাবও পবে হিসেব কষাত। সকালে দু ঘণ্টা এ আমার বাঁধা কাজ দাঁড়িয়ে গেল।

পড়বাব সময় পেতাম বাত গ্রাটটাব পনে।

তা-ও কি ভালো করে পড়াব যো ছিল।

আড়তেব লাগাও একখানা ছোট ঘরে আমি থাকতাম আর থাকত ওদের এক মুহুরী। মুহুরীর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। শুকনো চামুচিকেব মতো চেহারা— দুটো অঙ্কুত বড়ো-বড়ো জুলজুলে চোখ। আমি পড়তে বসলেই সে হঁকো ধবিযে আরম্ভ কবত।

আমার তখন বয়স কত আর? বাবোব বর্শা নয়। তামাক টানতে টানতে, জুলজুলে চোখদুটোতে আবো জ্বালিয়ে তুলে বিশ্রী ফাঁসর্যেঁসে গলায় যে-সব গল্প শোনাত, সে সবেব নানে তখন আমি ভালো কবে বুঝি নি, পরে বুঝেছিলাম। অকথা, অশ্রীল সমস্ত ব্যাপাব। কত ভাবে, কত মেয়েব সর্বনাশ সে কবেছে তাবই বিববণ।

আমাব ভালোমন্দ কিছুই বোধগমা হত না। ভাবী বিবলি লাগত।

—চূপ ককন, আমায় একটু পড়তে দিন।

—আবে থাম বাপু, থাম! চাষাব ছেলে বিদ্যাসাগব হবে—ইঁ। তাব চেয়ে হঁকোটা বব—তামাক খাওয়াটা শিখে নে।

মুহুরী যদি ক্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তো দপ কবে লখনটা গেল নিবে। সামন্তদেব বাড়ি থেকে যেটুকু কেবোসিন তেল ববাদ হত বাত নটাব পাবে আব আলো জ্বলবাব কথা নয়। ফলাবশিপেব যে সামান্য কটা টাকা পেতাম, তাতে নানা টুকটাক খবচ চালিয়ে আব তেল কেনবার পয়সা হুটত না।

ওবু এব মধ্যেও ফাস্ট সেকেন্ড হয়ে ক্রাস এইট পযন্ত উঠেছিলাম। তাবপবেই দেখা দিন বইযেব সমস্যা। দেখলাম ফলফাইন্যালের বই কেনা প্রায় সম্ভব-আশী টাকাব ধাক্কা। কাকা খোবাকীব বন বেচে কটা টাকা পাঠানেন সামন্তেববা দশ টাক সাহায্য কবল হেডমাস্টাব দয়া ববে তিনখানা ফুল কপি দিলেন। ওব অর্ধেক বইও হল না।

আব সামন্তদেব দশ টাক'ব ঋণ শ্রুতে হল খাতাব পব খাতা লিখে।

সাব, মহিনাবে দলাবাশিপ পের্যেছিলাম, ভেবেছিলাম আমি তুচ্ছ সাধাবণ ছাত্রদেব দলে নই, আমাব মধ্যে শক্তি আছে। তাবই জোবে - আমি স্বাধীনকুমাব—গাধীন গৌববে নাথ' তুলে দাঁডাব। যে ভাবতবর্ষেব জন্যে আমাব বাবা বৃকেব বক্ত চেলে দিযেছিলেন সেই ভাবতবর্ষে আমি আমাব সত্যিকাবেব কাণেব ভাষণ থুতে পাব। কি হ না পাবলাম সিবমতো পড়াশুনো কবতে, না হল ভালোভাবে পবীক্ষা দেওয়া। বেজান্ট বেকলে দেখা গেল, খণ্ড ডিভিশনে পাশ কবেছি।

হেডমাস্টাব থেকে আবাস্ত কবে সবাই একবাকো ছি-ছি কবতে লাগলেন। সামন্তদেব যে ছেলেটা তিনবাব বি-এ ফেল কবে এখন নদীব ধাবে ধাবে বন্দুক কাঁধে কাদা খোঁচা শিকাব করে বেডায়, সে বললে, পাশ কবেছে এই ওব ভাগ্য! কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ফুল ফাইনালে মাব খেয়ে যায়।

দাদিন ঘাবে মুখ নুঁকিয়ে পড়ে বইলাম। উঠলাম না খেললাম না। আব তাবই ভেতব মা-ব চোখের জল টপটপ কবে পড়তে লাগল আমাব কপালে।

—ওহ বাবা ওহ! আবাব মন দিয়ে লেখাপড়া কব। তুই জীবনে ঠিকই বড় হতে পারবি। তোর মতো কত দুঃখী ছেলে একেবাবেই পাশ কবতে পাবে নি—তাদেব কথাও ভেবে নে।

স্যার, এ'বাব বুক বাঁধলাম। এবার চলে এলাম কলকাতায়। কী কবব, ওই সামন্তদেব কাছ থেকেই চিঠি নিয়ে এলাম। সরকারেরা সামন্তদেব কুটুম—বড়বাজারে তাবা তামাকেব ব্যবসা করে। সেইখানেই জায়গা হল।

ওই এক কাজ। দোকানের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, দরকার হলে তাগাদায় বেকতে হবে। তবু মনে হল, কলকাতা-কলকাতা। কত বড় জীবন এখানে—কত সুযোগ। বড়-বড়

কলেজ, নামজাদা সব দিকপাল অধ্যাপক সেই সব কলেজে একবার পা দিলে, নামকবা প্রোফেসরদের জ্ঞানের একটুখানি ছোঁয়া পেলেই আমার মনেব ভেতর হাজার আলো বলমল করে উঠবে। সাবা পৃথিবীর প্রাণের চেউ এই কলকাতায় এসে ভেঙে পড়েছে—তার সঙ্গে একবার প্রাণ মেলাতে পাবলে আমি বাতারাতি খোলা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াব—প্রথম বর্ষাব জল পেয়ে মরা চাবাগাছ যেমন নতুন পাতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

গেলাম কলেজে—সঙ্গে আবার কটা খোবাকিব ধান বোচা টাকা। জানি, এবজনা সংসারে সবাইকে হয়তো বেশ কদিন আধপেটা খেতে হবে, হয়তো উপোষ দিতে হবে। কিন্তু যদি ভালো করতে পাবি পরীক্ষায়, যদি মানুষ হতে পাবি, যদি—

বিবট বাড়ি কলেজের, তাতে বখের মেলাব ভিড। সেই ভিড ঠেলে যদি বা অফিসে পৌঁছুতে পাবলাম, ওনলাম, থার্ড ডিভিশন ১ আই, এস-সিতে সাট ১ হবে না।

একটা-দুটো নয় সাব, ছটা কলেজ থেকে ফেরে দিলে। শেষে ওই মধ্যে একটা অকুলীন একটা কলেজে জায়গা হল। ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম। যদি কিছু কন্সেশন পাই।

—কন্সেশন ১ ভাইস-প্রিন্সিপালের চোখ আকাশে উঠল, থার্ড ডিভিশন!

—সাব—

—আই এস-সিতে এমনিই আমবা কন্সেশন দিই না, এব ওপরে থার্ড ডিভিশন

— সাব, গবিরেব ছেলে—

—সব বাঙালীর ছেলেই গবির। সে ভাবে দেখতে গেলে কলেজওদ্ধ ছাত্রকেই য়ী স্টুডেন্টশিপ দিতে হয়।

—সাব, একেবারে চাষীর ঘবেব ছেলে আমি—

ভাইস-প্রিন্সিপাল দাক্ষণ বিবন্ত হলেন। তা হলে কলেজে পড়তে এলে কেন ১ চাষবাস দেখলেই পাবতে। হাযাব এডুকেশন তোমাদের জ্ঞানো নয়। গ্যে— গ্যে— ডেণ্ট ডিস্টার মী—

কন্সেশন হল না। পথে ফিরে আসতে আসতে সামন্তদের সেই মুহূর্তের কথা মনে পড়তে লাগল : চাষাব ছেলে বিদ্যাসাণব হবে- হেঁদ।

সাব, তখনি হয়তো আমাব দেশে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এক মাঠ বোদের ভেতর, আওন পোড়া দিচ্ছে, তাঁব কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোটা পড়ছে -- সেইখানে নিজের জয়গায় গেলেই আমাব ভালো হত, শহবেব এই অপমানের চাবুক এমন করে আমাব গায়ে পড়ত না। কিন্তু সাব, আশা আমি ছাড়তে পাবলান না। কেমন ভেদ চেপে গেল, মনে হল, এব শেষ দেখে ছাড়ব।

সবকালদের তামাকের দোকানের এক ধারে থাকি। সামন্তদের সঙ্গে কত তবাত। সেখানে ছোট একটা আটচালার ঘবে থাকতে হত বটে, কিন্তু বাইরে আকাশ ছিল, আলো ছিল মানের জ্ঞানো মন্ত একটা দীঘির কালো গহীন জল ছিল—বাতাসে বতবো-ভাঁটি-চাঁপা-বকুলের গন্ধ ছিল। কিন্তু এখানে বড়বাজবেব গলি। বেলা বারোটায় সাবি সাবি দোকানে ইলেক্ট্রিকের আলো জ্বলছে। তিনহাত রাস্তার দুধাব দিয়ে আকাশছোঁয়া স্যাঁতলাগা বাড়ি—বাতাস নেই, গায়ে গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাজারো লোকের বাত একটা-দেউটা পর্যন্ত আসা-যাওয়া, গুমোট গবম, লাইন বাঁধা দোকান থেকে তামাক আর গুড়ের গন্ধ— আব কান-ফটানো কোলাহল।

এবই মধ্যে এক কোণায় একটা তক্তোপোশে থাকি। সারাবাত ইঁদুর চবে, দিনে-দুপুরে আবশোলাব উৎপাত। সরকারেরা কলেজের মাইনেটা চালাত—আব দিত পাঁচ টাকা হাত

খবচ। তাব বদলে সকালে-বিকালে কাজে বেকতে হত—তাগাদায় যেতে হত। জোগাড়-যস্তব কবে একটা টিউশন জুটিয়ে নেব তাবও জো ছিল না! বই? আই এস-সিব সব বই কিনতে কত টাকা লাগে সে আমি আজও জানি না। স্যাব, আপনিও বোধহয় জানেন না। আপনাদের সময় যে বই আপনাবা পাঁচটাকায পেতেন এখন তা বারো টাকার নিচে নয়। দু-একখানা পুরোনো এডিশন ফুটপাথ থেকে কিনেছিলাম—তাতে সিলেবাসেব অর্ধেকও পাওয়া যেত না।

পড়াশুনো ৬ খেতে যেতে হত সবকাবাদের বৌবাজারেব বাড়িতে। সেখান থেকে খেয়ে ফিবতে দশটাব আগে নয়। তাবপব একটা হলুদে ঘোলাটে বাস ছেলে যখন পড়তে বসতাম, তখন দু-চোখ যেন ছিঁড়ে পড়ত, খাতাব নোটওলিকে একবাশ দুর্বোধ্য ইতিবিভি বলে মনে হত। কখন ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না, সাবাবাত গায়েব ওপব দিয়ে ইদুব আব আবশোলাবা দৌড়ে বেডাত।

আব কলেজে ৬ খেঁষাখোঁষ ভিড। এক-একটা বেঞ্চে সাত-আটজনকে ঠাসাঠাসি কবে বসতে হয়, যেখানে পাঁচজনাব বসবাব জায়গা হওয়া উচিত। নোট নিতে হলে খাতা বাখবাব জায়গা মেনে না ল্যাবোরেটবিব অবস্থা আরো চমৎকাব। পনেরো জনাব মতো ছেলে যেখানে কাজ কবতে পাবে—সেখানে পঞ্চাশ জনকে কাজ কবতে দেওয়া হয়।

ভাবী বৈজ্ঞানিক। স্বাধীন ভাবতেব ইতিহাস যাবা গড়বে—এই তাদের লেখাপড়া শেখানোব চেহাবা।

তব সাব, চেষ্টাব ঐটি করব নি। দু-চাব জনাব কথা বলছি না—আমাদের মতো তুচ্ছ সাধারণ ছাত্র কলেজে লেখাপড়া শিখতেই এসেছিল। কেন তাবা পাবে না, কেন যে তাবা ফেল করে -

একটা ঘটনা বলি, স্যাব। আজ এ অবস্থাতেও আমার হাসি পায কথাটা ভাবলে।

কলেজের ফাউন্ডেশন ডে। ঘটা কবে সভা, পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা। সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল। বলতে বলতে তাঁব চোখে জল এসে গিয়েছিল।

—আমাবা একটা স্টাটিস্টিক্স নিয়ে দেখেছি—কলেজের টেন পারসেন্ট ছেলে মোটামুটি সব বই কিনতে পারে, টুয়েন্টি পারসেন্ট কিছু-কিছু কিনতে পারে, বাকী সেভেন্টি পারসেন্ট একখানা বইও কিনতে পারে না। এ অবস্থায় কী শিক্ষা আমবা দেব—কাদের বা দেব। এব যদি প্রতিকাব না কবা যায়, তা হলে শেষ পর্যন্ত দেশ কোথায় গিয়ে দাড়াবে!

প্রতিকাব অবশ্য ভাইস-প্রিন্সিপাল ভেবেই বেখেছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, কলেজ এডুকেশন গরিব ছাত্রদের জন্যে নয়।

স্যাব, সেকেন্ড আওফারের বেল পড়ল। আব বর্ণিক্ষণ আমি লিখতে পারব না। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তা হলে আপনাব উদারতাব উপবও আব উৎপাত কবা চলে না। সংক্ষেপেই আমাব কথাগুলো এবার শেষ করব।

আমাব মা লেখাপড়া জানেন না। আঁকাবাঁকা হরফে তাঁব জবানিতে কাকা চিঠি লিখতেন।

‘তুমি বাড়ো হও বাবা—দেশের দশেব একজন হও। তোমাব বাবা যে নাম রেখে গেছেন সে নামেব সম্মান রেখো তুমি। স্বাধীন ভাবতের কর্মী হতে হবে তোমায়—সে কথা তুমি ভুলো না।’

ভুলি নি—একদিনের জন্যেও না। কিন্তু স্বাধীন ভাবত তো আমার দায়িত্ব তুলে নিলে না,—আমার শিক্ষার পথ খুলে দিলে না। সেই তামাকের দোকানে চাকরি করে—ক্রাসেব নামে সেই অর্থহীন হট্টগোলেব ভেতবে, ভাপ্সা গরম আব কোলাহলে-ভরা বড়বাজারের গলিব সেই ঘবটিতে, হলুদে ইলেকট্রিকের আলোয় আমাব চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে

যেত—মাথাৰ মথো এক-একটা বস্ত্ৰেৰ ঢেউ ফেটে পড়ত থেকে থেকে। মনে হত এখান থেকে ছুটে পলাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি কোনো পুরোনো দীঘিৰ গহীন কালো জলৰ ভেতৰ, বুক ভৰে টেনে নিই চাপা-ভাঁটিফুল-নাগকেশৱেৰ গন্ধ, কোনো বৰ্ণাৰ কাজলা মেঘকে হাত বাড়িয়ে ডাকি আৰ বলি : আয় বৃষ্টি বোঁপে, ধান দেব মেপে—

কিন্তু কলকাতায় দীঘিৰ সেই কালো ঠাণ্ডা জল কোথাও নেই, সেই নাগকেশৱ সোদাল ফুলেৰ গন্ধ, আমাদেব দেশেৰ বাড়িতে ভৰপেট খোৱাকিব ধান নেই, মানুষেৰ আঙনজ্বালা বুকুৰ ভেতৰ কোনোখানে এক পশলা বৃষ্টি নেই।

কোথায় যাব, কোথায় পলাব।

আশা ছাডব না! আমি বাঁচব, আমি বড় হবো। আমি নইলে নতুন ব্লাস্ট ফাৰ্নেসে আঙন জ্বলবে না, হাইড্ৰো-ইলেক্ট্ৰিকেৰ বিদ্যুৎ ছুটেবো না—অটোমিক ৱিসাৰ্চেৰ কাজ বাকী পড়ে থাকবে, বিফাইনাৰিৰ পেট্ৰোলিয়াম পেট্ৰোল-কেবোসিন—বু অয়েল—পাৰ্বাফিনে নব নব কপ লাভ কৰবে না! সেই ময়দানবেৰ মন্ত্ৰ আমায় জেগে কৰে কেড়ে নিতেই হবে। আমি যে স্বাধীন ভাবতেৰ বৈজ্ঞানিক।

সাব, সবই স্বপ্ন! বাঙলাদেশেৰ কলেজে-কলেজে আমাৰ মতো অসংখ্য ছাত্ৰ স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছে—স্বপ্নেৰ যোৱেই চলে বেড়াচ্ছে। তাৰপৰ একদিন স্বপ্ন ভাঙে। দেখতে পায়—

সাব, পড়াশুনো কিছুই হল না। কখন পড়ব, কোথায় বই পাব? সামান্য বই কিংবা নোট জোগাড় কৰতে পাৰি, হলদে বাহুটাব খোলাটে আলোয় তাৰে কোনো অর্থই থাকে না, এক সাৰ পোকাৰ মতো তাৰা চোখেৰ সমানে কিলকাঁল কৰে নড়তে থাকে। তাৰপৰ কখন জায়গালো ভেঙে পড়ে— সব চেতনা হাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তামাক চিড়ে তৈৰি হাব ইঁদুৰ—আবশোণা—ডাম্পেৰ গন্ধভণা যাব ভাবেৰ আনোয় যখন জেগে উঠি তখন যেন মাথায় বিশ মন ভাব চেপে আছে। তাৰপৰ আটটা না বাজতেই হিসেবেৰ খাত।

আনুযালেৰ খাতা দেখা হয় না। মইনে দেওয়া থাকলেই বাক ধৰে প্ৰমোশন। প্ৰিণ্টেৰ দিলাম না। কী পড়ে দেব? তাৰপৰ এগিয়ে এল টেম্ট।

সাব, এইখানে নিজেৰ অপবাধেৰ কথা কবুল কৰি। টেম্ট যখন কাঁচিয়ে এল তখন মনেৰ মাথো সাবাক্ষণ সবটা অনিভন্ত চিত্তা যেন জ্বলতে লাগল আমাৰ। বই—মাত্র কয়েকটা বই যদি আমাৰ থাকত তা হলে ফাস্ট ডিভিশন না পাই—অন্তত সেকেন্ড ডিভিশন আমি পেতামই, আৰ মাথমেটিয়ে একটা লেটাৰ।

রাগ কৰবেন না সাব, আমাৰ মনেৰ অবস্থা বুঝে দেখুন। আমি যেন পাণল হয়ে গেলাম। তাৰপৰ—

তাৰপৰ—আমি কলেজ থেকে ক্লাসমেটাদেৰ বই চুৰি কৰতে আৰম্ভ কৰলাম।

আপনি কী ভাবছেন আমার সম্বন্ধে? ভাবুন। আমিই কি একথা বিশ্বাস কৰতে পাৰি যে শেষ পর্যন্ত আমি চাব হয়ে গেলাম? আমাৰ বাবা বস্ত দিয়ে দেশেৰ স্বাধীনতা এনেছেন, তাঁৰ ছেলে হয়ে শেষকালে চুৰি কৰলাম আমি?

স্যার, যদি পাৱেন—বিচাৰ কৰবাৰ আগে একবাৰ ভেবে দেখবেন কেন ছেলেজো বই চুৰি কৰে, কেন পৰীক্ষাৰ পাঠ্য নকল কৰে, কেন প্ৰশ্ন কঠিন মনে হলে অমন হিংসে অশোভন ভাবে পৰীক্ষাৰ হল থেকে বেৰিয়ে আসে? এগুলো অনায়ে, অতান্ত অনায়ে। এ জিনিষ কখনো হওয়া উচিত নয়—কেউ এসব সমর্থনও কৰবে না। তবু কেন হয়? কেন ছেলেৱা এমন কৰে ভুলেৰ বিকৃত পথে পা বাডায়? একটা পাশফেলেৰ ওপৰ কতখানি আসে যায়, কখনো কি তা চিন্তা কৰেছেন?

চুরিকৰা বই নিযে কোনো মতে হিঁচড়ে টেস্টে তৰে গেলাম। মাইনে দেওয়া ছিল, টেস্ট না দিলেও আলাউ করে দিত কিন্তু তাবপবঃ ফী দিতে হবে পৰীক্ষাব। এবং অনেক টাকা।

দেশেব অবস্থা খাবাপ—কাৰাব চিঠিতে জনলাম, এব মধ্যেই পেটভাতের ভাবনা দেখা দিয়েছে—নতুন ধান উঠতে না উঠতেই। মা-ব লক্ষ্মীৰ ঝাপিৰ সিঁদূরমাখা শেষ টাকাটা পৰ্যন্ত গেছে—হয়তো গৰ বিক্ৰী কৰে সামান্য কিছু পাঠানো যাবে।

লিখে দিলাম, গৰ বেচতে হবে না, আমিই যেমন কৰে পাৰি জোগাড় কবব।

কিন্তু কোথায় যোগাড় কববঃ স্টুডেন্টস্ এইড কাণ্ড থেকে পনেবো টাকা সাহায্য দিলে। তাবপবঃ

সবকাব-কৰ্তা আমায় ডেকে পাঠালো। বললে, পৰীক্ষাব ফীযেব জনো ভাবনা কি—আমিই পঞ্চাশ টাকা দেব তোমায়।

এত দয়া।

সাব, এতদিনে বুঝেছি, দয়া শুধু দয়াই নহ , এব পেছনে আব একটা ভয়ঙ্কৰ দাবি থাকে। পৃথিবীতে দয়াব দাম দিতে হয় সাংঘাতিক ভাবে।

ফী দেওয়া হয়ে গেল। তাবপব— এবপৰ এই দু-মাস ধৰে দয়াব ঋণ শোধ কৰেছি।

বিশ্বাস কৰবেন সাবঃ অক্ষ—ফিজিক্স — কেমেষ্ট্ৰী—বাংলা—ইংরেজি কিছু পড়তে পাৰি নি। পঞ্চাশ টাকাৰ বিনিময়ে বাত জেগে জেগে, ছিঁড়েপড়া চোখ আব মাথায় বিশ মন পাথৰেব ভাব নিযে আমি সবকাব কৰ্তাৰ খাতা তৈৰি কৰেছি।

কিসেব খাতাঃ ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবাব খাতা। , গোপন খাতা। পঞ্চাশ টাকাৰ দায় প্রত্যেকটি স্নায় দিয়ে, প্রতিবিন্দু বস্ত দিয়ে আমাৰ মেটাতে হয়েচে। এব পৰেও পড়বঃ আমি তো হতি মানুস নই।

তবু পৰীক্ষা দিতে এসে ছিলাম। তবু আশা ছাড়ি নি। ভেবেছিলাম একটা মিবাকুল যটে যাবে , এই চূৰি কৰে হাত পাবিয়েছি, নকল কৰবাব জনো বইযেব পাতাও ছিঁড়ে এনেছিলাম, কিন্তু মিবাকুল তো ঘটলো না। জামাব তলা থেকে কিছুতেই এক টুকৰো কাগজ আমি বাব কবতে পাবলাম না। ফাস্ট পেপাব, সেকেন্ড পেপাব, থার্ড পেপাব —আমাব চোখেব সমানে সব নোচে বেঙাতে লাগল। শুধু সবকাব কোম্পানিৰ জাল হিসেবেব খাতা ঘূৰপাক খেতে লাগাল মাথাৰ ভেতৰে, প্রত্যেক ছত্রে আব ইন্ভিভিজলেটোৰেব মুখ এক একটা জমা খবচের পাঠাব মতো দেখালো।

এই বাংলাব খাতা আমার শেষ খাতা।

সাব, ওয়ানিং পডল। আব পাঁচ মিনিট পৰেই খাতা কেড়ে নেবে। আমাব কথাও শেষ হয়ে এল। আত সঙ্কোব পৰেই যে কোনো একটা ট্রেনের চাকাৰ তলায় আমার সব মনেব ভাব নামিয়ে দেব।

আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম সাব – আমি স্বাধীনকুমাব, স্বাধীন ভৱতবৰ্ষেব জনো বাঁচতে চেয়েছিলাম , কেন আমি বাঁচতে পাবলাম না, আমাব মতো হাজাব-হাজাব ছাত্ৰেৰ পক্ষ থেকে সেই প্রশ্ন আপনাব কাছে বেখে গেলাম। জবাবটা আপনি ভেবে দেখবেন।

কাপুকযেব মতো আত্মহত্যা কৰছিঃ না সাব—না। এ আমাব পবাজয় নয়—আমাব প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশেব সেপ্টেম্বরে এক প্রলযেব রাত্রে আমাব বাবা দেশেব মাটিতে বুকেব রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশেৰ লক্ষ-লক্ষ ছাত্ৰছাত্ৰীৰ জনো তেমনি একটা ইতিহাসেৰ সূচনা রেখে যাবে। সে ইতিহাস কৰে গড়ে উঠবে আমি জানি না। আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পাবেনঃ প্রণাম।

পুকুরের মুক্তে

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সুবমা আইচ। দু-তিনদিন হয় নিবাপদে ভীমবতি পাব হয়েছেন। বাহাভুরে ধবাব কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা পূর্বনো হবে। এখন, নাকি, তাঁর নিদ্রাযোগ, তাঁর স্বৈচ্ছায চলাফেরা, বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ কবা, যা খায় তাই নাকি অমৃত। অন্যদিকে তাঁকে ভীমবতি, বুদ্ধিভ্রংশ ধরেছে বললে, বলেইতো তার তেমন আত্মীয়স্বজন যাবা ভালো সম্পত্তি থেকে বাঞ্ছিত হচ্ছে, তাবও যেন বা যুক্তিই থাকে, দুই-ই লোকাযত দর্শন।

সুবমাকে ঠাকুমা বলাই সম্ভব হতো, কিংও এখনও সম্ভব হয়, তাব মাঝে কিছু পৰিমাণে সুরমাতত্ত্ব থেকে গেছে, বলে নামটা উল্লেখ কবাবও যুক্তি আছে।

সুবমা ফবসা, বেশ ফবসাই, ববং লালমিশ্রিত সাদা বং, বিশেষ তাঁর গাল, গণ্ড, আব হাতদুখানা যেন এই বঙে অঁকা। তাঁর বাস্তব অথবা পায়েব যতটুকু চোখে পড়ে তাতে ববং হলুদে সাদা মিশানো। কপাল যা বেশ ছোটই এখনও, তা যিবে বোনোটের ফ্রিলেব মতো সাদা চুল, এখনকাব অপ্রচলিত আলবটি ক্যন্দায় উঠ হয়ে আছে। সুবমা বাট, পঞ্চাশটি পর্যন্ত খুবই মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। তাব পবেব এই বারো তেবো বছবে মেদ মাংস থেকে অনেকটা মুক্ত, যদিও এখনও মনে হয়, হয়তো বা বং-কবা মাখনে তৈবি শবীবে কোথাও হাড নেই। বিশেষ কোলেব কাছে একেব উপরে অন্যটিকে গুইয়ে রাখা ছোট ছোট দুধে আলতা হাত দুটোকে যদি দেখা যায়। কিন্তু মোটা মানুষ শবীবেব বোঝা কমিয়ে আনলে, পবে চামড়াটা আলগা থেকে যায়।

এখন তার পরনে থ্রিকোয়ার্টার হাটো, সাদা সমুদ্রনীল ভোবাব নাইট গাউন জাতীয় পোশাক। সমুদ্রনীলটায় বেওনিব ছায়া আছে। সম্ভবে পৌছানোব পব থেকেই সুবমা শাড়ি ব্রাউজ প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। এই গাউনজাতীয় পোশাকওলোয় ক্যামেলা বম। দিনেবাতে বাব দুতিন বদলে নিলেই হলো। গায়ে কাপড় থাকছে কিনা, অঁচলটা ঠিকমতো আছে কিনা ব্রাউজে শাড়িতে ম্যাচ কবছে কিনা, শাখা পবতে ভুলেছেন কিনা, এসব ভাবতে হয় না। সে যাই হোক সাদা কেশাবে যেবা লাল-সাদা মাখনে তৈবি মুখ, যাব একেব বেশি চিবুক, যাব কোলে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হাত দুটি যাতে মাখন যেন গলে যাবে, তাতে বারো বছবেব ডায়েটিং কবার ফলে হুকে কিছু আলগা ভাঁজ হওয়াতে হাল্কা-হলুদেব দাগও আছে। কিন্তু ডায়েটিং একত কমে, সুবমা গত বারো বছরে ভাত ছেড়েছেন, চিনি ছেড়েছেন। সপ্তাহে তিন-চারবাব পচিশ গ্রাম চালের ভাত, দু-চাব টুকবো কাঁটা ছাড়া মাছ-ফাই। আব বাকি সময়ে শাক-সবজি আব দুধ, আব ফল।

সুবমার এই এক সুবিধা, তিনি সাধারণেব চাইতে, বাঙালিনীব হিসাবে, কয়েক ইঞ্চি বেশি। পঞ্চাশ পর্যন্ত, ইঞ্চি আড়াই তিনি গোড়ালির জুতো পরতেনই। তাঁকে সাধারণ বাঙালি পুরুষদেব মতোই লম্বা দেখা যেতো। ডায়েটিং-এ, আর গডনের এই বাড়তি ইঞ্চি কয়েকটির ফলে তাঁকে এখন মোটা না-মনে হয়ে, দোহার মনে হয়, আর এ ব্যাপাবে তাব গাউনের লম্বা স্ট্রাইপগুলোও সাহায্য করে।

এটা সুবমা আইচের লাইব্রেরি ঘর কাম লিভিংরুম। কালো টেবিলটা তাঁর বাঁ হাতের কনুই-এর কাছে। তাঁর মুখটা, জানলা দিয়ে যে হাল্কা হলুদ রোদ, তা থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যেই এভাবে বসা। চোখে সোনা ফ্রেমের চশমা। টেবিলের উপরে অ্যালুমিনিয়ামের কিছুটা বড় আকাবের তকলি। এভাবে বসায় তাঁর পিঠের দিকে দেয়ালে লম্বাটে ধরনের ফ্রেমে একটা রঙিন ফটো। সেকালে, কালার্ড ফিল্মে ছবি তোলার সুবিধা হওয়ায় আগে, এককম সাদা কালো ফটোকে এনলার্জ করাব সময়ে, ফটোর গায়ে রং দেয়ার চেষ্টা করা হতো। ফটোটা চবকা-নিরত মহাত্মা গান্ধীর। ফটোতে মহাত্মার ডাইনে বাঁয়ে যত জমি উপরে আব নিচে সে তুলনায় জমি কম। অর্থাৎ ফটোতে বা পোরট্রেটে যেমন হয় তার উল্টো।

এই ঘরে এবং কখনও কখনও ড্রয়িং রুমেও সুবমা তকলিতে সূতো কেটে থাকেন, বলা যায়, ববীন্দ্রনাথের ১৯২৬-এব সূতো কাটা ও মন কাটা নিয়ে প্রবন্ধ পড়ার পবেও। যখন এই ঘরে তা করেন, তখন তাে তাব পিঠের দিকে চরকা-নিরত মহাত্মাই। আব সূতো কাটাও বটে। তা কিন্তু তুলো থেকে নয়। তিব্বতী উল থেকে। আব সেই পশমী সূতো থেকে ডোলমা কোমবে বাঁধা তাঁতের ক্লার্ফ, জামাব কাপড় ইত্যাদি বুনে থাকে। তা, সে তো ১৯৬০-এব পবে বাপ মা ভাই খুইয়ে আসা এই তিব্বতী মেয়েটা আশ্রয় নেয়ার পর। সেই কুড়ি একুশেব মেয়েটাকে শোকে তাপে অনাহারে শুকিয়ে চৌদ্দ পনেবোর মতো দেখাতো। সেই ঘট থেকে এই প্রায় ত্রিশ বছর তাঁত বোনে, প্রার্থনা করে, কেযাব-টেকার কম্পানিয়ান। বাংলা বলে, গোখালি জানে। ইংরেজিও, কিছু না বললে চলে না। তুলো থেকে পশমে যাওয়াটা ১৯৫৫-তে ঘটেছিল। এখনও তিব্বতী উলই বটে, তা কিন্তু নামে। ১৯৬২ থেকে উলটা আসছে লাদাখ থেকে, কাবণ তখন থেকে চুনি দিয়ে তিব্বতী উল আব কালিঙ্গও এ আগলডুও হচ্ছে না। সে যাই হোক, এটা এককম ব্যাপাব, এই ১৯৮৮-ব গ্রীষ্মেও তকলিতে সূতো কাটা চলেছে, আব তখন মহাত্মাব ফটোটা থাকে ব্যাক গ্রাউন্ডে। কেই বা জানে তা হয়? বোব হয়, এই বাড়িটায় যাবা থাকে, তাদের কথা ছেড়ে দিলে দুজন মাত্র মানুষ এই সাতশ কোটি মানুষেব মধ্যে—বাসবী সেন আব মাধবী মিত্র জানে, দুজনই মাত্র।

আব তাব কারণও আছে। গত যোল সতেব বছবে কমই, খুবই কম সুবমা আইচ কালিম্পঙ এ থেকে এমন কি শিলিওড়িতেও নেমেছেন। ১৯৭১-ই শেষ বছব, যখন মাসখানেকের জন্য কলকাতায় ছিলেন। আব বছবখানেক আগে শেষবার তিনি তাঁব এই বাড়ি থেকে বেবিয়েছিলেন। তা, কিন্তু যোগাযোগেব ফলে, আব তা মাধবী মিত্রেব প্রথম সন্তান খুব সদোজাত মুখ দেখতে। এই ১৯৭১, অবশ্যই, অন্যদিক দিয়েও মনে বাখাব মতো। এসময় থেকেই ডিম মাংস বাদ দেযা, খাদ্যে চিনি চাল কমিয়ে আনা, ফল আব শাকসবজি বাড়ানো। আব সেই বছবেই তাঁব এই বাড়িব এক-তৃতীয়াংশ জমি প্রথম বিক্রি করা। বাগানটাব এবং উপবনের পূব দিকটা ছাঁটা হয়েছিল, ফলে আট দশটা কমলা আব আপেলের গাছ গিয়েছে। কাবণ ব্যাঙ্গ তাব বাড়ি কবাব সময়ে কমলার বা আপেলের দুঃখে ব্যথিত হয় না। সুবমা ব্যথিত হয়েছিলেন। দুতিন বছব সে দিকে তাকাতে পাবেন নি। এখন আবাব সেদিকে ব্যাঙ্কেব দোতলা বাড়িটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই, একেবারে ভোলা যায় না বছব পাঁচেক আগে, বাড়িটাব দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ জমি বিক্রি করাব সময়ে, নতুন ক্ষয়া-ক্ষয়া বোধেব তলায় পুরনো দুঃখটা ওবণ্ডব কবে উঠেছিল। জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে পূব দিকের শেষ আপেল গাছটাব গায়ে ডোলমাব বাঁধা সাদা প্রার্থনা পতাকা দেখতে পেলেন সুরমা। পতাকাটা আপদকে রুখতে থাকে। কিন্তু তা হলেই বা কি হবে? বছর পাঁচেক আগে সে সময়ে দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ বিক্রি করাটাও যুক্তিযুক্ত ছিল। কে এসে থাকবে কালিম্পঙে? অত বড বাগানওয়ালা বাড়িতে তদারক করে? একা ডোলমা কত পাবে? তা ছাড়া জমিটা বিক্রি কবার টাকা ফিকসড ডিপোজিট কবায় তার সুদে বাড়ি বাকি অংশের তদাবক হচ্ছে, সংসাবও, আগে যেমন ছিলো, সেই স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে যাচ্ছে।

কে এসে থাকবে কালিম্পঙ-এ? তা ছাড়া, তখন ৮১-৮২-তে বিক্রি কবে ভালোই হয়েছে। এখন এই গোখা ন্যাশনাল ফ্রন্ট-পর্বে কে আর জমি কিনছে বাড়ি কবতে? বাড়িটাড়ি করার মধ্যে ফ্যাশানের ঝোঁকও থাকে। বাঙালির কাছে কালিম্পঙকে ফ্যাশানে এনেছিল ববীন্দ্রনাথের বাড়ি। রবীন্দ্রনাথের পরেও ফ্যাশানটা কিছুদিন ছিল বৈকি? নতুবা ৪৮-৪৯-এ ইংবেজ প্লান্টার্সদের এ ক্লাবটাকে শস্তায় পাওয়া গেলেও শস্তাটাই একমাত্র যুক্তি ছিল না, সুবমা আইচের তা কেনা। বলবে, অনেকটা জমি সঙ্গে ছিল? তা হলে, বলতে হয়, ১৯৩৯-৪০ থেকেই কেন সুবমা, খোলা বাতাসে দম নেয়াব ইচ্ছা হলোই, দার্জিলিং, কাশ্মিরাং-এ, অথবা মধুপুরেও না গিয়ে, কালিম্পঙ-এ আসতো, এখন, অবশ্য, কালিম্পঙ আব ফ্যাশানে নেই। সুবমা আইচের মতোই?

এখন সুবমা জানেন, মানুষের কাজকর্মের মূলে একটাই পবিষ্মাব কাণ থাকে না, ববং কারণগুচ্ছ থাকে, যার এক একটিকে এক এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, আসল কাণ মনে হয়। সব বাপারেই তাই।

কে এসে বাড়ি কববে, কে এসে থাকবে কালিম্পঙে, যখন তা আউট অফ ফ্যাশান? আব যখন চারপাশের গোলমাল অস্থির কবে তুলেছে? যখন সুবমা ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে বলা যেতো, শিলিগুড়িতে নামার পথটা বিপজ্জনক বলেই তাঁবা গর্তে বন্দী? হোলড আপ।

সুবমারই প্রথম সন্তান, বড় ছেলে, যাব এবার পঞ্চাশ হলো, যে বাইটার্সে থাকে বিটায়ারমেন্টের হিসাব আব প্রেশারকে খাতিব করতে চলতে হয়। এবার যাব সৌত্র জন্মেছে, যাকে ছোটমেয়েব বিয়ে দেয়াব উদ্যোগ করতে হচ্ছে, যে বালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে থাকে, আব সপ্টলেকেও জমি নিয়েছে একটা নতুন ধবনের বাড়ি কবতে, সেও দম নিতে ববং পুঁবা ভুবনেশ্বর, তেমনি পুনো মধুপুরও পছন্দ কবে, না কি দারজিলিং-কালিম্পঙে কলকাতাব সেই গণ্ডির—সেই পুরনো মুখগুলোকেই বর্শ কবে দেখা যায় বলেই বড পুত্রবধূব আপত্তি?

এক সুবমাব কন্যা বাসবী সেনেব কিছু মায়া থাকলেও থাকতে পারে সুবমাব এই বাড়িটায়। সেও পঞ্চাশেই প্রায়। সবকাবি কলেজে জিওগ্রাফিব প্রফেসর। এটা তাব কর্তব্যও হয়তো, যে সে তার মাকে দেখতে কোন কোন পুজোর ছুটিতে শেষ দিকে কালিম্পঙ-এ আসে। অন্যান্য ছুটিতে অবশ্যই তাকে স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে অন্যান্য জায়গায়, পবিবারেব অন্যদের পছন্দমতো, বাতাস নিতে হয়। কিন্তু এবারের আসাটা একটু অন্যবকমই হয়েছে। তাব পবিবারেব কেউ কেউ এই আন্দোলন আর গোলমালেব ভয় দেখিয়েছিল। আব তার যুক্তিও কি নেই? কিন্তু বাসবী সেন, বোধ হয়, আন্দোলনটার সাময়িক ভাটাকে থিতোনো জল মনে কবে কালিম্পঙ-এ এসেছিল। সেরকম সে তাব পবিবারকে বুঝিয়ে থাকবে। কিন্তু ভাটাকে থিতোনো জল মনে কবলে ভুলই হয়। সে এখানে আসার দিন দশেকেব মধ্যে আবার জোয়াবই তো এখন। ডাক ছাডছে।

অবশ্যই, বলা যায়, বাসবী সেনেব সঙ্গে এই বাড়িটার পরিচয়, তার যদি উনপঞ্চাশ হয়ে থাকে এখন, অন্তত চুয়াল্লিশ বছরেব। সেই ১৯৪৪-৪৫ থেকেই তো, যদিও সন্তরেব দশকের শেষ থেকে যোগাযোগটা ক্রমশ কমে আসছে। কেননা মিস্টাব সেন বছর পঞ্চাশে পৌছে যেতে না যেতে, সংসারটা, বাজার-হাট করা, হিসাব রাখা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, মিস্টার সেনকে ডাক্তার দেখানো, বাৎসরিক ভ্রমণ, সবই বাসবীর হাতে এসে পড়েছে। উপরন্তু সন্তকাবি কলেজে ক্লাস নেয়া, পবীক্ষার খাতা দেখা, এসবও।

আন্দোলনের ভাটাকে থিতোনো জল মনে করাই নয়, সঙ্গে আবার কন্যা ও দৌহিঁত্রীকে নিয়ে আসাও, সাতাশ আটাশের মাধবী মিত্র আব এক বছরেব খুকুকে সঙ্গে আনা। এমন নয় বাসবী 'চল চল' বলেছিলো। মাধবী তার অ্যালায়েড পার্টিসেনের চাকরি, যা নাকি এক্সেলজি ও অ্যাক্টিপলিউশন বিভাগে, মাসখানেকেব ছুটি নিয়ে কোথাও যাবো যাবো কবছিল। বাসবী কালিম্পঙ-এই যাচ্ছে শুনে বলেছিল, আমিও যাই না কেন?

কেন? এখনও এসব অঞ্চলে পলিউশন কলকাতা থেকে কম? অথবা আটান্তরের কাছে এলে কেউ দর্শনীয় হয়ে ওঠে? নাকি মানুষ-মানুষীর মধ্যে আর্কিওলজিব একটা স্পৃহা থেকেই যায়? অথবা, বলা কি ভালো, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দিশেহারা জাতিগুলো শিকড় খুঁজতে পূর্বনোকে খুঁড়তে খুঁড়তে এখন তাকে ফ্যাশানেবল করেছে? যদিও হয়তো আর্কিওলজি কখনও কখনও আর্টিফিকোলজি। কেননা নালন্দার মতো কিছুকে মাটির তলা থেকে মুক্ত করে, ঘাম চোঁছে, বন উড়িয়ে দিয়ে যা সূর্যের আলোতে প্রকাশ করা হয়, তা এক মকভূমি ও সিবাজ মাত্র, যা পূর্বনো ইঁটের ধুলো উড়ায় বাতাসে বাতাসে। আব পেট্রোল ও ডিজেলের অটোমোবাইল সেই পলিউশনকে বাড়াতে থাকে।

তা বলে, অবশ্য, মাধবী সুবমাকে মহেঞ্জোদরো মনে কবে না। ববং সেই ১৯০৯-১০ থেকে এই '৮৮ নাকি সেডিমেন্ট পড়ে পড়ে বুজে আসা চিন্মা? যা এখনও প্রাণের আশ্রয়? সূর্যের আলো ধবে, ছোট ছোট ডেউ ওঠে?

তা তো বটেই। যেমন মাধবী ভাবতে পাবে, ১৯৫০ থেকে এম এল সি অথবা এম এল এ. একবার মন্ত্রীও দু'তিন বছর বেল জনা, তাবপব ১৯৬৩ থেকে ১৯৮৮— এই পঁচিশ বছর এখানে, এই বাড়িতে, এই কিছু পরিমাণে লিকেনযুক্ত গাছে ঢাকা হেজেব আড়ালে গ্রে-বঙে বং-কবা বাড়িতে। কে আব খোঁজ নিতে আসছে সেই একসময়ের এম এল এ, এম এল সি, মন্ত্রীও? একটা করে পর্যায় পাব হওয়া, বলা হবে? পঁচিশ বছর ভুলে যাওয়াব পক্ষে যথেষ্ট সময়। ষাটের দশকে যাবা জন্মেছে, কলকাতায় অথবা অন্য কোন জেলায়, পূর্বব কিংবা স্থীলোক, তারা কি নামই শুনেছে, যে মনে বাখাব কথা উঠবে? কেমন লাগে না ভাবলে? নাকি হাসি পাবে? এই ভানিটি, এই অসাবতা, মানুষের ইচ্ছাব দেখে। সে সময়ে এম এল সি, পবে এম এল এ, পবে মন্ত্রীও, এসব বলে দেয় তাবও আগে, সেই কতদিন আগে থেকে, আন্দোলন ইত্যাদিতে যুক্ত হওয়া, শব্দ হয়ে দাঁড়ানো এসবও থাকে। তাবপবে এই পঁচিশ বছর। বোধ হয় জার্নালিস্টবা, যাবা এসব ব্যাপাবে খবর-টবর বাখে, আচমকা ভিজ্ঞাসা করলে, মাথা নেড়ে, চোখ বিষন্ন কবে, ভিভে টাকবায় চুক চুক কবে, বলে বসবে, 'আহা, ঠিক মনে হচ্ছে না, বোধহয় আশিব গোড়াতেই—'। সবজান্তা হয়ে জানে না, তাব চেয়ে মৃত্যু হয়েছে এবকম আন্দাজ ছড়ানো ভালো।

জানলাব পর্দা দিয়ে আলোটা হলুদ ছায়া হয়ে পড়ছে, কেননা, পর্দাটা চিকনের কাজ কবা লাভেস্তার বং মসলিন। সেই ছায়ায় চিকনের কাজ পত্রলেখাব মতো। সুবমাব শবীবের বাঁ দিকটায় সেই বোদ। মুখটা ডানদিকে যোবানো থাকায় চশমায আলো পড়ছে না, আব সেই হলদে ছায়া, যা টেবলটাব উপব দিয়ে একটা লম্বা ত্রিভুজ, তাব এ-পাশে সুরমাব সেই লালচে সাদা বং আব সাদায সমুদ্রনীরের স্টাইপ গাউন, সেই ত্রিভুজটাব সহযোগিতাতেই বেশ স্পষ্ট। চেয়াবটা হুইল চেয়াবের গডনে। এয়ার-বাসের মতোই কল টিপে পিঠটাকে নামিয়ে দিয়ে আবামকেদাবা কবা যায়। সন্দেহ হয়, ঢাকা লাগিয়ে নেয়ার বন্দোবস্তও আছে।

সুরমার ডানদিকে জানলাগুলো থেকে কিছু পিছিয়ে বসে বাসবী সেন। লিলাক উল দিয়ে কিছু বুনছে। সে, তার এই প্রিয় পঞ্চাশ বছরে, নবম আলো পছন্দ কবে। বিবোধী পক্ষ বলতে পাবে, পঞ্চাশের যে আঁকিবুকি মুখে তা ইতিমধ্যে উজ্জ্বল আলোতে ধবা পড়ে যায়, কারণ সে হালকা মেক আপ ব্যবহাব করে, যেহেতু সে অধ্যাপিকা। সে নিজে, কিন্তু, তাব অতি-পড়ুয়া চোখ দুটোকে উজ্জ্বলতা থেকে আড়ালে রাখতে চায়, পোলারয়েড হলেও চশমাব কাছে ধ্রোাব-লাগা সে ভালো মনে করে না। বেশ ফর্সাই সে, আর তার সাদা-বাদামী বুটি শাড়ি এখন ঢিলে-ঢালা করে পরা। বেশি জড়িয়ে পবলেই বরং ক্লাইম্যাকটোরিক প্রসূত বিবর্ণস্থলতা চোখে পড়াব সম্ভাবনা। সে তো কিছু ভাবছেই, ঠোট দুটো নড়ছে অতি মৃদুভাবে। সে ভাবনা, একবার এক বছর হতে চলে দৌহিত্রী যে এখন দোলনায় ঘুমাচ্ছে তাকে নিয়ে, অন্যাবার এরকম চারপাশের

এই আন্দোলন যে রকম বেড়ে উঠলো, নাকি বামপন্থীদের মতো একদিনে বনধন্য, একলাগাড়ে একশ দিনের বনধ, একশ দিনে তিন মার বেশি হয়ে যায়, কি করে বা মাধবী আব তাব খুককে নিয়ে নামা যাবে? ব্রেকফাস্টের পবে, এবকম সময়ে, এমন থিব হয়ে বসলে, মাঝে মাঝে তার ছোট ছোট হাই ওঠে, আর তাকে হাতের পিঠ ঠোঁটের সামনে রাখতে হয়।

আবও ডাইনে আরও পিছিয়ে মাধবী, সেখানে অনা দেয়ালের জানলা দিয়ে আলো। তিনজননের চেয়ারের অবস্থানকে যোগ করলে বরং এক বিষমকণী ত্রিভুজ হতে পারে। সে আগের দিনের কাগজটাকে পড়ছে। আগের দিনের বলতে কিন্তু ঠিক আগের দিনেব ভোব ভোব সময়ে কলকাতার ফুটপাথে বেরোনো কাগজ নয়। আগের দিনে তাদের হাতে পৌঁছানো কাগজ। কলকাতায় বেরোনোব পবে তিন চারদিন হয়ে যাচ্ছে কাগজটা তাদের হাতে পৌঁছাতে। মন্দের ভালো, ডাক আনায যে বাস শিলিওড়ি যাওয়া আসা করে, তাব ডাইভার শিলিওড়ি থেকে কাগজটাকে এনে দেয়। আব ডোলমা সেই বাসের ডাইভারব বাঁও থেকে কাগজটাকে নিয়ে আসে। একটা সুবিধা তো বটেই, খবরগুলো পুরনো হয়ে আসে বলে স্নায়ুতে ধাক্কাটা কম দেয়।

অবশ্য কাগজে এখনকার কথা যা লিখছে তার অনেকটাই শিলিওড়িতে পাওয়া ওজব, আব নতুবা পুলিশ যেটুকু বলেছে। আব তা ছাড়া, কাগজে কখনই এব অ্যাটি-পলিউশন ডিপার্টমেন্টেব সম্বন্ধে কোন সংবাদ থাকবে না, যাতে তার আও উৎকর্ষকে বাড়ায় কিংবা কমায়। সে ইতিমধ্যে পনেরো দিনেব দুটি বাড়ানোব দবখাস্ত পাঠিয়েছে। কর্তাব প্রশ্ন কবতেই পারে, কালিম্পঙে যাওয়াটা এসময়ে যথেষ্ট বিবেচনার কাজ হয়েছে কি? সে কাগজটাকে মুড়লো, আব ভাবলো, দেখা যাক, আত্র আবাব কোন তাবিখেব কাগজ আসে, আসে কিনা।

সে বরং ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকালো। কেমন লাগে না ভাবতে, সেই কতদিন আগে এই কাঠের দোলনাটা নাকি তাব জনা যোগাও হয়েছিল? অন্তত ছাব্বিশ সাতাশ বছর আগে। হ্যা, তাব মেয়ে তাব থেকে ঠিক সাতাশ বছরব ছোট। সে দিক দিয়ে সে নিজে বরং তাব মায়েব কাছাকাছি। বাইশ বছরব ছোট হতে পারে সে। তখন তো, তাব মা নিজেই বলেছে, এম এ পবীক্ষার ফল বেবোচ্ছে মাত্র। সে জিজ্ঞাসা কবেছিল, সে অবস্থাব পবীক্ষা দিলে কি কবে? আব এসবই সেইবকম আলোচনার সময়ে, যখন ইঠাং মা মেয়েতে খুব খোলাখুলি পবামর্শ দেযাব মতো এক অবকাশ হয়। বাসবী বলেছিল, তুই তো কনফার্মড হয়েছিলি চাকবিতে, এখন আব তা হলে—ত্রিশ বছরব এ পাবেই কিন্তু প্রথমটা ভালো। মানুষ হয়ে যায় ঠিকই। সে দিক দিয়ে বরং তার মা আর তাব মাযব বয়সের তফাৎ সব চাইতে বেশি। প্রায় ত্রিশ বছর।

আব তারপরে, দেখো, তাবও দশ বছর বাদে সেই এম এল সি হওয়া-টওয়া। আব তা প্রমাণ করে, ছেলেমেয়ে হওয়া-টওয়া, আন্দোলন, পার্টিব কাজ এসবের ফাক-ফোকরে। মাধবী ভাবলো, দিদিমাকে একবার দেখে নিয়ে। দেখলে কিন্তু তুলনা দিতে ইচ্ছা কবে। কি বলবে? বাইবে উতুঙ্গ গরম আন্দোলনেব, কাগজে উতুঙ্গ গরম সরকারেব বিবৃতির। কে দেশপ্রেমিক বেশি, তা ভোটারদের কাছে প্রমাণ কবতে একদল আর এক দলকে কিছু বলতে বাকি রাখছে না। অথচ, দেখো, রোদের ওই ত্রিভুজটাব পাশে, কিছুই কিছু নয়। অথবা, বোধহয়, ওঁব সেই ডায়েরির মতো। মলাটটা সোনারি রং খদ্দের কাপড়ের, কিন্তু ধুলো পড়ে পড়ে তাব ভুলে-যাওয়া বং ময়লাটে, ধূসর। কি রকম কাগজ ছিলো কে জানে। এখন বয়সে হলদেটো। ৩৯-৪০ দু'বছরের ডায়েরি। কি নেই তাতে? রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মত, মহাত্মা গান্ধীব ত্রিশের দশকের আন্দোলন-সম্বন্ধে মত, বাজারের হিসাব, নিজেব পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভল্পনা, কোন একটা পারিবারিক ঘটনা যা যেন স্নায়ুকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছিল, একটা ট্রাজেডির মতো যার পদসঞ্চারণ, যা অবশ্য এখন মনে পড়তেই চায় না,—এককথায় ভুলে-যাওয়া ডায়েরির বিবর্ণ মলাটেব মধ্যে একটা উষ্ণ সতেজ, জীবন চিরস্থায়ী অপরিবর্তনশীল হয়ে থেকে গিয়েছে। অথচ যার

জীবন তো বদলেছেই। প্রমাণও দেখা যায়, ভাবলো, মাধবী সেই আন্দোলন, তাব কেন্দ্রেব কাছে যাওয়া। এম এল এ মন্ত্রী ইত্যাদি হওয়া, একটা ছিঁচটিত্রেব মতো যাব এপারে গত পঁচিশ বছর ধরে জীবনটা বদলেছে, হয়তো তাব বেকার্ড বাখা হয় নি। কিংবা, বলবে কি জীবনটাই একটা শ্রোত, যাব মূল প্রবাহ বয়েই চলেছে, বয়েই চলেছে, তাব এ-বাঁক ও-বাঁকেব থেকে পছন্দ-কবা কোন বাঁকেব চিত্র হতে পারে সেই ডায়েরিব সুবমা ?— যেন অলিখিত উপন্যাসেব এক চরিত্র যাব কাছে নিজেব মত, নিজেব পছন্দ অপছন্দের খুঁটিনাটি, ব্রাউজের কাপড়ের বং আব টেকসচাব, কোন এক মাসিমাব অতি হাল্কা অসূয়া ধবা পড়াব ঘটনাটাও একান্তভাবে নিজের জ্ঞান লিপিতে বন্ধ কবাব মতো গুরুত্বপূর্ণ যেন, সেই সবই আসল জীবন, যাব বাইবে যা সব ঘটছে, সমাজে, বাজনীতিতে, সবই সেই জীবনের পটভূমি, ব্যাকড্রপ। অথচ বাইবেব সেই সব ঘটনা যা সমাজের আব বাজনীতিতে ঘটতে থাকে, তাবই সাড়ম্বর ইতিহাস লিখে বাখে অন্য অনেক। অন্য তুলনাও নেয়া যেতে পারে। জীবনটা যদি সমকেন্দ্রিক কতগুলো বড় থেকে ছোট বৃত্ত হয়ে থাকে, তবে সমাজ, আত্মীয়-স্বজন, বাজনীতি। বড় বড় বৃত্ত থেকে ক্রমশ ব্যক্তিগত ছোট বৃত্ত, যাব কেন্দ্রেব একেবারে কাছে ঘনিষ্ঠ বৃত্তটি তো নিজের শরীর, অন্তত মেয়েদের পক্ষে আব শরীরজাত ছেলেমেয়ে। আব একটি ছায়াও যেন সেখানে ভাসতে থাকে। সোটা অবশ্যই সেই ছেলে কিংবা মেয়েব জনক। সেই ৩৯-৪০' এব ডায়েরি যদি কেন্দ্রেব কাছাকাছি কয়েকটি বৃত্ত হয়ে থাকে, যাতে যেমন ধরে ববীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজিব সম্বন্ধে একেবারে ব্যক্তিগত মত, তবে একটা অ্যাক্ষেপাবই যেন তাব কেন্দ্রেব কাছে ভাসতে থাকে যেন ডায়েরি-লেখিকাব শরীরে ছায়া ফেলে ফেলে।

কিন্তু ডোলমা কাগজ নিয়ে এলো। আব তা দেখে বাসবী বেলা এগাবোটাব চা কবতে উঠল। মাধবী কাগজটাকে হাতে নিয়ে তাব দিদিমা সুবমাব দিকে হেঁটে গেলো। সুবমা কাগজের বড় বড় অক্ষরে হেডলাইন তাব সাব হেড পড়ে নোবেন নিজে নিজে, পরে চা এলে মাধবী পড়ে শোনায়ে ছোট অক্ষরে যা কিছু ছাপা। কখনও কখনও সবমাত্রা তাঁব উল্লেব তকলি হাতে নোবেন সংবাদ গুনতে গুনতে। এমনকি কোন কোন দিন ডোলমাও এসে কাঠেব মেঝেতে বসে যায়। বাসবী, সে তো তখন কাছেই, তাব সেই লিন্যাক উল বুনতে বুনতে কান পাতে। তাবও কি চোখকে আবাম দিতে লোভ হয় ইতিমধ্যে। হতে পারে। মাধবী দেখেছে বাসবী প্রযোজন না হলেও, পিঠেব নিচে কুপন ওঁড়ে দিলে থাঙ্কস বলে। এ ব্যবস্থা অবশ্যই বাসবী আব মাধবী এখানে আছে বলে। তা না থাকলে ডোলমাই পড়ে শোনায সংবাদ। কাজেব ফাঁকে ফাঁকে, কাজেই খুঁটিয়ে পড়া হয় কি ?

দাদিৰ দিকে যেতে যেতে কাগজে চোখ পড়লো মাধবীৰ। প্রথম পাতাব খবরই তো। একটা হাল্কা লাইনেব বন্ধ কবে। বস্ত্রেব চারিদিকে কালো গরম অক্ষরে প্রধানমন্ত্রীর সিবিয়া ভ্রমণ, আইপি কে এফের প্রথম দলেব লক্ষা থেকে সরে আসা, এসপিপি সি'র হুজুর, জি এন এল এফেব নেতাদের বক্তব্য। বস্ত্রেব মধ্যে ছোট হেডিং ১৪৪ ধাবা জাবি বিদ্যাসাগর কলোনিব পুকুরে। বস্ত্রটাই যেন পুকুর যাতে মুক্তো-মতি। মাধবী হেসে ফেললো। তাব চারদিকেব উদ্ভাপের মধ্যে বস্ত্র পুকুরটা ঠাণ্ডা বটে।

ক'দিন থেকেই সংবাদটা। দু'দিন আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াব এক হোমরা চোমবা বলেছিল, সেই পুকুরের মুক্তো জেনুইন, খাঁটি মুক্তো। তাব আগের দিনের খবরে পুকুরের বিনুকে মুক্তোর গন্ধ আর ছবি কাগজে দেখে বেশ হাসাহাসি হয়েছিল। জিওলজিক্যাল সার্ভের সেই অফিসাবের বিবৃতি পড়েও প্রথমে হাসাহাসির পর, বেশ একটা বৈজ্ঞানিক ধবনের আলোচনাও হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক কথাবার্তাই, কিন্তু হালকা মেজাজে। আর্টিফিশিয়াল রুবিব মতো, আমেরিকান ডায়মন্ডের মতো, মুক্তো বলে ভুল হয় এমন পুঁতি-মুক্তো আছে, যাব হাত, গলা, কানের সেট তিন চারশ'তেই পাওয়া যায়। জাপানি কালচার্ড মুক্তো আছে। বিনুকের

জলে কেমিক্যাল ছেড়ে বিনুকের ভিতরে একরকম মুক্তা তৈরি হয়ে থাকে। এটাই কালচার। একে কি জেনুইন বলবে না? কেননা, এটা তো ফাল্গুরিতে তৈরি হচ্ছে না। তা যদি না বলো, শরীরের বাইরে ফার্টলাইজড করা ওভাম প্রেস করে যা, তাকে কি জেনুইন মানুষ বলবে না? হাসতে হাসতে হঠাৎ অবাক হয়ে গভীর কিছু অনুভব করতে হয় যেন। মানুষ মুক্তার কেমিক্যাল গঠন জানার আগেও সমুদ্রে মুক্তা হতো। তাকেই কি একমাত্র জেনুইন মুক্তা বলা হবে। অন্যদিকে দেখো, তারা, দিদিমা, মা, মেয়ে, তিনজনেরই সন্তান থাকায়, ইশাবা মাত্রেই অনুভব করেছিল বিনুক ও মেয়ে মানুষে একটা মিল আছে।

ডোলমার সাহায্যে বেলো এগাবোটার চা নিয়ে ফিরলো বাসবী অধ্যাপিকা।

চা পর্যন্ত এটা ওটা গল্প চলবে। ডোলমা পাত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে গেলে, লাঞ্চ পর্যন্ত তকলি, নিল্যাক উল বোনা, আব কাগজ পড়ে শোনানো। বাসবীও শোনে মাধবীর কাগজ পড়া। তার হাতের কাঁটা দুটো চলতেই থাকে। এটা তেমন ব্যাপারই। পিঠ এখনও দুর্বল হয়নি, কিন্তু মাধবী লক্ষ্য করবেছে, পিঠেব কাছে কুশন গুঁজে দিলে খুশিই হয়, খ্যাঙ্ক্স বলে, এই ক্লাইম্যাকটেরিকের মুখে।

চা ভিজতে ভিজতেই কাগজের কথা উঠে পড়লো কিন্তু।

মাধবী হাসতে হাসতে বললো, — দেখো, কাণ্ড, একশ চুয়াল্লিশ পর্যন্ত জাবি কবতে হচ্ছে।

কোথায়? এখানে, পাহাড়ে, তা তো আছেই। —সুবমা মুখ তুললেন।

—বিদ্দেশগবে।

কি সাগর? ও। কেন? সেখানে কি পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরি কবছে কোন মেয়ব. না ভেড়ি দখল হচ্ছে, —আচ্ছা, মানু, তোর কি মনে হয় এটা ববিচাকুবকে আবিষ্কার কবাব মতো? ফ্যাগ ট্যাগ নিয়ে জলুস মোর্চা করে বিদ্যাসাগরকেও আবিষ্কার কবা নয় তো? বাসবী হেসে বললো, —এটা তোমার রাজনৈতিক বিদ্বেষ, মা, বামফ্রন্ট এই মুক্তা আবিষ্কার কবাচ্ছে না।

মাধবী বললো, —দাদি, তোমার কি মনে হয়, পরে বলা হবে, বামফ্রন্টের আমলেই পশ্চিমবঙ্গের পুকুরে মুক্তা হলো?

হাসি চেপে সুবমা বললেন, —সিম্বলিজমের ব্যাপার নয় তো? কেউ কেউ হয়তো বোঝাতে চাইছে সেই কালের পেটে একটা মুক্তা জন্মেছিল, সে বিদ্যাসাগর।

বিউটি, দাদি। কি অ্যালার্ট তোমার মাথা এখনও। আবাব বিষে দেয়া যায়।

যায় বুঝি? তোব মেয়ের বাপের সঙ্গে?

চানাড়তে নাড়তেই টেবিলের কাগজটায় চোখ পড়লো বাসবীর। সে বললো, —শুধু একশ, চুয়াল্লিশ নয়। ওই দেখ আজও জি এস আই-এর আর এক মত। এই বোধ হয় হাইআব অফিসাব বলছে, পুকুরেব মুক্তাকেও জেনুইন বলতে হবে। এগুলোব দামি হওয়াও যুক্তিযুক্ত হবে।

সুবমা বললেন, —আগে একদিন বলেছিল, ওই জি এস আই-ই, বড়জোব বারো চোদ্দ টাকা দাম হতে পারে।

বাসবী হাসিমুখে বললো, —হয়তো ভিড় দূরে রাখতে বলেছিল। তাতে ঠেকেনি বলে একশ' চুয়াল্লিশ।

সে চা জেকে প্রথম কাপটা সুরমাকে এগিয়ে দিলো, মাধবীর কাপে দুটো কিউই, নিজের কাপে একটা কিউব দিয়ে, নাড়তে নাড়তে ডোলমাকে, টি-পট দেখিয়ে বললো, —আমাদের আর লাগবে না, তুমি তোমারটা করে নাও।

দু একবার কাপে চুমুক দিয়ে সুরমা বাসবীকে বললেন, —আচ্ছা, বাবী, মুক্তো হারটা কি এবার তোর গলায় কখনও দেখেছি? আজকাল কি এখনও পরছিস না? এখন তো তোর পঞ্চাশ হয়— সোনার বদলে ওই একটা পরলেই সব গহনার কাজ হয়ে যায়।

বাসবী হাসলো। বয়স তার পঞ্চাশে পৌঁছাচ্ছে বটে, তাব গাল এখনও লাল হয়, কোন কোন হাসিতে। একটা ছাড়া অন্য দাঁতগুলো সমান, সুন্দর, সাদা। সে বললো, —অত চকচকে অমন একটা কি প'রে থাকা যায়? ওটা পরে ক্লাসে যাওয়া যায় না, কারণ ওর জন্যই অন্য রকমের পোশাক পরতে হয় যা ক্লাসে চোখে লাগবে। পরে পথে যাটে বেরোনো যায় না, পাছে জেনুইন ভেবে হামলা করে। নেমস্তন্ন পাটিতে পরলে লোকে ভাবতে পারে এক সাধারণ প্রফেসর, নিশ্চয়ই আসল মুস্তা নয়। খেলো হতে হয় না?

তোব নিজের কি সন্দেহ আছে? যাচাই করে দেখলে পারিস। বাবী, জামাই ওটাকে খেলো ভাবেনি তো?

বাসবী বললো, — তোমার জামাই বলেন, তাব স্বপ্নের তত বড় অ্যাডভোকেট ছিলেন না যে একটি সুন্দরী মেয়ে জন্মেছিল বলেই মেয়েব মাকে তেমন নিখুঁত জেনুইন মুস্তোহার উপহার দেবেন। হিসেবি লোক ছিলেন। একটা হাবে অত টাকা না আটকে স্ত্রীকে বরং কোম্পানিব কাগজ কিনে দিতেন। স্যাকবার কাছে নিয়ে গেলে, সে যদি বলে নকল—

এই সময়েই মাধবী দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ কবে ফেললো, সে এক মুহূর্ত আপন মনে হাসলো, সঙ্গে সঙ্গে বললো, —রসো। চা শেষ কবে ফেলো না। একটা মজাব জিনিস পেয়েছি। মনেই ছিলো না সকালে বলতে।

হেসে সুবমা বললেন, — তোব মনে থাকবে কি? সব সময়ে ভাবহিস, কখন রাস্তা খুলবে, আব না তজামাইয়ের কাছে যাবি।

মাধবী বললো, —আহা। আব চাকবিটা বুঝি কিছু নয়। বসো আনছি।

মাধবী সেই লিভিংরুম থেকে তাব শোবাব ঘবে গেলো। এই শোবাব ঘবটাকে, যা এই লিভিং রুমেরই একটা চওড়া ঝুল বাবান্দা ছিলো, এবাব মাধবী পছন্দ কবেছে পুর্বের আলোব লোভে। শোবাব ঘবের একটা আলমারি সে গোছাচ্ছিল, কালই, ইঁদুব তাড়াতে। তাতে সে একটা কাসকেট পেয়েছে। দেখলেই মনে হয় কোন নেকলেসের হবে। নীল ডেলভেট ধূলোয় বিবর্ণ, কিন্তু ফ্রেমের ফ্রেমিয়াম বেশ উজ্জ্বল। অকেজো বলে ফেলে দিতে গিয়ে মাধবীর মনে পড়েছিল। এ বাড়িতে দু'—একবাব কোন কাসকেট নিয়ে কথা হতে শুনেছি। অবশ্য কাসকেট একটা বাড়িতে কতই থাকতে পারে। কিন্তু এই কাসকেটটাব ছিমছাম শক্তপোক্ত গডন তার সেই স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিছুক্ষণ পবে তার মনে পড়েছিল, দিদিমা সুরমাব প্রায় পঞ্চাশ বছরের পূর্বনো এক ডায়েবিতে একটা কাসকেটের কথা আছে। ডায়েবিতে বাংলায় সি কে টি বলেই উল্লেখ, একবাব বোধহয় কাসকেট শব্দটা ইংবেজিতে ব্যবহাব হয়েছে। তাব তখন এবকম মনে হয়েছিল, এটাই কি সেই ডায়েবির কাসকেট? এখন তো মুস্তোহাবের কথা হচ্ছে। তা, বোধহয়, হয় না, এটা কখনও কোন মুস্তোহাবের কাসকেট ছিল?

মাধবী দু'—এক মিনিটেই কাসকেটটাকে নিয়ে ফিবে, টেবিলে বেখে সেটাকে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, —দাদি, দেখো, এটাব কথাই কি তোমাব ডায়েরিতে। তা আব হতে হয় না।

কোনটার কথা? ডায়েবিতে? কি আছে তাতে?

বাব, তোমার স্মৃতিকে জাগিয়ে দেব?

বাসবী চায়ে চুমুক দিয়ে মাধবীর দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হলো। কিছু না বলে, যেন কি বলা যায় ভাবলো।

মাধবী বললো, — সোজা কথায়, শিলিগুড়ি স্টেশনে কালিম্পঙব সেকালে সেই ছোট গাড়িতে বসেছিলে তুমি। তখন সেই লম্বা, রোগা, রক্তহীন ফর্সা বাঙালি সি কে টি সাহেব তাকিছুকি করতে করতে তোমার কামরাতেই উঠে পড়েছিল।

বাসবী হাত বাড়িয়ে কাসকেটটা নিলো। বললো, —আরে। এটা কোথায় পেলি, এতদিন পরে?

মাধবী বললো,—বারান্দাব ঘরের আলমারিতে।

কাণ্ড। বাসবী সলজ্জভাবে হাসলো,— তা হলে এখানে ছেড়ে গিয়েই আব মনে কবতে পারিনি। হারিয়ে গিয়েছে ভেবেছিলাম।

সুবমা বললেন,—ও সেই সি কে টি?

মাধবী হেসে বললো,— তোমাকে মনে কবিয়ে দিচ্ছি সি কে টি'তে কাসকেটই হয় না শুধু কাবো নামও হতে পারে ববং।

সুবমা বললেন,— সে সম্ভবত এক স্বদেশী ডাকাত ছিল।

কাসকেটটা কি লুটের মাল ছিল?

লুটের হতে পারে, নিজের মায়েব বাস্র থেকে সরানোও হতে পারে। আসলে স্টেশনে অত পুলিশ দেখে ভড়কে গিয়ে ভেবেছিল, তাব খোঁজেই পুলিশ। অথচ বলেছিল, কাসকেটটাব জন্য গুণাবা তাড়া কবেছে।

মাধবী বললো,— সে আমি পড়েছি। কাসকেটটাকে তোমাব হান্ড ব্যাগে কিছুক্ষণ বাখতে বলেছিল আর তুমি কিছু বলার আগেই সে নিজের ঝোলা থেকে কাসকেটটাকে তোমাব সিটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে নেমে গিয়েছিল। আব তুমি—সুবমা বললেন, কত আব বুদ্ধি হবে? সাতাশ আটাশ বছরের এক যুবক তো। ভেবেছিল ওটা সঙ্গে থাকলে বামাল সমেত ধবা পড়লে কোন যুক্তিতে খালাস পাবে না। আব আমি ধরা পড়লে পুলিশকে বলতে পারবো নেকলেসটা আমাবই।

মাধবী বললো,—তুমিও, দাদি, তখন আটাশ উনত্রিশের যুবতী। তাকে বয়সেব দকন অত বোকা খোকা বোঝাতে হবে না। ধবা পড়োনি ভাগ্য। সে কি আব কখনও খোঁজ কবেনি? না কি তোমাকেই আব খুঁজে পাযনি। কাসকেটটাকে তুমি হ্যাণ্ড ব্যাগে বেখে নিপাত্র?

বা, তা হবে কেন? অত দামী। যাব জন্য স্বদেশীদের জেলে যাওয়াব বিস্র নেযা। চোখ রেখে রেখে ঠিকই এসেছিল।

তুমি বুঝি বলেছিলে গাড়িতেই পড়ে আছে সেটা।

সুরমা বললেন,— অত সব কি হবে তোব? এটা সে কাসকেট নয়। সে কাসকেটটা গাড়িতেই পড়েছিল। আচ্ছা, বাবী, জামাই কি এখনও ভাবেন, ওটা কালচার্ড, জাপানি?

কি কাণ্ড দাদি? মোপার্সার মুক্তোর চাইতেও ঘোরালো দেখছি। সে সব মুক্তোওয়ালাবা থাকে বড়লোক। আর সেই লম্বা ফর্সা স্বদেশী ডাকাত—নিজেব আদর্শকেও ভুলে গেল?

আচ্ছা, দাদি, তুমি নিজে কখনও যাচাই করেছ জেনুইন কিনা?

কখন আব কবলাম!

মাধবী বললো,— দেখ, তোমার নাভজামাইও বলেছে, তোমাব অধ্যাপক মা কি কবে কিনবে? তুমিই বা কি করে কিনবে, যদি জেনুইন মুক্তো হয়ে থাকে। তুমি তো মাত্র দু-এক বছব প্রতিমন্ত্রী ছিলে। তাছাড়া, ওটা মুক্ত সত্যিকারের হলে মা বিযেব বাতেই দিতো। খুকু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতো না। বিযেব রাতেই তো কনে সাজায়।

সুরমা হেসে বললেন,— তুই তা হলে ওটা মাধুকে দিয়েছিস, বাবী? ভান্নো করেছিস। তাহলে তোর কখনও কখনও মনে হয়েছিল মুক্তোগুলো খাঁটি। নতুন কাসকেট কবে দিয়েছিস।

মাধবী বললো,— তোমার মেযের বুদ্ধি কি আর কম? নতুন কাসকেটটা টকটকে লাল ভেলভেটের।

আচ্ছা, দাদি, শুধু খুব লম্বা আর খুব ফর্সা বলেই তো নয়। হয়তো দশ হাজারে এক লম্বা আর ফর্সা। তা কিন্তু স্বদেশী ডাকাতের পক্ষে ভালো নয়। পুলিশ সহজে চেনে। কিন্তু তেমন ফর্সা আর লম্বা বলেই তো নয়। স্বদেশী ডাকাত বলেও। আব বোধহয় খদ্দরপরা তোমাকে

একবার দেখেই নিজের দামী কাসকেটটাকে তোমার ব্যাগে ভরে দিতে বিশ্বাস কবেছিল বলে। তখন তো বড় মামা বছর পাঁচেকের। কিন্তু দাদি, দেশের কাজ করতে গিয়ে অনাদিকে মন দেয়া কি এক বকমেব পাপ নয়? বাসবীর মুখটা লাল হলো। নতুন কবে অবাক হলো যেন সে। বললো, আচ্ছা মা, জেনুইন নাই হলো, পঞ্চাশ বছর হলো তো আমাদেবই কাছেই। আচ্ছা, মা, দাদা আব ভাই বলতো, তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো। আচ্ছা, মা, বাবা যাকে তোমাব স্যাটেলাইট বলতেন—

স্যাটেলাইট বলা কি ভালো। অনেকেই মত বদলেছিল, অনেকেই সবে এসে অহিংস হয়েছিল। পবে সত্ত্ববে এসে কো-অপারেটিভের মান্নেজিং ডাইবেকটর হয়েছিল। বছর দু-এক আগে কে যেন বলছিল বাব পাঁচ সাত আগে স্ট্রোকে—একটু উদাস হলো সুবমা।

হ্যাঁ, দাদি, তোমার কি মনে হয়, এখন আব যাচাই করাব দবকাব নেই? মানে তুমি, মা, আমি, পবে খুকু—। আচ্ছা দাদি, তোমার কি পবামর্শ? হাবটা কি লকাবো বাখবো নাকি বিক্রি কবে খুকুব নামে ফিক্স ডিপোজিট করবো। অ্যাসেট ডিক্রাবেশনে ফ্যাসাদ আছে—লাখ টাকাব হাব তো। নাকি তত দামী লুকিয়েই বাখতে হয়। কি কাণ্ড অথচ দেখো, মাকে জেনুইন বলবে আব কাকে বলবে না। একই ব্যাপাব নয় কি? সেই ঝিনুকের ডালাব মধো যথোপযুক্ত। কেমিক্যাল। জাপানিবা বুঝে শুনে ক্ষেপে বুকে কেমিক্যাল মেশালে তা কালচার্ড আব কৃত্রিম। আব অকূল সমুদ্রে হঠাৎ কোন ঝিনুক এক মুহূর্তেব যোগাযোগে তেমন কেমিক্যাল জেনুইন মুক্ত কবে? অথচ পরে যেন মনেই থাকে না, মনেই থাকে না।

মাধবী হাসলো। চা শেষ কবলো। উঠে দাঁড়ালো। তাব মুখে আলো পড়লো। তাব মুখ আব ঠোট দেখে মনে হলো, তাব পিপাসা পেয়েছে, যেন সূর্যেব সেই আলো থেকে কোন কর্মকাল পেতে চেষ্টা কবছে তাঁব ঠোট দুটো। ঠিক তখনই দূরে কোথায় আগুন যেন, জানলা দিয়ে ধোঁয়াব গন্ধেব বাতাস, দমকলেব ঘণ্টা একবার বাইফেলেব টাবাবাবাও শোনা গেলো।

অধ্যাপিকা বাসবী বললো,—কি ডোলমা? গোলমালটা কার সঙ্গে, কাব সঙ্গে?

ডোলমা কাঠেব মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ালো। জানলা দিয়ে দেখতে গিয়ে আপেল গাছটাব গায়ে বাঁধা বাঁশেব মাথায় সাদা প্রার্থনা পতাকাটা তাব চোখে পড়লো। সেটা পতপত কবে উড়ে অমঙ্গলই যে দূর করছে। সে হাসলো। চায়েব সরঞ্জাম জড়ো কবলো ট্রেতে। ধীবে ধীবে, যেমন কবে।

সে ভাবলো : সে তো মেমসাহেব যে এক সময়ে মন্ত্রী টিম্বি ছিলো তা জানে। আব এঁবা এখন যা বললো। সে ভাবলো, অনেক বড় কালের সমুদ্রে যেতে যেতে একবার ডুবতে হয়, আবাব নতুন কবে ভেসে চলতে হয়। কিন্তু দেখো, মেমসাহেবের এবাবই শেষ যাওয়া। আব ফিবে আসতে হবে না জন্মাতো। নিশ্চয়ই।

সুরমা বললেন,—কি খবর আজ? তিনি হাত বাড়িয়ে তর্কলি আব উল নিলেন। মাধবী বসে কাগজটাকে হাতে নিলো। বললো, অনেক খবর। এদিকে, দেখো, এ-পক্ষ ও-পক্ষকে দোষ দিচ্ছে, ও-পক্ষ এ-পক্ষকে—এই আন্দোলন আর গোলমাল নিয়ে। ডানদিকে স্বর্ণমন্দিবেব চাবদিকে নব্বই ফুট সড়ক। আর ডান দিকেই মাঝামাঝি বক্স কবে বিদ্দেশাগবেব মুক্তো।

সুবমা বললেন, মুক্তোটাকে শেষ পর্যন্ত দামী বলছে? পড়, শুনি। তিনি হাসলেন।

বাসবী কোলের উপরে সেই লিল্যাক উলটা নিয়ে বুনতে শুরু করলো। এরকম হয়, সেই লিল্যাক রং-এর আভা তার গলায় চিবুকে পড়তে লাগলো।

লুক্রেসিয়া

বাণী রায়

গতকলা রাতে গড়িয়াহাট বোডে একটি খানাব পার্শ্বে একটি সুন্দর সুবেশ যুবককে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সর্বাস্থে প্রহারজনিত ক্ষতের চিহ্ন ছিল। যুবকটিকে অবিলম্বে শঙ্কুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

*

*

*

“গড়িয়াহাট বোডে যে যুবকটিকে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম শ্রীযুত প্রবীর গুহ বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুত গুহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রকাশ, শ্রীযুত গুহ গতকলা অপরাহ্নে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। পথেব মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে তিনি গুপ্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার পকেটের টাকা, ঘড়ি ও হাতের হীবার আংটি প্রভৃতি কিছুই অপহৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ আততায়ীবা তাঁহাকে আক্রমণ কবিয়া প্রহাবে অচেতন কবিয়াছিল, কিন্তু কোন ভয় পাইয়া তাহাবা তাঁহার টাকাকড়ি প্রভৃতি অপহরণ না কবিয়া পলায়ন কবিতো বাধা হইয়াছে। কলিকাতার সি আই ডি পুলিশ এ বিষয়ে তদন্ত কবিতেছে।”

সংবাদপত্রে এই সংবাদটিতে কলিকাতায় চাক্কলোব সৃষ্টি হইল। কর্নেল প্রশান্ত গুহব একমাত্র পুত্র প্রবীর গুহকে কে না চেনে? বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল বড়, বাংলা সাহিত্যেব সুপরিচিত লেখক, জনপ্রিয়, কমলীয়মূর্তি প্রবীর গুহ কলিকাতা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিল। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংবেলী ভাষায় পণ্ডিত, মনস্বী ছাত্র প্রবীর গুহেব এই আকর্ষক বিপদে ছাত্রছাত্রী মহলে সাড়া পড়িয়া গেল।

পুলিস বহুদিন অপবায়ীব অন্বেষণ কবিল। প্রবীর গুহ আবোগ্য লাভ কবিল, কিন্তু তাহাব দক্ষিণ হস্তটি চিবদিনেব জন্য অকর্মণ্য হইয়া গেল। তাহাব ছাত্রজীবন শেষ হইল নিবাসাব অন্ধকারে। তাহাব উদ্ধত লেখনী মুক হইল কলম ধরিবার অসামর্থ্য। শোকাচ্ছন্ন মাতাপিতাব সহিত সে কার্সিয়াঙে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইতে গেল। প্রায় এক বৎসর যাবৎ সে সেইখানেই আছে।

পুলিসেব নিকট জবাববন্দীতে প্রবীর গুহ প্রকাশ কবিয়াছিল যে, নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া বাত্র প্রায় বারোটোর সময় সে গড়িয়াহাট রোড দিয়া একাকী ফিবিতোছিল। দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অন্ধকারেব মধ্যে একজন মুখোশপরা লোক সহসা তাহাকে আক্রমণ কবে। তাহার পর আর তাহার কিছু মনে নাই। আততায়ীর চেহারা সম্বন্ধে প্রবীর গুহ কিছুই বলিতে পাবে নাই।

এই আক্রমণের প্রকৃত ঘটনা এবং আক্রমণকারীর প্রকৃত পবিচয় জগতে তিনটি বাস্তব মাত্র জানে—প্রবীর গুহ নিজে, মালিনী সেন এবং আমি।

জানি, এখনও প্রবীর গুহর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়, তাহাব প্রতিভাব অপমৃত্যুব জন্য অজানা সেই দুর্বৃত্তকে অভিশাপ দেওয়া হয়, ইংরেজ শাসনের নিন্দা করা হয়—পথচাৰী ব্যক্তির জীবন এখনও নিরাপদ নয় বলিয়া।

আমি জানি, প্রবীরকে নিষ্ঠুরভাবে কে প্রহার করিয়াছিল এবং কেন। আমি জানি, কেন প্রবীর গুহ লক্ষপতি পিতার পুত্র হইয়াও পুলিশের নিকট প্রকৃত ঘটনা বলে নাই। আমি জানি, কেন মালিনী সেনের গর্ভিত মন্তক আজ অবনত, কেন প্রবীর গুহের নামে তাহার নয়নে বহি জ্বলিয়া ওঠে।

আমি অমর সোম—বিশ্ববিদ্যালয়ের, ইংবেজী বিভাগে পঞ্চবার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র, মালিনী আমার সহপাঠিনী এবং প্রতিবেশিনী।

মালিনীর পিতা পাটনায় জজিয়তি হইতে বিরাম লইয়া, হিন্দুস্থান পার্কে আমাদের পাশের বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। মালিনীর এক ভ্রাতা অধ্যাপক, অন্য ভ্রাতা ব্যারিস্টার। বাহির হইতে আই এ পাস করিয়া আসিয়া মালিনী আশুতোষ কলেজ হইতে বি এ পাস করে।

আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পড়ি। আমার ইংবেজীতে অনার্স ছিল, মালিনীরও তাই। পাশাপাশি বাড়ি, উভয় পবিত্রাবাসে সৌহার্দ্য। মালিনীর সহিত আমার সখা হইতে বিলম্ব হইল না।

আজ মালিনী আমার কে জিজ্ঞাসা করিলে আমার উত্তর দেওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু মালিনী আমার কে নয় তাহার উত্তরও আমার জানা নাই।

মালিনী বাংলায় বাহিরে মানুষ। সমস্ত প্রকৃতিতে তাহি তাহার একটা উন্মত্ত বিন্যাস। অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে অতিমত্ত সত্যটির মত। বাঙালিনীর ভীক নম্রতা তাহার মধো নাই, আছে আগ, আছে দীপ্তি। তাহার ক্ষীণ শ্যাম দেহে আকর্ষণশ্রী কিন্তু অস্বাভাবিক নয়নে, বঙ্গ বস্ত্র অথবা আছে অনল—যাহা পুরুষ-চিত্তকে দগ্ধ করে জানা দেয়।

মালিনী কর্ণচিহ্ন। তাহাদের বাগানে বসিয়া কতদিন তাহাকে দেশী বিদেশী কাব্য পড়িয়া শুনাইয়াছি। আমাকে সে চিরাবদন সম্পদান করিয়াছে, কিন্তু আমার নীচের প্রেম সে গ্রহণ করে নাই। বর্ষণমত্ত সন্ধ্যায় তাহার অবাধা অলক উড়িয়া আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, বৌদ্ধ প্রসন্ন দিনে সে আমার ভ্রমণে আমাকে সঙ্গী করিয়াছে, আকুল নিশীথে আমার সুবে সুব মিশাইয়া সে গান গাইয়াছে, কিন্তু আমার ভালবাসায় তিলেকের জন্য সে ধবা দেয় নাই। তাহার অনল অন্য শিখাকে খুঁটিয়া নবিত, আমি তাহাকে কেবল শীতল জলই যোগাইয়াছি।

বি. এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর মালিনী আমাদের বাড়ি আসিল, তাহার চঞ্চল চরণছন্দে গৃহ মুখব হইয়া উঠিল।

কি, একা একা বসে কবিতা বই পড়ছ? বাবা? শেলীর কবিতা এখনও পড় তুমি? আমারও ন্যাকামি ব ছড়া ভাল লাগে না। খালি ঘ্যানঘ্যানানি। বিকৃত ব্রন্দনের সুবে মালিনী আবৃত্তি করিল—

Oh lift me as a wave, a leaf, a cloud

I fall upon the thorns of life—I bleed

খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া মালিনী আমার পাশে কাউচে লুটাইয়া পড়িল।

আমি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিলাম। মালিনী আমার হাত হইতে বই কাড়িয়া লইল।

চল, ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া যাক। অনার্সে তুমি আমি কেউই তেমন ভাল করিনি।

এবারে গোড়া থেকেই ভাল করে পড়ব—তুমি হবে ফার্স্ট, আর আমি সেকেন্ড, না, আমি ফার্স্ট, তুমি সেকেন্ড? —মালিনী আমার চুলের উপর হাত রাখিল।

তাহার স্পর্শের উন্মাদ আকর্ষণ প্রাণপণে সংবরণ কবিতা করিতে আমি উত্তর দিলাম, তুমিই ফার্স্ট, আমি সেকেন্ড।

এই গেল আমাদেব বিশ্ববিদ্যালয়-প্ৰবেশেব ইতিহাস।

মাসখানেক পৰ। বিকাল চাৰিটায় মালিনী এৰং আমি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একত্ৰে বাডি ফিৰিতেছিলাম, মালিনীৰ বাৱিস্টাব দাদাব গাডিতে আমবা ফিৰিতেছিলাম—পথে, কোট হইতে তাহাব দাদাকে তুলিয়া লইতে হইবে।

সেনেট হলেব পাশ দিয়া আসিতে হঠাৎ আমাকে ঠেলা দিয়া আকুল স্বৰে মালিনী বলিয়া উঠিল, অমব, ও কে ৬

চাহিয়া দেখি, গাডিৰ চলাব পথ কৰিতে লোহাব গেটে একটি হস্ত স্থাপন কৰিয়া প্ৰবীৰ ওহ দাঁড়িয়া। শিগুৰ মত স্মৃতিত ও সৃষ্টিত তাহাব অধৰোষ্ঠে ভুলন্ত সিগাবেট। প্ৰশস্ত ললাটে প্ৰতিভাব জ্যোতি, দীৰ্ঘ সাবসগ্ৰীবা একটু পশ্চাতে হেলানো। নাবীসুলভ কমনীয মুখে ঈষৎ বিবক্তি ও অপাব আত্মমৰ্যাদাব ছাপ। সাধাবগেব সৰিত তাহাব কোন সংযোগ নাই, যেন থাকিতেও পাৰে না।

মালিনীৰ উৰ্বেজিত, মুগ্ধ মুখেৰ দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, ওব কথাই তো তোমাকে বলছিলাম সেনি। ওই হাছে প্ৰবীৰ ওহ—গতবাবে ইংবেজী অনাৰ্চে ফাৰ্স্ট হয়েছে। আমাদেব কাগজটাব সম্পাদক আব সেমিনাবেব সেফ্ৰেটাৰি।

ওই প্ৰবীৰ ওহ। ভাবী সুন্দব লেখে কিন্তু, অমন জোবালো লেখা কমই পেড়েছি। আব লেখাব সঙ্গে চেহাবাবও মিল আছে, তাই না ৬

প্ৰবীৰ ওহ তাকহিল না, সোজাসৃষ্টি কোন নাবীৰ দিকে সবলদৃষ্টিতে দেখা তাহাব ভ্ৰম্মগত অনভাস। তবে মালিনীকে সে পূৰ্বেই দেখিয়াছিল জানি! দেখাবাব বস্ত্ৰ কোন কিছতে, বিশেষত স্ত্ৰীজাতিতে থাকিলে, তাহা তাহাব বুদ্ধিপ্ৰথব দৃষ্টি এডায় না।

গাৰ্ড জনবানবহুল পথে আসিল। প্ৰবীৰেব উন্নত, কমনীযমূৰ্তিব দিকে চাহিয়া অৰ্ধস্বৰে, কপোত-ওঞ্জনেব মত মালিনী আৰ্গুতি কৰিল—

সন্ধ্যাবাগে ৰিনিমিলি ঝিলমেব স্ৰোতখানি বাঁকা

আধাবে মলিন হ'ল যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোযাব।

আত্মবিস্মৃত হাসি তাহাব মুখে, নয়নে স্বপ্নেব ছায়া।

মালিনীৰ সঙ্গলস হাসি আমাব চিঃদহন আনিল। তাহাকে পাবহাস কৰিয়া সতৰ্ক কৰিলাম।

চেহাবাটা বাঁকা তলোযাবেব মতই, কিন্তু চৰিত্ৰ ৬ সাবধান মালিনী, প্ৰবীৰ ওহেব নৈশিক চৰিত্ৰে শিথিলতা আছে। কোন মোবেই ওব হ'ত এডায় না।

মালিনীৰ বহু অধৰে শাগিত হাসি বলকিয়া উঠিল। প্ৰতিভাব সঙ্গে চৰিত্ৰেব যোগ থাকে না, অমব। চাঁদ বলকী ব'লেই সুন্দব। আব — লোকে তো অনেকই বলে। এদেশে তিলকে তাল ক'বে তোলাব প্ৰথা আছে, আমি জানি।

এত সুন্দব কি দেখলে তুমি, মালিনী ৬ তুমি তো কোন পুৰুষকে সুন্দব দেখ না ৬ — অজ্ঞাতে হয়তো একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

তোমাব চেয়ে বেশ সুন্দব হয়তো প্ৰবীৰ ওহকে কেউ বলবে না। কিন্তু আমি দেখাছি ওব ব্যক্তিত্বে, ওব প্ৰতিভাকে, চেহাৰা তাব আধাব মাত্ৰ। কি আশ্চৰ্য!

তাহাৰ দিন দুই পৰে বিতৰ্ক-সভায় প্ৰবীৰ ওহ নোয়েল কাণ্ডাৰ্ড সম্বন্ধে একটি প্ৰবন্ধ পাঠ কৰিল। কুশাগ্ৰ বুদ্ধি তাহাৰ, তীক্ষ্ণ বচন-বিন্যাস। প্ৰতিপক্ষৰ কলরব ভেদ কৰিয়া তাহাৰ উদাত্ত কণ্ঠ বাতাস আচ্ছন্ন কৰিয়া ঘূৰিয়া ফেৰে, তাহাৰ যুক্তি অসীম জ্ঞানেব পৰিচয় দেয়। সমুখেব আসনেই মালিনী, রক্তপদ্ম-বৰ্ণেৰ শাড়ী তাহাৰ কপকে মুখবতৰ কৰিয়া তুলিয়াছে। চঞ্চল দৃষ্টি তাহাৰ বাবংবাব প্ৰবীৰেব স্থিৰ প্ৰদীপ্ত দৃষ্টিৰ সহিত মিলিত হইতেছিল।

তাহার পরের দিনই মেয়েদেব বসিবার ঘবেব সামনে দেখিলাম, প্রবীর ও মালিনী অন্তবস্ত্র ভাবে আলাপ করিতেছে। প্রবীরেব পদ্মপলাশ নেত্রে ব্যাধের কটাক্ষ, মালিনীর নয়নে আত্মসমর্পণের অসহায়তা।

সহসা মনে হইল, বিশ্ববিদ্যালয় যেন তিমিরগুষ্ঠনে ঢাকিয়া গেল, যেন আমার চারিপাশে শত শত অলিন্দ স্থপতিশিল্পের নিদর্শনরূপে আমাকে বেড়িয়া ধবল। সম্মুখে খবশোতা টাইবার, তাহার তীরে উচ্চ গির্জাশ্রেণীর উপরে আভাস-স্বপ্নেব মত জাগিয়া উঠিল বোম নগরী। কত যুগান্তের বিস্মৃতি ভেদ করিয়া আমার জন্মান্তবেব প্রিয়া যেন অশান্ত ক্রন্দনে আমাকে ডাকিতেছে— ‘লুক্রেশিয়া’ ডাকিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আমি — আমি তো ‘কোলাটিনাস’ নহি, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র অমর সোম। আমার নির্যাতিতা, ‘লুক্রেশিয়া’ তাহার বিষাদম্লান দৃষ্টি, অসহা যন্ত্রণাব অভিযুক্তি লইয়া ক্ষণতবে দেখা দিয়া সর্বযা গিয়াছে। আমার সহপাঠিনী মালিনী শুধু ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রবীর ওহর সহিত বিশ্রান্তালাপ করিতেছে। আমার ‘বোম’ বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাচীরেব গায়ে মিলাইয়া গিয়াছে। কুয়াসান্তিমিত অতীতের পাটে টাইবারের স্রোত ঝিলিক দিয়া আবার বিস্মৃতির তমিস্রায় অন্তর্হিত হইল। আমি তো ‘কোলাটিনাস’ নহি, তবে কিসেব প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ? আমার হস্ত কেন আপনি মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, সমগ্র শরীর আহত ব্যায়ের মত কাহাব উপর সবোমে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়?

মনে মনে হাসিলাম। বাত্রিজাগরণ ও কাব্যচর্চাব মাত্রা কমাইতে হইবে। মালিনীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম, প্রবীর ওহ তখন চলিয়া গিয়াছে।

কি কথা হইছিল তোমাদের? বেশ তো আলাপ হয়ে গেছে দেখছি।— প্রশ্ন করিলাম।

মালিনী উত্তর দিল, একটা চ্যাটিটি পার্ফরম্যান্স হবে তাই গান দিতে বলছিলেন।

কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলাম না। প্রবীর ওহেব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, আভাসে জানি, নাবীদেহেব প্রতি তাহার দুর্বাব লোভ। কুমারীর কোমল অথব তাহার লেখনীকে প্রেরণা সোণায়, পবিত্রতার নীতিশাস্ত্রে তাহার আস্থা নাই। সে প্রত্যবক নহে, কিন্তু সে শিকানী। সে তাহার লক্ষ্যকে জানাইয়া দেয় যে শব্দসন্ধান চলিতেছে। জদয়হীন সে নহে, প্রতি-আধুনিক মাত্র।

ধীরে ধীরে অজ্ঞাতে আমার মুখ হইতে বাহির হইল—

If Collatine, thine honour lay in me.

From me by strong assault it is bereft

কি বলছ অমর? — মালিনী ত্রিঙ্কসা করিল।

বলছি—। আবার অজ্ঞানেব মত শুনিলাম আমিই বলিতেছি—

Yet die I will not till my Collatine

Have heard the cause of my untimely death

That he may vow in that sad hour of mine

Revenge on him that made me stop my breath

কোথা থেকে বলছ অমর? কোলাটাইন নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে।— মালিনীর চক্ষুতে নিবিড়তা নামিয়া আসিল। সুদূর আকাশে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, ললাট কুণ্ডিত করিয়া সে নামটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল।

লঘুকণ্ঠে বলিলাম, শেক্সপীয়ারের লুক্রেশিয়ার আক্ষেপ বলছি, বুঝলে? যখন প্রবীর ওহেব সঙ্গে কথা বলছিলে, কেন জানি না, কেবলই তোমাকে লুক্রেশিয়া বলে ভুল করছিলাম।

স্বামী কোলাটিনাস বাইবে। নির্জন ঘরে লুক্রেসিয়াকে সেক্সটাস আক্রমণ করেছে তার সর্বনাশেব জনো। কোলাটিনাস অবশ্য প্রতিশোধ নিয়েছিল।

মালিনী হাসিয়া উঠিল। পাথরের মালা যেন মেঝেতে ছিড়িয়া পড়িল, এমনই রাগিণীময় তাহার হাস্য। একটি কৃশকায় ছাত্র চলিতে চলিতে ফিবিয়া চাহিল। একজন ছাত্রী বিবক্তিতে ভ্রুকুণ্ঠিত কবিল।

অদ্ভুত কল্পনা তোমার! আমি বোমান সুন্দরীই বটে। আচ্ছা, প্রবীণকে কি মনে হ'ল সেক্সটাস।

তীব্র দৃষ্টিতে ভৎসনা হানিয়া চাপা গলায় মালিনী বলিল, ছিঃ।

ছয় মাস পবে।

মালিনীর গৃহে সাক্ষাভোজন। উপলক্ষ্য কিছু নহে, নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়।

প্রবীর বসিয়া ছিল বাকানো সেটিতে অলস ভঙ্গিতে। হাতে তাহার ধূমায়মান সিগারেট। সিগারেটের নীলাভ ধোঁয়া উজ্জ্বল হীরক-অঙ্গুরীয়কে অস্পষ্ট কবিয়া ফেলিয়াছে। বক্ষিম অধরোষ্ঠে ইস্পাতেব মত ধারালো কৌতুকেব হাস্য। চোখে নবম, প্রেমজড়িত আদবেব দৃষ্টি। সকলের সম্মুখে যাহা মুখে আসে না, তাহা যেন দৃষ্টিব সহিত সে মালিনীকে নিবেদন করিতেছিল। প্রতিটি কটাক্ষ যেন তাহার এক একটি চুষন।

মালিনী আমাব পাশে বড় সোফায় বসিয়া ফুলেব পাপাডি ছিড়িতেছিল। আজও সে পবিয়াছে রক্ত-গোলাপ বঙের বেশমী শাড়ি। কালো চুলে জড়ানো তাহার গোলাপের মালা, হাতে লাল গালাব জব-জড়ানো চুড়ি, কানে গলায় লাল প্রবালের গহনা। এ যেন তুলন্ত বর্হি-শিখা, উদগ্র-কামনায় তুলিতেছে কাহাকেও আলিঙ্গন কবিবার নিমিত্ত।

আব ওই যে স্তিমিত-গৌব তরুণ পুরুষ শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে অঙ্গশয়ান, তাহার নলাটে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হইতেছে, অলস তন্দ্রাব ছায়া বমণী-সুন্দর আখিপন্নবে বাসা বাঁধিয়াছে, তাহার সবল দীর্ঘ তনু, প্রেম ও কামনায় প্রোজ্জ্বল—সেও এই একই অগ্নি। আগ্নেয়গর্গবির ভস্ম-আবরণে সে প্রসুপ্ত। তাহাকে চেনা যায় না, অথচ তাহারই অগ্নি উদগীবণে একদিন ধ্বংস আসে—কত পম্পিযাই তাহার লাভাশ্রোতে ভাসিয়া যায়। একই বর্হি উভয়কে আকর্ষণ কবিতোছে প্রবল বেগে, শুধু তাহার রূপ বিভিন্ন। সর্বনাশা এই মোহ, কে কাহাকে গ্রাস কবিতো পাবিবে ঠিক নাই।

আমাব অবশ দেহে মালিনীর বক্ত-অঞ্চল বহুবাব লাগিতেছে। তাহার চপল বাহু কতবাব আমাকে ছুঁইয়া গেল। কতবাব আমার কাণে সে করাস্পর্শি স্থাপন কবিয়া আমাব চোখেব উপন নত হইয়া হাসিল। কি অন্ধ আকর্ষণ তাহার দিকে আমাকে অহবহ টানে। প্রতিটি রক্তকণিকা তাহাকে খুঁজিয়া বার্থ প্রতীক্ষায় মগ্ন হইয়া যায়। পূর্বষেব বৃত্তস্ক যৌবন নিযত তাহাকে প্রার্থনা করে। মনে হয়, কত দিন হইতে চিনি তাহাকে। কত নীল সমুদ্রেব পাশে পাশে তাহার আঁখি আমাকে সঙ্কেতে ডাকিয়াছে। কত দুর্বার বণক্ষেপে তাহার মুখেব ছবি আমাব শত্রু-বস্ত্র-স্নাত হস্তে বল যোগাইয়াছে। আমি তাহাকে চিনি। জন্মজন্মান্তর হইতে তাহার সহিত আমার যোগাযোগ। কিন্তু এ জন্মে অমব সোম বৃথাই মালিনী সেনকে চাহিয়া মবে। মালিনী জনাবণে তাহার সে চেনা মুখখানি ডুলিয়া গিয়াছে।

যাই বল মালিনী, ছেলেমেয়েতে বন্ধু আমি বিশ্বাস করি না। এ বিষয়ে 'আবাহনে' একটা কবিতা লিখেছিলাম আমি বছরখানেক আগে। আর নিছক নিবামিষ বন্ধুত্বেব প্রয়োজন কি? যদি মনে দোলা লাগে, লাগুক। কারও কোনও ক্ষতি তো হচ্ছে না। সুখ পেলে কেন ছেড়ে দেব? —হাতের সিগারেটের দিকে চাহিয়া প্রবীর চিন্তিতভাবে বলিল।

মালিনী হাসিল। মনে হইল সে যেন ধরিয়া লইয়াছে, প্রবীরের উচ্ছ্বল কথাবার্তার সহিত তাহাব চরিত্রের কোন যোগ নাই। অধিকাংশ শিল্পীর মত প্রবীরও আত্মপ্রত্যাহারক। উন্নতমনা, সংযমী প্রেমিক তাহাব মধ্যে চিবজাগ্রত। মুখের কথায় প্রবীর অন্তরকে গোপন করিতেছে।

মনে হইল চাঁৎকার করিয়া বলি, মালিনী, মালিনী! এত তেজ, এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ভুল ক'ব না। প্রবীর গুহব খেলাই এই। সে যা মনে কবে, হাসির ছলে অন্য পক্ষকে পূর্বেরই তা জানিয়ে দেয়। অপব পক্ষ যদি সেটাকে পবিহাস বা মুখের কথা মাত্র মনে কবে, তবে দোষ প্রবীরের নয়।

প্রবীর চুম্বনের ভঙ্গিতে অধব অগ্রসর করিয়া সিগারেট ধবিল। মৃদু টান দিয়া আবার বলিতে লাগিল, বিবাহের প্রয়োজন নেই, নিরামিষ বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন নেই। জগৎটা কেবল দেখে যাও। আনন্দ, আনন্দই সাব। জীবন ক্ষণিকের। তাই বলি মালিনী, পুরুষের বন্ধুত্বে বিশ্বাস ক'ব না। কাবণ —

Friendship's cool water

Any moment can change into wine

মালিনীর দিকে তাকাইয়া বুদ্ধিতে পাবিলাম, বন্ধুত্বের শীতল পানীয় তাহাব কাছে বহু পূর্বের সুবাস কপান্তবিত হইয়া গিয়াছে।

সকলকে বিদায় দিয়া মালিনী বাগানে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চৈত্রের বাত্ৰি, আকাশে ভবা জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না তাহাব বস্ত্র অধরে, তীক্ষ্ণ নয়নে, কালো চুলে।

প্রবীরকে নিয়ে একটু বাড়িয়েছ মালিনী। এখনও সাবধান হও। প্রবীর ভাল ছেলে নয়।

মালিনীর দীপ্ত সৌন্দর্য্য জ্বলিয়া উঠিল। ভাল কি মন্দ, তা নিয়ে লোকের মাথা-বাথা কেন? ভাল ছেলে দেখে দেখে আমার অসহ্য হয়েছ। আমি শিশু নই অমব, মনে বেথো।

মারিয়া হইয়া বলিতে লাগিলাম, প্রবীরদের বাড়ি অত্যন্ত সেকেনে। মাব তুমি তো জান, ও বিবাহে বিশ্বাস কবে না। এখন তো দূরবের কথা, কোন দিনই হয়তো বিয়ে কববে না। মালিনী বিপদে পড়বে তুমিই, কাবণ তুমি ওকে যতটা ভালবেসে ফেলেছ, ও তোমাকে তা বাসেনি।

আহতা সঙ্গীর মত মালিনী দেহ আকৃষ্টত করিল, সূর্য্যালোচিত ছবিব ফলকের মত সঙ্গীর্ণ তাহাব চক্ষু সঙ্গীর দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া বহিল। সে চোখে ঘৃণা ও দম্ভ।

কি পাগলের মত ববছ অমব? বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না এখানে। প্রবীরকে আমি হয়তো ভালবেসেছি, না জেনে অস্বীকার কব না। কিন্তু আমি জানি, আমার ভালবাসার ও যোগা। লোকে ওকে বোঝে না, ওব প্রতিভার মূল্য মিনমিনে বাংলাদেশ দিতে পাবে না। তোমবা, তথাকথিত শুদ্ধ শাস্ত ভাল ছেলেবা, ওব মুখের কথা, বাইরের ব্যবহাব দেখে ভুল কব। বড সুন্দব মন প্রবীরের। আমি ওকে ঠিক চিনেছি। সমস্ত সামাজিক বন্ধন, সংস্কারের ওপরে প্রবীর গুহ। অসাধারণ ওব ব্যক্তিত্ব।

নদীর ধ্বংসমুখী তীরে দাঁড়াইয়া আছে আমার প্রিয়া। তাহাকে বক্ষা করিবাব ক্ষমতা নাই আমার। অদৃশ্য বিপদ তাহাকে গ্রাস করিবাব জন্য অগ্রসব হইতেছে। সবল শিশুর মত নিজের পবিত্র নির্ভবশীল মন দিয়া সে বিশ্বের বিচার করিতে চায়।

আবার তাহাব দিকে চাহিয়া বলিলাম, তুমি প্রবীরকে বোঝনি মালিনী, যতই তোমাব বুদ্ধি থাক বা দীপ্ত থাক। চিবকাল বাংলাব বাইরে তুমি মানুষ, সবল খোলা জীবন তোমার, মানুষের জটিলতা-কুটিলতার সঙ্গে তোমাব পরিচয় নেই। মালিনী, তুমি সং মেয়ে, অসং পুরুষের কামনা বোঝা তোমাব সাধের বাইবে। প্রতিভা আছে প্রবীরের, কিন্তু সে প্রেমিক নয়, কামুক।

অমর, অনেকক্ষণ তোমাব ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা সহ্য কৰেছি, আব নয। মনে বেখো, প্ৰবীৰ আমাব বিশেষ বন্ধু, তাকে অপমান কৰাব অধিকাৰ তোমাব নেই। আমাব সঙ্গে প্ৰবীৰেৰও বন্ধুত্ব আছে, তোমাবও তাই। কিন্তু সে তো কখনও আমাকে উপদেশ দিতে আসে না?— মালিনী সম্মুখের গাছ হইতে দুইটি ফুল ছিড়িয়া সবোষে কুটি কুটি কৰিয়া ছড়াইয়া ফেলিল।

যত্ৰণায় আমাব মুখ নীল হইয়া গেল। চন্দ্ৰের স্নিগ্ধ আলো মালিনীৰ অৰ্ধচন্দ্ৰ ললাটে নিজেৰ ছায়া দেখিতেছিল। শিথিল তাহাব কেশবন্ধন, অঁখিতটে বিপুল শ্ৰান্তি। বহু বক্তৃতা অধৰে তাহাব চাঁদেৰ আলো। আজ যেন সে অধৰ তত বহু, তত উদ্ধত নয। যেন অন্য অধৰ তাহাকে নিজেৰ বলে নত কৰিয়াছে। তাহাব অধৰেৰ দিকে দৃষ্টি বাঁথয়া অতি কষ্টে আৰাব বলিলাম, উপদেশ দিচ্ছি না মালিনী, বন্ধুত্বেৰ দাবীতে সাবধান ক'বে দিচ্ছি। তোমাব ভাবানু কবিনম এ পৃথিবীতে চলে না। প্ৰবীৰ তোমাব মত নয। তুমি যা, বাইবে সে তারই ভাগ মাত্ৰ। কিন্তু ও কি মালিনী, ও কি তোমাব ঠোটে— প্ৰবীৰ কি — ৫ মালিনী, মালিনী, উত্তৰ দাও।

আহত পশুর মত বেদনায আমাব স্বৰ নিৰ্জন বাত্ৰিতে বীভৎস শুনাইল।

গৰ্বিতা বাণীব ভঙ্গিতে মালিনী গ্ৰীবা বহু কবিল। —হাঁ। যা অনুমান কৰেছ সত্য। প্ৰবীৰ আমাকে চুহ্নন কৰেছে। তাতে কি হযেছে? আমি তো তাকে ভালবাসি।

তাহাব পৰ প্ৰায় পনেরো দিন মালিনীদেৰ বাড়ি যাই নাই, কথাবার্তাও হয় নাই। ক্রাসে দেখি, সম্ভাৰ্ত্তাব মত মালিনী নিৰ্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসে, কোন দিকে না চাহিয়া ব্ৰহ্মসেব শেষে চলিয়া যায়। আব মাঝে মাঝে দোঁখ, বিকালে তাহাব গাড়িতে প্ৰবীৰ ওহকে।

সন্ধ্যাব ছায়া টাইবাবেৰ তীবে তীবে নামিয়া আসিয়াছে। কৃষ্ণ ও কেশ মেমপালকেবা অন্ধশহস্তে দুগ্ধফেনেৰ মত শুভ্র মেমকুলকে গৃহে লইয়া যাইতেছে। দবে উচ্চ পৰতৰক্ষে মিনাব গম্ভীৰ মাথা তুলিয়া বহিয়াছে। গোৰ্খালিৰ মূৰ্খু আলো বোমাকে স্বৰ্ণফলকে মাড়িয়া তুলিয়াছে। স্বপ্নকহেলিমাণ্ডত শ্ৰাসাদগৃহে সৃষ্টা সন্দৰ্ভা। কত যুগেৰ অন্ধকাৰ বিস্মৃতি যেন দবে সৰিয়া গেল, মনেৰ গহন অন্তল হইতে নিদ্রিত অনুভূতি আৰাব জাগিয়া উঠিল। আৰাব প্ৰতিশোধেৰ অনল দেহে উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। সেক্সটাসেব কণ্ঠ লক্ষ কৰিয়া লোলুপ অসি উদাত হইতে চায়।

নিৰুদ্ধ কামনাভাবে দেহ মুখ। লুক্ৰেশিয়াব ঘুমন্ত অধৰে সেক্সটাসেব অধৰ। লুক্ৰেশিয়াব দেহবল্লবীৰ উপৰে সেক্সটাসেব কঠিন দেহ নামিয়া আসিতেছে ধীৰে -- অতি ধীৰে।

বন্ধকণ্ঠে স্বৰ আসিল না, চমকিয়া জাগিয়া দোঁখলাম, শয্যা ঘৰ্ম্মিত। প্ৰবীৰ ওহ তাহাব কাগজেৰ জনা একটি কবিতা চাহিয়াছে, তাহাই লিখিতে সন্ধ্যায় অবসন্ন দেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নেৰ স্পৰ্শ তখন যেন চোখে লাগিয়া আছে। তখন যেন কানে লুক্ৰেশিয়াব আৰ্ত্ত হাহাকাৰ ভাসিয়া আসিতেছে। কত দূৰ শতাব্দীৰ পাবে বসিয়া সে যেন আহুন কৰিতেছে। তাহাব হৃদয়মথিত কৰণ বোদন আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আমাকে ডাকিতেছে, কোলাটিনাস। কোলাটিনাস।

এ ডাক না শোনা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার চিত্ততন্ত্রী এই এক সুবে বাঁধা যুগ যুগ হইতে। জানি, আমাকে যাইতে হইবে।

ক্ষিপ্ৰহস্তে বেষভূষা সারিয়া লইলাম। মালিনীৰ বাড়ি সন্ধ্যাৰ পৰ পৌছিলাম। বাহিরেৰ ঘৰে মালিনীৰ অধ্যাপক দাদা ও ব্যৱিষ্টাৰ দাদা উচ্চ স্বরে আলোচনায় রত। মালিনী মাতৃহীনা। তাহাব বড় বউদিদি রাস্তাৰ দিকের জানালা পৰিষা দাঁড়াইয়া আছেন।

সাদৰ আহান চিৰদিনই মালিনীৰ বাড়িতে পাই। প্ৰশ্নেৰ উত্তৰে শুনিলাম, মালিনী কলেজ হইতে এখনও বাড়ি ফেৰে নাই, সঙ্গে গাড়িতে আছে কেবল প্ৰবীৰ গুহ। অধ্যাপক বলিতেছেন, এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না আমাৰ। স্বীকৃষ্কাৰ নামে খেচ্ছাচাৰিত। ব্যাৱিষ্টাৰ আমাৰ দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, এ তোমাৰ বেশি বলা হছে দাদা। কলেজের বন্ধু, ভদ্ৰযবেৰ ছেলে। তাৰ সঙ্গে বেডাতে গেছে তাতে ক্ষতি কি? নেযেদেৰ কি এতই ঠুনকো মনে কৰ— এতই দুৰ্বল? আৰ মালিনী সে জাতেৰ মেয়ে নয়। নিজেৰ ভাব সে নিজে নিতে জানে।

আমাৰ দিকে চাহিয়া অধ্যাপক চুপ কবিলেন। হায়! তাহাৰ মনে কৰেন, মালিনীৰ বৰমালা একদিন আমাৰ কণ্ঠেই পৌছিবে।

বাত্ৰি আটটা বাজিয়া গেল। যে যাহাৰ কাজে চলিয়া গেলেন আমাবই প্ৰতীক্ষা শুধু শেষ হইল না।

অবশেষে গভীৰ বাত্ৰে এক গাড়ি আসিয়া থামিল। দোখলাম, এক ছায়ামূৰ্তি নামিয়া অসংলগ্ন দ্ৰুত পদে পিছনেৰ দ্বাৰ দিয়া হ্ৰদবেৰ দিকে অগ্ৰসৰ হইল। তাহাৰ সন্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিলাম, মালিনী।

সহসা তাহাৰ ক্ষীণ দুই বাহু আমাৰ কণ্ঠে বেটন কবিয়া ধৰিল, আমাৰ বক্ষে মুখ লুকাইয়া মালিনী কাঁদিয়া উঠিল। দেবতাৰ মন্দিৰে পূজাবীৰ মত সন্ত্ৰমে শ্ৰদ্ধায় দুই হাতে আমি সেই চিৰপ্ৰিয় মুখখানি তুলিয়া দেখিলাম।

চক্ষু তাহাৰ আবহ, অধৰ বিগুহ ও স্ফীত। কববীৰ বন্ধন অৰ্ধেক খুলিয়া চুল জটাতে পৰিণত হইয়াছে। শাড়িৰ স্থানে স্থানে কাদা, গায়েৰ জামা ছিন্ন, সমস্ত শৰীৰ তাহাৰ যেন কেই গুৰিয়া মুচড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে। আমাৰ নিকটে মালিনী কম্পিত ভগ্নবৰে সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। সে ও প্ৰবীৰ বেডাইতে গিয়াছিল লেকে, ফিৰিবাবৰ পথে প্ৰবীৰ তাহাকে গড়িয়াহাটাৰ নিৰ্জনতম কোণে তাহাদেৰ একটা বাগান-বাড়ি দেখাইতে লইয়া যায়। তাহাৰ উদ্দেশ্য মালিনী বুঝে নাই, মালিনী তাহাকে বিশ্বাস কৰে। গাড়ি অনেক দূৰে ছিল, বাগানবাড়ি নিৰ্জন। বসিবাব ঘৰে প্ৰবীৰ তাহাকে লইয়া প্ৰেমাভিনয় আবস্ত কৰে। মালিনী প্ৰথমে তাহাকে প্ৰশ্নই দিয়াছিল, কিন্তু শেষে প্ৰবীৰেৰ কামনাৰ মাত্ৰা দেখিয়া পলায়ন কৰিতে চেষ্টা কৰে। কিন্তু পলাইতে সমৰ্থ হয় নাই। কুমাৰী-জীৱনেৰ চৰম অসম্মান তাহাৰ হইয়া গিয়াছে।

সৰ্বশৰীৰ মালিনীৰ থৰথৰ কৰিয়া কাঁপিতেছিল, নিদাৰণ শ্ৰান্তিতে আত্মগ্লানিতে সে অবসন্ন। শিশুৰ মত তাহাকে বক্ষে তুলিয়া তাহাৰ শয়নকক্ষে লইয়া গেলাম, সন্মুখে শয্যাৰ শোয়াইয়া দিলাম। চক্ষুৰ অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম, ডাল্ভাৰ ডাকি।

না অমব, না। আমাৰ লজ্জাৰ কথা তুমি ছাড়া আৰ কেউ যেন না জানে। উ., লোক-জানাজানি হ'বে ব'লে কুকুৰটাকে শিক্ষাও দিতে পাৰব না, এই আমাৰ ক্ষোভ।— নিৰুপায় ক্ৰোধে মালিনী শুভ্ৰ মূলাদন্ত দিয়া বিছানাৰ চাদৰখানা ছিন্ন কৰিতে লাগিল।

লোক-জানাজানি হ'বে না, তাকে শিক্ষাও তুমি দিতে পাৰবে মালিনী। আমি এখনই যাচ্ছি। এখনও তো সে গড়িয়াহাটাৰ বাগান-বাড়িতে আছে বলিছিলে না? —অসহ্য হৃদয়াবেগ দমন কৰিয়া শাস্ত্ৰস্বৰে বলিতে পাৰিলাম।

তুমি যাবে? তুমি যাবে অমব? — উত্তেজনাৰ মালিনী শয্যাৰ উপৰ উঠিয়া বসিল, দুই হাতে আমাৰ হাত চাপিয়া ধৰিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যাও। আমি, আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি, সেই কষ্ট সেটাকে দিতে হ'বে। প্ৰতিজ্ঞা কৰ অমব, এৰ শাস্তি তুমি দেবে তাকে? দয়া ক'ৰে ছেড়ে দেবে না? মাটিতে তাৰ মাথা লুটিয়ে দিয়ে সেই মুখ তোমাৰ জুতো দিয়ে

খোঁতলে দিও। যে হাতে ঘৃণা প্রবৃত্তিতে আমাকে ধরেছে, সেই হাত তার জন্মের মত ভেঙে দিও। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ভাল সে আমাকে বাসেনি। আজ স্পষ্টই বলেছিল।

আমি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলাম। আবার শতাব্দীর বিস্মরণের পরপার হইতে সেই গীতি বাজিয়া উঠিল—

Revenge on him, that made me stop my breath !

দরজার বাহিরে আসিতেই কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আহান আসিল দুর্বল ভগ্নস্ববে, অমর!

দেহ তখন আমার বোমান বীরের বীর্যে উদ্বেল, তিলমাত্র বিলম্ব সহ্য হয় না। কিন্তু যে কণ্ঠের একটি মাত্র আহান আমাকে মৃত্যুর তীর হইতেও ফিরাইতে পারে সেই কণ্ঠের আহ্বানে আবার ফিরিলাম।

বালিশে মুখ লুকাইয়া, অস্পষ্ট স্বরে মালিনী কহিল, কিন্তু, তাকে প্রাণে মেবো না অমর।

প্রবীর গৃহের সহিত দেখা হইয়াছিল, সেই বাত্রে গড়িয়াহাটের বাস্তায়। বাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগাবোটা, আমি অপেক্ষা করিয়া ছিলাম পথের পাশে।

প্রবীর আমাকে চিনিয়াছিল, কাবণ আমি মুখে কোনও মুখোশ ধারণ কবি নাই, এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্বে প্রস্তুত হইবার সময় দিয়া আক্রমণের কারণ খুলিয়া বলিয়াছিলাম। তাহার পরের ঘটনা সকলেই জানিয়াছে। প্রবীর শক্তিশালী, নিজেকে রক্ষার চেষ্টাও তাহার প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আমি, আমি তো তখন শুধু বিংশ শতাব্দীর অমর সোম ছিলাম না, আমি তখন কোলাটিনাস।

প্রবীর আমার নাম পুলিশের নিকট কবে নাই, ইহাও তাহার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভার পবিচয়।

মালিনী আজও বাঁচিয়া আছে—আমিও আছি। লুক্রেশিয়ার পবির্ণতি তাহার হয় নাই। কিন্তু সে আমার কাছে আজ মৃত। সে অন্যোপভুক্তা বলিয়া আমি দূরে সবিয়া যাই নাই—অমৃত কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। কিন্তু আমার যাহা জানিবার, তাহা সেই চবম অবমাননার সময়ে তাহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি। তাহার যন্ত্রণা আমি ভুলিতে পারিয়াছি, ভুলিতে পারি নাই কেবল তাহার মুখের একটি কথা—তাকে প্রাণে মেবো না অমর।

রোমের প্রাচীন গাথায় ও মহাকবি শেক্সপীয়রের কাব্যে একটি ভুল ছিল, আমার জীবনে তাহার সংশোধন হইয়া গিয়াছে।

আমার লুক্রেশিয়া আজীবন সেক্সটাসে আসক্ত।

মেহেরজানের মা

মিরজা আবদুল হাই

বেল ইস্টিশানে হাটের ভিড়। সবগুলো গাড়ীতেই লোক ঠাসা, তবুও একটা পাওয়া গেল একেবারে খালি। বেশ সাফ সুতবা। গদি মোড়া। মাথাব উপব বন্ বন্ কবে পাংখা ঘোরে। তারই ভেতর ছোট্ট একটা কুঠবি। আযনায় মুখ দেখা যায়। কল থেকে টিপটিপ কবে পানি পড়ে। তারই ভেতর ধাক্কা দিয়ে রকীবাকে ঢুকিয়ে দবজা বন্ধ কবে জমিলা বেবিষে গেল।

বকীবাব পেটে-পিঠে, শাড়ী ব নিচে, চটেব থলিতে সুপারি বাঁধা, হাতে মবিলের টিন। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আযনার ভেতব দিয়ে নিজের পেটেব দিকে নজব পড়তে মনে হল যেন আট ন'মাস। মেবাজান যখন পেটে এসেছিল, তখনকাব কথা বকীবাব মনে পড়ল। অনেক অনেক দিন আগেকাব কথা। বুকের দুক দুক ভাব ছাপিয়ে কেমন যেন একটা সরম-বাংগা অনুভূতি তাব মনেব অতলে শিহবণ জাগাল।

দশটাব গাড়ী বাক বাক কবে এগিয়ে চলেছে। মানুষের হালে বেঁচে থাকাব জন্য এই নতুন জীবিকাব পথে নোমে পড়া। শুধু আজকের জন্য বেঁচে থাকা, কালের ভবসা কাল। গবীবের শুধু দিনেব দিন বাঁচ, ভবিষ্যৎ তো শুধু বড়লোকের। রকীবাব অস্তবলোকের চিড় খাওয়া ভাবনা।

বকীবাব বুক হাতুড়ি পেটাব আওয়াজ। প্রাপ্তিব হিসাব পাঁচটাব গাড়ীতে নাভাবনে ফিবলে। এখন শুধু ভয়, মাবধব আব জেল-ফাটকের ভয়।

জমিলাই মুখে শুনা, সব বেটাই না কি দু'পয়সা কবে খাচ্ছে—তা সাযেব সুবা-ই হোক, আব মজুর ভিখবী-ই হোক। মনকে যুক্তি দেখায় রকীবাব।

বেনাপোলে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। থামাব কিছু পরেই জমিলা বলে, নেমে একটু হাঁটাইটি কব।

বকীবাব বলে—ভয় করে, যদি ধবে।

ধববাব হলে কি আব আমি নামতাম? আর ধরলেই বা কি? ওষুধ জানা আছে। চার আনা, আট আনা, বড় জোর এক টাকাই নিল। আব তাই বা নেবে কেন, খেপে খেপে যে পেট ভরাই, তাই বা কি এমনি নাকি। ধরবে কোন খানকীর পুত!

প্রতি মুহূর্তেই রকীবাব ভাবে এই বুঝি একটা বিপত্তি বাধে। গাড়ী থেমেছে তো থেমেই আছে। নড়বার নাম করে না। ধবা যদি পড়ে তো কি হবে? খুব নাকি মারধর করে। কিন্তু কতজনকে মারধর করবে। জমিলাই দেখিয়ে দিয়েছে—ওরা সবাই। জমিলার মত প্রৌঢ়া তো আছে-ই, বুড়া বুড়ি, ছেলে মেয়ে যোয়ান অগুণতি। এদের ভরসাই বা কম কিসের।

গাড়ী ছাড়বার আগেই জমিলা বলে দিল—দেখ, ঘাটে ঘাটে গাড়ী থামবে, আমাদের দরকার মতই থামবে। এখন থেকে ছাড়বার পর, পয়লা দু'বারে নামবি না, তার পরের বার, বুঝলি?

রকীবা মাথা নাড়ে। এত বড় কলের গাড়ী যা গাঁয়ের পিসিডেন্ট কিম্বা থানাব বড়বাবুও নাকি থামাতে পারে না, তাকে নিজেদের কথামত থামাতে চালাতে পারে যাবা নিজেকে তাদেরই একজন ভেবে বকীবা গর্ব অনুভব করত লাগল।

তৃতীয় বাব গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে বকীবা হাতে কবে নেমে পড়ে।

ফাঁকা মাঠ। অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ নেমে ব্রত পায়ে মাঠের দিকে দৌড়াল। বকীবা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। জমিলা তার কনুই চেপে ধবে বলে—দৌড়া, দাঁড়ালে চলবে না। বনগাঁয়ে জিনিস বেচাকেনার কারবারটা নির্বাঙ্কট নয়। ভোগান্তি অনেক। যাদের মহাজন সঙ্গে—তাদের তো পোষাবাবো। আব যাওয়া-আসাব হাস্লামা যতটুকু বকীবা আঁচ করে রেখেছিল—আসলে তাব সিকিও নয়। ভয় শুধু মনেই।

পাঁচটার গাড়ীতে বকীবা যখন ফিরে এল, তখন তাব কোমবে গৌজা কিছুটা খুচবা পয়সা, আর টিনে ভর্তি সেব চা'ব সরিষার তেল। সেবে কমসে কম টাকা, দেড় টাকা পাবে। বকীবা শুধু হিসাব কবে। আঙ্গুলের আঁকে আঁকে গুণতে গিয়ে ভালগোল পাকিয়ে ফেলে।

ঘরে ফিরবার সময় রকীবা যেন আব ইঁটতে পাবে না। অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো বা শুধু পেটে ভাতে বাত দিন গৃহস্থেব বাড়ী খাটনি, পান থেকে চুন খসলে অকথা অত্যাচার, সব কিছু যেন অনেকদিন আগেকাব দেখা দুঃস্থপ্লেব মত মনে হতে লাগল। হাওলাদাব বাড়ীর সেই কল্কী সেকাব ঘাটা পিঠে অনুভব করত চেষ্টা কবল। না, জ্বালা আব আছে বলে মনে হয় না। দু' একদিন পবই সে মেবাজানেব জনা একখানা দশহাত শাড়ী কিনে আনবে। একটুকবা তেনা পবে থাকে মেয়েটা। ভাল কবে পরলে নয় হাতে হবাব নয়। আব যা বাড়ন্ত গড়ন। পাডাব বদ ছোকবাবা এখন থেকেই বদনজব দেবাব তালে আছে। বুকে বুকো আগলিয়ে বাখে বকীবা। মান ইজ্জতই যদি না বাখা যায় তবে দুনিয়ায থেকে কি লাভ!

বজলটাকে নিয়েও চিন্তা কম নয়। ময়লা একটুকবা নেংটি পবে সারাদিন টো টো কবে ঘুরে বেড়ায়। ঘবে থাকলে রকীবাব প্রাণে শান্তি থাকে। মেবাকে দেখবাব একটা লোক থাকে। হোক না দুধেব ছেলে। খোদাতালা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, বজলেব জনাও একটা লাল শার্ট আব একটা পেণ্ট। পেটের দায়ে মেবাকেও ঘবে বাখা যায় না। লোকজনেব বাড়ীতে এটা সেটা কাজকর্ম করত হয়। বাঁধাধবা কিছু নয়, তবু বকীবাব ভয় কাটে না। গাঁয়ের ড্যাকবাঙলোব যা বকম-সকম।

মেহেবজানেব শাড়ী হয়েছে। মাথায় নাবিকেল তেল লেগেছে। বজলেব পেণ্ট শার্ট সব কিছু।

দিন গড়িয়ে চলে। খুঁকে খুঁকে বাঁচার দিন নয়, পেট ভবা। বেশ হাসিখুশী'ব দ্রুত চলমান দিন।

দিন কয়েক যেতেই বকীবা একদিন কালেব পিছন ফিবে তাকায। নিজেব কাছেই বিশ্বয়কব মনে হয়। ভাল কবে যেন বুঝে উঠতে পারে না। কি করে বজল ও মেবা দুজনেই মায়েব সংগে কারবারে নেমে পড়েছে। নেহাৎ যেন একটা গতানুগতিক ব্যাপার। তাব প্রথম দিনেব অভিযানের মত এদের আসার কোন বৈচিত্র্য নেই। মনে রাখবার কিছু নয়।

তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের সংগে ভিড়ে গেছে। ঠিক কাঞ্জে হাস্লামা যেমন কম, লাভও সেই অনুপাতে কম। তাই বা মন্দ কি, ঝক্কি যত মহাজনের ঘাড়ে।

ন'দশ বছরের বজল। ভয়ানক চটপটে। টিন হাতে সরিষার তেল আনাটা যেন তাব ধাতে সয় না। দু' এক দিন টিন নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপবই বাদ দিয়েছে, হয়তো মহাজনের নির্দেশে। ফিরবাব পথে লবণ নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণী'ব বেঞ্চেব তলায়—সেব

কয়েক লবণ বিছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। ধরা পড়বার প্রশ্নই উঠে না। যাত্য শুধু মালই যাবে। গাড়ী যখন চলে বজল তখন গাড়ী তলায়, একটা লোহাব রডেব উপর অনেকগুলি বন্ধু বান্ধবের সংগে বিড়ি টানে। লাল পাট সিল্কের একটা রুমাল গলায় বাঁধা, হাতে পিতলের একটা আংটি। কানে আধপোড়া বিড়ি। রকীবা যখন প্রথম শুনল যে বজল গাড়ী তলায় বসে চলাফেরা কবে, ভয়ে তখন সে প্রায় কঁকিয়ে উঠেছিল। বলা যায় না কখন কি হয়। বজল মায়ের কাছে কসম কবেছে—গাড়ী ভিতর বসেই সে যাওয়া আসা করবে। কিন্তু গাড়ী যখন চলে তখন গাড়ীর নিচটা দেখবার সুযোগ থাকে না বলেই রকীবা ভাবে মা অস্ত্রপ্রাণ ছেলে নিশ্চয়ই মায়ের কথা বাথছে। মেহেরজানকে বকীবা চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা কবে, কিন্তু সম্ভব আব হয় কই। বেনাপোলে গাড়ী থামলেই বকীবা মেয়ের খবর কবে। বকীবা প্রায়ই স্মরণ কবিয়ে দেয়—দেখিস, ঐ ছোড়াগুলির সংগে মিশাবি না কিন্তু, বুঝলি? মেবা বুঝেছে বলে মাথা হেলায়।

আব শোন, ঐ যে সেপাইগুলো, তা বেনাপোলেবই হোক, আব বনগাঁয়েবই, বুঝলি, সব বেটাই বদমাসের ধাড়ী। এ লাইনে সব শেয়ালের এক রা। খববদাব। বলে দিলাম।

উঠতি বয়সের মেবাজান বুঝে সব কিছুই।

সবসময় ধরা সোজা কথা নয়। তা ছাড়া, বৃষ্টি পড়লে, বাত্রে ঘবে ঘুমানো যায় না। ঝব ঝব করে পানি পড়ে।

মেবা বলে, এখন আব সে বকম অভাব নেই, ঘরটাকে মেবামত কব।

সময় কোথায়? লোক লাগালে দু' তিন দিন কামাই দিতে হয়। বকীবা নিরুদ্ভিগ কণ্ঠে জবাব দেয়।

সন্ধ্যার দিকে আর বকীবা ঘব থেকে বের হয় না। মাঝে মোল্লা পাডাব মজিদ আসে। অবস্থা মন্দ নয়। টিংটিঙ চোহাব। শেয়ালের মত পিটপিটে পূর্ত চোখ। সারা গায়ে পাঁচড়া নাকি, লোকে বলে খাবাপ বাবাম। কোন জন্মের কুটুম্বতা নেই, যেমাই কবেছে হয়ত, এতদিন, এখন বলে—চারি আছ কেমন? আর আডচোখে মেহেবজানের দিকে তাকায়।

বকীবার জুকুম আছে—ঐ ছোকরা মজিদ এলে, খববদাব বলে দিলাম— ঘোমটা তুলবি না।

মেবা ঠোট ঝকিয়ে বলে, তা এই ঘেয়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিস কেন? মেয়ে ও ছেলের হাত ধরে, রকীবা নাভারনের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় এসে উঠল। তালেব মিয়ার-ই কাজ কবে সে। এই লাইনে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে মহাজনের আশ্রয়ে। কেউবা ইন্সটিশনে, প্লাটফর্মের, কিংবা কোন দোকানের বারান্দায়, রকীবাই ছিল দূবে। গরীব বলেই শুধু গ্রামে এত লোকের মাঝে নিজের ভিটায় থেকেও ছিল নির্বাক। এদের মাঝে এসে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চারিদিকে শ'য় শ'য় যেন আপনার লোক। জমিলা, নন্দ, নিখিলের মা, জৈতুন এবা সবাই যেন কতকালের আত্মীয়। ব্যবসায়ীরা নাকি মিলেমিশে থাকতে পারে না অথচ আশ্চর্য, এরা সকলে একই কারবার করে কিন্তু অভিন্ন আত্মা। সুখে দুঃখে খবর করে, লাইনে কোন দিন কোন অফিসার চলে, কোথায় কিভাবে টিপলে কি ফল পাওয়া যায় সবাই সবাইকে বলে। দিল খুলে আলাপ আলোচনা করে। আশে পাশে সারা রাতেই প্রায় বাতি জ্বলে। খোলা বারান্দায় যেন ভয় নেই আর। গাড়ী ধরারও নেই তাড়াতাড়ি।

বয়স যেন আর তাল সামলাতে পারছে না। মেরার শরীরের গড়ন বয়সকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে চলেছে।

বেনাপোলে বনগাঁয়ে লাল করে পান খায় মেরাজান। রকীবার একদিন চোখে পড়ে গেল। দু'জন সেপাই মেরাজানের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। একজন বনগাঁয়ের আব অনাজন বেনাপোলের। প্রায় সব সেপাইরই মুখ চিনে রকীবা। এদের কাছে পাকিস্তান হিন্দুস্থান সব

এক। একজন সেপাই সরে গেলে পরে রকীবা জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেরাজানের চুলেব মুঠি ধরল।

মেরাজান চমকে উঠল।

হিড় হিড় করে লোহার বেড়াটা ব কাছে টেনে এনে রকীবা চাপা গর্জন কবে উঠল—
হারামজাদী, এই সেপাই ষণ্ডা দুটো ব সংগে কি কবছিলি?

মুখে ব উপর কোন দিন মেবা উত্তর দেয় না, কিন্তু আজ দিল—তোব সব তাতেই সন্দ’।
এত লোকের মাঝে চুল ধবে টানাটানি কবিস না বলছি।

বকীবা কিছুটা থতমত খেয়ে গেল।

মেহেবজান ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে।

—বুড়ি হয়ে গেছিস, তাল মান টের পাস না। এদেব সঙ্গে খাতিব রাখতে হয়।

— তোব খাতিব ধুয়ে পানি খা গে, যা। হাজার বার কবে মানা কবেছি, হাবামজাদীব কানে যায় না। ওই ডাকবা হাত বাড়িয়ে তোকে কি দিচ্ছিল?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেবা বোধ হয় উত্তর ঠিক করল। —বাঃ বে, ও আবাব কি দেবে!
পান কিনেছিলাম, ওবাই বলল পান খাওয়াতে। তাই দিয়ে দিলাম একটা। আমিই ত দিলাম।
পুলিশের লোক আবাব কাউকে কিছু দেয় নাকি কোন দিন?

—কাজ নেই বাপু পান খাওয়ানোব। একটু বুঝে সুঝে চলিস—বকীবা দবদ মিথিয়ে বলে।

মাঝে মাঝে, মাসে দু’ মাসে, অনেকগুলি সেপাই আব বর্ডাব পুলিশেব বড় সাহেববা এসে হানা দেয়। ধবপাকড় হয়, মাবধব লাগে, কিন্তু কপালগুণে বকীবাব কিছু হয়নি।
একদিন ব্যবস্থাটা হল বড় কড়া বকমেব। অন্যান্য দিন আগে থেকেই কিছুটা আভাস পাওয়া যেত কিন্তু সে দিন হঠাৎ যেন পৌষেব আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। গাড়ী ব পেছন দিয়ে নামতেই, লোহার বেড়াব অপর পাশেব জংগল থেকে অনেকগুলি সেপাই মাথা তুলে দাঁড়াল। ক’জন বেড়া টপকিয়ে প্লাটফর্মেব ভেতর এসে পড়ল। হাতে লাঠি। যাকে ধবে তাকে দু’ এক যা লাগায়। হলখুল ব্যাপাব। বকীবা স্তম্ভিতের মত পেটে বাঁবা সুপারীব থলেটাব উপব হাত বেখে এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ নজবে পড়ল একজন সেপাই বজলকে দৌড়িয়ে ধববা ব চেষ্টা কবছে। বজল লাফ দিল। তাব পা-টা লোহার পাতেব মাথা চোখা বেড়াব উপরটা অল্প স্পর্শ কবল মাত্র। বকীবাব বুকটা ধড়াস কবে উঠল, বজল ততক্ষণে বেড়াব অপর পাশে জংগলের মাঝে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেছে। হতভম্ব বকীবা পাগলের মত বেড়াব দিকে দৌড়াল। পবক্ষণেই তাব পিঠের উপব লাঠির একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সেদিন আর বকীবাব বনগাঁ যাওয়া হল না। সুপারী, তেলের টিন, ট্যাকে যা কিছু ছিল সর্বস্ব দিয়ে তবে নিস্তার। বকীবার মাথা টন টন কবছে। পিঠে জ্বালা আব ব্যথা। হাত দিলে টেব পাওয়া যায় পিঠেব চামড়া যেন বাইন মাছের মত হয়ে ফুলে উঠেছে। প্লাটফর্মের উপরই সে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফিবতি গাড়ীতে যারা বেনাপোলে নামল তাদের দেখে বকীবাব মনে হল কেউই কমেনি। অন্যান্য দিনের মত পুবা দলটাই ফিরে এসেছে। এদেব সংগেই মেবা বজল গাড়ী থেকে নামল।

বকীবা ছুটে গিয়ে বজলকে বুক জড়িয়ে ধবল। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—
কোথাও লাগেনিত রে?

কানের আধপোড়া বিড়িটা ধরাতে ধরাতে বজল জওয়াব দিল—দূর, লাগবে কেন?
দেখেছিলি না কি—আমার লাফ দেওয়াটা? বাবা, কত পেট্রিস করে শিখেছি। পুলিশের বাবাব সাধ্য আছে ধববে!

নাক দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফিল্মী কাযদায় ভংগী করে বজল।

ছেলের বীরত্বে বকীবাও যেন কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

মেবা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে পান চিবাতে চিবাতে বলে, — দেখি মা তোর কোথায় লাগল?

পরম স্নেহে মায়ের পিঠে বা হাতটা বুলায় মেবাজান।

বকীবা চুপ কবে থাকে।

কিছুক্ষণ পব, মেবা আঙ্গুলের ডগা হতে বাড়তি চুনটুকু দাঁতে কেটে নিয়ে ঠোঁটটাকে একটু ঝাঁকিয়ে বলে—মা, তোবও যেমন, বললে তো শুনবি না। বলেছিলাম না, খাতিবে কাজ হয়। দেখলি, ধরতে পাবল আমাকে? ফিক ফিক করে মেবা আত্মপ্রসাদে হেসে ওঠে।

বাগ কবে বকীবা—ঝাড়ু মারি অমন খাতিবেব মুখে। মুখপুড়ী, দাঁত সিঁটকাবী না বলছি।

তেবছা কবে হেসে মেবা বলে—তা হলে পড়ে পড়ে মা'ব খা'। যেমন আঙ্কেল।

বাড়ন্ত শবীবে একটা ঝাকানি দিয়ে মেবা টিন হাতে সরে পড়ে।

তালেব মিষা মহাজনের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে বকীবা পিঠেব ব্যথার কৌকায় আব ইন্টিশনের দিকে চায়। ঘুম আসে না। বজল পাশে শুয়ে নাক ডাকায। মেবাজান আজ আব ফিরেনি। সেই যে বেনাপোলে দেখল, ফেবাব আব পাত্তা নেই। জর্মালা, জৈতুন এদেব প্রায় সকলেব কাছেই বকীবা খবব নিয়েছে কিন্তু সঠিক খোঁজ কেউই দিতে পারেনি। যে ব্যাপারীব ঠিকায় মেবা কাজ কবে তার লোকজনেরব কাছেও খবব নিয়েছে। মেবা নাকি নন্দব কাছেই বেনাপোলে মাল সর্মঝায়ে দিয়ে কোথায় সবে পড়েছে। নন্দকেও খুঁজে পায়নি বকীবা। সে নাকি কিছুটা বাড়তি লবণ এনেছিল। তাই নিয়ে একেবারে যশোব চলে গিয়েছে। নাভাবনের কাজটা ঠিকমতই সেবে দিয়ে গেছে। বেশ লেখাপড়া জানা ছেলে নন্দ, কিন্তু কেমন যেন পাগলাটে পাগলাটে।

বাত যতই বাড়তে লাগল, পিঠেব ব্যথা ছাপিয়ে ততই মেবাজনের জন্য বকীবার দৃষ্টিভঙ্গা বাড়তে লাগল। যদি খাবাপ লোকেব পাল্লায় পড়ে থাকে? কাস্টমেব অফিসারগুলি একদিক থেকে মন্দ নয়। এদের নিষে বড় মাথা ঘামায় না। তাবা আছে তাদেব তালে। গাড়ী শুধু তল্লাশীই কবে। কি যে পায তারাই জানে। খুব ভাল লোক কি না তাই বা কে বলতে পারে? সন্দেহ জাগে বকীবাব মনে। ব্যাপারীব দালালদেব সংগে হযত যোগসাজস আছে, তাই বা কবে না। কিন্তু ঐ যে সেপাইগুলি, তা বনগায়েবই হোক আব বেনাপোলেরই হোক, ভালোব ভালো আব খাবাপেব খাবাপ। দু'দেশেব হিন্দু মুসলমানে এত যে মারামারি কাটাকাটি, এদেব কাছে কিছু নয়। কেমন মিলঝিল। খাও দাও আব ফুটি কব, মাঝে মাঝে শুধু খববদাবী আব পযসা কুড়ানো। কোন্ মেয়েব গতবটা একটু ভাল তাই খোঁজ নেওয়া; তা এপারেই হোক আর ওপারেই হোক। অবশ্য সাড়ে সতেবোয়া একদিন বড় সাহেবরা এলে তোড়জোড় কবে লাঠির কেবদানী দেখানো। এদেব বিশ্বাস করা যায় না। বদমায়েশের হাড্ডি সব। বিয়ে শাদা একটা মেবার না দিলে, মান-ইজ্জত আর রাখা যাবে না। বিয়ের কথা মনে পড়ায় বকীবাব মনে অনেকটা স্বস্তি জাগে। দু'একদিন কথাটা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল, কিন্তু এক নন্দ ছাড়া সবাই বলে, আবও বড় হোক। নন্দ ছেলেটা লেখাপড়া জানে বলে মনে হয়, বড় বড় কথা বলে। বোধ হয় বই পুঁথির শেখা কথা। একদিন নিজেই সে বলেছিল—চাচি, তোর মেহেরকে বিয়ে দে। হিন্দু মুসলমান যাই হোক, ছেলে একটা হলোই হল। আমাদের আবার জাত বেজাত কি? আগের কালে হিন্দুদের কাজ দিয়ে জাত ঠিকহত। কিছু দিন পর দেখবি—বনগাঁয়ে বেনাপোলের আমরা সুবাই একজাত হয়ে গেছি। আমরা ছেলে বা নাতির নাম হবে অমুক চন্দ্র স্মাগলাব। এমনি সব পাগলাটে কথা। সব কথা শুছিয়ে

রকীবাব মনে পড়ে না। কিন্তু যে যাই বলুক, মেয়ের শাদী নিয়ে কথা—জাত বেজাতের প্রশ্ন আসে বৈকি। জাত ধর্ম তো আর দেশ থেকে উঠে যায়নি। এখনও চন্দ সুকুজ উঠে। বকীবাব ভাবে, নন্দর সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কাল আরেকবার আলোচনা করবে।

বাত তিনটা বাজার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রকীবাব উঠে ইস্তিনাশেব দিকে পা বাড়াল। এই গাড়ীতেও মেরা আসতে পারে।

আসুক হারামজাদী আজ। এত রাত বাইবে থাকা বের কবছি। বকীবাব মনে মনে গবজায়।

মেরা সত্যি সত্যি গাড়ী থেকে নামল। ঢুলু ঢুলু চোখ, স্লথ গতি, কেমন যেন খোঁড়ার মত পা টেনে টেনে প্লাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এল। রকীবাব একটু অস্বস্তিকার জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। মেরা বাইরে আসতেই থপ্ করে খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

—হারামজাদী, বল— খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

হারামজাদী, বল, কোথায় ছিলি?

মেরা বোধ হয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল, ভড়কাল না। বরঞ্চ বেশ তিষ্ঠ গলায়ই জবাব দিল— যেখানেই থাকি, তোর কি?

বকীবাব মাথায় যেন খুন চড়ল। চটপট পিঠে মাথায় কিল-চড় চালাতে শুরু করল।

হারামজাদী খান্‌কী, মান-ইজ্জত আর বাখলি না।

মেবো ফোঁপাচ্ছিল, ফোঁৎ কবে উঠল—ও বড় ইজ্জতওয়ালাব চোবাই কাবাব কবেন— আবার মান।

কথা কইস না হারামজাদী, সাবাদিন ছিনালী কবে আবাব তেজ দেখায়। খববদার আমাকে আর মা বলে ডাকবি না। বাবন্দায় আব উঠবি তো তোরই একদিন কি আমাবই একদিন।

ধপ্ থপ্ কবে পা ফেলে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ কবে শুয়ে পড়ল। মেয়েও চরিত্রহীনতার অপমানে সারা অঙ্গে যেন সে বিছুটির জ্বালা অনুভব কবছে। এমন মেয়ে পেটে ধরেছিল বলে তার নিজের সন্তাটাই যেন অপবিত্রতার গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছে।

অনেকক্ষণ পব টের পেল মেরা এসে ছোট ভাইয়ের কাছে শুয়ে পড়েছে। বকীবাব চোখ মেলল না। একটা বোবা বকুণ্ডা অবসাদের আকারে তাকে চেপে ধরে বিষম লাগিয়ে দিয়েছে। সে নড়তেও পাবল না। একখানা হাত রকীবাব পিঠে পড়ল। ফোলা জায়গাটায় মেরা হাত বুলাচ্ছে। কাঁচের চুড়িগুলি টুনটুন করে বাজে। রকীবাব নিজীবের মতই চুপ কবে রইল।

এই মা, ঘুমিয়ে পড়েছিস?

রকীবাব চুপ।

খুব লেগেছিল, না-রে?

রকীবাব উঃ করে শব্দ করল।

জানিস মা, ওই যে কপালে মোটা আঁচলওলা সাদেক আর বনগ্রামের সুরেন্দ্র,—তাবা বলেছে, আমাদের কোন ভয় নেই। বিপদে আপদে তারাই দেখবে।

পেট্রলের মধ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইর কাঠি ফেলে দিলে যেভাবে দগ্ন করে জ্বলে উঠে, রকীবাব মগজও যেন সেইভাবে জ্বলে উঠল। অস্বস্তিকারে হাত নাড়ার সময় একটা আধপোড়া চেলার গায়ে হাত লেগেছিল—নিঃশব্দে তাই তুলে দমাদম মেরাজানের উপর চালাতে লাগল। চিৎকার করে মেরা অস্বস্তিকারের ভিতর মিশে গেল। ঘুমন্ত বজলের উপর দুই এক ঘা পড়েছিল, সেও কেঁদে উঠল। রকীবাব সুর তুলে অশ্রাব্য ভাষায় মেরার উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে লাগল। সোরগোলে লোকজন উঠে পড়েছিল, তারা এসে জোট পাকল। বকীবাবে সাধুনা দেবার চেষ্টা করল।

বাকী রাতটুকু রকীবা আর ঘুমাতে পারল না। বজলকে বুকের মাঝে চেপে ধরে পড়ে রইল। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। কিসের দুঃখ তার। রকীবা নিজের মনকেই প্রশ্ন করে। যে মেয়ে মান-ইজ্জতের ধার ধারে না, তার সংগে কিসের সম্পর্ক? সে যেখানে খুশী যাক, রকীবা আর তার মুখ দেখবে না। মেয়ের ইজ্জত বন্ধক দিয়ে পয়সা রোজগার করবার আগে যেন তার মরণ হয়। মেরাজান তার মেয়ে নয়; কোন খানকীর মেয়ে হয়ত ভুল করে তার পেটে এসে জায়গা নিয়েছিল কে জানে। ভোরের দিকে রকীবাব চোখ দুটা জড়িয়ে এল।

চলতি গাড়ীতে বসে, প্রাটফবমে দাঁড়িয়ে সুখ-দুঃখের কথা হয়। একদিন জমিলা বলে—মেরাকে কি সত্যি বিদায় করে দিলি নাকি? এই লাইনে এসব ধরলে চলে না। হাজার হোক পেটের মেয়ে তো। বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন। গুম হয়ে থাকে রকীবা কিছুক্ষণ, তারপর শান্ত কণ্ঠ বলে—একটা কথা এতদিন তোকে বলিনি বু’, মেবা আমাব পেটের মেয়ে নয়। বিন্মাব ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

শেষের কথাগুলি খুব কষ্টে উচ্চারণ করে বকীবা। গাড়ী চলাব খট খট শব্দে গলার আঙুয়াজেব বিকৃতি হয়ত জমিলা ধবতে পাবেনি। শাড়ী'ব আঁচল দিয়ে বকীবা দু' চোখ চেপে ধবে। এক গাড়ী লোক। পায়ে পায়ে ঠাসা। একটা কঁকিয়ে উঠাব শব্দ জমিলা'ব কানে যেতেই সে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন কবল—কি হল বকীবা। আঁচলে'ব মধ্যেই মুখ বেখে রকীবা জবাব দিল—কিছু না, চোখে কয়লা পড়েছে।

তালেব মিযা মহাজনের বাবান্দায় শুবে বাতে'ব আঁধাবে বজলকে বুকে চেপে ধরে বকীবা চোখে'ব পানি ফেলে। আঁচল আব চাপা দিতে হয় না। মেবা গেছে—যাক। বজল এব সোনা'মার্কিক। ঘুমন্ত বজলে'ব মুখটা নিজে'ব বুকে'ব উপব চেপে ধবে। যেন কোলে'ব শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

একদিন বেনাপোলে'ব ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে গাড়ীটা থামতেই হৈ হৈ একটা বব উঠল। একটি ছেলে কাটা পড়েছে। নীচে'ব বডে বসে আরেকটি ছেলের সংগে বিড়ি নিয়ে ঝগড়া কবছিল। ফল যা হবাব হয়েছে। এতগুলি লোকে'ব মুখে মুখে ছেলোটার পরিচয় ঠালগোল পার্কিয়ে হোঁচট খেতে খেতে বকীবা'ব কানে যখন পৌঁছল তখন গাড়ী আবাব চলতে শুরু করে দিয়েছে। শফিক, মনীন্দ্র, না হয় বজল। এই তিনজনের মধ্যেই একজন। ঘটনা ঘটেছে দুই দেশে'ব সীমানাব পাথবটার কাছে। তেলে'ব টিনটা হাতে নিয়ে রকীবা পাথবে'ব মত দাঁড়িয়ে বইল। যে যাব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে উঠে পড়ল। চলন্ত গাড়ী থেকে কয়েকটি কণ্ঠ চিৎকাব কবে উঠল—ও রকীবা, তাড়াতাড়ি উঠে আয। জলদি কর। বকীবা পাথব।

গাড়ীটা যখন অনেকখানি এগিয়ে গেল, রকীবা তখন হাতে'ব টিনটা সেখানেই ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে লাইন ধরে বনগায়ে'ব দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

শুধু রক্ত আর রক্ত!

মানুষ বলে চিনবার যো নেই। খেতলিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। মনীন্দ্রেরও হতে পারে, শফিকেরও হতে পারে। হঠাৎ নজরে পড়ল একখানা অক্ষুণ্ণ হাত আর সেই হাতে'র আঙ্গুলে পিতলের আংটি। রকীবা আর কিছুই টের পায়নি, শুধু সমস্ত রেললাইনটা যেন ঘুরতে ঘুরতে একটা রক্তের বন্যার মত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পাশের গ্রামের একটা পড়ে দালানের দাওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় ক'দিন পড়ে ছিল রকীবা। হয়ত কোন সহৃদয় গ্রামবাসী লাইন থেকে উঠিয়ে এনেছে। টের পায়নি।

রকীবা ভাবে—মেরাজান খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসতো, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনেব গলাটা টিপে ধরে ভাবনাটার দম বন্ধ করে মাবতে চায়। না, না, মেহেবজান বলে কেউ তাব কোন দিন ছিলই না। ধুঁকে ধুঁকে মরবে—সেও ভাল।

এই কদিনেই যেন বয়স তার দশ পনের বৎসর বেড়ে গিয়েছে। পিঠটা বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। ভর না দিয়ে ভাল কবে চলতে পারে না। বাস্তাব পাশ থেকে একটা বাঁশের টুকবা কুড়িয়ে তাতেই ভর দিয়ে রকীবা কোণাকোণি পথে ভিক্ষা করে তিনদিনে সরসপুরে এসে পৌছল।

নিজের ঘরটাব শুধু ভিটির চিহ্ন আছে আর কিছুই নেই, শুধু একটা পোতা। ক্লান্ত বকীবা পোতাব উপর বসে পড়ে বজলের মৃত্যুর পব এই প্রথম চোখেব পানি ফেলল।

কাজ পাবার আশায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে রকীবা। যেখানেই যায় সেখানেই প্রশ্ন হয়—আঁচল দিয়ে চোখ মুছে রকীবা উত্তর দেয়—মবে গেছে।

আহা-হা, কি কবে ম'ল।

গাড়ীতে কাটা পড়ে।

সবাই আহা-হা করে, কিন্তু চাকবি দেয় না কেউই। হয়ত বা সাত কলস পানি আব দুটা ঘব লেপানোব বদলে দেয় আধ থালা পাস্তাভাত।

প্রথম দিনেই বেনাপোলে চোখে পড়ল মেবাকে। চেনা যায় না যেন। নূতন লাল সবুজ চেকশাডী ব্লাউজ। একপোচ পাউডাবও হয়ত লাগিয়েছে পুষ্ট মুখেব উপব। চোখ ফিবানো যায় না। রকীবা চোবেব মত সন্নিহ্ন দৃষ্টিতে চায়—বিদ্রোহ-কবা মনটা হয়ত পাহাবা দিচ্ছে। কখন ধবা পড়ে যায় কে জানে।

পুবানো পবিচিতবা হেঁকে ধবে।

ছিলি কোথায় এ্যাদিন।

এমন হলো কি করে।

রকীবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জওয়াব দেয়—যাব কোন চুলায়! অসুখ কবেছিল।

গাড়ীটা ছাড়ছে না। কাস্টমের চেকিং শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু কেন দেবী কবছে কে জানে।

রকীবা প্লাটফর্মের পেছন দিকে— বেলিং-এব কাছে একটা নুডিপাথবেব স্তুপেব উপর একা একা বসে সুপারী চিবচ্ছিল। পিছন থেকে মেরা এসে তাব পিঠে হাত বাখল।

বকীবা নিরুদ্দিগভাবে মাথা ঘুরাল।

এ্যাই মা।

প্রকম্পিত করুণ অথচ মিষ্টি দুটা শব্দ। বহু বছবেব পবিচিত।

অন্তরেব নিরুদ্ধ মণিকোঠার গলা টিপে বাখা অন্ধ মাতৃহুটা যেন সশব্দে ঝলকিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশ কবল।

মেরা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই ঝটতি বেগে উঠে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ল—ছিনালীর আব জায়গা পাস না! মা ডাক গিয়ে যে বেবুশ্যো তোকে পেটে ধরেছিল, তাকে। কোথাকার কোন আন্তাকুঁড়েব ময়লা—আমাকে বলে কিনা না!

রকীবা একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে সামনের দিকে হন হন কবে এগিয়ে গেল।

দু'একজন ব্যাপারটা দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পিছু ধাওয়া করে রকীবাকে জেরা শুরু করল। সে একটা প্রশ্নেরও জওয়াব দিল না। বেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দশটার গাড়ীতে যাওয়া আর পাঁচটার গাড়ীতে ফিরে আসা। জীবন সংস্থানের দুক্লহ পরিক্রমা।

শরীরে যথেষ্ট বল হয়েছে। আর কিছু না হোক, দু'মুঠা ভাত তো পেট ভরে খাওয়া যায়।

আজকাল সকলের মুখে মুখে একটা কথা ঘুরে ফিরছে। সেপাইরা নাকি গুলি করে চোরাকাবাবাব বন্ধ করবে। কাগজে নাকি লিখেছে। কেউ বলে গুলি কবে ধরবে। নানা মুখে নানা কথা। তবে গুলি যে করবে এই সত্যটুকু সবার মুখেই এক — গুপ্ত সময়ের তফাৎ। মহাজনোবা বলে— কবক দেখি, কত গুলি কবতে পারে। বন্দুকের নলের মুখেও ছিপি আঁটা যায়, বুঝলি? চান্দির ছিপি। তোরা কিছু ঘাবড়াবি না।

বকীবাব ভয় হয়, গুলির ভয়। কিন্তু পবমুহূর্তেই ভাবে—কবক না গুলি। চুইয়ে চুইয়ে তো রক্ত পড়বে না—বজলের মত হয়ত লহমাব মধোই সব শেষ হয়ে যাবে। তা ছাড়া এত শতে বিশতে যদি ভয় না পায়, তবে সেই বা পাবে কেন! ওজবটা উঠার পর থেকে কমেছে নাকি কেউ। না লাইন ছেড়ে দিয়েছে?

কিন্তু সতাই একদিন ঝামেলা বাধল। বেনাপোলে গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গেই ধুম ধুম কবে শব্দ হল। লোকজনের চিংকারে প্রাচীরের মুখরিত হয়ে উঠল। ছেলে মেয়ে বুড়া বুড়ী যোয়ান সকলেই প্রাণ হাতে কবে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটছুটি কবছে। হাটের মধ্যে একটা পাগলা মহিষ ঢুকে পড়লে যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি হয় তেমন যেন একটা কিছু হয়েছে। বকীবা গার্ডের গাড়ীর সঙ্গে লাগানো একটা কামবায় ছিল। মাটিতে নেমে হতভম্বের মত গাড়ীটাব কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বইল। সন্তুষ্ট চিংকার কলববের মাঝে গুলি গুলি শব্দের কাটা আওয়াজ। বকীবাব বুকো আশ্চর্যবন্ধাব আকুল মন্ততা, চোখে মৃত্যুভয়েব বিভ্রান্ত।

বেলিং যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে সেপাই সান্দ্রী যেন অপেক্ষাকৃত কম। লোকজনও যেন সেদিকে দৌড়াচ্ছে না। এই কি সুযোগ। ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালনে হঠাৎ বকীবাব নড়বে পড়ল ইস্তিশনের প্রাচীরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মেবাজান এক সেপাইব সঙ্গে হেসে হেসে কি আলাপ করছে। মুহূর্তে বকীবাব মনে পড়ল মেবাব সেই কথাগুলি— “তারা বলেছে, বিপদে আপদে ভাবা দেখবে, আমাদের কোন ভয় নেই।”

না, না, মবণ— সেও ভাল। পেটের মেয়েব যৌবন বেচে বেঁচে থাকতে চাই না।

ধুম ধুম কবে আরও কটা শব্দ হল। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পড়ে গেল। এমনিই কি সব লাল হয়ে যাবে। সীমানাব পাথরের কাছে লাইন স্নিপাব, পাথরের মত। বকীবা হাতের টিন ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বেলিং—এব শেষ মাথা পাব হয়ে পাশের ঝোপের দিকে দৌড়াল। এক জায়গায় হেঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। না উঠে এই জায়গায় লুকিয়ে থাকলেও হয়। কথাটা মনে পড়তেই দেখল একজন সেপাই তাবই দিকে ধাওয়া কবছে, হাতে লাঠি না বন্দুক কে জানে। বকীবা মবির্বাচি কবে দৌড়াতে লাগল। পরনের কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, কাঁটায় লেগে অনেক জায়গায় রক্ত ঝবছে— সেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই। কয়েক পা যেতেই ঝোপের ভেতব থেকে আরেকজন সেপাই তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত এগিয়ে এল। লহমাব মধো বকীবা চিনতে পারল—কপালে সেই মোটা আঁচিল—কি নাম যেন তাব! হাতে কি বন্দুক?

রকীবা কদ্ধনিশ্বাসে অতি কষ্টে যেন চিংকার করে উঠল, “আমি, আমি মেরাজানের মা। চিনতে পারছ না!”

ছেদ

আবু রুশদ

আব পাবা যায় না। নঈমা নিতা গঞ্জনা দেয় : নিজেব বউ ছেলেকে খাওয়াবাব মুবোদ নেই। মবদ হয়ে জন্মেছিলে কেন ?

মবদ হয়ে জন্মালেই যে সব সময় বউ ছেলেকে খাওয়াবার মুবোদ হয় এই ধারণা নঈমা কোথা থেকে পেলো সে-ই শুধু জানে। তবে কেরাণীর চাকুবী কবে নজমুল যে বউ ছেলেকে যথেষ্ট পবিমাণে খাওয়াতে পাবে না এটা ঠিক।

দশ বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে— ছেলেমেয়ে হয়েছে চাবটি। প্রথম ছেলেটা নঈমাব বাপেব বাড়ীতে হয়েছিল। ছেলা হওয়ার সব কিছু খবচ তাঁবাই কবেছিলেন। পবেব তিনটিব জনা সেখান থেকে তেমন সাডা না পাওয়ার দকন দাইযেবই শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। শেষেব তিন বারেব কোন বাবই নঈমা একসঙ্গে দশ বাব দিনেব বেশী বিছানায় থাকতে পাবেনি। দবকাব হলেও বা ইচ্ছে কবলেও সংসারেব কামেলা তা হতে দেখনি।

অথচ, এখানেই খোদাব বহমতেব আভাস, নঈমাব শরীবটা এখনও অটুট। এমন কি কোথাও একটু ভাঁজ পড়েনি। কি কবে কম খেয়ে নিতা অভাবেব সঙ্গে যুঝে নঈমা তাব শরীবটা এখনও ঠিক বেখেছে নজমুল তা বুঝতে পাবে না।

অবশ্য নঈমার দুব সম্পর্কেব এক মাদ্রীয় ইউনিভার্সিটিতে এম এ পড়ে—মাঝে মাঝে বিস্কুট-লজেন্স নিয়ে আসে। সেওলি তো বাচ্চাবাই খায়। আব নঈমাও যদি চুপি চুপি সেওলোতে ভাগ বসিয়ে থাকে, তবে শুধু তাতেই তো তার দেহে এত পুষ্টি আসবার কথা নয়।

নিজের দেহ সম্বন্ধে, এই এত অভাবেব সংসারেব মধ্যে নঈমা বেশ সচেতন। বাজাব খরচা থাকুক বা না থাকুক তার নারকেল তেল চাই-ই। নঈমাকে মাথার চুল শুকনো বাখতে নজমুল খুব কম দেখেছে।

একবার সপ্তাহখানেক এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। সেবাব বড় ছেলে খালেদ, বয়স যখন তাব বছর চাবেক হবে, শীতে প্রায় সাবাদিন শুধু একটা ছেঁড়া গেঞ্জী পরে থাকবাব দবন, কঠিন অসুখে পড়েছিল।

প্রথম তারা চালিয়েছিল হোমিওপ্যাথি—পয়সা কম লাগে বলে। তবে রোগের যখন তাতে কোন উপশম হল না তখন বাধা হয়ে এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার তারা আনিয়েছিল, বহু কষ্টে ধার জোগাড় কবে।

ডাক্তার বললো নিউমোনিয়া। তবে সময় মত ধরা পড়াতে ভয়ের কিছু নেই।

সেবার একসঙ্গে সাতদিন নঈমা মাথায় তেল দেবাব কথা ভাবতে পারেনি। উদ্ভ্রান্তের মত ছেলের সেবা করেছিল। চুলে তখন তার বেশ জট ধরে ছিল বটে, তবে সেবার তা মা হিসেবে তাকে দেখতে নজমুলেব চোখে আরও যেন ভাল লেগেছিল।

এক রাতে খালেদের অবস্থা খুব খারাপের দিকে গিয়েছিল। ডাক্তার আবার ডাকা হল, ইনজেকশন দেওয়া হল, ওষুধ আনা হল। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই প্রায় সারারাত জেগে অসুস্থ ছেলের সমস্ত খুঁটিনাটি প্রয়োজনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল।

নঈমা তাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে নিতে বলেছিল—সারারাত জেগে শরীর যদি আবার ভেঙে পড়ে তবে আর এক মুসিবত।

—ঘুমোনো তোমাবই বেশী দবকার। নইলে একা মানুষ এত ঝামেলা পোহাবে কি কবে? স্বামীর কথা শুনে নঈমা হঠাৎ রেগে উঠেছিল : নিজের ছেলের সেবা করা ঝামেলা নাকি?

—তাই বললাম বুঝি, সংসারের কাজও তো আছে। জবাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে নঈমা হঠাৎ স্বামীর খুব কাছে সরে এসে ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে কর্ণপত স্বরে জিজ্ঞেস করবেছিল : ছেলে আমার বাঁচবে তো।

স্ত্রীকে বাঁ হাতে বেটন করে নজমুল গভীর আশ্বাসের স্বরে অভয় দিয়েছিল : আরে বাঁচবে না কেন, আজকাল নিউমোনিয়াতে লোক কি আর সহজে মবে? কত ভালো ওষুধ বেরিয়েছে।

ছেলে ভাল হয়ে যাওয়াব পব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সে নৈকট্যবোধ আর বেশী দিন থাকেনি। আবার সেই দিনেব পব দিন অভাব। ছোট মেয়েটা একেবারে দুধ পায় না, মেজছেলেব কামিজটা এত জায়গায় ছিঁড়েছে যে আর তালি দিয়েও পববার উপায় নেই। নঈমাব নিজের পবনেব পাড়ী দুটোয় এসে দাঁড়িয়েছে—তাব একটা আবাব ছিঁড়ি জিঁড়ি কবছে।

অবিরত অভাবেব এই ফিবিস্তি ওনে নজমুল এক একবাব খেপে উঠতো : পয়সা কি আমায় চুবি কবতে বলো?

—তা আমি কি জানি, নঈমা উঃ-টা নৌঝে উঠতো, তবে পয়সা কামাই করা তো মেয়েদেব কাজ নয।

—না ই বা কেন? শুধু পুকষেব ওপবই সমস্ত ঝক্কি পড়বে কেন, তুমি কিছু আয় করতে পাব না? শোসেব দিকে নিজের অজান্তেই নজমুলেব গলার আওয়াজ একটু বঁকে গিয়েছিল।

—কিভাবে আয় কববো! পথ বাংলে দাও না।

—কেন, সেলাই-টেনাই তো কবতে পাব।

—ওবে আমাব মবদ বে, সেলাইযেব দশটা কল যেন আমায় কিনে দিয়েছে! শবম হয় না নিজের দোম অনোর কাঁধে চাপাতে?

তাব ভেতবটা তেতো হয়ে উঠলেও এব কোন জবাব নজমুল দিতে পাবতো না—তাই চুপ কবে যেতো। তবে এই যে চুপ কবে যেতে হয় এটাত্তেই সব চেয়ে বেশী দাহন। মরদ হয়ে জন্মালেও সত্যি তার মুরোদ নেই।

একদিন দূবাস্বীরটা এসে প্রস্তাব করে : চলুন দুলাভাই, আপাকে নিয়ে একটা সিনেমা দেখে আসি। ‘মহল’ ছবিটা নাকি বেশ ভাল হয়েছে।

সিনেমা দেখবার সখ থাকলেও সে নিজে গেলে সমস্ত খবচটা বাধা হয়ে তাকেই দিতে হবে, একথা মনে হওয়াতে নজমুল কথাটা একটু কৌশলের সঙ্গে ঘুবিয়ে নেয় : না ভাই, সিনেমা দেখা কি আমাদের পোষায়, তোমার আপা যেতে চাইলে তাকে নিয়ে যাও।

আর, নজমুল কিছুটা আহত হয়ে লক্ষ্য করে, নঈমাও সহজে বাজী হয়ে যায়। কিছুটা সেজেওজে কানিশের জুতো পবে রিক্সায় চড়ে দু’জনে সিনেমা দেখতে বেবিয়ে গেল—বাচ্চাদের তদারকের ভার নজমুলের ওপর ছেড়ে দিয়ে।

রাত নটায় সিনেমা থেকে ফিরে এলে নঈমাকে নজমুল বললো : এভাবে যে সিনেমা যাও লোকে জানতে পারলে কি বলবে?

মধুর সরলতার সঙ্গে নঈমা জবাব দিলো : ভাইয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাব তাতে দোষের কি আছে? তোমার মনটা দেখছি বড় ছোট। তারপর স্বামীকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললো, সত্যি ‘মহল’-এ মধুবালাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

তাতেও নজমুল ঠিক প্রবোধ মানে না। ভাবে ঃ সে যখন নঈমাকে ছেড়ে সিনেমা দেখে না, বন্ধুরা দেখাতে চাইলেও, তখন নঈমা তাকে ছেড়ে সিনেমা দেখতে গেল কি কবে। তাও পরপুরুষের সঙ্গে!

ভোরে উঠে নজমুল দেখে মেজ ছিলে বিছানা ভিজিয়েছে। ভোবের যে হাওয়া মনকে কিছুটা সতেজ করতে পাবতো, প্রস্রাবের কটু গন্ধ তার সঙ্গে মিশে নজমুলের মেজাজটাকেই বিগড়ে দিলো। এ বকম প্রায় রোজই হয়। তবে গতরাতের কথা ভেবে মনটা আর সব দিনের চেয়ে একটু বেশী খিচিয়ে থাকে।

চিড়ে আর এক কাপ কম-দুধের, কম-চিনির, ধোঁয়াব বিশ্বাদ চা খেয়ে, ভাঙা পাক-ঘব থেকে এখনও অবিরত আসা ধোঁয়া পান করে নজমুল নিজের সংসারের দিকে একবার চেয়ে দেখে।

দু'ছেলেই উদম হয়ে ঘুরছে, বড় মেয়েটির পরনে একটা ছোঁড়া জামিয়া। ভিজ়ে কাঁথা শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বেলা ন'টার রোদ কাঁথার আর্দ্রতা সদা শুষতে আরম্ভ কবেছে বলেই গন্ধটা তার এখন আবও কটু। ভিজ়ে পুরনো নোংরা কাঁথার কাপড় এখন ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেছে।

এই তা হলে তার মাসে ত্রিবিশ দিনের কাহিনী।

ওদিকে নঈমা আবাব তাড়া দিচ্ছে ঃ খুব যে বোদ পোহাতে বসলে, বাজার করতে যেতে হবে না? ওদিকে অফিসে খেয়ে না যেতে পারলে তো আমাব চৌদ্দ গুণ্টী উদ্ধার কববে।

মিথো মিথো গল্পনা, অভাবের দৈনন্দিন নিষ্করণ পীড়ন, দিনে দিনে একটু একটু কববে ক্ষয়ে যাওয়া। না, এ আর চলবে না। যেমন কবেই হোক এ জীবন বদলাতে হবে। পাবে যা ঘটুক, কৃচ পরওয়া নেই। মুহূর্তে নজমুল নিজের মন ঠিক কবে ফেলে।

ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের কব্বানী বলে সুবিধে অনেক। প্রথম যেদিন সে দু'টাকা ঘুয নেয নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, যে হাতে টাকাটা নিলো তাতে কয়েকটা আধা-লাল, আধা-কাল কেঁচো ঢুকে পের্চিয়ে পের্চিয়ে ঘুরে তাদের পিচ্ছিল দেহ থেকে একটু একটু করে বস নিঃসরণ কবে সমস্ত হাতটাকে দুর্গন্ধে ভাবে দিয়েছে।

কিন্তু অফিস থেকে ফেরবাব সময় বাবু বাজারের কাছ থেকে নঈমাব জন্য সেদিন কিছু বেলফুল নিতে ভোলেনি।

নঈমা তাজ্জব হয়ে গেছলো। কবে যে এব আগে নজমুল তাব জন্য ফুল এনেছিল, নঈমা সে কথা এখন আর মনে করতে পাবে না। তবে তা নিয়ে এখন নজমুলকে গল্পনা দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। স্বামীকে নিয়ে এখনও নঈমার মনে কিছুটা সাধ আছে। নিজের অটুট দেহসুবন্দা সম্বন্ধে সে সংসারের হাজার দীনতার মধ্যেও সচেতন না হয়ে পাবে না। স্বামীর তরফ থেকে আজকাল তেমন সাড়া পাওয়া যায় না বলেই ইউনিভার্সিটিতে-পড়া সেই ছোকরা আত্মীয়ের ওপর নঈমা সেটা পরখ করে মনে মনে খুশী হতো।

অথচ পরপুরুষকে নিয়ে অসতীত্বের কোন চিন্তা তাব মধ্যে নেই। শুধু নজমুল যদি তাকে মাঝে মাঝে কাছে ডাকতো, কিছুটা আদর করতো, কখনও কখনও চুলের ফিতা বা অন্য কোন চুটকি উপহার এনে দিতো, তবে তার নিজের মেজাজ এতটা খিটখিটো কখনও হতো না।

আজকে রাতে শুধু কয়েকটা বেলফুল—বড় জোর সব মিলে দু'আনা দাম হবে—নঈমার নিজের চুলে বেঁধেছে। তাতেই মনে কি অঘটন ঘটে যাচ্ছে।

বাচ্চারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা কামরাটা ফুলের গন্ধে ভরে গেছে। জানালার ফাঁক দিয়ে, অনেক দিন পরে কামনা-কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে নঈমা কয়েকটা গিনির মত উজ্জ্বল তারা

দেখতে পায়। মনটা তাতে এমন ভরে যায়। সাধ হয়, নজমুলকে নিয়ে আসমানের অঙ্গনে তারা দু'জনে ঘুরে আসে, তারাও হোঁওয়া নিজেদের মধ্যে নিয়ে।

ওদিকে নজমুলও খুশী হয় অনেকদিন পরে নঈমাকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়ে। রাতের গোপনতায় বেলফুল কতটা মাদকতা সৃষ্টি করতে পারে সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাব ঘুম নেবার কথা মনে পড়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে সেই কৈঁচোর ছবি।

নঈমা লক্ষ্য করে সংসারের ছোটখাট অভাব এক এক করে সব দূর হয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের সার্টপ্যান্ট এলো, মেয়েদের ফ্রক। নজমুলের একটা নতুন ঠাণ্ডা সুট, তার নিজের তিন চারটে শাড়ী।

তাতে নঈমা কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলেও কৌতূহলও তাব মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। একদিন নজমুলকে জিজ্ঞেস করেই বসে : আজকাল এত পয়সা আসে কোথেকে ?

—আমরাও দবকাব হলে কিছু পয়সা আয় কবতে পারি গো। নজমুল অনেকটা দুর্বল কণ্ঠে বলে।

—আয়টা কিভাবে হয় তাই বল না কেন। নঈমা আবো পবিত্তাব জবাব চায়।

—টুইশানি কবি আব গেট-এ ওয়ার্ড-এ মাঝে মাঝে টাকা পাই। নজমুলের নিজের কানেই নিজের কথাগুলো বড় ফাঁকা শোনায়।

সংসারে সদা-আসা সচ্ছলতা লক্ষ্য করে বড় ছেলে মায়েব উপস্থিতিতে একদিন বাপেব কাছে এসে দাঁড়ায়। পাড়ায় তাবা একটি ক্রিকেট টিম কবেছে। তবে 'ব্যাট' এ পর্যন্ত জোগাড় হয়নি। তাব খেলাব সাথীবা তাকে ধবেছে বাপকে বলে একটা ক্রিকেট 'ব্যাট'—এব টাকা জোগাড় কবতে পারি কিনা। প্রথমে মাকে বলেছিলো। নঈমা জবাব দিয়েছিলো : তোব বাপকে বলতে পারিস না ?

তাই সাহস করে ছেলে বাপেব কাছে এসে প্রত্যাশাব ভঙ্গীতে দাঁড়ায় কিন্তু আসল কথাটা মুখ ফুটে আর বলতে পারে না।

নজমুল ছেলেকে অভয় দেয় : কি, তোমাব মতলব কি ?

ছেলেব দ্বিধা দেখে মা সে কথাটি জানিয়ে দেয়।

নিজেব ছেলেব প্রতি নজমুল সহসা গভীর মমতা বোধ করে। বড় সুবোধ, নম্র তার এই ছেলে। কখনও তেমন কিছু আবদাব কবেনা। আজ শুধু ক্রিকেট ব্যাট—এব জন্য বাপেব কাছে আবদার কবতে এসে দ্বিধায় কেমন জড়সড় হয়ে গেছে।

সারা ঢাকায় ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলাব ধুম পড়ে গেছে। যাদের বাপের অবস্থা ভাল, হাফ সার্ট হাফ প্যান্ট পবে পায়ে প্যাড লাগিয়ে হাটন কম্পটন—এর নাম উচ্চারণ কবে বেশ অভিজাত ধরনে এই খেলাব অনুশীলন কবে।

আর তার নিজের ছেলে বেচারা এ পর্যন্ত একটা ক্রিকেট ব্যাট জোগাড় কবে উঠতে পারেনি।

নজমুল যখন তাকে সাতটি টাকা গুণে দিল, ছেলের মুখে সে কি পূর্ণতার হাসি। নির্ভেজাল সুখ বলে যদি কিছু থাকে, এই রকমেই শুধু তা অনুভব করা যায়। সাফল্যের উজ্জ্বল হাসিতে তার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নজমুল পিতৃহের গাঢ় আনন্দ যেমন নিজের মধ্যে অনুভব করে, নিজের হারানো কৈশোরের কথা মনে করে তেমনি বেদনায় মন তাব ভরে যায়।

নঈমাও আবদার জানায় : স্যাকরাকে একবার ডাক দাওনা। সালেহার (বড় মেয়ের নাম) জন্য দুটা সোনার চুড়ি গড়াই।

তার কোন পরিত্কার জবাব না দিয়ে কিছুটা রহস্যের ভঙ্গীতে নজমুল জিজ্ঞেস করে : আর তোমার নিজের জন্য ?

থাক অত সোহাগে কাজ নেই—পরিমিত ধরনে ঝামটা নিয়ে নঈমা বলে—আমি চার ছেলের মা, আমার এখন চুড়ি পরবার সখ নেই। তারপর কিছুক্ষণ থেমে—তার চেয়ে বরং এক কাজ কর, আমাকে আট আউন্স ভাল উল আর একটা ভাল প্যাটার্নের বই এনে দিয়ো। সামনে শীতের জন্য তোমার একটা সোয়েটার বুন দেবো।

তাহলে ঘুম খাওয়াটা একেবারে বিফল যাচ্ছে না দেখছি। মনে মনে নজমুল ভাবে, বউ ছেলে এখন কতটা আপন মনে হয়।

ধরা পড়ল আচানক। শেষের দিকে উপরি নেওয়া নজমুলের এতটা গায়ে সযে গেছলো যে, এ ব্যাপারে আব কোন সাবধানতা সে দরকার মনে করতো না।

সারা অফিসে মন্ত হৈ চৈ। যারা ঘুম নিতেনা তাদের সংখ্যা অবশ্য খুব কম। তারা বেশী কিছু ব্রফ মন্তব্য করেনি—ঘুম যারা হরদম খেয়ে আসছে তাদের মুখেই নীতিবাক্যের থৈ ছোট্ট একেবারে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমাদের মুখে একেবারে চুনকালি দিলো!

—একেবারে ভিজ়ে বিড়ালটি বাবা, বাইরে থেকে মনে হয় খুব যেন সাধু পুরুষ।

দ্বিতীয় মন্তব্যটি সহকর্মী বয়স্ক করে—যে দু'তিনবার নজমুলের কাছে ধাব চেয়ে পায়নি। হয়ত সে-ই পুলিশে খবর দিয়েছিল।

পবদিনই নজমুলকে সাসপেন্ড কবা হয়।

এটা এক ধাক্কা বটে। হয়ত পরে ধবাধবি কবে নজমুল খালাস পেয়ে যেতে পাবে কিন্তু এই যে সে ঘুম নেয় এটা সাবা অফিসের লোক জানতে পাবলে সে লজ্জা সে ঢাকবে কি কবে?

নঈমাব কাছ থেকে এই বিপর্যয়ের কথা বেশ কয়েকদিন লুকিয়ে রেখেছিল। তবে তিন চাবদিন উপবি উপরি অফিসে যেতে না দেখে নঈমা তাকে একদিন শঙ্কিত স্ববে জিজ্ঞেস কবলো ঃ আজকাল অফিসে যাও না যে বড়।

— অনেক ছুটি জমা আছে. না নিলে পচে যাবে।

অবশ্য সে জবাব বেশীদিন কার্যকরী হয়নি। মাসের প্রথমে নজমুল গুধু পঞ্চাশ টাকা নঈমাব হাতে এনে দিল তখন তাব জবাবদিহি কবতে গিয়ে নজমুলকে বলতে হয়েছিল যে অফিসেব বড়কর্তাব সঙ্গে তার ঝগড়া হওয়াতে তাকে সাসপেন্ড কববেছে। সে তাব বড়কর্তাব বিবদ্ধে মামলা করবে।

সে কথা শুনে নঈমা জ্বলে উঠলো একেবারে ঃ মামলা কববে না ঠেড়া কববে। ফুটো কলসী তুমি, তোমার মুরোদ কত, এই দশ বছবে সেটা কি আমি টের পাইনি, এখন কাচ্চাবাচ্চাদের নিয়ে না খেয়ে মরো।

নজমুলও আব রাগ সামলাতে পারেনি। ঠাস করে নঈমাব গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললো ঃ তোমার কি ভাবনা, তোমার ভো নাগর আছে, সেই কাচ্চাবাচ্চাদের খাওয়াবে।

বাগে আর অপমানে নঈমার মুখটা তখন দেখবার মত — তার দৃষ্টি যেন আগুনের হলুদ।

কথা আর চাপা থাকল না। নজমুল ও নঈমার পরিচিত সকলেই জানতে পারলো নজমুল ঘুম নিয়ে ধরা পড়েছে। যতদিন জানাজানি হয়নি ততদিন পরিচিতদের কাছ থেকে কিছু ধার নিয়ে নজমুল কোনমতে সংসারের খরচ জুগিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে একেবারে গুম-হয়ে-যাওয়া নঈমা নিজে আধা-উপোস করে আর সকলকে দু'বেলা অন্ততঃ ভরপেট খাইয়েছে।

নজমুল লক্ষ্য করে, ইদানীং ইউনিভার্সিটির সেই ছোকরা আত্মীয় আবার বেশ আমাগোনা আরম্ভ করে দিয়েছে।

সমস্ত বাসার আবহাওয়া কেমন যেন স্তব্ধ ও ভারী হয়ে উঠেছে। নঈমা তার সঙ্গে আজকাল আর কথাই বলে না—নজমুল যেন খবিস নাপাক এক জীব। স্ত্রীর কোন কোমলতাই তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বড় ছেলোটোও যে বাগের কাছে মাঝে মাঝে আবদার

করতো—তাব দিকে আব একেবারে ঘেঁষে না। বাপের দিকে মুখ তুলে চাইতেও তার যেন বড় বাধে। কখনও চোখাচোখি হয়ে গেলে তখনই চোখ নামিয়ে নেয়। নিশ্চয়ই ছেলোটো কারও কাছে বাপের কীর্তি কথ্য শুনেছে।

সহসা নজমুল আবিষ্কার কবে এক এক করে তাব সমস্ত আশ্রয় তার কাছ থেকে সবো যাচ্ছে। বউ এখন বেগানা আওরতেব মত মনে হয়। নিজের বলে আব যেন মনে হয় না।

যাক্গে, শালার—যা হবার হবে। দবকার হলে, এই অবলম্বনহীনতা থেকে নিজেকে কি ভাবে বাঁচাতে হয়, তা নজমুল জানে।

ধারও এখন আব কারুর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। সব কিছু জানতে পেরে নঈমার বাবা খবর পাঠিয়েছেন ছেলেমেয়েকে নিয়ে নঈমা যেন দেশে চলে আসে—দু' বেলা দু'মুঠো খাওয়া সেখানে জুটে যাবে। নিজেই এসে তিনি তাদের নিয়ে যেতেন তবে সে পথ জামাই আব রাখেনি।

নঈমা উন্টো খবর পাঠিয়েছিল : বিপদের সময় স্বামীকে একা ফেলে বেখে সে বাপেব বাড়ী যাবে কি কবে?

আজকাল ভাত-ডালের সঙ্গে আলুভর্তাও আব নঈমা জোগাতে পারে না। এবি মধ্যে বিয়েব সময়কাব আংটিটা তার গেছে।

ভাত খেতে বসে নজমুল কিন্তু মস্তব্য কবতে ছাড়ে না : নিজের জন্য বুঝি মাছ তবকাবী রেখে দেওয়া হয়েছে, আমি বাইবে গেলে সেই ছোকরার সঙ্গে বসে খাবে!

নঈমা চিলবিলিয়ে উঠে বলেছিলো : এবার থেকে নিজের ভাত নিজে রেঁধে খায় যেন। চুবি কবে ধবা পড়ে আবার তেজ দেখো না। ওব জন্য ভাত আমি আর রাঁধতে পারব না।

তার জবাবে ক্ষিপ্ত হয়ে নঈমাব দিকে বাসন-পেয়ালো ছুঁড়ে মেবে খালি পেটে নজমুল উঠে যায়। বাসন-পেয়ালো নঈমাব হাতখানেকের ভেতব এসে কর্কশ এক শব্দ কবে মাটিতে পড়ে যায়। ডালের ছিটায় নঈমাব শাড়ীতে ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া হলদ-দাগ বসে যায়।

তাবপর দু'দিন নজমুল বলতে গেলে বাড়ীমুখোই হয়নি—খায়ওনি। কিছুটা বাগ, কিছুটা হতাশা, নিজের প্রতি অশেষ কারুণ্য— সব মিলে তাব মনে বেশ একটা ঘোরের সৃষ্টি কবেছিল। তবে খিদের জ্বালায় সেটা বেশীক্ষণ টিকতে পায়নি। দু'আনার চিনাবাদাম আব তার সঙ্গে গলা-ভবা পানি খেয়ে নজমুলের পেটেব ভেতরটা কেমন যেন কবতে লাগল।

অদ্ভুত জিনিস এই খিদে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, নাড়ী পর্যন্ত একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথায় কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। চাবিদিকে চোখ-আঁধার-কবা শুনাতা।

পেটে যে দু'দিন ধরে দানা পড়েনি—এব বাইরে নজমুলের কাছে আব কোনও সত্য নাই। ছেলেমেয়েদের খাওয়া জুটেছে কিনা সে সম্বন্ধে এখন তার, বাপ হয়েও, আগ্রহ নাই। কি করে নিজের পেটের খিদে মেটানো যায় সেটাই নজমুলের কাছে এখন একমাত্র চিন্তা।

নঈমাকে বললে নিশ্চয়ই সে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু নঈমা, তাব স্ত্রী, তার এতদিনকাব সাথী, তাকে সে যে কথা বলেছে তার পরে তার কাছ থেকে পুরুষ হয়ে, স্বামী হয়ে, চাওয়ার গ্লানি সে সইবে কি করে।

নঈমাকে সে কি বলেছে খিদের তাড়নায় নজমুলের অবশ্য সে কথা মনে থাকে না।

আচ্ছা সেই ইউনিভার্সিটিতে-পড়া ছোকবাটার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখা যাক কিছু টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা।

সেই আশায় তাহেরবাগ থেকে একসী বাজারের দিকে নজমুল হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। প্রথম কয়েক মিনিট ক্লান্তির ভাব তখন ধরা পড়েনা, তবে টয়েনবি সার্কুলার রোড-এ পড়ে ওই ৬ নং ফ্লেক্স গ্রন্থকটা দ্বিধা : ১৩ হয়ে আসে। জিন্মা, অভিন্যার কাছাকাছি আসতেই

পেছন থেকে দুই-রিজ্বাকে ছাড়িয়ে-আশা একটি দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ীর হর্নেব শব্দে হকচকিয়ে নজমুল প্রায় তাল সামলাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাল সামলে দেখে তার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আব হাত-পা'র ভাঁজে ভাঁজে কাঁপুনি।

—খুব বেঁচে গেছি, বাবা। পেটের খিদের কথাও ভুলে গিয়ে নজমুল নিজেব মনে আঙড়ায়। জিন্নাহ্ অভিন্যুর পবিপাটি লেবাসের দিকে চেয়ে খিদের খোঁচা যখন আবাব প্রবল হয় তখন আর্তনাদের ধরনে নজমুল নিজেকে জিজ্ঞেস কবে : কি থেকে বাঁচলাম ?

কার্জন হলের কাছে এসে নজমুলেব আব হাঁটবার উদ্যম থাকে না। কম্পাউণ্ডেব ভেতব গিয়ে এক পাশে ঘাসের ওপর চুপটি করে বসে কিছুটা জিবিয়ে নেয়। সমস্ত নাড়ী যখন ক্ষুধাব জ্বালায় টনটন কবে উঠছে তখন গাছের ওপর বোদেব খেলা নজমুলের চোখে পড়ে। তারপব সমস্ত-রোপিত তুণেব ঘন শ্যামলিমার সঙ্গে স্তবকে-স্তবকে উন্মোচিত, হলদে, লাল, গেকযা বঙ-এর কিবণ-দীপ্ত মিতালী হঠাৎ যেন নজমুলেব চেতনা জাগিয়ে তোলে। মনে হয়, মাটির সমস্ত নির্বাস তুণ ও ফুল টেনে নিয়ে বোদ আব আকাশকে উপহাব দিচ্ছে। এ-চিস্তাটা অদ্ভুত লাগে, অত্যন্ত অস্তবঙ্গ মনে হয়—অনেকটা তাব নিজেব নাড়ীব জ্বালাব মত।

ভদ্রলোক নজমুলেব আসাতে খুশী হননি। কামরায় ঢুকেই সেটা নজমুল যেমন বুঝতে পারল তেমনি কোণের ছোট টেবিলে সাদা প্লেটের ওপব মুসীগঞ্জ-কলাব হলদে নবম কাঁদি দেখে দৃষ্টি তাব সেখানে একেবাবে আটকা পড়ে গেল। বুঝতে পাবনা না কিছুক্ষণ : কলা চাইবে, না টাকা।

তবে দু'দিনেব ওপব খালিপেটে কলা খাওয়ার কথা ভাবতে গিয়ে ভেতব থেকে সহসা বমিব ভাবটা প্রবল হয়ে ওঠে। তাই চট্ কবে টাকাই চেয়ে বসলো : পনেবোটা টাকা যদি দেন, সামনে মাসে শোধ কবে দেবো।

ভদ্রলোক তাব দিকে একবাব সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন, পবে বললেন শীতল বৈষায়ক ভঙ্গীতে : পাগল হয়েছেন, মাসেব শেষে অত টাকা পাব কোথা ?

জবাবটা আগে থেকেই নজমুল অনুমান কবে বেখেছিল—পাগল বিশেষণটা ছাড়া—অতএব খুব বেশী হতাশ সে বোধ কবে না। আব কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায়।

বেরিয়ে আসবে এমন সময় পেছন থেকে ভদ্রলোকেব গলা শুনেত পায : পাঁচ টাকা হলে নিয়ে যেতে পাবেন, আপনাকে আব শুধতে হবে না।

শেষের কথাটাই অনিশ্চয়তা বাধাল। শুধতে যখন হবে না, নেওয়াই যাক না কেন। পব মুহূর্তে ভাবে : এতে কি আব বেইজ্জতিব বোঝা কমবে, আব এইভাবে গবমিল দিয়ে চলবেই বা ক'দিন ?

বাইবে বেরিয়ে দেখে, রাস্তার মাঝখানে এক মবা কুকুব পড়ে আছে। মুখ থেংলে শুধু মাড়িটাই আলগা হয়ে খসে পড়েনি, নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। চোখে জিজ্ঞাসাব দৃষ্টি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে দু'একটা দাঁড়কাক সেদিকে এক পা এগুচ্ছে, এক পা পিছুচ্ছে।

এখন খিদের চেয়ে নিস্তেজ, নিজীব ভাবটাই বড় হয়ে উঠেছে। গতিময় জীবনেব প্রাণস্পন্দন চাবিদিকে দেখেও মনে তেমন কোন অনুভূতি জাগে না। একটি ছোট ঝোঁবে এক দোতলা বাসার জানালা দিয়ে তাব দিকে চেয়ে ভাবী মিষ্টি ধবনে হাসছে। নজমুলেব প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত : দূর শালী। হঠাৎ রাগে নজমুলের সমস্ত সন্তায় যেন আগুন ধরে যায় : বউটা মাগী, বাচ্চাগুলো কার কে জানে, আব সব বেটা দাগাবাজ, খল। এইভাবে বেঁচে থাক! থু থু থু থু থু!

বাসার ধারে মুদীর দোকানের কাছে এসে নজমুল টলমলে মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। বাগ বেশীক্ষণ থাকেনি, কারণ খালিপেটে রাগ করতে গেলে মাথা তা বেশীক্ষণ বহন করতে

পারে না। কিছু মুড়ী মুড়কী কিনতে পারলে বেশ হতো। পেট তাতে কিছুটা স্বস্তি পাবে। পকেট হাতড়িয়ে দেখে সেখানকার ভাঁজে কেমন করে যেন একটা আধুলি রয়ে গেছে। মুড়কীর সঙ্গে আরো কিছু কিনে বাসায় ফেবে।

খালি তকতপোষেই নজমুল গা এলিয়ে দেয়। খিদে এখন অনেকটা সয়ে গেছে। পেটে আর সে কামড়-খাওয়া ভাব নেই। শুধু নিঃসাড় অবশতা। ক্রমে ক্রমে গিলে-খাওয়া শূন্যতা।

কামরার বাইরে পরিচিত এক গুঞ্জন শুনে শেষবাবের মত উদ্যম সংগ্রহ কবে নজমুল কান খাড়া করে থাকে। সেই ছোকরা আবাব এসেছে।

নঈমা বলছে আদরের ধরনে : এতদিন পরে মনে হল।

ছেলেটি বলে : এইত তিনদিন আগেই এলাম।

— আরে তাইত, এত ভুলো মন হয়ে গেছে ভাই। (ভাই আব কেন, নজমুল বিড় বিড় করে) কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পব ছেলেটি আবাব বলে : এই কুড়িটা টাকা ভাই পাঠিয়ে দিলেন।

নজমুল ভাবে : রঙ্গটা বেশ জমেছে।

এবার নঈমা যা বললো তাব জন্য নজমুলের মন ঠিক প্রস্তুত ছিল না : বড় উপকাব কবলে ভাই, তোমাব ভাই বোধ হয় আমাব উপব বাগ কবে দু'দিন না খেয়ে আছেন। নঈমাব গলাব স্ববে খেদহরণ মমতা। মন আবাব জেগে উঠতে চায়, ছেলোদের মুখ মনে পড়ে, সেই ছোট মেযেব মিষ্টি হাসি চোখেব সামনে ভাসতে থাকে। নঈমা, নঈমা .

অর্ন্ত অনুভব কি যেন হাতড়ে বেডায়। কি যেন ফিবে পেতে চায়।

শেষ বাবেব মত নাতী নিঃসাড়তায় কঁকড়ে ওঠে। একবাব খেয়াল হয় কিছুটা মুড়কী খেয়ে নেয় — তাতে হয়ত চেতনাব নতুন দু'এক তন্ত্রী বেঙ্গে উঠবে। তবে বাদুডেব মত ডানা ঝাপ্টে কালো হতাশা দ্রুত আসে, আব তাব তডিং তাডনায় হাতটি যায় 'র্যাটম' এব প্যাকেট এ।

এখন বাকী থাকলো কোনমতে এক গ্লাস পানি জোগাড় কবা। তাবপর পানিব সঙ্গে 'র্যাটম' এর সমন্বয় ঘটাতে যেটুকু দ্বিধা যেটুকু জ্বালা।

হালাল

অবর্ণ চৌধুরী

মসজিদে ফজরের আজান তখনও পড়েনি।

পূর্ব আকাশের ধূসর গায়ে জায়গায় জায়গায় কমলালেবুর বঙ-হোঁয়ানো সৰু সৰু ফটল ধবেছিল। আকাশের বাকি আধখানা তখনও কিছুটা আঁধাবে মাখামাখি হয়ে আছে। চাচা ভাতিজায় হাল, লাঙল আর বলদ দুজোড়া নিয়ে মাঠের উদ্দেশ্যে সড়ক ধরে অনেকটা উত্তর-পশ্চিম দিক ব'লে বওনা হল।

পশ্চিমে মাঝারি সাইজের একটা নিচু আবাদি পাঁথার আব তার পরেই দক্ষিণ প্রবাহিনী রত্না, পূবে নবীনগরের মূল বসতি, মাঝখানে এই সড়ক। সড়কটি স্বল্পপবিসব হলেও মোটেই অখ্যাত নয়। নবীনগরের পূবে মাইল তিনেক তফাত দিয়ে যে চওড়া ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড বাস্তাটা বরাবর উদ্ভবে জেলার সদর অভিমুখে চলে গিয়েছে, এই সড়কটি সেই রাস্তা থেকেই সুন্দরদিঘির হাটের পাশ দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুখ করে বের হয়ে আরো দু'তিনটে গ্রামের মধ্যে দিয়ে এসে এই গ্রামে ঢুকে অনেকটা ধনুকের মত একটুখানি বেঁকে গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলের গা ঘেঁষে পূবে গোরস্থানটা বেখে, পশ্চিমে রেখে জুম্মাঘরখানা, বলতে গেলে আপতাবের আঙিনার উপর দিয়েই পূব-দক্ষিণ মুখ কবে বরাবর মাইল তিন-চার এগিয়ে আবাব মিশেছে সেই ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড বাস্তায় বোশেনাবাদ বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে। এ বাস্তাটা যদিও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেরই বটে, তবু পাকিস্তান হবার বহুকাল আগে ইংরেজ আমলের কোন এক আকালের সময়ে টেষ্ট বিলিফ হিসেবে বাঁধা হয়েছিল বলে এ অঞ্চলের লোকে ছ'সাত মাইল দীর্ঘ এই সড়কটিকে বিলিফ সড়ক নামেই ভাল বুঝে থাকে।

রশিখানেক রাস্তা না হাঁটতেই বলদগুলো সব লেজ উঁচিয়ে এক দফা পায়খানা পেসাব করল। থামতে হ'ল বলে বিবস্তাই বোধ করছিল আপতাব। যাই হোক, সন্তপণে গোবর, চোনা প্রভৃতি ডিঙিয়ে কেবলই তারা আবাব হাঁটা শুরু কববে, এমন সময়ে দূবে আঙুল দেখিয়ে মাহ্‌তাব একটা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা কবল — উডা কে যায় চাচা?

আপতাবও থমকে দাঁড়াল। সত্যিই তো! উলটো দিক থেকে গোরস্থানের পাশ দিয়ে সড়ক ধরে কে একটা লোক আসছিল। কুয়াশা ছিল বলে এতক্ষণে ভাল মালুম পাওয়া যায়নি। আরো রশিখানেক এগিয়ে জুম্মাঘরের পুরানো দালানটার কাছাকাছি গিয়ে ঠিক যেখানটায় তারা হাতেব ডানে পূব দিকে একটা পাঁথারের মধ্যে নেমে যাবে সেই মোড়ের মাথাঅবধি হন হন করে এসে বুড়ো বটগাছটা বাঁয়ে রেখে সড়ক থেকে ডানদিকে নেমে জুম্মাঘরের পেছনে আখের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম দিকে লোকটা কোথায় যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল। খুব সম্ভব শিমুলতলা ঘাটে রত্না পার হয়ে সে ওপারে যাবে।

— মানুষটা কে, তা তো চিনতে পারলাম না বাহে? ... আগতাব তার কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটা ঢোক গিলে বলল — একখানা সাদা কাপড় দিয়া মুখখানা ঢাকা আছিল না?

— মুইও হে? এই দেখলাম মাহ্‌তাব সত্যি দিল — নি হু চলনটা যেন কিসমতের মতই মনে হইল।

— কিসমত চৌকিদার !..... আপতাবের ভ্রু দুটো একটু কঁচকে উঠল — তা হইতে পারে । কিন্তু কিসমত এই ফজরে চোরের মত কোনঠে যায় ?

আপতাবের মাথায় একটা দুশ্চিন্তা ঢুকে গেল ।

চাচা ভাতিজায় তৎপরতার সাথে মাঠে লাঙল জুড়লো । আপতাব আলি আর মাহতাব আলী, চাচা আর ভাতিজা । আশপাশের আট-দশটা গ্রামে অবশ্য তারা আপতাব ডাক্তার আর মাহতাব মাষ্টার বলেই বেশী পরিচিত ।

আপতাবের স্ত্রী যে বছর মারা গিয়েছিলেন, সেই বছরবেই বড় ভাই আলতাব আলি অসহায় স্ত্রী এবং শিশুপুত্র মাহতাবকে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন । সেই থেকে নিঃসন্তান আপতাব মাহতাবকেই ছেলেব মত মানুষ করেছে । ভাবীকেও একদিনের জন্য উপেক্ষা অবহেলা করবেনি । বাড়ির দুই বউ বেঁচে থাকাকালে, চাষবাস, রান্নাবান্না আলাদাই হত । পরে রান্নাবান্না একসাথেই সুরু হল । এখন তারা ষোল আনাই একাক্সবত্তী পরিবার ।

কাজে মন দিলেও কিসমত চৌকিদারের কথাটাই কিন্তু আপতাবের মাথাব মধ্যে নানাবকম ভাবে ঘুরঘুর করছিল । থানাটা হচ্ছে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের বড় বাস্তাব ধাবে, সুন্দরদিঘির হাট ছাড়িয়ে আরো মাইল চাবেক উত্তরে । ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসও সুন্দরদিঘির হাটের উপরেই । কিসমত থানায় গেলে সাধাবগত সুন্দরদিঘির হাট দিয়ে বোর্ডের অফিস হয়েই গিয়ে থাকে । তাছাড়া আজ সাপ্তাহিক হাজিরার দিনও নয় । রত্নাব এপাবে নবীনগর পলিমাটির বাবো মাসেব তেবো ফসলের গাঁ, কিন্তু ওপাবটা লাল উষব খিযাবী মাটি । শিমুলতলার ঘাট পাব হলেই ওপাবে সাঁওতালদেব ছোট একটি বসতি, নাম তাব আঁধারকোঠা । আঁধারকোঠা পাব হলেই গুব হল শাল-পলাশ-মহুয়ার ঘন জঙ্গল । এই জঙ্গলেব ধাব ঘেঁষে ঘেঁষে একটা সৰু পায়ে-হাঁটা পথ একটু একেবেঁকে প্রায় উত্তবমুখে চলে ববাবব গিয়ে পেছনে দিয়ে থানাব কাছাকাছি বড় বাস্তায় মিশেছে । এই পথে থানায় গেলে প্রায় মাইল দুই কম হাঁটিতে হয়, সময়ও লাগে কিছু কম । কিন্তু পথটা খুব চালু পথ নয় । তবে, প্রতিপক্ষেব নজর এড়িয়ে থানা, আদালত, মামলা, কবাবা কবতে হলে ঠেকা বেঠেকায় লোকে এই পথেই যাওয়া আসা কবে থাকে ।

লাঙল চালাতে চালাতে জমিব এক মাথায় গিয়ে মোড় ঘুবাবব জন্য একটা বলদেব বাশ টেনে অন্যটাকে খেদাতে খেদাতে হঠাৎ আপতাব জিজ্ঞাসা কবল — কাল বাতে কাব বাড়ি হইতে বাহিব হইছিস, কিসমত কি তা টের পাইছে, হ' ?

— কে জানে ? .. ঠোট উলটিয়ে মাহতাব বলে — বাহিব হইবাব সময়ে তো মানুষেব নাগাল পাই নাই ।

বলল বটে, কিন্তু মাহতাবও নিশ্চিত ছিল না । কিসমতেব অভিসন্ধিটা কি ? গত কয়েক দিনে যে সব উড়ো কথা তাব কানে এসেছে সেগুলোব সাথে ব্যাপারটাকে মিলিয়ে বুঝবাব চেষ্টা করছিল মাহতাব । ভাবছিল ভোর রাতে কাপড়ে মুখ ঢেকে চোরা-পথে কিসমত গেল কোথায় ! থানায় গেল কি ?

কথা বলতে বলতে দুজনেরই হালের মুঠোটা একটু শিথিল হয়ে এসেছিল । লাঙ্গলের ফালটিকে মাটির মধ্যে তাক মতো ডুবিয়ে ধরে গভীরভাবে তারা আবার কাজে মন দিল ।

সৰ্বে বুনবার জন্য জমিটা চাষ দিয়ে এই বেলার মধ্যেই তৈরি করে ফেলতে হবে । তাই তারা বড় উদ্বিগ্ন । পাড়ার জুম্মাঘরে এষার নামাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবার পথে সেরাতে আকাশে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আপতাবের মনে হয়েছিল যে চাঁদখানা আধাআধি প্রায় ভরে এসেছে । দিন চার-পাঁচেকের মাথায় সম্ভবত ওটা পূবো হয়ে উঠে পূর্ণিমা দেখা দেবে । আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে । এলোমেলো বাতাসও বইছে কখনও কখনও । ভাবগতিক দেখে প্রৌঢ় আপতাবের খনার বচনের কথাটা মনে পড়ে গেল । আশঙ্কা হল,

পূৰ্ণিমা নাগাদ অবশ্যই বেশ কিছু পানি বৰ্ষাবে। জমিটা তৈৰি কৰে আজকালৈৰ মধোই সৰ্ব্বোটা বুনৈ দিতে পাবলৈ ভাল হয়। সৰ্ব্বো বোনা আৰু বৃষ্টি নামাৰ মধো চাবা গজানোৰ জন্য যদি চাবটো দিনও হাতে পাওযা যায় তৰে আবাদেৰ খুবই উপকাৰ হ'ব।

বাতোই কথাটা আপতাৰ তাৰ ভাতিজাকে বলে পাঠিয়েছিল।

দিন পনেবো আগে সুন্দৰদিঘিৰ হাটে একদিন এক পুলিছ কনষ্টেবল ডালা-বুলো বিক্ৰি কৰা নিম্নবৰ্ণেৰ একটা গবীৰ হিন্দু বিধবাকে হাত ধৰে টেনে, লাথি মেৰে ফেলে দিয়েছিল তাৰ ডালা-বুলো যা কিছু ছিল। এই বেআদবীৰ জনা হাটুবে মানুষেৰ কাছে লোকটা বেদম মাৰ খেয়েছিল সেদিন। পুলিছ পিটানোৰ এই ঘটনাটি ঘটাব পৰ থেকে মাহ্‌তাৰ আজকাল বাতে আৰু বাডি থাকে না। কাৰণ মাহ্‌তাবকেই এই হাস্‌মাৰ নেতা বলে থানা থেকে কয়েক দফাৰ খোঁজখুঁজি কৰা হৈছে। তাই বাতে এপাডা ওপাডা এ গ্ৰাম সে-গ্ৰাম কাবো না কাবো বাডিতে সে থাকে। সকাল বেলায় এদিক-ওদিক সন্ধান নিয়ে দেখে-শুনে নিজ বাডিতে ফেৰে। ফুৰসং মত গাঁয়েৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলটোতেও প্ৰায়দিনই লুকিয়ে চুৰিয়ে এক চক্কৰ মেৰে সে পড়িয়ে আসে। বাডিতে যথাসম্ভব খুব কম সময়ই থাকে। দিনভৰ সংসাৰেৰ কাৰ্জৰ ফাঁকে ফাঁকে সন্দেহজনক লোকেৰ চোখ এড়িয়ে খবৰেৰ কাগজ হাতে মানুষেৰ সাথে আলাপ আলোচনা মিটি, মজলিশ সবই সে কৰে। আৰাৰ বাতে কোথায যেন হাবিয়ে যায়।

চাচাৰ কাছ থেকে লোক মাৰফৎ খবৰ পেয়ে বাত থাকতে থাকতেই মাহ্‌তাৰ সেদিন বাডি ফিবেছে। তিনটে চামু আগেই দেওয়া ছিল। দুপুৰেৰ আগেই যদি আৰু এক দফা চামু দেওয়া যায় তৰে বিকেল নাগাদ মই দিয়ে সৰ্ব্বোৰ বীচ ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। সুতৰা, এত তাড়াছড়া।

হাল ছেড়ে দিয়ে বাডি ফিৰতে স্বভাবতই সেদিন আপতাৰদেৰ অনেক বেনা হয়ে গেল। বাডি ফিৰেই আপতাৰ দেখে বাইবেৰ আগ্নিনাথ কাঁঠালতলায় বাঁশৰ মাচাব উপৰে তাৰ জনো একটা কণী বসে অপেক্ষা কৰছে। অগত্যা, লাঙ্গল জোয়ান কাঁধ থকো নামিয়ে বলদওলোকে একটা গাছেৰ ছায়ায় বেবে বেখে আপতাৰ ডাক্তৰকে আপাতত ব গাঁৱ দিকে মন দিতে হল।

স্কুলেৰ বেলা অনেক আগেই পাব হয়ে গিয়েছিল। কান্ধেই ঝটপট স্নান খাওয়া সেবে মাহ্‌তাৰও স্কুলেৰ উদ্দেশ্যে বওনা হয়ে গেল।

বাতোৰ শিশিৰে ভেজা বিলিফেৰ সডকেৰ ধুলো ততক্ষণ বোদেৰ তাপে শুকিয়ে এলোমেলো বাতাসে উডতে শুক কৰে দিয়েছে। পাঁথাৰে পাঁথাৰে বুলে বেৰ হওয়া বানেৰ শীমওলো যেন সেই বাতাসেৰ ছোঁয়ায় আত্মদে হেলদুলে নাচছিল। কাৰ্তিক মাসেৰ ছোট বেলা, তাই এবই মধো গাঁয়েৰ ছেলে মেয়েৰা বই স্নেট খাতা পেনসিলেৰ দপ্তৰ বগলে স্কুলেৰ সামনে ছোট মাঠে এসে ভিড জমিয়ে ফেলেছে। স্কুল মানে অবশ্য খড দিয়ে ছাওয়া জানালা দৰজাবিহীন একখানা মাটিৰ ঘৰ মাত্ৰ।

ছেলে-মেয়েৰা জটলা পাকিয়ে কি নিয়ে যেন বাকবিতণ্ডা হৈ হুহু কৰছিল। এমন সময়ে পৰিচিত একটা পায়ের শব্দে সকলেৰ মধো অস্ফুট একটা সাড়া পড়ে গেল — মাষ্টাৰ! মাষ্টাৰ!

এই ছেলেপেলেৰা! মাঠেৰ মধো বসি কিসেৰ মিটিং কৰোছেন হে? হাতেৰ মুঠোয় ভাঁজ-কৰা খবৰেৰ কাগজটা দিয়ে মাহ্‌তাৰ মাষ্টাৰ একটা ছেলেৰ পিঠে আস্তে কৰে একটা আঘাত কৰল।

সকলেই মাষ্টাৰকে খবৰটা দেবাৰ জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। ছোট বোকেয়া উজ্জৈজিতভাবে ছুটে মাষ্টাৰেৰ কাছে গিয়ে কচি গলায় চিৎকাৰ কৰে বলে উঠল — মাষ্টাৰ, তুমি জবৰ বাঁচি গেছেন!

মাহ্‌তাব নিচু হয়ে মাটিতে আলগোছে বসে হাসিমুখে আদর করে রোকেয়ার কচি হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে — কেন ময়না?

জটলাটা যখন চলছিল রোকেয়া তখন একান্ত নিবিষ্ট মনে ওদের আলোচনা শুনছিল। 'কি' সে বুঝেছিল, সে-ই জানে। এখন চোখ বড় বড় করে উত্তেজিতভাবে বললে — নুরুল আমীন তোমাকে ধরতে আইছিল।

— নাজিমুদ্দিনও সঙ্গে ছিল... আর একটি ছোট্ট ছেলে সম্ভবত তাব নিজেরও কিছু একটা বলা দরকার মনে করে রোকেয়া চোখেব দিকে চোখ রেখে, সমর্থন পাবার আশায় ঘাড় বাঁকিয়ে অনেকটা আন্দাজেই বললে — কেন বোকেয়া, পিছনে সাইকেলে টোপ মাথায দেওয়া উডা নাজিমুদ্দিন নয়? সবাই হো হো করে এক দফা হেসে উঠল।

মাহ্‌তাব জিজ্ঞাসুভাবে লতিফের দিকে তাকাল — কি বাহে?

আলম বলে উঠল — দারোগা তিন-চারজন সিপাই সাথে এই ঠাই আইছিল। তোমার কথা পুছ করলে।

— কোনটা দারোগা তোবা চিনেন, হ' — ?

— দাবোগা কোনটা, হামরা কেমন চিনি না। বোশেনাবাদে ভাষাণীব মিটিং-এ যাঁই বক্তৃতা খাতায় লিখি নিলে, তাঁই দারোগা নয়। অনুযোগের সুবে লতিফ জবাবটা দিল।

দাবোগা তাহলে সঙ্গেই ছিল বটে। মাহ্‌তাব জিজ্ঞাসা করল — কোন্ দিক বুলি ওবা গেল রে?

— মোব সন্দো হয়, কিসমত চৌকিদারের বাড়ি বুঝি গেছে। ক' দিন ধবি কিসমত খুব ইঁটাইটি কবোছে — একটি ছেলে মাহ্‌তাবের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কবল — তোমাকে ধবি দিতে পারিলে কিসমত বলে পঁচিশ টাকা বখশিশ পাইবে, হ'?

কথাটা মাহ্‌তাবের কানেও এসেছে। মাসকয়েক আগে আধাবকোঠা অঞ্চলের সাঁওতালদের হয়ে ফবেষ্ট ডিপার্টমেন্টের বডকর্তাদের কাছে একটা ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছিল সে। তাবপব থেকে, সাঁওতালদের সাথে ফরেস্ট গার্ডদের অহবহ যে সব হাস্যামা লেগে থাকে, সেই সব হাস্যামার সাথে তাব নামটাকে জড়ানোর চেষ্টা থানাওয়ালাবা ববাবব করে আসছে। গত মাসে হাটে জববদস্তি তোলা আদায়েব ব্যাপাব নিয়ে যে হাস্যামা হয়ে গিয়েছিল তাব সাথেও তাব নামটা জড়ানো হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি পুলিশ পিটানোর ঘটনায় তাকেই প্রধান আসামী কবে খোজাখুজি কবা হচ্ছে। এখন সব মিলিয়ে তাকে একটা বিপজ্জনক লোক আখ্যা দিয়ে, ধববাব জনা বেরোয়া চেষ্টা থানা থেকেঅবশাই হতে পারে। কিন্তু পঁচিশ টাকা বখশিশ সম্পর্কে থানা থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণাব কথা সে জানে না। তবে কথাটা ছড়িয়েছে বটে।

— কতক্ষণ হইল ওবা গেছে বে? জিজ্ঞাসা কবল মাহ্‌তাব।

— এই তো। কেবলই গেল ওবা। পাড়াব ভিতর দিয়া আইছেন, তাই ওবা তোমার নাগাল পায় নাই। বিলিফ সড়ক ধবিয়া আসিলে ওরা তোমাকে আটক কবি ফেলাইতো।

দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে গেল মাহ্‌তাব। কিসমতই বোধ হয় ব্যাপারটাকে তাহলে এতখানি পাকিয়ে তুলেছে। ক' দিন আগে স্কুলেব সেক্রেটারী হাযাত মাহমুদ তালুকদার তাকে ডেকে কিসমত সম্পর্কে একটুখানি ইঁশিয়াবও করে দিয়েছিল। কিসমত নাকি কোথাও কোথাও বলেছে যে হাজার হলেও সে হচ্ছে গিয়ে চৌকিদার, বলতে গেলে খাস গববমেন্টেরই লোক। কাজেই গবরমেন্টের দিকেই টেনে তাকে কাজ করতে হবে। চৌকিদারী কবতে গিয়ে চৌকিদারী নিয়মকানুন ষোলো আনা না মানলে চলবেই বা কেন? এ-ছাড়া, কিসমত যে দু-এক জায়গায় মাহ্‌তাবের খোঁজও করেছে, সে কথাও মাহ্‌তাবের কানে এসেছে।

মাহ্‌তাবেব মুখের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণে অনেকেই ব্যাপারটার গভীরতা আন্দাজ করল।

— তোমার নসীবে আজ এই ঠাই আর থাকা নাই মাষ্টার। ..মুরুব্বীর মত আলম বললো — ওরা বোধ হয় ফের ঘুরি আসিবে।

মহতাব ভাবছিল, কি এখন করা উচিত। এমন সময় স্কুলের গেছন দিকে আখের স্কেটটা একটুখানি নড়ে উঠলো।

সড়ক থেকে নেমে, নির্জন গোরস্থানটা ঘুরে পায়ে-ইঁটা সুরু পথটা ঐক্যে-বৈক্যে ঠিক যেখানে গিয়ে পাড়ায় ঠেকেছে, সেখানে একটা পাতাঝরা কুম্ভচূড়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিরাট অথচ নিঃশব্দ গাছটার নিচে ছোট ছোট দুটি ভাঙা ঘর এমন নীরবে মুখোমুখি খাড়া হয়ে আছে যে, মনে হয় যেন কেবলই মাত্র একটা নম্রা চাল চালবাব পরে দাবার ছক সামনে দুটি খেলোয়াড় গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছে। বাইবের দিক থেকে আঙিনাটিকে আড়াল করবাব চেষ্টা করছে ততোধিক জীর্ণ একখানা কঙ্কির বেড়া। সবটা মিলে এই শ্রীহীন প্রায় বে-আফ্র আঙিনাটাই হচ্ছে কিসমত চৌকিদারের বাড়ি।

কিসমত কিছুক্ষণ হল মাত্র বাড়ি ফিবেছে। খুব ভোরে সে আজ বাড়ি থেকে বেব হয়েছিল। কোন সময়ে অজান্তে পাশ থেকে শুট কবে উঠে যে লোকটা পালিয়েছে তা ঘূমেব ঘোরে বউ রহিমা টের পায়নি। যতবাবই সকাল থেকে কথাটা সে ভাবছিল ততবাবই দপ্ করে রহিমার মাথায় যেন আঙুন জ্বলে উঠছিল। অবশ্য বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে, সময় হোক, অসময় হোক, চৌকিদাবকে থানায় ছুটতে হবেই। কিন্তু একটিবাব বলেও যাবেনা, এ কেমনতর কথা।

বাড়ি ফিববাব পথে, কোথায় যেন জলকাদা ঘেঁটে গোটা আষ্টেক শিঙ্গি আব চাব পাঁচটা সুরু সুরু কৈ মাছ গামছায় কবে বেঁধে এনেছিল কিসমত। ঘবেব চালে লটুকানো খালুইটা নামিয়ে মাছগুলো তাতে রেখে সেটা যখন বহিমাব সামনে সে এগিয়ে দিল তখন বহিমা আড়চোখে চেয়ে তা দেখল বটে, তবে কিছুই বলল না। কিন্তু ওন্ ওন্ কবে গান কবতে কবতে খুব যত্নেব সাথে হাত পা কাঁধ নাক মুখ থেকে কাদাব দাগগুলো পবিত্তার কবে মুছে গা ধুয়ে একটুখানি পরিপাটি হবার উদ্দেশ্যে মাথায় দেবাব জনো নিতান্ত সাদা মনে বহিমাব কাছে গিয়ে যেই সে হাতের তালু পেতে দিয়ে একটু তেল চাইল, অমনি বহিমা যেন তেলে বেগুনেই জ্বলে উঠল — লজ্জা-সরম বলি কি কিছুই মানুষেব থাকা লাগে না?

— মানুষেব তো লাগেই। কিন্তু চৌকিদাবেব তা লাগে না। মহা দার্শনিকের মত কথাটা বলে হাতখানা নিজ স্বল্পায়তন কালো দাড়ির গুচ্ছটুকুতে বেখে কিসমত বহিমাব মুখেব দিকে চোখ তুলে চাইলো — কিন্তু সে কথা কেন?

সে কথা কেন! .. অতল বিষ্ময়ে এবং ভয়ঙ্কর রাগে বহিমাব গোলগাল ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে উঠলো — মুইও চৌকিদারের বেটি আছি। কিন্তু মোর বাপ ভাইয়ে চাষ-আবাদ ছাড়িয়া তোমাব মত কেবল দারোগা-সিপাইয়েব পাছে পাছে দৌড়ায় নাই। কাল বাতেই আধপেটা খাইছেন। জানেন, চাউল ঘরে নাই। কিন্তু তাব ব্যবস্থা কি কবছেন শুনি?

— ওহু, এই কথা কিসমত যেন কিছুটা আশ্বস্ত হল। তবু প্রশাধনের এমন মৌজটা টুটে যাওয়ায় তার যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

— কথা কন না কেন? ...রহিমা আবাব সাপের মত ফণা ধরে ফোঁস কবে উঠলো। মনে হল, নাকের ছোট্ট রূপোর নাকফুলটা বুঝি তার ছিটকে পালিয়ে যাবে।

কার্তিক মাসের দিন। পাঁথারের ধান কেবলই মাত্র ফুলে বেরুচ্ছে। সুতরাং ঋতুবা বিশেষ কিছু আর যে ছিল তা নয়। বেলা যথেষ্টই হয়েছিল, পেটে ভুখও ছিল বেশ। ভাত যে রান্না হয় নি তাও অস্পষ্ট নয়। তবু রহিমার মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাটি-বয়সী কিসমতের কেন যে নির্লজ্জের মত একটু রসালাপের ইচ্ছে জাগলো, তা সেই জানে। সে বলে ফেললো — মোর কি? এমনি তো পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়। তার উপর উসকা খুসকা চুল মাথায় গাজীব বাঁশের মত নাচন দেখি মানুষে তোর ভাতারকেই পাগলা বাউড়া বলি স্কেপাইবে।

তেলকের বাজনার সাথে সাথে গাজীব বাঁশের সেই ধিনিকি-ধিনিকি নাচনের ছবিটা চোখের সন্মুখে ভেসে ওঠায় রহিমা প্রথমটায় ফিক্ করে হেসে ফেললো বটে কিন্তু পরমুহূর্তেই তাব

চেহারাটা অন্য রকম হয়ে গেল — ভাত দিতে পার না, তাঁই ভাতার! একটা বোটো-পুত থাকিলে, বোধ করি মোর এতখানি অবহেলা হইত না হায় পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ঝাঁঝ রহিমার চোখেমুখে ফুটে বের হল।

এক্ষুণি যে প্রচণ্ড বেগে ঝড় উঠবে সেটা স্থির বুঝে পালাবার জন্য ছটফট করছিল কিসমত, এমন সময়ে মুন্সিলটার আসান এল সম্পূর্ণ অন্য একটা পথ বেয়ে।

কিসমতের ভাঙা ঘর দুখানার মধ্যে টেকিঘরের বেড়াটা এখনও তবু কিছুটা ভাল আছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিদ্যুতের মত চকিতে বহিমা ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ভেতরেই ঢুকে পড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের পথের উপর থেকে সাইকেলের কিট কিট শব্দের সাথে অনেকগুলো জুতোব ভারি মস্ মস্ আওয়াজ কানে ভেসে এল, কাবা যেন কিসমতের নাম ধরেই হাঁক দিল।

আফ্র রক্ষাব জন্য মোতায়েন আউনিার এই কণ্ঠসার বৃদ্ধ বেড়াটা সুযোগ পেলেই বহিমার সাথে এরকম মর্মান্তিক রসিকতা না করে ছাড়ে না। সে তার খাটো এবং জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া পরনের শাড়িখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে টেকি ঘরের মধ্যে অগত্যা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটুখানি পান-সুপারীর আয়োজন কিসমত এ পর্যন্ত করেই উঠতে পারে নি, তাই উপবণ্ডালাব উপস্থিতিতে সম্বর্ধনাব জন্য সে যেন হঠাৎ যাদুমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

ঘরে একখানা বসবার মোড়া ও চলনসই মাদুর আছে। কিন্তু সেগুলো তার মনে ধরল না। হস্তদস্ত হয়ে গায়ে নীলপোষাকটা চাপিয়ে বেষ্ট কষতে কষতে মেহমানদেব বসবার জন্য পাড়াপ্রতিবেশীর বাড়ি দৌড়াদৌড়ি কবে খান দুই ভাঙা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ টানাটানি করে এনে বাড়ির সম্মুখে পথের উপর মহা এক ছলছল সে বাধিয়ে দিল। দাবোগা সাহেবের সেখানে বসবার কারণ বাকুচি কোনটাই ছিল না। সুতরাং তিনি ধমক দিয়ে শিগগির বের হবার জন্য কিসমতকে প্রচণ্ড এক তাড়া লাগালেন। কিন্তু কিসমত চৌকিদারের সৌজন্যবোধও যেমন তুখাড় হয়ে উঠল, সাহেবকে খেদমত করবার সঙ্কল্পও যেন তেমনই অটল হয়ে দেখা দিল। ধমক খেয়েও কুকুর যেমন লেজ নাড়ায় অনেকটা সেই রকমই, হাত কচলাতে কচলাতে সে হি হি করে হাসতে লাগল — সামান্য একটা ওয়াপানের আয়োজন, উডার অনুমতি না দিলে স্যাব, সেডা কেমন হয়! তাব চোখ দুটো কুকুরের মতই মিনতি প্রার্থনায় কণ্ঠ হয়ে উঠলো।

দারোগা সাহেবের পিণ্ডি জ্বলে যাচ্ছিল, তবু সংযতভাবে তিনি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীর চাব-পাঁচ বছরের একটি ছেলের মাথায় অযথাই একটা চাঁটি মেরে কিসমত তাকে বললো — যান তো বাপ আলাবকসো, বাড়ি হইতে পানবাটা ধরি আন দেখি। মুখের কথা মুখেই শেষ না হতে অবশ্য সে নিজেই বিধে খানেক তফাতে আলবক্তের বাড়ির দিকে ছুটলো পান-সুপারী সংগ্রহের জন্যে।

অনুরোধে টেকি সবাইকেই গিলতে হয়, দাবোগা সাহেবও বেহাই পেলেন না।

পানটা মুখে দিয়ে ম্যাচেব কাঠি ঠুকে দারোগা সাহেব সিগারেটটা ধবাতো না ধরাতেই অবশ্য, বাড়ির ভেতরের উদ্দেশ্যে চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি যথাস্থানে ফেরৎ দেবার নির্দেশ দিতে দিতে পাগড়ী মাথায় বল্লম হাতে বিদ্যুৎগতিতে এসে সম্মুখে খাড়া হল কিসমত। কিন্তু দারোগা সাহেব তখন মনে মনে এত অস্থির বোধ করছিলেন যে তার এই তৎপরতার প্রতি কোনও তারিফসূচক মন্তব্য করা তো দূরের কথা, অধৈর্যের সাথে তিনি প্রায় মুখ ভেংচিয়ে উঠলেন

— চলো, চলো! বড্ড লেট করিয়ে দিলে হে!

কিসমতই সকলের আগে কদম বাড়াল।

— কোন দিকে যাচ্ছে! বিরক্ত হলেন দারোগা।

— স্যার মুখ কাঁচুমাচু করে কিসমত বল্লো — স্কুলের সেক্রেটারির বাড়ি স্যার।

ফেরাব লোককে বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করে বিশেষ কোনও ফয়দা হবে না। দারোগা সাহেব মনে মনে সায় দিলেন, লোকটার বুদ্ধি আছে বটে। সেক্রেটারিটাকে একটা জোর ধাঁতানি দিতে হবে, বোটো কমিউনিষ্ট পুষছেন! মুখে জিজ্ঞাসা করলেন — কি নাম হে লোকটার?

— হেত মামুন স্যাব।

— হেত মামুন! ব্যঙ্গ করে বল্লেন দারোগা — সে আবার কোন বামুনের বেটা হে?

কবিরাজ স্যাব . বল্লমখানা দুই পায়ের ফাঁকের মাঝখানে কায়দা মাফিক চেপে ধরে অকারণেই মাথার পাগড়ীটা একবার খুলে ফেলে আবার সেটা যুতসইভাবে মাথায় বাঁধতে বাঁধতে অনেকটা চৌকিদারি ভাষাতেই কিসমত বললে — হামার গাঁয়েবই স্যাব। সাত নম্বৰ সুন্দরদিঘির বোর্ডের অধীন মৃত জ্ঞান মাহমুদ তালুকদারের বেটা।

টুপি, সাইকেল, বুট, বল্লম সমেত সমস্ত দলটা নড়েচড়ে উঠল মৃত জ্ঞান মাহমুদ তালুকদারের ছেলে কবিরাজ হায়াত মাহমুদ তালুকদারের বাড়ির উদ্দেশ্যে। কিন্তু ততক্ষণে সাদা, কালো, লাল, খয়েরী প্রায় আধ ডজন কুকুরও যেউ যেউ কবতে করতে এসে জুটে গিয়েছে। কিসমত একলাই এতক্ষণ যা কিছু হাঁক-ডাক কবছিল। ভাবে মনে হচ্ছিল, গাঁয়েব লোকের নিষ্পৃহতাব ফলে তার উপরওয়ালার যথেষ্ট সমাদর হচ্ছিল না বলে কিছুটা সে অতৃপ্তি বোধ কবছিল। এখন কুকুরের চিংকাবে দ্বিগুণ উৎসাহে কখনও বল্লমের ভয় দেখিয়ে কখনও বা মাটি থেকে ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে তাই ছুড়ে হে-হে করে কুকুর তাড়াতে তাড়াতে সত্যিই গাজীৰ বাঁশের নাচনের মতই পাডাময় সোবগোল তুলে সমস্ত দলটিকে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

হোমিওপ্যাথি ঔষধের হাতবাক্সটা ঘাঁটার্ঘাটি করে কয়েক পুৰিয়া ব্রাইয়োনিয়া দিয়ে ব গীকে বিদায় করে গোয়াল ঘরবৰ সামনে সবেমাত্র চাড়িতে ঘাসের সাথে খইল মেখে দিয়ে গকব খাবাব ব্যবস্থা কবেছিল আপতাব। এমন সময় চাপা গলায় মাহতাবেব মা দেওবকে ডাকলেন — মিয়া! শুনি যান জলদি।

যেতে অবশ্য হল না। বুড়ি নিজেই খডম ঠকঠক কবতে কবতে গোয়াল ঘরবৰ দিকে এগিয়ে এলেন। পব মুহূর্তেই কাঁধে গামছা ফেলে আপতাব বাড়ির পেছনে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চোবা পথে বাইবে বেব হয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক বাদে আপতাব যখন কতকটা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিবছিল তখন বাড়িব সামনে বিলিফ সড়কের ধারে কদম গাছের তলায় দাবোগা পুলিশেব দলটার সাথে তার দেখা হয়ে গেল।

— মাহতাব বাড়ি আছে, হ'ব? চক্ষুলজ্জাহীন কিসমতই প্রথম কথাটা গিজ্জেস কবল।

দালাল কিসমতের মুণ্ডটা চিৰিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল আপতাবেব। কিন্তু সেও যেন তাকে বৃথাই খুঁজে হযবান হয়েছে এমনই অসহায়েব ভঙ্গীতে অনায়াসে সে বলে ফেলল — বাড়িতেই তো আডিল মাহতাব। কোন দিক বুলি বা গেছে তা আন্মাই জানে।

— আন্মাই জানে! তুমি জান না? কটমট করে তাকাল কালো চাপ-দাড়িওয়াল কনস্টেবলটি।

আপতাবেব কান দুটো লাল হয়ে উঠল।

— ইঞ্চুল যায় না সে? বেশ ডাঁটের সাথেই গিজ্জাসা করলেন দাবোগা সাহেব। দাবোগা সাহেব মোটামুটি একটা খবর ঠিকই পেয়েছিলেন যে মাহতাব মাস্টার স্কুলে প্রায় নিয়মিতই এসে থাকে।

— যায় তো। কিন্তু ইঞ্চুল বুলি আজ ছুটি নাকি .. আমতা আমতা করে বক্সল আপতাব।

— কেন, তোমাব বাপের আজ ফতহাব তারিখ নাকি বিদ্রপের সাথে মুকুটি কবলেন দারোগা।

— তবে বুলি ইঞ্চুল খোলাই আছে।

একে তো মেয়ে-মরদ, বুড়ো-বাচ্চা সমস্ত গ্রামবাসীর নিক্তিয় অথচ কৌতুহলী চাহনি পরিবেষ্টিত হয়ে একপাল অসভ্য কুকুর পেছনে নিয়ে গোটা গ্রামখানা এভাবে সঙ সেজে ঘুরে বেড়াতে বেজায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাতে অঙ্গের জন্যই মাহতাবেক বাড়িতে

পাওয়া গেল না স্থিৰ বুঝতে পেৰে দাবোগা সাহেব এবাৰে বেগে একেবাৰে গুম হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেৰে একটু ইন্ধন যোগানোৰ উদ্দেশ্যে ফৰ্সাপানা বেঁটে পশ্চিমা পুলিসটি কিসমতকে বকাবকি কৰে বলল — তুমি একটা বুড়বুৰু আছে। কিসমত। সমুচা মাটি কৰে দিলে তুমি।

কাজেৰে মध्ये কোন গোলমাল হয়ে গেলে উপবণ্ডালাবা যে অধস্তনকেই দায়ী কৰে থাকে এটা সমস্ত স্তৰেৰ অধস্তনদেৰই জানা কথা। সুতৰাং কিসমত তাতে কিছুমাত্র দমল না। উৎসাহেৰে সাথে চোখ টিপে অবলীলাক্রমে বলল — না সিপাইজী, এইডা ভাল হইছে। চাইব-চাইবডা সাইকেল আছে আমাদেৰ, ইন্ধুল ছাঁদিয়া ধবা যাইবে .. স্কুলেৰ চাৰিদিক থেকে ঘেৰাও কৰে ছেঁদে, সাইকেল দাৰ্ভিয়ে ছইসেল বাজিয়ে মাহ্‌তাব মাষ্টাবকে ধৰে বেঁধে আনবাব চৌকিদারী বোমাঞ্চে সে তখন বেশ মশগুল হয়ে উঠেছে। বাড়ি থেকে মামুলিভাবে ধৰা পড়ে গ্ৰেপ্তাৰ হয়ে গেলে মাহ্‌তাব তাৰ মানুহ শিকাৰেৰ এমন মজাটা অনায়াসেই মাটি কৰে দিতে পাৰতো।

কিন্তু দাবোগা সাহেবেৰ মেজাজ এব আগে স্কুলেৰ সেক্ৰেটাৰী হায়াত মাহমুদ কবিবাজেৰ বাড়িতেই বিগড়ে গিয়েছিল, তিনি চাপা বিবন্ধিৰ কিসমতের দিকে চেয়ে বললেন — বড্ড বকবু কব হে তুমি।

তবে বেশ বুঝা গেল, দাবোগা সাহেবও উপস্থিত কৰ্তব্য ঠিক কি হবে তা স্থিৰ কৰতে পাৰছিলেন না। তিনি ভেবে এসেছিলেন আচমকা স্কুলটায় হানা দিয়ে অতি স্বচ্ছন্দে টুক কৰে মাহ্‌তাব মাষ্টাবকে তুলে নিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু ব্যাপাৰটা তাৰ ধাবপাশ দিয়েও গেল না দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিল।

—বাড়ি তল্লাসী কৰা হইবে কি? অতি বিনীতভাবে নিবেদন কবল কিসমত — যদি ঘৰে লুকায়ে থাকে।

কিসমতেৰ চোখ দুটি আঁৰিষ্কাৰেৰ সম্ভাবনায় বেড়ালেৰ চোখেৰ মত জ্বলজ্বল কৰে উঠল।

কিন্তু না। এখানে আর দেবি না কৰে সমস্ত দলটা আবাব স্কুলেৰ দিকে ফিৰে যাওয়াই স্থিৰ কবল।

স্কুলে যখন আবাব তারা গিয়ে পৌছিল তখন স্কুলটা একেবাৰেই ফাঁকা। একমাত্র কালজামেব গাছটা তাৰেৰ ব্যঙ্গ কৰবার জন্যে সেখানে একা একা দাঁড়িয়েছিল।

সন্ধ্যাৰ অন্ধকাৰটা তখন কেবলই বেশ জমে উঠেছে। আঁধাৰকোঠাৰ ভঙ্গলেৰে মध्ये একটি মেটে কুটিৰেৰ আঙিনায় মছয়া গাছেৰ তলায় একখানা দড়ি দিয়ে বোনা বাঁশেৰ নিচু খাটিয়ায় বসে তিন-চাব জন লোক পৰিবেষ্টিত হয়ে গল্প শুনতে শুনতে আঁখ চিৰোছিল মাহ্‌তাব। বছৰ বিশেকের একটি তরুণী হাত পা নেড়ে কি যেন বলছিল। তাৰ কালো মিষ্টি চেহাৰাখানা তখন সন্ধ্যাৰ আঁধাৰে মছয়া গাছেৰ ছায়ায় একেবাৰেই প্ৰায় মিলিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাৰ খোঁপাৰ বুনো ফুলেৰ ধবধবে সেই গুচ্ছটি তখনও মুগ্ধ মাহ্‌তাবেৰ চোখ দুটোকে ফাঁকি দিতে পাৰেনি। আকাশে চাঁদটা উঠবার অপেক্ষায় সে রয়েছে। চাঁদটা উঠলেই, শিমুলতলাৰ ঘাটে রক্তা পাৰ হয়ে মাহ্‌তাব আবার নবীনগরেই ফিৰে যাবে।

দুপুৰবেলায় স্কুল ছুটি দিয়ে আঁখেৰ ক্ষেতের ভেতৰ দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে বড়ো পাৰ হয়ে মাহ্‌তাব পালিয়ে এসেছিল এখানে। এপাৰে আশ্ৰয় অবশ্য সুলভ কিন্তু খাদ্য বড়ই দুৰ্লভ। সাঁওতাল বাড়িতে খাওয়া দাওয়া মুসলমান সমাজে নিষেধ। কিন্তু সেটাও মাহ্‌তাবেৰ কাছে বড় কথা নয়। প্ৰয়োজনবোধে সমাজেৰ পাঁচজনে জানতে না পাৰে এমনভাবে লুকোচুৰি কৰে সাঁওতাল বাড়িতে খেতে তাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, খাবে যে সে খাদ্য কোথায়? নবীনগরে এ সময়টা যদি সিকি ভাগ লোকেৰ অৰ্ধাহাৰ অনাহাৰ শুরু হয়ে থাকে, এপাৰে প্ৰায় ষোল আনা লোকেৰই সেই অবস্থা। বেশীৰ ভাগ লোক এখন খাবাৰ জন্য মাটি

খুঁড়ে বুনো আলু সংগ্রহ কবছে। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই যে, সবচেয়ে বেয়াড়া ধরনের ওলের চেয়েও এ আলু বহুগুণে হিংস্র। তবে পেটের ভুখা কত অপাঙ্কজের জিনিসকে তাব প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে দিনে দিনে যে মানুষের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কবে তুলেছে, সভ্যতাব ইতিহাসই তাব সাক্ষী হয়ে আছে। এখানকার সাঁওতালোবা বন-জঙ্গলের মধ্যে থেকে খুঁজে খুঁজে মাটি খুঁড়ে বুনো আলু তুলে, পারলে দু-এক দিন তা ঘরে রাখে। তারপর সেগুলো ফালি ফালি করে কেটে একটা ঝাঁকায় করে রত্নার শ্রোতে ডুবিয়ে রেখে আসে। দু-এক দিন বাদে আলুর বিষাক্ত কণ্ডলো যখন সব ঝবে গিয়ে শ্রোতে ধুয়ে চলে যায় তখন সেগুলো বোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে নেয়। এর পর তা সিদ্ধ করে যেমন খুশি খাওয়া চলে।

আঁধারকোঠার সাঁওতালোবা তো তবু যা হোক একটা বিকল্প ব্যবস্থা বের করেছে। কিন্তু নবীনগরে আবার তা চলে না। এক সময়ে সাঁওতালোরাও যখন বুনো আলু খেত না তখন এগুলো ছিল শূয়োবের খোরাক। শাস্ত্রীয় বিধির চুলচেরা বিচারে এই বুনো আলুকে 'হারাম' অর্থাৎ অবৈধ খাদ্য হিসাবে গণ্য কবা চলে কি চলে না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি। তবে একটা অবস্থিত স্মৃতি এর সাথে জড়িত থাকায় আজো তা 'শূয়োরে আলু' নামে অভিহিত হয়ে নিছক সংস্কারবশেই 'হারাম' হয়ে আছে। আজো ঐ নবীনগরের মুসলমান সমাজে বৈধ পবিত্র খাদ্য হিসাবে পাঙ্কজ হয়ে উঠতে পারেনি।

যাই হোক, টুইলা সর্দারের মেয়ে সুখমীকেই রত্নার ওপাবে পাঠানো হয়েছিল সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে আনতে। সেই সুখমীই তার সংগৃহীত বিবরণ এতক্ষণ ধরে মছয়া গাছেব তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাখিল করছিল। সুখমী যেমন সাহসী তেমনই বুদ্ধিমতী। সে এক বোকা জালানী কাঠ মাথায় কবে বিক্রিব ছলে ঘুরতে ঘুরতে একেবাবে সুন্দরদিঘির হাট পর্যন্ত বেড়িয়ে দেখে এসেছে। দাবোগা-পুলিশ কেউ কোথাও নেই। শুধু সুন্দরদিঘির হাটখোলাব কাছে বোর্ডের অফিসেব বারান্দায় কিসমত চৌকিদারকে শুকনো মুখে বসে থাকতে দেখেছে সুখমী। থানা পর্যন্তও যেতে পারতো সে। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিযে এল। সন্ধ্যাব মুখে ফিববাব সময়ে পথের পাশে ক্ষেতভব্যা আখ দেখে সুখমীর মনে পড়ে গেল মাষ্টারের ক্ষুধার্ত মুখখানাব কথা। তাই সে দুটো ভাল দেখে আখও ভেঙে নিয়ে এসেছে।

আখ চিবোতে চিবোতে মুগ্ধ হয়ে কাহিনীটা শুনছিল মাহ্‌তাব। ছেলেমানুষী ঢঙ-এব কথাগুলো বেশ লাগছিল তার। সুখমী অবশেষে বললো — তুমাব কুছু ডব নেই মাষ্টাব। পুলিশ-ফুলিস তল্লাটের মধ্যে কই নেই। বাপ-মায়ের বেটা বাপ-মায়ের কাছে যাও। ঘবে যাইয়ে কুছু খাও। জবর ভুখ লাগছে তুমাব।

বুকখানা ভরে উঠলো মাহ্‌তাবের। সুখমীব দরদ মাখানো কথাগুলোয কি বকম যেন একটা জাদু আছে!

টুইলা সর্দার উপস্থিত ছিল সেখানে। সেও সুখমীর কথাতেই সায দিল।

আজই যখন একটা হামলা হয়ে গেল, তখন দু-একদিন যে আপাতত ওঁরা হানা দেবে না তা মাহ্‌তাবও আন্দাজ করতে পারে। কিন্তু সে ভাবছিল অন্য কথা। ভোব রাতে বড়া পাব হয়ে চোরাপথে কিসমতই যে থানায় গিয়ে সংবাদ দিয়ে দারোগা-পুলিশ ডেকে ন্বিয়ে এসেছে এ বিষয়ে মাহ্‌তাবের মনে আব কোনও সন্দেহ নাই। এখন কথা হচ্ছে, গাঁয়ের ভেতরে থেকে লোকটা যদি এরকম শয়তানি শুরু করে তবে কয়দিনই বা এভাবে পালিয়ে পালিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে।

আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছিল। আখ চিবোতে চিবোতেই মাহ্‌তাব রওনা দিল। মনে মনে ঠাক করল সে যে দুই-একদিনের মধ্যেই বোশেনাবাদের সহকর্মীদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করে একটা শলাপরামর্শ করবে।

টুইলা সর্দার আর তার সম্বন্ধী ঝলুক মাঝি মাহ্‌তাবকে খানিকদূর এগিয়ে দিল। সুখমীও প্রায় রত্নার ধার পর্যন্তই নিঃশব্দে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

শিমুলতলা ঘাটের কাছাকাছি এসে ওকে বিদায় দিয়ে মাহ্‌তাব আস্তে আস্তে জলের ধারে নেমে এল। একটা বুনা ফুলের সৌবভে নদীব ধাবটা মৌ মৌ কবছিল। কেন যেন বড় ভাল লাগছিল মাহ্‌তাবেব।

রজ্জা ছোট হলেও তেজী। বনেব ভেতব দিয়ে প্রবাহিত এ নদীর বুকে লুকিয়ে আছে অজস্র ছোট ছোট ঝরা। পাতাল ফুঁড়ে সেই ঝরাগুলোব মুখ দিয়ে অনবরত ঝিবঝিব করে বেব হয়ে আসছে জলের ধাব। তাই অগভীর হলেও কোন সময়েই এ শুকিয়ে যায় না। এখন তো কার্তিক মাস। চৈত-বৈশাখের দাকণ গ্রীষ্মেও এক হাঁটু জলে টেব পাওয়া যায় তার তীব্র পাহাড়ী শ্রোতব মেজাজ। বত্সাব বুকে চাঁদখানা গলে গলে ছলকে ছলকে ভেসে যাচ্ছিল। মাহ্‌তাব সেই চাঁদনী-মাখা জলে ধীরে ধীরে অতি সন্তুর্ণণে নেমে পড়ল।

ওপারে গিয়ে জল ছেড়ে তীরে উঠতে যাবে মাহ্‌তাব এমন সময়ে তার নজরে পড়ল সামান্য একটু উজানে জলের একেবারে ধারে কে একটা লোক চূপচাপ বসে রয়েছে। হঠাৎ এমন মিঠে মেজাজটা তার ভয়ঙ্কর বকম বিগড়ে গেল। কতখানি স্পর্ধা! এ বাতে কে এখানে গোয়েন্দাগিরি কবতে এসেছে রে।

হাঁক ছাড়ল মাহ্‌তাব— কে রে মানুষ উডা!

জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, লোকটা পড়ি মবি কবে ছুট দিল। কিন্তু জোযান মাহ্‌তাবেব তখন জেদ চেপে গিয়েছে। দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে সে পেছন থেকে জাপটে ধরে ফেললো।

— মাতাব!

কিসমতেব গলা নয়? উত্তেজিত মাহ্‌তাব আগে খেয়াল কবেনি। এখন ভাল করে চেয়ে দেখে, তার দু'বাহুব কবলেব মধ্যে অত্যন্ত আড়ম্বলবে কিসমত দুই হাতে শক্ত কবে একখানা ঝাঁকা ধবে বয়েছে আব তাতে ফালি ফালি কবে কাটা একবশ 'শূয়োরে আলু'।

মাহ্‌তাব হকচকিয়ে গেল।

কিসমতেব গলাটা শুকিয়ে উঠেছিল। একটা ঢোক গিলে বললো — সব মানুষকে তো কওয়া যায়না মাতাব! তবে তোমাক্ কওয়া চলে। ফজরে আসিয়া মানুষজন ওঠার আগেই মাটি খুঁড়ি চূপ চূপ এই আলু তুলিয়া কাটিয়া পানির সোঁতায আজ ডুবায় রাখছিলাম।

ভোববেলাব কথাটা মাহ্‌তাবেব মনে পড়ে গেল। কিন্তু, কি বলবে মাহ্‌তাব ঠাহর কবতে পাবছিল না। কিছুই অবশ্য বলতে হল না। দেখতে দেখতে কিসমতেব স্বাভাবিক মেজাজ ফিরে এল। বললো — মাতাব, দিন কয়েক ইস্কুল করা তুমি বাদ দেন। এই খবরটা তোমাক্ দিবাব জন্য মুই কত মানুষকে তোমার কথা পুছ কবছি! আজ হঠাৎ ওরা আসিয়া পড়িল, আলাবাস্তেব বাপকে দিয়া তোমার মাকে খবরটা পাঠায়ে, কত রঙ ঢঙ হল বাহানা করি শয়তানদের যে মুই ঠেকাইছি তা খোদাই জানে।

কোমবেব কাছ থেকে ভাঁজ-করা ছোট একটা বস্তা বের করে তাতে ভিজে ঝাঁকা থেকে আলুগুলো তুলে তুলে ভরছিল কিসমত। একটু থেমে বললো — হাটের ইজাবাদাব তমিজ হাজী কইলে, তোমাক্ থানায় ধরি দিতে পারিলে উই আমাকে নগদ পঁচিশ টাকা বখশিশ দিবে। পঁচিশ টাকায় দেড় মণ ধান পাওয়া যায় ঠিকই। কিন্তু মাতাব, তোমাবা দশেব খেদমত করেন। সেই ভাত কি মোর হারাম ইহিত না?

বিশুদ্ধ মাহ্‌তাব তখনও কিছু বলতে পাবল না। চাঁদের আলোয় ঝাঁকা ভর্তি ফালি ফালি করে কাটা 'শূয়োরে আলু'গুলো দেখে শুধু তার মনে হল যে কিসমতেব পবিত্র স্পর্শে ওগুলো আজ 'হালাল' হয়ে উঠেছে।

লাখে না মিলয়ে এক

গোলাম কুদ্দুস

লাখে না মিলয়ে এক।

আমি ষাট লাখে পেয়েছিলাম তোমাকে। ভিখু, কত বছর আগে কৃষকদেব মধো এসেছিল সেই আলোড়ন, যাকে বলা হয় তেভাগা আন্দোলন। সে কি সত্যের বছর আগে? আর তাতে কি ষাট লাখ কৃষক অংশ নিয়েছিল? মাথা গুনতি করে কি এই সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল? তবু এটাই চলে আসছে। এর সত্যিমিথো আমি জানিনে। তবে বাংলাদেশের এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আন্দোলন যে ছাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এব খবরাখবর ভোগাডেব জন্য আমাদের তখন বহু জায়গায় ঘূর্ণতে হয়েছিল। অল্প এতকাল পরে অবাক হয়ে ভাবছি, এত লোকের মধো শুধু তোমার কথাই কেন এমন করে মনে আসছে?

অথচ তুমি বার বছরের কৃষক-বালক বই তো নও। কোন বৃহৎ কাণ্ডও তুমি ঘটাও নি আর আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ও মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তবু এমনটা কি করে হল?

তোমার নামটা ভাই আমি বেমানুম হাবিয়ে ফেলেছি। তোমাকে যে নামে ডাকছি, ওটা আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর নাম। তাকে বহুকাল হাবিয়েছি, কিন্তু নামটা স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই নামের লেবেলটা অল্প আমি তোমার গায়ে সঁটে দিলাম।

কিন্তু ভিখু, কানু ছাড়াও গীত আছে। ভাবতে বসলে ক্রমে ক্রমে আবে। অনেক মুখ এবং ঘটনার কথা মনে পড়ে। কি করে ভুলি হেমন্তদাকে! কৃষক সমিতিতে যোগ দেওয়াব আগে সে নাকি ডাকাত ছিল। পৌষমাসের রাত্রিতে টর্চ জ্বলে গ্রামের পথে চলেছি, সামনে খানিকটা জল জমে আছে, থমকে দাঁড়িয়ে জুতো খুলতে যাচ্ছি অমনি আমাদের নব-বান্ধবী আমাদের পাঞ্জ-কোলে কবে শুনো তুলে ধরল। — আহা কর কি! ছাড়ো! ছাড়ো!... কে শোনে কার কথা। যতই বলি, আমিও গ্রামের ছেলে, ততই হেমন্তদা বলে, আহা আপনারা হলেন কলকাতার লোক, আপনারা কি জলকাদা সহ্য হয়? ... হেমন্তদা হিমশীতল জলটা পাব করে আমার বপুটাকে হালকা সোনার মতো ডাঙায় নাগিয়ে দিল। পবে সেই হেমন্তদাকে আর একবার দেখেছি, তিনি তখন চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। সেই লোহার মতো শক্ত শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। দেখলে মানুষটাকে চেনাই যায় না!

সব আন্দোলনে যুবকেরাই থাকে সকলের পুরোভাগে। কৃষক আন্দোলনেও সৈনিক তাব ব্যতিক্রম হয়নি। ‘এক ভাই, এক টাকা, এক লাঠি’ — আওয়াজটা তাদেরই স্বর থেকে আকৃষ্ট করেছিল। তারাই দলে দলে ভলান্টিয়ার হয়েছে, তারাই গাথা বেঁধে ধান কেটেছে, তারাই লাঠির ডগায় নিশান বেঁধে মিছিল করেছে, আর তাবাই বাত জেগে পুলিশের হামলা ঠেকাতে পাহারা দিয়েছে। কিন্তু কৃষক-মেয়েরা তাদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি রানী-শংকহিনের মেয়েদের। তারা পুলিশের হাত থেকে চারটে বন্দুক কেড়ে এনেছে। পুরুষদের মধো ছলছল কাণ্ড! কি করে বন্দুক ফেরত দেওয়া

যায়, সেই এক ভাবনা। আর এই সময় মেয়েদের মারধোর করার সনাতন রীতিটা হঠাৎ যুক্তি বহির্ভূত বলে মনে হতে লাগল। তখন এ নিয়ে অনেক গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। কৃষক সমিতির কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অভিযোগ করার দৃশ্য আমিও দু'একটা দেখেছি।

ভাবলে অবাক লাগে তখন কত বড় বড় ঘটনা কত সহজে ঘটত। তোমার সে-সব বোঝাব মতো তখন বয়সও হয়নি, সুযোগও ছিল না। তুমি যেখানে জন্মেছ, সেখানেই বড় হয়েছ। তুমি কোনো স্কুলে পড়নি, বাংলা দেশকে জানা তো দু'বের কথা, একখানা মানচিত্রও দেখনি। তুমি কি করে জানবে, মস্ত অবিভক্ত বাংলা দেশে কি তোলপাড় কাণ্ড চলছিল। তোমার গ্রাম থেকে আট-দশ মাইল দূরে কি ঘটেছিল, তাব খবরই কি তুমি জানতে?

তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার মাস তিনেক আগে আমি সেইবকম একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। কপনাবাণ্য বায়েব নামটা হয়ত শুনে থাকবে। তোমাদের এলাকায় এম এল এ। আমি তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে কেরোসিনের ডিবেব আলোয় খবর লিখতাম, আব মাঝে মাঝে কান পেতে শুনতাম গ্রামের বাস্তায় পাহাবাবত ভলান্টিয়াবদের মাতোয়ারা কণ্ঠের আওয়াজ — ‘জন দেব তবু ধান দেব না।’ দাওয়ার আর এক পাশ থেকে উঠত কয়েকটা ছাগল, আব তাদের ডেকে পার্শ্বে শাখিতা বাড়ির বুড়ো-মা বিড় বিড় করে কি যেন বলত। সামনে লাউ-কুমড়োর নীচু মাচাটাব মধ্যে জ্বলত জোনাকী। মাটির সানকীতে ডাল-ভাত খেয়ে আমি ওভাবকোট গায়ে জড়িয়ে গবম খড়ের বিছানায় শুয়ে শীতে কাঁপতাম, আব পাহাবাবত ভলান্টিয়াবদের নৈশ বিচরণের জামাকাপড়ের অবস্থার কথা ভেবে লজ্জা পেতাম। সকালে তাবা অনেকে এসে আমাকে ঘিবে বসত, আব শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমাব ওভাবকোটের ওপব সন্তুর্পণে হাত বুলিয়ে বলত, — কমবেট, এটা গায়ে দিলে শীত লাগে না, — না।

মানুষের সঙ্গে একায়া হওয়া কি সোজা কথা? এই জামাকাপড়ের প্রাচীর একটা ব্যবধান সৃষ্টি কবেছে। তাই বলে একে তো হঠাৎ বাদ দেওয়াও যায় না। ওদের যে বস্ত্রে যে শীত সহ্য হয়, আমি সে রকম কবতে গেলে নিউমোনিয়ায় ভুগব। ওবাও তা আশা কবে না। কলকাতা থেকে ভদ্রলোক ‘কমবেট’ এসেছে, এতেই ওবা খুশী। আব আন্দোলনের উৎসাহেব জোয়াব আপাতত সব ব্যবধান ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অথচ এই হঠাৎ আলোব ঝলকানিব মতো আন্দোলন বুঝতে হলোও তাব পিছনেব কথাটা বুঝতে হবে। কাবণ এই আলোড়ন আকাশ থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো নিশ্চয় ঝবে পড়েনি। এরকম আকস্মিকভাবে তো সংসারে কিছু হয় না। ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এই আন্দোলনের একেবারে নাড়িব যোগ। সেকথা কৃষকেরা সবাই জানে, বোঝে এবং বাববার কবণ সূরে আমাকে স্মরণ করিয়েও দিয়েছে। কত গ্রামেব মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তারা আমাকে কবেরেব সাবি দেখিয়ে দিয়েছে। শ্রাশানে যাবা পুড়েছে তারা তো স্মৃতি রেখে যায়নি। তবে সেদিন সবাইকে তো শ্রাশানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রামেব লোক বাধা হয়ে গ্রামান্তেব কোন জঙ্গল বা আমবাগান বা মাঠেই তাদের ফেলে দিয়ে গেছে। কৃষকরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে — ঐ যে ঐখানে। তিন বছর পরেও গাদা গাদা ভাঙা হাঁড়ি কলসী মালসা তার সাক্ষী হয়ে আছে।

দুর্ভিক্ষের সময় আমি ছিলাম শহরে, গ্রামেব কান্না আমি কি করে বুঝব! শুধু সেটা যখন করণ মিনতির মতো শহরের ফুটপাথে এসে মাথা কুটে-মরেছে, তখন চোখের জল ফেলেছি। ক্রমে ক্রমে তাও শুকিয়ে গেল। তবু তখনকাব একটা ঘটনা কি করে তোমাকে আমার নিকটবর্তী করেছে, সেই কথাই আজ অকপটে সব বলব।

একদিন বাত বাবোটা নাগাদ বাড়ি ফিরছি। সিঁড়ির কাছটা রীতিমতো অন্ধকার। সেখানে প্রায়ই একটা কুকুর শুয়ে থাকে। সাবমের-প্রীতি আমাব নেই, আমি কতবার যে ওটাকে লাথি মেবেছি, তবু আপদটাকে দূর করতে পারিনি। সেদিনও কুকুর মনে করে কুণ্ডলী পাকানো একটা বস্তুর উপর পদাঘাত করলাম। অমনি মানুষ-কণ্ঠের দুর্বল আত্ননাতে চমকে উঠলাম।

— কে? কে ওখানে শুয়ে?

কোন সাড়াশব্দ নেই।

আবার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করাব পর একটি বালক কণ্ঠের উত্তর এল — আমি।

— আমি কে?

— আমি।

ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এক ভদ্রলোক টর্চহাতে নামছিলেন, সেটা ফোকাস কবতেই নামহীন গোত্রহীন ‘আমি’কে দেখা গেল।

একটি বছর নয়েকের শীর্ণ কঙ্কালসার উলঙ্গ বালক, আর একটি বছর চারেকের অনুকপ শীর্ণ এবং উলঙ্গ বালককে কোলে জড়িয়ে শুয়ে আছে।

— তোবা কোথেকে এসেছিস?

কোন উত্তর এল না।

— তোর বাবা নেই?

— মবে গেছে।

— তোব মা নেই?

— মবে গেছে।

— ওটা কে?

— আমাব ছোট ভাই।

— কাদছে কেন?

— ছুব।

ভিখু, তোমার কাছে সত্যি কথাই বলব। টর্চধারী নেমে গিয়ে মোটরে উঠল, আব আমি হঠাৎ এমন ক্রান্ত বোধ কবলাম যে সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। ভিতবটা যেন অসাড হয়ে এসেছে। গত দুসপ্তাহ ধরে শহরে মৃত্যুর মহোৎসব দেখছি। কি কবতে পারি, কি কবতে পেরেছি? কিন্তু মৃত্যু দেখতে দেখতে মনটা যে কেমন কবে পাথর হয়ে উঠেছিল, সেদিন রাব্রেই তা টের পেলাম। অথবা আদৌ টেরই পেলাম না। তাই নির্বিবাদে ছেলেদুটোকে ফেলে আমি টলতে টলতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তখন শীত পড়তে শুরু কবেছে। একবার মনে হল, উলঙ্গ বড়ভাইটা শুধুমাত্র নিজের কঙ্কালসার দেহটার উত্তাপ দিয়ে ছুরোত্তপ্ত ছোটভাইটিকে রক্ষার কী ককণ চেষ্টাই না করছে। একথা এমন স্পষ্ট করে যে তখন ভেবেছি, তাও নয়, তবু একবার মনে হল চাদরটা দিয়ে ওদের ঢাকা দিয়ে এলে হত। কিন্তু তক্ষুনি অবসাদের সুরে মন বলল, সব মরাছে, ওরাও মরবে, মরতে দাও।

সকালে উঠে দেখলাম, ন্যাংটো ছেলেটার দুই বাহুর মধ্যে তার ছোটভাইটি মঞ্চে রয়েছে।

জানো ভিখু, আজও চোখ বুঁজলে তাদের দেখতে পাই। নিজের চেহারাটা নিজে যখন দেখি তখন শিউরে উঠি। অথচ নিজেকে এককাল কত উঁচুদরের জীব বলে মনে করে এসেছি। বিশ্বসংসারে দুর্ভিক্ষের প্রলয়ে যখন ঘরবাড়ি বাপ-মা সবই ভেসে গেল, তখনো ঐ ক্ষুদ্র বালকটি তার ক্ষুদ্রতর ভাইটিকে ছাড়েনি, দুই হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে চেয়েছে। আর আমি? সভ্যতার খোলস-পর্যায় আমি মৃত্যুর মহোৎসব দেখতে দেখতে অবশ হয়ে ঘরে গিয়ে কবল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে পেরেছি তো।

সে সময় তোমার বয়সও হবে ওরি মতো — বছর নয়।

— তুমিই বা দুর্ভিক্ষের কি বুঝবে? তোমার তো তখনো বোঝবার মতো বয়স হয়নি। গ্রামের সে ভয়ানক দিনগুলিও মধো যে না থেকেছে, সে কি করে বুঝবে কৃষক মেয়েদের মনের ভাব, যখন তারা ধানের আঁটিও ওপব হাত বুলিয়ে বলে, — মা লক্ষ্মী, ঘরে এয়েচ? তোমাকে আমি ছাড়বো না। — ‘জান দেবো তো ধান দেবো না’ব বহুসা এই।

কিন্তু কৃষকদের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল তোমাদের অঞ্চলের কৃষকদের কালাী সরকাব। তার ফলও সে ভোগ কবেছিল। তাব জ্যাঠামশায় জোতদাব এবং ধনবান। আন্দোলনের শুরুতেই বাড়ির মাঝখানে পাঁচিল তুলে দিলেন। বাড়িও একমাত্র ইঁদাবাব ত্রল বন্ধ কবলেন ভাতুপ্পত্রের পরিবারে।

গ্রামের কৃষকেরা অবশ্য তার জবাব দিয়েছিল।

কোনো লোক তাঁর বাড়িতে খাটেনি, তাঁব ধান মাঠে পড়ে ছিল। তাঁর আনুব ক্ষেত চষা হয়নি। তাঁব গোয়াল-ভবা গরুর মুখে ঘাস বিচালি জোগাবাব রাখাল পর্যন্ত জোটেনি। কালাী সবকার আমাকে গম্ভীব মুখেই জানিয়েছিলেন, — ব্যাপাবটা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দুই পক্ষেব কেউই কাউকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

কৃষকদের মনের ভাব একটু একটু বুঝতে পাবছি বৈকি। কি কবে তারা ছাড়বে? দুর্ভিক্ষের পবেব বছব সব জায়গায় ভালো ফসল হয়নি। তার পবেব বছব বকেয়া বাকি ঋণের নামে কৃষকদের সর্বস্বান্ত কবে শুমে নিয়ে গেছে। এই তৃতীয় বছরে সোনার ধান মাঠে মাঠে আশাব বাগীব মতো হাতছানি দিচ্ছে।

আব আমাব মনের ভাব ওনদের? আমি এসেছি সেই কলকাতা শহব থেকে, যেখানে কিছুকাল আগে মানুষ পণ্ডব মতো আচরণ কবেছে। তখন সেই দাস্তাব দিনগুলি কতবার ভেবেছি এবং পবস্পবকে বলেছি — এব চেয়ে মানুষের জন্য কিছু একটা করতে গিয়ে ওলি খেয়ে মরাও ভালো। সেই কিছু একটা, আমার চোখের সামনে, মানুষ আব শসোব যুগ যুগান্তবের নির্বিড় সম্পর্কের কপ নিয়ে উপস্থিত। মহানগবের অক্ষকূপ থেকে হঠাৎ আমি ছাড়া পেয়েছি গ্রাম গ্রামান্তবের দিগন্ত বিস্তারিত খোলা মাঠের মধো। আমার মাথার ওপব বৌদ্রদীপ্ত ঘননীল উজ্জ্বল অনন্ত আকাশ, আব চারপাশে আশাদীপ্ত নক্ষত্রের মতো অজ্ঞব মানুষের মুখ। এই সব আওনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র, বোদে-পোড়া কালো মানুষের হৃদ্যার স্তূপে।

বুঝতেই পারছ এই উচ্ছাসপূর্ণ মনোভাব কৃষক-জীবনের কঠোর বাস্তবতাব বিপ্লবেরণেব হস্তবায় ছিল। তবু মনে কবো না একেবাবেই চোখ বুজে ছিলাম।

নডাইলে একজন কৃষক ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল — এটা তেভাগার ধানের ভাত। ... তাকে খুশী করাব জন্য আমি সজ্ঞানেই এমন মুখভঙ্গি কবেছিলাম যাতে তেভাগাব ধানের ভাতের বিশেষ মিষ্টত্ব এবং বসাস্বাদনের প্রয়াস বুঝিয়ে দেওয়া যায়।

দিনাজপুরে এসে ফুলবাড়ির মাঠে প্রথম তেভাগাব ধান কাটা দেখলাম।

একটা লাল নিশান পুঁতে রেললাইনের ধাবে ধান-কাটা ইচ্ছিল। মাঝে মাঝে গানও গাওয়া হচ্ছে। একজন তামাক সাজছে সারাক্ষণ। কয়েকজন লোক ভাত-রাঁধার আয়োজন করছে। আজ মাঠেই বনভোজনের ব্যবস্থা। আমার পক্ষে খুশী এবং উত্তেজনা চেপে রাখা মুশকিল। আমি কয়েকজন সাঁওতাল কৃষকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা কবলাম।

এই সময় দার্জিলিং মেল পাস কবে। হঠাৎ সেই দূরন্ত গাড়িটা মাঠের মধো আমাদের “ছাকাছি এসে থেমে গেল। ড্রাইভার এবং ফায়ারমানেরা হাসছে, আর হাত নেড়ে নেড়ে

কি যেন বলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে কাশ্বে হাতে একদল কৃষক ইঞ্জিনের দিকে দৌড়ে গেল। ওদিকে ওরাও গাড়ি থেকে পান্টা ধ্বনি দিচ্ছে। গাড়ির যাত্রীরা হতবাক হয়ে এই কাণ্ড দেখছে। হঠাৎ শুনলাম ধ্বনির ভাষাটা বদলে দিয়ে কে যেন বলে উঠল — কৃষক মজুর এক হও।.... ওদিকে গাড়ির পিছন থেকে গার্ড ক্রমাগত তার ফ্লাগ নেড়ে বাঁশি বাজিয়ে ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করছে। কিন্তু গাড়িটার নড়ার লক্ষণ নেই। কাবণ তখন কৃষকদের হাত থেকে একটা লাল নিশান নিয়ে ইঞ্জিনের মাথায় বাঁধা হচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল দার্জিলিং মেলের মতোই আন্দোলন বাঁধা লাইন দিয়ে দ্রুত সম্মুখে ধাবিত হবে।

কদিন পরে জেলা শহরে গিয়ে দেখি, সেখানে খুব উত্তেজনা। কোর্ট-কাছারিতে ঐ একমাত্র আলোচ্য বস্তু। আব ট্রেনে যেতে যেতে তেভাগা আন্দোলনের নেতাদের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ধারণা ব্যক্ত হতে শুনলাম। কেউ তাদের বাফসেব মতো নৃশংস, কেউ বা তাদের অতি-মানব বলে বর্ণনা করছে।

ভিখু, সংস্কৃতি কি তা জানো? ঐ রকম শব্দ কখনো তুমি নিশ্চয়ই শোনো নি। তবু শোনো, শহরের এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এক সভার আয়োজন করল, তারা নাকি আমাব কাছ থেকে আন্দোলনের কথা শুনতে চায়। আমি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু যেতে হল। কি যে বলেছিলাম আজ আমাব বিন্দুমাত্র মনে নেই, শুধু মনে আছে সভাশেষে বেরিয়ে আসতেই কে একজন বলল — চিবির বন্দবে গুলি চলেছে।. ঐটাই তেভাগা আন্দোলনের প্রথম গুলির খবর।

চিবির বন্দব জায়গাটা দিনাজপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। ট্রেনে গিয়ে আবাব কিছুটা হাঁটতে হয়। দলবল বেঁধে সেখানে যাওয়া গেল। যে জায়গাটায় গুলি চলেছে সেটা বিরাট এক মাঠেব মাঝখানে। চাবদিকে পাকা ধানের সমুদ্রে যেন ঢেউ খেলছে। একটা জায়গায় শুধু কিছু ধানের শিশ মাটি ছুঁয়েছে — সেটা বন্দকের গুলিতে আহতদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগেকার ধড়ফড়ানির ফল। নোয়ানো ধানের গুচ্ছ তুলে দেখলাম তাব নাঁচের মাটি রক্তে তামাটে হয়ে গেছে। কেউ কেউ সেই মাটি হাতে তুলে নিল। কৃষকবা আমাব হাতে কয়েকটি বুলেট উপহাস দিল। পুলিশ কৃষকদের তাড়া করে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে গিয়ে গুলি চালিয়েছিল, তাব কতকগুলো ঘবের মাটির দেওয়ালে ঢোকে। কৃষকবা তা খুঁড়ে-খুঁড়ে বের কবেছে। এদের সবাই মুসলমান। তাদের ইচ্ছা আমি এগুলি কলকাতায় সোহরাওয়ার্দীর হাতে তুলে দিই। তিনি তখন লীগ-মন্ত্রিসভাব কর্ণধার।

বেলা বাড়ছে। একখানা মাঠ পাব হয়ে আমাব এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি এসে উঠলাম। এখানেই আমাদের আবাহের আয়োজন হয়েছে। অনেক লোক জমেছে, তাবা শুনতে চায় অতঃপর কি করণীয়।

চিবির বন্দবের কৃষকরা সেদিন কি চেয়েছিল জানো? ধনুক। এ অতি সত্য কথা। তাদের কাছে 'এক লাঠি, এক টাকা, এক ভাই' চাওয়া হয়েছিল, তাবা তা দিয়েছিল। এখন তারা নিজের চোখে দেখছে হাজার হাজার লাঠি দিয়েও কয়েকটা বন্দুককে ঠেকানো, গেল না। তাহলে এখন কি করবে তারা? আমাব কাছে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমি প্লামেই বড় হয়েছি, কৃষকদের চিনি, একটা চরের লড়াইতেও তাদের দেখেছি, কিন্তু সেখানেও কয়েকজন লাঠিয়াল প্রধান ব্যক্তি। কৃষকেরা শান্তিতে থাকতেই ভালোবাসে। এখন বুঝতে পারি মানুষ কখন চরমপন্থার কথা চিন্তা করে। চরম নির্যাতনই হচ্ছে চরমপন্থার পরিপোষক।

ভিখু, তোমাকে আমি তত্ত্বকথা শোনাতে বসিনি, তেভাগার ইতিহাসও ব্যাখ্যা করছি না। এ কাহিনী আসলে তোমাকে নিয়েই রচিত। তবু যে কতকগুলো আনুষঙ্গিক ঘটনা এসে পড়ছে তার কারণ, এগুলি না বললে তুমি আমার মনে কেন স্থান নিয়েছ, তা বোঝা এবং বোঝানো যাবে না। এখন তোমার বয়স উনত্রিশ হওয়ার কথা। তুমি অনেক কথাই এখন বুঝবে।

এইবার অদ্ভুত এক কাহিনী শোনাব তোমাকে। অথচ এক হিসাবে সেটা নিতান্তই এক মামুলি ঘটনা। শুধু দৃষ্টির হেরফেরের জন্য অদ্ভুতকে মামুলি, আর মামুলিকে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

চিরির বন্দরে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ভালোই হয়েছিল। কৃষকেবা উঠানে, আমরা ভদ্রলোকের ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন অতি শীর্ণ অতি মলিনবস্ত্র পরিহিতা নারী একা একা খেতে বসেছে। তার খাওয়ার স্থান কোথায় জানো? পাশাপাশি দুখানি খড়ের ঘবেব চালা থেকে বৃষ্টির জল পড়ে যে জায়গাটা ঢালু গর্তের মতো হয়েছে, সেইখানে গর্তের মধ্যে কলাপাতা ভাঁজ করে সে বসেছে।

আমি নিতান্ত মামুলিভাবেই প্রশ্ন করেছিলাম — মেয়েটাকে সাঁওতাল বলে মনে হচ্ছে।

কে যেন স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল — হ্যাঁ, শিববামের বৌ!

— মানে, যে শিববাম শহীদ হয়েছে?

— হ্যাঁ তারই বৌ।

আমি হাতে ভাতের দলা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তারপর সেই ভাত আমাকে গিলতেও হল।

ভিক্ষু, ভূমি হয়ত জানো না, চিরির বন্দরে সেদিন শিবরাম আর সমীকন্দীন মারা যায়। সেই শহীদদের হত্যার প্রতিবাদেই আমাদের চিরির বন্দরে আগমন।

অথচ একজন শহীদের বৌ আজ সব থেকে নিকৃষ্ট জায়গায় কুকুব-বিড়ালের মতো খেতে বসেছে কলাপাতা বিছিয়ে। আর সেটা ঘটেছে সকলের চোখের সামনে এবং কাবোবই তাতে কিছু মনে হচ্ছে না। এব নামই বোধহয় একান্তবোধ?

অথচ মজা এই যে শিবরাম এবং সমীকন্দীন মরেছে, তাদের এই আন্দোলনে নিজেদের কোন লাভই ছিল না। তারা ক্ষেতমজুর। তবু তাবাই প্রাণ দিল। আব এ-নিষে অনেক গবেষণাও শোনা গেছে — ক্ষেতমজুরেবা কেন এত ক্ষেপল। . কিন্তু সব সত্ত্বেও তলাব মানুষ তো ওপরে উঠতে পারল না? তাব উত্থান কে চায়? আমবা যে সম্পন্ন কৃষকেব বাড়িতে খেতে বসেছি তাদের কাছে শিববামের বৌ তো দুঃখী-কাঙাল বই কিছু নয়। কিন্তু অনোবা তা সহ্য কবলে কি করে? অদ্ভুত আজকের দিনটা ঐ শহীদেব বৌকে কি ঘবেব দাওয়ায এনে বসানো যেত না?

— না, যেত না, সে তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

এবপর সমীকন্দীনের বাড়িতে যাওয়াব ইচ্ছা আমার লোপ পেয়েছিল। তবু যেতে হল। সেখানে শিববামের বৌয়ের দ্বিতীয় সংস্কারে জানামুখে উঠানে বসে আছে। শুধু তফাৎ এই, তার চাবপাশে চাব পাঁচটি ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। খোলা উঠানে চুলায় একটা হাঁড়িতে কি যেন ফুটছে। ওপাশে একটা দাওয়ায় একটা টেঁকি শোভা পাচ্ছে। তার ওপরেব খড়ের চালা অনেক আগেই লুপ্ত হয়েছে। বৃষ্টির জলে দাওয়াটাও ক্ষয়ে গেছে। আব একখানি মাত্র ঘর। তাব অর্ধেকটা ভেঙ্গে পড়েছে। — এই হল আব এক শহীদেব ডেবা। সমীকন্দীনেব বৌ লোক দেখে মাথায় কাপড় দিতে গিয়েছিল, কিন্তু অতদূর ওঠানোব মতো কাপড় কোথায়? যা আছে তার ছিন্ন অংশেব ফাঁকে দেহ অসংবৃত। কাজেই সে এব আমবা আড়ষ্ট হয়ে বইলাম। তারপর ফিবে এলাম।

কৃষকের সঙ্গে একান্তবোধ? অত সোজা নয়।

তারপর কত জায়গায় গেলাম, কত কি দেখলাম, কত কি ঘটল, সে সব থাক। আমি শুধু একটা ঘটনা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কারণ আমি তার মধ্যে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা সত্ত্বেও সেখানকার কেউ আমার মনের গভীরে কেন স্থান পায়নি?

ডিমলার নাম শুনেছ? একবার এলাকাটা নাকি অসহযোগ আন্দোলনকালে ছ মাসের জন্য স্বাধীন হয়েছিল। মনে করো না সেটার পিছনে খুব বেশী বীরত্ব ছিল। জায়গাটা এত সভা জগতের বাইবে, এবং বর্ষাকালটাও এমন ডুবে থাকে যে ইংরেজবা ওর স্বাধীনতাকে গ্রাহ্যই করেনি। রাস্তাঘাট শুকিয়ে খটখটে হলে তারা ওখানে একজন দারোগা পাঠিয়েছিল, কেউ বাধা দেখনি।

শুনে আমাব ভারি হাসি পেয়েছিল। বক্তা রাগ করে বললেন — এতে হাসির কিছু নেই। আর এবার তো বাবুদের আন্দোলন নয়, এবার চাষা ক্ষেপেছে, কাজেই অবস্থা সঙ্গীন হতে পারে।

জায়গাটায় পৌঁছে দেখলাম; কই তেমন তো কিছু নয়। শুধু কনকনে শীতে ঘুমুনো দায়। যেখানে আস্তানা পড়েছে, সেখানে দুজন নেতাব সাক্ষাৎ পেলাম। মাচার ওপব আমবা তিনজন, তার নীচে কটি ছাগল।

ধান কাটা শেষ হয়েছে, কৃষকেবা নিজের খামারেই সব তুলেছে, এখন জোতদারেরা পুলিশ এনে তা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কাল হাটবাব, পরশু মিটিং ডাকা হয়েছে। কাজেই আপাতত আগামী কাল ছুটি।

সকালবেলা তামাকেব ক্ষেতে জল দেওয়া দেখছি, এমন সময় পাশের গ্রামের এক সম্পন্ন কৃষকের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা এসে বলল — বিকালে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন।

ঘটনাটা এতই নাটকীয় এবং আনন্দদায়ক যে তামাকে তা বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। তুমি কি করে বুঝবে এক সপ্তাহ কারো পেটে চা না পড়লে বিশ্ব কেমন অন্ধকার দেখায়? কদিন আগে দীনেশ লাহিড়ী নামে এক কৃষক নেতাকে গাটা করেছিলাম, কারণ তিনি আমাদের ফেলে দশ মাইল পায়ে হেঁটে কই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য, ফিরতেও তাঁকে দশ মাইল হাঁটতে হয়েছিল। লাহিড়ীমশাই জমিদার বংশের ছেলে, বঙ্কাল জেল খেটে প্রৌঢ় বয়সে কৃষক-আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তরবঙ্গের কৃষকদেব ভাষা তাঁর মতো কেউ আয়ত্ত করেনি, অস্ত্রত তাঁর মতো কাউকে জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে খাঁটি কৃষকসুলভ গালাগালি ভাষা প্রয়োগ করতে শুনিনি।

তাঁর পায়ে জুতো নেই, গায়ে একটা গবম জামা নেই, রুগ্ন শীর্ণ শরীর। কোমবে ব্যথা, আব গত দেডমাস তেভাগা সুক হওয়ার পব কৃষকদেব বাড়িতে জলের মতো ডাল আর পাটশাকের বেশী আহাৰ্য জোটেনি। কিন্তু ডিনলায় এসে আমবা যে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলাম। কই মাছের ঝোলের চেয়ে চা আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় মনে হল।

ষাঁর বাড়িতে আমবা হাজির হলাম তিনি একজন সম্পন্ন কৃষক, কিন্তু ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে জোতদারের চেয়ে কম নন। গোয়াল-ভবা গরু, খামার-ভবা ধান, বিবাট বিরাট আটচালা ঘর। এরকম পরিবার কৃষক সমিতির সঙ্গে আছে দেখে আনন্দ হল। এবং তা আরো বেড়ে গেল, যখন শুনলাম, আমাদের জন্যে খাঁটি গাওয়া ঘি দিয়ে চিড়ে ভাজা হচ্ছে।

এমন সময় দেখা গেল মাঠের মধ্য দিয়ে একটা লোক প্রাণপণ বেগে ছুটে আসছে।

— গুলি চলেছে।

— কোথায়?

— উই, হোথায়!

— কেউ মরেছে?

তা সে বলতে পারে না। খবর শুনেই সে ছুটেছে। রইল আমাদের চা আব চিড়ে ভাজা। তার পিছন পিছন ছুটছি আমরা তিনজন। তখন লাল হয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ধান-কাটা মাঠে নাম-না-জানা একরকম ছোট ছোট লাল ফুল দুপায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছি। আশ্চর্যের ব্যাপার,

কতবার ভেবেছি এই ফুলের নাম কাউকে জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রশ্ন করতে সাহস পাইনি। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পৌছাতে পৌছাতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। দেখা গেল, গুলির যথার্থ ফলাফল কেউই জানে না। যতই এগুচ্ছি, ততই লোকের মধ্যে বেশী আতঙ্কের ভাব দেখছি। কেউ বলছে, দশজন মরেছে — কেউ বিশ, কেউ পঞ্চাশ, কেউ বলছে একশ, বন্দুকধারী পুলিশ, কেউ তার সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে পাঁচশ।

আমার সঙ্গী নেতাদ্বয়ের যিনি সিনিয়ার, তিনি তাঁর টর্চলাইটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন — আপনি রিপোর্টার মানুষ, আপনি গিয়ে দেখুন।

আমি তাঁর এই ব্যবহারে বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম। পরক্ষণেই মনে হল, আচরণটা হয়ত কাবণ-সম্মত। কেননা পুলিশ তাঁদের দেখলে গ্রেপ্তার করতে পারে। তবুও এই বিদেশি বিটুইয়ের সব কিছুই আমার অজানা অচেনা। আমি এখানে কি বলব, কি কবব?

ছায়ার মতো দুজন কৃষক আমার অনুগামী হল। তাদের না পেলে আমি যে কি করতাম জানিনে।

ঘটনাস্থলে গিয়েও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারলাম না। নির্জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে খড়ের আগুন জ্বলছে, আর তার পাশে কয়েকজন আহত কৃষক মাটিতে পড়ে আছে। হঠাৎ মনে হল যেন এক প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসে পড়েছি এবং যেখানে কোনো বন্যপশুর ভয়ে মানুষ আগুন জ্বেলে নিজেকে রক্ষা করছে।

আসলে মৃতের সংখ্যা এক, গুরুতর আহতের সংখ্যাও এক। কিন্তু গুলিবিদ্ধ লোকের সংখ্যা বহু। তার কাবণ পুলিশ বুলেট ব্যবহাব করেনি, পাখি-মাঝা কার্তুজ দিয়ে মানুষ মেরেছে। মানুষও তাই হররাবিদ্ধ হয়ে পাখির মতো দূর দূবাস্তরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তাদের কতকগুলি পড়ে আছে এই মাঠে, আর কতকগুলি গ্রামে ঢুকতে পেরেছে।

মাঝা যে গেছে তার নাম তৎনারায়ণ। তার ঘবেব মধ্যে ঢুকে ডোল থেকে জোতদাবরা ধান ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। তখন তার চিংকারে রাস্তা থেকে বহু হাটুরে লোক সেখানে ছুটে যায়।

আমি গিয়ে দেখলাম তৎনারায়ণের মৃতদেহের অর্ধেকটা মাচার ওপর, বাকী অর্ধেক শূন্যে ঝুলছে। মাথার খুলি ফেটে গেছে। পাশের বারান্দা থেকে মাঝে মাঝে কাদের ক্লাস্ত কান্নার স্বর ভেসে আসছে।

পুলিস উঠোনে আর একটা লোককে এনে শুইয়ে রেখেছে, তার বাঁ চোখের মধ্য দিয়ে গুলি পাশ কেটে বেরিয়ে গেছে, তবু লোকটা মরেনি। লোকটির নাম গুল মহম্মদ। তাকে হাসপাতালে পাঠালে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে। কিন্তু হাসপাতাল এখান থেকে কতদূরে?

পুলিস বলল, সকালের আগে গরুর গাড়ি যোগাড় করা যাবে না।

রাত্রে আপাতত কিছু করণীয় নেই। পাশের গ্রামে আস্তানায় ফিরে গেলাম। রাত তখন দুটো। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে বরফ। একসলা ভাত খেয়ে নেতাদ্বয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত ভোর হয়ে গেল। কি করতে হবে? সেই মামুলি মিটিং ডাকার কথা, গ্রামে গ্রামে খবর পাঠানোর কথা, লোকের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু আপাতত আমাকে গিয়ে দেখতে হবে যাতে পুলিশ গ্রামের লোকের এজাহার ঠিক ঠিক লিখে নেয়।

গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই চম্‌চুহির। লোককে খবর পাঠাতে হয়নি, তারা নিজেরাই কাতারে কাতারে আসছে। নেতাদ্বয়ের কিছু হিসেবের ভুল হয়েছে। কিন্তু এদের হাতেই বা ওগুলো কি বস্তু? খুব কম লোকের হাতেই লাঠি, বেশীর ভাগের হাতে সড়কী, বদ্বম, খাঁড়া,

রামদা, মেয়েদের হাতে বাঁটি খোঁজা। কারো কারো হাতে লাঙলের ফাল, কোদাল এবং কুড়ুল। আটটা নটার মধ্যে সমস্ত মাঠ ছেঁয়ে গেছে। মাথা গুঁতলি করলে হাজার দশেকের বেশী হবে না, তবে চর্মচক্ষে জনসমুদ্র বলেই বোধ হচ্ছিল।

মাত্র চারজন বন্দুকধারী পুলিশ, আর একজন দারোগা। তাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

দারোগাবাবু বললেন, আমি নিজে গরুর গাড়ি করে এক্ষুণি গুলমহম্মদকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে দেখবেন untoward কিছু না ঘটে।

— তাহলে আপনার বন্দুকধারীদের একটু পিছিয়ে রাখুন।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

কাল যে দুজন কৃষক ছায়ার মতো আমার সঙ্গে এসেছিল তারা জিজ্ঞাসা করল — লোকেরা কি করবে?

— আমি তার কি জানি?

— ওরা আপনার স্কুম চাইছে?

— আমার!

— হ্যাঁ আপনার।

মুহূর্তকাল ভেবে যে সত্য আবিষ্কার করলাম, তা আমার পক্ষে আদৌ সুখদায়ক ঠেকল না। এখানকার নেতৃত্ব আত্মগোপন কবাব ফলে প্রচার হয়ে গেছে আমিই তাঁদের প্রতিনিধি। ফলে এই দশ হাজার ক্রুদ্ধ বর্শা-বল্লমধারী লোক আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

আমি ছায়াসঙ্গীদের প্রশ্ন করলাম, — ওবা কি চায়?

উত্তর এল, ঐ যে সামনে জোতদারদের গ্রাম, ওটাকে আক্রমণ কবতে চায়?

— তারপর?

— ওরা সব জোতদারদের মাথা কেটে আনবে।

— আর?

— ওদের মেয়েদের পুড়িয়ে মাববে।

— কি করে?

— সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে।

— আর এ সব যদি আমি না কবতে বলি?

ছায়াসঙ্গীরা নিশ্চুপ। একজন বলল, তাহলে কি হয় বলা যায় না। তাহলে হয়ত এই পুলিশদের ওরা ছেড়ে দেবে না।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এত লোকের হাতে ধাবালো অস্ত্র-শস্ত্র আমি কখনো দেখিনি। আর এতে আমার মনে পুলক সঞ্চার হচ্ছিল না। শুধু বোধহয় মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাকে ধরে এনে আমার ঘাড়ের একশ মণ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। আমি কি করি এখন? কি করে এদের থামাব? অথচ আমার মুখের একটা কথায় আজ এরা শ্রলয় কাণ্ড ঘটাতে পারে। এতবড় শক্তি এবং সম্মান যে আমার ভাগে হুটতে পারে, তা ভাবতে পাবিনি। আমি যেন হঠাৎ সম্রাট হয়ে গেছি। একবার যদি চোঁচিয়ে বলি, তাহলেই ঐ যে সম্মুখে সবুজ ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম, সেখানে জ্বলে উঠবে দাউ দাউ করে আগুন। মুর্খুতের মধ্যে ফুংকারে উড়ে যাবে মানুষের কাঁচা মাথাগুলো। অথচ এত বড় যে শাহানশাহ সম্রাট, সে কেন দৃশ্টিস্তাব ভারে এমন নুখে পড়েছে!

ছায়াসঙ্গীদের একজনকে পাঠালাম নেতৃত্বের কাছে নির্দেশের জন্য। সে লোকটা আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে বলল, উপস্থিত যা ভালো বুঝি, তাই যেন করি।

আমি একথা গোপন করতে চাই নে, যে আমার ভারি রাগ হল এঁদের দায়িত্বজ্ঞান দেখে। আর যতই রাগ বাড়তে লাগল ততই আমার মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গেল। আমি যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। এটা বুঝতে পারছি, ঐ খুনখারাপির দায়িত্ব হঠাৎ আমি নিজের স্বক্ষে নিতে পারব না। কিন্তু এদের থামাব কি করে? আওয়াজ মাঝেমাঝেই সমুদ্র গর্জনের মতো উঠছে, আর সেই সঙ্গে এদের মধ্যে থেকেই বেরোয়া বক্তারও অভাব ঘুচে যাচ্ছে। কেউ কেউ উত্তেজিত লোকদের আরও উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু উত্তেজনার চেয়ে পেটের ক্ষিদে যে বড়, সেটা আমার মাথায় ছিল। সুতরাং কৌশল হবে কালক্ষয় করা। এইভাবে বারোটা-একটা নাগাদ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই সামলে দেওয়া যাবে। অতএব —

অতএব আমি বক্তৃতা করতে লাগলাম। কে একজন একটা চোঙ আমার হাতে দিল। তাতে মুখ লাগিয়ে যে সব আপাত সত্য কথা বললাম, তাব যে ষোল-আনাই মিথ্যে, তা আমি হলফ করে বলতে পারি। এই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, সুবিধাবাদী নেতারা কিভাবে অনর্গল বানানো মিথ্যা পরম সত্যের মতো জোব দিয়ে বলে যেতে পারে এবং কিভাবে তাবা ‘ম্যানেজ’ করে। শ্রানি এবং ধিক্কারে আমার মন ভবে গেল। ভিখু, তুমি যদি সেখানে থাকতে, দেখতে পেতে মানুষের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা প্রহসনে পবিণত হওয়া কত মর্মান্তিক!

যা ভেবেছিলাম তাই। দুপুরবেলা তিনভাগ লোক চলে গেল। বাকী যাবা রয়ে গেল তাবা অধিকাংশ আশপাশের গ্রামের লোক। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু এমন সময়ে মূর্তিমান আব এক দুর্ভোগ এসে দেখা দিল।

উত্তরবঙ্গের এক বিখ্যাত ব্যক্তি এসে হাজির। তাঁর নামধাম কবতে চাইনে, — কারণ যে কাণ্ড তিনি করেছেন তা যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে অতি লজ্জাকর। কলকাতায় লোকটিকে দেখেছি, অল্পবিস্তর পরিচয়ও ছিল, খাঁটি লীগের লোক। এখানে এসেই শুনেছিলাম লোকটি সপ্তাহ দুই আগে এই এলাকায় প্রচণ্ড এক দাঙ্গা বাধাবার উপক্রম করেছিলেন। হিন্দু মুসলিম কৃষক সম্পূর্ণ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন দুই ব্রহ্ম জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন আজকের আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব। তারপর তেভাগা শুরু হতেই কৃষকদের মধ্যকার ফাটল যখন জোড়া লেগে গেল, তখন উন্টোদিকে হিন্দু মুসলমান জোতদাবরাও মিশে গেল ঝাঁকের পাখির মতো। আজ যিনি এসে উপস্থিত তাঁকেও জোতদাববাই পাঠিয়েছে কৃষকদের ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু অগ্নিতে ঘৃতাশ্রুতির মতো কৃষকদের স্তিমিত ক্রোধ তাঁকে দেখে আবাব বেড়ে উঠল। আর কৃষকরা এতক্ষণ পর একটা কিছু নাগালের মধ্যে পেয়েছে। সর্ব্বাই তাঁকে ঘিবে ধরল। কি করে তিনি গুলির খবর পেলেন? তিনি তো থাকেন দূরে শহরে। তাহলে গুলি চালানোর আগেই জোতদারেরা নিশ্চয় তাঁকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল। লীগনেতা কৃষকদের এতগুলো প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। আর তাঁব পিঠের উপর কৃষকরা তখন সড়কি আর বল্লম উঁচিয়ে ধরেছে।

— দিই ব্যাটাকে শেষ করে। আপনি শ্রুকুম দেন।

আমি জবাব দিলাম — এই যদি তোমরা কর, আমি এক্ষুনি চলে যাব।

হঠাৎ সেই লীগনেতা কৈদে ফেললেন, আর সেইসঙ্গে মাটিতে বসে পড়ে আমার হাঁটু জড়িয়ে ধরলেন — আপনি বাঁচান আমাকে।

আমি কি স্বপ্ন দেখেছি। এর নামই কি শ্রেণী সংগ্রাম? কিন্তু আমি যে কাণ্ড করলাম তা নিতান্তই মোলায়েম। আমি তাঁকে হাত ধরে তুলে ধরে বললাম, — আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।

তিনি তক্ষুনি সানন্দে জোতদারদের গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর অপস্রয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে আমার মনে হল, কেন কঠিন হতে পারলাম না। এদের মতো লোকেরাই তো দুর্ভিক্ষে মানুষ মেরেছে, আর এখন লোক একটা আন্দোলনের পথে এগুতে চাইছে বলে তাদের গুলি চালিয়ে মারছে। লোকটা যেদিকেই তাকাচ্ছে সেদিকেই তো মৃত্যু। তবু ও লোকটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া কেন? আর আমি ছেড়ে দিতে চেয়েছি বলেই যে কৃষকরাও ছেড়ে দিয়েছে তাও তো ঠিক নয়। এত যে রাগ, তবু তারা মানুষের গায়ে সহসা হাত দিতে চায় না। আজ যে জোতদারদের গ্রাম জ্বলেনি, মানুষ মরেনি, তাতে তো তাদের একটুও নিরানন্দ দেখছি না, বরং তারা শেষ পর্যন্ত কি ব্যাপারটা এড়াতে পেরে খুশীই হয়নি? হিংস্রতা তো তাদের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। মাটির বুকে সন্তানের মতোই যত্নে তাবা ফসল ফলায়। তবু আমি জানি ক'দিনের মধ্যেই আসবে আরো বন্দুক, আরো পুলিশ, জোতদারদের আরো গুণ্ডার দল। কিন্তু তার চেয়েও যে আরো কিছু ভয়ঙ্কর ঘটতে পারে, তখন তা কি ভেবেছিলাম?

বাংলাদেশে কৃষকদের জয় না হলে জাতি দুই টুকরো হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ দাঙ্গার কলকাতা থেকে বেরিয়ে তো স্পষ্টই দেখলাম, ভাঙ্গা কি করে সহজে জোড়া লাগে। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, বাংলাদেশেব সাহিত্যিক নাট্যকার খাঁরা এত করে সাম্প্রদায়িক মিলন চেয়ে এসেছেন, তাঁরা হয়ত আসল জায়গায় হাত দিতে পারেননি। কিন্তু আজ আব তা নিয়ে আক্ষেপ নেই। কারণ কৃষকের জয় নামক বস্তুটার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছু জড়িত। সেদিন নিকট দূরের বহু শক্তি তাকে পিষে মারার জন্য তৈরি ছিল। তবু এর আর একটা দিকও ভাবতে ইচ্ছে করে। সময়টা ভারতের স্বাধীনতার লাভের আগের বছর। কিন্তু স্বাধীনতার ছায়াটুকু যে কতদূরে তা কেউ জানত না। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটা অনির্দেশ উত্তেজনার ঢেউ বইছে। অস্তিত্ব কল্পনা করতে দোষ নেই যে, সেদিন ষাট লক্ষ কৃষক অন্যান্য বহু লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিলে দূত্পণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে বাংলা দেশের অন্য চেহারা হত — এসব এখন ভেবে লাভ কি? তখন সব ভাবনাই ছিল অস্পষ্ট। শুধু তখন মাঠে মাঠে ঘুরতে ঘুরতে মনে হয়েছে, এসব কথা বড় বড় শহরের বড় বড় মাথাওয়ালা নেতাবা কি আর ভাবছেন না। তাঁদের উপরই ভার দিয়ে বসেছিলাম।

সরল বিশ্বাসের এই এক দোষ। কিন্তু ভিখু, তুমি কি এইসব বকুনির বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছ? পারলে সরল বিশ্বাস নামক দ্রব্যটা ত্যাগ করো। ওতে শুধু ভগবানই মেলে, আর কিছু না। তোমার আজ বয়স হয়েছে, ঘাড়ের উপরের মাথাটা দিয়ে কি কিছু ভাববে না?

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ডিমলা ত্যাগ করলাম। পথে কয়েকজন কৃষকের বাড়িতে বসতে হল। তাদের আমি চিনি না, কিন্তু তারা আমাকে একদিনের মধ্যেই চিনেছে। তাদের মুখ আমার আজ মনে নেই, কিন্তু সেদিন বিদায় নেওয়ার সময় তাদের প্রত্যেকের চোখেই জল দেখেছিলাম। এমন কি সুকৃতি আমি করেছি, যাতে এতটা আশা করতে পারি? কিন্তু মানুষ মানুষের বন্ধু হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আমার চোখের জল আসেনি; এরা আমাকে দেখলেও এদের তো আমি ব্যক্তি হিসাবে দেখিনি। এরা সারাদিন আমার চোখে সমষ্টির মধ্যেই মিশে ছিল। আমার বরং এদের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, কারণ জানি — দুদিন পরেই এদের উপর আসবে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণ। ভিখু, এরপর আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। বেশ কয়েকদিন নিশ্চিন্ত কাটানো গেল। একদিন সকালে চা খেতে খেতে কাগজের প্রথম পাতায় চোখ পড়তেই দেখি খাঁপুরে পুলিশের গুলিতে আঠারো জন নিহত। আর অনেকে আহত হয়েছে।

কলকাতা থেকে ডাক্তারসহ কয়েক ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হল। তাঁরা দুদিন পরে ফিরে এলেন। পুলিশ তাঁদের ঐ এলাকায় ঢুকতে দেয়নি।

তখন আমার কাছে প্রস্তাব এল, আমি ঐ এলাকায় অন্য কোনো পথে ঢুকতে পারি কিনা। আমি সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। আমার কাছে ছবিটা স্পষ্ট ছিল। বালুরঘাট স্টেশনে নেমে খাঁপুর যেতে হয় — মাত্র কয়েক মাইলের পথ। এই পথটাই পুলিশ অটিকে রেখেছে। কিন্তু বালুরঘাট ছাড়িয়ে ফুলবাড়ি স্টেশনে যদি নামা যায় তাহলে মাইল দশেক হেঁটে হয়তো পিছন দিক দিয়ে খাঁপুরে ঢোকা যেতে পারে। এতেও পুলিশের হাতে পড়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এছাড়া অন্য পথ নেই। তবু ভাগ্যিস আমি রাজী হয়েছিলাম, নইলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।

আমি আবার সেই স্টেশনে নামলাম যার কাছে একদিন দার্জিলিং মেল থেমেছিল। আমি আবার সেই মাঠ দিয়ে হাঁটলাম যেখানে একদিন নিশান উড়িয়ে ধান কাটা হয়েছিল। আমি আবার সেই গ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলাম যেখানে এক সময় দিব্যরাত্র উৎসবের বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু এবার কেমন যেন সব নিঃস্বুম। দুই একটা আধা পরিচিত মুখ চোখে পড়ল, তাবা পাশ কাটিয়ে গেল। কঁাচর কঁাচব করে ছইওয়ালা একটা গরুর গাড়ি আসছে। কাছে এসে থামতেই দেখলাম বসে আছেন কালী সরকার। তাঁর মুখচোখ শুকনো। আমাকে দেখে বললেন — আপনি! ও বুঝেছি।

কালী সরকারের স্বশুরবাড়ি খাঁপুরে। গুলি চলার সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাপের বাড়ি। তারপর তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন কিছু দূরের একটা গ্রামে। এখন সেখান থেকেই স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসছেন আমাদের কালী সরকার। তাঁর কথা শুনে মনে হল না খাঁপুরে ঢোকা যাবে।

মাইল সাতেক হেঁটে সন্ধ্যার মুখে যে গ্রামে আশ্রয় পেলাম, সেখানে খাঁপুরের আরো কয়েকজনকে দেখলাম। তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে স্থান পেয়েছে। পরিচয় হল শ্রীচন্দ্র নীলকণ্ঠ বর্মনের সঙ্গে। ভিখু, তুমি তাকে নিশ্চয়ই চেন। ঐর স্ত্রী যশোদা বর্মন খাঁপুরে মারা গেছেন। পরদিন সকালবেলা এই শোকাচ্ছন্ন শ্রীচন্দ্র মানুষটি আমাকে খানিক দূরে এগিয়ে দিলেন। তারপর আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখালেন, ঐ যে গ্রাম দেখছেন, ওর পাশে আড়াআড়ি যে মাঠটা, সেটা পেরুলেই খাঁপুর। আমার আর এগুতে সাহস হচ্ছে না, আমি যাই।

নীলকণ্ঠ বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন। তাঁকে কে যেন একজোড়া নতুন চটিজুতো কিনে দিয়েছে। সেটা পায়ে দিয়ে মাথা নীচু করে নীলকণ্ঠ ফিরে যাচ্ছেন, আর আমি একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। নীলকণ্ঠ সহজে এলাকা ছাড়েননি। গুলি চলার পরেও কয়েকদিন আশেপাশেই ছিলেন, আর প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে তাঁকে শীত অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে এসে সটান শুয়ে পড়তে হত। কারণ পুলিশ হানা দেয় শেষ রাত্রেই।

আমি চলেছি একা। আশেপাশে অনবরত দৃষ্টি ফেলেছি। আশ্চর্য, চোখে একটা লোক পড়ল না। মাঠ জনশূন্য, কেউ কোথাও কোনো কাজে আসেনি।

ফ্রোশ খানেক এগিয়ে যে গ্রামে ঢুকলাম, সেখানেও সব নিস্তব্ধ। একটা সম্পন্ন কৃষকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যখন ডাক দিতে যাব — কেউ আছেন? এমন সময় তুমি কোথেকে এসে আমাকে দেখে বললে, আপনি কে? — তোমার কাছ থেকেই শুনলাম ঐ গ্রামেরও পুরুষ মানুষ সব পালিয়েছে।

এইখানে বলে রাখি, এতকাল পরে তোমাদের রাজবংশী কৃষকের ডাঘা বেমানুম ভুলে গেছি। যাই হোক আমার সব কথা শুনে তুমি বললে, খাঁপুরে যদি ঢুকতে চান, এই তার সময়।

- বলো কি? এই দিন দুপুরে? খোলা মাঠ দিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে না?
- আমি তো দুপুরবেলাতেই গিয়েছিলাম সেদিন। এই সময়টা কেউ সন্দেহ করে না।
- কেন বলো তো?
- এই সময় কেউ আসতে পারে, পুলিশ ভাবতেই পারে না।
- কিন্তু পাহারা তো দেয়?
- না, কোন পাহারা থাকে না। সবাই তেল মেখে পুকুরে স্নান করতে যায়।
- তুমি ঠিক জানো?
- হ্যাঁ।
- তুমি আমার সঙ্গে যাবে?
- হ্যাঁ।
- তোমার ভয় করবে না?
- আমার ভয় কিছু করে না, তবু মা শুধু বকে।
- তাহলে তোমায় যেতে হবে না। আমি একাই যাব।
- না, আপনি সব চিনতে পারবেন না। ওরা টের পেয়ে যাবে। আমি হেসে বললাম
- পেলোই বা।
- ওরা ধরতে পারলে খুব মারে।
- আমাকে মারবে না।

তুমি তবু আস্তে আস্তে বললে — আমি যাব আপনার সঙ্গে, আপনি কতদূর থেকে আসছেন।
তুমি আমার হাত ধরে টানতে লাগলে, চলুন নইলে মা টের পাবে, আমাকে যেতে দেবে না।

আমি তোমার সঙ্গে মাঠে নামলাম। হাঁটছি আর মনে হচ্ছে আমরা দুজনে যেন চক্রান্তকাবী। আমরা পুলিশকে জানান দিয়ে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি লুকিয়ে। এক নিষিদ্ধ স্থানে ঢুকতে যাচ্ছি, পিছনের দরজা দিয়ে।

এই সর্বপ্রথম আমার মনে হল, আমি যেন কৃষকদেরই একজন। আগে আমি আন্দোলন দেখেছি একজন দর্শক হিসাবে। তাদের প্রতি আমার অগাধ সহানুভূতি আছে, কিন্তু আমি আব তারা আলাদা। এমন কি ডিমলায় যখন হাজার হাজার কৃষক আমার ওপব অমন করে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তখনও কে যেন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আমি স্বৈচ্ছায় লুকিয়ে লুকিয়ে এক অবরুদ্ধ গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছি।

আমি এখন বুঝতে পারছি, কেন সব ছাড়িয়ে তোমার স্মৃতি আমার কাছে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের এই খাঁপুর যাত্রার সময় সব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এখন আর সেই সভা-শোভাযাত্রা নেই। লাল নিশানের ক্ষীণতম ইশারাও লুপ্ত। চারিদিকে সব চাঞ্চল্য থেমে গেছে। সব আওয়াজ বন্ধ হয়েছে। শুধু একটা বীভৎস ভয় বিরাজ করছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। হাজার হাজার মানুষের উৎসাহ আর উত্তেজনার মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন শস্যশূন্য মাঠ, ভাষাশূন্য গ্রাম। যেন এক বিরাট রঙ্গমঞ্চে আলো নিভে গেছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদায় নিয়েছে, পিছনের সাজ-ঘরও নীরব, দর্শকের আসনগুলিও ফাঁকা।

এই অবস্থায় একজন নির্ভীক বালক এবং একজন তরুণ সাংবাদিক মুক্খোমুখি হয়ে পরস্পরকে দেখছিল। পিছনে মৃত্যু, সামনে নিষ্পেষণের যন্ত্র, আর মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য। তখন আচমকা মনে পড়ে গেল, তেভাগা আন্দোলনের প্রথম দিকে একজন আমার কোলে করে শীতল জলের ছোঁয়া থেকে আমার পদযুগলকে রক্ষা করেছিল, আর আজ খাঁপুরে এগিয়ে দেওয়ার জন্য একজন বয়স্কলোক খুঁজে পাওয়া গেল না।

মাঠের ওপার থেকে গান ভেসে এল! তুমি আমার বিষয় লক্ষ্য করে বললে, পুলিশেরা রেকর্ড বাজাচ্ছে।

মাইল দুই দূরে লাউড স্পীকারের ধ্বনিতরঙ্গ এমনভাবে এসে কানে ধাক্কা দিতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। আমি প্রশ্ন করলাম, ওরা কি রোজই বাজায়?

— হ্যাঁ, প্রায় সব সময়। খাসি মেরে মেরে খায়, আর রেকর্ড বাজায়, আর তাস খেলে।

— খাসি পায় কোথায়?

— সব গ্রাম থেকে ধরে ধরে নিয়ে যায়। আর জেলে এনে পুকুর থেকে সব মাছ ধরে।

গ্রামের কাছে এসে দেখি এপাশটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরেছে। বহু কষ্টে সেটা পার হয়ে তুমি আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম।

ফাঙ্কুন মাসের মাঝামাঝি। বেশ গরম বাতাস দিচ্ছে। গ্রামের মধ্যে টু শব্দ শোনা যায় না, কেবল ঝরা পাতা মাঝে মাঝে এক একটা দমকা হাওয়ায় সরসর করে মাটির উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাস থেমে গেলে সব নীরব। একটা মস্ত গোয়ালঘরের পাশে যেতেই পরিচিত একটা শব্দ কানে এল — গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কিন্তু জাবর কাটার এই ধরনের কোরাস কখনো আমি শুনিনি। কৌতূহলবশে গোয়ালঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গোটা কয়েক গরু চোখ বুজে মুখ নাড়ছিল, আমাদের পায়ের শব্দে নির্বোধের মতো চোখ মেলে চেয়ে রইল। আমি ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম, কারা এদের ঘাস জল দেয়?

— পুলিশ কটা রাখালকে ধরে এনেছে।

আমি বললাম, চল ভিতরে ঢুকি। বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। তকতকে ঝকঝকে নিকানো উঠান এবং ঘরগুলি। কোথাও একটু মালিন্য নেই। শুধু কিছু শুকনো ঝরা পাতা পড়ে আছে।

এইভাবে অনেকগুলি বাড়ির ভিতরে ঢোকা গেল, বেশির ভাগ বাড়িতেই লোকজন নেই। শুধু দু'একটা বাড়িতে বদ্ধ ঘরেব মধ্যে থেকে স্ত্রীকণ্ঠে ভয়ার্ত আওয়াজ শুনলাম — কে? কে?

তুমি আমার হাত টিপে দিলে, অর্থাৎ যেন শব্দ না করি। আমাব ভয় হচ্ছিল, হঠাৎ কোথেকে একটা কুকুব ডেকে উঠবে, কিন্তু সারা গ্রামে কেন একটা কুকুব দেখলাম না। অবশেষে তুমি আমাকে একটা বাড়ির উঠানে এনে দাঁড় করিয়ে চাটাইয়ের দরজা ঠেলে ভিতরে গেলে। খানিক পরে তোমার সঙ্গে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। বুঝলাম এই বুড়ির সঙ্গে তোমাব প্রায়ই সাক্ষাৎ হয়।

বুড়ি হাত নেড়ে আমাকে কাছে ডাকল। কাছে যেতেই ফিসফিস কবে বলল, তুমি কার ঘরের ছেলে বাবা! কেন এই রাফসপুরীতে এসেছ, পালাও শিগগির। নইলে এরা মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে আমার পা শিউরে উঠল। বাল্যকালের কোন রূপকথা শুনতে শুনতে যেন এইরকম এক বুড়ির কল্পনা করেছিলাম, আর তার মুখের ভাষাও যেন এইরকমই ছিল। আজ বাস্তবে তার নমুনা দেখে ভয়ে বিষ্ময়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হল রূপকথার গল্পকারেরাও বোধ হয় এমনি করে অবরুদ্ধ জনপদের অভিজ্ঞতাই কল্পনার রঙ চড়িয়ে প্রকাশ করেছিল। তাতে থাকত রাজকন্যা রাজকুমার তেপান্তরের মাঠ, জীবন কাটি মরণ কাটি। বুড়ি উঁচু দাওয়ার উপর বসে আমার গায়ে মাধ্যম হাত বুলিয়ে বলল, — আমাদের তুমি দেখতে এসেছ। আহা মায়ের বুকে ফিরে যাও বাবা, নইলে এরা তোমাকে খুন করবে বাবা।

বুড়ি ফিসফিস করে আরো কত কি বলতে লাগল আর মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে বলল — পালাও।

আমি বললাম, — এই ভিখু তো প্রায়ই আসে, তাকে বারণ কর না কেন?

— ও কিছুতেই শোনে না, একদিন ছোঁড়া মরবে।

তুমি আমাকে বললে, ওদের স্নান বোধ হয় হয়ে গেল, এবার জলদি চলুন।

আমি ভেবে পেলাম না এই গ্রাম থেকে আর কি খবর সংগ্রহ করার আছে। আরো কিছু শূন্য বাড়ি আর ঝরাপাতা দেখবো শুধু। এর জন্যই এত পথ আসা?

তবু একে বেকে পা টিপে টিপে গ্রাম পার হতে হল। আগের মতোই কাঁটাতারের বেড়া পার হলাম। হঠাৎ পিছনে একটা গুলির শব্দ। আমরা প্রাণপণে ছুটলাম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। খানিক পরে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম। কই কেউ তো তেড়ে আসছে না। গুলিটা আমাদের উদ্দেশ্যে ছোঁড়া হয়েছিল অথবা ঘৃণাজাতীয় পাখি মাঝেই তাব লক্ষ্য ছিল, তা আমি আজও জানিনে। যে গুলি কবেছে সে কি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, আব ওটা যদি কাঁকা আওয়াজ হয়ে থাকে, সে কি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য? মাঠের মাঝখানে এসে দুজনে থামলাম। তখন বিনা কারণেই বোধ হয় আমাদের চোখেমুখে দিগ্বিজয়ের আনন্দ ছিল। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, ব্যাটারের কাঁকি দেওয়া গেল।

আমি বললাম, — ভালোই। কিন্তু পিঠে গুলি লাগলে লোকে কি আমাদের বীর বলত?

তুমি সেকথায় কানই দিলে না। তুমি নাম ধরে ধরে কত লোক সম্পর্কে কত কথা বলতে লাগলে। কে কোন গ্রামে পালিয়ে আছে, কার পরিবারের কে মবেছে, প্রথম দিন কী হয়েছিল — এমনি অজস্র কথা। এক সময় তোমাদের গ্রামে এসে পড়লাম। তোমাকে বললাম, — এবার তুমি বাড়ি যাও, আমি চলি।

তুমি বললে, ঐ বাবলাগাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। তারপর সে গাছটা ছাড়িয়েও যখন তুমি আমার সঙ্গে আসতে থাকলে তখন আমি বললাম, — আর এসো না, এবার যাও।

হঠাৎ তুমি বললে, — আপনার তেঁটা পায়নি?

— পেয়েছে। সামনের গ্রামে গিয়ে জল খাব।

— না, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি দৌড়ে জল নিয়ে আসছি।

পাশেই একটা মরিচের ক্ষেত। চারপাশে উঁচু মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে কয়েকটি বাবলাগাছ যেন আমার জন্যই এতকাল অপেক্ষা করছিল। তাদের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। বসে বসে তোমার ক্ষুদ্র মূর্তিটি ক্ষুদ্রতর হতে হতে হঠাৎ আমার মনে হল এই রকম এক একটি বালকই কি প্রাচীন কবিদের কখনো ধ্রুব, কখনো নচিকেতা, কখনো বা প্রহ্লাদ চরিত্র সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে? হয়ত নিবাদপুত্র একলব্য এইরকম কোন গ্রাম থেকেই দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

একটু পরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার তেমন করে দৌড়ে আমার দিকে এলো, তোমার গা দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে।

তেঁটা পাওয়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা করেছিলে এবার বুঝলাম। মায়ের ভয়ে তোমাদের বাড়িতে ভাত খাওয়ানোর কথা বলতে পারনি। মুড়ি-মুড়কি আনা যাবে কিনা, তাড়াতাড়ি হয়ত তোমার সন্দেহ ছিল। এখন তুমি কৌচড়ভর্তি মুড়ি আর আখের গুড় এনেছ। হাতে পিতলের বকম্বকে মাজা বদনায় শীতল জল। খেতে খেতে এবার তোমাদের সংসার এবং গ্রামের অনেক খবর শোনা গেল। বিদায় নিতে গিয়ে বললাম, — আচ্ছা এবার যাই, কেমন?

তুমি বললে, — আবার আসবেন।

— আসব।

তোমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কারণ তুমি আমার কথা সরল অন্তঃকরণে বিশ্বাস করছিলে। আমি কিন্তু সে হাসিতে যোগ দিতে পারিনি। আমার মনে পড়ল, ইতিপূর্বে কত জায়গায় কতজনকে বলেছি, আবার দেখা হবে। কিন্তু তাদের কতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে? অথচ এমনি করেই সারা জীবন বলতে হয়। তোমাকেও বললাম। আর মনে মনে এও জানি, কোন দিন দেখা হলে এই তুমি তো সেই তুমি থাকবে না।

আমি কিছুদূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, তুমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ। আমি যতই হাঁটছি, ততই বুঝতে পারছি আমার পিঠের উপর তোমার দৃষ্টি আছড়ে পড়ছে। আমি আর তাকাতে সাহস করলাম না।

তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে। তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। কলকাতায় কত চায়ের দোকানে ‘বয়স্কপী’ কৃষক বালকদের মুখের দিকে তাকিয়ে কতবার তোমার কথা মনে পড়েছে। মাঝে মাঝে ওদের কারো মুখে হয়ত তোমাব মুখের আদল লক্ষ্য করে চমকে উঠেছি। হয়ত তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হলেও সেই পুরনো দিনের বালকটিকে দেখতে পাব না, কালের স্রোতে তোমাকে আঁজ যৌবনে উত্তীর্ণ করেছে। তবু তুমি এই সতেব বছর ধরেই আমাব চেতনায় বালকবেশে সেই মাঠের মধ্যেই একা দাঁড়িয়ে আছ।

তুমি যেন আমাদের এই বাংলা দেশেব কৃষক আন্দোলনের কৈশোর অবস্থার প্রতীক।

কতকাল ধরে কত ধার্মিক ভক্তকে বৃন্দাবনের এক বংশীধারী কিশোর মাতিয়ে রেখেছে। আমাব মতো যৌব নাস্তিককে না হয় মাতিয়ে রাখুক তোমার মতো এক রাজবংশী চাষার ছেলে।

তুমি বেঁচে আছ, কিন্তু তোমার যৌবনের দিনগুলি নিদাকণ রুদ্ধ ধূসর পথ পার হতে হতে এখন কোথায় এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তোমার বুকেব মধ্যকার সেই সাহস এখনো অক্ষয় আছে কিনা, এসব আমি কিছুই জানি না। শুধু জানি, যতদিন কৃষক তাব মুক্তি খুঁজে না পায়, ততদিন আমারও মুক্তি নেই, ততদিন বাব বার তোমাকে আমায খুঁজে ফিরতে হবে।

কানাকড়ি

সন্তোষকুমার ঘোষ

দরজায় বারকয়েক টোকা দিল মন্থথ, তবু খুলল না। নাম ধরে ডাকল সাবিত্রী।

ভেতর থেকে সাবধানগলা সাড়া এলো; কে।

আমি।

দরজা খুলে গেল। সাবিত্রী বলল, এত দেরি হ'ল তোমার। আমি তখন থেকে ভয়ে মরি। চূপচাপ তরুপোষে পা তুলে বসে আছি। জিনিস-পত্রব কিছু গোছগাছ হয়নি কিন্তু।

গেঞ্জিটা খুলতে খুলতে মন্থথ বললে, কী করি, দু'দুটো টিউশনি ছিল যে। একটু পাখা করবে ? খালি-গা, হাঁটু অবধি কাপড় তুলে মন্থথ পাঁচ মিনিট হাওয়া খেল কিন্তু সাবিত্রী তখন কিছু বলল না। বলল অনেক পরে, একেবারে শুতে এসে।

আজ দুপুরের কথাটা। বিকেলের দিকে গলির ঠিক মুখটাতে ট্যাক্সি ব হর্ণ বোজেছিল। মিনিটখানেক পবে একজোড়া মশমশ জুতো এসে থেমেছিল ওদের দোরগোড়ায়। তাবপব দরজায় টোকা। কাছে পিঠে কেউ নেই, নতুন বাসা, চেনা নেই, জানা নেই, ভয়ে কাঠশবীব সাবিত্রী, ছিটকিনি তো ছিলই, তার ওপর খিল তুলে দিবেছিল। ভাগিস সেই মুহূর্তে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল, ফিসফিস সুরে একজন বললে, ওদিকে নয়, ইদিকে। চোখেব মাথা খেয়েছ ?

মশমশ জুতো বললে, তাই নাকি, মাইবি ভুল হয়ে যায়। তুমি তৈরি ?

রেডি।

তা হলে ষ্টেডি — গো।

মশমশ জুতো মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে, পিছনে পিছনে খুটখুট। বোধ হয় হাই-হীল। একটু পরে গলির মুখ থেকে ট্যাক্সি ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ এলো।

মন্থথ শুনলো সব, বলল, নতুন জায়গা, তাই সব তাতেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু চেনাজানা হোক, তখন আর এত ভয় পাবেনা।

প্রথম থেকেই সাবিত্রীর পছন্দ হয়নি। না বাসা, না গলি। আলাদা বাসার জন্যে মন্থথকে পেড়াপিড়ি করেছিল কিন্তু সে কি এমন। বাপের বাড়ি বেহালায়, সেখানে তবু মাটির ছোঁয়া ছিল। নারকেল গাছের ছাতাধরা ছোট্ট একটু ছাত ছিল। কিন্তু আহিরীটোলার এই গলিতে আছে শুধু পীচ আর পাথর।

অবাড়ন্তরীর মেয়েদের বয়সের মতো, এ-বাড়িতে বেলা যেন বাড়ে না। সারারাত ভ্যাপসা গরমের পর একেবারে শেষ রাতে গলির গ্যাস-আলো ক্লাস্ত চোখ ঝোজে, সেই সঙ্গে মানুষও। কিন্তু ক' মিনিট। একটু পরেই সদর রাস্তায় সাড়া জাগে, গঙ্গাবাসীদের নিয়ে প্রথম ঢঙ ঢঙ ট্রাম বেরুলো। চৌবাচ্চায় ঝিরঝির শব্দ, জলের কলটা ষাটনশব্দ আলেকজান্ডার সূতার একগাছি দাঁতে চেপে আছে।

তারপর থেকে সব বাঁধা টাইমে। বাবুরা বাজারে বেরিয়েছেন, এখন তবে সাড়ে সাতটা। কুচো চিৎড়ি আর পুঁইশাকে থলে ভর্তি করে ফিরছেন : আটটা। কলতলায় মগ হাতে ঠেলাঠেলি, নাছুই পানি স্নান : সাড়ে আট। নমো নমো খাওয়া। নটা। রেকাব থেকে তুলে নেওয়া মিঠে এক খিলি পান, রাস্তাব দড়ি থেকে ধরানো আয়েসী একটা কাঁচি — সারাদিনের বরাদ্দ ছুটির মধ্যে একটি — সাড়ে নটা, দৌড় — দৌড় — দৌড়।

তারপর থেকেই গলিটা যেন বিমোতে শুরু করে। কোন সাড়া নেই, কচিৎ একটা কাকের কা-কা, কচিৎ সারাদুপুর রোদে টোটো-হয়রান ফিরিওয়াল এ-গলিতে খন্দের না হোক, ছায়া খোঁজে।

সাড়া জাগে শুধু একবার, সেই শেষবেলায়, গলির মোড়ে ট্যাক্সির হর্ণে। পাশের ঘরের দরজায় তিনটে টোকার ইশারা, মশমশ জুতোর পিছে পিছে মিলিয়ে যায় হাই-হীল।

আলাপ হতে হতে ছদিন কাটলো।

জানালায় আয়না রেখে সাবিত্রী কপালে বড়ো করে সিঁদুরের টিপ পরছিল, ছায়া দেখে ফিরে তাকাল। বলল, আসুন। আপনি তো ও-ঘবে থাকেন?

চৌকাটেব ওপর ইতস্তত দু'টি পা। সাবিত্রী দু'টি উঁচু গোড়ালি পলকে দেখে নিল।

জুতো পায়ে ঢুকবনা ভাই। বেরুচ্ছি। দু'দিন থেকেই দেখছি আপনারা নতুন এসেছেন। তা ফুরসুই পাই না যে এসে পরিচয় করব। দবজা সব সময়ে তো বন্ধই দেখি। আজ খোলা দেখে এলুম।

আসুন, আসুন না ভেতরে। সাবিত্রী আবাব বলল। জুতো খোলাব দবকাব নেই, উনি তো দু'বেলাই ঢুকছেন।

তন্তপোষে বসে মেয়েটি বলল, বাঃ দিবা তো গুছিয়ে নিয়েছেন। দু'জনের সংসার।

দু'জনেব না। সাবিত্রী কুণ্ঠিত হেসে বলল, তিনজন।

ওমা তাই তো। খুকিকে তো দেখতেই পাইনি। কেমন চূপচাপ ঘুমুচ্ছে। কার মতো হয়েছে. — বাপেব মতো?

কী জানি। সাহস পেয়ে সাবিত্রী বলল, আপনাবা ক'জন দিদি।

হেসে লুটিয়ে পড়ার ভঙ্গি করে মেয়েটি বলল, দিদি আবাব কী। মল্লিকা। আমাকে মল্লিকাদি বলে ডাকবেন। বয়সে তো আমি বড়ই হবো আপনাব চেয়ে মনে হচ্ছে।

মল্লিকাদি, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, আপনারা ক'জন — তিনজন না চাব?

একজন ভাই। মল্লিকা বলল, এক এবং অদ্বিতীয়। দু'জন হতে পারলাম কই যে তিনজন হবো।

ওমা, আপনার বিয়ে হয়নি? করেননি কেন।

করিনি কি আর সাধ করে। হ'ল না। মল্লিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল। কিন্তু আমি আর বেশীক্ষণ বসব না ভাই। বেরুতে হবে। শ্যামের বাঁশি বাজলো বলে।

শ্যামের বাঁশি? একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে সাবিত্রী বলল, ও, ট্যাক্সির কথা বলছেন। আপনি বুঝি খুব ট্যাক্সি চড়েন?

তা চড়ি, মল্লিকা বলল, আপনি চড়েন না।

আমি? বলতে গিয়ে চোখ দুটো যেন নিবে গেল সাবিত্রীর। আমি? আপনিও যেমন মল্লিকাদি। গরীবের ঘরের মেয়ে পড়েছি গরীবের হাতে — আমি ট্যাক্সি চড়েছি দু'বার। একবার বিয়ের সময়, আরেকবার এই এবারে, মিনু হতে হাসপাতাল যেতে। সাবিত্রী ইস্তিতে ওর মেয়েকে দেখিয়ে দিলে।

নিজের কথাটা বলেই সাবিত্রী কৌতূহল সামলাতে পারল না, বলল, আপনাকে নিতে রোজ রোজ কে আসেন, মল্লিকাদি। ওই যে মশমশ জুতো, কোট, প্যান্ট —

ওমা, তাও দেখেছ। মল্লিকা অল্প হেসে বলল, ও হ'ল আমার এক মামাতো ভাই। আমার হার্টের ব্যামো কিনা, তাই রোজ হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যায়।

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সারা হলে সাবিত্রী নিজেই গেল মল্লিকার ঘরে। মল্লিকা বিছানায় শুয়ে কী একটা বই পড়ছিল, এসো ভাই। কাজকর্ম চুকলো।

দুকবে কি, সাবিত্রীর পা সরছিল না। ছোট্ট, কিন্তু এমন সাজানো গুছানো ঘর আব কখনো চোখে পড়েনি। ঝকঝকে পালিশ খাটের ওপর ধবধবে বিছানা, ফুলতোলা বালিশেব ওয়াড়। ড্রেসিং আয়না, টি-পয়, গ্রামোফোন একটা। আলমাবিতে কাচের, চীনা মাটির খেলনা কতরকম।

এগুলো? সাবিত্রী জিজ্ঞাসা কবল।

এগুলো পুতুল। মল্লিকা বলল, আমি খেলি যে। আমার কি পুতুল খেলাব বয়স গিয়েছে ভাই।

খাটের একপাশে সাবিত্রী বসল সন্তর্পণে। নোংরা কাপড়, কী জানি। মল্লিকার হাতেব বইটা দেখিয়ে বলল, কী পড়ছেন।

পৃষ্ঠা মুড়ে রেখে মল্লিকা বলল, গল্পের বই। কাল সিনেমায যে বইটা দেখতে গেছলুম, সেটাই লিখেছে। ভারি চমৎকার। তোমাকে কী বলব ভাই, কাল দু'জায়গায় আমার চোখে জল এসেছিল।

কাল সিনেমায গিয়েছিলেন বুঝি?

যেতে হয়েছিল, সাধ করে কি আর গিয়েছি। আমার সারা বিকেল মাথা ধরে আছে, তবু ছাড়ল না।

কে ছাড়লনা দিদি?

আবার দিদি। বলবে মল্লিকাদি। ছাড়ল না আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

আপনার জ্যাঠতুতো ভাই, মল্লিকাদি। আপনার ছোট?

আঙ্গুলে বয়সের হিসেব করে মল্লিকা বলল, অনেক ছোট। প্রায় দু'বছর হবে। কেন তুমি দেখনি? সেই যে, রোজ গাড়ি নিয়ে বিকেলে আসে? ও আবার সিনেমার কাজ করে কিনা। ডিরেক্টর।

সাবিত্রী তখন কিছু বলল না, বলল অনেক পরে মন্থথকে, গরম ভাতের থালায় হাওয়া দিতে দিতে।

না জেনে শুনে আমাকে কী একটা বাসায় এনে তুলেছ, শুনি?

খাওয়া বন্ধ করে মন্থথ সপন্ন দৃষ্টিতে তাকালো। ফিস ফিস করে সাবিত্রী বলল, তোমাকে সেদিন বলিনি? ও-পাশের ঘরে থাকে একটা নষ্টচরিত্রের মেয়েমানুষ। আমি এখানে থাকব কী করে বলো তো। তুমি তো বেরিয়ে যাও সারাদিনের মতো। একটু থেমে বলল, সেদিন বলেছিল মামাতো দাদা, আজ বলেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মামাতো ভায়েরা রাতারাতি জ্যাঠতুতো ভাই হলে আসল সম্পর্কটা কী হয়, মুখ্য হলেও সেটুকু বুঝতে পারি।

মন্থথ ফের মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। বলল, তুমি বেশি মেশামেশি কোরো না। নিজে ঠিক থাকলেই হল। তোমাকে চিনি তো, খারাপ কিছু তোমার কাছে বৈষতে পারবে না।

ওর চরিত্রভেজের ওপর স্বামীর আঁট শ্রদ্ধা আছে জেনে সাবিত্রীর বুক ভরে গেল।

দুপুরে মন্থথ অফিসে বেরুচ্ছে, সাবিত্রী বলল, আজ কিন্তু বাসার খোঁজ আনা চাই।

মন্মথ বলল, আচ্ছ।

ফিরতে ফিরতে মন্মথর রাত আটটা বেজে গেল। দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়েই সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, গেলে খোঁজ।

কিসের?

বাসার।

জামা খুলে মন্মথ হকে টাঙিয়ে রাখল, জবাব দিল না।

ভাত বেড়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, কাল যদি নতুন বাসার খোঁজ না কর, তবে আমি মাথা খুঁড়ে কুরুক্ষেত্র করব বলে রাখলুম।

বিরক্ত গলায় মন্মথ বলল, বাসার খোঁজ পাওয়া কি অত সহজ নাকি।

তাই বলে খুঁজবে না তুমি।

ডালের বাটিতে সুড়ং চুমুক দিয়ে মন্মথ বলল, খুঁজব, খুঁজব। অত ব্যস্ত হলে কি চলে।

হাতাটা ঠং করে মেঝেয় ফেলে দিয়ে সাবিত্রী তিস্ত গলায় বলল, আমাকে একটা বেশ্যাবাড়িতে এনে তোলার সময় মনে ছিল না?

মন্মথর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। বলল, তোমাকে বেশ্যাবাড়ি এনে তুলেছি আমি?

সাবিত্রী চোখ দুটো তখনও জ্বলছে। রুদ্ধস্বরে বলল, বেশ্যা ছাড়া কী। দিনরাত রঙ মাখে, সঙ সাজে, ও কী-জাতের মেয়েমানুষ আমার জানতে বাকি নেই। তুমি যদি বন্দোবস্ত না কবো, আমিই করব। কালই বেহালায় চলে যাবো।

ভাতেব থালায় জল ঢেলে দিয়ে মন্মথ বলল, তাই যাও। তবু যদি সেখানে কী সুখ আমার জানতে বাকি থাকত। বাপ নেই, মা ছেলেবোয়ের কাছে চোর হয়ে আছে। ভাইয়ের ছেলের কাঁথাবদলানো থেকে ভাজেব কাপড় কাচা অবধি সব কাজ করতে হয়নি সেখানে? দু'বেলা হেঁসেল ঠেলা, আর ঠেস দেওয়া কথা শোনা। দু'খানা শোবাব ঘর পর্যন্ত নেই। শনিবাব শনিবাব আমি যেতাম, শুতে দিত চিলেকুঠিতে, বুড়ি মা বারান্দায় ঠাণ্ডায় শুয়ে শুয়ে কাশত। তখন তুমি কেঁদে কেঁদে ইনিযে বিনিযে বলোনি আমাকে আলাদা বাসা করতে? বলোনি, এখান থেকে যেমন করে হোক আমাকে নিয়ে চলে। তোমার সঙ্গে না হয় গাছতলাতে থাকব, সেও সুখ? ও-কথাগুলো কি থিয়েটারে শিখে এসে মুখস্থ বলেছিলে।

একটা মাদুর নিয়ে সাবিত্রী আলাদা শুতে যাচ্ছিল। মন্মথ বলল, খাবে না তুমি?

উপড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ঢেকে সাবিত্রী চাপা কান্নাভাঙা গলায় বলল, আজ আমাকে বাপের বাড়ির খোঁটা দিলে তুমি। আমি জলটুকুও হৌঁব না।

হৌঁবেনা?

না।

থাকো তবে। একটা বালিশ নিয়ে মন্মথ বাইরের রকে শুতে গেল।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখল, সারা গা ব্যথাব্যথা। ঘরে এসে আয়নায় দেখল চোখ দুটি লাল। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে ন্নান সারা হয়ে গিয়েছিল। এক পেয়লা চা এনে মন্মথর সম্মুখে রেখে চলে যাচ্ছিল, মন্মথ ডাকল, শোন।

ভিজে চুল, খোলা, তখনো সিঁদুর পরেনি, সাবিত্রীর কপাল প্রাকসকাল আকাশের মতো ন্নিষ্ক, নিষ্কণ্ডশুভ্র। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারারাতকাঁদা চোখ দুটিতে করুণ ক্রান্তি। মন্মথ অনেকক্ষণ একস্ফুটিতে চেয়ে রইল, কোন কথা বলতে পারল না। সাবিত্রী মাটির দিকে অপলক চেয়ে আছে। মন্মথ অনেকক্ষণ পরে ডাকল, সাবিত্রী।

সাবিত্রী চোখ তুলে তাকালো। পাতা দুটি কেঁপে উঠল একবার, একটু ভিজল, ঠোট দুটি থরথর হ'ল। উঠে গিয়ে মন্মথ সামনে দাঁড়াল সাবিত্রীর, একখানা হাত কাঁধের ওপর রাখল।

সরে যেতে চাইল সাবিত্রী, হাতখানা সরিয়ে দিতে চাইল, কিন্তু সরতে গিয়েও সরতে পারল না, আরো বেশি করে ধরা পড়ল, ঢলনামা মুখ ডুবিয়ে দিল মন্থধর বুকে।

পরক্ষণেই হসিকামা মুখখানা তুলে বলল, একি, তোমার গা এত গরম।

মন্থধর সামান্য হাসল।

সাবিত্রী বলল, কাল আবার রাগ করে বাইরে শোয়া হয়েছিল। আজ অফিসে যেতে পাবেনা তুমি।

মন্থধর বলল, ও কিছু না। অফিসে যেতেই হবে। তুমি বাসাবাসা করে পাগল হয়ে আছ, তাই তোমাকে বলিনি। আমাদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। এ-সময়ে সবাই ভয়ে ভয়ে আছে। গরহাজির হলে গোলমাল হতে পারে।

বিদ্যুৎপুষ্টের মতো সরে গেল সাবিত্রী। সশব্দ স্বরে বলল, তোমারও চাকরি যাবে নাকি।

যেতে তো পারেই। আমদানী রপ্তানীর ওপব আমাদের অফিস, মাল আসছে না নিষমিত বিদেশ থেকে। পাকিস্তানেও চালান যাচ্ছে না।

একটু চুপ কবে থেকে মন্থধর আবার বলল, দু'দিন একটু চুপ করে থাকো। চাকবির ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাক। এর মধ্যে আর নতুনবাসাবা হাস্যামা কবে কাজ নেই। একটু নিচু গাঢ়গলায় মন্থধর বলল, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু ভেতরটা আমাদের খাঁটি। নিজেদের নিজেবা সন্দেহ করে যেন ছোট না কবি। আমাকে তুমি চেন, আমিও জানি তুমি কী। আমাদের দু'জনের কাছে দু'জনের দাম থাকলেই হল।

বাজারের থলি হাতে মন্থধর বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাবিত্রী ডাকল এই, শোন।

মন্থধর ফিরে তাকাল। সাবিত্রী বলল, গেঞ্জিটা ছেড়ে দিয়ে যাও, ওটা পরে আর বাইবে যায় না। লোকে বলবে কী।

সিঁদুবে চোখের জলে বুকের কাছটাতে মাখামাখি। মন্থধর একটু হেসে গেঞ্জিটা খুলে দিল।

একটু পরেই মল্লিকা এসে দাঁড়াল দবজায়। মিটি মিটি হেসে বলল, কাল রাত্তিরে বুঝি কস্তাগিনীতে ঝগড়া হয়েছিল?

সাবিত্রী লজ্জিত গলায় বলল, কই, নাতো।

ইস, আবার লুকোনো হচ্ছে।

আপনি কী করে জানলেন।

হাত গুনতে জানি যে। ঘরে খড়ি পেতেছিলাম। না ভাই, খড়ি নয়, আড়ি। কাল আড়ি পেতেছিলাম তোমাদের দরজায়। সাবিত্রী তবু বিশ্বাস কবছে না দেখে মল্লিকা বলল, কাল তোমার কর্তাকে রকে ঘুমোতে দেখলাম কিনা, তাই। শেষ শো'তে থিয়েটাং দেখেছি কাল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। দেখছ না চোখ দু'টো ফোলাফোলা, ভালো ঘুম হয়নি কিনা তাই। একটু থেমে মল্লিকা বলল, কাল তোমরাও তো ঘুমোওনি। চোব এলে কিন্তু মুশকিলে পড়তে ভাই। বলে মল্লিকা হাসল।

কিন্তু সাবিত্রী হাসল না। সেই লজ্জাটুকু ঢাকতে মল্লিকাকে একটু বেশি করে হাসতে হল।

এড়াতে চাইলেও সব সময় এড়ানো যায় না। এক বাসায় থাকতে গেলে দু'চাববাব মুখোমুখি হতেই হয়, মিষ্টি হেসে মিষ্টি হাসির শোধও দিতে হয়। বিশেষ, মল্লিকা যদি একবাটি মাংস নিয়ে রান্নাঘরের সমুখে এসে দাঁড়ালো, সেদিন আর সাবিত্রী না বলতে পারলো না। একটুখানি চেখে বলল, চমৎকার হয়েছে মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, বুনো পাখি। শশাঙ্করা বাইরে গিয়েছিল, শিকার করে এনেছে। ভাবি চমৎকার স্বাদ না?

শশাঙ্কই যে মল্লিকার সেই জ্যাঠতুতো কিম্বা মামাতো ভাই, সাবিত্রী জানত। চুপ করে রইল, কিছু বলল না।

মল্লিকা জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ কী রাঁধলে ভাই? কী মাছ দেখি।

সেদিন বাজার থেকে মাছ আসেনি, কিন্তু মাথা কাটা গেলেও সাবিত্রী সে-কথা স্বীকার করতে পারবে না। বলল, দেহিতে বাজার এসেছে, এ-বেলা বেশি কিছু হয়নি মল্লিকাদি। অল্প চারটি খেয়েই আফিসে গেছেন। ও-বেলার জন্যে রেখে দিয়েছি বাঁধাকপি আর মাছের মুড়ো।

চলে যেতে যেতে মল্লিকা বলল, ও-বেলা আমার এক বাটি চাই কিন্তু।

মুহূর্তে ছাই হয়ে গেল সাবিত্রীর মুখ। তখন থেকে কেবলি প্রার্থনা করেছে, হে ঠাকুর, আজ যেন উনি একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরেন, কিন্তু মন্থথ ফিরল সাতটা বাজিয়ে।

ঘরে ঢুকেই মন্থথ জামাটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাবিত্রী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, খুলো না। তোমাকে এখনি বাজার যেতে হবে।

বিস্মিত বিরক্ত গলায় মন্থথ বলল, কেন।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো সাবিত্রী। সস্তর্পণ গলায় বলল, একটা বাঁধা কপি আনবে, আব একটা মাছেব মুড়ো।

মন্থথ বিদ্রুপ করে বলল, হঠাৎ এত সখ যে। এত খাবাব সাধ — পোযাতি হলে নাকি আবার?

সাবিত্রী বলল, চুপ চুপ, আস্তে। সাধ নয় গো মান। আমার মান বাঁচাতে পারো একমাত্র তুমি। তাবপব সাবিত্রী ফিসফিস কবে সব কথা বলল। শুনে কঠিন হয়ে গেল মন্থথব মুখ। কী ফাসাদ বাধিয়ে আছ বলো তো। মাসের শেষ, হাতে পয়সা নেই, শেষ রেশনটা বাদ দেবো কিনা ভাবছি, — তাব ওপর এসব কী পাগলামি। তোমাকে বারবার বলিনি, আমবা দু'জনকে নিয়ে দু'জন, কারুর কাছে ছোট হবো না, তাই বলে ছোট কাজও করব না কখনোও, কেন, কেন তুমি পাল্লা দিতে চাও অন্যোব সঙ্গে?

মন্থথর হাত দু'খানা চেপে ধবল সাবিত্রী। ধবা গলায় বলল, আর করব না। কিন্তু আজকের মতো আমাকে বাঁচাতেই হবে। না-হয় কোন হোটেল থেকে একবাটি কিনে নিয়ে এসো। কম খবচে হবে।

হাত ছাড়িয়ে মন্থথ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, পাগলামি করনা। আমি এখন যাই, হোটেলো হোটেলো খোঁজ নিইগে কোথায় বাঁধাকপি দিয়ে মাছেব মুড়ো রাঁধা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, মন্থথ কিন্তু টিফিন কারিয়ারের একটা বাটিতে বাঁধাকপির ঘণ্ট জোগাড় কবে আনলও। অনেক রাতে, শুতে এসে সাবিত্রী বলল, হোটেলের রান্না, মল্লিকাদি কিছু টের পায়নি কিন্তু। খুব সুখ্যাতি করছিল।

সেদিন দুপুর থেকেই মল্লিকার ঘর সাজানোব ঘট দেখে সাবিত্রী অবাক হয়ে গেল। যেখানে যত ঝুল ছিল, সব সাফ করেছে মল্লিকা, বালতি বালতি জল ঢেলে মেঝে ধুয়েছে। খাটটা ছিল ঘরের মাঝখানে, সেটাকে টেনে এনেছে এক কোণে। ঘষে ঘষে পবিস্কার করেছে আয়নার কাঁচ। ফুলদানীতে টাটকা তাজা ফুল, জাজ্জিমের ওপব ধবধবে চাদর।

কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে গায়ে মুখে মাথায় সাবান মেখেছে মল্লিকা, বারান্দায় সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা। সাবিত্রী সারাক্ষণ উঁকি দিয়ে দেখছে মল্লিকার কাজ। বলল, আজ যে এত ঘটা মল্লিকাদি?

মল্লিকা মুচকি হাসল। বলল জানো না? আজ যে আমাকে দেখতে আসবে ভাই। তা কেউ তো নেই, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করছি।

সাবিত্রী বলল, ঠাট্টা!

কেন আমাকে বুঝি দেখতে আসতে পারে না? আমার বিয়ের বয়স কি একেবারেই গিয়েছে ভাই। দেখতো কেনন টান টান চামড়া, ধবধবে রঙ, মল্লিকা সামনে হাত দু'খানা প্রসারিত করে ধরল।

অপ্রতিভ সাবিত্রী বলল, তা কেন, তা কেন। সত্যি করে বলুন না, মল্লিকাদি কে আসবে আজ।

আমার ক'জন বন্ধু। নেমস্তম্ভ করেছে আজ। এখনি এসে পড়বে ওরা।

তারপব কতক্ষণ ধরে যে মল্লিকা আয়নার সমুখে বসে বসে প্রসাধন করল। সাবান দেওয়া চুল ফাঁপিয়ে দিল খোঁপাবাঁধার এক নিপুণ কৌশলে। একটু রঙ, একটু পাউডার ক্রীম মিশিয়ে তৈরী করল অপরূপ ত্বকপ্রলেপ, ভূরেখাকে দীর্ঘায়ত করল তুলিকায়। হারমোনিয়ামেব নিখুঁৎ সাজানো রীডের মতো দাঁতের পাঁতি বার করে যখন হাসল, সাবিত্রী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটু পরে বলল, আপনার বন্ধুরা এসে পড়বেন। আমি এখন যাই মল্লিকাদি।

মল্লিকা বলল, আহা, ব'সনা।

এখনও ঘর সাজানো একটু বাকি ছিল, এটা-ওটা এখানে সেখানে সরাতে লাগল, টুলের ওপর বসে মেয়েকে দুধ দিতে দিতে সাবিত্রী দেখতে থাকল নির্নিমেবে।

ঠিক সেই সময়ে বারান্দায় মশমশ জুতোর শব্দ শোনা গেল, আজ এক সঙ্গে অনেক জোড়া। পালাবে কি, দরজা তো মোটে একটা। মাথার কাপড় সামলাতে গিয়ে কাপড় আলগা হয়ে পড়ল, পায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে নজরে পড়ল গোড়ালির ওপরেও খানিকটা জায়গায় উপযুক্ত প্রচ্ছদ নেই।

খুকিকে একরকম জোর করেই দুধ ছাড়াল সাবিত্রী, মেঝেয় শুইয়ে দিল, ব্লাউজের বোতামগুলি পট পট করে বন্ধ করল কোনক্রমে। খুকিকে কোলে নিয়ে দৌড়তে যাবে, চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে শশাঙ্ক, একেবারে মুখোমুখি।

না-জানি আজ একটা গোটা আতরের শিশিই ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর ক্রমালে শশাঙ্ক উজাড় করে এসেছে, গন্ধে সাবিত্রীর গা-বমিবমি অনুভূতি এলো। চৌকাঠ ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াল শশাঙ্ক, সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হ'ল ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল বুঝি। অসম্মত গিলে আস্তিন আদ্রির জামাটা বুঝি সঁটেই রইল আঁচলে, হীরে ঠিকরানো আঙ্গুরের শর বিধে রইল পিঠে, ঠিক যেখানটায় ব্লাউজটা ফেসে গেছে।

তা ছাড়া ঘরে এসেও সাবিত্রী ভুলতে পারল না শশাঙ্কের চাউনি। কী আতুর, আচ্ছন্ন চোখে চেয়ে ছিল লোকটা। পাতের পাশে বসে থাকা বেড়ালটা যে-আগ্রহে বাটির গা চেটে চেটে খায়, চুষে চুষে খায় মাছের কাঁটা, তেমনি। সাবিত্রী সারা শরীর ভরে শিহরণ অনুভব করল।

শনিবার, মন্থথ সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরল। ঘরে পা দিয়েই একরকম চৈঁচিয়ে উঠল, কী হচ্ছে কী হচ্ছে ও-ঘরে।

সাবিত্রী বলল, একটু আস্তে কথা বলতে পারো না? গান। মল্লিকাদি গান গাইছে। ও-ঘরে আজ কত লোক এসেছে জান।

ঘুগায় কুণ্ঠিত হয়ে গেল মন্থথর মুখ। জানালা দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিতে দিতে বলল, ছি-ছি-ছি। ওরা বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করলে দেখছি।

খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে সাবিত্রী বলল, ঘুড়ুরও বাজছে না?

মন্থথ তখন ডেস্টিলেটোর দুটোও বন্ধ করে দেবে কিনা ভাবছে। বলল, ওসব শুনে কাজ নেই।

এক একবার গান থামে, সাবিত্রী বলে, এই বুঝি ওদের আসর ভাঙলো। কিন্তু ভাঙেনা। একটা শেষ হতেই এক পশলা হাততালির তারিফ শোনা যায়, পবক্ষগেই হারমোনিয়মটায় নতুন সুর ককিয়ে ওঠে।

মন্মথ বলল, কী কলেঙ্কারি। এই তবে পেশা তোমার মল্লিকাদির। এতদিনে পরিষ্কার বোঝা গেল। ছি-ছি পেটে খাবার জন্য কত ছোট কাজই না কবে মানুষ। বলতে বলতে মন্মথর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; আমাদের কিন্তু গর্ব আছে সাবিত্রী, উপোস কবে শরীর শুকিয়ে মবলেও ভেতরের মানুষটাকে নীচ করিনি। কালই বাড়িওয়ালাকে বলব আমি। একটা বিহিত কবতে হবে।

সাবিত্রী ভেবেছিল মল্লিকা পর্বদিন মুখ দেখাতে পাববে না ওব কাছে। আশ্চর্য, পর্বদিন কলতলায় মল্লিকাই সেধে কথা বলল।

এমন বেহায়া মেয়ে, বলল, কাল কেমন গান শুনলে ভাই।

সাবিত্রী কোন জবাব দিল না।

মল্লিকা বলল, উঃ, কী ধকল গেছে কাল। থামতেই চায় না। একটা শেষ হতে আবেকটার ফরমাস কবে।

সাবিত্রী বাঁকা গলায় বলল, কাল যাবা দেখতে এসেছিল, তাদের আপনাকে পছন্দ হয়েছে মল্লিকাদি?

কলকুঁচিব জল সশব্দে দুবে ছিটিয়ে সশব্দে হেসে উঠল মল্লিকা। ওমা, তুমি এখনো গাট্রাব কথাটা মনে বেখেছ? আমাকে দেখতে তো আসেনি। শীগগিরই হামবা একটা গীতিনাটা অভিনয় কবব কিনা, কাল হামাব ঘবে তাব মহলা হ'ল। আসছে পূর্ণিমায় শো। নাটাপীঠ থিয়েটারও ভাড়া নেওয়া হয়েছে, জান?

সাবিত্রী নীববে কাপড় কাচতে লাগল। মল্লিকা হঠাৎ কাছে ঘেঁসে এলো। সাবিত্রীব কানব কাছে মুখ নামিয়ে বলল, তুমি কিন্তু একটু সাবধানে থেকো ভাই। কাল শশাঙ্ক তোমাকে একেবাবে স্পষ্ট সামনাসামনি দেখেছে। কী বলব, ওব মাথা ঘবে গেছে একেবাবে। ওবা এবাবে যে ফিল্মটা তুলছে, তাতে নাকি ছোট্ট একটি মাযের পার্ট আছে। খুকিকে তুমি দুধ দিচ্ছিলে না — ঠিক অমনি একটা পোজ ওদেব চাই।

সাহস পেয়ে আরো কত কী বলত মল্লিকা ঠিক নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সাবিত্রী দুমদাম পা ফেলে উঠে গেল। মুখ ফিবিযে বলে গেল, তুমি মবো মল্লিকাদি।

ববিবার বাড়িওয়ালাব কাছে যাই-যাই করেও মন্মথ আলসেমি করে সারাদিন বাসায় কাটিয়ে দিল। সোমবার অফিসফেবং যাবার কথা ছিল, সেদিন বেলা তিনটের সময়ই সটান চলে এলো বাড়ি। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঘবে গিয়ে তক্তপোষে শুয়ে পড়ল।

মেঝেয় আঁচল পেতে শুয়েছিল সাবিত্রী, ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল, একি, এত শীগগির ফিরলে আজ? তাহলে আজ সিনেমায় নিষে যেতে হবে কিন্তু।

কঠিন চোখে তাকাল মন্মথ। বলল, হ্যাঁ। সেইটেই বাকি আছে। সিনেমা দেখাবই সময় আমাদের।

ভয় পেয়ে আরো কাছে ঘেঁসে এলো সাবিত্রী। মন্মথব কপালে উদ্ভিগ্ন করতল রাখল, ডিজে হাত গরম ঠেকল, কিন্তু নিশ্চিত বোঝা গেল না, তখন গাল কাৎ কবে রাখল মন্মথর কপালে। বলল, জ্বর হয়নি তো।

পাশ ফিরে সরে গেল মন্মথ। বিষণ্ণঠাণ্ডা কঠে বলল, জবাব আমার কপালে লেখা নেই, সাবিত্রী, জামার বুক পকেটে আছে। উঠে গিয়ে দেখ।

অফিসের ছাপমারা লেফাফা দেখে সাবিত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। খাম না খুলেই বলল, এ কী ছাঁটাই?

মন্মথ এ-প্রশ্নের জবাব দিল কনুই দিয়ে চোখ ঢেকে।

মল্লিকা উঁকি দিয়ে বলল, ওমা, খুকিকে এখুনি ভাত দিয়েছ, ভাই? বয়স কত ওর — দাঁত উঠেছে?

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলল, উঠেছে দিদি, ওপরনীচ মিলিয়ে ছ'টা। ভীষণ পেটের অসুখ যে ওর, তাই ভাবছি আজ দুধ দিয়ে কাজ নেই।

মল্লিকা মুখ টিপে হাসল : কলকাতার দুধ তো সিকিটাই জলমেশানো, পাথরভর্তি চালের চেয়ে সেটা পেটের পক্ষে ভালই হত সাবিত্রী।

মুখ টেপার রকম দেখে সাবিত্রীর সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে মনে বলল, বেশ্যা, হারামজাদি।

সন্ধ্যার পর নিজেই একটা দরখাস্তের মুসাবিদা কবছিল মন্মথ, আপনমনে হাসছিল। সাবিত্রী পাশে এসে বসল। মদু গলায় জিজ্ঞাসা করল, হাসছ যে। আজ কোথাও কোন আশা পেয়েছ?

মন্মথ বলল, না। আজ আলফ্রেড এণ্ড জ্যাকসন কোম্পানীর বড়বাবুকে কেমন জন্দ করেছে সেই কথাই ভাবছি।

সাবিত্রী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে দেখে মন্মথ গল্পটা বলল : আরে না-কামানো গাল আর খালি পা দেখে ব্যাটা তো কথাই বলতে চায় না। বলে বেয়ারার কাজ নেই বাপু, অন্যত্র দেখ। চট করে বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললুম, বেয়ারার কাজ চাইনে স্যার, ক্লাবিকাল। আমি সাত বছর সিমসন জোসেফের বাড়ি ক্লার্কের কাজ করেছি। আমাব চেহারা আগাগোড়া দেখে নিয়ে — চোখ তো নয় শালাব, যেন বুরুশ — বড়বাবু বললে, তুমি! বললুম, ভদ্রলোক স্যাব, দস্তবমত আগার গ্র্যাজুয়েট। জ্যাঠামশায় মাঝে গেছেন স্যার, তাই. . . সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভঙ্গি বদলে গেল ব্যাটার। বললে, অশৌচ কেটে যাক, একটা দরখাস্ত নিয়ে আসবেন। দেখি ছোট সাহেবকে বলে কিছু করতে পাবি কিনা। মন্মথ হো-হো কবে হাসতে লাগল।

নিয়ে যাও তবে দরখাস্ত : সাবিত্রী বলল।

আর সেখানেই তো মুশকিল। দরখাস্ত তো কালই নিয়ে যেতে পারি। না হয় দু'আনা খবচ করে দাড়ি কামিয়ে বললাম, শ্রদ্ধাশ্রুতি চুকে গেল স্যার। কিন্তু পা দু'খানা মুড়ি কী দিয়ে।

অনামিকা থেকে নিঃশব্দে বিয়ের আংটিটা খুলে সাবিত্রী মন্মথের হাতে দিল। মন্মথ কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল, কালই একজোড়া জুতো কিনবে তুমি।

সাবিত্রী চায়না, না ঘেঁষতে, না মিশতে, তবু কি কমলি মল্লিকা ছাড়ে। মন্মথ বেরিয়েছে টের পেয়েছে কি এ-ঘরে এসে বসবে। বিব্রত, বেআক্র করবে সাবিত্রীকে একটার পর একটা রঞ্জনরশ্মি প্রশ্নে।

গায়ে যে বড়ো একটাও জামা রাখনি সাবিত্রী?

কুণ্ঠিত সাবিত্রী আরো জড়োসড়ো হয়ে বসতে চেষ্টা করে বলে, বড় গরম যে মল্লিকাদি?

গরম? হাসলে ভাই তুমি আমাকে। চারদিন থেকে সমানে বিষ্টি, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, আমরা রান্ধিরে চাদর গায়ে দিচ্ছি, তবু তোমার গরম গেল না। অবাক করলে ভাই। এ-গরম তোমার বয়সের।

মল্লিকার গলটি টিপে ধরলে, নখ দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে বুঝি রাগ ষেত সাবিত্রীর। কিন্তু উপায় নেই। মুখ ফুটে কাউকে বলা যাবে না কিছু। গোপন ঘায়ের মতো লুকিয়ে

রাখতে হবে এই দুঃখ; এই অনটন, যা অনশনের সোদর। কিন্তু পুঁজুরক্তে ছেঁড়া কাপড়খানাও যে মাখামাখি হয়ে গেল, সাবিত্রী লুকোবে কী?

মল্লিকা বলল, আজ দুপুরে একটু বেরুবো। ঘরখানার ওপর একটু নজর রেখো। সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম।

কোথায় যাবে, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেনি, মল্লিকা নিজেই বলল।

বেসে যাবো ভাই। শশাঙ্করা খুব ধরেছে। সারাদিনের ধকল, শরীরে কি এত সয! দম নিয়ে ফের বলল, তা শশাঙ্ক বাহাদুর ছেলে বলতে হবে। জিতিয়ে দেবে কিন্তু তোমাকে ঠিক। পাঁচ টাকায় পাঁচশো। সেই যে ম্যাজিক আছে না, ধুলোমুঠো সোনা হয়ে যায়? এ তাই।

পাঁচ টাকায় পাঁচশো, মল্লিকাদি?

ওই কথার কথা। তা তেমন তেমন ঘোড়া মিললে হয় বৈকি। আর তিন টোটের খেল মেলাতে পারলে তো কথাই নেই, — রাতারাতি বড় মানুষ।

সাবিত্রীর চোখ দুটো জ্বলছিল। মল্লিকা বলল, অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে।

সাবিত্রী শুকনো গলায় বলল, এমনি।

কিন্তু মল্লিকা বেবিয়ে যেতেই সাবিত্রী চালেব হাঁড়িতে হাত দিল। বেরুল টিনেব একটা কৌটা, সেই কৌটার মধ্যে ন্যাকড়ার একটা পুঁটলি। গিট খুলতে ছড়িয়ে পড়ল পয়সা, সবশুদ্ধ সওয়া পাঁচ আনা। মন্মথর চাকরী হলে কালিঘাটে পুঁজো দেবে বলে কবে যেন সাবিত্রী আলাদা করে রেখেছিল।

মল্লিকাব তখনো সাজগোছ সারা হয়নি, সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়াল। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, মল্লিকা তখন কষ্টায়, ঘাড়, কনুই অবধি পাউডার মাখছে। ফিবে তাকিয়ে বলল, কী ভাই।

সাবিত্রী অনেকক্ষণ কিছু বলতে পাবল না। তাবপব সঙ্কোচ জয় কবে নীচু গলায় বলল, কম পয়সায় বেস খেলা যায় না, মল্লিকাদি?

মল্লিকাব চোখে মুখে কৌতুক ছড়িয়ে পড়ল, বলল, কত কম পয়সা, ভাই?

এই ধবো, স'পাঁচ আনা?

স'পাঁচ আনা কেন, পাঁচ আনাতেই চলবে। আমাব চেনা বুকি আছে কত, তুমি খেলবে?

কুণ্ঠিত, কাঁপা হাতে সাবিত্রী মল্লিকার হাতে পাঁচ আনা গুঁজে দিল। মল্লিকা বলল, ঘোড়া?

সাবিত্রী, বলল, ওসব আমি বুঝিনে, তোমাব যা ভাল মনে হয়, ক'র মল্লিকাদি।

সেই পাঁচ আনা সুদে-আসলে ফিবে এলো কিন্তু। মল্লিকা বলল, তোমার ভাগ্য ভাল সাবিত্রী আমরা এলোমেলো খেলে ফতুর, কিন্তু তোমার নামে যেটা ধরলুম, সেটাই বাজি নিলে। তবে পেমেন্ট ভাল হয়নি, নামী ঘোড়া কিনা। পাঁচ আনায় পেয়েছে আট আনা।

আমার এই ভালো মল্লিকাদি, সাবিত্রী আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বললে।

চায়েব সঙ্গে ফুলুরি বেগুনী দেখে মন্মথ অবাক হ'ল। পয়সা পেলে কোথায় তুমি?

যেন কতই রহস্য, সাবিত্রী এমন ভঙ্গিতে হাসল।

চাকরির দরখাস্ত লিখে লিখে আর জবাব না পেয়ে পেয়ে মেজাজ আজকাল সর্বদাই তিরিঙ্কি মন্মথর, স্ত্রীর কাছেও জবাব না পেয়ে চটে গেল, রোজগার করেছ নাকি?

তবু হাসল সাবিত্রী — যদি বলি তাই।

ঠাট্টাকটু গলায় মন্মথ বলল, আশ্চর্য হবো না, জলজ্যাস্ত আদর্শ যখন পাশেই রয়েছে।

কথার ধরনে সব উৎসাহ মিইয়ে গিয়েছিল সাবিত্রীর, তবু মন্মথকে সব কথা খুলে বলতেই হল।

অঙ্ককার হয়ে গেল মন্মথর মুখ। গম্ভীর স্বরে বলল, এও তো এক হিসাবে তোমার রোজগারই। ছি-ছি। তোমাকে বলিনি সাবিত্রী, ও-সবে কাজ নেই। না খেয়ে থাকবো সেও স্বীকার, তবু তোমার উপার্জন খেতে চাইনে।

কার্তিক মাসেব গোড়াতে সাবিত্রী বাপেব বাড়ি গেল। ইচ্ছে ছিল না, শুধু মন্মথব পেড়াপীড়িতে। সাবিত্রী বাববার বলেছে, আমার কিছু ক্ষতি হবে না দেখো। তা ছাড়া, আমাদের এখন এই দুঃসময় চলছে। কার কাছে তোমাকে রেখে যাবো।

মন্মথ বলেছে, সে-ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে। এ-অবস্থায় এত খাটুনি সহ্য হবে না, তাব ওপর পেট ভরে দুবেলা খেতেও পাওনা। শেষ পর্যন্ত একটা বিপদ বাধাবে? আব, কদিনের জন্যেই বা। তোমার হিসেব মত তো আর সাড়ে পাঁচ মাস?

কিন্তু ঠিক পঁচিশ দিনের মাথায় সাবিত্রী ফিরে এলো, ফ্যাকাশে, সাদা কাঠি। কণ্ঠার হাড় চোলে উঠেছে, পেট চুপসে ছুঁয়েছে পিঠ।

মল্লিকা বলে, ছেলে কোলে করে আসবে ভেবেছিলাম, তা এ কী চেহারা নিয়ে এলে, ভাই? সাবিত্রী বলল, ও-শব্দে না এসেছে ভালই হয়েছে মল্লিকাদি। এলে খাওয়াতাম কী।

কী হয়েছিল রে।

কিছু না। শরীবটা এখন থেকেই খারাপ নিয়ে গিয়েছিলাম তো। বোজই ঘুষঘুষে জ্বব হত। ওখানে গিয়ে কলতলায় মাথা ঘুরল একদিন, — ব্যস।

শরীরটা দু'দিন একটু সেরে এলেই পারতে।

সাবিত্রী চুপ করে রইল।

মন্মথ দিনকতক যোবাঘুরি করছে। ব্যবসা কবছে বলে। বাপেব বাড়ি যাবার আগেই সাবিত্রী শুনে গিয়েছিল, এক বন্ধুর প্রেসেব সঙ্গে বন্দোবস্ত কবেছে মন্মথ, কাজ দিলে কমিশন। লক্ষ্মীর কৌটো কুড়িয়ে কাচিয়ে বেবিযেছিল পাঁচ টাকা, খুদ বিক্রী করে আবো দেড়। একটা ট্রামের মাথুলি কিনেছিল মন্মথ।

একদিন দুপুরে মন্মথ খেয়ে দেখে চুপচাপ শুয়ে পডছে দেখে সাবিত্রী বলল, কী গো, আজ কাজে যাবে না?

মন্মথ হাই তুলে বলল, দূব, দূব। শুধু যোবাঘুরি, শরীবটাই মাটি।

কাজ দিতে পারনি তোমার বন্ধুব প্রেসে?

দিয়েছি তো। মন্মথ খাটেব নিচে বাখা লেটাব হেডেব জুপ দোঁখিয়ে দিল, ওগুলো দেখতে পাওনি? চক্রবর্তী এগু দত্ত, — অর্ডাব সাপ্লায়ার্স।

কোন কোম্পানী?

কোম্পানী আমি নিজেই। দত্ত নামটা দিয়েছিলাম মনগড়া। শুধু একটা নাম কেমন ন্যাড়ান্যাড়া শোনায় বলে। ওগুলো কাল সের দরে বেচে দিও।

আরেকটা কাজের কথা অনেক দূব এগিয়েও হল না। কোন একটা ফার্মেব ট্রেড রিপ্রেসেন্টেটিভ। কলকাতাব বাইরে যেতে হবে মাঝে মাঝে। একশো টাকা মাইনে, বাহা খবচা, উপবস্তু বিক্রিব ওপব দু' পাবসেন্ট কমিশন। সে-অফিসেব মাঝারি একজন কেবাণীকে পান খেতে কিছু হাতে গুঁজেও দিয়ে এসেছিল। নির্দিষ্ট দিনে দেখা কবতে গেল মন্মথ। ফিবে আসতে সাবিত্রী বলল, হল?

না। মন্মথ বলল, জোচ্চোব শালা জোচ্চোর — পাঁচশো টাকা জমা বাখষ্ঠে চায়। আবো তোদের মাল নিয়ে কি সেরে পড়তাম আমি? এটুকু বিশ্বাস কবতে পাবিস না?

মন্মথ বলতে বলতে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠল যেন সাবিত্রীই জামিনের টাকা চেয়েছে। যেন সাবিত্রীই ওকে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অন্য লোক নিয়েছে ওরা?

আরে সেই কথাই তো বলছি। যাকে নিয়েছে সে আবার আমার চেনা, প্রভাস গাঙ্গুলী। সেদিন বিয়ে করেছে কিনা, নগদ নিয়েছে দু'হাজার, বলামারুব পাঁচশো টাকা দিয়ে দিল।

কোন কারণ নেই, তবু সাবিত্রী মাথা নীচু করল। ওর বাবা শুদ্ধমাত্র শাঁখা সিঁদুরে কন্যা সম্প্রদান কবেছিলেন, সেই আপশোসই মন্থন করছে না তো এতদিন পরে, কোলে একটা আসবার পরে, এমন কি আরও একটা নষ্ট হয়ে যাবার পরে।

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়, কিন্তু শাক ঢাকবে কী দিয়ে। আর মল্লিকা এমন সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে যে লুকোবার উপায় নেই।

মল্লিকা বললে, এত শীগগির আজ খেতে বসেছ ভাই।

পাতে শুধু কলমী শাক সেদ্ধ, আর কয়েকদানা মাত্র ভাত। অনাদিন হলে সাবিত্রী তাড়াতাড়ি জল ঢেলে দিত থালায়। কিন্তু বলত আজ তোমার ভগ্নপতির তাড়াতাড়ি কাজ ছিল দিদি, বাজাবটাও কবে দিয়ে যেতে পাবেনি, তা, আমারও শরীর ভাল নেই, দু'টো দাঁতে কাটছি শুধু।

নিজের ঘবে গিয়ে ছোট একটা বাটিতে মাছের ঝোল নিয়ে ফিবে এল মল্লিকা, একটু চেখে দেখবে ভাই, নুন দিয়েছি কিনা বুঝতে পাচ্ছি না।

অত্যন্ত সহজ হল, অনাদিন হলে অপমান বোধ কবত, মল্লিকাকে ফিবিয়ে দিত, কিন্তু আজ কী হ'ল সাবিত্রীর চোখ দুটো ছলছল কবে উঠল। কত ভুল না করে মানুষ, কত অকারণে একে অপরকে ঠেলে বাখতে চায় দূবে। পাশের ঘরের এই মেয়েটিকে কেন ববাবব অপছন্দ কবে এসেছে সাবিত্রী? ওব কাছে আসল পবিচয় লুকিয়ে বাখতে চেষ্টা করছে বলে? অকস্মাৎ সাবিত্রীব মনে হ'ল সেও তো মল্লিকার কাছে কম কথা লুকোয়নি। মল্লিকা গোপন কবতে চেয়েছে ওব কলঙ্কেব কুলো, সাবিত্রী ওব অভাবের ফুটো কলমী। এতদিন পরে সাবিত্রী প্রথম অনুভব কবল একই পৈঠায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

বুক ঠেলে খানিকটা লবণাস্ত কাল্লা ছাপিয়ে পড়ল সাবিত্রীব চোখে।

সেদিন সাবিত্রী একটা অসমসাহসিক কাজ কবল।

তেমন কিছু রোদ নেই তবু চোখ দু'টো গবম, কান কাঁপা কবছে। অনভাস্ত পাবে ববাবব জড়িয়ে যাচ্ছে শাড়ি। ধাবকবা স্যাণ্ডালটার স্ট্রাপ যেন চামড়া কষে ধবেছে।

একা পথ চলাব অভ্যাস নেই, ভয় ছিল ঠিক চিনতে পাববে কিনা। মল্লিকা ভাল কবে বুঝিয়ে দিয়েছিল, — বিশেষ অসুবিধা হল না।

ঘাড়তে দেখল তখনো সিনেমা গুরু হতে মিনিট পনোবো দেবি। ধপ কবে একটা কৌচে বসে পড়ল সাবিত্রী। মল্লিকার দেওয়া গন্ধ কমালে মুখের ঘাম মুছল।

কিছুই লুকোয়নি আজ মল্লিকার কাছে। মন্থনখব চাকরি না থাকাব কথা, অভাবের কথা, উপোস দেওয়াব কথা। সব অহংকাব, অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে বলেছে, তোমার পায়ে পড়ি মল্লিকাদি, যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে দাও। নিজের জন্য ভাবিনা। কিন্তু চোখের ওপব মেয়েটা শুকিয়ে মবে যাচ্ছে, সহ্য হয় না।

কী-কাজ করবে তুমি?

তাই-তো, কী কাজ। না-জানি ভাল লেখাপড়া, না সেলাই। টাচার হতে পারবে না, নার্স না দর্জি না। কথাবার্তায় তুখোড় নয় যে টেলিফোনে কাজ নেবে। অসীম প্রয়াসে সংকোচ জয় করে সাবিত্রী বলেছে, আচ্ছা সেদিন যে কাজটার কথা বলেছিলে সেটা হয় না? সেই যে সিনেমা, ছোট্ট একটা পার্ট, মায়ের? শশাঙ্কবাবুকে একবারটি বলে দেখ না মল্লিকাদি।

অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল মল্লিকা। দাঁত দিয়ে সূতো কাটতে কাটতে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, আমি বললেও হবে; কিন্তু তার চেয়েও একটা সহজ উপায় আছে। কিন্তু সে কি তুমি রাজি হবে ভাই।

রাজি ? হাসতে গিয়েও চোখ দুটো আবার ভারি হয়ে এল সাবিত্রীর। ভিখারীর আবার বাছবিচার। আমার কিছুতেই ভয় নেই মল্লিকাদি। তুমি বল।

মল্লিকা বলল। সাবিত্রী এত যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারল না। মল্লিকা জোর দিয়ে বলল, অন্যায় কিছু করতে বলছি না তো, শুধু পাশে গিয়ে বসবে। আমার নামে টিকিট তো কেনাই আছে। আমি জোর দিয়ে বলছি সাবিত্রী, আমি বললে যা হত, এতে তার চেয়ে দশগুণ ফল হবে। নিজের কাজে নিজেকেই ওছিয়ে নিতে হয় ভাই।

কী সম্মোহন ছিল মল্লিকার অকম্প স্বরে, অপলক চোখে, সাবিত্রীর অন্তস্তল অবধি কেঁপে উঠল। কুয়োব গভীর তলদেশে নির্জীব একটা কণ্ঠ যেন ভেসে উঠল : বেশ আমি বাজি, মল্লিকাদি। টিকিটখানা দাও।

তারপর চলে এসেছে এই ছায়ালোক বাযোক্কেপে। মন্মথ বেঁবিয়ে গেছে। তাব অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করিনি।

আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্ক পাশে এসে বসল। গদি-আসনে সারা শরীর কেঁপে উঠল সাবিত্রীর, জড়োসড়ো হয়ে বসল। বিস্মিত শশাঙ্কই প্রথম কথা বলল, আপনি ?

মল্লিকাদির শরীর খারাপ। আসতে পারলেন না। টিকিটটা নষ্ট হবে, তাই আমাকে --

অন্ধকার ঘরে পর্দার ওপরে ততক্ষণ ছবির নড়াচড়া শুক হয়ে গেছে। কী কথা বলছে ওরা, প্রেক্ষাগৃহে কখনো তুমুল হাসি, কখনো স্তব্ধতা। সেদিকে তো চোখ নেই সাবিত্রীর, সেদিকে কান নেই। গলা ওকনো, দেহ আড়ষ্ট, চোখে জ্বালা। এই বুঝি নিবালোকতাব সুযোগে এগিয়ে এলো একখানি রোমশ হাতের ছোবল। এই বুঝি ওব কোমর হাড়িয়ে ধবল একটি দুঃসাহসী লালসা। যতবার শশাঙ্ক নড়েচড়ে বসল, ততবার ভয়ে অন্যদিকে সবে গেল সাবিত্রী, কতবার যে পাশের হাতলে অনামনস্ক হাত রাখল, কতবার যে তুলে নিল, হিসেব নেই। একবার খসখস কবে উঠল, মনে হ'ল শশাঙ্কব বাঁহাত কী যেন খুঁজছে এদিকে। প্রাণপণ প্রয়াসে শরীরটাকে শক্ত করল সাবিত্রী, মনটাকে প্রস্তুত করল, এমন সময় ফশ্ কবে আলো জ্বলে উঠল। আড়চোখে চেয়ে সাবিত্রী দেখল শশাঙ্ক একটা সিগারেট ধবিয়েছে। বাঁ ধারের পকেটে এতক্ষণ দেশলিইয়ের বাস্ক খুঁজছিল।

বুকের ভেতব থেকে কমাল বাব কবে সাবিত্রী সস্তপর্ণে কপালের ঘাম মুছল।

বিরতির আলো জ্বলতে উঠে গেল শশাঙ্ক, একটু পরে দুটো আইসক্রীম নিয়ে ফিবে এল। একটা সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, কেমন লাগছে।

ঘাড় কাৎ করে সাবিত্রী অস্ফুটস্বরে কী বলল, নিজেই শুনতে পেল না।

বুঝতে পারছেন ? প্রোগ্রাম কিনে দেবো একটা ?

সাবিত্রী বলল, না।

কী অসুখ হয়েছে মল্লিকার।

খতমত খেয়ে সাবিত্রী বলল, বেশি কিছু না। এই — এই মাথাধরা আর কী।

আবার আলো নিবল। আবার সেই ছাইছাই ফিকে অন্ধকার, পর্দায় মুখব ছবির অবিবাম গতি, সেই দমবন্ধ ভয়, ঘামঘাম অস্বস্তি। কিছু বুঝলনা সাবিত্রী, বুঝতে চাইল না, পালা কবে হাতলে হাত রাখল, তুলে নিল, সরে বসল, সরে এলও, বারবার একটা অগ্রসর পুরুষ হাতের স্পর্শ কল্পনা করে নিজের হৃৎপিণ্ডের ধবক ধবক শব্দ শুনল।

শেষ বারের মত আলো জ্বলতে সব লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মত সাবিত্রী অনুসরণ করল শশাঙ্ককে, বাইরে আসতে পাঁচমিনিটের বেশি লাগল।

শশাঙ্ক বলল, কিছু খাবেন ?

না-বলতে গিয়েও সাবিত্রী কিছু বলতে পারল না, ওর কথা বলার ক্ষমতাই লোপ পেয়েছে। পর্দা ঠেলে একটা ছোট কামরায় বসল দু'জনে। শশাঙ্ক বলল, কী আনতে বলব। অস্বচ্ছন্দ শুকনো গলায় সাবিত্রী কোনমতে বলল, এক গ্লাস জল।

শুধু জল? তা কি হয়। শশাঙ্ক কিছু খাবারও ফরমাস করল।

যতক্ষণ সিনেমার মধ্যে ছিল, ততক্ষণ সাবিত্রী লক্ষ্য করেছে, ভয় করেছে শশাঙ্কের হাত দু'খানাকে; এবারে খাবারের টেবিলের তলা দিয়ে ওর পা দু'খানার দিকে নজর পড়ল। মিহিগিলে কৌচাটা শুঁড়ের মত লম্বা হয়ে একজোড়া চকচকে কালো নিউ-কাটের গন্ধ শুঁকছে। সেই মশমশ জুতো। সাবিত্রী কাঁপল, পা দু'খানার নিম্নতম প্রান্ত অবধি শাড়িতে ঢেকেও স্বস্তি হলনা, টেনে নিল চেয়ারের নিচে। তবু যেন চোখ বুঁজে অনুভব করল আবেক জোড়া পা নিঃশব্দে, গুটিগুটি এগিয়ে এসেছে; নতুন সাঙালের ফিতেয় পায়ের পাতার যেখানটা কেটে গিয়ে জ্বালা করেছে, তার ওপর সাবিত্রী যেন বাববার কঠিন একজোড়া নিউ-কাটের চাপ অনুভব করল।

শশাঙ্ক বলল, আপনার বুঝি সিনেমা দেখাব বিশেষ অভ্যাস নেই?

এতক্ষণে সাবিত্রী সম্বিং ফিরে পেল। হঠাৎ মনে পড়ল, আসল কাজই বাকি রয়ে গেছে। যে জন্যে এত আয়োজন করে আসা, সেই কথাটাই বলা হয়নি শশাঙ্ককে।

বলল, না। আপনারা — আপনি তো খুব দেখেন, না।

আমি? আমাকে তো দেখতেই হয়। আমি সিনেমায় কাজ কবি জানেন না?

ফুবিযে যাচ্ছে সময়। চাযের পেয়ালায় শশাঙ্ক চুমুক দিচ্ছে আস্তে আস্তে। একটু পবেই বিল নিয়ে এসে দাঁড়াবে বয়। যা বলার আছে সাবিত্রী, এই বেলা।

তবু কি সোজাসুজি বলতে পাবল। প্রথমে জিজ্ঞাসা কবল স্টুডিও সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর। কেমন করে তোলা হয় ছবি, কথা গাঁথা হয় কি-কবে। তারপর ওনতে চাইল, কী-কী ছবি উঠছে এখন।

শশাঙ্ক বলল, একখানা মোটে। তাও কাজ এগোচ্ছে না। বাজার খারাপ। বাববার মাংস খেয়ে এ-ব্যবসা থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে সবাই।

নিজেকে থেকে শশাঙ্ক প্রস্তাব করবে, সে আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। বিল চুকিয়ে দিতে শশাঙ্ক পাঁচটাকা একখানা নোট দিয়েছে, খুচরো পয়সা এখুনি ফেবৎ নিয়ে আসবে বয়। আর সময় নেই।

মরীয়া হয়ে সাবিত্রী বলল, মল্লিকাদি বর্গছিলেন, — আপনাদের ছবিতে নাকি — নাকি একটা পা-পার্ট খালি আছে। লোক খুঁজছেন আপনাবা।

শ্রিতচোখ দু'টির ওপরে শশাঙ্কের ভূজোড়া সন্নিহিত হয়ে এল : মল্লিকা বলেছে আপনাকে? কবে?

কিছুদিন আগে। জলে নেমে আর শীত নেই সাবিত্রীর। মাথা নীচু কবে বলে যেতে লাগল, আমাদের বড় অভাব শশাঙ্কবাবু। তাই ভাবছিলাম, আমি যদি .. আমাকে যদি —

সিগারেট বার কবে দেশলাইয়ের বাঞ্চে সজোরে বাববার ঠুকল শশাঙ্ক। বলল, বড্ড দেবি হয়ে গেছে, সাবিত্রী দেবী। মল্লিকাকে যখন বলেছিলাম তখন স্বাভাবিকভাবে মায়েব পার্ট করতে পারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম আমরা। তা কাজচালানো গোছের একজনকে দিয়েই সেরেছি। সে-বই তো তোলা হয়ে গেছে, এখন মুক্তিপ্রতীক্ষায় আছে।

সাবিত্রী বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু শেষ বাজি ধবার মত সুরে বলল, আপনাদের নতুন ছবিতে কোন পার্ট খালি নেই?

আছে। কিন্তু মায়েব পার্ট তো নেই। একটা হিরোয়িন খুঁজছি আমরা। কিন্তু, — সাবিত্রীর মাথা থেকে পা অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক বলল, কিন্তু, ক্ষমা করবেন সাবিত্রী দেবী, সে পার্ট আপনাকে দিয়ে বোধ হয় হবে না।

শশাঙ্কব চোখে নিজের চেহাবাব ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেল সাবিত্রী। লজ্জার জোয়ারে সমস্ত বস্ত্র এসে জড়ো হল মুখে, পরমুহূর্তের ভাঁটায় আবার সব শুকিয়ে কাগজ-সাদা হয়ে গেল। চুল উঠে যাওয়া প্রশস্ত কপাল, কালোরেখার পরিখার আড়ালে বসে-যাওয়া দু'টি নিশ্চয় চোখ, গালের উঁচু হাড়, প্রকট কণ্ঠস্থি, শিরাবেকনো লিকলিকে হাত, সমতল বৃক্বেব কববে দু'টি বোঁটায় স্তনের এপিটাফ, এ-চেহারা হিরোয়িনেব সাক্তে না, এ-কথা শশাঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে খেয়াল হ'ল, এই আশ্চর্য।

শশাঙ্ক বলল, আমি অত্যন্ত দুর্গন্ধিত, এবার কিছু করতে পাবনাম না। তবে আপনার কথা আমাব মনে থাকবে। পরের ছবিতে যদি সুবিধে হয়, খবর দেবো।

একটা গাড়িও কবে দিতে চেয়েছিল শশাঙ্ক, সাবিত্রী নেয়নি। দ্রুত পায়ে ফিবে আসতে আসতে দোকানেব ঘড়িতে সময় দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে কখন, খুকি হয়ত উঠে খুব কান্নাকাটি কবছে। মন্মথ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিবেছে অনেকক্ষণ, সাবিত্রীকে না দেখে মুখ ওর কালো হয়ে গেছে। আজ আব বন্ধা নেই। মনশ্চক্ষে সাবিত্রী দেখতে পেল, দাঁতে ঠোট চেপে মন্মথ যবময় পাযচারি কবছে, দু'হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। সাবিত্রীকে দেখে কী কববে মন্মথ? মুখেব ওপর দরজা বন্ধ কবে দেবে? বার কবে দেবে গলাধাক্কা দিয়ে? ওব ছুকুম না নিয়ে বাড়িব বাহিবে পা বাড়ানোব অপবাধেব জনো চোঁচামেচি। কেলেক্ষবি কববে? বোঁকোর মাথায় বাড়ি থেকে বেবিযেছিল যখন, তখন এ-সব সম্ভাবনাব কথা একবাবো মনে হয়নি। সর্বনাশ হতে হলে মেয়েমানুষেব কত মতিচ্ছন্নই না হয়।

দবজা খোলাই ছিল। খুকিকে বৃক্বেব উপব শুইয়ে মন্মথ ছড়া ওঠিয়ে য়ুম পাড়াচ্ছে। দেয়ালেব দিকে মুখ ফিবিযে সাবিত্রী কাপড় ছাডল, তখনো বৃক্বেব মধো টিপটিপ কবছে। সিনেমা ভাঙল?

কী জবাব দেবে বৃক্বেব না পেবে সাবিত্রী চুপ কবে বইল।

মন্মথ হাসি মুখে বলল, আবে, জানি জানি। এসে দেখি তোমাব মল্লিকাদি খুকিকে লেবেধুস বিষ্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা কবছে। ওব কাছেই শুনলাম।

পবম প্রশান্ত মন্মথব মুখ, কী নিকন্তাপ কণ্ঠ। পায়েব নখ দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল সাবিত্রী। এব চেয়ে মন্মথ সোজাসুজি ধমক দিল না কেন, এই নিষ্ঠুর বিদূপেব চেয়ে আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধবলেও ভাল ছিল।

মন্মথ বলল, ভাল, ভাল। জুজু-বুড়ি হয়ে না থেকে নিজের পথ নিজে দেখছ, খুব ভালো। নীচু সুবে বলল, তা সুবিধে হল কিছু। শশাঙ্ক কিছু বলল?

কী বলবে?

এই ধবো কাজেব কথা। কতবকম জানাশোনা ওদের, তোমাকে একটা কাজ তো জুটিযে দিতে পারত? তা তুমিও কিছু বললে না?

না।

হঠাৎ সোজা হয়ে মন্মথ বিছানায় উঠে বসল। কঠিন গলায় বলল, জুঁবে গিয়েছিলে কেন। নিজের দরকারেব কথা ভাল করে না বললে লোকে বুঝবে কেন? :

অত ইনিযে বিনিযে কথা বলাব আমার অভ্যাস নেই।

মন্মথর বুঝি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। — অভ্যাস নেই! নেকি! কচি খুকি! নাক টিপলে দুধ গলে, না? কিসে নিজের ভাল হয়, তাও বোঝ না?

শান্তম্বরে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, কিসে?

সে কথার জবাব না দিয়ে মন্থথ বলল, শশাঙ্ক তোমাকে বাড়ীতেও পৌঁছে দিয়ে যেতে চাইল না।

চেয়েছিল। আমি রাজি হইনি।

চে-য়ে-ছি-ল। বা-জি হ-ই-নি। সাবিত্রীর কথাটাবই প্রতিধ্বনি কবে মন্থথ মুখ ভেংচে উঠল, রাজি হওনি কেন।

হলেই কি মান থাকত তোমার।

মান ধুয়ে জল খাও, পেট ভববে। তীব্রস্বরে মন্থথ বলল, কী ক্ষতি হত তোমার শশাঙ্ক যদি গাড়ি কবে পৌঁছে দিত।

পলক পড়ছে না, মণি দুটো জ্বলছে মন্থথর। সেই অগ্নিদৃষ্টির সঙ্গে চোখ মেলাতে গিয়ে সাবিত্রী চমকে উঠল। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মন্থথ ঠাট্টা কবছেন, সত্যিই বুঝি সে চেয়েছিল সাবিত্রী শশাঙ্কর সঙ্গে এক মোটবে আসুক।

একটু ছোঁয়াছুঁয়ের ঘুষ দিয়ে কাজ হাঁসিল হোক।

মন্থথ বলে যেতে লাগল, ওবা আমুদে লোক, একটু ফুর্তি চায়। খুশি হলে উপকারও করে। গুচিবায়ুর বাড়াবাড়ি কবে সব মাটি কবলে।

ছুটে গিয়ে সাবিত্রী হাত চাপা দিল মন্থথর মুখে, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ করো। বলে আব অপেক্ষা করলনা, টলতে টলতে পাশের ঘরে এসে মল্লিকার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল। মল্লিকা পাশে এসে বসল তাড়াতাড়ি, কি হয়েছে সাবিত্রী, অমন কবছ কেন।

জবাব শোনা গেল না। উপস্থিত কান্না বোধের প্রাণপণ প্রয়াসে সাবিত্রীর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেল। ওব পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মল্লিকা বলল, কী হয়েছে ভাই, আমাকে খুলে বল। সিনেমায না জানিয়ে গিয়েছিলেন বলে খুব বেশি বকেছেন মন্থথবাবু।

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল, না।

তবে কানোব কাছে মুখ নামিয়ে মল্লিকা ফিসফিস কবে জিজ্ঞাসা কবল, তবে বুঝি সিনেমার হলে শশাঙ্ক বেশি বাড়াবাড়ি কিছু কবেছে।

বাঁশিখে মুখ ডুবিয়ে সাবিত্রী তেমনি মাথা নাড়ল, তাও না।

তবে।

এ তবেরও জবাব পেলনা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটানা কেঁদেই চলেছে সাবিত্রী। কী কবে বোঝাবে কোথায় কাঁটা। এতদিন নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল শশাঙ্কর কাছে অস্তুত ওব শবীরটাব মূল্য আছে, আব মন্থথর কাছে ভেতবের মানুষটাব, মল্লিকাকে কেন, কাউকে কোনদিন বলা যাবে না, কত বড় দুটো ভুল আজ একদিনে ভেঙে গেছে।

প্রতিপক্ষ

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ

ভোর ভোর ঘুম ভাঙ্গল পরান মুচির। ঘাড় ফিঁরিয়ে দেখল বন্ধ ঝাঁপেব ফাঁকে সরু একচিলতে ধোঁয়াটে আলোর রেখা। কাক-শালিখরা একে-দুয়ে মিলে এ-গাছে ও-গাছে ‘পাখিসব-করে-বব’ সাধতে শুরু করেছে। পরান আজকাল এত সকালে মাচা থেকে নামে না। চৈতমাসের দ্বিতীয় পক্ষ এখন। এখনও দিন-রাতের সন্ধির সময়টায় একটু গা-শিব্শিব হাওয়া দেয়। আবহাওয়ার এইটুকু হেরফেরেই হাঁপানি টান ওঠে। দুবছর ভুগে ভুগে এখন টান ওঠার ধরা-বাঁধা সময় কিছু নেই। তবু ভোরবেলার টানটা নিত্যকার ব্যাপার। বিশেষ করে ঋতু বদলের কালে। একটা অদৃশ্য হাত গলার নলিটা চেপে ধবে। শ্বাসনলিটা সংকুচিত হয়ে যায়। আর তখন প্রাণপক্ষিটা একটু হাওয়াব জন্য বুকের খাঁচাব মধ্যে পাখা ঝাপটাতে থাকে। পবান তখন পক্ষিটাকে খাঁচায় শান্ত বাখাব জন্য হাঁ-করে শ্বাস টানতে টানতে প্রাণপক্ষি হাঁপায়। তার বিশ্বাস একটা অপদেবতা গলায় চেপে ধবে প্রাণপক্ষিটাকে বেব কবে নেবাব চেষ্টায় বার বার আক্রমণ করে। একগোছা মস্তপুত তাবিজ-কবচ ধাবণ কবেও রাক্ষসটাব আক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। পরান রাক্ষসটাব নাম দিয়েছে নলিবাক্ষস। বাক্ষসটা তাকে পর্যতিরিশেই ষেটেব বুডো কবে মজুবখাটাব শক্তিও শেষ কবে দিয়েছে।

মেঝেতে চাটাই বিছিয়ে শোয় বৌ সৌরভী ছয় ও চাব বছরের ছেলেমেয়েকে নিয়ে। ফবসা হতেই সৌরভী উঠে মোটা তাঁতের শাড়িটা টেনেটুনে গায়ে জড়িয়ে ঝাঁপ খুলে বাইবে গেলে পবান নিশ্চিন্তে পাশ ফিরল। সৌরভী এখন মাঠ ফিবে যাবে রানাবাড়ি। ঐ বাড়িব ‘বাব’ কাজের নি সৌরভী। প্রথমেই মস্ত উঠোন ঝাঁট দেবে। ততক্ষণে বাড়িব মেয়েছেলেবা কেউ উঠে উঠোনের কোণে মস্ত একপাঁজা কাঁসা-পেতলেব বাসন, ডেগ-কড়া এঁটোকাঁটা সমেত জুড় কবে বাখবে। সৌরভী সেগুলো নিয়ে বাড়িব সামনে পুকুরবাটে গিয়ে ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে ঘসে ঘসে মাজবে। ঝকঝকে করে মেজে এনে বাল্মাঘরের বাইবে বাখবে। তখন মেয়েরা কেউ ধোয়া বাসনের উপর এককলসি জল ঢেলে দিয়ে অছুং-দোষ কাটিয়ে ঘরে তুলবে। তারপর সৌরভী পাবে আধকৈজির মত মুড়ি। মুড়ি আঁচলে নিয়ে বাড়ি এসে ভাগ কবে খেতে দেবে পরান ও ছেলে-মেয়েকে। নিজে শিকা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে খাবে পান্তা। পান্তা খেয়ে আবাব গিয়ে ভাবী কাজ, ধান সিদ্ধ করে শুকুতে দেওয়া, ভানার কাজ বা কাপড়-চোপড়-মশাবি কাচাকাচি প্রভৃতি নানা কাজে দুপুর গড়ায়। তখন গামলায় কবে নিয়ে আসে ভাত, বাটিতে ডাল আর খাঁট। তা কম না। প্রায় তিনপো কেজি চালের ভাত। ভাগ করে খেতে আধপেটা ক্ষুধা মেটে। বাকি আধখানা পেট ভরতে পঞ্চায়তের ‘ভোলৈব’ চাল ভরসা। পশুপতি রানার কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পরান হাঁপানিতে ভুগে ভুগে স্থায়ী ডিম্বাঙ্গীবা তালিকাভুক্ত হয়েছে। ডালের চাল সব সপ্তাহে না পেলো হাঁড়ি চাপে না। তখন পশুপতির দয়া ভরসা।

পশুপতি গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পেশায় পুরোনো এল. এম. এফ ডাক্তার। একসময়ে ভাল পশার ছিল। এখন পাশের গ্রামে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে অবধি রোগী তেমন জোটে না। অবশ্য তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি তেমন কিছু হয়নি। পেশাটা উপরি, চাষবাসই প্রধান। তাছাড়া পেশাটা গ্রামা মানুষের কাছে মানও আদায় করে। নইলে চম্পিশ বিঘা এ রাজ্যের সবচেয়ে সরেস দোয়াশলা জমি এখন ভাড়া-করা ট্রাক্টরে গভীর চাষ দিয়ে শ্যালোতে সেচ দিয়ে, পটাসিয়াম-নাইট্রোজেন সার আর পোকামারা ওষুধের কারিকুরিতে সারা বছর অপরিপাক ফসল দেয়। ইউরিয়া-ফসফেটের চাপানে আলু-কপি-শালগম আর আমন-বোরো-গমের পাহাড় দিচ্ছে। পশুপতির বড়ছেলে সেই 'স্পেশাল কেডার' আমলের প্রাথমিক শিক্ষকের পাকা চাকরি ছেড়ে, আর ছোটছেলে ক্রাশ টেন-এর পড়া ইস্তাফা দিয়ে মুনিষ-চাকর খাটিয়ে চাষ সামলায়। তাতেই পশুপতি ফসল উৎপাদনে 'আদর্শ চাষী' অভিজ্ঞান ও রৌপ্য পদক লাভ করেছে।

পশুপতি ইউনিয়ন বোর্ডের আমলে একদফা প্রেসিডেন্ট ছিল। দাপটে রাজ্যপাট চালিয়েছে। জমানা পাশ্টে যেতে বেশ কিছুকাল মাথা নিচু করে নয়া জমানার হালচাল দেখে নিয়ে সময় বুঝে ভোল পাশ্টে ডিগবাজি খেয়ে আবার মাথা তুলেছে। কথায় আছে, জঙ্ঘরিবাই শুধু খাটি জহব চেনে। তখন দারিদ্র্যদুরীকরণে কেন্দ্র-রাজ্য মিলে উঠেপড়ে লেগেছে। গ্রামাঞ্চলেও নানা পরিকল্পনায় থোক টাকা মঞ্জুর হচ্ছে। তাই পঞ্চায়েতওলো অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পুরোনো অভিজ্ঞ (আড়ালে লোকে বলে পুরোনো পাপী) পশুপতিকে দূরে রাখা চলে না। ঝটিতি উপপ্রধান করে নিয়েছে তাকে।

পরান মুচি যদি কোনো গ্রুপ থিয়েটারেব গেয়ো-গবিব নায়ক হতো তবে পশুপতিকে সাজানো যেত খলনায়ক। যদিও সিনেমাব মত ফাইট দিবার অনুকূল পরিস্থিতি নেই। যদি বা থাকে তা কিছুটা আছে পবানোব বোগক্লিষ্ট শবীর থেকে মনে ও পশুপতির চরিত্রের লাম্পটোর ঝোকেব মধ্যে।

পশুপতির বয়স ষাটের দিকে অনেকটা এগিয়েছে। লম্বা না হলেও নাতিহ্রস্ব। তবে দীর্ঘ-পাশে খুব মোটা না হলেও ঘাড়ে-গর্দানে পালোয়ানসুলভ। মস্ত গোল মাথাটা প্রায় ন্যাড়া। চওড়া চোখাল ও নাকেব পাটা, আব পুক একজোড়া ঠোট চরিত্রের একদিকের ইঙ্গিত দেয়। ঊঁটাব মত দুটো গোল চোখ একটু লালচে আর মস্ত ভুঁড়ি দেখে তাকে দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক মনে হলেও আসলে কিছুটা মতলববাজ আব তান্ত্রিকসুলভ পঞ্চ ম-কারে আসক্তিও একটু বেশি। বিশেষ কবে প্রথম দুটি ম-কাবে। তবে চরিত্রে দয়ামায়াও আছে। দয়াদাক্ষিণ্য ও লাম্পটা বলা যায় সমান সমান। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে পশুপতি বাড়ি ছেড়ে পুকুরের অপব পাড়ে সদর রাস্তার কাছে তার ডাক্তারখানায় থাকছে। তা নিয়ে কিছু কিছু কানাঘুঘো চলছে ইয়ারবন্ধুদের মধ্যে। আব খি-চাকররা সবাই ছোটলোক বা অচ্ছুং। তারা কিছু জানলেও মুখ খোলে না।

মুচিপাড়ার মানুষগুলো পশুপতির খাতক। তার ভ্রমিতে মুনিষ-খাটা থেকে পঞ্চায়েতের ডোল পাওয়া সবই তার অনুগ্রহ-নির্ভর। ভয়ে-ভক্তিতে আর নিজেদের তৃণজ্ঞানে তাকেই পঞ্চায়েতের ভোটে জেতায়। নিজেদের মুখপাত্র করে। পশোডাক্তারের বিরোধী পক্ষ তাকে 'মুচিদের 'ভক্ষক' বললেও ওরা নিজেরা বলে, চবিত্তির না থাক, তাঁর খেয়েই বাঁচি যখন তখন তিনিই আমাদের 'রক্ষক'। কার্যত সমস্ত মুচিপাড়াই পেটের ভাতের জন্য বাঁধা পড়ে গেছে পশুপতির কাছে। এটুকু খলনায়কের পশ্চাৎপট।

পরান এই আর্থিক শৃংখলের বাইরে ছিল না আগে। যখন পশুপতির রাখাল (স্থানীয় ভাষায় 'বাগাল') ছিল, এবং পরে বড় হয়ে যখন তার ভ্রমিতে মুনিষ খেটেছে তখন মাথা

সোজা করে পশুপতির দিকে তাকাতে পারত। সেই মাথা এখন পশুপতির পায়ের তলায় রাখতে হয়। মন না চাইলেও পশুপতির দয়া পেতে তাব মন যোগাতেই সৌবভীকে দিতে হয়েছে বারকাজেব জন্য। নইলে বড় গৃহস্থবাড়ির কাজ বাগদি মেয়েবাই পায়। রোগে যত কাহিল হচ্ছে পবান, পশুপতির উপর বাগ-দ্বেষ তত বাড়ছে মনে সৌবভীর কাবণই। বৌ কি শেষে বেদখল হবে? পশোডাক্তার বলে দিয়েছে, খবরদার, বৌয়ের সঙ্গে শুবি না। উদ্ভেজনা হলেই মববি।

পবান শুনে মনে মনে চটলেও নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে পৃথক না শুলে সহজেই শরীব উদ্ভেজিত হয়, আর তাতে বুক ধড়ফড় করে। তা থেকে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। যতই পঙ্গু হচ্ছে দিন দিন ততই ঈর্ষা আব সন্দেহ বাতিক বাড়ছে। উপার্জনের মূবোদ না থাকায় আব বৌয়ের ভাতে ভাগ বসিয়ে মুখ খোলার সাহসও আর নাই। তাই একা ঘরে বসে সাবা বিশ্বসংসারের উপর ঝাল ঝাড়ে গাল দিয়ে। গাল পাড়ে নিজের মবা বাপকে এবং নিজেকেও। বাপের উদ্দেশ্যে বলে, শালা ছিদেম পয়সাও রেখে যাওনি, শুধু দিয়ে গেছ তোমাব হাঁপানি। নিজেকে বলে, মব্ শালা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়, ল্যাঠা চুকে যাক্। আব কদিন নলিবাক্সসটার সঙ্গে যুদ্ধ করে মাগেব ভাত খাবি? পশুপতির উদ্দেশ্যে বলে, শালা মা মেগো, নিজের পুতের বৌকে নেশাব মৌজে জড়িয়ে ধরেছিলি। তাই না তোব ধুমসি বৌ ঝাঁটা তুলে তোকে ডান্ডাবখানা সই করে দিয়েছে। ঘরের কিস্তি চাপলেই চাপা থাকে না। শালা মুচিপাড়ার বৌ-ঝিদেব তুমি রাত করে ডান্ডাবখানায় গিয়ে চাল নিতে বল। এ-বেলা অচ্ছুং মানো না। তা নিয়ে না শাওনমাসে মনসাপুজোব আগে সঙ-এব গান বেঁধেছে শাখাবীদের শীতল ওগো পাড়াব দলেব লেগে—কালোব ঘবে ধলো ছেলে কেমন করে হয় গো/ অন্ধকাবে অচ্ছুংপাডায় লুকিয়ে কে যায় গো। মাঝে মাঝে অচ্ছুংপাডায় কালো কালো মানুষগুলোব ঘবে ফর্সা ফুটফুটে বাচ্চাব ভন্ম হয়। সৌবভী ভেমনি ফর্সা বং নিয়েই বৌ হ- এসেছিল। এখন দুটি সন্তানের মা, তবু ঐ বঙেব জৌলুসই ভদ্রপাডাব অনেকের চোখ টানে।

ভাববেলা শুয়ে শুয়ে পবান নলিবাক্সসটার দিনের প্রথম দফা আত্রমণের প্রতীক্ষা করছিল। একবার হাঁপ উঠে মিনিট পনেবো জোব লড়াই করে বাক্সসটাকে তাড়িয়ে দিয়ে কয়েক ঘন্টা একটু স্বস্তি মেলে। সে-ফাঁকে গরুর চামড়া ছাডাবাব ছুবিটাকে বালিতে শান দিয়ে ধাব করে রাখবে। আগেব বাতে দানোদের একটা গাইয়ের বিয়াতে গিয়ে বাছুরেব একটা চ্যাং আগে বেবিযে আসাতে আর খালাস হয়নি। সে অবস্থায় পড়ে গিয়ে ঘন্টা তিনেক চাব পা ছুড়ে দাপিয়ে মবে গেছে। মরলে হিন্দু গ্রামের লোক আস্ত ভাগাড়ে ফেলে। ভাগাড়ে চামড়া ছাড়িয়ে নিবাব হক্ একমাত্র পবান আব তাব খুডতুতো ভাই নাবানেব। ঠাকুরদাব আমল থেকে জমিদারের হুকুমনামাব অধিকাৰে। চামড়াটাব দামেব অর্ধেক ভাগ পেলেও দুবেলা কিছুদিন বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে পেটপুবে ভাত খেতে পারবে। পবান ঘাড় ফিবিযে দেখল ঝাঁপেব সরু ফাঁকে উঠোনে একটু যেন কাঁচা বোদেব ছিটোফাঁটা গাছগাছালিব কাঁকে ঢুকে পড়েছে। ছেলে-মেয়ে তখনও জাগেনি। ভাগলেই তো খাওয়ার জন্য ঘ্যান্ ঘ্যান্ শুক কববে। সৌবভী মুড়ি নিয়ে না আসা পর্যন্ত ঘুমুক না। .. এসব ভাবতে ভাবতে পবান উঠে পড়ল। মাচার অনেকটা উপবে একটা ছোট তাকে একটুকরো অয়েলক্লথ মুড়ে রাখা থাকে একফুট লম্বা ও দুইঞ্চি চওড়া ফলার মস্ত ছুরিটা। অবশ্য প্রতিবাব চামড়া ছাড়িয়ে একটু টাটকা গরুর চৰ্বি মাখিয়ে রাখে। তবে ভাগাড়ে মরা গরু পড়ে নমাসে-ছমাসে একটা, ততদিনে চৰ্বিটুকু পিঁপড়েয় শেষ করে।

ছুরিটা পাড়তে উঠেই পরান টের পেল নলিচাপা বাক্সসটা গলায় থাবা বাড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বালিশে দুহাতের কনুই ও দুখাবার মধ্যে মাথা রেখে

আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল আক্রমণ ও প্রতিরোধ চেষ্টা। সে কি টান! প্রাণপক্ষিটা ছুটুফুটিয়ে একেবারে প্রায় বেবিঘে আসাব উপক্রম করে। মিনিট কুড়ি লড়াই করে তবে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়। তাবপরও কিছুক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস টেনে গামছা দিয়ে মুখ-চোখ মুছল। যাক, ভোরবেলাব পর্ব শেষ হল।

ছুবিটা পেড়ে নিয়ে দাওয়ায় নেমে পবান শানকাঠে মিহি বলি দিয়ে ভালবকম শান দিয়ে চকচকে কবে ফেলল। ডগাটা সব ছুঁচোলো। ভোঁতা ডগা চামড়া ছাডানো যায় না। ছুবিটাব ধাব আঙুলে পরীক্ষা কবতে কবতে পবান নলিবাক্সসেব উদ্দেশ্যে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে স্বগতোক্তি করল, শালা এখন তোকে পেলে এই ছুবির ডগা দিয়ে তোর নলি ফুটো কবে মেবে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ডগডুগি বানাতাম। —অবশ্য পরান জানে তা সম্ভব না। কাবণ রাক্সসটা থাকে অদৃশ্য। অনেকটা গল্পের নিয়তির মত। নিয়তি অদৃশ্য থেকে কখনও বাঘ হয়ে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে খায়, কখনও কুমির হয়ে জলে টেনে নেয়, কখনও শরীবে ঢুকে হার্টফেল কবায কিংবা ধীরে ধীরে রক্ত শুষে মাবে (পবান বাস-ট্রেন-বিমান-নিয়তির কথা শোনেনি)। কখনও তাব মনে হয় রাক্সসটা একটা অতিকায় মাকডসা। দেশ জুড়ে এমন একটা মাযাজাল তৈরি কবে ঝুলিয়ে রেখেছে যে জালে শুধু পরানের মত হা-ভাত ঘো-ভাতবাই আটকে যায়। —এসব জটিল তত্ত্বকথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কাজেব মতলব মাথায এল। গকটাব চামড়া ছাডাবাব সময় ভাগাড়ে বসেই যদি নলিবাক্সসটা আক্রমণ কবে তবে মহা বেকায়দায় পড়তে হবে। এ-বেলাই পশোডাক্তাবেব কাছে কেঁদেককিয়ে একটা হাঁপেব ইন্সেকশন নিতে পাবলে সাবা দিনেব মত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। আগেও অনেকবাব বেশি ঘন ঘন শ্বাসকষ্ট হলে পশোডাক্তাবেব ইন্সেকশন দিয়ে সাময়িক আবাম দিয়েছে। কাবণ যাই হোক পবানের উপব একটু নেক্নলব আছে ডাক্তাবেব। তাব কাবণ না বোঝাব মত মূর্থ না পবান। তবে তাব সুযোগটুকু নিতে বাধ্য হয় বুঝেও। যা হোক এখন গকটাব চামড়া ছাড়িয়ে আনাব গবত পবানেব। চামডার দাম অর্ধেক পেলেও অনেকদিন তাব নিজেব হাতে কিছু উপার্জন হবে। সেটা কাজেব মানুষ আকাজে হযে এখন বোঝে কি আনন্দেব বিষয়। নারান তো মুনিষ খেটে সংসার চালায। এ-কাজে একেবারেই আনাড়ি। ঠিকমত ছুবি চালাতে শিখতে এখনও ঢেব দিন লাগল। পবানই ছুবির কাজ করে। নাবান শুধু চামড়া টেনে ছাডাতে হাত লাগায়। আগেব দিন বাতেই পবান তাকে বলে রেখেছিল গক মবলে ভাগাড়ে ফেলে কিনা দেখতে।

সৌরভী মুড়ি নিয়ে এলে মুড়ি খেয়ে পরান গিয়ে হাজিবি হল পশোডাক্তাবেব ডাক্তারখানায়। মনে মনে যতই গাল দিক পশুপতির সামনে পরান কেঁচো। পশুপতি একাই ছিল। পবান মেঝেতে বসে হাতজোড় কবে নিবেদন করল, এ যাত্রা আব বাঁচবনি। বড্ড কষ্ট দিচ্ছে এজ্ঞে হাঁপানিটা। উঠতে বসতে টান উঠছে। দয়াধন্য করে যদি একটা ইঞ্জিসান ফুঁড়ে দ্যান তো এটু আরাম পাই।

পশুপতি তখন সবে কেজিখানেক মুড়ি দু লিটার সদ্য দোয়া কাঁচা দুধে একথাবলা গুড়সহ মেখে খেয়ে প্রাতঃভোজন সেবে খাটে আধশোয়া হয়ে গড়গড়ার নলে মুখ দিয়েছে। এক দমক তামাক টেনে বলল, তুই হতভাগা দেখছি আমাকে ফতুর কবিবি। ইন্সেকশনের দাম অনেক বেড়ে গেছে। একটা পাঁচটাকা। তোর এদিনে ষাট-সত্বে টাকা ভেজেছে। গায়ে খেটে শুধতেও তো পারবি না। তবে শুধবি কি করে?

পবান বাইরে মুখটা মরো-মরো করে রাখল। মনে মনে বলে চলল, শুধতে পারব না জেনেও তো দিচ্ছ। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার গরজ তোমারও। আমি মরার পর বৌয়ের যদি পেটে বাচ্চা আসে, সবাই আঙুল তুলে দেখাবে তোমাকে। সঙ্কের গান বাঁধবে তোমাকে

নিয়ে। বামুনপাড়ার ফিচলে ভৈরবঠাকুর বলে, অঙ্ককার হল গঙ্গাজল। অঙ্ককারে কে বা মুচি আর কে বা বামুন। শুধু আলো জ্বলে মুখটি দেখা চলবেনিকো। মুচিরা হল অচ্ছুদের মধ্যেও সবচেয়ে নিচের থাকে। অন্য সব অচ্ছুৎ জাতের গোমাংস খেলে জাত যাবে। কিন্তু মুচি গরুর চামড়া ছাড়িয়ে যদি সেই গরুর মাংস এনে খায় তবে জাত যাবে না। তবে নিজেরা গোহত্যা করবে না। এই হল শাস্ত্রের নির্দেশ। সেই মুচির ঘরেই কিনা উঁচু জাতের—। ফিচলে বামুন ভৈরব নিজেই ইঙ্গিত দেয়।

পরান তিতো খাওয়া মুখ করে প্রসঙ্গ পাশ্টে বলল, এ হুণ্ডায় ডোল নিয়েও বাহানা করছে। পাই কি পাই না—এবারে মনে লয় না খেয়ে মরতে হবে।

পশুপতি তামাক টানা শেষ করে নল পেঁচিয়ে রেখে বালিশে কনুই রেখে কাত হল। সঙ্গে বিরাট ঢাকের মত ভুঁড়িটিও কাত। খালি গায়ে শুধু একটা সস্তা গেকুয়া বাদামি লুঙ্গি। পরানকে ভাটা চোখে একটুকাল নিরীক্ষণ কবল। পরান যেন বিড়ালের থাবায় ধরা পড়া নেংটি ইঁদুর। বলল, তাদের পাড়ায় কজনোর ঘবে হাঁড়ি চাপে উনুনে ডোলের চাল না পেলো? তাদের দারিদ্র্যসীমার উপরে তোলা শিববৎ অসাধি। জাত-পেশা তো সবাই ছেড়েছি। শিল্প-ঋণ দিলেও ভেসে খেয়ে ফেলবি। এখন যা, পরে দেখব ডোলের ব্যাপার— তোর বৌ ডাক্তারখানায় ঝাঁট-ন্যাতা দেয় না কেন বে? আমি কি আলাদা গৃহস্থ? আজ সন্ধ্যাবেলা এ-ঘরে মিটিং বসবে পঞ্চায়েৎ কমিটির। বৌমাকে বলবি গিয়ে এখনই দুপুরেব মধ্যে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। তখন আমার স্টকের বস্তা ঝাড়া চাল যা আছে দিয়ে দেব'খন।

পবান দানাদের মবা গরুটাব কথা একদম চেপে যাবে ভেবেছিল, চাল দিনে-দুপুরেই এরকম অযাচিত পাবে শুনে খুশি চেপে রাখতে পাবল না। বলল, কাল বেতে দানাবাড়িৰ একটা গাই বিয়েতে গিয়ে ঝাঁধকে মরেছে। আজ ঠিক ভাগাড়ে ফেলবে। চামড়াটা পেলো কিছু রোজগার হয়। একটা ইঞ্জিনান ফুঁড়ে দান যদি তবেই ভবসা কবি ছুবি ধবতে।

পশুপতি পরানকে চোখ ছোটো কবে দেখে। পবান বোঝে ডাক্তার মনে মনে কি একটা মতলব ভাঁজছে। একজোড়া ভীমেব মত তার উরুত একটাব উপর আবেকটা একটু একটু খেলছে। পরান মনে মনে বলল, তোমার জোড়া মুওরের কাচাকলে পেয়াই কবার লেগেই তো মুচিপাড়ার বৌ-ঝিগুলারে রাত করে তোমার ডাক্তারখানায় ইস্পিশাল ডোলের চাল নিতে আসতে বল। অঙ্ককারে লুকিয়ে না নিলে অন্যথাও দেখে চাইবে। সবাইকে এককথাই বললে কি আব গোপন থাকে? সবাই জানে ঘরে ভাত নাই তো বৌ-ঝি যাকে হোক পাঠাও একটু রাত কবে। রাত নটা-দশটাই এখানে অনেক। তা জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না ভাব দেখায়। অঙ্ককাব নাকি গঙ্গাজল।

পশুপতি ভেবেচিন্তে বলল, দানারা গরুটাকেভাগাড়ে ফেলবে ঠিক জানিন্স? যদি পাইকেবকে চামড়ার দাম ধরে বেচে দেয়? একটা পুরো বয়সের গরুর চামড়ার দাম এখন সাত-আটশব কম হবে না। পাইকেরকে বেচে দিলে গরুর লাশ গরুর গাড়িতে তুলেই নিয়ে যাবে।

এমন সম্ভাবনাব কথা শুনে পরান কিছুক্ষণের জন্য থ হয়ে থাকল। তারপর বলল, সে কি কতা ডাক্তারবাবু? মরা গরু ভাগাড়ে ফেলবে, আমরা চামড়া ছাড়িয়ে নিবো— এই ঠোঁ নিয়ম। এখন জমিদার না থাক পঞ্চাৎ তো আছে? আপুনি পঞ্চাতে থাকতে ইটা কি কবে হয়? তা বাদে বাগানে শেয়াল আর গাছে শকুনগুলা আশা করে থাকে। তাদিগেরকে মরাগরুর মাস খেতে না দিলে তো গিরস্তের অকেলোন, গ্রামেরও অমুঙ্গল। ইসব শাস্ত্রের কতা।

পশুপতি মোটা গর্দানের উপর হাঁড়ি-মাথা নেড়ে ভাঁটা চোখ এতক্ষণ গোল কবে বলল, থাম। শাস্ত্রের শোনাতে হবে না তোকে আর। ওসব জমিদারির সঙ্গেই বরবাদ হয়ে

গেছে। আসল কথা তোরা হলি আমার ভোটার। প্রকাশ দানা আমার কাছে ভোটে হেরে গেল না এবার পঞ্চায়েতের নির্বাচনে? তাইতে মরা গরু পাইকেরকে দিয়ে তোদের মুরকবি বলে আমাকেও জন্ম করবে ভাবছে হয়ত। 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখায়' বলে না, সেরকম আর কি। প্রকাশ দানা হলো মহাবড়েল। আচ্ছা আমি চকৌদারকে বলে দেব, এখনই আসবে। গাঁয়ের মধ্য দিয়ে মরা গরু নিতে দেব না।

অতঃপর পশুপতি পরানকে একটা এড্রোনালিন ইন্জেকশন ফুঁড়ে দিয়ে বলল, যদি চামড়াটা আদায় হয়, অর্ধেকদাম থেকে আমার ইন্জেকশনের দাম শুধবি। বিনিপয়সার ওষুধে রোগ সারে না। বৌমাকে গিয়ে পাঠিয়ে দে আমাদের বাড়ি থেকে। এই ঘরে ন্যাটা দিয়ে যেতে বলবি।

পরান জিভে জোন্দা স্বাদ নিয়ে বেরিয়ে এল। যেতে যেতে তার স্বভাব ফিরে পেল। পশুপতিকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে সওয়াল শুরু করল : তুমি শালা কদিন আগে তোমার পুতের বৌকে বৌমা-বৌমা করে নেশার বৌকে আদর করে একেবারে জাপটে ধরেছিলে। শালা এসব খবর হল কয়লার আঙুন, কাপড়ে চাপা থাকে না। এখন মুচিবৌয়ের দিকে নোলা বাড়াচ্ছ। আমার বৌয়ের রংটা ফর্সা, তাইতে চোখ পড়েছে। ইদিকে বল বৌমা। ইঞ্জিনের টাকা আমিও দোব তুমিও নেবা। ...

বাড়ি ফিরে পরান দেখল এর মধ্যেই নারান মুনিসের কাজ ছেড়ে ফিরে এসে ওদের দাওয়ায় বসে পাস্তা খাচ্ছে। সে দেখে এসেছে দানারা মরা গরুটাকে ভাগাড়ে ফেলেছে। তাই কাজ ছেড়ে চলে এসেছে।

পরান তাড়াতাড়ি ছুরি আর একটা ধামা নিয়ে ছুটল ভাগাড়ের দিকে। নারানকে বলে গেল জলদি যেতে। ডাক্তার ভয় ধরিয়ে দিয়েছে মনে। গরুটার আশুত দখল না পেলে স্বস্তি নাই। ভাগাড় গ্রামের বাইরে মস্ত একটা বাগানের শেষ প্রান্তে। বাগান জমিদারের ছিল, এখন খাসের। গাছ আগেই অনেক কেটে নিয়েছে। এখন জংগল আর শেয়ালদের অভয়ারণ্য।

পবান গিয়ে দেখল গোটা দশেক শেয়াল গরুটাকে ঘিরে বসে পাহারা দিচ্ছে। ওরা জানে পরান গিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে নিলে তবে ওদের ভোজ। মুচিপাড়ার মানুষগুলোর মতই কখনও বা টানা উপোস দেয় ওরা। তাতে গৃহস্থর হাঁস-মুরগী দু-চারটা চুরি করে খায়। পরান তাতে দোষ দেখে না ওদের। ওরা স্বাধীন, কুকুরের মত প্রভুর পায়ে দাসখত দেয় না। প্রভুর পাতের প্রসাদ খায় না, আর বেত খেয়ে কাঁদে না। অন্যের ছকুমের গোলাম না শেয়ালরা। 'তু' কবলে কাছে যায় না, 'ছু' করলে তেড়ে আসে না। ... এসব প্রশস্তির কথা ভাবতে ভাবতে ছুরিটা ছোরার মত তামেচা-বেহরা করে এগোয় পরান। শত হলেও নখীদস্তী ওরা। মুখে বলে, সরে যাও বাবাসকল, দশ হাত দূরে সরে বস। আগে আমার কাজ সারতে দাও।

পরান মুখে অনর্গল কথা বলে শেয়ালগুলোকে ভয়ে রাখে আর নিজের ভয় তাড়ায়। ওরা কিন্তু বাধা ছাত্রের মতই হাত দশেক সরে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। কোনো কোনোটা হাই তুলে হাঁ করে দুপাটি চক্চকে দাঁত দেখিয়ে যেন অধৈর্য ভাব প্রকাশ করছে। পরান একা কাজ শুরু করতে সাহস পায় না। ওরাও খুবই ক্ষুধার্ত, যদি ছুরি চালাবার সময় মাংসের গন্ধ পেয়ে খেপে গিয়ে সবগুলো একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে? পরান আড়চোখে গরুটার চামড়ার সাইজ জরিপ করে, আর হাত তুলে শেয়ালদের উদ্দেশ্যে মুখ চালিয়ে যায়।

গরুটার সাইজ বেশ বড়। বাছুরের ঠ্যাংটা একইভাবে বেরিয়ে আছে। পাছটা ফুলে ঢোল। আর যথার্থ অর্ধেই ল্যাজে-গোবরে লেপটে আছে। পরাণ প্রথম গলার নলিতে ছুরি বসাবে। নারান মাথাটা একটু তুলে ধরবে আর পরান ছুরিটা চোয়ালের ঠিক নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে যতটা সম্ভব উপরে তুলে চামড়া ঝাঁচিয়ে চালাবে। তারপর চার পায়ের চামড়া খুরের উপর পর্যন্ত চিরে দেবে। শেষে পেট বরাবর গলা থেকে পাছার দিকে ছুরি টেনে নামাবে।

... এসব অভ্যস্ত কারিগরি ভাবনার সঙ্গে মুখও চালায় সমানভাবে। বলে, একটু ধৈর্য রাখ বাবাসকল। নাবানে এল বলে। কাজটা মনে কর খুব সহজ নয়কো। চামড়া খসানো জানবা খুব সোজা না, ছোরম আছে একাজে। বাছুরে চোখ দেবা না। ওটার চামড়ায় একডজন ডুগডুগি হবে। রথের মেলায় একটা পাঁচটাকা করে বেচব। বেশি দাম ষাঁড় টাকার কি আর সেকাল রেখেছে কর্তাবা? টাকায় আটসের চাল ছিল এক সময়, এখন একসের আট টাকা। তোরা ভাত না খেয়ে ভাল আছিস বাবাসকল। যাক সেকথা, এখন শোন, বাছুরের বিজলি কাট মাস নুন মেখে রোদে দিয়ে শুকিয়ে হাঁড়িতে রাখব। বর্ষাকালে চাল জুটলে ঝোল, না জুটলে শুধু পুড়িয়ে খাব। তা বাদে গরুটার দাবনার মাস দুভাই দুকেজি নোবো। বাকিটা তোমাদিগের। তবে শকুনরাও কিন্তু নাড়িভুঁড়ির হকদার, ওদিগে বঞ্চিৎ করবা না।

তখন নারান এল ওর থামা ও একটা লাঠি নিয়ে। পরান ওকে বলল, লাঠিটা একপাক ঘুরোয়ে দে। শেয়ালগুলো এত কাছে থাকা ভালো না। যাও বাবাসকল, আরো বিশহাত পিছোও। রান্না হলোই পাত পড়বে। এখন পিছোতে বাবু হয়ে বসে থাকো সব।

নারান জানে, পরান শরীর ভাল থাকলে অমন বক্ বক্ করে। বোধ হয় ডাক্তারবাবু ইন্সপেকশন ফুঁড়ে দিয়েছেন। শরীর ভাল না থাকলে মুখ গোমড়া করে গুম্ মেরে থাকে। নারান কাজে হাত দিল বিনা বাকো।

সন্ধ্যার পরই রান্না করেছে সৌরভী সেই মাংস পেঁয়াজ-রসুন-লংকার ঝালে ঝোল আর পশুপতির বস্তা-ঝাড়া কেজিদেডেক চালেব ভাত। দুপুরে ডাক্তারখানায় নেতা দিতে গেলে পশুপতি ঐ চাল দিয়ে বলে দিয়েছে, এখন এ চাল নিয়ে যা। ঘণ্টাচারেক রাতে আসবি। তাব আগে মিটিং শেষ হলে আমি খাব। তারপর এলে চার কেজি ডোলের চাল আমিই দেব। — শুনে অবধি কথাটা গলার কাঁটার মত ঢোক গিলতে খচ্ করে বিঁধেছিল পবানের। তাবপর ভাত-মাংসে পেট ভবতে শরীরের সঙ্গে মনও এলিয়ে পড়েছে মাচাসই হয়ে। শুয়ে শুয়ে চোখ বড় করে দেখতে দেখতে তার মনে হল সৌরভী'ব চলাফেবায় আজ যেন একটু বেশি ছুটফটে ভাব। ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে শুয়ে পড়ার জন্য ধমকধামক দিয়েছে আজই প্রথম। নিজেকে উন্টো দিকে ফিরে বসে খেলেও মনে হল বেশ তাড়াতাড়িই হাত চালাচ্ছে। শেষে হাঁড়ি তাকে তুলে দিয়ে এঁটো বাসন ও বাতি নিয়ে মাজতে চলল ডোবার ঘাটে। বাইরের থেকে দরজায় ঝাঁপও টেনে দিয়ে গেল। ঘরে অন্ধকার নামতে পরানোর দুচোখও অন্ধকারে বুজে গেল।

রাত তখন হয়ত দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে সবে, কিসব হিজিবিজি স্বপ্ন দেখে ঘুম চটে গেল পরানের। অনেক দিন পর কড়া মাংসের ঝোল পেটে পড়ে পেট গরম হয়ে মাথাও গরম হয়েছে। চ্যাট্‌চ্যাটে ঘাম সারা গায়ে। ঘরের মধ্যে থল্‌থলে অন্ধকার। পরানের চোখে পড়ল দরজার ঝাঁপের মুখে আঙুল আষ্টেক ঝাঁক। বাইরের ক্ষয়া চাঁদের আলোর চওড়া একফালি খানিক ঢুকে পড়েছে দাওয়ায়, দেখা যাচ্ছে। দরজায় বাঁশের ছড়কোটা তুলে দিলে এক আঙুলের বেশি ঝাঁক থাকে না। তখন মনে পড়ল সৌরভীর রাত দশটা নাগাদ চাল আনতে যাবার কথা। তবে কি ডাক্তারখানা থেকে সৌরভী আর ফেরেনি রাতে? প্রশ্নটা মনে জাগতে বুকের খাঁচাসুদ্ধ কেঁপে উঠল পরানের। উঠে বসে মাথা নুয়ে কান পাটল নিচের দিকে। একটু যেন ছেলে-মেয়ের মিহি নিঃশ্বাস শুনতে পেল। কিন্তু বড়দের ভারী নিঃশ্বাস না তা। সৌরভী যে ফেরেনি তার অকাটা প্রমাণ ঝাঁপ বন্ধ করে ছড়কো দেয়নি।

পরান কিছুক্ষণ নিশ্চল বসে থাকল। একটা ছবি আঁকল মনে মনে — পশুপতির একজোড়া ভীমের গদা উরুতের ক্যাচাকলে বন্দী হয়ে মুক্তির জন্য হাঁকোড়-পাকোড় করছে সৌরভী। অথবা ব্যাপারটা উন্টো, সৌরভীই নিজেকে থেকে নিজের গতরের ক্ষুধা মিটাতে

সেখানে থেকে গেছে। এসব চিন্তায় বুকে দুপদুপানি শুরু হল। ভাবল, থাক মাগী বাইবে, দরজায় ছড়কো তুলে দেই। দরজা বন্ধ করবে স্থির করে মাচা থেকে উত্তেজিত হয়ে নামতে গিয়ে পবান টের পেল নলিরাঙ্কসটা গলায় থাকা বাড়িয়েছে। মাঝবাত্তে অক্ষম রাগে দুঃখে আবহ্যত সৌরভীর জন্য একধরনের হাহাকারে অসহায় পরান নিয়তিব দোসব নলিরাঙ্কসেব হাতে নিজেকে ছেড়ে দিল।

আধঘণ্টা পরে পবান অনেকটা সুস্থ বোধ করল। ততক্ষণে উত্তেজনা ঠাণ্ডা বরফ হয়ে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কবে বুঝল, এবপব বেঁচে থাকা দুর্বিসহ হয়ে উঠবে তাব পক্ষে। না সৌরভী না পশুপতি তাকে মানুষেব মর্যাদা দেবে। নেড়ি কুকুবেব মত দুমুঠো মুড়ি আর ভাত তু-কব দেবে। পশুপতির নির্দেশে তাও লাথি-ঝাঁটা মেবে দেবে অথবা তাড়াবে। মুখচোরা সৌবভী ক্রমশ মুখ খুলবে। আড থাকবে না মুখেব। একমাত্র মুক্তি নিজেই যদি এইবেলা সময় থাকতে নিজের নলিটা একেবাবে বন্ধ কবে দেয়। ঘাবে-বাইরে-দেহে তিন শত্রুব সঙ্গে লড়াই কবে বাঁচা যাবে না। সে অনেকবাব আত্মধিক্কাবে নিজেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়তে বলেছে। এখন সেটাই নিদ্ভতিব উপায় হিসাবে বেছে নিল।

মাথার উপরেব তাক থেকে টাটকা চর্বি মাখানো ছুরিটা অয়েলক্রথ সমেত পেড়ে নিয়ে মাচা থেকে নেমে আধখানা বাঁপ খুলে দাওয়ায় গরুর দাঁড় রেখেছিল। সেটা নামিয়ে দড়িটা খুলে নিয়ে একমাথায় হাততিনেক অংশে ছুবি ও অয়েলক্রথ থেকে চর্বিটুকু মাখালো যবে যবে। তাবপব সে প্রান্তে তৌব কবল একটা আলগা ফাঁস।

যন্ত্রের মত দ্রুত হাত চালিয়ে প্রস্তুতি শেষ কবলেও পবানের মাথায় খেলছিল কিছুটা নাটকীয় পবিকল্পনা। মববেই যখন চুপি চুপি আড়ালে মরবে কেন? নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কি বস্তু না জানলেও প্রায় তাব কাছাকাছি একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদেব সংকল্প পরানেব চিন্তায় দানা বাঁধল। সংকল্পটা হল, পশুপতিব ডাল্লারখানাব সামনে সদব বাস্তার পাশে মস্ত আমগাছটাব রাস্তার উপবে মোটা ডালটা থেকে ঝুলে পড়বে। আব তার আগে ডাল্লারখানায় শিকল তুলে দিবে। সকালে পশুপতি যখন অচ্ছুং সৌবভীব সঙ্গে ধরা পড়বে তখন মজা লুটতে যারা আসবে তাবা আবও একটা মজার দৃশ্য দেখবেঃ মূর্তিনান প্রতিবাদ হিসাবে পবানেব উলংগ দেহটা গাছ থেকে ঝুলে ওদেব ভেংচি কাটছে। পশুপতি তাব মূল প্রতিপক্ষ হলেও এ মুহূর্তে গ্রামেব এব সমাজের সব পশুপতিদেবই সে একটা শিক্ষা দিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। সকলে দেখুক প্রতিবাদ কত অর্থপূর্ণ হতে পারে। ... ঠিক এমনি একটা পবিত্র ক্রোধ নিয়ে দড়িটা কোমবে জড়িয়ে তাতে ছুবিটা ওঁজে দিয়ে বাড়ি থেকে বেবিযে পড়ল পবান। ঠিক তখন তাকে উৎসাহ দিতেই যেন ভাগাডেব শেষালগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠল।

ডাল্লারখানার পিছনে কাঠা-দুই জায়গায় পশুপতিব ধান বাড়ি হয়। তাব পাশে পুকুরপাড়ে মস্ত পোয়াল গাদার গায়ে তেঁসানো সরু লম্বা একটা মই। পোয়াল উঁচু করে গাদা দিতে বা ভাসতে লাগে ওটা। পরান মইটাব প্রায় মাঝামাঝি কাঁধ ঠেকিয়ে তেঁনে নিয়ে আমগাছের দশ-বারো হাত উঁচুতে মোটা ডালে ঠেকিয়ে দাঁড় করালো। তারপর গেল ডাল্লারখানার দবজায় শিকল তুলতে। কি খেয়াল হল শিকল তোলাব আগে একটা কপাটে আস্তে তেলা দিয়ে দেখল। তাতেই কপাটটা মৃদু শব্দে আধখানা হাঁ হয়ে গেল। পবান অমনি সবে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কান পাতল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল কাবো য়ুম ভাসেনি, কেউ জেগে নেই।

এবার পরানেব ভাবনা নিশ্চিত স্বচ্ছামৃত্যুব পূর্বমুহূর্তেও একটা অন্য খাতে পড়ল, যা একান্ত ঐহিক। তাব প্রচণ্ড ইচ্ছা হল, মববেই যখন তখন একবাব পশুপতি ও সৌবভীব

যুগল-নিদ্রা একটু চাক্ষুষ করে মরবে। এ-চিন্তার সঙ্গে গলায় দড়ির ফাঁস পরার ভীতি দূর করার সম্পর্ক আছে। মনে জোর পাবে। এরকম একটা যুক্তি খুব স্পষ্ট না হলেও পরানের মনে আছে। সে মনে সাহস এনে চোরের মত ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। মশারির কোণে গিয়ে দাঁড়াল। অবিকল মোষের মত ভৌঁস্ ভৌঁস্ শব্দ করে নাক ডাকছে পশুপতির। পরান আস্তে আস্তে মশারির কোণ একটু ফাঁক করে উঁকি দিল। জানলা দিয়ে একটু চাঁদের আলো পরানের মতই চুরি কবে ঢুকে পড়েছে। চোখ একটু সয়ে গেলে পশুপতির মস্ত ভুঁড়িটা কাপড়সিদ্ধ কবা দশ-বারো নম্বরির বিরাট কড়া উন্টনো মনে হল পরানের। তেমনি কড়ায় সোডায় সিদ্ধ-করা কাপড় মাঝে মাঝে রানাবাড়ির খাটে আছড়ে কাচে সৌরভী। পশুপতি দুপাশে পা ফাঁক করে চিংপাত হয়ে ঘুমুচ্ছে একা। সৌরভী নিশ্চয় আগে বেরিয়ে গেছে। তাই হয়ত দবজা খোলা। ভেজিয়ে রেখে গেছে সেই দরজাটা। পশুপতি মদের মেশায় আর গতরের সুখের পরিশ্রমে উঠে আব দরজা ভিতর থেকে খিল আটকাযনি। কিন্তু সৌরভী কোথায় গেল? এমনও হতে পারে, এই মোষটার দু-উরুতের কাচাকল থেকে ছাড়া পেয়ে কাহিল হয়ে কোনোবকমে বাড়ি গিয়ে ঘরের ঝাঁপ আটকাবাব কথা মনে ছিল না, বা সে অবস্থাই ছিল না। পশুপতিও এখন মদেব খোয়ারিতে অচেতন। সহজে খোয়াবি কাটবে না।

পবান অবস্থা বুঝতে পেরে সাহস করে মশারির সামনের পাট তুলে দিল। অমনি ভক্ করে দিশি মদের বোট্কা গন্ধটা পবানের নাক দিয়ে ঢুকে একেবারে তালুতে উঠল। পশুপতি ঠিক যেন একটা মবা মোষের লাশ। ফিকে আলোয় এখন দেহটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে। পবান নিজের গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবাব কথা ভুলে পশুপতি নামক মোষটার চামড়া ছাড়াবার প্রক্রিয়াটা ভাবতে শুরু করল। প্রথম গলার নলিতে ছুরি বসিয়ে কানের তলা দিয়ে ঘাড়ের উপর দিকে যতটা চানড়া পারা যায় রেখে ছুরি ঘুবিযে আনবে। এসব ভাবতে গিয়ে বুকে দুব্দুব্ শুক হল। পবানের মনে হল নলিরাফ্‌সটা গুড়ি মেবে এগিয়ে আসছে গলা চেপে ধরতে।

ঠিক তখন আবছা ভৌতিক আলোয় পরান দেখল পশুপতিরই একটা লোমশ মোটা হাত তাব গলাব দিকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। এই প্রথম একটুও ভয় না করে ক্ষিপ্ত পবান টেঁচিয়ে বলল, শালা নলিরাফ্‌স, এতদিনে তোকে হাতে পেয়েছি। ইবার প্রতিশোধ লিয়ে যাব।

একটানে কোমর থেকে মস্ত ছুঁচালো ছুরিটা বেব কবে পরান পশুপতির গলাব নলিতে খাড়া বসিয়ে দিয়ে দুহাতে চেপে ধরল ছুরির বাঁট।

কল্যাণী

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

এই একটি মাস কল্যাণীর আর অবসর বলতে এক তিলও থাকে না। সংসারে ‘ছিষ্টি’ কাজ তো আছেই, তার উপর ‘মায়ের রূপরচনা’। হ্যাঁ, পাড়ার আর সবাই বলে ঠাকুর তৈরি, কিন্তু কল্যাণী বলে রূপরচনা—এ কথাটা ওব নিজস্ব নয়, স্বর্গতঃ ঠাকুর অর্থাৎ স্বর্গর শিবশঙ্কর ঠাকুর এই আখ্যাই দিতেন প্রতিমা-মূর্তিকে।

কৌলিক পূজার আর কিছুই বজায় নেই।

পাড়ার কৌতূহলী ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে জমেছে। আজ দো-মেটে হবে। ওবা রোজ আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে—ম্নান মুখে কথার জবাব দিতে দিতে কল্যাণী হাতে কাজ ক’রে যায়।

আজও সকালে উঠে বাসিপাট সাত-তাড়াতাড়ি চুকিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে এসে রূপরচনার কাজে লাগল কল্যাণী। হাতে আব মোটে সময় নেই, কদিনই বা বাকি। অথচ এবাবে চাঁদা পত্র একদম আদায় হচ্ছে না। হবে কি ক’বে, পাড়াতে যে বড়লোকেবা ঘববাড়ি কবেছে, তাদের সর্বজনীন পূজোর দিকেই সবাই ঝুঁকেছে। সর্বজনীন পূজোর বিরাট প্যাণ্ডেল, ঠাকুর আসেন নবিতে চ’ড়ে। তিন দিন তিন বাত ধ’রে নানা বকমের তামাশা। সেখানেই যায় মোটা মোটা চাঁদা। তা যাক, সে জন্যে কল্যাণীব দুঃখ নেই, কিন্তু আটহানা-চারআনা ববান্দটুকুও যদি বন্ধ হয়ে যায় তো মায়ের সামনে ধূপ-ধুনোটুকু দেবার সামর্থ্য থাকবে না যে কল্যাণীর। শুধু কি চোখের জলেই মাকে আবাহন করবে কল্যাণী এবার! তার জন্যে রূপরচনাব দরকাব ছিল না, প্রতিনিয়ত ধান্নেই তো সে মায়ের কাছে মিনতি জানায়, মুক্ত কর না, মুক্তি দিয়ে তোমাৰ চরণে টেনে নাও।

তবু কল্যাণী মাটি থেকে ফালতু ইট-পাটকেল বেছে ফেলে দিয়ে জল ঢালে। নবম কাদা মাখতে মাখতে স্বামীর উদ্দেশে গলা একটু চড়িয়ে বলে, ওগো, ওঠ। বেলা যে অনেক হ’ল, চাতাল ছাড়িয়ে সূর্য ঠাকুর মন্দিরে ঢুকলেন।

মন্দির, তবে মাথায় খোলার খাপরা, মাটি-লেপা হ্যাঁচার বেড়া, অবশ্য মেঝেটুকু লাল সিমেন্টেব। সবই তো সেই শ্বশুরের আমলের। তাঁর কাছেই কল্যাণী ঠাকুর-গড়া শিখেছে। বাবো বছরের মেয়ে, আদর ক’রে ঠাকুব বলতেন—গৌরী। গৌরীদান করেছিলেন কল্যাণীর বাবা। তখন এই সংসারে লক্ষ্মী ছিলেন বাঁধা। শিবশঙ্করের পূজার্চনার বীতি ছিল রাজসিক। আর পাড়া ছাড়িয়ে মহান্নায় তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ... কল্যাণীব চোখে সে সব স্বপ্ন ছবি হয়ে আজও বেঁচে আছে। এখনও প্রতিমার রূপরচনাব কালে সেই ছবিগুলিই ভেসে ভেসে আসে।

পাশের ঘরে অন্নদাশঙ্করের খড়মের শব্দে কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। যাক, আজ তা হ’লে মা মুখ তুলে চাইবেন মনে হচ্ছে। একবারের ডাকে অন্নদার ওঠার কথা নয়, তিন-চার দফা ডাকাডাকির পর বিরক্তি-ভরা ভ্রুকুটি নিয়ে সে ওঠে। হবে না কেন, গাঁজার

আজ্জায় নিমন্তলার শ্মশানঘাটেই তো রাত এগারোটো-বারোটো বাজে। কিছু বলবার উপায় নেই। বললেই কটাস ক'বে জবাব মিলবে? তা গৌজেলের ঘরে থাকতে মন না চায় তো গেলেই পাবিস মাতাল নাগরেব পাকা দালানে। এর পিছনে যে ইতিহাস আছে সেটা কল্যাণী মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। তবু এক-এক সময় অমদার খোঁচা খেয়ে স্মৃতিপটে জেগে ওঠে একটি সুন্দর দিবাকান্ত তরুণ মুখ। আহা, শেষ পর্যন্ত ছেলোটো মাতাল হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে চৌমাথাব মোড়ে অশ্বখগাছের ডালে ঝুলেছিল—শীতের রাতে। গা শিউরে ওঠে। মিথো কথা নয়, কল্যাণীকে ছেলোটো ভালবেসেছিল। নল-খাগড়াব জঙ্গল বেহেটে প্রথম দোতলা ইমারৎ এ পাড়ায় ওবাই প্রথম তোলে। অমদার সঙ্গে রোজই আসত ছেলোটো। কল্যাণীকে 'বউদি' বলে ডাকত। আস্ত পাগল ছিল। পাগল না হ'লে অমন ভালবাসতে পাবে। সে যাক, আজ অমদাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চাঁদা আদায়ে পাঠাতে হবে। নইলে মায়ের কোরা শাড়ি অন্ততঃ একখানা কিনবে কি দিয়ে? নিজের সাধ্যমত কল্যাণী প্রতিমা গড়ছে। কিন্তু তিনখানা শাড়ি তো চাই,—মা দুর্গাব দশহাত শাড়ি, লক্ষ্মী-সরস্বতীর নয়—আটহাতি হ'লেও চলে। কলাবউয়ের জন্য বড় গামছা একখানা। আব— আরও আছে, কার্তিক-গণেশের ধুতি। আব ভাবতে পাবে না কল্যাণী, অনেক টাকা চাই যে।

কোন কালেই অমদা কিছু ভাবে না। তবে তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। তাতে কল্যাণীও আপত্তি নেই। পুরুষ মানুষ একটু আলা-ভোলা হতেই পারে। কিন্তু মেয়েদের তো হাল ছেড়ে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে থাকলে চলে না। কুলবধূর দায়িত্ব সামান্য নয়। লৌকিক মর্যাদা তাকে বজায় রাখতে হবে।

এই মর্যাদার দায়িত্ব কল্যাণীকে অষ্টপ্রহর উদ্ব্যস্ত ক'বে রেখেছে। তবু বক্ষে যে ছেলেপুলে নেই। তাতে খাওয়ানো-মাখানোব ঝামেলা নেই। আছে এই মন্দির, আব আছে অমদাশঙ্কর। দু দশ ঘব যজ্ঞমান এখনও যেতে যেতে টিকে বয়েছে। তাদের অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, সতানারায়ণ, লক্ষ্মীপূজাব কল্যাণে এখনও যৎসামান্য রোজগাবপত্র হয় অমদাশঙ্করের। তবে তাবা নিতান্ত গবিব বস্তির বাসিন্দে। বড় বড় ঘব তো অমদাশঙ্করের হাতছাড়া হয়ে গেছে কবেই। মাটিব ওপর নতুন মাটির হালকা প্রলেপ দিতে দিতে কল্যাণী বলল, ওগো, একবার ইদিকে শোন।

সাদা এল : কলকে সাজা নেই কেন?

ওমা, দেখেছ, একদম ভুলে গেছি। এই যে, আমার হয়ে এসেছে। দাঁড়াও, যাই।

থাক, আব সোহাগ কাডতে হবে না। যা করছ তাই কব। আনি আবার একটা মানুষ, তার আবার তামাক।

আচ্ছা, এই সাত-সকালে ঝগড়া মুখে ক'রে উঠলে! বলছি, ভুল হয়ে গেছে।

ভুল! আমি আর বুঝি নে! অচ্ছেদা। আচ্ছা, আমিও শিবুঠাকুরেব ব্যাটা, তোমাকে দেখাব, ভুলকে ঠিক করতে হয় কি ক'রে।

মুখ বুজে থাকাই ভাল। আর একটি কথা কইলে, কলকেটা আছড়ে, ভাঙবে, তখন কেনার পরস্যা যোগাড় করতে হবে কল্যাণীকেই। যোগাড় মানে—ধার। ঐ ধারটুকু শোধ হবে কবে তার ঠিক নেই। মনে মনে কল্যাণী প্রমাদ গণল—এই মেজাজের ওপর চাঁদা চাইতে যাওয়ার কথা বললে আর রক্ষে থাকবে না। কিন্তু না বললেই বা চকাবে কি ক'বে! এমনি সঙ্কেচ ক'রে ক'রে তো এতদিন কেটেছে। আর চলে না।

ওদিকে বাচ্চাদের প্রশ্ন : খড়ি দেবেন কবে? রঙ দেবেন কবে? এমন মাখনের মত মাটি কোথায় পাওয়া যায়? আমায় একটু দেবেন?

কল্যাণী হাসিমুখে ওদের কথার জবাব জুগিয়ে যায়। আর উৎকর্ণ হয়ে থাকে। পাশেব ঘরে কি ঘটছে-না-ঘটছে শুনে বোঝবার চেষ্টা করে।

ইকোর টান উঠতে কল্যাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

পাশের ঘর থেকে অন্নদার সাড়া এলঃ বলি মাটি তো খুব লাগানো হচ্ছে। তাবপর, কি দিয়ে কি হবে শুনি?

মন্দির থেকে কল্যাণী হেসে উত্তর দিল, মায়ের কাজ তিনিই কবিয়ে নেবেন। এতোকাল তো এইভাবেই মা এসে পূজো নিয়েছেন, এবার নেবেন।

তোমার আব কি, ব'সে ব'সে মাটি মাখছ, খড়ের গাঁজা দিচ্ছ। কিন্তু বাইবেব দুনিয়া যে বদলে বরবাদ হয়ে গেল সে খবর রাখ? জান এবার আরও একটা পূজো বাড়ল পাড়াতে। চাটুজ্যোদেব দলেব সঙ্গে গাঙ্গুলীরা আর এক হয়ে পূজো করছে না। 'সাধারণ' দল বেরিয়ে গিয়ে নতুন পূজো করছে। বলি, চাঁদা তো দেবে এই পাড়াব লোকেই, তোমার এবার আশাব গলায় খোলামকুচি।

ব'সে ব'সে অত না ভেবে একবার বেরোও না গো। তুমি গিয়ে দাঁড়ালে মুখেব ওপব না বলতে পারবে ভেবেছ! দু চাব আনাও তো দেবে মায়ের নামে।

মাথা খারাপ নাকি! এই কেলেকারিব পর—

কেলেকাবি অবশ্য একটা বড় রকমেবই হয়ে গেছে—মাস দেড়েক আগে। এব আগেও দু-চাববাব এ বকম কেলেকাবি অন্নদার দৌলতে ঘটেছে, তবে এবাবেব মত চিটিকার পড়ে নি কখনও। তা, তখন পাডায় তেমন লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা কমই ছিল। আব দেবদ্বিজ ভক্তিব এতটা দেনাও ঘটে নি। এবাব যেন বড় বেশী বাডাবাড়ি হয়ে গেল। ওই পুকুবপাডেব ফুটফুটে বউটাব সঙ্গে অন্নদাব ফটিনাট্টি কল্যাণীব নতুন এড়ায় নি। দু-একবাব আকাবে-ইস্মিতে কল্যাণী বুঝিয়েও দিয়েছে অন্নদাকে, সাবধান হও। কিন্তু গবীবের কথা বাসি না হ'লে তো মিষ্টি লাগে না।

একদিন সন্কেবেলা হৈ-ঠে প'ড়ে গেল। একেবাবে হাতেনাতে ধবা পড়েছে আসামী। ঘোঁট চলল রাতদুপুর অবধি। পাডার এখানে-ওখানে জটলা-চকববা, হাফশার্ট আব গোঁগু গায়ে বাস্তাব ওপাবেব বাবুবা এসে জুটেছে। অবশেষে বাম-পাগলা ব্যাপাবটা সামলে দিলে। বাম ভটচায় ওরফে রাম-পাগলা, বস্তিব তরফের মাতব্বব লোক। স্বভাবচবিত্রেব কথা বাদ দিলে, লোকটি স্ফুর্তিবাজ।

বাস্তাব দু পাশে দুটি সমাজ। ডান দিকে বস্তি এলাকা, একটিও পাকা বাড়ি নেই। সাবি সারি খোলার ঘর, টিনের চালা। আব সামনে দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে চওড়া বাঁধানো ড্রেনেব জল। আব রাস্তাব এপারে দৌতলা তিনতলা নতুন ডিজাইনেব বাড়ি। দু তরফের মধ্যে অলিখিত পার্থক্য চাক্ষুষ করতে সবাই অভ্যস্ত।

রাম-পাগলা ভিড়ের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে চৌচিয়ে বললে, আমাদের বস্তিব ব্যাপাবে ভদ্রলোকের নাক গলাবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা দয়া ক'বে অন্তর্ধান করুন। আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব মশাই।

তারপর অন্নদাকে আর মেয়েটির স্বামীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি বুঝিয়ে দিল বাম-পাগলা, কে জানে! তবে ব্যাপারটা মিটে গেল।

আজ এতদিন পরে যে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সেই কেলেকাবিই কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা কল্যাণী ভাবতে পারে নি।

অন্নদা ঝেড়ে জবাব দিয়ে দিল— সে পারবে না চাঁদা সাধতে যেতে। ভদ্রলোকদের সে বেশ ভাল ক'রেই চেনে। চাঁদা তো দেবেই না, উন্টে কতকগুলো কথা শুনিবে দেবে।

কল্যাণী বলবার আগেই সে নাকি দু-এক জায়গায় চেষ্টা করেছিল। তারা ঠোট উন্টে বলেছে, মায়ের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই তাঁর কপালে অন্নদার মত সেবক জুটেছে। মায়ের নামে পয়সা আদায় করে তো অন্নদা সৌখিন সাদা চাট কিনবে কিংবা জালি গেঞ্জি। আরও কি যে বলেছে তা অন্নদা না বললেও কল্যাণীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। আশেপাশে বস্তির ঘরে ঘরে প্রায়ই এসব ছোটবড় চ্যুতি ঘটে, তা নিয়ে হাস্যমাত্ত হয়, আবার চাপা পড়তেও বেশী সময় লাগে না। কল্যাণীকে সবই দেখতে হয়, চোখ কান তো আর বন্ধ রাখা যায় না—তবে এসব ও গায়ে মাখে না। ও থাকে নিজের মন্দির নিয়ে। সবাই ওকে সমীহ করে। সধবাবা সাবিত্রীরত করলে ওকেই শ্রদ্ধার্থ দেয়। ওর সন্তান নেই তাতে কি, এমন সন্তীকে কে না পূজা করবে।

অবশেষে চাঁদা আদায়েব ভারটুকুও কল্যাণীব ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। আসুক। কল্যাণীব কিছুতেই আপত্তি নেই, শরীরে বইলে ওর আর কি।

সেদিন দুপুরে ঠাকুরের গায়ে খড়ি লাগিয়ে কল্যাণী বেরিয়ে পড়ল। ওকে যেন ওই পাকা বাড়িওলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বাস্তব কলে জল নেবার সময় তিনতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির বউ-মেয়ে সবাইকেই কল্যাণী দেখেছে—আগে ওখানেই যাবে। এক বাড়িতে অনেকগুলি পবিবাব থাকে। কাছাকাছিও বটে।

প্রথমেই তেতলায় উঠল। কড়া নাড়তেই সাড়া পাওয়া গেলঃ কে, কেঃ

আমি, একবার এদিকে শুনুন না!

দরজা খুলে দিলে একটি বউঃ কি চাই?

আপনাদের কাছে একটু সাহায্য চাই। আমবা মায়েব পুত্রে কবি-

ও। আসুন আসুন।

বসতে বলল বউটি। বেশ মিষ্টি কথা। বললে, আপনাকে যেন দেখেছি কোথায়।

এই তো আপনাদের সামনেই, ওই মন্দির আমাদের।

মন্দির ওনে বউটি অবাক হয়ে চেয়ে বইল। কল্যাণী বললে, এই তো সামনেব ওই বস্তুতে।

হা, তাই বল। মন্দির বললে কি ক'বে বুঝব ভাই! তা কি ব্যাপার বলুন তো, আপনাকে দেখে বস্তির লোক বলে কার সাধ্য! বেশবাস সবই ভদ্রঘরের মত—কথাও বলেন ভাল।

আমরা ব্রাহ্মণ। শ্বশুর ছিলেন পণ্ডিত। আর তাঁর ছেলেও পূজার্তনাই করেন।

ছেলে মানে, ওই সেই ঠাকুর তো! তার কথা আর কে না জানে।—ব'লে বউটি অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

কল্যাণী মুখ বুজে বইল।

বউটি বললে, বাগ করলেন ভাই! না না, আমি সেভাবে বলি নি। এমনি কথার কথা। পুণ্ডরিকের কথা না তোলাই ভাল—ওব আর ইতব-ভদ্রর নেই। যাক যে কাজে এসেছেন সেটাই হোক। ছেলেমেয়েদের কাছে শুনি বস্তুতে ঠাকুর হচ্ছে—একটি মেয়েলোক নিজে হাতে ঠাকুর গড়ে। মেয়ে-কুমার পেলেন কোথায় ভাই?

কল্যাণী গলাব আড়ষ্টতা কাটিয়ে খুশী মুখে বললে, কুমার ডাকার পয়সা কোথায় দিদি। আমিই মায়ের কপরচনা কবি। আর পয়সা যখন ছিল তখনও ওঁদের বংশের বিধি এই রকমই ছিল, আমাব শ্বশুরও নিজেই রূপরচনা করতেন।

আপনি নিজেই সব করেন। সময় পান কি করে? আর এ তো সহজ কাজ নয়। তা মেয়েদের মধ্যেও আর্টিস্ট আছে, অ্যাঁ।

বউটির কথার ধরন অনারকম। কল্যাণী এ রকম মেয়ে এর আগে দেখে নি। ওব প্রশংসা এতদিন বস্তির মানুষেই করেছে, আজ প্রথম ও স্বকর্ণে তিনতলার ফ্ল্যাটের মানুষদের তাবিফ পেল।

বউটি বললে, আপনি একটু বসুন। আমার ননদ-জা ওদের সবাইকে ডাকি।

একে একে অনেকগুলি নানাবয়সী মেয়ে জুটে গেল। পাশের ফ্ল্যাটেরও বউ-ঝি এসেছে বস্তীর ঠাকুরগণকে দেখতে, যে মেয়ে নিজের হাতে দুর্গা-প্রতিমা গড়তে পারে সে তো ফ্ল্যাটবাসিনীদের দ্রষ্টব্যই।

সবাই সায দিল চাঁদা অবিশিা দেওয়া উচিত। সর্বজনীন পূজোব জন্যে অনেক কাজেব লোক আছে। কিন্তু এবকম একটা মৌলিক প্রচেষ্টাকে মেয়েরা সাহায্য সমর্থন না করলে মেয়েদেরই কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। কেউ বলল, আমাব নামে এক টাকার রসিদ কাটুন ভাই। কেউ আট আনা, কেউ বা দু টাকাব রসিদ কাটতে ফবমাস কবল। চাঁদাটা এখন আর বাড়ি-পিছু ধবছে না ওবা, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে চাঁদা দেবে। এদের রকমসকম দেখে কল্যাণীব যৌবন-অতিক্রান্ত বকের মধ্যে খুশিব ঝড় ব'য়ে যায়। এই তো সুদিনের সূচনা। তবে নাকি পূজো হবে না? মাযের দয়া থাকলে কেন হবে না? কল্যাণী তো অধর্ম করে নি, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় নি, নিরন্তর মাযের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। না তো সবই দেখেছেন অন্তবে অন্তবীক্ষে থেকে।

বউটি বললে, ওমা, আপনি চুপ ক'রে ব'সে কেন? আজ যা পাচ্ছেন নিন। কাল আমি আপনাব হয়ে আর সবাইকে ব'লে দেব। চটপট রসিদ কাটতে থাকুন।

কল্যাণী স্নান হেসে প্রশ্ন কবলে, রসিদ কি দিদি?

একটি ময়ে বললে, চাঁদা নোবেন। রসিদ দেবেন না?

রসিদ তো নেই ভাই। মাযেব পূজোয় যে যা দেবেন হাত পেতে নেব। তাঁব ভোগে লাগবে।

দু-একজন মুখ টিপে হাসল।

বউটি বললে, আচ্ছা, এবাব আপনাকে বিশ্বাস ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু এব পর রসিদ বই একটা ছাপিয়ে নোবেন। বুঝলেন, গুধু হাতে চাঁদা কেউ দিতে চায় না।

কল্যাণী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

তা মন্দ উঠল না। এক জায়গায় ব'সেই সাড়ে আট টাকা চাঁদা উঠল।

একে একে সবাই চ'লে গেল। কল্যাণী ব'সে আছে। বেশ লাগছে এখানে ব'সে থাকতে। এদের এই পরিদ্বাব পরিচ্ছন্ন পরিবেশটিতে লক্ষ্মীশ্রী বাসেছে। ঠিক এমনটি অনেক কাল পবে নজরে পড়ল কল্যাণীব।

বউটি এক সময়ে বললে, বসুন ভাই, চা খাবেন?

চা তো খাই নি কখনো দিদি।

ওমা, অবাক কাণ্ড! চা খান নি? তা খেয়ে দেখুন না।

আর একদিন খাব। মাযেব পূজোটা চুকে-বুকে যাক। এখন তো খুব বিচাব আচারে থাকতে হয়। মাযের রূপবচনাব সময় কত সংযম মেনে চলতে হয় দিদি, কি আব বলব।

কেন?

মাযের ধ্যানকেমন থেকে বাইবে ফুটিয়ে তোলা তো সাধনার ব্যাপার।

বউটি বললে, রাগ করবেন না দিদি। আপনার মুখে কথাগুলো শুনে মন্দ লাগছে না। কিন্তু আপনার এই অমদা ঠাকুরকে দেখলে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসে। আচ্ছা, ও কি ক'রে ঠাকুরের পূজো করে ভাই?

কল্যাণী হাত জোড় করে বললে, সবই মায়ের ইচ্ছা দিদি। তাঁর ক্ষমা না থাকলে কি আর মানুষ বাঁচত!

বউটি বললে, অবিশ্যি ভক্তি আলাদা জিনিস। কিন্তু, না—থাক।

কথাটা চেপে গেলেও বউটি মুখ টিপে হাসতে লাগল।

হাসছেন কেন দিদি?

এমনি। আপনাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার।

অবিশ্যি আপনি মেয়েমানুষ, তাই আপনার পছন্দতে ভয়েব কিছু নেই।

আচ্ছা, এককালে আপনি খুব সুন্দরী ছিলেন, তাই না?

কি জানি, হয়তো ছিলাম, হয়তো ছিলাম না।

এখন তাই সত্যি কথা বলি, আপনাকে আমার সবাই চিনি। এমনিই তখন না-চেনার ভান করে ছিলাম।

ও, তাই নাকি! বাঃ বে, বেশ মজা তো!

বউটি আরও ঘনিষ্ঠতা কবল এক খিলি পান দিয়ে। তার পর যে কথাটা বলল, তার জন্য কল্যাণী মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

হঠাৎ ওর দু হাত চেপে ধরে বলল বউটি, আচ্ছা, তোমাকে ওই অন্নদা হতভাগা ভাগিয়ে এনেছিল, বার ক'বে, তাই না? সত্যি বলবে, আমার গা ঝুঁয়ে আছে।

কল্যাণীর আপাদমস্তকে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কল্যাণী সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘৃণায় ওব সর্বদ্বন্দ্ব যেন বি বি ক'বে উঠল।

দৃষ্ট কণ্ঠে কল্যাণী বলল, আপনি গেরুহেব বউ, তাই আর শাপশাপাত্ত কবলাম না। নইলে বলতাম, কুলটা ছাড়া এ কথা কেউ মুখে আনতে পারে না। ঢেব হয়েছে, আপনাদের সাহায্য আমার দরকার নেই। এই বইল আপনাদের চাঁদা।

স্তুম্ভিত ভাবে বউটি দাড়িয়ে বইল। তার চোখের সামনে দিয়ে কল্যাণী তব-তব ক'বে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

কল্যাণী নিজে আর কোথাও চাঁদা আদায়ে বেবোয নি। অন্নদাকে বলেছে বস্ত্রের বাইবে কাকব কাছে হাত পাতবে না। আমার মাথাব দিবা বইল। তাতে মায়েব পুত্রো যেমন হয় তেমনি হবে।

অন্নদা পর্বদিন সকালে পুরনো লাল শালুর ওপর লেখা দুর্গাপূজার ফেস্টুনটা টাঙিয়ে দিতে দিতে বলল, ঠিক হয়ে যাবে বউ, তুই তোব কাজ ক'বে যা। আমি দেখি ইদিকে।

ছেলেমেয়েবা আজও ভিড় জমিয়েছে। সর্বজনীন তলায় এখনো কোনো আয়োজনের চিহ্ন নেই—ওদের ঠাকুর আসে লবিতে চ'ড়ে। কণ্টাক্তব এসে ম্যারাপ বাঁধে ষষ্ঠী ব দিন সকালে। ঢোল-সানাই বসে, সেও ষষ্ঠীপূজার দিন। তখন আর ছেলেমেয়েরা এখানে কেউ উঁকি দেয না। তা না-ই দিক, এখন তো ওরা রয়েছে। কল্যাণী রঙ চড়াতে চড়াতে খুশী হয়ে ওঠে। ওর ভরসা আছে, মা পূজার যোগাড় করিয়ে নেবেন। এই তো অন্নদাও হাত লাগিয়েছে কাজে, তবে তার ভাবনা কি!

অন্ধজনে দেহ আলো

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

‘এই যে অশ্বিনীবাবু।’

সময়মত টেব পেলো অশ্বিনী কেটে পড়ত। এখন আব উপায় নেই। সুবপতি কাঁধে হাত বেখেছে।

অগত্যা ‘এই যে আসুন’ বলে মনে মনে বাপান্ত কবে সবে বসে জায়গা করে দিতে হয়।

ধাঁধাটার ফয়সালা হল না। তাব কথাই ওনেছে মেনকা। সে বলেছিল বলেই ববদাব সঙ্গে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমায গেছে। সে ফেবাব আগেই ফিবে এসেছে। নিজে থেকে ব্যাপারটা মেনকা না জানালে অশ্বিনী জানতেও পাবত না। তবু কেন বরদার সঙ্গে মেনকা সিনেমায গিয়েছিল ওনে তাব বাগ হয়ে গেল? এ ধাঁধা নয়?

লাঠি ঠুকে ঠুকে সুবপতি সামনে ঘুরে আসে। কোঁচাব খুটে বেধি ঝেড়ে নিয়ে আসনপিড়ি হয়ে বসে। ছোকরা চাকরটাকে বিদায় দেয়। লাঠিটা কোলে শোওয়ায়। দাবনায হাত বুলায়।

‘দেখলেন তো মশায়, আপনিই যে বসে আছেন—’

‘আপনার দিব্যদৃষ্টি।’

‘ঠাট্টা কবছেন ভাই।’

ঠাট্টাই অশ্বিনী কবেছিল। দাঁত-মুখ খিচিয়ে নীবর ঠাট্টা। সুবপতির কাতব সুবেব ভাই ডাক ওনে, মুখোমুখি চেয়ে তাকে কাতবভাবে হাসতে দেখে ভড়কে যায়। লোকটা সত্যি সত্যিই অন্ধ তো? আব পাঁচটা কালো চশমা-ওঝালাব মত শয়তানেব ধাতী নয় তো?

‘ছি ছি ঠাট্টা করব কেন।’ গম্ভীর মুখে অশ্বিনী বলে। জোবে জোবে মাথা নাড়ে। মুখ গম্ভীর করে জোবসে মাথা নাড়লেই যেন ‘অন্ধেব সেটা নজবে পড়ে যাবে।’ সত্যি আপনার বাহাদুরি আছে। নইলে এত বড় পার্কেব মধ্যে বাস্তব বেলা—’

‘অন্ধেব কিবা দিন কিবা বাত্ৰি।’ সুবপতি থিক থিক কবে। হাসে না কাশে বোঝা দৃষ্কব।

বোঝাব গবজও বড় বোধ কবে না অশ্বিনী। কথটা শোনা শোনা। কোন্ নাটকে যেন কথটা আছে? অবিশ্যি নাটকে কোন কথা থাকা না থাকা বড় নয়। বলাব ভঙ্গিটাই আসল। তাই না অতি সাধাবণ কথাকে কেউ কেউ চমৎকাব ডায়লগ বানিয়ে ফেলতে পারে, যেমন আজ বৌদিব হাতেব মাংস খাব অশ্বিনীদা। ডাঁটা-চচ্চডিতেই বৌদি যা স্বাদ তোলে, আহা মাংসে না-জানি কী হবে।

বৌদিব হাতেব মাংস বলতে অবিশ্যি মেনকার হাত দুটোকে কেটে-কেটে বাম্নাব আন্দার ববদা কবেনি। কাচের চুড়িতে হাত দুটিব যত বাহারই খুলুক, হাড় বাদ দিলে ক’ ছটাক মাংস ওতে মিলবে। সিনেমা থেকে মেনকাকে বাসায পৌছে দিয়ে ফেব বাজাব দাবড়ে সে দস্তরমত পাঁঠার মাংসই কিনে এনেছে। কিন্তু তার গদগদ গলার কথা শুনলে অশ্বিনী মোহিত হয়ে যায়। কথাব ঢংয়ে কে বুঝবে যে মেনকাব বাম্নার তাবিফটা নেহাতই খোশামুদি মাত্র।

মেনকাকে না সে সিনেমাৰ পৰ বেস্তোৰাঁৰ নিয়ে যেতে চেয়েছিল ? বেস্তোৰাঁৰ মাংস খেয়ে তাৰ জুত হযনা বলে ।

‘আপনাৰ ওই সিগাৰেট অশ্বিনীবাৰু । বলি বটে, চাবমিনাবেৰ গন্ধ আমি স্ট্যাণ্ড কৰাতে পাৰি না, কিন্তু আজ ওবই গন্ধে— ।’ কথাটা মূলতৰি বেখে সুবপতি পকেট থেকে গোল্ডফ্লেকৰ প্যাকেট বেব কৰে । প্যাকেট থেকে সিগাৰেট । ‘চলাবে নাকি ?’

অশ্বিনী দোটোনাৰ পড়ে যায় । নিজৰ সিগাৰেটেৰ সিকিভাগ মাত্ৰ পুড়েছে, গোল্ডফ্লেকৰ লোভে হেনস্থা কৰে এখন ওটা ফেলে দিলে পৰে আপশোশ জাগৰে না ? পৰে মানে যখন পকেটে সিগাৰেট থাকবেনা অথচ একটা টানেৰ জন্য প্ৰাণটা আইটাই কৰতে থাকৰে । টুকৰে । টাকবাব জন্যে মেখে, তক্তাপোশেৰ তলা অবধি হাতডাতে হৰে ।

‘জানি, একবাৰ যাৰা চাবমিনাবে মজেছে— ।’ সিগাৰেটেৰ প্যাকেট পকেটে চালান কৰে দিয়ে সুবপতি সিগাৰেট ধৰায় ।

অশ্বিনীৰ ইচ্ছে কৰে গলা বাজিয়ে প্ৰতিবাদ কৰে ওঠে । বস্তিৰ মেয়ে নিয়ে যে ঘৰ কৰে বলিগঞ্জৰ মেয়ে তাৰ পছন্দ নয় ? বলিগঞ্জী পেলে কোন্ শালা বস্তি চায় । নেহাত ওটা জন্মেও জুটবে না বলে বস্তিই বিধিলিপি বলে বস্তিৰ ওণ গেয়ে বস্তিৰাসিন্দাকে নিজৰ চাওযাৰ মান বাঁচাতে হয় ।

এমন প্ৰতিবাদেৰ ইচ্ছেটা বৰদাৰ সামনেও বাবকয়েক মাথা চাড়া দিয়েছে । বৰদাও যে গোল্ডফ্লেক খায় । বৰদাও যে এমন কথা বলে ।

কিন্তু বাপ টেপে যাওযায় সন্তোষ বহুবেই তিন তিনটে বাডিৰ মালিক বনে গেলেনও মেনকাকে বৌদি বৌদি আৰু অশ্বিনীকে দাদা দাদা কৰে যে বাপ্তো হেনো হয়ে যাব এনে কথাবও প্ৰতিবাদ যখন কোনোদিন কৰতে পাৰেনি তখন কি প্ৰতিবাদ কৰা উচিত সুবপতিৰ কথাৰ ? এখনও আলাপেৰ আড্ডা ভাঙনি যে সুবপতিৰ ?

‘আপনি তাহলে আজও টিউশনিতে গেলেন না ?’

‘টিউশনি ? অ—না

‘অফিসে গিয়েছিলেন ?’

‘হুম ।’

‘যাননি তো ? শৰীৰ খাবাপ হলে যাবেন কেন । সুবপতি নড়েচড়ে বসে । সিগাৰেট লম্বা টান দিয়ে নাকেমুখে ধোঁয়া ছাড়ে । ‘মশায়, শৰীৰ খাবাপ হোক চাই না হোক, পাওনা ছুটি সৰ্ব্বাই নেয় । অথচ আমাৰ স্ত্ৰীকে এই কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পাবলান না । উনি কি বলে জানেন ?’

গত সাত দিনে কমসে কম সাতশবাৰ ওনেছে— ফেব ওনেতে হৰে ? আবাৰ জানিনা বলাটাও কি ঠিক হৰে ? অশ্বিনীৰ স্মৃতিশক্তি সম্পৰ্কে লোকটাব কি তাহলে খাৰাপ ধাৰণা হয়ে যাৰে না ?

‘উনি বলেন—’

‘আপনাৰ স্ত্ৰী অত্যন্ত ডিউটিফুল । কী অফিসে কী সংসাৰে । তাই উনি—’

‘প্লিজ ।’

‘আজ্ঞে ?’

‘ডিউটিফুল বললে ওঁকে ছোট কৰা হয় । দয়া কৰে ওই বিশেষণটা ব্যবহাৰ কৰবেন না ।’

যাবাবা । ওই বিশেষণ কি অশ্বিনীৰ মনগড়া ? ‘আমাৰ স্ত্ৰী শুধু ডিউটিফুল নয় মশায়, দুৰ্দান্ত বিউটিফুলও’ বলে সুবপতিই কি প্ৰথম দিন মিনিট খানেক ধৰে আদেখলা হাসি হাসেনি ?

শুধু স্ত্রী নয়, সুরপতির চেহারাটাও যে একদা রাজপুত্রের মত ছিল, এখন গায়ে চাপ চাপ চৰ্চি ভ্রমে নাদুসনুদুস একটি ভুড়ি গজিয়ে উঠলেও শরীরটা একসময় চাবুক চাবুক ছিল, চোখ দুটি এখন গর্তে ঢুকে গেলেও একসময় ভাসা-ভাসা টানা-টানা ছিল, এই টাক মাথাতে চুলের কেয়ারি ছিল, পাশাপাশি সেদিন দুজনকে চমৎকাব মানাত, দেবদেবী বলে সবাই তারিফ কবত— প্রথম দিনই সুরপতি সেকথা শোনাযনিঃ গতকালও তার জের টানেনিঃ

‘ডিউটি নয় অশ্বিনীবাবু, লাভ। ভালোবাসা। ওঁর সব কিছুই মূলে আছে ভালোবাসা। জ্ঞানেন, আমার যেসব আত্মীয়স্বজন একদিন—’

‘আপনাকে ত্যাগ করেছিল, আপনার স্ত্রীর নামে যাতা রটিয়েছিল তারাও আজ আপনার স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।’

‘হবে নাঃ হওয়া উচিত নয়ঃ’

অজ্ঞের ডবল প্রশ্নের জবাবে অশ্বিনী দুহাতে কলা দেখিয়ে সোৎসাহে বলে, ‘নিশ্চয় হবে। একশোবার হওয়া উচিত।’

কিন্তু এভাবে প্রতিপক্ষকে বশে আনা কি সকলের পক্ষে সম্ভবঃ অশ্বিনী সমস্যায পড়ে যায়। ভালোবাসার বিয়েব মাহাত্ম্য বোঝাতে বিয়েব মাস ছয়েকের মধ্যেই লেববেটরিতে আসিডের বোতল উন্টে চোখ দুটিকে জন্মের মত খাবিজ করে দেওয়াঃ

ঘটনাটা নিছক আকসিডেন্ট, নাকি ভালোবাসার ঝগড়া উঁচু বাখার মতলবে সুরপতিই ওই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলঃ অশ্বিনীর খটকা লাগে।

‘আফিস কামাই দূবস্থান, দুবেলা রান্নাটা পর্যন্ত উনি—’

গাড়োল কাঁহাকা। আজকের দিনে শ আড়াই টাকায় অর্থব স্বামী আর একটা ছেলেকে পুষতে হলে ছোকরা একটা চাকর রাখার বেশি হিম্মত যেন কাবো থাকে! ভালোবাসার বিয়ে না হলে কোন মেয়ে যেন বিয়েব পর চাকরি কবে না। বান্নাবান্না ঘবসংসারের কাজে হাত দেব না বিয়েটা ভালোবেসে হয়নি বলে!

‘দিন একটা গোল্ড ফ্রেক খাই।’

‘খাবেন।’

‘বোজ আপনি অফার কবেন—।’

সিগারেটের প্যাকেটটি অশ্বিনীর হাতে সঁপে দিয়ে সুবপতি যেন বর্তে যায়।

এবং অশ্বিনী কবে-কি সুবপতির প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বেব কবে নিয়ে একটা চাবমিনার তাতে বেখে দেয়। একটি গোল্ডফ্রেক ধবায়, প্যাকেটে মজুত কবে বাখে একটা। মেনকাও চারমিনারের গন্ধ সহিতে পারে না, দেখা যাক গোল্ডফ্রেক-চাবমিনারের ফাবাকটা সে আজ ধরতে পারে কিনা।

‘জ্ঞানেন’, ফিসফিস কবে সুবপতি বলে, ‘ও কাল বাতে আমায় খাইয়ে দিয়েছে।’

‘আচ্ছা!’

‘আব আমি না ওঁর আঙুল কামড়ে দিয়েছি।’

‘বটে!’ অশ্বিনী নাক সিটকায়, ভিত্ত ভেঙায়।

‘অনেক আগে—বুঝলেন—বিয়েব পব. প্রথম প্রথম আমবা এক পাতে খেতাম। ও আমায় খাইয়ে দিত্ত, আমি ওকে খাইয়ে দিত্তাম। সাত সাত বছর হয়ে গেল—কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে। চোখে ভাসছে।’

চোখে ভাসছে। ঠুনি জোড়া খসিয়ে চোখের খোদলে আঙুল ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে পবখ করে দেখবে নাকি ভাসমান দৃশ্যটাকেঃ

‘চারু আভেনিউয়ের ওপর দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট। আমার এক বন্ধু জোগাড় করে দিয়েছিল বলে, বুঝলেন না নইলে যাট টাকায় অমন ফ্ল্যাট—জানালায় দরজায় নীল পর্দা, নীল রঙটা ওর খুব পছন্দ কিনা।’ নিজের মনের মত কবে যব সাজিয়েছিল। যে দেখত—

‘তারিফ করত।’ না দেখেও অশ্বিনী তারিফ করে। তারিফ করাব জিনিস হলে তারিফ করবে না? সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট, দক্ষিণে একফালি বাবান্দা। বাবান্দায় কি সিজন্ ফ্রাওয়ারের শোভা। ঘরের ফুলদানিতে হররোজ টাটকা রজনীগন্ধা। সন্ধ্যায় স্বামীস্ত্রীর বারান্দায় পাশাপাশি ইজিচেয়ার পেতে বসে-থাকা। স্ত্রীর গান, স্বামীর কবিতা পাঠ। কোন কোন দিন সেজে-ওজে বেড়াতে যাওয়া—গঙ্গার ধার, লেকের পাড়। শনিবার রাতভব গল্প আর খুনসুটি।

এ সব বইয়ে পড়েই লোকে তারিফ করে, এতো জলজ্যান্ত ঘটনা।

‘আমাদের—অন্ধদের—বুঝলেন অশ্বিনীবাবু এই একটা মস্ত সুবিধে। আজ আব কিছু দেখতে পাই না বটে কিন্তু একদিন যা চোখে দেখেছি আজও তা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। যুমোলেও সেই সব দিনের দৃশ্যই স্বপ্নে দেখি।’

তীব্র একটা জ্বালা অশ্বিনীর বুকে আচমকা দপ কবে ওঠে। মেনকাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেনি বটে কিন্তু বিয়ের পব তো রেওয়াজ মাফিক ভালোবেসেছে। সুবপতির মত পাঁচ মিনিটে তার বিয়ে চুকে যায়নি, গুটিকয় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিয়ের আসর জমাতে হয় নি। তাব বিয়েতে নহবত বেজেছে, পাড়া মাং হযেছে। লোকজনের হইচই আব আলোব বোশনাইয়ে নিজেকে একটা কেউকেটা মনে হয়েছে। তারপর ধবো বাসবের স্মৃতি। ফুলশয্যাব স্মৃতি। দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট না হলেও দক্ষিণ খোলা ঘর একটি তাব ভাগোও হুটেছিল। মা না মবে যাওয়া পর্যন্ত, সে ছাঁটাই না হওয়া পর্যন্ত দশটা বছর চার ভাই মিলে এক সঙ্গে এক বাড়িতে ছিল। মেনকা গান না গাক, সে কবিতা না পড়ক—তারা দুজনেও মাঝে-মাঝে বেড়াতে যেত বইকি। তাবা কখনও এক পাতে না খেলেও, মেনকা তাকে কোনদিন খাইয়ে না দিলেও যবে খিল দিয়ে একটা রাজভোগ একই সঙ্গে দুজনে খায়নি কি? দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে? কতবার!

কিন্তু কই, সেসব দিনের স্মৃতি তো আজ ভুলেও কদাচ মনে পড়ে না। মাত্র দেড় বছরেক বেকাব জীবনই তার দশ বছরের স্মৃতিটাকে বেমালাম লোপাট করে দিল।

সত্যি, কি সৌভাগ্য তবে অন্ধ হওয়াব।

চাকরি কবেও সংসারের কাজ করে বলে বউয়ের গুণকীর্তনে সুবপতি মুখে থুতু তুলে ফেলে। কিন্তু চাকরি না করলেও জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সংসারের সব কিছু মেনকা সামলায় না, একাধাবে বাঁধনির কাজ, বিয়েব কাজ, ঘুঁটে দেওয়ার কাজ, ধোপানিব কাজ, ছেলে-মেয়েদের মাস্টারিব কাজ। ভাড়াটেকদের কাছ থেকে এটা-ওটা ধাব করার কাজ। স্বামীর সাথে শোওয়াব কাজ।

তিন মাসের বাড়িভাড়া বাবদ একশো কুড়িটাকা এখনও না দিয়ে যে অশ্বিনী ভদ্রভাবে ঘুবে ফিরে বেড়াতে পারছে—এব জনো বাহাদুরিও কি মেনকার প্রাপ্য নয়? ববদাব বৌদি ডাকে সে যদি না খুশি হয়, খুশি হয়ে তাকে যবে এনে বসায়, দু-দণ্ড হেসে কথা বলে, তাব রসিকতায় আঁচল খসিয়ে হেসে লুটায়, সবশেষে নিজে হাতে চা করে খাওয়ায়—কী উপায় হবে অশ্বিনীকুমারের?

‘আচ্ছা অশ্বিনীবাবু—’

‘আমার নাম অশ্বিনী নয়।’

‘হ্যাঁ, আপনাকে মিথ্যা বলেছিলাম।’

‘উপায় ছিল না। আপনার স্ত্রী আবার্ত দেবীই আমায়—’

‘আমাব স্ত্রীকে আপনি চেনেন?’

মায়া হয়। সুরপতির ব্যাকুলতা দেখে মায়া হয়। থাকগে। মানুষকে হিংসে ক'বা উচিত নয়। মানুষকে ঈর্ষা ক'বা উচিত নয়। মানুষকে ভালোবাসো। মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখো। মানুষের ন্যাকামি দেখেও, মানুষের ভণ্ডামি দেখেও, মানুষের বদমাইসি দেখেও গলা চিঁবে ব'লো সবার উপরে মানুষ সত্য।

‘আপনি আমায় মিথো পরিচয় দিয়েছেন : কিন্তু কেন—কেন—কেন—’

অগ্নী উঠে দাঁড়িয়েছিল, সুবপতির আত্ম স্বাবেও ক্রম্বেপ কবেনি—হঠাৎ ওব বুকফাটা কাশিব দমকে বসে পড়ে।

সদা ধরানো সিগারেটে টান দিয়ে সুবর্ণিত কাশছে। হাত-পা ছুঁড়েছে। লাঠিটা কোন থেকে পড়ে গেছে।

‘সিগারেটটা ফেলে দিন।’ বলে নিজেই অশ্বিনী সিগারেটটা সুবপতির হাত থেকে ফেলে দেয়। ‘চারমিনাবে তো আপনার অভোস নেই।’

‘চাৰ্মিনাৰ : আমাৰ প্যাকেটে :’

‘আমিই ঢুকিয়ে বেখেছিলাম।’

‘আপনি।’

‘আমি ভেবেছিলাম আপনি টেব পাবেন না। আপনি অন্ধ। আপনি আহাম্মক। কিন্তু আমার খেয়াল ছিল না যে—’

‘আমি আহাম্মক।’ খপ কবে সুবর্ণাতি অশ্বিনীর একটা হাত মুঠো করে।

‘ଆଃ, ହାଡ଼ିନ—ଲାଗେ।’

থাবান মত দুহাত দিয়ে অশ্বিনীবা আঙুলগুলি পিষতে পিষতে সুবপতি বলে- 'আগে বর্নন কেন আপনি আমায় আহাম্মক বললেন, আমার স্ত্রীর কথা আপনি না বর্ণাঙ্কলেন? কেন আপনি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন? কী আপনার মতলব? কে আপনি? বলুন শিগগির— নইলে এখন আমি চিংকাব দিবে লোক জড়ো করব। আমার বাড়ি আটটি ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছেন বলে—'

এই লোকটাব ওপর সে টেকা দেবাব চেষ্টা কবছিল? অশ্বিনী তাজ্জব। নাযা কবে এই লোকটাকে সে বেহাই দিচ্ছিল?

নিজেকেই অশ্বিনী'র এখন আহাম্মকের বেহদ বলে মনে হয়।

শুনবেন তাহলে ?'

‘ଆଳବଂ।’

‘তবে বনি, ধর্মত বলা আমার কর্তব্যও। হাত ছাড়ুন। আপনি কি জানেন কেন শ্যামবাজারে ছেড়ে আপনাদের উঠে আসতে হয়েছে?’

‘এ বাড়িটা আবও ভালো বলে।’

‘আপনি তাই শুনেছেন বটে, কিন্তু চোখ থাকলে দেখতে পেতেন—যাক, আপনি কি জানেন আপনার স্ত্রী বোজ নতন নতুন শাড়ি পাবে অফিসে যায়।’

‘मित्रा कथा ।’

‘আপনি কি জানেন আপনার স্ত্রীর চেহারা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই মুখে বঙ
ঠোটে লিপস্টিক মেখে—’

‘মিথো কথা।’

‘আপনি কি জানেন, আপনার স্ত্রী প্রতি মাসে নতুন নতুন গয়না গড়ায়?’

‘মিথো কথা। ওর সব গয়না হয় গিল্টি, নয় কাচ, নয় প্লাস্টিকের। ছেলে হবার সময়
সোনার গয়নাগুলি—’

‘এই তো মুশকিল। সতিমিথো যাচাই আপনাকে ওই স্ত্রীব কাছ থেকেই করতে হয়। স্ত্রী
বলেছে বলেই না ওই ছেলেকে আপনি নিজের ছেলে ভেবে—’

‘ও একটা অ্যাকসিডেন্ট। ছেলেমেয়ে আমবা চাইনি—’

‘অ্যাকসিডেন্টই বটে। আবার দেবীর পক্ষে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কি। নইলে
দেবদেবীর মত মা-বাবার অমন হতকুচ্ছিত—’

‘খবর্দাব!’ গর্জে ওঠে সুবপতি।

‘অনর্থক রাগ করছেন। চিৎকার কবে লোক জড়ো করলে দুজনেরই ক্ষতি। বাড়ি খালি
না হওয়া পর্যন্ত পার্কে গল্প কবে আপনাকে আমার আটকে রাখাব কথা। আবার দেবী অবশ্য
বিনে পয়সায় একাজ—’

‘তবেরে হারামজাদা।’

‘লাঠিটা খুঁজছেন? এই যে।’

তাড়াতাড়ি লাঠিটা তুলে নেয় অশ্বিনী। তাবপব ছড়ি ঘোরাবার ভঙ্গিতে মোটা লাঠিটা
ঘোরাতে ঘোরাতে তবতর কবে হাঁটা শুক করে।

পিছনে অকথ্য আক্রোশে চিৎকার করছে সুবপতি। খিস্তি কবছে। দাপাদাপি করছে।
ককক ককক ককক।

এমন চিৎকার দাপাদাপি তো অনেকেই কবে। কেউ প্রকাশ্যে, কেউ মনে মনে। অন্যেব
তাতে কী যায় আসে।

কাজটা অন্যায় হয়ে গেল? বিনা দোষে একজনকে সাজা দেওয়া?

হলে আর কি কবা। বিনা দোষে সাজা ভোগ কবাই তো দুনিয়াব নিয়ম।

লাঠিটা ডাস্টবিনে ফেলে অশ্বিনী তুড়ি দেয়।

ছবি

ধীরেন্দ্রলাল ধর

প্ল্যানচেটের আসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডেউ কলকাতায় এসেও ধাক্কা মেবেছে। দিনদুপুরে জাপানী বোম্বারদের বাতিমত আক্রমণ হয়েছে কলকাতার উপর। বোম্বাভীত নাগরিকেরা শহর খালি করে চলে গেছে। প্রতিটি সন্ধ্যায় চলেছে নিষ্প্রদীপের মহড়া। ঘরের মধ্যে আলো জ্বাললেও সে আলো বাহিরে বেরনো নিষেধ। এমন দিনে চুপচাপ বাড়িতে বসে-বসে আর বউ পড়ে সময় কাটে না। সন্ধ্যার পব আমরা ক'জনে মিলে তাই প্ল্যানচেটের আসর বসিয়েছি। একখানি কাঠের টেবিলের সামনে তিনজন বসে প্ল্যানচেটের উপর হাত রেখে মনে-মনে কোন মৃত-আত্মাকে স্মরণ কবি। তারপবই প্ল্যানচেট নড়তে শুরু কবে। বেশ কিছুক্ষণ নড়াচড়া পর প্ল্যানচেটের নীচ থেকে কাগজখানি তুলে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করি তার উপরের পেনসিলের বেখাগুলি থেকে কোন প্রশ্ন-উত্তরের সন্ধান পাওয়া যায় কি-না। সন্ধ্যার পব দু'তিন ঘণ্টা এইভাবে দিবা কেটে যায়।

এই আসরের সদস্য-সংখ্যা বর্তমান চারজন। আমি, আমার ভাই জয়দেব, আর আমার প্রতিবেশী কাকা-ভাইপো মহাদেব ও ভূদেব। তবে সবদিন ভূদেব আসতো না, মাঝে-মাঝে সে যেত বায়োকোপ।

একদিন মহাদেবকে খুব চঞ্চল বলে মনে হোল! অনেকক্ষণ বসে থেকেও প্ল্যানচেট আর চলে না। আমরা বিস্মিত হলাম, বললাম — আজ কি হোল বলত?

মহাদেব বললো — আজ আমার মনটা বড় চঞ্চল, তাই আজ এতে ঠিক মন দিতে পারছি না।

— কেন, আজ কি হলো? নতুন কোন মামলা-মোকদ্দমা নাকি?

মহাদেবের অনেক সম্পত্তির মালিক, তাব সম্পত্তিঘটিত মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে।

— ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা বিশেষ গোপনীয়। তবে তোমাদের আমি বলতে পারি যদি কখনও প্রকাশ না পায়।

— কি বলত?

— কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে বলবে না?

— জান তো আমরা কখনও কোথাও পরচর্চা করি না।

— তবে শোনো ভূদেব আমাদের খুন করাব চেষ্টা কবছে।

— পাগল নাকি?

— শুনলে তাই মনে হয় বটে, আমিও তাই প্রথমে বিশ্বাস কবিনি। কিন্তু প্রতি রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় কে যেন এক ঘা চাবুক মারলো। পরক্ষণেই দেখি হাতে পায়ে মাথায় বৃকে, কোনো-না-কোনো জায়গায় কামকন করছে। সেই ব্যথা বাকি বাতটুকু আমায় স্থির হতে দেয় না। প্রথমে ডাক্তার দেখাই, কয়েকটা ভিটামিন বি ইনজেকসন নিলাম, কিন্তু তাতে কিছুই হোল না। শেষে গুরুদেবকে বললাম। তিনি আমাকে এক তান্ত্রিকের কাছে যেতে বললেন। তান্ত্রিক বললো আমাকে শুকো-বাণ মারছে, এবং মারছে আমার ভাইপো। একভাবে পাঁচ-ছ মাস এই বাণ মারাৰ ফলে শেষে শুকিয়ে-শুকিয়ে আমি একদিন মরে যাবো।

— তুমি ওইসব বুলবুলকি বিশ্বাস করো ?

— যদি প্ল্যানচেট বিশ্বাস করি তাহলে যন্ত্রমন্ত্রই বা বিশ্বাস করবো না কেন ? তবে আমি শুধু শোনা-কথায় বিশ্বাস করিনি। আমি লোক লাগিয়েছিলাম, তাব মূখ থেকেই জানলাম, ভূদেব বাঘোন্মোহ দেখতে যায় না, প্রতি শনিবারে এক তান্ত্রিকের কাছে যায়। আমাদের কথাটা লুকোয়। দেখ, আজ শনিবার, আজ সে গেছে।

— তাতে তার লাভ ?

— বিষয়। আমি মরে গেলে সব বিষয় সে হাতে পাবে।

— তোমার তো ছেলেমেয়ে নেই, সে তো এমনই সব বিষয়ের মালিক হবে।

— সে তো অনেকদিন সবুর করতে হবে। ততদিন সবুর কবাব ইচ্ছা তার নেই।

মহাদেব বিষণ্ণ হাসি হাসলো।

— এর কোন প্রতিকার করেছ ?

— একটা মাদুলি নিয়েছি, তাতে তিন-চারদিন ভাল আছি।

— আশ্চর্য ব্যাপার।

— জীবনটাই আশ্চর্য বুদ্ধদেববাবু!

ভিতরে-ভিতরে ব্যাপারটা এতদূর এলেও বাইরে কিন্তু তাব কোন প্রকাশ ছিল না। কাকা-ভাইপোও যথারীতি আসতো আমাদের প্ল্যানচেটে বৈঠকে।

দিন যায়। ব্যাপারটাকে আমরা দু'ভাই বিশেষ কোন গুরুত্ব দিইনি। অনেক মানুষের অনেক রকম ধারণা থাকে। আমাদের মনে হয়েছিল মহাদেববাবুরও অনেক বিষয় সেইজন্য মনে তাব ভাইপো সম্পর্কে অমনি এক ধাবণা আছে। যাকগে, দেখতে-দেখতে পুত্র এসে পড়লো, মহাদেববাবু বললেন — এভাবে আর ভাল লাগছে না, দিন-কতক কলকাতাব বহির্বিষয়ে আসি। অবিরাম ব্র্যাক-আউটে মন বিধিয়ে গেছে।

কাক-ভাইপোয় একদিন কলকাতাব বাইরে চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে একখানি চিঠি পেলাম যে মহাদেববাবু রাজগীরে গিয়ে উঠেছেন, ওখানকাল উষ্ণ প্রসবণ ও পাহাড়ঘেরা গ্রাম্য পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তিনি এখন কিছুদিন ওইখানেই থাকবেন। তারপর কয়েক সপ্তাহ একেবারে চুপচাপ, আর কোন খবর নেই।

হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে জয়দেব বললো — দাদা, আশ্চর্য খবরবেব কাগজ দেখেছ ?

— কেন ? সকালেই তো পড়েছি।

— না, সব তুমি পড়নি! একটি খবর তোমাব নজর এড়িয়ে গেছে। কাগজের একটি পাতা খুলে ছোট্ট একটি খবরবেব দিকে জয়দেব আমাব দৃষ্টি আকর্ষণ করলো : 'রাজগীরে পাহাড় থেকে পতনের ফলে মৃত্যু।'

সংক্ষিপ্ত সংবাদ। কলকাতাব বিশিষ্ট বাবসায়ী মহাদেব ঘোষাল বায়ু পরিবর্তনের জন্য, রাজগীরে গিয়েছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় জরাসন্ধ বৈঠকের উপর তিনি বেড়াতে যেতেন। গত শনিবার সন্ধ্যার পর বৈঠক থেকে নেমে আসার সময় সহসা একটা সাপ দেখে তিনি ভয়ে পিছিয়ে যান। একেবারে পাহাড়ের কিনায়ায় ছিলেন, পদঙ্কাল হয়ে তিনি প্রায় শতাধিক ফুট নীচে পড়ে যান, তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে।

খবরটা পড়ে মনটা দুর্গত হ'লো, বললাম — সত্যি মানুষটি ভাল ছিল। এমনভাবে অপঘাতে মরলো! বড়ই দুঃখের কথা।

জয়দেব বললো — গত শনিবারে ব্যাপারটা ঘটেছে, আজ বুধবার।

আমার ফটো তোলাব একটা সখ আছে, এলবামের পর এলবাম সন্নিবেশিত ছবি তুলে। মহাদেববাবুর ছবিও তুলেছিলাম। সেলফ থেকে এলবামখানি নিয়ে দেখতে লাগলাম। জানা চেনা বন্ধুবান্ধবদের ছবিব মধ্যে মহাদেববাবুর ছবিও পেলাম। জয়দেবকেট গায় পুরোদস্তর দেশী পোশাকে তোলা ছবি।

ছবিটার পানে তাকিয়ে আছি, এমন সময় ঘবে এসে ঢুকলো ভূদেব। অশৌচের বেশ!
ক্লান্ত কণ্ঠে বললো — কাকাবাবুকে বেখে এলাম।

— হ্যাঁ, এইমাত্র কাগজে পড়লাম। ব্যাপারটা তো ভাল বুঝলাম না।

কি করে যে কি হলো, আমিও ভাল বুঝলাম না। জরাসন্ধ বৈঠকটা ঠিক উষ্ম প্রহরণেব উপবেই পাহাড়ের একটা ছাদ বলতে পারেন। কাকাবাবু আর আমি বোজ সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে বসে থাকতাম, সন্ধ্যার পর নেমে এসে স্নান করে হোটেল ফিৰতাম। শনিবার দিন যেই আমবা উঠবাব যোগাড় করছি অমনি একটা সাপ কোথা থেকে ছিটকে এসে পড়লো একেবারে কাকাবাবুর পায়ের কাছে, কাকাবাবু লাফিয়ে পিছু হটে গেলেন। কিন্তু সেখানে পিছু হটাব জায়গা কোথা, সে তো একেবারে পাহাড়ের কিনাবা। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে কাকাবাবু একবারে নীচে গিয়ে পড়লেন। একেবারে শ'খানেক ফুট নীচুতে পড়লে আর কি কিছু থাকে, আমি যখন নেমে এলাম, তখন আব করার কিছু নেই। মনে হলো, কলকাতায় নিয়ে আসি, তারপর ভেবে দেখলাম আর অতো হাঙ্গামা করে কাজ কি? শেষ যখন হয়ে গেল, তখন সব শেষ করেই যাই। চিতাভস্ম নিয়ে এসেছিলাম, কাল এখানকার গঙ্গায় দিলাম। চেয়ারবেব উপব কস্মলের আসনটা বিছিয়ে ভূদেব বিমর্ষভাবে বাসে পড়লো।

মহাদেববাবুর ফটোখানি তার সামনে ধবলাম, বললাম — এইমাত্র তোমার কাকাব ছবিখানা বের করলাম।

ছবিটার পানে তাকিয়ে ভূদেব চমকে উঠলো, বললো — এ কী!

আশ্চর্য। আমি তো এতক্ষণ এটা দেখিনি, ফটোয মহাদেববাবুর মুখে নীচেকার ঠোঁটেব উপব দিয়ে একটা লাল রেখা, হঠাৎ দেখলে বক্তেব দাগ বলে মনে হয়। এমন একটা দাগ তো এখানে থাকার কথা নয়। হাত দিয়ে দাগটা মুছতে গেলাম। সমস্ত মুখখানা লাল রঙে মাখামাখি হয়ে গেল। এই লাল বং এখানে এলো কোথা থেকে? আমার টেবিলে তো লাল কালি নেই।

— রক্তে কাকুব মুখখানা অমনিই হয়ে গিয়েছিল। ভূদেব বললো।

— কিন্তু এখানে লাল রং এলো কোথা থেকে? আমার এখানে তো লাল কালি অবধি নেই। আশ্চর্য!

বলতে-বলতে সহসা আমার মনে হলো, যেন হাতের এলবামখানা অত্যন্ত ভাবী হয়ে উঠছে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা। এলবামখানি হাতে ধরা যাচ্ছে না। জয়দেবকে বললাম — দেখ, দেখ, এলবামটা কেমন ভাবী হয়ে উঠলো, বরফেব ঠাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে।

জয়দেব তাড়াতাড়ি এলবামখানি হাতে নিল, নিয়েই টেবিলের উপর বেখে দিল, বললো — ফটোখানি প্রেতাবিষ্ট হয়েছে, মহাদেবের প্রেতাব্দ্যা এখন এই ঘবেই এসেছেন।

জয়দেব বিলিতি প্রেত-চর্চা সমিতির মাসিক পত্র মাঝে মাঝে পড়তো, বললো — আমি বিলিতি কাগজে পড়েছি এই ধরনের ব্যাপার। অপঘাতে যাদের মৃত্যু হয় তারা অনেক সময় তাদের শোবার ঘরে অথবা তাদের প্রিয় বন্ধু বা প্রিয় বস্তুর কাছে আসে, আর সেই আগমন বুঝতে পারা যায় এই একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ দিয়ে। এই এলবামখানি যেভাবে ঠাণ্ডা হয়েছে তাতে সেই কথাটিই সত্য বলে মনে হচ্ছে। এখন যদি প্ল্যানচেট চালানো যায়, তাহলে মহাদেববাবুর যা কিছু বলার আছে তা আমরা এখনি জানতে পাববো।

ভূদেব বললো — কিন্তু আমি তো আর বসতে পারবো না, আমাকে আরো কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। আমি এখন যাই।

ভূদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অন্যমনস্কের মত বেবিযে যাচ্ছিল, জয়দেব ডাকলো — আপনার কস্মলের আসনটা পড়ে রইল।

ভূদেব ফিরে এসে আসন তুলে নিলে।

জয়দেব বললো — দাঁড়ান।

ভূদেব দাঁড়ালো।

জয়দেব বললো — দেয়ালে আপনার দুটো ছায়া পড়ছে কেন? আলো তো আমাদের ঘবে একটা।

ভূদেব সভয়ে দেয়ালের পানে তাকালো, তারপর অস্থিভাবে বললো — আমি যাই, আমি যাই।

ভূদেব তাড়াতাড়ি ঘব থেকে বেরিয়ে গেল। ঘর পার হয়েই অন্ধকার বারান্দা, তারপরেই ফটক। পরক্ষণই ফটকের সামনে একটা পতনের শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি আমরা দুজনে বাইবে গেলাম। ভূদেব বারান্দায় শেষ সিঁড়ির কাছে পড়ে আছে। ডেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, ধরাধরি করে ঘবে এনে শুইয়ে দিলাম। চোখে-মুখে জল দিলাম। ধীরে-ধীরে ভূদেব চোখ মেললো! ভীতিবাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, গেছে?

— কে?

— সেই ছায়া?

— কিসেব কি — সাহস দিয়ে বললাম — তুমি জেগেই আছ। একটা ছায়া দেখে এতো ভয় পাচ্ছ?

— আপনি জানেন না, আপনি বুঝবেন ... ওই তো, ওই তো দাঁড়িয়ে আছে...

— কই, কোথায় কে?

— ওই যে জানলার বাইবে অন্ধকারে।

— আমবা জানালাব পানে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। বললাম — কই? কেউ তো নেই।

— ওই তো বয়েছে, আমি স্পষ্ট দেখছি। না-না-না — জানলাটা আপনি বন্ধ কবে দিন।

জানলাটি বন্ধ কবে দিলাম, ভূদেব ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো।

জয়দেবকে বললাম — বাড়িতে একটা খবর দাও, একজন ডাক্তার ডেকে আনো।

— বাড়িতে খবর দিয়ে কিছু হবে না। বাড়িতে সাবাবাত ধরে ছায়া আমার পাশে-পাশে থাকে। এখানেও ছাড়াই। ডাক্তার কি ভূতের সঙ্গে লড়বে? বাড়ি আমি এখন যাব না। তাব চেয়ে আমি এখানেই এখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই, তবু আপনাবা এখানে আছেন, একটু সাহস আছে!

— বেশ ত ঘুমোও না। বলো তো কোন ডাক্তারের কাছে গিয়ে একটা ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসি।

— দবকাব হবে না। বলে, ভূদেব চোখ বুজলো।

ঘণ্টাখানেক সেইভাবে কেটে গেল। মনে হলো ভূদেব ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়দেব কুসাবো রান্না করছিল। এসে বললো — রান্না শেষ হবে গেছে, উনি ঘুমোন, ততক্ষণ খেয়ে নিই। এসব তো আব উনি কিছু খাবেন না।

আমবা দু'জন খেতে চলে গেলাম।

আহার শেষ কবেছি, ঠিক এই সময় সহসা ভূদেবের আত্ননাদ শুনতে পেলাম, তাড়াতাড়ি হাত ধুয়েই ছুটে এলাম, ভূদেব সোফার উপরে বসে আছে, তাব দুই চোখ বিস্ময়িত, ভয় বাকুল। বললাম — কি হয়েছে?

ভূদেব সে কথাব কোন সাড়া দিল না। সামনের দেয়ালের পানে তাকিয়ে সে কখন বলছে — মাপ কবো কাকু। তুমি আমায় মাপ কবো। আমি ঝোঁকের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছি। সম্পত্তির লোভে আমার মাথা খাবাপ হয়ে গিয়েছিলো। না হলে তোমাকে কখনই আমি পাহাড়ের ওপর থেকে ঠেলে ফেলে দিতে পারি। তোমাকে আমি খুন কবো একথা কোনদিনই ভাবিনি, বাজগীবে হঠাৎ মাথাব মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। কী যে হলো, কী যে কবে বসলাম, এখনও তো ভেবে পাই না। তুমি আমায় মাপ কর কাকু।

রামাই দারোগার কার্যকলাপ

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনচিহ্ন বোঝা সতিই দুরূহ ব্যাপাব। মফস্বলের এই শহরটিতে নতুন যে দারোগাটি বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁর নাম রামচন্দ্র দত্ত। লোকেব মুখে মুখে তিনি ‘রামচন্দ্র’ বইলেন না, হয়ে গেলেন ‘রামাই দারোগা’। ভালোবেসে এই নামকরণ, না ঘৃণায়, তা বোঝা মুশকিল। তবে ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যতক্ষণ তিনি তদন্তে না বেরিয়ে থানায় আছেন, ততক্ষণ তাঁকে দেখা যেত তিনি নিজের চেযাবে বসে আছেন পাত্রমিত্র নিয়ে একেবারে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মতো। তাঁর সভায় থাকতেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা ইত্যাদি। ঢালাও চা আসছে আব তিনি মেতে আছেন জমজমাট আড্ডায়। শহরের কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের তিনি ডেকে ডেকে নিয়ে এসেছেন জমাট আসবে। ভদ্রলোক পুলিশ হলে হবে কী, তাঁর উৎসাহ সাহিত্যে, নাট্যে, আব বিবিধ শিল্পে। তাব মধ্যে কাকশিল্প, চাকশিল্প, দাকশিল্প, সবই আছে। এঁদের নিয়ে দিনরাত থানাব মধ্যে তাঁব ‘হো-হো-হা-হা’ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ কবে বই কী। থানাব লোকজনও বিস্ময়ে হতবাক। থানাব বড়বাবু যিনি তিনি যদি গম্ভীর না হয়ে এ রকম পাত্রমিত্র নিয়ে বসে হো-হো-হা-হা কবেন তাহলে লোকে তাঁকে মান্য কববে কতখানি? আব তদন্ত? ছোটোখাটো চুরি ছিনতাই ইত্যাদি তদন্তে তিনি যান না, অধস্তনদের পাঠান। ‘বড় কাজে’ অবশ্য তাঁব নিজে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে এখানে আসা অবধি তেমন ‘বড় কাজ’ আব ঘটল কই? হাই তুলে তাই একদিন তিনি তাঁব পাত্রমিত্রদের বললেন, মশাই, আপনাদের অঞ্চলটা কি একেবারে সাধুপুরুষদের স্বর্গ? একটাও ডাকাতি নেই, খুন নেই, ধর্ষণ নেই, এ কীবকম জায়গা? উত্তরে পাত্রমিত্ররা একটু কাষ্ঠহাসি হেসে দ্বিজেন্দ্রলাল বায়েব কর্তৃতাব সেই মোসাহেবদের মতো হাঁ-তা-বটেই তো বলে ধুরো তুলে ছেড়ে দেন।

এমন যে মফস্বল শহর, তাব মাইল চাবেক কি পাঁচেক দূবে —পশ্চিমে — একটা অস্ত্র পাড়গাঁ ছিল। একদিকে দিগন্তবিশারী ধানের মাঠ, অন্যদিকে গ্রাম, আব মাঝখানে চওড়া উঁচু সড়ক যাব ওপব দিয়ে আগেব দিনে যেত গরব গাড়িই বেশি, এখন আধঘণ্টা অন্তর অন্তর বাস যাচ্ছে দুইব আব এক শহর পাড়ি দিতে। তাব সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা যায় অটো বিস্কো। তাব ওপব সাইকেল বিস্কো তো আছেই। অনববতই দেখা যাচ্ছে তাদের, শহর থেকে সওয়াবি নিয়ে এ-গ্রাম সে-গ্রামে এসে থামছে। ঐ যে অস্ত্র পাড়গাঁয়েব কথাটা তুললাম? শহর এগিয়ে আসতে আসতে গ্রামটাতে এখন গ্রাস করে আব কী। আগে ছিল একখানা মাত্র ঝাঙাচোবা কোঠাবাড়ি, এখন হয়েছে আট-আটটি ছাদওয়াল কোঠা, একটি ছাড়া সাতটিই দোতলা। আগে ছিল দরমাব বেড়াওয়াল ঘবদোবই বেশি, এখন গোটাকতক ঘব বাদ দিয়ে বাকিগুলো সব ইটেব। ঘেঁষ দিয়ে ইট গাঁথা দেওয়াল, মাথায় পাকা ছাদ নয়, লাল লাল টালি বসানো। এ ছাড়া, সড়ক যেসে গড়ে উঠেছে ইট গাঁথা মাথায় টালি বসানো পাড়াব ছেলেদের ক্লাব ঘব ‘ইয়ুথ ক্লাব’। সেটা আবাব বছর খানেক হল ভেঙে তিনটুকবো হয়ে গড়ে উঠেছে

— কাছে-দূরে আবও দুটো ক্লাব ঘর, একটা 'নিউ ইয়ুথ ক্লাব' আর একটি 'যুবসংঘ'। এটাও ভাঙে ভাঙে করছে, 'নিউ যুবসংঘ' এই হয়ে দাঁড়াল বলে। শুধু 'ইয়ুথ ক্লাব' বা 'যুবসংঘ' বলা ভুল হল, বড় কবে ক্লাব ঘরের নাম লেখা থাকলেও নিচে থাকত গ্রামের নাম 'আরশিনগর'। আসলে সবাই মুখে মুখে বলে 'আরশি' কিন্তু 'শহর' এগিয়ে আসবার বেশ ধরে 'নগর' শব্দটি আরোপ করে রূপ দিয়েছে 'আরশিনগর'।

আমাদের বামাইদাবোগা সেদিন সভাস্থ হয়ে এই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করছিলেন। বলছিলেন বেড়ে নামটি তো মশাই, 'বাড়ি'ব কাছে আরশিনগর, ও এক ঘর পড়শি বসত করে।' সভাসদবা সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন 'আরে তা বটেই তো তা বটেই তো।'

বামাই বললেন তা, গায়ের মধ্যে তিন-তিনটে ক্লাবঘর যখন, তখন তিন-তিনটে 'মাতব্বর' নিশ্চয়ই আছেন। আমাদের খাতায় খুঁজে দেখলুম তিনজনই 'নানী' লোক, তার মধ্যে একজন তো বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর আবার গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকেই গতিবিধি বেশি। না-না, শহরের হৃদয়ের মধ্যে তিনি কমই বসবাস করেন, তাঁর ঝোঁক 'বর্ডার'-এর দিকে। বোধহয় বাপ-কাকাদের ছেড়ে আসা দেশটার দিকে তাঁব এখনো নাড়িব টান আছে, নইলে ঘন ঘন 'বুড়ি' ছুঁয়ে আসবার বাতীক কেন?

বটেই তো! বটেই তো! নামটা কী স্মার?

'স্মার' জবাব দিলেন, সাধুপুরুষদের আবার 'অষ্টোত্তব শতনাম' থাকে। ঐরও 'ওবর্ষে' দিয়ে তিনটি নাম আপাতত নথিভুক্ত আছে, 'অহিভূষণ', বোধহয় এটিই আসল নাম, অন্য দুটি হল 'বাঁকাকেষ্ট' আর 'জুলুম খাঁ'। সভাসদদের একজন বললেন, শেষের নামটি আমিও শুনেছি। বর্ডারের দিকে এই নামটারই চলন বেশি। রামাই বললেন, ঠিকই শুনেছেন, ঐ নামেই তিনি মাঝে মাঝে 'সীমানা' পার হয়ে যান।

কেন?

বামাই সুর করে বললেন, ডাক দেখি তোব বৈজ্ঞানিককে, সে কটা কেন'র উত্তর লেখে? আমাদেরও তাই, উত্তর এখনো জানা নেই, হাতের মুঠোয় যা আছে তা 'অনুমান' মাত্র।

কবি মন্তব্য করলেন, 'অনুপান' নহে।

রামাইয়ের সহাস্য উত্তর, নহে।

বামাই বর্ণিত এই যে 'জুলুম খাঁ', নিজেব গ্রামে তিনি 'বাঁকাকেষ্ট' বা কারও কারও কাছে 'বাঁকাদা' নামে পরিচিত। বেশ পেটানো লম্বা চেহারা, বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে বলেই মনে হয়। দিনমানে ঐকে গ্রামে সচরাচর বেশি দেখা যায় না, দেখা যায় সম্ভাব অঙ্ককার রীতিমতো গাড় হবাব পর। গ্রামের তিনটি ক্লাবঘরের তিনজন 'মাতব্বর'দের মধ্যে ইনি একজন হলেও এব প্রতাপ বেশি। অন্য ক্লাবদুটির 'মাতব্বর' যাবা তাবা ঐর জুকুমেব বাইবে যাবাব হিম্মৎ রাখেন না। ঐর নিজস্ব ক্লাবঘরটির নাম 'নিউ ইয়ুথ ক্লাব' এবং এটি স্থাপিত রয়েছে বড়রাস্তার ধারে বটে কিন্তু গ্রামের একেবারে প্রত্যন্ত সীমায়। এর ঘরের পাশ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। জঙ্গল মানে নানান গাছ-গাছালিব একত্র সমাবেশ, আম, কাঁঠাল থেকে সেগুন গাছ পর্যন্ত বিরাজমান। এছাড়া দেশটাতে গাছপালা ও ঝোপঝাড় তো আছেই। এই জঙ্গল পার হওয়ার পর অন্য গ্রামের সীমানা শুরু। সেই সীমানা পার হয়ে অন্য গ্রাম - গ্রামান্তরে যাওয়ার বাধা নিষেধ নেই। বাঁকাদা বা জুলুম খাঁ তো নয়ই। ওল্লাটের সবাই ওকে চেনে, কিন্তু ওর কাণ্ডকাবখানার বিরুদ্ধে একটা লোকও মুখ খুলতে সাহস পায় না। এমনি ওর দাপট। কার বা কাদের মদতে এই দাপট, তা আমাদের বলার দরকার নেই।

আরশি গ্রামে ভিতরে গোটা কয়েক পুকুর আছে। তার মধ্যে একটি পুকুরই বড়, তার একটা খাট রীতিমতো; শান বাঁধানো, ধা.প ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে জলের ভিতরে। সিঁড়িটা

ওপরের ধাপের সঙ্গে রয়েছে মানানসই একটা চাতাল। চাতালের মাঝখানে ঝাঁকড়া মাথা খুব বড় একটা আমগাছ, তাব গোড়া ঘিরে গোল করে আসন গাঁথা আছে, লোক এসে এখানে বসে দু-দণ্ড ছায়ায় জিবোতে পারে। পুকুরটা চওড়ায় বেশি নয়, কিন্তু লম্বায় অনেকখানি। বাঁধানো ঘাটের উপ্লেট দিকে পুকুরটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে কোনো বাঁধানো সিঁড়ি নেই, শুধু ঐ সীমায় যাবা বাস কবে, তাদের জন্য রয়েছে একটা ঘাটের মতন — তাল গাছের কাটা গুঁড়ি দিয়ে ধাপ বানানো। কাছেই এক-ইট দিয়ে গাঁথা, মাথায় টালি বসানো একটা বাড়ি, সেই বাড়ির মেয়েরা ঐ ঘাটে নেমেই বাসন মাজে, চান কবে, কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় ও বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ে ঐ ঘাটে না নেমে পুকুরেব পাশেব পায়ে-চলা পথটা ধরে হেঁটে সেই বাকবাকে বাঁধাঘাটটিতে এসে চান করছে। তখন হয়তো ঠিক-দুপুরবেলা ঘাটে আর কেউ নেই, শুধু তাব বয়সী একটি মেয়ে ছাড়া। এই মেয়েটি তাব বন্ধু। ওকে দেখেই সে নিজেব ঘাটে না নেমে এই ঘাটে চলে এসেছে। দুজনেবই বয়স চৌদ্দ-পনের। কাঁচা ঘাটের মেয়েটি শাড়ি পরেছে, তাকে মানিয়েছেও বেশ। গায়েব বঙ ফবসাব দিকে, দোহাবা চেহাবা, মুখখানি বড় মিষ্টি লাগে দেখতে। ছোট কপাল, টানা ভুরু, ভাসা-ভাসা চোখ, পাতলা ঠোঁট, মাথায় এক ঢাল চুল। ধনীব ঘরে জন্মালে, একটু ঘসা মাজা কবলে। একেই ডানা কাটা পবী বলে চালানো যেত। গবীব ঘরেব মেয়ে, দিনরাত মায়েব সঙ্গে খেটে মরে, যত্ন আভি বা উপযুক্ত খাবার দাবাব পায় কই? তাই শরীরে চাকচিকা নেই। তা সত্ত্বেও ইঠাৎ দেখলে ওকে মন্দ লাগে না। নামটিও উপযুক্ত, শ্রীমতী। তুলনায় ওর বন্ধুটি একটু লম্বা, গায়েব বঙ একটু চাপা, কিন্তু দেহসৌষ্ঠবে এ-ও কম যায় না। এ আবার শাড়ি পবে না, এব গায়ে সবসময়ই থাকে সালোয়ার কমিজ। নাম কেতকী, কিন্তু ডাকে সবাই 'কেয়া' বলে, যেমন শ্রীমতীকে লোকেবা ডাকে 'শ্রী ব'লে। উচ্চারণে 'শ্রী'কে শোনায় 'ছিবি'।

এই শ্রী যখন কলসি কাঁখে কাছে এসে দাঁড়াল, কেয়া একটু হেসে বললে, 'কীরে ছিবি, আছিস কেমন?'

ছিবি মুখটিপে হেসে বললে, যেমন রেখেছিস।

ওনা! ওকী কথা। আমি কাউকে বাখনেওয়ালী নাকি।

নয়ই বা কেন? আমাদের সবাব বাখনেওয়ালী তো তোব কথায় ওঠে বসে।

কেয়া বসিকতাটুকু উপভোগ করেও বললে এ যে তুই বান বলতে বাবণ বুঝলি। আমাব কথায় সে ওঠে-বসে, না, আমি তার কথায় উঠি বসি।

ছিবি এবাব হেসে ফেলল, বললে, কী বুঝছিস! শেষ পর্যন্ত বিয়ে কববে তো?

কেয়া বিয়েব কথায় লজ্জা পেল, বলল, দূর! আঠাবো বছব বয়েস আগে হোক তখন বিয়েব কথা ভাবব। টি-ভির বিজ্ঞাপন দেখিস না? আঠারো বছর বয়স না হলে —

ছিবি এবার স্পষ্টতই হেসে উঠল, তাবপর বলল, থাক আর ব্যাখানা করিস না! কত যেন আইন মেনে সব চলছে।

তা চলছে বই কী। যারা মানবার তারা মানছে, আর যারা মানবার নয়, তারা মানছে না।

ছিবি মুচকি হেসে বললে, বাঁকাদা কোন্ দলে? মানবার দলে, না, মানবার দলে নয়?

কেয়া বললে, জেনে শুনে কেন ন্যাকা সাজছিস।

বলেই স্বর পালটে বলে উঠল, এই শোন এখন কেউ কোথাও নেই, তোকে চুপি চুপি বলি, তুই একটু সাবধানে থাকিস। তোর ওপরও ওর নজর পড়েছে।

ধ্যাৎ, তুই থাকতে আমি।

কেয়া বললে পুরুষের নেশা ছুটতে কতক্ষণ? আজ আমি আছি, কাল হবি তুই।

কথাটা শুনে শ্রীমতী গম্ভীর হয়ে গেল, বললে, দেখ ভাই, ঠাট্টা করিস না! শুনে আমার যে ভয়ে বুক কাঁপে! গরিবের ঘরে জন্মেছি, যতটা পারি গতব খাটিয়ে মাকে সাহায্য করি। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, জল তোলা ছোট ভাই দুটোকে দেখা এই করেই আমার সময় কেটে যায়। এর ওপব শরীরের ওপর শকুনের চোখ যদি পড়ে — কথাটা সে শেষ কবতে পাবে না, গলাটা ধরে আসে।

কেয়া বললে, শরীরের ওপর কেন, মনের ওপর পড়তে পাবে না?

ও লোকের মন আছে? অবশ্যি এ-কথা তুই-ই ভালো বলতে পারিস।

কেয়া মন্তব্য কবল, মনের খবর আমিও জানি না। যা জানি তা শুধু তুই কেন, গোটা গাঁয়ের লোক জানে। ওর ভয়ে লোকে মুখ বুজে থাকে, টু শব্দটি করে না।

তোর বাপ-মা?

বাপ-মা কি গাঁ ছাড়া? ওরে গরিব আমরাও। আমাদের ঘরও এক ইঁট দিয়ে গাঁথা, মাথায় টালি। বাপ-মায়ের এই মেজো মেয়েটাকে কী করতে হয় বা না হয় তা তারা জানে, কিন্তু রা কাড়ে না লোকটার ভয়ে। পিস্তল, ছোরা, পেটো, কী ওর নেই?

এই খবরটা পুলিশ জানে না?

পুলিশ? ও-কথা না তোলাই ভালো।

শ্রীমতী বলে, তা যা-ই বলিস বাঁকা কেপ্টোর এলেন আছে, সবাইকে কেনন বশ কবে রেখেছে বল?

কেয়া হেসে উত্তর দেয়, তা বেখেছে। আমাকে তো রেখেই ছে, এব পর তোকেও বাখবে বলে মনে হয়।

ধোং, আয় চান কবতে নামি।

দুজনে চান কবতে নামে। দু-তিনটে ডুব দেবাব পব কেয়া আবাব বলে, হাঁবে, বাঁকাকে তোব মনে ধরে না?

দূর কী যে বলিস। ওসব ভাববাব আমার সময় নেই। তোকে বলোছি না?

কেয়া বললে, দেখতে শুনতে কিন্তু লোকটা খারাপ নয়।

কে বলেছে খারাপ? খারাপ কাজগুলো ছেড়ে দিক না? তাহলে লোকে ওর পূজো কববে।

তুই-ও পূজো কববি তো?

শ্রীমতী উত্তর দেয়, তা করব বই কী! পূজো কবার মতো লোককে পূজো কবব না?

তা বটে।

বাঁকা প্রসঙ্গের আপাতত এই খানেই সমাপ্তি ঘটে। ওরা চান করে যে যার বাড়ি চলে যায়।

কিন্তু বাড়ি গিয়েও স্বস্তি নেই। কেয়াকে সংসারের কাজ কিছু কিছু যে না করতে হয় এমন নয়। সেই হাতের কাজ করতে করতে ওর মনে ছিবির কথাগুলোই ওন ওন কবে বাজতে থাকে, ‘খাবাপ কাজগুলো ছেড়ে দিক না? তাহলে লোকে ওব পূজো কববে’। কথাগুলো কানের কাছে যত গুঞ্জন তুলতে থাকে, ততই ওর মনে অস্বস্তি, লাগে! তাহলে সে যা ভাবছিল তাই? ছিরিরও ভেতরে ভেতর বাঁকার ওপর টান আছে নাকি? ওর মন বলে, নিশ্চয়ই আছে। নইলে সে যখন বললে তুইও পূজো করবি তো? তখন সে বললে তা কবব বই কি, পূজো করবার মতো লোককে পূজো করব না?

ছোট থেকে ওবা একই সঙ্গে খেলাধুলো করতে করতে বড় হয়েছে, ছোট থেকে বাঁকাকেও দেখেছে বড় হতে, কিন্তু বড় হয়ে ছেলোটা অমন বিগড়ে গেল কেন? কেয়া জানে, তাব থেকে শ্রীমতীকে অনেক ভালো দেখতে। তাই ওকে দেখতে দেখতে আজকাল ওর মনে কী রকম যেন একটা জ্বালা ধবে। যদি বাঁকা ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শ্রীমতীব দিকে তাকায়।

এই আশঙ্কা থেকেই শ্রীমতীকেও কথাটা বলে ফেলেছিল, 'তোমার ওপর ওব নজব পড়েছে'। আসলে কথাটা স্বেচ্ছা বানানো। বাঁকা আব যাই কবক, তখনো পর্যন্ত কেয়া ছাড়া আব কারও দিকে নজর দেয়নি। তবু ওর ভয় যায় না। বাঁকা যে লুটেরা লোক, এ বিষয়ে ভুল নেই। ও লুট কবতে জানে, ভালোবাসতে জানবে কী? যখন দবকার হয় ওকে ক্লাবঘরে ডেকে পাঠায়। যখন ডেকে পাঠায়, তখন ক্লাব ঘরে সে থাকে একেবারে একা। কেয়া ঢুকতেই সে বাপ কবে সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দেয়, আব তাকে দুহাতে জপটে ধরে। হাত দুটো যেন লোহাব হাত। এক এক সময় মনে হয় যেন তাকে দু-হাত দিয়ে সাঁড়াশিব মতো টিপেই মেবে ফেলবে। তা এও মরণ বই কী! কাছে টেনে নিয়ে শুধু একবার বলবে, পিল খেয়েছিলি তো? নিজের কাছে নিজের স্বীকার কবতে লজ্জা নেই, সুটকেশ কিনে দিয়েছে ঐ বাঁকাই। দিয়েছে সালওয়াব কামজেব সঙ্গে দামী সাবান, স্নো পাউডার। দিতে সে কিছুই বাকি বাখেনি, তাব সঙ্গে ঐ 'পিল' লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে খেতে হয় কেন? গাঁয়েব মেয়ে বলে সে কিছু জানে না নাকি? টি ভি যদ্দিন থেকে এসেছে তদ্দিন থেকে গাঁয়েব মেয়েবাও জেনে গেছে। বিজ্ঞাপনগুলোতে তো সবই থাকে। 'অনুভব কবেছি তাই বলছি' থেকে ঐ 'পিল' ওলোব কথা! কিছু কি জানাতে বাকি বাখে ঐ বিজ্ঞাপনগুলো? এর পবে আছে 'গভীর বাতের ছবিওলো।' না, টি-ভি ছবিব কথা নয়, সে 'অনা' ছবিব কথা। ভি সি আর এনে যখন ওবা দেখে তখন একবার বাঁকাও তাকে ডেকে নিয়েছিল। গভীর বাতই হবে। তার জানলায় আস্তে আস্তে তিন টোকা। বাঁকার সংকেত। মা টেব পেনেও কিছু বলে না বা বলতে পাবে না। শুধু ফিসফিসিয়ে বলে, সাবধানে থাকিস।

বাত্রে সে মায়েব কাছেই শোয়। বাবার ঘব আলদা, হাঁপানী বোগী, প্রায়ই বাত জেগে কাটায় আব খক খক কবে কাশে। ছোট ভাই দুটোব ববস আট আব আব দশ, হাফপ্যান্ট পবে স্কুলে যায়, তাবা বাপেব খুব অনুগত। শোয়ও বাপেব কাছে। সে যে তাদের দবজা খুলে বাইবে গেল, বাপ কি টেব পেন না? পেনেও কিছু বলাব তাব সাধা নেই। জানালায় টোকা দিতে অবশ্য বাঁকাকেই নিজেই আসে। নিজেই তাকে অন্ধকারে টানতে টানতে ক্লাব ঘবে নিয়ে যায়। এইসব রাতে বাঁকা আব সবাইকে ভাগিয়ে দেয়, তাদের দেখা হয়ে গেলে আবাব ঐ 'ছবি' চালায় শুধু কেয়াব জন্য। পাশে বসিয়ে বলে, ভালো কবে দাখ। তুই আব আমি ছাড়া ঘবে কেউ নেই।

আহা! মেমসায়েবওলো বয়েছে না?

বাঁকা অবাক হয়ে বলে, মেমসাহেব! মেমসায়েব কোথায়!

কেয়া উত্তর দেয়, কোথায় আবাব। ঐ ছবিতো। মাগো কী ঘেন্না!

ছবি দেখতে দেখতে ও যত 'ঘেন্না-ঘেন্না' বলে, তত মজা পায বাঁকা। ও যত চোখ বোজে, তত হি হি কবে হাসে বাঁকা। কেয়াব শরীরটা কাঁপতে থাকে, গলার ভিতবে বমি বামন ভাব আসে, বিতৃষ্ণায় সারা মন ভবে যায়। ছবি অবশ্য বড় নয়, বাপ করেই শেষ হয়ে যায়। আর শেষ হওয়া মাত্রই ওব ওপব পড়ে বাঁকা মহাজন যেন তাব দেনা উসূল কবে নেয়। চোখের জল মুছতে মুছতে কেয়া বাড়ি আসে। এ-সময় বাঁকাও কী বকম যে বেইশ হয়ে শতরঞ্জিব ওপব পড়ে থাকে, তার হাতে যে টাকা তুলে দেওয়া উচিত, তা-ও সে দেয় না। কেয়া অন্ধকারেই ফিবে আসে, সাপেই কাটুক বা শেবালে কামডাক তাতে তাব কী? অথচ কেয়াব বিছু হয় না। তার পায়ের শব্দে সাপ শেয়াল সবই বোধহয় এক এক কবে সবে যায়। আব তাদের পাড়াব মধ্যে ঢোকামাত্র কুকুঁবওলো একবার মাত্র ডেকে ওঠে, তাকে চিনতে পেরেই তারা চূপ করে, আব ডাকে না। ভেজানো দবজা খুলে সে ভেতবে ঢোকে। মা যে তখনো জেগে আছে তা সে বুঝতে পাবে। বুঝতে পাবে না কোনো সাড়া না দিয়ে ঘুমের

ভান করে পড়ে বয়েছে। কিন্তু এ সব দেখে সে উচ্চবাচ্য করে না। উঠানে নেমে রান্নাঘরের লাগোয়া একচিলতে যেবা জায়গায় টিনভর্তি যে জল ধরা থাকে, তা দিয়ে ঘাড়ে মাথায় মুখে পায়ে জল ঢেলে একটু ঠাণ্ডা হয়ে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। মাথায় জল দেওয়ার পরেও আগুন নেভে না, ঘুম আসে না, সে ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে থাকে, চোখে বাববাব তুল এসে পড়ে। বারবাব নিজেকে প্রশ্ন কবে, একে কি ভালোবাসা বলে? সে দেখেছে হিন্দি ছবিতে 'পেয়ার' হলে সে 'পেয়ার' আর কখনো ভাঙে না, কিন্তু এখানে সঙ্গে সঙ্গে টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। অথচ তার কিশোরী বয়স থেকেই সে স্বপ্ন দেখত এক ধবনোব ভালোবাসাব যাব সঙ্গে বাঁকার এই ব্যবহারের কোনো মিল নেই। এ যেন ভ্রমুখাব-জলখাব বলতে বলতে এক গেলাস জল খেয়ে গেলাসটা অর্ধ টক করে টেবিলের ওপর বেখে তাড়াতাড়ি অন্য কাজে প্রস্থান করা!

বাঁকা তই ক'রে। কেয়ার সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাঁচ মিনিটের। তারপরে সে কেয়াকে দু-হাত দিয়ে তেলে দেয়, যা পাল্লা পাল্লা!

সে চাবুক-খাওয়া ভ্রমুব মতো পালিয়ে আসে। অথচ, ওকে তো অস্বীকারও করা যায় না। ও যে মাঝে মাঝে জামা কাপড় দেয়, দবকাবি জিনিসপত্র পাঠায়, টাকাও দেয়। তাদের ঘবে ছিল ছেঁচা বাঁশের বেড়া, ওর দযাতেই তো ইটের দেওয়ান উঠেছে। তবু কি একে ভালোবাসাব সম্পর্ক বলা চলে? এইটুকু বয়সেই কেয়া বুঝতে পারে, এ সব নিছক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। আবার এটুকু না হলে তাদের সংসারই বা চলে কী কবে? তাব বাবা শহবে এক কাপড়ের দোকানের কর্মচারী মাত্র, তাতে আব কটা টাকা বা ঘবে আসে? যেটুকু আসে তা দিয়ে আত্মকালকাব দিনে চলে কি? তাই মা বাবা সব বুঝেও না লোঝাব ভান কবে। সারা গ্রামের লোকও কি জানে না? সব জানে, ভয়ে কিছু বলতে পারে না। ছোঁড়ারাও পারে না, বুড়োবাও পারে না। আতঙ্কের মুণ্ডবে তাদের কোমব ভেঙে গেছে।

কেয়া সব মেনে নিয়ে একেও 'ভালোবাসা' বলে ভাবতে চেষ্টা করত। ভাবত বিয়ে না করলেও বাঁকাকেই তার স্বামী। কত স্বামী কত বউকে যন্ত্র করে না, তাবা এক হাতে চোখেব জল মুছে অন্য হাতে সংসারের যাবতীয় কাজ কবে বেড়াই। তাদের মতো সে নিজেও বা পারবে না কেন? কিন্তু বাঁকার কি সংসার আছে? বাড়ি বলে একটা বস্তু তাব আছে বটে, সেখানে এক পাতানো বুড়ি পিসিমা ছাড়া আব কেউ নেই। এছাড়া, সে বাড়িতে বাঁকা থাকে কতক্ষণ? রাত্রে যে সেখানে শুতে যাবে তাও বহু দিন হয় না, ক্লাবঘবে 'গভীর বাতের ছায়াছবি' দেখে বাকি রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেয়। পিসি ডাকতে এলে তাকে 'দুবছাই' কবে তাড়িয়ে দেয়।

একদিন কেয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা তোমার বাপ মা নেই?

উত্তরে সে খেঁকিয়ে উঠেছিল, তা দিয়ে তোর দরকার কী? তুই যেমন আছিস তেমনি থাক।

আর একদিন মাব জবানীতে বলেছিল, মা বলছিল, তুই কি এ ভাবে কাল কাটাবি? বিয়ে করবি না?

বাঁকা শুনে চোখ বড় বড় করে মস্তব্য করেছিল, তা করনা! কে বারণ করছে?

তোমার আপত্তি নেই।

আমি কি তোর বিয়ে-করা বর, যে আপত্তি থাকবে?

কেয়া বলেছিল, বর তো হতেও পারো।

বাঁকা ওর চুল মুঠি কবে ধরে এক টান দিয়ে বলেছিল, ওসব খোয়াব ছাড়।

কেয়া নিজের চুল কোনোমতে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, তাহলে মাকে কি বলব আমার সম্বন্ধ দেখতে?

বলনা দেখতে। এক বেটাকে ছাদনতলায় ধরে নিয়ে আয়, আমি একটু হাতের সুখ করিনি।
মানে!

বাঁকা বললে, হাত পা ভেঙে লাড়ু করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দেব।

এই তো! দিবা হিংসে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

আবে। ওসব হিংসে-হিংসি বাখ! আমাব হচ্ছে হিসেবেব কর্ডি! হিসেব ছাড়া বুঝি না।
যদিই এ মেজাজ থাকছে, তদিই তোকে কাছে ডাকব! তারপরে পেছনে মারব লাখি, পগাব
পাব হবার পব যাব গলায় খুশি বুলে পডিস, দেখতে আসব না। কিন্তু এর মাঝখানে যদি
কারও সঙ্গে লটর পটর কবো তো, একদিন গর্দান যাবে, সাফ বলে দিলুম।

কেয়া বললে, বাঁকাদা এসব কথা আসে কোথেকে? আমাকে একটু ভালোবেসে দ্যাখো
না, আমি চিবদিনেব দাসী হবেই থাকতে চাই।

দাখ, এসব ইনিযে-বিনিযে বাংলা সিনেমার ভাষা আমাকে বলিস না। আমাব মাথা
ধরে যায়।

তাহলে কি হিন্দি সিনেমাব ভাষা বলব?

তুই পারবি? তাহলে সে বকম পোশাক পবতে হয়, বাগানে যেতে হয়, নেচে নেচে
গইতে হয় 'বাহো মে আ যা-ও, সাভন হো ত্তো পর্দা কেয়া?'

ওটা কী বললে? ওব মানে কী?

আবে. মানে ফানে ছেড়ে দে! তুই বাগানে গিয়ে নাচতে পারবি, গাইতে পারবি?

কেন পারব না? তুনি শিখিয়ে দেবাব ব্যবস্থা কব?

আবে ফোট! নাচবি ঝর সঙ্গে?

কেন তোমার সঙ্গে?

আমার সে সময় কোথায়? নে এখন যা। বকবক কবিসে আমার মাথা ধবিযে দিলে
একেবারে। পা — ল!

কেয়া উঠে দবজা পর্যন্ত গিয়েও ফিবে দাঁড়াল, বলল, তোমাব আব কী, তুমি তো
সবসময়ই বল পালা আর পালা। আমিই শুধু কলঙ্কের ডালি মাথায় বয়ে বেড়াই।

বাঁকা ক্লাবঘরের সেই শতবর্ষের ওপবই শুয়ে ছিল, এবার উঠে বসল, এই। আবাব তুই
বাংলা সিনেমার ভাষায় কথা বলছিস। যা বলবি সোজাসুজি বল। কে তোকে বলল দিয়েছে?
কেন দিয়েছে? তাব নাম বল, তাব মুণ্ডটা ছিড়ে নিয়ে আসব।

ওঃ! খুব মুরোদ!

বলে, কেয়া আব দাঁড়ায়নি, অন্ধকাবে কোনো রকমে পথ চিনে যেমন আসে, তেমনি
ফিবে এসেছিল ঘরে।

কিন্তু এইসব স্মৃতিব ক্ষত তাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দেয় না, তাব অন্তবকে যেন কুবে কুবে
খায়। তার সঙ্গে বাঁকার সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক নয়। তবু ঘবের বাইরে দিবালোকে
বেকলে লোকে তখন তার দিকে তাকায়, তখন তাব মনে হয়, তারা মুখ ফুটে না বললেও
তাকে বাঁকার প্রণয়িনী ভেবে মনে মনে থিক্বার দিচ্ছে। এ যে কী হ্রালা, তা যার অভিজ্ঞতা
না হয়েছে সে বুঝবে না! বাঁকা যেমন তাকে খেলার পুতুল ভাবে, কেয়াও বাঁকাকে তার
বেশি ভাবতে চেষ্টা করে না। কিন্তু সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে বাঁকার চিন্তাই তার মনে আসে, আর
কিছু যেন তার ভাববার নেই, অনুক্ষণ শুধু বাঁকা আর বাঁকা।

এ-রকম অবস্থায় দেখা হয়ে যায় 'ছিরি'র সঙ্গেই, প্রায়ই। 'ছিরি'-ও কি সব-সময়ে তাব
মতো বাঁকার কথা ভাবে? নইলে তাকে দেখামাত্রই বাঁকার কথা তোলে কেন? সেদিন
বললে, এই, কাল দেখলুম তোর বাঁকাকেষ্টকে, একেবারে দিনদুপুরে।

কোথায়?

এই পুকুরে। একা একা মান করছিল, জামা-প্যান্ট ঘাটে রেখে, একটা জাঙিয়া পবে।

তুই তখন কোথায় ছিলি?

ওপাৰে, আমাদের ঘাটের ধাৰে।

তোকে ও দেখেছিল?

কী করে দেখবে? আমি ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কেন? তোব আবার নতুন করে ওকে দেখবাব কী ছিল?

ছিলবে ছিল। জামাকাপড় পৰা ছাড়া খালি গায়ে ওকে তো কখনো দেখিনি! সত্যি কেয়া, ওব মুখটাই শুধু বোদে পুড়ে পুড়ে কালো হয়েছে, বুকটা হয়নি। ওব বুকটা এখনো ধবধবে ফৰসা!

না হয় তাই। তাতে হলটা কী?

‘শ্রী’ বললে, হলটা কী জানিস? মনে হল, ওকে যদি কেউ ভালোব দিকে ফিৰিয়ে আনতে পারে, তাহলে দেখা যাবে, ওব মতো মানুষ আৰ হয় না!

কেয়া বলে উঠল, তা তুই-ই দেখ না। ভালোব দিকে ফিৰিয়ে আনতে পারিস কিনা।

আহা! আমি কী কবে পাবব? আমি কি ওব সঙ্গে মিশি?

ছেলেবেলায় তো মিশতিস?

ছেলেবেলাব কথা ছেড়ে দে। বাপ-মা-মরা ছেলে দেখে মায়া হত!

আব এখন? এখন মায়া হয় না? হয়, স্বীকাৰ কবতে চাস না।

‘ছবি’ বললে, ওসব কথা ছাড়। তুই-ই ওকে ফেরাতে পারিস। একমাত্র তুই। সেজনাই কথাটা তোকে বললাম। ও তোকে ভালোবাসে — একমাত্র তোকেই ভালোবাসে।

‘কেয়া’ব মতো মুখবা মেয়েও একথাব জবাব দিতে পারে না, চোখের জল গোপন কবে ‘শ্রী’ব কাছ থেকে সবে আসে। বাড়ি যায় না, জঙ্গলে গিয়ে আগ্নেয়াগোপন কবে, কথাগুলো তাব মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। তার বয়েস অল্প হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতা কম নয়। বাঁকাব সঙ্গে মিশে তার অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে? কিন্তু একে যে পুতুল-খেলা বলে, ভালোবাসা বলে না। একথা কী কবে বোঝাবে সে শ্রীমতীকে। ‘ছবি’ কতটুকু জানে তাব ও বাঁকাব সম্বন্ধে? মনে মনে কেয়া বলতে থাকে শ্রীমতীব উদ্দেশে - মুখপুড়ি, তুই গিয়ে ভালোবাস। তোব কপ নির্লজ্জব মতো দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে, তুই গিয়ে ওকে কাপেব ঝলক দেখিয়ে বশ কর। কবে, কেমন তুই ওকে ফেরাতে পারিস দেখব। আব না পারিস তো, তুই মববি — মববি — মববি!

কিন্তু এততেও স্ফোভ মিটল না, আব একদিন দুপূবে ওকে ওপাব থেকে এপাৰে স্নানব ঘাটে ডেকে আনল কেয়া। সেদিনও ঘাটে তারা দুজন ছাড়া আব কেউ ছিল না। মনোব জ্বালায় শ্রীব সঙ্গে ইচ্ছে কবে কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল কেয়া। প্রসঙ্গ ছিল এ এক — বাঁকাকে। কেয়া বলে উঠল, তোব তো শরীৰে কাপেব গাওে কপ ভোসে যাচ্ছে, তুই-ই যা না একদিন ওর কাছে, দেখ না কপ দিয়ে ওকে ভালোতে পারিস কি না। ছেনালীতে তুই-ও বম যাবি না।

কী বললি! আমি ছেনাল! তোব মতো।

তোব মতো মানে! আমার সম্বন্ধে কী জানিস — কতটুকু জানিস!

রাগেব মাথায শ্রীমতীও বলে ওঠে, সবটুকু জানি। গায়েব লোকেবাও জানে। ভয়ে লোকে কিছু বলে না তাই। ছেনাল মেয়ে বেহায়া — মেয়ে। অন্যকে ‘ছেনাল’ বলতে তোব মুখ খসে যায় না!

কেয়া ক্ষেপে যায়, বলে, তুই বেহায়া — তুই ছেনাল! লুকিয়ে লুকিয়ে ওব চান কবা দেখিস, লুকিয়ে লুকিয়ে ওব সঙ্গে প্রেম কবিস — আমি জানি না কিছু — বুঝি না কিছু। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রীমতী, তাবপরে চাপা গলায় বলে, কী বললি! আমি প্রেম কবি! ওবে! আমি প্রেম করলে ঠিক ওকে ভালোব দিকে নিয়ে আসতুম।

কেয়া চিংকার করে বললে, তা নিয়ে আয় না! ছেনাল মাগী! বেহায়া মাগী! আমাকে ছেনাল বলা — বেহায়া বলা! এমন অপমান! ওকে যদি বলে দেই, তাহলে তোব অবস্থা কী হবে জানিস।

যা যা বল্গে যা তোর পেয়ারেব লোককে! না হয় আমাকে মেবে ফেলবে। এই তো! এব বেশি কিছু তো নয়! ওবে ওব হাতে তোব মত হামলে পড়াব চেয়ে মরণও ভালো!

তাই মব তুই! মুখপুড়ি — হস্তচ্ছাড়ি — বেহায়া মেয়ে। এব শোধ যদি না নেই তো আমার নাম 'কেয়া' নয়।

বলতে বলতে দুন্দাম পা ফেলে কেয়া চলে গেল। কলসি হাতে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল শ্রীমতী, তাব পবে জলে নেমে কয়েকটা ডুব দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

সেই সময়, ঠিক সেই সময় কী কাবণে কে জানে, দিনমানে বাঁকাকেষ্ট গায়ে আসছিল, বাড়িতে পিসিমাব হাতে রাঁধা ভাত খাচ্ছিল, দু-একবার ক্লাবঘবে এসেও বসছিল। তাব যা কাজ, বোধ হয় তাবই ডেব টেনে তাকে দিনকয়েক আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছিল। তখনো ঠিক দুপুব হয়নি, সূর্য মাথাব ওপবে আসেনি, ক্লাবঘবে বসে দুই সাঙাতেব সঙ্গে কথা বলছিল বাঁকাকেষ্ট, সামনে একটা বোতল খোলা, এমন সময় হন হন কবে এসে ঢুকল কেয়া। এমন সে কখনো কবে না, না ডাকলে সে কখনো আসে না, তাই তাকে আসতে দেখে গুধু সাঙাতবা কেন, বাঁকাও অবাক হয়ে গেল।

কী বে! তুই।

কেযাব চোখে জল। বললে, আমাকে অপমান কবেছে।

কে?

'ছবি'।

'ছবি' কে? ও, সেই ডবকা মেয়েটা। যাব বাপ বাঙাবে যায় তবি তবকারি বিক্ৰি কবতে? হ্যাঁ-হ্যাঁ — সেই। তুমি তাকে খুব চেন — ছোটবেলায় খুব দেখেছ।

তা, ঘানঘান না কবে কী সে কবেছে বল্ না। এমন খাণাবনী হয়ে অসময়ে ছুটে এলি কেন?

কেযা কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার আব লজ্জা কী। আমার আব আবক কী! আমাকে 'ছেনাল' বলেছে। আমি যে তোমাব কাছে আসি, তা নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে, আমাকে 'কলঙ্ক' দিয়েছে, 'বেহায়া' বলেছে, 'ছেনাল' বলেছে! তোমাকে নিয়েই কথা! তুমি সহ্য কববে?

'না-কবব না' — বলে উঠে দাঁড়াল বাঁকাকেষ্ট, তার চোখালটা শব্দ দেখাচ্ছে, চোখদুটো আরক্তিম, বললে, ও কোথায় রে।

পুকবে। ওদেব নিজেদেব ঘাটে বাসন মাজছে।

দেখছি। বলে এগোতে গিয়ে বাঁকাব পা লেগে মদের বোতলটা গড়িয়ে পড়ল। বোতলে যেটুকু মদ অবশিষ্ট ছিল, তা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ল। কিন্তু তাতে ও ক্ষেপ কবল না, হন হন কবে বেবিয়ে এল ঘর থেকে। একবাবে সোজা চলে এল 'শ্রী'দেব ঘাটে, শ্রী সেখানে বসে তখনো বাসন মাজছিল। ওপাবে বাঁধাঘাটে তখন অনেকেই স্নান কবছিল, পুকব পাডেব বাগানে একটা রাখাল গক চরাচ্ছিল। এমন কি জানালা দিয়ে ওকে সাক্ষেদ দুটিকে নিয়ে অমন কবে ছুটে আসতে দেখে 'ছবি'ব মা-ও ঘবের কাজ ফেলে ঘাটের দিকে ছুটে আসছিল।

কিন্তু তিনি আসবার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। মেয়েতে-বাঁকাতে কী কথা হয়েছিল তিনি জানেন না, তিনি আসতে আসতে দেখলেন, মেয়ের গলা টিপে ধরেছে বাঁকা। তিনি যখন ঘাটের কাছে এলেন, তখন মেয়ে পড়ে আছে নিচে, উপুড় হয়ে। অর্ধেক দেহ তাব মাটিতে, অর্ধেক জলে।

কী হল গো কী হল! — মা চিৎকার কবে উঠলেন, আমার মেয়েবা কী হল!

কখে দাঁড়াল বাঁকা, চৈঁচিয়ে উঠল, খববদার! চিল্লালে একেবারে শেষ কবে দেব। কেউ যদি এ-ব্যাপার নিয়ে টু শব্দ কবে, তাহলে আর রক্ষে নেই। লাশ পড়ে থাকবে!

সবাই শুনল ওর কথা। ছিরির মা শুনল, বাখালটা শুনল, ঘাটে অতগুলো লোক চান কবছিল, তারা শুনল। আতঙ্কে কেউ 'রা' কাড়ল না। তাব সাঙাংবা তো করবেই না, কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা তাব তথাকথিত প্রণয়িনী কেয়াও না। বীবদর্পে পা ফেলে তাঁর ক্লাববাবে ফিরে গেলেন বাঁকাকেষ্ট।

যথাসময়ে গাঁয়ের চৌকিদার মারফৎ খববটা পেলেন রামাই দাবোগা। পাত্রমিত্রবা তখনো তাঁকে ঘিরে বসে ছিল। আসছিল চা আর আলুর চপ। অনেক দিন পবে থানায় একটা 'বড কাজ'-এব খবব এসেছে, থানার বড়বাবুর তো নড়েচড়ে বসা উচিত। কিন্তু তিনি তা কবলেন না। ডেকে পাঠালেন সেকেণ্ড অফিসার প্রদোংবাবুকে, বললেন, যান মশাই, তদন্তদন্ত করে আসুন, লাশ চালান দিন, ডাক্তার থেকে মর্গ, সব ঝামেলাই আজ পোযান দেখি আপনি, ইবাং মান, আব হ্যাঁ, সাক্ষীদের এজাহাব নিতে ভুলবেন না, 'খুন' এব ব্যাপাবে ওটাই আসল জিনিস।

প্রদোংবাবু 'জো হুকুম' বলে যথাবীতি পুলিশী সম্মান জানিয়ে চলে গেলেন। রামাই দারোগা পাত্রমিত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আকাশ মেঘলা-মেঘলা— দিনটা বেশ জমেছিল মশাই! 'আষাঢ়সা প্রথম দিবসে মেঘমাম্মিয়া সাযুং'— কী বলেন? অ্যাঁ। 'বপ্রক্ৰীড়াপবিণত গজং প্রেক্ষণীয়ং, দদর্শ — তাই না?

'তারা' বললেন, হ্যাঁ, তা বটেই তো, তা বটেই তো।

বড়বাবু 'কালিদাস' থেকে মনটাকে সামান্য একটু সবিয়ে বলে উঠলেন, এ ঠিক ঐ ব্যাটা 'বাঁকাকেষ্ট'র কাজ। কী বলেন?

দারুশিল্পীটি এবার মুখ খুললেন, বললেন, চৌকিদার তার নাম বলেছে কি?

রামাই বললেন, কী কবে বলবে? সে তো কিছু চোখে দেখেনি।

কারুশিল্পীটি বললেন, অন্য কেউ।

রামাই বললেন, সেই খবরই তো আনতে পাঠানুম। প্রদোংবাবু খুব উৎসাহী মানুষ, ও ঠিক খবব বার করে আনবে।

কিন্তু দিনেব শেষে সব কাজ মিটিয়ে প্রদোংবাবু ফিরে এসে বললেন, এক ব্যাটা সাক্ষীও পাওয়া গেল না। কেউ কিছু দেখেনি। ওর মা-ও না।

বাপ?

তিনি বাড়িতেই ছিলেন না। হাটে গিয়েছিলেন।

মা খুব কান্নাকাটি করছে তো?

তা করছে।

আপনি জেরা করেছেন?

তা করেছি। কিন্তু ঐ এক কথা। তিনি কিছু দেখেননি, মেয়ে ঘাটের ওপর মবে পড়ে আছে, এটুকু ছাড়া। ঠিক আছে। ফোরেনসিক রিপোর্ট আসুক। তারপর দেখা যাবে।

সেদিন গভীর রাত্রের তলব মতো কেয়া যখন ‘যুব সংঘ’-এব ঘরে এল, তখন যথারীতি ঘরে বাঁকা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওর কাছে গিয়ে কেয়া কেঁদে ফেলল, তুমি একী করলে।

কী করলুম! আমি তো ওখানে ছিলুমই না। কেউ আমাকে দেখিনি। তুই-ও না। পুলিশকে তো তোরা এই কথাই বলেছিস।

কেয়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, তা পুলিশকে যা বলবার বলেছি, কিন্তু তোমাকেও কি তাই বলব? তুমি তাকে একটু কড়কে দেবে, এই ভেবেছিলুম। তাকে যে একেবারে ‘শেষ’ করে দেবে, এ কে ভাবতে পেবেছিল?

দাখ গোখরো সাপ নিয়ে খেলা করছিল। সে যখন উত্তাক্ত হয়ে ছোবল মারে, তখন সবটুকু বিষই ঢেলে দেয়। এটা তোব জানা উচিত ছিল।

হ্যাঁ, দোষ আমারও। আমার ওসব কথা তোমাকে বলা উচিত হয়নি। আমাকে তুমি শাস্তি দাও। বলে, সে ডুকরে কেঁদে উঠল। ওকে দুহাতে কাছে টেনে নিয়ে বাঁকা বললে। কী শাস্তি তুই চাস, বল? সে-শাস্তিই দেব।

আমাকে মেবে ফেল। অমনি কবে — দুহাতে গলা টিপে।

মুহূর্তে কেয়ার বুকের কাছ থেকে বাঁকান হাতটা সরে যায়। মুহূর্তে উন্মনা হয় সে! ঠিক সেই মুহূর্তটিকে মনে পড়ে। ছোটবেলায় তো ওকে ‘বুড়ি’ বলে সবাই ডাকত, ও-ও ডাকত। সেই বুড়ি কবে শ্রীমতী হল, ‘শ্রী’ হল, ‘ছিবি’ হল, কে জানে। তার গলায় হাত দিতে সে অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল বাঁকা তাকে কী করতে যাচ্ছে, কিন্তু সে গলায় হাত দিতেই — তাব ছোঁয়া পেয়ে — মেয়েটা যেন কেমন হয়ে গেল, দুটি চোখ বুজে ফেলল, নিজের হাত দুটো শিথিল করে দিল, দুটি হাত দিয়ে সে প্রতিরোধও করল না। তাতে বাঁকান মাথায় আবও যেন খুন চড়ে গেল! একটা টিমে পাখিকে টিপে মারার মতন কবে সে ‘ওকে’ শেষ করে দিল।

ওকে উন্মনা দেখে কেয়া একটু অবাক হয়েছিল, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কী তুমি কবলে বলো তো? ‘ছিরি’ তোমাকে মনে মনে ভীষণ ভালোবাসত। তোমাকে একদিন পুকুরে চান কবতে দেখে আমাকে কী বলেছিল জান? বলছিল, বোদে পুড়ে পুড়ে ওর মুখটা কালো হয়েছে, কিন্তু বুকের কাছটা ঠিক আগের মতোই ফুসে আছে। ওকে যদি ভালোর দিকে ফেরানো যায় তাহলে দেখবি ও এক নতুন মানুষ হয়ে উঠবে।

বাঁকা এবার অবাক হয়ে কেয়ার মুখের দিকে তাকাল, ফিসফিস কবে বলার মতো সুরে বলল, তুই কি হিংসে করতিস, নারে। সত্যি করে বল।

দু-হাতে মুখ ঢাকল কেয়া, তারপর কান্নাভরা গলায় বলতে লাগল, হ্যাঁ, হিংসে করতুম। হিংসে করতুম ওব রূপকে। হিংসে করতুম ওব মনটাকে। ও তোমাকে ভালো করতে চাইত, অন্ধকারকে আলো করতে চাইত!

এর উত্তরে অবাক-করা গলায় বাঁকা বললে, তোকে আজ ছেড়ে দিচ্ছি। তুই বাড়ি যা। রোজ অন্ধকারে যাস, আজ যেতে হবে না, ঐ টর্চটা নিয়ে যা।

স্তম্ভিত হয়ে গেল কেয়া। বললে, সত্যি বলছ। বাড়ি যাব!

হ্যাঁ।

আর কখনো আসব না?

বাঁকা খোঁকিয়ে উঠল, কখনও আসবি না কে বলছে! যখন ডাকব, তখনি আসবি। কিন্তু আজ তুই যা। আর কিছু ভালো লাগছে না।

এক মুহূর্ত চুপ কবে ওব দিকে তাকিয়ে থেকে কেয়া বললে, ঐ আলমাবিতে বোতল আছে না? ওটা নিয়ে এসে খেতে আরম্ভ কর।

বাঁকা উঠে বসে প্রচণ্ড বাগে চিৎকার করে উঠল, হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই খেতে আরম্ভ কবব। তুই ভেবেছিলি কীরে শালী? আমি ওটা খাব না তো কী, জঙ্গলে গিয়ে গলায় দড়ি দেব! যা ভাগ —নইলে এক লাখি মেরে দরজার বাইরে বাব করে দেব! পা — লা!

কেয়া আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এল। টর্চটা সে নিল না। রোজ যেমন অন্ধকারেই সে ফিরে যায়, তেমনি ফিরে যেতে লাগল।

সেদিন থেকে দেখা গেল বাঁকা আব বড় গাঁয়ের বাইরে যাচ্ছে না। যদি বাব হয়, তো, খানিক পরেই ফিরে আসে। সাইকেলটা বাড়িতে বেখে। হ্যাঁ সে কখনো ক্লাব ঘরে আসে, কখনো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কেন, কে জানে। এবা অন্ধকার জগতের মানুষ, এদেব বোঝা শক্ত, এদের গতিবিধি বোঝা আরও শক্ত। গাঁয়ে সে রাতেও থাকে, বিশেষ করে বাত একটু বেশি হলে সে ফিরে আসেই। ক্লাবেও যায়, কিন্তু আজকাল আব কেয়াকেও সে ডাক দেয় না। কেয়া বাড়িতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে বাঁচে। গভীর রাতে বাঁকা এখন কী কবে, কোথায় যায়, কেয়া তার খোঁজ বাখতে পারে না।

কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে যায়। ভোরে উঠে গাঁয়ের লোকেরা দেখে, পুলিশে পুলিশে গাঁ একেবারে ছেয়ে গেছে। বিশেষ করে জঙ্গলের গভীবে। পুলিশেব ভিড় জঙ্গলেব দিকেই বেশি। গাঁয়ের এ-কান থেকে সে-কানে কথাটা দেখতে দেখতে বটে যায়, বাঁকা নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে। একটা বড় আমগাছের ডালে তার দেহটা ঝুলছে!

আর যাবে কোথায়। দলে দলে লোক ছুটল জঙ্গলে। একটা গাছকে ঘিরে চারদিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে। গাছটার কাছে কাউকে যেতে দিচ্ছে না পুলিশ! দূব থেকে ঝুলন্ত দেহটা দেখা যায়, সেই জামা, সেই প্যান্ট, খানিকটা পাতাব আড়ালে হলেও মুখখানা চেনা যায়।

মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যে-লোকটা তাদের সবার টুটি টিপে ধবেছিল, সে আজ তাদের মুক্তি দিয়েছে! তাবা এ-যাবৎ যেন প্রাণখোলা হাসি হাসতে পাবেনি। টেঁচিয়ে সুখ দুঃখের কথাও কহিতে পাবেনি। এবার দাবোগাব ডাকে সবাই তাব কাছে একে একে জড়ো হল। আজ বামাই দাবোগা নিজে এসেছে এজাহার নিতে। আজ আর ভয় নেই, আতঙ্ক নেই। সবাই এজাহার দিল, সবাই সেই এজাহারে সই কবল। এমনকি সবার আগে কাগজে সই করতে যে এগিয়ে এল, সে কেয়া। তারপরে এগিয়ে এল শ্রীমতীৰ মা, সেই বাখান্টা, সেদিন স্নান করতে নামা সেই সব মনুষ। এবা সবাই সাক্ষী, এবা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী। কে একজন বুডো মতন লোক বললে, আর সাক্ষা নিয়ে হবে কী, যাকে ঝোলাচ্ছ, সে তো নিজেই ঝুলে পড়েছে! একই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়া! পাপের বেতন মৃত্যু, এ-তো জানা কথা। খুন, রাহাজানি, চোরাচালান, কী ও করেনি? ভয়ে, আতঙ্কে লোকে টু শব্দটি করত না। এমন কি ঐ মেয়েটাকে দেখলেন তো? ভয়ে ও কিছু বলত না, ছোঁড়া যা বলত, ও শুনতে বাধ্য হত। ঐটুকু মেয়ে কীভাবে ইজ্জৎ লুটিয়ে দিত, তা তো ও নিজের মুখেই বলল, দেখলেন তো দাবোগাবাবু?

রামাই দাবোগা বললে, তা তো সব দেখলুম আব জানলুম, আব লিখেও নিলুম, দবখাস্তও নিলুম। যে লোক নিজে ঝুলেছে, তাকে আবাব ঝুলিয়ে কী হবে জিজ্ঞাসা কবলেন না? মশাই, এ সব হচ্ছে বেকর্ড — থানায় রাখতে হয় — কাগজেও দিতে হয় — নইলে লোকে জানবে কী কবে?

তা বটে।

এবার আপনাবা পাতলা হন, আমাদের কাজ কবতে দিন।

দেখতে দেখতে গ্রামের লোক সরে গেল। বামাই দাবোগা এবাব প্রদোঃবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি জিপ নিয়ে ছুটে এসে বললেন — কী শুনছি স্যাব, বাঁকাকেই নাকি নিজেই গলায় দড়ি দিয়েছে?

রামাই দাবোগা বললেন, তা তো গ্রামের সবাই দেখেছেন, আমার শিল্পী ও কবি বন্ধুরাও দেখেছেন। ঐ দেখুন, গাড়ি ভর্তি করে ওঁরাও আমার সঙ্গে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন? দুর্ভিক্ষেব ডাকে প্রজাদের কাছে ছুটেছেন রাজা, কবি এসে বললেন, আমিও যাব। রাজা বললেন, কাজের মধ্যে আপনি গিয়ে কী করবেন? কবি বললেন, কাজের মধ্যে — ‘অ-কাজের লোক’-এবও দবকার হয়। তাবা গিয়ে সুর বেঁধে দেয়।

তঁার সভাসদদের দিকে ফিরে বামাই বললেন, কেমন তাই না?

তাঁবা বললেন, হ্যাঁ, তা বটেই তো — তা বটেই তো।

একটু অবাক হয়ে প্রদ্যোৎবাবু বললেন, ঠিক বুঝলুম না সার।

দারোগা এবাব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, প্রদ্যোৎবাবু আসল সাক্ষীদের সব সাক্ষ্য নেওয়া হয়ে গেছে, এবার বাছাধন যাবে কোথায়? আপনি আপনার সাক্ষ-পাক্ষ নিয়ে এখুনি শহরে ছুটে যান, সেখানে ‘বলাকা’ বেস্টুবেণ্টে গিয়ে হানা দিন। আমাদের সাদা পোশাকের দল সেখানে রয়েছে, বাছাধন পালাতে পারবে না, এখুনি গিয়ে অ্যারেস্ট করুন।

কাকে?

খুনীকে।

খুনী কে?

বামাই বললেন, কে আবাব। ‘বাঁকাকেষ্ট’, ওবফে ‘বাঁকা’, ওবফে ‘অহীভূষণ’।

অবাক হয়ে দূবেব আম গাছটা দেখিয়ে প্রদ্যোৎবাবু বললেন, সেতো ঐ ঝুলছে।

বামাই বললেন, না, সে ঝুলছে না, ঝুলছে তাব ডামি। ঐ আমাদের কাকশিল্পীর অবদান। মাটির তৈরি কিন্তু অবিকল আসল ‘বাঁকাকেষ্ট’। ওটি দেখিয়েই গাঁয়ের লোকের মুখ খুলিয়েছি। আব একবার খুলিয়েছি যখন তখন আব মুখ বন্ধ হবে না। আপনি যান। এবাব বুঝলেন তো, থানায় বসে এঁদের নিয়ে ‘হো-হো-হা-হা’ কেন কবি? কাজের মধ্যে ‘অ কাজ’-এব লোকেবও দবকার হয়, মাঝে মাঝে।

একসূত্রে বাঁধা

শক্তিপদ রাজগুরু

হুড়মুড় করে এসে ছেলোট্টা একরকম আছড়েই পড়ল ঘবেব মধ্যে। কাঁধে একবাশ গামছার মোট, হাতে একখানা নোতুন গামছা দল্যামোছা করে জড়ানো।

হাঁপাচ্ছে ছেলোট্টা। ভীত চকিত চাহনি মেলে এদিক ওদিক দেখছে বাস্তাব পানে চেয়ে। হুলাব গাড়ী থেকে জনকষেক লোক নেমে ফিরিওয়ালাদেব যাকে পাচ্ছে জামার কলার হাত ঘাড় ধরে টেনে তুলছে। আবও দুচারজন যাবা তাব মত সবে পড়া ফেরিওয়ালাদেব সন্ধান করছে। অতীন খুব যাহোক দৌড়ে সরে এসেছে আজ।

ধরা পড়লেই বিপদ হতো। চল থানায কোর্টে, জরিমানাও দিতে হবে।

দারোয়ানটা মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

— বাহার যাও। রাস্তামে যাও।

অতীন কাঁচুমাচু করে বিনীতকণ্ঠে জানায়,

— বেরুলেই ধরে নিয়ে যাবে দারোয়ানজী। একটু থেকেই আমি বেব হয়ে যাবো।

— আভি নিকোলো।

দরকার হলে দারোয়ানজী ওব ঘাড় ধরেই বের কবে দেবে রাস্তায়।

হঠাৎ সামনেই নোতুন গাড়ীখানা এসে থামল। গাড়ী থেকে বেব হয়ে আসেন তরুণ একটি যুবক। এই বিবাট প্রেস-পত্রিকা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের মালিক।

মুনিবকে আসতে দেখে দারোয়ানের কর্তব্যনিষ্ঠা আবও বেড়ে যায়। গর্জে ওঠে সে,

— নিকোলো।

ঠেলে বেরই করে দেবে গামছাওয়ালা ছেলোট্টাকে। মালিক নিমেষবাবু ছেলোট্টার দিকে একবার চাইলেন। তিনিও ব্যাপাবটা বুঝেছেন। ওদিকে হুলা তখনও যায় নি। বেব হলেই ধবা পড়বে বেচারার।

বলে উঠেন নিমেষবাবু,

— থাক। ওকে একটু থাকতে দাও। পরে যাবে ও।

দারোয়ান থমকে দাঁড়াল। ছেলোট্টাও অবাক হয়। একটু ঘাবড়ে যায়।

বৈশাখের দুপুর। চারিদিকে কড়া রোদে পিচ পর্যন্ত গলে গেছে, তাপ উঠছে। ছেলোট্টা একরকম রোদে রোদেই গামছা ফিরি করছিল।

ঘামে নেয়ে উঠেছে। তারপরেই ওকে দৌড় দিতে হয়েছে। ভয়ে উত্তেজনা তার গলা শুকিয়ে গেছে।

দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই।

নিমেষবাবু গাড়ী থেকে নেমে নিজের ঘরে যাবাব মুখে বাঁটগিঃ সেক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ওপাশে কোন কর্মচারীর বসবাব একটা টল। তাতেই বসে বলে চলেছেন,

— কি রে যদু, ভাল কবে ছাঁট ফর্মাগুলো। কালকেব লটে দেখলাম অনেক বাদ রয়ে গেছে।
যদু মুখ কাঁচুমাচু কবে শরীরটা কাল ভালো ছিল না।

আজও তো ভাল দেখছি না। ছুটি নিয়ে যা — মাইনেপত্র পাৰি। দুচারদিন ছুটি নিয়ে ভালো হয়ে আয়।

কে এক গ্রাস জল এনে দিয়েছে নিমেষবাবুকে। জলটা খেতে গিয়ে হঠাৎ তা'ব চোখ পড়ে ওই গামছাওয়ালা ছেলোটার দিকে। কেমন সতৃষ্ণ চাহনিতে চেয়ে আছে এই দিকেই।

ছেলোটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে চোখ নামাল। এমন করে চেয়ে থাকাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি তার। নিমেষবাবুই জিজ্ঞাসা কবেন।

— জল খাবি?

খুব তৃষ্ণার্ত সে। জিব ওকিয়ে আসছে। সাবা শব্বারে ঘাম বইছে। মাথা নাড়ে অতীন।

ওকে এক গ্রাস জল দে মধু। আয় গামছাগুলো নাম। জল খেয়ে একটু বস।

ছেলোটা অবাক হয়েছে।

অনেক লোককেই দেখেছে। বড় লোক গাড়ীওয়ালা আদমীদের জানে সে। তোয়ালে না হয় একটা গামছা কিনে মুখের উপর অর্ধেক দান দিয়ে গাড়ী নিয়ে বেব হয়ে যায় — পিছু পিছু কাঁচুমাচু কবে গেলে তবে হয়তো বাকী দামটা নেহাৎ তচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে দেয় বাস্তাব উপরে।

জলটা খেয়ে একটু শান্ত হয় অতীন।

— কদিন ব্যবসা কবছিস?

অতীন নিমেষবাবুর দিকে চাইল, পাঁচজনের মত আশা করেছিল সেও পড়বে, পাশ করে মানুষ হবে। কাক্ষণিক কববে।

কিন্তু তা হয়নি। বাবা মাঝা যাবার পব থেকেই সাধাবণ বাঙ্গালী সংসারের মত তাব উপরই সব দায় দায়িত্ব এসে পড়ল, পড়াশোনা হ্রাব হ'ল না। ছোট দুটো ভাই, একটি বোন আব বিধবা মা — তাদের মুখের অন্ন যোগাতে হবে। অন্য কোন পথ আর পাযনি।

কাবখানাতেই ঢুকেছিল। কিন্তু কিছুদিনেব মধ্যে পায়ে চোট লাগে — বসে বইল বেশ কিছুদিন। মাইনেপত্র নেই, সংসারের সেই অভাবেব কালো ছায়াটা গাততব হয়ে ওঠে।

শেষকালে সামান্য কিছু সঞ্চয় ভেবে এই পথ নিল অতীন। রাস্তায় বাস্তায় গামছা ফিবি করে। অতীন জবাব দেয়,

— মাস ছয়েক হ'ল। বাড়ীতে মা — দুটি ভাই — বোন।

হাসল নিমেষবাবু — সবই আছে। নেই কেবল মা লক্ষ্মী, না রে! তা এতে চলে?

চুপ কবে থাকে অতীন।

কি করে চলে তা আর বোঝাতে পারে না সে। কোনদিন একবেলা জোটে, কোনদিন তাও পুরোপেট জোটে না। মহাজনদের দেনা মিটিয়ে থাকে না বিশেষ কিছু। বিবেকানন্দ বোড থেকে বৌবাজারের মোড় অবধি বাব দুয়েক টহল দেওয়াই হয়। বলে অতীন,

— তবু স্বাধীন ব্যবসা, যদি কোনদিন দাঁড়াতে পারি।

নিমেষবাবু ছেলোটার দিকে চেয়ে থাকেন — এত হতাশা ক্লান্তির মাঝেও ওর কষ্টে একটা আশার সুর জাগে। সেই সুরটা নিমেষবাবুর মনে লেগেছে।

নিজের জীবনেরই যেন এটা মূলকথা।

সামান্য অবস্থা থেকে নিমেষবাবু এত উপরে উঠেছেন। নিজে আজ এতবড় প্রেসের মালিক, দোকানও বেশ চালু, তাছাড়া নিজেই একটা পত্রিকা করেছিলেন নেহাৎ খেয়াল বশেই।

জীবনে একটা কথায় তিনি বিশ্বাস করেন — নিজে কাউকে ঠকাবেন না, সেটা কঠিনভাবে মেনে চলেন, তাই দেখেছেন তিনিও কোথায় ঠকেন নি। মাঝে মাঝে নানা বিপদ কষ্টও এসেছে। এসেছে নানাদিক থেকে আঘাত। তবুও তিনি আবার দাঁড়িয়েছেন।

ছেলেটার কথায় তাঁর সেই স্বপ্নের রেশই ধ্বনিত হয়,

— দোকান টোকান নে। রাত্তায় কতদিন ঘুরবি।

ছেলেটির কাছে ওটা একটা স্বপ্নই, চিরদিনের স্বপ্ন। কিন্তু কোথেকে দোকান করবে সে। সামান্য তার পুঁজি। জবাব দেয়,

— সে তো অনেক টাকার ব্যাপার, ঘর জোগাড় করাই তো দায়। ঘর না হোক, কারও বাড়ীর একটু রকু পেলেও হয়, তাও বলে পাঁচশো টাকা সেলামী লাগবে। কোথেকে দিই। তাই পথে পথেই ঘুরছি। হঠাৎ বলে ছেলেটা,

— গামছা লাগবে স্যার! বাঁকুড়া খনেখালি সন্তোষপুরের মুখপাত গামছা আছে। তোয়ালে — হাসতে থাকেন নিমেষবাবু প্রাণখোলা হাসি।

— আমার কাছেই ব্যবসা শুরু করলি যে রে? বেশতো চালু তুই। তা দে দুজোড়া গামছা। ভাল দেখে দিবি কিন্তু আর গলা কাটিস না।

অতীন নায্য দামেই গামছা দুজোড়া বের কবে দেয়। দামটা নিয়ে একটা নমস্কার জানিয়ে পথে নামবার আগে বলে,

দরকার হলে বলবেন বাবু, তোয়ালে গামছা। আমি মাঝে মাঝে খোঁজ নোব।

দেখাদেশি প্রেসেব — দোকানের দুচার জন কর্মচারীও কিছু মালপত্র নেয়। অতীন খুশী মনেই বের হয়ে এল। নিমেষবাবু তখনও হাসছেন।

বেশ চালু ছেলে তো? একেবাবে বাণিজ্য করে চলে গেল।

অতীনের সাহস একটু বেড়েছে। পথে পথে পরিক্রমা কবে নানা ধ্বনের মানুষ দেখেছে সে। এ যেন তাদের থেকে বিচিত্র ধাতের। মাঝে মাঝে প্রেসে যায়। হঠাৎ সেদিন গিয়ে দেখে নিমেষবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘুবছেন।

বিরটা বিরটা কয়েক স্তূপ পত্রিকা ছাপা হয়ে এসেছে।

বিভিন্ন জায়গায় যাবে শেওলো, দেবী হয়ে যাচ্ছে। লোকজন আসে নি বিশেষ।

অতীন বলে, আমি হাত লাগাবো স্যার!

— পারবি!

হাসে অতীন, গামছা বাঁধা অভোস আছে, দেখি নিশ্চয়ই পারবো। অতীন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে প্যাকেট করে বাঁধতে থাকে, বেশ চালু হাত। নিমেষবাবু ওর চটপট পরিষ্কার কাজ দেখে অবাক হন।

ছেলেটা বিরামহীনভাবে কাজ করে চলেছে, শুধু তাই নয়, প্রেস দপ্তরীখানার কয়েকজন লোককেও সেই সঙ্গে কাজ করিয়ে নিয়ে চলেছে।

জামাটা খুলে গামছার মোটের উপর রাখা পরনের কাপড়খানা সামলে নিয়ে কাজ করে চলে।

— পাঁচখানার প্যাকেট আলাদা রাখো, ওদিকে দশখানার প্যাকেট।

শক্ত করে বাঁধন দে মতি, নাহলে আলগে যাবে।

রাশিরাশি পত্রিকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্যাকেটজাত হয়ে যায়, একটু বিশ্রাম।

এরপর আর এক টাল মাল আসবে।

নিমেষবাবু নিজে থেকেই ওদের জন্য ভাল ডিমের মামলেট রুটি আর চায়ের ব্যবস্থা করেছেন, নিজেও গঞ্জি গায়ে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে চা মামলেট খেতে থাকেন।

হাঁরে অতে, আজ বাগিছো যাবি না? সারাদিন তো প্যাকেট বাঁধছি —

অতীন হাসে — একটা দিন না হয় ছুটিই নিলাম বড়বাবু।

প্রেস — দোকানের সকলেই ওই নামেই ডাকে নিমেষবাবুকে। অতীনও সেই নামটাই ব্যবহার করে।

— খা চাটা খেয়ে নে। যাবার আগে আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি অতে।

নোতুন মাল এসে গেছে। ওরা কাগজ দড়ি নিয়ে আবার বাঁধতে বসে।

রাত্রি হয়ে গেছে, রাশিকৃত প্যাকেটের দিকে চেয়ে খুশী হয় নিমেষবাবু, ছেলোটো না এসে লাগলে সব মাল পড়ে থাকতো। মেলিংও হতো না। রাশিরাশি টাকা লোকসান হয়ে যেতো। ছেলোটো কাজের।

প্রথম দিনেই লেবেল স্লিপ ঠিকমত লাগিয়ে এতবড় কাজটাকে শ্রেফ হাকাইকি করেই তুলে দিল।

হাত পা ধুয়ে অতীন জামাটা গায়ে দিয়ে গামছার মোট তুলে নিয়ে বের হবার আয়োজন কবছে। ওর মনেও খুশীর সাড়া।

তবু একজনের একটা উপকব করতে পেরেছে। নিমেষবাবু ওব হাতে তুলে দেন দশটাকার একটি নোট। অবাক হয় অতীন।

— আঞ্জে!

হাসেন নিমেষবাবু, নে। বাড়ীতে তো কিছু দিতে হবে।

— টাকা নোব? অবাক হয় অতীন।

নিমেষবাবু জবাব দেন।

— দোষ কি! আমার এতগুলো টাকা বেঁচে গেল, ঠিক তাবিখে বই বেরুল। এর দাম তো অনেক। পরে দেখা করিস। কাল পরশু!

অতীন কোনরকমে টাকাটা পকেটে নিয়ে বেব হয়ে এল। মনেব মধ্যে একটা তবু কাঁটার মত বেঁধে। টাকার তারও দরকাব।

চাল ডাল তবকাবীও কিনতে হবে। নইলে কাল সকালেই সংসাব অচল হয়ে যাবে। তাই হাত পেতে টাকাটা নিয়েছে — নিতে বাধ্য হয়েছে। নইলে নেবাব ইচ্ছে তার ছিল না।

কথাটা বলেন নিমেষবাবুই।

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি অতীন। সে এতকাল এই স্বপ্ন দেখেছে। ছোট্ট একটা দোকান হবে তার নিজস্ব। বেশ জানে সে একটু পায়ের নীচে মাটি পেলে সে দাঁড়ায়ে পারবেই।

নিমেষবাবু বলেন : আমার রকের ওপাশে একটু জায়গা কাঠ দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি। ওখানেই দোকান কর তুই। গামছা লুঙ্গি তোয়ালে এইসব রাখবি।

সদর রাস্তার উপরেই একখানি দোকান দেবে সে। অতীন কথাটা যেন বিশ্বাস করতেই পারে না। নেহাৎ বড়বাবু — বলছেন তা চুপ করে শোনে সে তবু বলে,

— সে তো অনেক টাকা লাগবে বাবু, মালপত্র কিনতে হবে।

হাসেন নিমেষবাবু, ঠিক আছে, আড়াইশো টাকা দোব, মালপত্র কেন, টাকা শোধ দিয়ে দিবি।

— সত্যি! চমকে ওঠে অতীন, বলে — তবে ঘরভাড়াও নিতে হবে বড়বাবু।

বড়বাবু হাসতে থাকেন।

— জ্ঞান তো টনটনে রে অতে! ভাড়াটে হতে চাস। ঝাতে উচ্ছেদ করতে না পারি? ঐ্যা।

অতীন মাথা চুলকোতে থাকে। নিমেষবাবু বলেন — ঠিক আছে, তুই দশটাকা ভাড়া দিবি মাস মাস। রসিদ দেবেন সবকার মশাই, বলে দোব।

অতীন খুশীভরে বড়বাবুর পাযের ধুলেই নিয়ে বসে। বিব্রত হন নিমেষবাবু, আবে ছাড় ছাড়, পা ছাড় অতে। ভালো হবে না বলছি।

অতীন পাযের নীচে মাটি পেয়েছে ওই লোকটির দয়ায়। আশ্রয় দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে, তাকে আর দুপুরের খর বোদে — না হয় অঝোব কৃষ্টির মধ্যে পথে পথে ঘুরে বেশাতি করতে হবে না।

দোকানে বসে বোচাকেনা কববে। মাও খুশী হয় ছেলের এই উন্নতিতে। বেশ ঘটা কবেই দোকান উদ্বোধন করছে অতীন।

নিজে হাওড়াব হাট থেকে দেখে শুনে মাল কিনে এনেছে, লুণ্ডি গামছা তোয়ালে, আরও টুকটাকি কি সব। মেয়েদের জামাও কিছু এনেছে।

এরই মধ্যে গোটাকতক প্যাকিং বাস্তব কাঠ দিয়ে তাক আলমাবী বানিয়ে নিয়েছে, বাজার থেকে ছোট কলাগাছ, ঘট পূজোর জিনিষপত্রও আনে।

প্রেসের গুণী ভট্টাচার্যই বলেছে। পূজা টুজো আনিই কবে দোব অতে। ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে দোকান চালু কর।

বড়বাবুকে গিয়ে বলে অতীন।

— আজ বৈকালে দোকান খুলছি বড়বাবু, আপনাকেই বউনি কবতে হবে। চমকে ওঠেন নিমেষবাবু, ফের গলা কাটবি অতে?

তবু নিমেষবাবুই ওব দোকানের প্রথম খদ্দেব। সওদা একজোড়া গামছা। অতীন দাম নেয় আড়াই টাকা।

হাসেন নিমেষবাবু — আড়াই টাকা! বেশী লাভ নিলি কিন্তু অতে!

অতীন টাটে বসেছে, কপালে চন্দনের টিপ, বড়বাবুর কথায় বলে, — তা বউনিব লাভ, বেশিই নিইছি বড়বাবু।

— বেশী লাভ করিস না অতে, কম লাভে বেশী বেচবি, খদ্দের আসবে।

রাস্তাব ধারে দোকান, একেবারে কলেজ স্ট্রীটের উপরেই। অতীন কিছুদিনের মধ্যেই বেশ জমিয়ে তুলেছে। দোকানে সম্ভ্যেব পর থেকেই খদ্দেরের ভিড় জমে।

মেয়েদের ভিড়ই বেশী। মেয়েদের হালফ্যাশানের নানা রকম ব্লাউজ, জামা—রুমাল তো আছেই, তাছাড়া তোয়ালে গামছা লুণ্ডিও আছে। তবে মেয়েদের জিনিষ বিক্রী কবেই লাভ বেশী।

একবার বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে তারা তো আসেই, পরিচিত মহল থেকেও অন্যান্য মেয়েরাও আসে, মালপত্র কিনে নিয়ে যায়।

অতীন তবু আশপাশের দোকান থেকে কম দামেই জিনিষপত্র বেচে।

— চার টাকা দাম।

কোনো ভদ্রমহিলা বলেন — অনেক বেশী দাম বলছেন দাদা।

— পাঁচ দোকান দেখে নিয়ে যান। দাম আমার কম।

কথাটা সত্যিই। তাই তারা ফিরে এসে নিয়ে যায়।

অতীন ছোট ভাই সতীনকে এনেও দোকানে বসায়। ছোট ভাইটা স্কুলে পড়ছে, অতীন কোনদিক থেকে তার কর্তব্যের ক্রটি করে নি।

ভাইগুলোকে পড়াচ্ছে। সতীন ম্যাট্রিক দিয়েছে।

অনেক আশা তার ভাইকে কেন্দ্র করে, তার ছোট ভাই যতীনও সামনের বছর পরীক্ষা দেবে।

অতীন তবু বড়বাবুর কাজে আরও নিবিড় করে মিশে গেছে। কাগজ বের হবার সময় দু-তিন বাত্রি সেও প্রেসে পড়ে থাকে, রাশিরাশি পত্রিকা হৈ চৈ করে প্যাকেটবন্দী করে। লেবেল সাঁটে হিসাব মত। পূজো সংখ্যা বের হবার সময় অতীনের অবসর নেই।

এদিকে তাব দোকানেও পূজোর মরশুম পড়ে। ছোট্ট দোকানটা বড় হয়ে মালপত্রও বেশী আমদানী কবে। বেচাকেনাও হয় প্রায় ষাট-সত্তর টাকা আন্দাজ।

বাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে এসে বাঁধাইখানায় ঢোকে, রাশবন্দী পত্রিকা বাঁধা হচ্ছে, হাত লাগায় তাতেই। নিজেই কাটিং মেশিন চালায়। প্যাকেট করে।

নিমেষবাবুও ওদের সঙ্গে থাকেন।

কলবব হৈ চৈ কবে অতীন কাজ কবে ওদের সঙ্গে, ও থাকলে সকলেরই হাত চলে জোবে।

— চুলছিস নাকি রে মধু! দোব এক বালতি জল ঢেলে।

অতীন নিমেষবাবুর টাকা অনেক আগেই শোধ করে দিয়েছে। তবু বেশ জানে। তাব কৃতজ্ঞতা ঋণ এ জীবনে শোধ কবণে সে পাববে না।

শশী দপ্তরী বলে,

— অতে এইবার বিয়ে কববে বডবাবু।

বডবাবুও খালি গায়ে ওদের মাঝে একটা চেয়ার টেনে বসে আছেন। শশীর কথায় নিমেষবাবু অবাক হন।

হাতীন চুপ করে থাকে। শশী বলে চলেছে,

— আন্তে বডবাবু, লভ্ ম্যাবেজ। ওবই কোন খন্দেব।

সাঁ কবে একটা প্যাকেটই ছুড়ে দেয় অতীন শশীর দিকে। শশী ঘাড়টা সবিয়ে প্যাকেটটা ধরে নিয়ে হাসতে থাকে।

ওকেই গুণোন না?

— কি বে অতে? লভ্ ম্যাবেজ — বডবাবু হাসি চেপে গাষ্টাবকণ্টে জিজ্ঞাসা কবেন।

অতীন ওই লোকটিকে অন্তরেব থেকে সমীহ করে। মাথা চুলকে জবাব দেয়। — আন্তে খন্দেব নয়, আমাব দোকানেব ব্রাউজ জামা ফকটিক সেলাই কবে বেচতে আসে! অন্য অনেক দোকানেই দেয়। খুব ভালো মেয়ে — আপনিও দেখেছেন। কালো মত কবে সেই যে আসতো।

বডবাবু দেখেছেন মেয়েটিকে।

অতীন বলে — আব একটু বাড়াবো ভাবছি। যদি বকটায় আব হাত দুয়েক জায়গা দেন।

নিমেষবাবু হাসতে থাকেন।

— খুব চালু তো তুই বে। আগে বিয়ে-থা হোক, তারপব দেখা যাবে।

তবে ব্যাটা বিয়ে-থা করবি — সামলাতে পারবি তো; যা খর্চাব দিন —

অতীন বিনয়ের সঙ্গে বলে,

— আপনি তো আছেন।

কৃত্রিম কোপে চমকে ওঠেন বডবাবু,

‘ওবে হারামজাদা, নিজে বিয়ে কবে পরের ঘাড়ে চাপাবার তাল। বিয়ে করবি তুই আব ঠালা সামলাতে আমরা।

হাসতে থাকে অতীন, বডবাবুর স্বভাবের এই সহজ মধুর ভাবটা সে চিনেছে। ছাপাখানার ম্যানেজার থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে একুপবিবারে কর্তার মতই মেশেন। তাদের সুখদুঃখের তিনিও সমান শরিক।

এমনিতে তাই প্রথমদিন থেকেই লোকটিকে চিনতে দেবী হয়নি অতীনের।

বড়বাবু বলেন।

— বিয়ে করবি, ভেবে-চিন্তে দেখ অতীন। ভাইটা চাকরী পেলেই তোকে বড়ো আঙ্গুল দেখাবে, মা, বোন তো আছেই, তারপব বৌ আসবে।

— তাইতো দোকানটা বাডাতে চাইছি বড়বাবু। তাছাড়া —

অতীন বাকী কথাটা বলতে পারে না। মিনার সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে তার বাধে।

মেয়েটিকে দেখেছিল প্রথম এখানেই, বাড়ীতে তৈরী কিছু ব্লাউজ বেচতে এসেছিল।
চোখে-মুখে ওর অভাবের ছায়া, করুণ ডাগর দুটো চোখে নীরব বেদনার আভাস।

— কত করে ডজন?

মিনা জবাব দেয় — আঠারো টাকা। তাতেই বেশী কিছু থাকে না।

অতীন এক একটা ব্লাউজ গড়ে চার টাকা সাড়ে তিন টাকায় বেচবে। আজই কয়েকটা অর্ডার আছে। কি ভেবে আঠারো টাকা দিয়ে এক ডজনই কিনে নিয়ে বলে,

— কাল-পরশু আবও এক-দেড় ডজন দেবেন, তবে একটু হাতের কাজ যদি করা থাকে ভালো হয়। বাইশ টাকা দর দিতে পারি।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতাভরে ওব দিকে চাইল।

কয়েকদিনেব মধ্যেই দুপুরের দিকে সেই অর্ডারটা দিয়ে যায় মিনা। দুপুরেব বোদে বাস্তাব পিচ গলে গেছে, ষ্ট্রাপছেঁড়া চটিটা আটকে যায়, যেন পদে পদে বাধাই পেয়েছে সে পথ চলায়।

তবু আসতে হয়েছে।

— একটু বসবেন না? যেমে নেযে উঠেছেন যে।

মিনা একটু টুল টেনে বসল। দামটা নগদই মিটিয়ে দেয অতীন।

পরিচয়টা এমনি করেই গড়ে ওঠে। মিনা বলে,

তবু আপনি মালপত্র কাটান আমাব। অন্য দোকানে গেলে পথ থেকেই জবাব দেয।

অতীন জানে পথে পথে ঘোরাব বেদনা। যাডে গামছার বোঝা নিয়ে দীর্ঘপথ হেঁটেছে।
টনটন করছে যাড় হাত-পা। পুলিশের তাড়া খেয়ে দৌড়েছে কতদিন প্রাণ হাতে নিয়ে।

তাই বোধহয় মিনার এই পথে পথে ঘোরাব বেদনা সে বোঝে।

একটা বস্ত্রবাড়ীতে থাকে। মাঝে মাঝে মালপত্র আনতে গেছে অতীন। মাল আনাটা যেন একটা উপলক্ষ্য, মাঝে মাঝে ওকে দেখতে গেছে। শান্ত একটু মেয়ে। সেলাই মেশিনেব শব্দ ওঠে।

ওকে দেখে অবাক হয়েছিল প্রথম দিন মিনা। মেশিন ছেড়ে উঠে আসে।

আপনি — কি ভাগি আমার। বা এসেছেন তাহলে। আপনার অর্ডার কাল পুৰো দিয়ে দোব।

অতীন চোখ মেলে ওর সংসারের শ্রীহীন অবস্থাটা দেখছে। বৃদ্ধ বাবা-মা আর ভাইবোন তারা। দাদা কোন একটা কারখানায় চাকরী করে। মা এক কাপ চা নিয়ে আসে। লুড়ি বলে,

— মেয়েকে নিয়েই আমার ভাবনা বাবা। কষ্টের সংসার। বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

অতীনও ক্রমশঃ তা বুঝেছে।

মিনা মাঝে মাঝে আসে। ব্যবসা সম্বন্ধে তারও বুদ্ধি কম নেই। সে বলে, কিছু খান কাপড় কিনে দাও, সস্তায় ভাল হবে। তাছাড়া মেয়েদের রকমারী ফ্রক তৈরীর ব্যাপারেও তার হাত ভালো। সুন্দর কাটিং।

তার দোকানের মাল অন্য দোকান থেকে আলাদা। তাই বিক্রিও ভালো।

অতীন মাথা চুলকোতে থাকে।

বড়বাবু বলেন, হিসেব করে চলবি, মেয়েটাকে বলবি গরীবের ঘর, ঠাটবাট যেন না বাড়ায়। মারা পড়বি।

অতীন স্বপ্ন দেখছে।

পূজোর বাড়তি কয়েকদিন রাত্রি কাজ করে চলেছে থ্রেসে। নিমেষবাবুৰ পত্ৰিকার অসম্ভব কাটতি, পূজো সংখ্যা ছেপে শেষ করতে পারে না তারা।

দণ্ডুরীখানা — মেইলিং — লেবেল লাগানো কঠিন ব্যাপার।

অতীন ছোট ভাইটাকেও লাগিয়েছে, নিজেও খেটে চলেছে। জানে নিমেষবাবুৰ কাজ তাবই কাজ। এটা শেষ করা তার কর্তব্য।

এরই মধ্যে কাণ্ডটা ঘট য়।

এতদিন ব্যবসা করছে অতীন, এমনিতে সাবধানী সে। তবু সর্বনাশা কাজটা ঘটে গেল।

পূজোৰ বাজাব। প্রায় শ তিনেক টাকার মাল কিনেছে হাওড়াৰ হাটে। গামছা লুঙি, কিছু প্যান্ট জামাও বয়েছে। বিবাট একটা মোট হয়ে গেছে।

একটা কুলিৰ মাথায় মাল চাপিয়ে হাট থেকে ইঁটতে ইঁটতে হাওড়া স্টেশন অবধি এসে সেখান থেকে বাসে তুলবে।

তবু কম খরচে মালটা আনা হয়, পডতা থাকে। তাছাড়া ট্যাক্স করতে গায়ে বাজে। বেশ ভিড বয়েছে স্টেশনে।

চাৰ্ভিদক লোকজন গিশগিশ কৰছে। মালটা নিয়ে কুলি দাঁড়িয়ে আছে। বাসটায় খুব ভীড। কোনবকমে সামনে দবজা খুলে মাল নেবার জন্য কনডাকটাবকে বাজী কৰিয়ে পিছন ফিৰে দেখে কুলি নেই, মালও গায়েব। হন্যে হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি কৰতে থাকে।

কিন্তু কোথায় বা কুলি কোথায় বা সেই মাল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে অতীন। পূজোৰ মবশুমে এতগুলো টাকা একেবারে জলে গেল।

অনেক কষ্টেব টাকা তাব। চোখ ফেটে জল বেব হয়ে আসে।

ধাক্কাটা সামলাবে কি কবে তাই ভাবছে। হাত খালি হয়ে গেছে। পূজোৰ সময় দোকানে মাল তুলতে পাববে না, খালি থাকবে সাব সাব তাকগুলো। খদ্দেৰ ভিডবে কি দেখে।

তাবপর সংসাবেব চাহিদা আছে। কোনদিকে দিশে পায় না সে। বড়বাবুৰ কাজকৰ্ম পুরোদমে চলেছে। এবাব পূজোয় ভাল ব্যবসা কৰেছেন তিনি। তাঁব পত্ৰিকাও আশাতীতভাবে জনপ্রিয় হয়েছে বাজাবে। চাহিদামত মাল দিতে পাবছেন না তিনি।

অতীন কোথায় বে?

কে বলে, দোকানে চুপ করে বসে আছে। কি হয়েছে তার। দেখলাম কাঁদছিল।

— কাঁদছিল। একটু অবাক হল বড়বাবু। ডাক তাকে।

অতীন এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ছোট ছেলের মত কাঁদছে সে।

— কি হয়েছে বে অতে? মেয়েটা ভেগেছে? তখনই বলেছিলাম ও চলন্তিকা মেয়ে, তা কত গেল হারে?

• অতীন বলে ওঠে,

— তা নয় বাবু! আজ তিনশো টাকার মাল কুলিৰ মাথা থেকে হারিয়ে গেল।

— তাই নাকি। দরদভরা কষ্ট বলেন বড়বাবু।

পূজার মুখ। দোকান খালি পড়ে থাকবে, কেই বা বেচ্যকেনা করবে। গুছিয়ে নিয়েছিলাম বড়বাবু, কিন্তু সবই আমার কপাল।

বড়বাবু ধমকে ওঠেন,

ব্যাটা লবাব। কদিন নিজেব ঘাড়ে মোট চাপিয়ে বেচেছিস, হারায় নি কিছু। নবাব গেলেন কুলির মাথায় মাল চাপাতে, হয়েছে তো এইবার। টাক্সি করতে পারিস নি? তিন টাকা যেতো, তিনশো টাকা বাঁচতো। মরগে এইবার।

অতীন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছে। তার বকের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা দোকান, এতদিনেব সাধনা সব এক আঘাতে চুরমার হয়ে গেল।

বড়বাবু ধমকে বলেছেন।

— আবাব মেয়েদের মত কান্না হচ্ছে।

কি ভাবছেন তিনি। এতদিন ছেলোটাকে দেখেছেন। তার ব্যাপাবে প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম কবে। এ দরদ, এই সাহায্য টাকা দিয়ে কেনা যায় না।

অতীন চুপ কবে এব হয়ে যাচ্ছে।

বড়বাবু ডাকেন, দাঁড়াল অতীন।

— লবাবেব যাওয়া হচ্ছে কোথায়? দোকান তুলে দিবি তাহলে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। ড্রয়ার খুলে বড়বাবু তিনখানা একশো টাকার নোট বেব করে ওর দিকে এগিয়ে দেন,

— নাও ধরো। মুখ খুলতে লবাবেব লজ্জা হয়। পাবো তবে এ টাকার মালও হাবিয়ে এসো। ফের যদি দেখেছি কুলিব মাথায় মাল তুলেছিস, পেটে লাথি মারবো তোর। নিজে বয়ে মাল আনবি, একবারে না পারিস দুবারে আনবি, কালই দোকানে মাল দেখতে চাই আমি। যাও আর ঘট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না রামভক্ত হনুমানের মত।

অতীন নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে সে, বাববাব তাব বিপদে ডেকে সাহায্য করেছেন উনি।

এ তার বিশ্বাসের বাইবে। সাবা মন কি এক কৃতজ্ঞতায় ভবে ওঠে। মানুষেব মনের এই শুভ কামনার দাম কি জানে না অতীন, তবু মনে হয় বড়বাবুর আবও বাড়বাড়ন্ত হোক।

দোকানে বের হয়ে এসে দেখে মিনা দাঁড়িয়ে আছে। খবরটা সে পেয়েছে অতীনের ভাই সতীনের কাছে। চমকে উঠেছে ওনে।

ওকে দেখে বলে ওঠে সব শুনলাম। এতগুলো টাকা গেল এই সময়।

তারও ভাবনা জেগেছে। অতীন বলে ওঠে,

যাকগে। বড়বাবু তো আছেন। খুব বকেবাকে দিলেন টাকাটা। সতে তুই তাক টাক সাফ কব। সাঁঝবেলাতেই মাল আসবে, কাল বাকী সব মাল এনে লাগাবো। বড়বাবুর হুকুম কাল যদি দোকানে সমস্ত মাল না তুলি কবে গাট্টা লাগাবো।

— টাকা দিলেন উনি। তিনশো টাকা! মিনা অবাক হয়।

হাসে অতীন। বড়বাবুকে দেখনি, যেমন বড় তেমনি দবাজ মন।

হঠাৎ গাড়ীটা এসে থামে রাস্তার ধারেই। স্বয়ং বড়বাবুই চলেছেন। ওকে থামতে দেখে অতীন শশব্যস্তে রক থেকে নেমে যায়। বড়বাবুর কথায় র্যাক থেকে রুমালের দুটো বাস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেল।

— একটা রুমাল দে দিকি, রুমালটা কোথায় ফেলে এসেছি।

অতীন একটা সিল্কের দামী রুমালই এগিয়ে দেয়, বড়বাবু চটে ওঠে, ব্যাটা নচ্ছাব, একটা সূতি রুমাল দিতে বললাম, উনি আনলেন মুর্শিদাবাদ সিল্কের রুমাল; লবাব কোথাকার।

একটা সূতি রুমাল তুলে নিয়ে দামী রুমালটা ওর মুখের উপর ফেলে দিয়ে বের হয়ে গেলেন গাড়ী নিয়ে একটা আধুলি ধরিয়ে দিয়ে।

অতীন হাসতে থাকে, মিনা অবাক হয়, লোকটার গাড়ী থেকে হাঁকডাক মেজাজের কথা শুনে মনে মনে বিবস্ত্রই হয়েছে সে। মুখের উপর ওই আধুলি ছুড়ে দেওয়াটা ভালো লাগে না।

মিনা বলে, খুব যে গরম দেখলাম ওর, পয়সার গরম।

জিব কাটে অতীন, ওকথা ওকে বলোনা মিনা, ওই তো বড়বাবু। আমার অমদ্যতাই বলতে পারো। এই দোকান ঘর মূলধন আজকের টাকা সবই ওঁর দেওয়া। সব কর্মচারীই তার আপনজন। মস্ত লোক — দেখবে কোনদিন এইখানেই বসেই কথা বলছেন।

মিনাও দেখছিল তাকে।

অতীন পূজোব বাজারে সেবাব খুব কার্মিয়েছিল। বড়বাবুর টাকা ফেবং দিতে গিয়ে একচোট বকুনি খায়। শেষকালে বলেন তিনি — পূজোর মজুবী। দিনবাত দুজনে খেটেছিস, ওটা তোরাই রাখ। কারবারে খাটা।

দোকান ক'মাসেই জমে উঠেছে, শীতের মবশুম, গরম কাপড় জামাও তুলেছে, বকেব গ্রাবও খানিকটা জায়গা নিয়ে দোকান বাড়িয়েছে।

এই সময় ওদের বিয়েও হয়ে গেল। অতীনের বিয়েতে প্রেসের অনেকেই আসে। বৌভাতেব দিন নিজে আসেন বড়বাবু। মিনা আজ লোকটিকে নতুন কবে দেখে। ওব হাতে দেন একটা হার। মিনা প্রণাম কবে।

বড়বাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজকর্ম খাওয়া দাওয়াব তদাবক কবেন, কর্মব্যস্ত সদাহাস্যময় মানুষটিকে আজ নোতুন করে দেখে মিনা।

অতে, দোকান এইবাব ভালো কবে জমা, কারিগর তো ঘবেই বয়েছে।

নোতুন ছাঁট কাট এবং পোষাক বের কর দিকি। অতীন হাসে।

অতীনের ইচ্ছা আছে, একটু ওছিয়ে নিতে পারলে ওপাশে বড়বাবুর কাছ থেকে একটা ঘরই নেবে। কাটা পোষাকের দোকান দেবে ভালো কবে। এ দোকানে বসিয়ে দেবে সতীনকে।

ব্যবস্থা কবে রেখেছে সে। মহাজনবা তাকে বাকীতে মাল দিতে চায় কিন্তু অতীনই নেযনি, ভেবেছে এইবার সেই কথা। দবকাব হয় মিনাকেও দোকানে নিয়ে যাবে।

বাস্তাব ধাবের অনেক বড় দোকানের কাউন্টারে মেয়েদেব বোচাকেনা করতে দেখেছে, নিজের দোকানে কাজ কববে ক্ষতি কি।

তাই বড়বাবুব কথায় বলে,

— ভাবছি তাই বড়বাবু। কিন্তু না করলে তো সংসার চলবে না। হাসেন নিমেষবাবু, জ্ঞান হয়েছে তাহলে।

মিনার কিছু নিজের সঞ্চিতে টাকা ছিল। বুদ্ধিটা সেই দেয়, বড়বাবুব কাছে ওদের গ্যাবেজ ঘরটার জন্য বলে, ওটা তো বন্ধই থাকে, ওটাকে একটু সাবিয়ে নিয়ে বং কলি কবলে ভালো দোকান হবে। মালপত্র কিছু বাকীতে নেব, কিছু কিনবো। আব কাউন্টার একটা কবিয়ে নোব। র্যাক তাকও পুরোনো কিনে বং করিয়ে নোব।

টাকাপত্রের হিসাবও হয়ে যায়। মিনাব নিজের সখ দোকান দেবে। পথে পথে একদিন ঘুরেছে। সেই পথের ধাবেই রীতিমত দোকান দিয়ে বসবে।

অতীন ভয়ে ভয়েই কথাটা পাড়ে সেদিন।

বড়বাবু দেখছেন ওকে পথে পথে ঘুবতে। ছেলোটা নিজের পরিশ্রমে আর চেষ্টায় এত বড় হয়েছে, আজ দোকান করতে চায়।

বুদ্ধিটা কে দিল রে? জিজ্ঞাসা করেন বড়বাবু।

অতে বলে— আপনি তো বললেন, সেদিন, তাই বলছিলাম দান ওই গ্যাবেজটা — সরকার মশাই মুখের উপর বলে,

— নাথুমল ওটার জন্য হাজার টাকা সেলামী আর পঁচিশ টাকা ভাড়া দিতে চেয়েছে। সরকার মশাই-এর অবশ্য কিছু প্রাপ্য আছে তা ছাড়া। কিন্তু বড়বাবু কথাটা শুনে কি ভাবলেন। অতীন হতাশই হয়েছে। কোন আশাই তার নেই। নাথুমল অনেক বড় কারবারী, সে ওসব দিতে পারে।

বড়বাবু বলেন, নাথুমলকে জবাব দিন সরকার মশাই, ওটা অতেকেই দিতে হবে। কাল থেকে ভাড়া বন্দোবস্ত করে দেন।

অতীন চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সরকার মশাই বোদামুখ করে চলে যায়। আড়ালে গজগজ করে।

— বাবুর ওটি পোষাপুত্র, কি লগ্নে যে তাড়া খেয়ে গামছার মোট নিয়ে ঢুকেছিলি তা তুইই জানিস। ব্যাটার ববাত ফিরে গেল।

প্রেসের দপ্তরীখানাব অনেকেই খুশী হয়। — তাহলে দোকানই দিলি অতে। কথায় বলে বৌ ভাগো ধন।

শশী বলে, দোকানের নাম দে মিনা স্টোর্স।

হাসে অতীন। সে বলে তাকে, দোকানের নাম যা দোব ঠিক করে বেখেছি। দোকানের নাম দোব ‘মনোবমা’। আমাদের কাগজে দেখনি কত রকম ভালো লেখা ছবি খবর গল্প-টল্প থাকে, তেমনি আমার দোকানেই সব থাকবে — তাছাড়া ওই ‘মনোরমা’ কাগজের দৌলতেই তো সব আমারও তো বরাত ফিবেছে ওই কাগজের দৌলতে, তাই নাম দোব ‘মনোবমা’। বড়বাবুকে বললাম কথাটা। বড়বাবু বলেন, তুই তো বেড়ে চালু হয়েছিস অতে। মগজে বুদ্ধি আছে।

তোড়জোড় কবে লেগেছে অতীন, মিনাও মাঝে মাঝে আসে। দোকানের তাক আলমাবী লাগানো হচ্ছে, কাউন্টার একটা পুরোনো দোকান থেকে কিনে এনে পালিশ কবছে।

দোকানের উদ্বোধন করতে হবে ঘটা করে। কাগজের দু’একজন ফটোগ্রাফারকেও বলে রেখেছে ছবি-টবি তুলে দেবে। বড়বাবুকেই বলে অতীন,

— এবাবও কিন্তু দোকানে আপনাকেই বউনি কবতে হবে বড়বাবু। হাসেন বড়বাবু,

— আবার গলা কাটিবি তাহলে?

অতীন বলে, আপনার বৌমাও বলছিল সেই কথা, ওব দয়াতেই সব —

বড়বাবু ধমকে ওঠেন,

খাম দিকি ব্যাটা। বিয়ে করে আরও বিটলেমি বেড়েছে।

উদ্বোধনের দিন এগিয়ে আসে।

হঠাৎ এমনি দিনে অসুস্থ হয়ে পড়েন বড়বাবু। প্রেস দোকান কাবখানার চালু কাববাব, নানা ঝামেলায় ডুবে থাকতে হয়। দিনরাত কাজ নিয়েই থাকেন।

হঠাৎ অফিসেই মাথা ঘুরে পড়ে যান সেদিন, অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ী নিয়ে যাওয়া হোল, সারা প্রেস দপ্তরীখানা দোকান-এর কর্মচারীরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ক’দিন ধবে যম্মে মানুষে টানাটানি চলেছে।

অতীনও গেছে বার কয়েক খবর নিতে। বিরাট বাড়ীর কাছে। ঢোকবাব সাহস নেই। দেখে ডাক্তারের দল আত্মীয়স্বজনরা নীরবে আসা-যাওয়া করেন।

— কেমন আছেন বড়বাবু?

দারোয়ান ওর দিকে চেয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন ধনী আত্মীয়কে স্যালুট দেয়। অতীন কোন জবাবই পায় না।

সেই সহজ সরল সুন্দর প্রাণখোলা মানুষটি হঠাৎ যেন তাদের সহজ সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে গেছে। কেউ তাকে চেনে না।

এই পরিবেশে তার প্রবেশ নিষেধ। তবু সে আসে স্তব্ধ বিরাট বাড়ীটার কাছে; বেদনাসিক্ত চাহনি মেলে চেয়ে থাকে।

কোন জবাব মেলে না। লোকমুখেই শোনে অবস্থা নাকি ভালো নয়।

মুখ বুজে দোকানে আসে। কোন রকমে কাজ করে মাত্র। সব উৎসাহ তাব নিভে গেছে। নোতুন দোকানের কাজ চলেছে। মনে হয় এ দোকান না করলেই হ'ত। বড়বাবু কি আসতে পারবেন তাব দোকানে প্রথম বউনি করতে।

অনেক আশা নিষেই দোকান করতে চেয়েছিল সে। মনে হয় নিশ্চই আসবেন ... বড়বাবু। সেরে উঠবেন।

হঠাৎ খবরটা আসে প্রেসে। স্তব্ধ হয়ে যায় সব কোলাহল। ফ্লুট মেসিনের গর্জন থেমে যায়, বন্ধ হয়ে গেল দপ্তরীখানা। বইএব দোকানও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তাদেরই দোকান নয়, বই-এব পাড়ই আজ বন্ধ।

এই ব্যবসায় অন্যতম প্রখ্যাত একটি উৎসাহী মানুষ আজ আর নেই।

— বড়বাবু নেই। অস্পষ্ট কণ্ঠে আত্ননাদ কবে ওঠে অতীত। কাঁপছে সেই তরুণ ছেলটি। কান্না ভিজ়ে কণ্ঠে বলে অতীত।

—সতে, দোকান পাঠ কাজকর্ম আজ বন্ধ করে দে। বড়বাবু চলে গেছে।

শ্মশানের পথে আজ লোক ধবে না। মৌন শোভাযাত্রা চলেছে। গুণমুগ্ধ বন্ধু, প্রীতিমুগ্ধ বাংলাব ববেগা সাহিত্যিক শিল্পীব দল সমব্যবসায়ী বন্ধু আত্মীয়স্বজন চলেছেন প্রিয়বন্ধুব শেষযাত্রায়।

শ্মশানে লোক ধবে না। তাদের ভিড ঠেলে এগিয়ে আসে অপরিচিত অজানা সাধাবণ একটি মানুষ, মালাটা বড়বাবুব গায়েব উপব দিয়ে কান্নায় ভেসে পড়ে।

শিশুব মত কাঁদছে আজ অতীত।

ভিড থেকে বেব হয়ে এল, দূরে দাঁড়িয়ে আছে মিনা। তাবও চোখে জল।

সন্ধ্যাব স্নান আভা নামছে গঙ্গাব বুকে, পশ্চিম আকাশে বুক ভবা বজ্জেব জ্বালা দু একটা নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে কোন অজানাব দিকে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অতীত, আর মিনা।

ধূ-ধূ জ্বলছে সেই অনির্বাক চিতাব অগ্নিবেখা উর্ধ্বাকাশেব পানে উঠছে। সমবেত হাজাবো মানুষেব চোখে জ্বল নামে। তাবই ধাবা নেমেছে অপরিচিত ওই অতীত ফিবিওয়ালাব চোখে।

বলে সে — বড়বাবু বলতেন, জীবনে ফাঁকি দিস না, ফাঁকিতে পডবি না। তাহলে ফাঁকি তাকে দিঁইছি মিনা — নাহলে এমনি কবে তিনিই বা চলে যাবেন কেন? বাবা মা ভাই ঠাকুর কোন কিছুই আমাব ছিল না, — বড়বাবুকেই দেখেছিলাম একটা পুরো মানুষ, অতে ফিরিওয়ালাকেও সে ভালে নি। ওপাশেব হাজারো মানুষেব অন্তবেব বিমুগ্ধ প্রীতিব সঙ্গে মিশেছে তুচ্ছ একটা ফিবিওয়ালাব চোখেব জল।

মানুষ আজ মানুষেব জন্য কাঁদে। চিরকালই কাঁদে। এক জায়গায় সে আজও বদলায় নি, হাজারো মিথ্যাব মাঝে এইখানে সে সত্য, এইখানেই সে সুন্দর।

রাত্রির অন্ধকার নামে গঙ্গাব বুকে আকাশে তারাগুলো উজ্জ্বল নীল আভায় জ্বলছে।

অসাময়িক

শম্ভু মিত্র

মানুষটির নাম সত্যপ্রিয় চৌধুরী। আজ বয়স হয়েছে, এবং তার সঙ্গে আবার এমন একটা কিছু হয়েছে যাতে অনেকদিন পবে কেউ যদি তাঁকে দাখে চিনতে পাবে না। আমিও পারিনি। গোড়াতে পারিনি। ফিল্ম-পরিবেশকদের আপিসে যাবার সিঁড়ির মুখটা দুপুবেও অন্ধকার। সেইখানে সিঁড়িতে ওঠবার জন্যে পা বাড়িয়েই হঠাৎ অতোখানি একটা দীর্ঘ শবীব মুখোমুখি এসে পড়ায় পাশ কাটাবার মধ্যেই একবার তাকিয়ে ফেলেছিলুম। কিন্তু সেও ঐ এক পলকের জন্যেই, তারপরই চোখ ফিরিয়ে আপন গতিবেগে ওপবেই উঠে যেতুম, কিন্তু ঘিলুর মধ্যে ততক্ষণে টবে টক্ক ক রে একটা টেলিগ্রাফের বার্তা চঞ্চল ক বে তুলেছে, — লোকটার চোখটা যেন আমাকে চিনতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে মোটর নার্ভগুলো ব্রেক কষলো, আর আমি ওপবেব ধাপে ফিরে দাঁডাতে গিয়ে প্রায় ভদ্রলোকের গায়েব ওপবেই হুমডি খেয়ে পড়ে তাঁর মুখেব দিকে তাকালুম। ঠিক। ভদ্রলোকের ঘাড ফেরানো চোখে সেই চিনতে পাবাব ভাব। আমাব মাথাব মধ্যে তখন যেন ডজনখানেক কেবানী তাদের অফিসাবেব তাডা খেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ফাইলের তাডাব মধ্যে খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।

দীর্ঘ ভদ্রলোকের শীর্ণ মুখেব ওপর হাসি। ঝোঁক দিয়ে ভুদুটিকে উপব দিকে তুললেন কৃশল প্রশ্নের ভঙ্গিতে, আব সঙ্গে সঙ্গে আমি চিনতে পাবলুম। বিস্ময়ে কথাগুলো যেন আমাব মুখ থেকে স্থলিত হয়ে পডলো — “আপনি! এ কী চেহাৰা! এ কী চেহাৰা! এ বকম কেন হোল? কী হয়েছে আপনাব?”

সত্যপ্রিয় ভাঙা তোবড়ানো গালে আবার একটু হাসলেন। বললেন — “আমিও তো ভেবে ভেবে কোনও ঠাণ্ডর পাছি না। তোমরা কেউ বলতে পাবো? যে, কী হোল আমাব?”

আগেকার মতো সেই মেঘডাক্ষ গম্ভীর আওয়াজ নেই সত্যপ্রিয়েব। নবনাটা আন্দোলনের মধ্যে যে কষ্ট গুনে লোকে উদ্বেল হোত, মেয়েরা প্রেমে পড়তো, সে উদাত্ত বলিষ্ঠ কষ্টস্বব কোথায় হাবিয়ে গেছে। আজ সে যেন অনেক ক্লান্ত, অনেক ফিকে। হঠাৎ মনে হ'তে পাবে এ কষ্ট যেন আর কথোপকথনের নয়, এ যেন শুধু স্বগতপ্রলাপেব।

আমারও সেই কথাই মনে হোল একটু পবে তাঁর সঙ্গে চাযের দোকানে ব'সে। এতদিন পরে দেখা, আমার সত্যদাকে যে কী দিয়ে আপায়ন করবো ভেবেই পাইনি। আমাব যাযাব কথা ছিল ওপরতলায় এক ফিল্মপরিবেশকের আপিসে, একটা পোস্টারের ডিজাইন নিয়ে, (আমি কমার্শিয়াল আর্টিস্ট) ভুলে গেলুম সেসব, আমন্ত্রণ ক রে নিয়ে গেলুম সত্যপ্রিয়দাকে মোড়ের ছোট্ট চাযের দোকানটায়, অনেক কথা বলবো আর অনেক কথা শুনবো ব'লৈ। অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে, অনেক কথা আমার শোনবার আছে, অনেক খবর জানবার আছে।

সত্যদা বললেন, — “তা এককালে তো আমাকে গুরু ব'লে মানতে, তারই দক্ষিণাস্থরূপ দুটো টোস্ট খাওয়াও তো। আজ সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি।”

সেকি। আমি চেয়াব ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম — “চলুন তা’হলে একটা ভালো জায়গায় যাই, পেট ভ’রে খেয়ে নেবেন, এখানে শুধু টোস্ট খেয়ে কী হবে। চলুন।”

হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। মাথা নেড়ে বললেন, — “নাহে। ঐ দুখানা টোস্টের ওপব দিয়েই যাক। বেশী দক্ষিণা চাইতে গেলে আবার সম্পর্কটাই ভেঙে যাবে। বোসো।”

আমি বসলুম, কিন্তু তাঁর কথায় একটা অভিমানের আবেগ আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ ফুলে উঠতে থাকে, বললুম, — “আমি জানি অনেক লোক আপনার সঙ্গে বেইমানি করেছে, আপনারই সাহায্যে দাঁড়িয়ে উঠে পবে আপনার নামেই কুৎসা ক’বে বেড়িয়েছে, কিন্তু আমি বোধ হয় তাদের মতো নই, আমি সেবকম বংশে জন্মাইনি। আমার যদি কোনও মনুষ্যত্ব থাকে, আমার যদি কোনও বকম সত্যজ্ঞান হয়ে থাকে, — সে সমস্ত আপনার জন্যে। আজ যদি তার দক্ষিণা দিতে আমাকে সর্বস্ব দিতে হয় সেও আমি হাসিমুখে দিতে পাববো, দুখানা টোস্ট খাইয়ে শোধ দিতে চাইব না।”

বলতে বলতে সত্যিই আমার চোখ জ্বালা ক’রে জল এসে পড়লো, আমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হোল।

সত্যপ্রিয়দা কিন্তু কিছুই বললেন না। চূপ ক’রে সামনের দিকে চেয়ে বইলেন, যেন আমার এই আবেগের ভিতর দিয়ে আরো অনেক গভীর কথা, অনেক মৌল কথা তাঁর চোখের সামনে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যাব কোনও সমাধান নেই।

একটু পবে আপন মনে বললেন, — “কেস যে এমন হয়। আমার কাছে এলেই সবাইয়ের কেন যে এমন হিস্টরিয়া হয়! কিন্তু আমি তো আর কিছু চাই না। স্তুতিও চাই না, কুৎসাও চাই না, — খালি একটু বিশ্রাম চাই।” একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো তাঁর।

এই সেই সত্যপ্রিয় চৌধুরী যে বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলনের একজন নেতা। সেদিন যার শরীর ছিল বিশাল, মন ছিল তীক্ষ্ণ, সাহস ছিল অপরিমেয়, আর আশা ছিল তার চেয়েও বেশী। আজকের মতো এই নিষ্কণ্টক চোখ নয়, সেদিন যাব চোখ ছিল বিদ্রুতের মতো শাণিত; আজকের মতো এই অস্থি-চর্মসার ক্লান্ত মুখাবয়ব নয়, সেদিন যার মুখে সকালের আলো ঝলকাতো, সেই সত্যপ্রিয়দাব মনে কোনও সংশয় ছিল না। যাব মনে ভবসা ছিল যে স্বার্থান্বেষী মুনাকালোলুপ মুষ্টিমেয় লোক দেশের সাধাবণ লোকের পরিস্ফুরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেবল তাদের জনাই জনগণের সংশ্লিষ্টের বসাব্বাদনের পথে বিঘ্ন ঘটছে। তাই স্বার্থত্যাগ ক’রে একনিষ্ঠভাবে গভীর নাটকের অভিনয় ক’রে যেতে হবে, কেবল দেশের লোককে ভালো জিনিসটি দেখবার সুযোগ ক’রে দিতে হবে, তাহলেই তাবা আপন-পর বুঝতে পারবে, এবং যা সং ও সত্য তার জয় হবেই। এ হবেই হবে।

এবং সত্যি কিন্তু তখন-তখন হয়েছিল জয়। হেঁ হেঁ প’ড়ে গিয়েছিল সত্যপ্রিয় চৌধুরীর প্রয়োজনায়। বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া প’ড়ে গেল নতুন যুগ এসেছে ব’লে। নাট্যাভিনয় আবার নতুন ক’রে এবং আগের চেয়ে অনেক বেশী ক’রে জাতে উঠলো। ইনটেলেক্চুয়াল এবং মর্যাল দুই খ্যাতি একসঙ্গে হোল। সেদিন সত্যপ্রিয়দার চলায় বলায় হাসির আওয়াজে যেন জয়ের নিশান হাওয়ায় উড়তো।

আর আজ তিনি ক্লান্ত, একটু হেসে নিজের ডানহাতটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, বললেন, — “তুমি তো এক সময়ে রিহার্সেলের ঘরে সকলের হাত দেখতে, — দ্যাখতো। — তখন দেখতে দিইনি, আজ দ্যাখ।”

তাঁর সেই কালিমেড়ে দেওয়া ঘর্মাক্ত তেলামুখের হাসির দিকে তাকিয়ে আমার মনেব সমস্ত অভিমান যেন বয়স্কদের শোকের সামনে শিশুর কান্নার মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, — “আপনি কি হাত দেখায় বিশ্বাস কবন আজকাল?”

তিনি বললেন — “করি বৈকি। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা যা কিছু করবার ছিল সমস্ত করেছে, ক’রে চাঁদ বেগের মতোই হেরে গেছি। তাই আজ চ্যাংমুড়ি কাণিকেই বিশ্বাস করি। — অঙ্ককার একটা বড়ো সত্যি জিনিস ভাই। ইস্কুলে পড়েছ তো, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। মানুষের সন্তিহেও তেমনি তিনভাগ অঙ্ককার একভাগ আলো। কিংবা হয়তো তারও কম।”

আমি কথা পাশ্চাতে জিজ্ঞাসা করলুম, — “আপনি আজকাল কোথায় আছেন?”

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, — “বাড়ির ঠিকানা আমি অনেকেদিন হোল কাউকে দিই না। তোমাকে বলছি, আশা করি তুমি কাউকে বলবে না। — থাকি ক্যানিং লাইনে একটা গ্রামে। স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে।”

— “এখানে এই ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারদের পাড়ায় এসেছিলেন কেন?”

— “ওরা মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে সিনারিও ঠিক করিয়ে নেয়, সংলাপ লিখিয়ে নেয়। না, নাম দেয় না। অল্প কিছু টাকা দেয়। কখনো দেড়শো কখনো দুশো।”

— “এই টাকাতে আপনি করেন?”

— “করি। খালি তাই নয়, এইটুকু কাজ পাবার জন্যে আবার তোষামুদিও কবি।”

সত্যপ্রিয়দা কর্তার তোষামুদি করছেন এ ছবিটা আমি চেষ্টা করেও কল্পনা করতে পারলুম না। কিন্তু তিনি মাথা নেড়ে বললেন, — “করি। নইলে আমাকে না দিয়ে তো আর কাউকে ইচ্ছে কাজটা দিয়ে দিতে পারে। আমার মতো উজ্জ্বলতার লোক তো কেবল আমি একাই নই।” চা আসে, টোস্টও।

সত্যপ্রিয়দা বললেন, — “চা খেয়ে নিয়ে আমার হাতটা একবার দেখে দিয়ো তো। — কবে ভালো হবে তা জানতে চাইছি না, কবে একেবারে মন্দ হবে সেটা খালি ব’লে দিও। এই যে দেড়মাস দুমাস অন্তর দেড়শো দুশো টাকা রোজগার হয়, এইটাও কবে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে বলতে পারো? তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হই। — বুঝতে পাবলে না? যেদিন সত্যি বন্ধ হবে আমি তো ঠিক সেইদিনই বুঝতে পারবো না, তারপরেও দুমাস, তিনমাস, হয়তো চারমাস ধরে ঘোরাঘুরি করবো, আর আশা করে যাব যে এইবার আসবে কিছু টাকা। এই কষ্টটা থেকে অন্তত তুমি আমাকে বেহাই দিতে পাবো। দ্যাখনা যদি সেইটুকুই পারো।”

আমার কি যেন হয়, হঠাৎ জোর দিয়ে ব’লে উঠি — “না, এরকম চলতে পারে না। আপনি আবার আসুন। আমি আবার লোকজন জড়ো করবো। আবার আমরা নতুন ক’রে নাটক করবো নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আবার আপনাকে কাজে নামতেই হবে।”

সত্যপ্রিয়দা মাথা নাড়েন, বলেন — “নাঃ। আর তা হয় না।” আমি অনুনয় ক’রে বললুম, — “কেন হবে না? বলছি তো, আমি ছেলেমেয়ে জোগাড় করবো, যারা এখনো স্বপ্ন দেখতে পারে, যারা এখনো আদর্শের জন্য ত্যাগ করতে পারে, সেইরকম অল্পবয়সীদের আমি যোগাড় ক’রে আনবো।”

সত্যপ্রিয়দা বললেন — “তাতে কী হবে? দু’একবছর পরে তো আর তারা অল্পবয়সী থাকবে না, তখন? যাদের নিয়ে শুরু করেছিলুম তারা আজ কোথায়? কেউ ব্যবসা দেখছে, কেউ অফিসার হয়েছে, কেউ ফিল্মে গেছে, আর যারা কোনও রকম সুবিধে ক’রে উঠতে পারেনি তারা আজও প্রতিষ্ঠার লোভে থিয়েটারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিষমুখে সকলের কুৎসা ক’রে বেড়াচ্ছে। — তাদের পরে আবার যারা নতুন এলো তারা কী করলে? — যাকগে।তুমি কি এখনও নাটক করছো? কোনো দলে আছো?”

বললুম, — “না। জীবনে আমি একটাই দলে ছিলাম। এবং শেষ দিন পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।”

সত্যপ্রিয়দা হাসলেন, বললেন, — “সত্যিই গৌরব?”

তারপর একটু চুপ ক’রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, — “শেষ দিনটায় তুমি ছিলে?”

— “ছিলুম। আমি, পৃথ্বীশ আর দীপক সবচেয়ে আগে এসেছিলুম। এসে দেখলুম আপনি লাইব্রেরীর বইগুলোর ওপর হাত বোলাচ্ছেন, আমরা তাই আপনাকে জানান না দিয়ে বারান্দার কোণের দিকে চ’লে গেলুম।”

— “জানো, অনেকের অনেক রক্ত জল ক’রে কেনা হয়েছিল বইগুলো। তাই নেড়েচেড়ে দেখছিলুম। — কিন্তু মনে আছে? অমরেশ পরে ইঙ্গিত করলে যে আমি তাড়াতাড়ি এসে বই সরিয়েছি?”

— “তার শাস্তি অমরেশকে সেইদিনই পেতে হয়েছিল। সেই রাক্তিরেই।”

— “হ্যাঁ, তোমরা কয়েকজনে নাকি তাকে মেরেছিলে। কিন্তু কেন মাঝতে গেলে। অমরেশ বোকা ছিল।”

“কিন্তু খগেনকে পেলেও সেদিন আমরা ছাড়তুম না। সেই বুঝেই সে গা ঢাকা দিয়েছিল।”

— “খগেন এখন কী করছে?”

— “নানান আপিস ক্লাবে যে কোনও নাটকের ঠিকে-ডাইরেকশন দিয়ে বেড়ায়। তার জন্যে পয়সা পায়। তারপর কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।”

— “সুশান্ত, প্রদীপ, এরা কী করে?”

“সুশান্ত একটা দল করেছে। প্রদীপ আর একটা দল করেছে। — কিন্তু এদের কথা ছেড়ে দিন আপনি। এরা দল করেছে দলাদলিৰ জন্যে। এদের প্রধান কাজ হচ্ছে পরস্পরের নামে কুৎসা করা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনার নামে প্রত্যহ একটা কুৎসিত কথা না বলতে পাবলে এদের পেটের ভাত হজম হোত না। কিন্তু আপনি তো একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাই এখন নিজেদের মধ্যেই সব গালাগালির লক্ষ্যটা থেকে যাচ্ছে। যাকগে, যাকগে, এবা অত্যন্ত তুচ্ছ লোক। — আপনি আবাব ফিরে আসুন, সত্যদা, আমরা আবার কাজে লাগি। সেইসব দিনগুলোর কথা মনে হ’লে ভেতরটা য়ে কী হয় সে তো আমি আপনাকে বোঝাতে পারবো না। আচ্ছা, তখন তো আমরা কোনওদিন কোনও ছোট কথা ভাবিনি। আপনি বলতেন, নিজেকে সম্মান করতে পাবলেই আত্মসম্মান থাকে, সেটা অপরের দেওয়া না-দেওয়ার ওপর নির্ভর করে না। আপনি বলতেন, দেশের সাধারণ লোক নেভাপ্রদীপের মতো মন নিয়ে উন্মুখ হয়ে ব’সে আছে যে কবে আমরা সেই প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দোব, সেইদিনই দেশে দেওয়ালির রাত আসবে। — সেই বড়ো-কথাটা তো আজও আমাদের বলা হোল না সত্যদা, কেউ যে বলবে এমন লোক নেই। আপনি ফিরে আসুন। আমাদের জন্যে, দেশের জন্যে, আবার একটা কিছু করুন।”

কিন্তু সত্যদা চুপ ক’রে থাকেন, তারপর নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, “নাঃ। আমার সে শক্তি নেই তাই, আমার দ্বারা হোল না। প্রথম যখন শুরু করেছিলুম তখন দেশ পরাধীন। আমরা সবাই তখন এক, কারণ শত্রু তখন বিদেশী ইংরেজ। তারপর স্বাধীন হলুম। সামনে থেকে বিদেশী শত্রু হ’টে গেল, আর আমাদেরও যতো কুশ্রী ঝগড়া বেরিয়ে পড়লো। যারা অভিনয় করবে তাদেরও, যারা দেখবে তাদেরও। তবুও করেছি। এক-আধটা টিউশানি ক’রে না খেয়ে না প’রে করেছি। কই, দেশের লোক তো একটা থিয়েটার দিলে না আমাদের। তারা ফ্যাশান ক’রে আমাদের অভিনয় দেখতে এসেছে। আর হাততালি দিয়ে ফিরে গিয়ে তাদের পুরানো অভ্যস্ত জীবনযাপন করেছে। তাই, যারা অভিনয় নিয়ে ব্যবসা করেছে তাদেরই রোজগার বেড়ে গেছে। এই লোকেরাই যে সেখানে ঝাঁক বেঁধে গিয়ে পয়সা দিয়ে এসেছে, তবেই না বেড়েছে। — ছেলেটা মারা গেল, সে কথা তো জানো। আজ ভাবি ভালো হয়েছিল, নইলে আরো কষ্ট পেত। অরুণাংশু তখন সকলকে তাতাচ্ছে যে, স্যাক্রিফাইস ক’রে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, শিষ্টাী হওয়া যায় না। — খগেন তখন সেই যে নতুন মেয়েটি

এসেছিল — সীতা — যার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, — তার সঙ্গে জোব ক'রে প্রেম করবার চেষ্টা করছে। দল বেঁধে মদ খাচ্ছে তারা, ঐ বাচ্ছা ছেলে অমরেশকেও ভিড়িয়েছে সেই দলে। যেদিন হচ্ছে আসছে, যেদিন হচ্ছে কামাই করছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে ব্যক্তিগত কাজ ছিল। আদ্ভুত! আমি তখনো ভাবছি নতুন নাটকের কথা। নতুন ধবনের। — বাড়িতে নীলিমা ছেলেব শোকে পাগল।

আমাকেই দোষ দেয়। বলে, আমার মহত্বের সাধনার দাম দেয় আমার ছেলে। হ্যাংলা হয়, পরের বাড়িতে গিয়ে চুরি ক'রে খায়, তারপৰ ম'বে যায়। — বলতে পারো ভাই, কাব জানো কবেছি এ পাগলামি!

তাবা তো অন্তত আমার তৈরি জিনিসটাকে কোথাও বাখবে আদর ক'রে? নতুন ফর্ম তো এনেছিলুম একটা, সেইটারই একটা স্থান ক'বে দাও কেউ, যাতে তার বৃদ্ধি হয়, প্রসাব হয়! — আসলে কী জানো?

ইতিহাস বলো, ভবিষ্যৎ বলো, বা জনসাধারণ বলো, কারোর ওপর কোনও ভরসা করাই ভুল। যা করবে তা নিজের দায় মনে কবেই কোবো, কাবোর ওপর ভবসা ক'বে কোরো না। ছোটবেলাব ঐ যে ধারণা, ভালো কাজ কবলে মানুষ পুৰস্কাৰ পায়, পুণোব জয় হয়, — এ একেবাবে ভুল। তোমার পোড়ো জমিটার সামনে দিয়ে যদি চওড়া বাস্তা বের হয় তাহলেই তোমার জমির দর বেড়ে যাবে, আবাদ করো আর নাই করো।”

হঠাৎ আমার মনে হোল তেলচিটে ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে যেন বিরাট একটা ভাঙা পিরামিডেব মতো ব'সে আছেন তিনি। সারা মুখে কতো দাবিদের ডৌল আব বেখা। চোখ দুটো ঝোলা। ঢল-নামা গঙ্গাব মতোই গভীর কিন্তু তেমনি অস্বচ্ছ, ভিতবে যে কতো কী হচ্ছে তা কিছু বোঝা যায় না। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কথা শুনতে শুনতে আমার যেন আচ্ছন্ন লাগছিল, জোব ক'বে সেটাকে কাটাৰাব জানো সোজা হয়ে বসি, আবাদ চায়েব অর্ডার দিই। কিন্তু সত্যপ্রিয়দা নড়েন না, কোথাও যে কিছু নড়ছে জীবনে তাও যেন তাঁব গোচর নয়।

আমি তাঁকে বলি, — “আমাদের দলে যদি অরুণাংগু খগেনেব মতো লোক না থাকতো তাহলেই আমরা ঠিক থাকতুম। ওদেব মতো লোক যেখানে যাবে সেই জায়গাটাকেই ভাঙবে।”

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে আগের মতোই মৃদুস্বরে বললেন, — “না। এ জাতের মোটের মাথায় standard breed হচ্ছে এইবকম। এই চোদ্দ পনেরো বছর ধ'বে কতো ছেলে এলো, গেল, — সব এই। সমাজেই মানদণ্ডের গোলমাল হয়ে গেছে। সেইজনোই আমার কথা শুনতে শুনতে ওদের রাগ হোত। অথচ একদিন ঐ অরুণাংগু, ঐ খগেন, আদর্শবাদীর উজ্জ্বল চোখ নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার কথা শুনে ওদের ভিতরটা যেন রণ রণ করতো। তাবপর আস্তে আস্তে ওদেব চোখের জ্যোতি ক'মে এলো। যে সাফল্যের আশা করেছিল সে যখন এলো না, — টাকা এলো না, ফিল্মের মতো পাব্লিসিটি এলো না, সুন্দরী নারী এলো না প্রেমজ্ঞাপন করতে, — তখন ওদের রাগ হল আমি যেন ঠিকিয়ে এনেছি। কারণ আমার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী, আব লোকমুখে তো আমার খানিকটা প্রতিষ্ঠা। — তাই যখন হঠাৎ ছেলেমেয়েদের মেলামেশার কথা জনতে পারলুম, বাধা দিলে গেলুম, ফল উন্টো হোল, আমার সামনে ওদের একটা যে সঙ্কোচের বাধা ছিল সেটা উড়ে গেল। ওরা বললে, যে-তাড়না প্রাকৃতিক তাকে দমন করা যায় না। আমি বললুম — তাকে চালনা করা যায়, সাবলিমেন্টে কবা যায়। ওরা বললে, — আগে পেট ভ'রে খাই, তারপর কৃষ্ণসাধনের কথা ভাবা যাবে। বললে, — আমরা সাধারণ মানুষ, সাধাবণেব মতোই বাঁচতে চাই। খিদে পেলে খাবো, আর না খেতে পেলে চুরি করবো। তবেই আমরা সাধাবণ লোককে আনন্দও

দিতে শিখবো। এসব দার্শনিক নাটকের মাধ্যমে উচ্চস্তরের সামাজিক দায়িত্ব পালন ক'রে নয়। সেন্টিমেন্ট দিয়ে, ঢং দিয়ে, ভেঙ্কি দিয়ে, — সাধারণ মানুষের মনোমত সাধারণ হয়ে।

ভয়ে আমার হাত পা যেন কাঁপতে লাগলো, বললুম — তা'হলে এতদিন আমরা যা ভেবে এসেছি সব ভুল? বীর থাকবে না, কেউ, কেউ লড়াই করবে না, মহৎ হবে না?

ওরা তিক্তভাবে হেসে বললে — মাফ কববেন, চারদিকে যাদেব দেখা যায় তারা কেউ বীর নয়, বীরত্ব দেখতেও চায় না। তাই নায়কেব চেয়ে এখন নায়িকাব টান বেশী। সোজা লাইনের চেয়ে কার্ভ-এর দাম বেশী।

“এসব কথা তোমরা কেউ জানো না। তোমরা খালি জানো যে মিসেস ঘোষকে আমি বকেছিলুম ব'লে খগেনবা কমিটি মিটিঙে আমায় মাপ চাইতে বলেছিল। আমি রাজি হইনি, তাই আমাকে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব এনে সেটা পাশ করালো। তাই না? কিন্তু এসব অনেক পরে, তার আগে — ওঃ! — কিন্তু কেনই বা তোমাকে এ সমস্ত বলছি। থাকগে।”

আমি বললুম, — “না বলুন, আমার শোনাব দবকার আছে।”

— “কী দরকার?”

সে কথার জবাব না দিয়ে আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললুম, — “আছে দরকার। আপনি বলুন।”

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ সোজা প্রশ্ন ক'বে বসলেন, — “অরুণাংশু এখন কোথায় জানো?”

আমি যেন এই প্রশ্নটাবই অপেক্ষা কবেছিলুম গোড়া থেকে। অন্যদিকে তাকিয়ে বললুম, — “এখন কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। সাঠে অ্যান্ড মাচওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজাব। থিয়েটার রোডে থাকে।”

তিনি একটু হেসে বললেন, — “থিয়েটারেব সঙ্গে ঘুরি ঐটুকু সংযোগই বেখেছে?”

আমার হাসি এলো না, কারণ আমি সত্যপ্রিয় চৌধুরীর মতো মহৎ নই। রাগে আমার চোখ বাঙা হয়ে উঠেছে, তবু সংযত থাকবার চেষ্টা ক'রে বললুম, — “বছর দেড়েক আগে সে ফিরেছে। ঠিকানা যোগাড় ক'রে আমি একদিন গিয়েছিলুম তার বাড়িতে। বেয়ারাকে দিয়ে ব'লে পাঠালে এখন ব্যস্ত আছি, আপিসে দেখা করতে বোলো। আমি একটা কাগজে লিখে বেয়ারার হাত দিয়ে আবার পাঠালুম যে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার আমার আদৌ কোনও ইচ্ছে নেই, আমি শুধু নীলিমা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। কিন্তু দেখা করতে দিলে না। বেয়ারা এসে বললে, যে এ বাড়িতে ও নামেব কেউ থাকে না। আমি আর পারলাম না, সিঁড়ির কাছটায় গিয়ে চৌচিষে ডাকতে লাগলুম — নীলিমা বৌদি, আমি মুকুলেশ এসেছি। আপনার কাছে আমার কিছু প্রশ্ন আছে, আপনাকে তার জবাব দিতেই হবে। নীলিমা বৌদি বেরিয়ে আসুন, আমাকে বলুন আপনি কী ক'রে এ কাজ করতে পারলেন—। ততক্ষণে ওপরে অরুণাংশু বেরিয়ে এসেছে, রেলিং ধ'রে চীৎকার ক'রে বেয়ারাকে ডেকে বললে আমায় তাড়িয়ে দিতে। আমারও তখন মাথায় রক্ত চ'ড়ে গেছে। আমি অরুণাংশুকে গালাগাল দিয়ে বললুম যে সে আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছে, আপনার সঙ্গে বেইমানি করেছে —। কিন্তু বেশী বলা গেল না, চাকরে ও দারোয়ানে মিলে আমাকে মেরে গেটের বাইরে বের ক'রে দিলে। দু'একটা রাস্তার লোক দাঁড়িয়ে প'ড়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, আমি চৌচিষে মুছতে মুছতে চ'লে এলুম।”

খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। তারপর সত্যপ্রিয়দা আস্তে আস্তে বললেন, “নীলিমা কে তোমরা অমন ক'রে বিচার কোরো না। ওর যা কিছু অনিষ্ট সব আমি করেছি, ও আমায় সত্যিই ভালোবেসেছিল।”

আমি বিশ্বাস করি না কথাটা, তবু চুপ করেই থাকি। তিনি আবার বললেন, সত্যিই ও আমাকে ভালোবেসেছিল। আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমার সাথী হ'তে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে, ও একেবারেই অভিনয় করতে পারে না। ও কী করবে? ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়লো।

আমি প্রতিবাদ না করে পারলুম না যে, — “অভিনয় ছাড়াও তো কতো কাজ থাকে। পোশাকের ভার নিতে পারতেন, প্রস্পেক্ট করতে পারতেন, — মাঝে মাঝে তা কবেওছেন শুনেছি সেসব, কেন বন্ধ করলেন?”

সত্যপ্রিয়দা বললেন — “কিন্তু সেটা তো ওর ক্ষমতার উপযুক্ত কাজ হোলো না। সারাদিনের মধ্যে ওর তো আরো কাজ থাকা চাই, যে-কাজ ওর বুদ্ধি বোগা। — তাই ও চাকরি নিল। সেল্‌স্‌ অর্গানাইজ করা ব কাজ। কিন্তু ওর সে কাজ সম্বন্ধে আমার তো বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। আমি আমার কাজেই মশগুল থাকতুম। কিন্তু নীলিমা তো চেয়েছিল যে আমার কাছে তার মূল্য হবে, খালি টাকা রোজগার কবাই তো সাথী হওয়া যায় না। অথচ আমি তার এই নির্ভরতা বুঝতে পারতুম না। আমার মনে হোত, আমরা দুজন স্বাধীন সম্পূর্ণ লোক, স্বচ্ছায় যুক্ত হয়েছি। ফলে, তার কাজ সম্পর্কে আমার উদাসীনা নীলিমার মনে হ'তে লাগল তারই সম্পর্কে আমার উদাসীনা। ও কল্পনা করতে লাগল আমি আব যেন কাবোব প্রেমে পড়েছি। — ওব সেই অসুস্থতা দেখে সত্যিই আমার মন ক্রমশ বিকপ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, তাতে আমার কাজেব ক্ষতি হচ্ছিল। এমন সময়ে ছেলে হবাব সময় হোল। ও চাকরি ছেড়ে দিল। আমি আবার ওর শরীরেব দিকে নজর দিলুম, আমাদের সব ঝগড়া মিটে গেল। আরো মিটে গেল ছেলে হবাব পব। ও যেন ঠিক কাজটা পেল, যাতে আমাদের দুজনেবই উৎসাহ। ও ঠিক কবলো ও ঘবকবগাব কাজ কববে, ছেলে মানুষ কববে। — কিন্তু আমার বোজগাব ক্রমশই কমতে লাগল। আব ততোটাই নীলিমা ক্ষেপে উঠতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আমাকে নাটকেব কাজ ছাড়াতে পারলো না, ফলে বোজগাব কিছু বাড়লো না। ববঞ্চ খুব কমেই গেল। তখন একদিন বাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলুম যে আমাদের পাঁচ বছবেব ছেলে দুপুব বেলায় পাশের বাড়িব জাল-আলমারি থেকে চুরি ক'রে তবকাবি খাচ্ছিল, হঠাৎ ধবা প'ড়ে গেছে। — দুজনে অনেকক্ষণ চুপ ক'বে ব'সে রইলুম। সেই নাববতাব মধ্যে নীলিমার কঠিন মুখ যেন চিংকাব ক'বে আমাকে দাবী করতে লাগলো। কিন্তু আমার মনে প্রায় অনেক বছর আগে ইবসেনের একটা প্রশ্ন বার বার যা দিতে লাগলো — ছেলেমেয়ে আছে ব'লে কি মানুষ ভালো কাজ করতে পারবে না, সতোর জনো দাঁড়াতে পারবে না! — তাবই মাসকয়েক পবে ছেলেটা মারা গেল।”

আমি প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা কবলুম — “এই রকম হয়েছিল নাকি? — তারপব?”

সত্যপ্রিয়দা চোখ দুটো ছোট ক'বে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, যেন কষ্ট ক'রে কী দেখবার চেষ্টা করছেন। বললেন, — “তারপব? ভাবো নীলিমার কী রইল? আমার সাথীত্ব পেল না, সংসার পেল না, ছেলে রইল না। আমার মতো হাঘরের ঘবে ও কী দ্বিয়ে পূর্ণতা আনবে। কখনো কুৎসিত বিষাক্ত কথা ব'লে ঝগড়া করে, আবাব কখনো আমাদেরই আঁকড়ে ধ'বে কাদে। আমি দিনের পর দিন দেখেছি। কিছু করতে পারিনি। তার কাঙ্ক্ষণ থাকতে পারিনি বেশীক্ষণ, রোজগারের জন্যে যেতে হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় রিহার্সেলে যেতে হয়েছে। কাউকে বুঝতে দিইনি আমার দিন কী করে কাটছে। আর একলা বাড়ির মধ্যে নীলিমা একটু একটু করে অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কতো করে তখন সেই নাটকটা আমরা তৈরি কবলাম — ক্রান্তিপূর্ব — কতো বিশিষ্ট লোকের কাছে কতো প্রশংসা হোল, কিন্তু লোকে দেখতে এলো না। কী জানি কেন। হয়তো সাধাবণ দর্শকের মন বদলাচ্ছে। তাই জোর ক'রে অভিনয়টা

চালাতে গিয়ে অনেক ধার হয়ে পড়লো। অতোগুলো বৎসরের পবিত্রমেব পর হাতে কোনও টাকাপয়সা রইল না, শুধু ধার রইল। — তখনই ঐ মদ খাওয়া, ঐ মেয়েদের নিয়ে ব্যাপারগুলো ঘটলো। — ওরা বন্ধুত্বের মধ্যে উদ্ধতভাবে আমার সঙ্গে কথা বললে, ওরা সবাই যে আমার চেয়েও কতো বেশী আত্মত্যাগ করেছে সেইসব কথা —। আমি কিন্তু কখনো বলিনি যে আত্মত্যাগের মৌরসী-পাট্টা কেবল আমার। বলতে পারলুম না। কিছুই বলতে পাবলুম না। বাড়ি ফেরার পথে কেবলই মনে হ'তে লাগলো, নিশ্চয়ই আমাব কোথাও পাপ হয়েছে, নইলে আমারই হাতে গড়া ছেলেরা এসব কথা আমাকে বললো কী ক'রে! আমারই পাপ, নিশ্চয় আমারই পাপ। — সেদিন বড়ো কষ্ট হচ্ছিল। এরকম কখনো হয়েছে তোমার যে, চোখ শুকনো থাকে, অথচ থেকে থেকে কী রকম একটা জন্তব মতো অস্বাভাবিক আওয়াজ বেবিযে পড়ে গলা থেকে? — ভগবান করুন, যেন না হয়।'

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে লাগলেন, — “বাড়ি ফিবেতে অনেক রাত হোল। নীলিমা কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা কবলো, — ‘এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?’ — আমি কোনও জবাব দিলাম না। ও আবার বললো, — ‘আমাব সম্পর্কে কী ঠিক কবেছ? আমি কী কবো?’ আমি বললুম, — ‘তুমি ঠিক ক'বে নাও তুমি কী কবতে চাও।’ নীলিমা বললো, — ‘একটা স্ত্রী তার স্বামীর কাছে যা ন্যায্যভাবে চাইতে পাবে তাব চেয়ে বেশী তো কিছু চাচ্ছি না। আমি একটা সংসার চাই, ছেলেপুলে চাই, তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চাই। এটা চাই না যে আব একজনের মহত্বের সিঁড়ি হবাব জন্যে তাবা ম'বে যাক। আমাব স্বামীব অবহেলা চাই না। আমাব একটা ভবিষ্যৎ চাই, তাব জন্যে আমাব —।’ আমি বাধা দিয়ে বললুম — ‘এতোদিনে তো বুঝতেই পেবেছ যে আমি একেবারে অক্ষম, একেবারে অপদার্থ, তাহ'লে আব কেন আমাকে এসব কথা বলছে। আমাব স্বাচ্ছন্দ্য দেবাব ক্ষমতা নেই, ছেলেপুলেকে বাঁচিয়ে রাখবাব ক্ষমতা নেই, আব তোমাব ভবিষ্যতও বাঁচিয়ে দেবাব ক্ষমতা নেই। আমি লোকটা ঐটুকুই, আমি নপুংসক, আমি হিজড়ে, আমি পানী, আমি স্বার্থপব, আমি সব, আমি সব। দয়া ক'রে আমাকে ছেড়ে চ'লে যাও। আমার ওপর ভবসা ক'বে তোমাব সবাই নিজেদেব সর্বনাশ আব কোবো না। দোহাই তোমাদেব, তোমাব যাও। চ'লে যাও।’ তারপবেও দিন কাটলো। কী ক'বে কাটলো তা আব এখন বলা অসম্ভব। কিন্তু কিছুদিন কাটলো। বেশ বুঝতে পাবছিলুম যে চারপাশ থেকে কী একটা যেন ঘনিযে উঠছে। কিন্তু আমিও তখন শেয়ালের মতো সতর্ক হয়ে গেছি। বিহাসেলে খুব সাবধানে ব্যবহার করি, বাড়িতেও। আমাব অপর আমিটা যেন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কান খাড়া ক'বে আছে, একটু বাঁচবাব পথ পেলেই যেন সেদিকে দৌড় দেবে। কিন্তু ওরা ঠিক আচমকা ধ'বে ফেললে। রাণী ঘোষ চোখ রাঙিয়ে এসে জানতে চাইল যে খবরেব কাগজে ওব নাম অতো ছোট কেন। বলবাব ধবনে আমার অপমানবোধ হোল, তাই গলাটাকে খুব আস্তে ক'বে বললুম — বিজ্ঞাপন আমি পাঠাই না, মুকুলেশবা পাঠায়, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে দাখ। রাণী ঘোষ ব'লে গেল — তবু জবাবটা আপনাবই দেওয়া উচিত ছিল, কারণ ওরা তো সব আপনাবই ফলোযাব, যন্ত্রী তো আপনি। — তাবপব রিহাসেলের সমযে খুবই হেলাফেলা ক'রে সংলাপ বলছিল, আমি বলে ফেললুম — যদি তোমার রিহাসেল দেবার ইচ্ছে না থাকে দিয়ো না, কিন্তু দিতে উঠে এরকম করাটা যে এদলে চলে না সে কথা তোমাব জানা নেই? — বাস্। রাণী কেঁদে কেঁটে কী করলো সে তো সবাই জানো। আমি নাকি তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি। দলের প্রতি অনুরক্তি আমার চেয়ে তাব একতিলও কম নয়। এবৎ কমিটির লোকেরা এর প্রতিকার না করলে সে আর এ দলে থাকবে না ইত্যাদি। — পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরী হোল, সামান্য জুরেব মতো হয়েছিল। নীলিমা

আমাকে চা দিতে এলো বাইরে যাবার পোশাকে। বললে — তোমাব এমনি ডাল ভাত বেঁধে রেখেছি, কালকেব তরকারিটাও আছে। যদি আরও কিছু ইচ্ছে হয় বেঁধে নিও। আমি চললাম।

আমি হতবুদ্ধির মতো বললুম — কোথায়?

নীলিমা বললে — সে কথা তোমাকে বলবার কোনও প্রয়োজন দেখছি না, কাবণ সেটা তোমার কোনও আগ্রহের বস্তুই নয়। খালি এইটুকু জানালেই যথেষ্ট হবে যে আমি অসতী হয়েছি, আর সেই জন্যই চলে যাচ্ছি।

আমি উঠে গিয়ে ওর হাতটা ধরে বললুম — নীলিমা, কী বলছো তুমি?

ও বললে — হাত ছাড়ো।

আমি বললুম — না। তোমাকে আমি যেতে দেব না। তোমার মাথাব ঠিক নেই, তুমি সুস্থ হও, তারপরে যা ইচ্ছে হয় কোবো।

নীলিমা টান দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিলে, বললে — সুস্থ মানে? তোমাব মনোমত হওয়া? তুমি যেটাকে ভালো মনে করো সেইটেই সবচেয়ে ভালো, সকলের পক্ষেই ভালো, তাই না? আশ্চর্য আশ্চর্যের তোমার।

কঠিন বিদ্রূপেব হাসি হেসে উঠলো নীলিমা, বললে — তুমিই একমাত্র মানুষ, না? তোমার মতই একমাত্র মত, না? কিন্তু আব আমি তোমার বৌ না। আমি অসতী। অসতী হয়ে আমি তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এখন থেকে আমার নিজের ভালোমন্দ আমি নিজে বুঝবো।

আমি জিজ্ঞাসা করবো না মনে করেও না-জিজ্ঞাসা করে পারলুম না, — কে, কে সে?

নীলিমা বললে — অরুণাণ্ড। (চোঁচিয়ে বললে) — হ্যাঁ। অ-রু-ণা-ং-ণ্ড।

এমনই একটা সন্দেহ একদিন আমাব মনে হয়েছিল। ছেলে মারা যাবাব পব থেকেই অকণাংণ্ড একটু বেশী আসতো আমাদের বাড়িটায়। আমার অবর্তমানেই আসতো। একদিন বিকেলে আমি এসে পড়াতে কী রকম যেন সম্ভ্রান্ত হয়েছিল, তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে চলে গেল, আমাকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল যে আমিও রিহার্সেলে যাবো কিনা। কিন্তু নীলিমাকে আমি খুব লক্ষ্য করেও তো তাব মুখে কোনও আনন্দের আভাস, বা গোপনীয়তার চেষ্টা, কিছুই তো দেখতে পাইনি। তাই আর সে সন্দেহকে প্রশ্রয় দিইনি। আজ সেইটাই হঠাৎ বাজের মতো আচমকা আমারই মাথায় পড়লো। — হয়তো খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলুম, হঠাৎ দেখি, নীলিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ছুটে গিয়ে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললুম — আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি ভুল করছো। অরুণাংণ্ডর এবকম করা স্বভাব। সে কখনো —

নীলিমা বাধা দিয়ে বলে উঠলো — অরুণাংণ্ডর সম্বন্ধে তুমি কোনও কথা না বললেই তোমার মর্যাদা থাকতো —

আমিও তেমনি করে বললুম — বলবো না। আমি কারোর সম্পর্কে কোনও কথা বলবো না। কিন্তু তুমি এই পাগলামি কোরো না, এটা পাগলামি —

নীলিমা প্রায় চীৎকার করে বললে — আমি অসতী, — অসতী। আমার সঙ্গে তুমি বাস করবে কী করে —

আমি বললুম — না। একদিনের একটা ঘটনায় কেউ খারাপ হয়ে যায় না। তুমি থাকো, তোমাকে আমি যেতে দেব না —

বলতে বলতে আমি তাকে টেনে বিছানার কাছে নিয়ে এলুম। বললুম — একদিন তো তোমাতে আমাতে যে সম্পর্ক ছিল সেটা পবিত্র ছিল, সেটা পুণ্যের ছিল —

নীলিমা যেন কী এক অন্ধ আফ্রোশে হিংস্র হয়ে উঠে আমার বুকের কাছে গেলিটা টেনে ধরে বললে — বুঝতে পারো না কেন? আমি সেটাকে নোংরা করেছি। তোমার এই বিছানায় আমি অন্য লোকের সঙ্গে শুয়েছি। শুয়ে তোমাকে ঠাট্টা করেছি। নোংরা করেছি, বুঝতে পারছো, সমস্ত বাড়িটাকে নোংরা করেছি। থাকবে? থাকবে এখনো আমাকে নিয়ে? পারবে? —

আমি দুহাত দিয়ে মাথাটাকে ঢেকে বসে রইলুম, যেন আমার মাথায় কেউ মেরেছে। কখন যে নীলিমা চলে গেল জানতেও পারিনি।এক গ্লাস জল আনতে বলতো মুকুলেশ।

আমি যে টেঁচিয়ে জল আনতে বলবো সে ক্ষমতা ছিল না। ভয় হচ্ছিল যে একটু জোরে কথা বলতে গেলেই হয়তো গলা ভেঙে যাবে। তাই উঠে গিয়ে ছোট রান্নাঘরটা থেকে জল চেয়ে নিজের হাতে নিয়ে এলুম। পুবানো পাথরের টেবিলের ওপর চায়ের দাগ লেগে আছে, মাছি উড়ছে, তার পাশে গ্লাসটা রাখলুম। সত্যপ্রিয়দা সমস্ত জলটাই ঢুক ঢুক করে খেয়ে ফেললেন।

তাবপব আবার বললেন, — কমিটিব মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। কিন্তু মেজবিটি বললে যে আমি দলটাকে নিজের জমিদারীর মতো ব্যবহার করি। আমাব উচিত বাণী ঘোষের কাছে সকলের সামনে ক্ষমা চাওয়া। আমি বললুম, যে আর আমি কোনও ব্যাপারে কোনরকম জোর খাটাতে যাবো না, কোনো পদেও আমি থাকতে চাই না, আস্তে আস্তে সেগুলোও অন্যোবা নিয়ে নিক, কিন্তু ক্ষমা চাইতে হলে আব আমি এখানে থাকতে পারবো না, কারণ আমি যে নিজের দোষ বুঝতে পারছি না, দোষ বুঝলে — তোমরা জানো — আমি কখনো ক্ষমা চাইতে পবাত্ম্য হই না। আমাকে এমনি সাধারণ সভা হিসেবে থাকতে দাও। আমি এখনো কাজ করতে পাবি, আমাকে কাজ করতে দাও —। অনেকের হয়তো বা মন ভিজ্জিছিল কিন্তু খগেন বললে — আমার মনে হয় সত্যপ্রিয়দা, আপনার এখন দল ছেড়ে দেওয়াই উচিত। আপনার আইডিয়াগুলো পুরানো হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনার প্রোডাকশন্ আব পপুলাব হচ্ছে না। আমার মনে হয় আধুনিক নাট্য আন্দোলনে আপনার আব কিছু কবাব নেই।

হঠাৎ আমাব মনে হোল যে খগেনরা ঠিক বলেছে। আমি কোনও কিছুই তো ঠিক করে কবতে পারলুম না। মানুষের ঘরের জীবন আর বাইরের জীবন — এই দুটো স্তর তো কতো চেষ্টা করেও আমাদের অভিনয়ে একসঙ্গে আনতে পারলুম না। অথচ কী একটা মূল কারণে আমাব দুটো জীবন একসঙ্গে ভেঙে গেল। — যদি সেটা এতদিনেও বুঝতে পারতুম তাহলে আবার হয়তো নাটক করতে আসতুম।

খুব জোরে নিশ্বাস টেনে সত্যপ্রিয়দা বললেন — “চলো, বেরিয়ে পড়া যাক, ভিতরটায় যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।”

দুজনে বেরিয়ে এলুম ফুটপাতে। হঠাৎ যেন সমস্ত শহরের গোলমালটা ভেঙে পড়লো আমাদের ওপর। বাইরের আলো যেন চোখ বঁধতে লাগলো।

সত্যপ্রিয়দা আমার বাম্হটা ধরে রাস্তার ভীড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন — “এই হোল জীবন, এ কিছুই পবিত্র থাকতে দেয় না। ভালোর মধ্যে মন্দ, আর মন্দের মধ্যে ভালো, সব জড়াজড়ি করে আছে। এখানে লখীন্দ্র যেমন আদরের, সাপও তেমনি আদরের। এখানে বেহলাকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে হয় স্বর্গের সভায় নাচ দেখিয়ে। উদ্দেশ্যের জোরে নয়, যুক্তির জোরে নয়, — লাস্যের অভিনয় করে। খগেনরাই ঠিক, আমি ভুল।”

হাঁটতে থাকেন সত্যপ্রিয়দা। আমিও সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি একটি পরে জিজ্ঞাসা করি, — “আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে যাবো?”

উনি যেন আপনমনে হাঁটছিলেন, এই কথায় হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন — “না। সেখানে, — সেখানে নীলিমা আছে। কোনও চেনা লোক দেখলে তার ভালো লাগবে না।” ব’লে উঠলুম — “বৌদি কি আপনার কাছে?”

সত্যপ্রিয়দা ফুটপাথের কিনারে গিয়ে দাঁড়ান রাস্তার দিকে মুখ করে। তারপব বললেন — “হ্যাঁ। অস্তঃসত্ত্বা হবার কিছুদিন পরেই ও আমার কাছে পালিয়ে আসে। বলে, এবাবে যেন আমি ওর সন্তানটাকে বাঁচাই।”

খুব চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু বাঁচলো না। সেই প্রসব হওয়ার সময়েই নীলিমার পক্ষাঘাত হয়। এখন আমরা ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। — তোমরা যারা অল্পবয়সী, যাদের এখনো আশা আছে, তারা বুঝতে পাববে না যে সমস্ত আশা-ভরসা খুইয়ে যখন দুটো মানুষ পবম্পরকে জড়িয়ে ধ’বে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে মৃত্যুব অপেক্ষায়, তখন তাদের ভালোবাসা সে কী বকম ভালোবাসা। — আচ্ছা, আমি চললুম।”

একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লেন তিনি।

ফুটপাথের ওপর থেকে একটা কলেজের ছেলে ব’লে উঠলো — “মাইবি কি অস্বাভাবিক লম্বুবে।”

আমার হঠাৎ জবাব দেবাব ইচ্ছে হোল যে, হ্যাঁ, আমাদের এই বেঁটেদেব জাতে ওদেব বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়, ওবাই অস্বাভাবিক। কিন্তু কিছু বলতে পাবলুম না, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে হাঁটতে লাগলুম।

অনুপমা

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তখনও জানতাম না ব্যাপারটা। তাই নাম জিজ্ঞাসা করতে মেয়েটি যখন হাসতে শুরু করল তখন বললাম, তোমার নামটা বোধহয় খুব মজার তাই হাসছ।

আমার কথা শুনে মেয়েটি আরও জোরে হাসতে হাসতে বললে, না না, এমনি সাদামাটা নাম। অনুপমা। সবাই ‘অনু’ বলে ডাকে। আপনিও তাই ডাকবেন। বলে আবার হাসতে লাগল অনুপমা।

বুঝলাম হাসিটা ওর কথাব বাহন। গানের সঙ্গে যেমন তানপুবা ওব তেমনি কথার সঙ্গে হাসির ফোয়ারা। তার ওপব অনুপমা সুকপা। ভাবি সুন্দর মুখশ্রী। সঙ্গে এমন সবল হাসি। তাই ওর কথা শুনতে ভালই লাগে।

প্রথম যেদিন আমার কাছে এল সেদিন শুধু দু’চাবটে কথা বলেই চলে গেল। বললে, আবার একদিন আসব।

এরপব অনুপমা একদিন এসে বললে, দাদা, আপনার একটা ছবি দেবেন?

হ্যাঁ, দেব।

ছবি দিলাম। ছবিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া কবে বললে, এব তলায আমার ভাইয়ের নাম লিখে দিন। ছবিটা যেন আপনি আমার ভাইকে দিচ্ছেন। আমার ভাইয়ের নাম বিজয়।

ছবির তলায় লিখলাম, স্নেহেব বিজয়কে —

খুব খুশি হল অনু। বললে, এটা পেয়ে আমার ভাই খুব খুশি হবে। বড চঞ্চল ছেলেটা, তবে আপনার গান শুনলে একটু স্থির হয়ে বসে।

এতগুলো কথার মধ্যে কত যে হাসল অনু তাব হিসেব নেই। হাসলে ওর সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো যেন টুথপেস্টেব বিজ্ঞাপনেব কোন মেয়ের মত দেখায়।

এইভাবেই ও মাঝে মাঝে আসে আমার কাছে। এখন ওর কাছ থেকে জেনেছি ওর ভাই বিজয় কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আছে। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করাব পর আর পড়ে নি। এখন দিনরাত কেবল পার্টি নিয়ে আছে। তাই অনুব খুব ক্ষোভ। বলে, এই দেখুন না আমার কথা। আমি একটা প্রাইমারি স্কুলের টিচার। বাড়িতে অসুস্থ বাবা। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। দুটো বোনও আছে। তারা এখনও স্টুডেন্ট। আর এই বিজয় আমাদের একমাত্র ভাই। ও কোথায় চাকরির চেষ্টা করবে তা নয়, দিনরাত টো টো করে ঘুরছে। আমার একার রোজগারে এতগুলো লোকের খাওয়া-পরা। তাই আমাকে দু’চারটে প্রাইভেট টিউশনিও করতে হয়।

এতগুলো দুঃখের কথা বলল কিন্তু সব হাসতে হাসতে। নতুন কেউ শুনলে মনে করবে বানিয়ে বানিয়ে কথাগুলো বলছে। নইলে এসব কথা কি কেউ হাসতে হাসতে বলতে পারে।

প্রায়ই অনু আসে আর দু’চারটে কথা বলে চলে যায়। বেশিক্ষণ বসতে পারে না। বলে, অনেক কাজ দাদা। তবু আপনার কাছে এলে মনটা ভাল হয়ে যায়। বুঝতেই পারছেন আমার

কত দায়িত্ব — বলে এমন হাসবে যেন মনে হবে ঠাট্টা করে কথাগুলো বলছে। কিন্তু আমি তো জানি এগুলো ঠাট্টা নয়। সব সত্যি। আসলে হাসিটা ওর মুদ্রাদোষ। মুদ্রাশূণ্য বললেই ভাল হয়।

এরপর বেশ কয়েকদিন অনুর দেখা নেই। তারপর একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এল। হাসতে হাসতে বললে, আপনাব কাছে আসব আসব করেও আসতে পারিনি। কী কবে পারব বলুন? এখন তো রান্নাটাও আমার ঘাড়ে পড়ল।

বললাম, কেন, তোমাব মা তো রান্না করেন। তিনি বুঝি অসুস্থ?

অনু বললে, অসুস্থ তো হয়েছিল মা। কিন্তু সুস্থ আর করতে পাবলাম কই? চলে গেল। বলে হেসে উঠল অনুপমা।

মার মৃত্যুর কথা বলেও হাসি। এ হাসিতে মন সায় দিল না আমার। চূপ কবে গেলাম। অনু জিজ্ঞাসা সবল, আপনার কি শরীর খারাপ দাদা? এত চূপচাপ হয়ে গেলেন যে?

বললাম, তোমার মার মৃত্যুব খবর শুনে আমি তো তোমার মত হাসতে পারি না। তুমি যে কি কবে হাস তা বুঝি না।

অনুপমা গলায় জোব এনে বললে, কেন হাসব না? ভগবানের কী কাণ্ড দেখুন। মা ছিল নিপাট ভালমানুষ। সংসারটাকে মাথায় করে বেখেছিল। তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে আমাকে জন্ম কবতে চায় ভগবান। আমাকে কাঁদাতে চায়। কিন্তু আমিও তেমনি মেয়ে। কাঁদতে আমার বয়ে গেছে। বলে হাসতে লাগল অনু।

এমন মেয়ে এর আগে আমি দেখিনি। হাসতে দেখেছি অনেক মেয়েকে। প্রাণ খুলে হেসেছে তাবা হাসিব কথায। কোন সুখবব পেয়ে আনন্দে হেসেছে। কিন্তু কান্নাব কথায হাসতে দেখিনি আর কাউকে। তবে জগতে কত বিচিত্র মানুষ আছে। সকলকে কি আমবা জানি, না জানতে পারি।

অনুব অনেক সমস্যা। তারমধ্যে ওব এখন চিন্তা ভাই বিজয়কে নিয়ে। সেদিন এসে অনু বললে, জানেন দাদা, গতকাল আমার ভাইকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। তাবপবই হাসতে হাসতে বললে, এখন হাজতে থাকুক। ভালই হল।

বললাম, ভাল কেন?

অনু বললে, বাইবে থাকলেই তো একটা না একটা গুণগোল বাধাবে। হাজতে আটকা থাকলে তবু কিছুটা জন্ম হবে। বলে খুব হাসতে লাগল অনু।

একদিন অনু একটা মেয়েকে নিয়ে এল আমার কাছে। বললে, দাদা, এ আমার বন্ধু শিখা। এখন বেশ গাইছে। আপনি ওর গান শুনে দেখুন না একবার? শুধু ও কেমন গাইছে এটা ওকে বলে দিলেই হবে।

বললাম, ঠিক আছে শুনব। তবে আজ তো পারব না। আমাকে এখনি বেরতে হবে। পরশু একে নিয়ে এস।

অনু বললে, পরশু তো আমি আসতে পারবনা। ওদিন আমার দু'জায়গায় পড়াতে যেতে হবে।

বললাম, শিখা একাই আসুক। গান শুনে নেব।

নির্দিষ্ট দিনে শিখা একাই এল। ওর গান শুনলাম। মোটামুটি ভালই গায়। সেই কথাই বললাম শিখাকে। শিখা শুনে খুশি হল। বললে, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি।

বললাম, আশীর্বাদ করছি। তবে গানের লাইনে এখন ভীষণ প্রতিযোগিতা। এত ভিড় কাটিয়ে প্রথম সারিতে আসা খুবই মুশকিল।

আমার কথাই শিখা খুব দমে গেল। কান্নাভাঙা গলায় বললে, তাহলে কী দাদা আমি দাঁড়াতে পারব না?

ওকে উৎসাহ দিতে বললাম, পারবে না কেন? নিষ্ঠা আব চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাবে।

এবার খুশি হল শিখা। বললে, চেষ্টা আমি করছি। আর নিষ্ঠা আমার আছে।

বললাম, তাহলে আর ভাবনা কী। তোমাব হবে।

এরপরই আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, অনু তোমাব কতদিনের বন্ধু?

শিখা বললে, আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকি। আমাদের বন্ধুত্ব সেই ছেলেবেলা থেকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?

কী কথা দাদা? বললে শিখা।

বললাম, অনু কি ছেলেবেলা থেকেই এইরকম? মানে এই কথায় কথায় হাসি। দুঃখের কথাও দিবা হাসতে হাসতে বলে?

শিখা বললে, অনুকে যে কত বকমের ঝামেলা পোহাতে হয় তা যদি জানতেন। বাবা অসুস্থ। মা মারা যাবার পর সংসারের সব কাজ ওকে কবতে হচ্ছে। ওব দুটো বোন আছে। তারা কলেজে পড়ছে। তারা অনুর মত নয়। এবমধ্যেই বয়স্কেন্ড জুটিয়েছে। এসব ব্যাপাবও নজরে রাখতে হয় অনুকে। তার ওপর নিত্য অশান্তি ভাই বিজয়কে নিয়ে। অনু কিন্তু এসব ঝামেলা হাসিমুখে সহ্য করে যাচ্ছে। সবদিক একা সামলাচ্ছে।

বললাম, অসাধারণ ক্ষমতা তো অনুর। তাও আবার হাসতে হাসতে লডছে।

শিখা বললে, হ্যাঁ, এই হাসিটাই ওব শক্তি। অনু বলে, দুঃখকে ভয় পাই না আমি। দুঃখের পরে দুঃখ এলে সহ্য করা সোজা। তাই দুঃখের কথা হাসতে হাসতে বলি। কিন্তু আমার ভয় সুখকে। সুখের পরে দুঃখ এলে তা বোধ হয় এমন হাসতে হাসতে সইতে পাবব না। তাই সুখকে আমি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি।

খুব দামি কথা বলেছে তো অনু। বললাম শিখাকে।

উত্তরে শিখা বললে, আপনাকে তাহলে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। অনুকে তো এতদিন দেখছেন। সত্যিই সুন্দরী। একজন বডলোকেব ছেলে ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু ও বাজি হয় নি। বাজি না হওয়াব কাবণ জিজ্ঞাসা কবাতে বললে, আমি গরিবের মেয়ে। ওদেব অবস্থার সঙ্গে আমাদের অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাত। রূপের মোহের আয়ু বড অল্প। দু-দিন ঘর করতে করতেই অরুচি। তখন আমাকে ছেড়ে দিলে কী অবস্থা হবে আমার। পাহাড থেকে গড়িয়ে একেবারে তলায়। খবরের কাগজ খুললে এবকম ঘটনা তো প্রায়ই দেখা যায়। না ভাই, দুদিনের সুখের আমার দরকাব নেই। আমার দুঃখই ভাল। তবু তো হাসতে পারছি।

এরমধ্যে অনু একদিন এল। শিখার গান আমার ভাল লেগেছে জেনে খুব খুশি হল। বললে, শিখার চেষ্টা আছে। তবে দোষ কী জানেন, কোথাও একটু ধাক্কা খেলে বড্ড মুখড়ে পড়ে। তখন ওর কান্না কান্না মুখ দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু ওকে সাহুনা দেব কি, আমার হাসিটাই সব মাটি করে দেয়। কী মুশকিল বলুন তো।

অনুর এইসব কথা শুনতে বেশ লাগে। দুঃখ তো সংসারে সবারই আছে। কিন্তু হাসি দিয়ে কীভাবে দুঃখকে ঢেকে রাখতে হয় তা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলেছে মেয়েটা।

এরপর বেশ কিছুদিন অনু এল না আমার কাছে। এতদিন তো দেরি করে না। যতই কাজ থাক তবু পাঁচ মিনিটের জন্যেও একবার দেখা করে যায়। হাসতে হাসতে দুঃচারটে দুঃখের খবরও দিয়ে যায়।

সেদিন নিউমার্কেটে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে অনুপমা। চমকে উঠলাম ওকে দেখে। সীথিতে সিঁদুর। হাতে শাঁখা। পাশে যমদূতের মত লম্বাচওড়া একজন লোক। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। ব্যেস প্রায় ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ। তেইশ বছরের অনুপমাব পাশে একেবারে বেমানান। আমাকে দেখে এগিয়ে এল অনু। পাশের লোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বললে, ইনি আমার স্বামী। তারপর হাসতে হাসতে বললে, এইসব ব্যাপারে খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে আপনাব কাছে যেতে পারিনি। দু'একদিনেব মধ্যে যাব।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা ফুটফুটে চেহারাব মেয়ের এই স্বামী! তাছাড়া হঠাৎ বিয়েটা হলই বা কী করে। ও তো একবারও নিজের বিয়েব কথা আমাকে বলেনি।

অনুপমা পরের দিনই এল আমার কাছে। স্বামীকে নিয়ে নয়। একলাই এল। এসেই কুলকুল করে হাসি। বললে, খুব অবাক হয়ে গেছেন তো।

বললাম, অবাক হওয়ারই কথা। বলা নেই কওয়া নেই একেবারে বিয়ে। তাও আবার. . .।

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই ও বললে, বুঝেছি আপনি কি বলতে চান। ওব চেহারাটাই ওরকম। গায়েও ভীষণ জোব। আমার মত চাবটে মেয়েকে একসঙ্গে তুলে ধবতে পাবে। এত ক্ষমতা ওর। কিন্তু দাদা, মানুষটা ভাল। একটু থেমে বললে, তাছাড়া ওকে বিয়ে না করে আমার উপায় ছিল না। আমার ভাইকে বাঁচাতেই ওকে বিয়ে কবতে হল। বলে একগাল হাসি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাই কী করেছিল?

অনু বললে, এমনিতে তো এদলে ওদলে ঝগড়া মাঝামাঝি লেগেই আছে। কিন্তু এবারে একেবারে খুনোখুনি ব্যাপাব। আমাব স্বামী না থাকলে সেদিন বিজয় নির্যাত খুন হত। উনি তো এককালে এসব করেছেন। তাই সেই ছেলেটাব হাত থেকে বাঁচাতে পাবলেন বিজয়কে। আব তারই জোরে বিজয় খুন কবল সেই ছেলেটাকে। সব ঘটনা ঘটল আমাব স্বামীব চোখেব সামনে। তার মানে পূবো ব্যাপাবটার সাক্ষী থেকে গেলেন আমাব স্বামী।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপব?

অনু বললে, তারপব আর কী। ইনি এলেন আমার কাছে। সোজা প্রস্তাব। বললেন, তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হও তাহলে বিজয়ের কোনও ভয় থাকবে না। তুমি আমাব স্ত্রী হওয়ার পর শালাবাবুকে তো আর ধরিয়ে দিতে পারব না। উন্টে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতে হবে বিজয়কে। বাস, রাজী হয়ে গেলাম। বলে প্রায় দু'মিনিট ধবে হাসল অনু। তারপব হাসতে হাসতে বললে, আপনি ওকে ভুল বুঝবেন না দাদা। ভাবছেন আমাকে ব্র্যাকমেল করে বিয়ে করল। ঠিক তা নয়।

তবে কী? জিজ্ঞাসা করলাম।

অনু বললে, ওব কথায় আমি নিজেই রাজী হয়ে গেলাম।

বললাম, কেন?

কেন আবার। ইদানীং আমাকে বিয়ে করার জন্যে বেশ কয়েকজন খুব বিরক্ত করছিল। ঐকে বিয়ে করে আমি রেহাই পেলাম। এখন আর আমার কাছ ঘেসতে কেউ সাহস কববে না। মানুষটি আগে যা ছিল ছিল। এখন ওসব ছেড়ে দিয়েছে। শুধু আত্মরক্ষার জন্যে শক্তিতে বজায় রেখেছে। আমাকেও সেইভাবে তৈরি করতে চায়। আমার গা-হাত-পা টিপে বকুল বড্ড নরম। তোমাকে ব্যায়াম শেখাব। এই বলে আমার শরীরটাকে নিয়ে লোকালুফি করতে থাকে।

বললাম, তোমার ভয় করে না? ওর হাত ফস্কে পড়ে গেলে।

অনু হাসতে হাসতে বললে, পড়ে গেলে ওর যাবে। আমার কী!

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার স্বামী করে কী?

অনু বললে, ব্যবসা। এখন খুব সম্ভাবে টাকা উপায় হবে। খুব ভাল লোক দাদা। আমার কথা শোনে। হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে চলে গেল অনু।

শিখা একদিন এল। জিজ্ঞাসা করলাম, অনু কেমন আছে?

বললে, অনু বেশ ভালই আছে। ওর বাবা মাঝে গেছেন। বোন দুটোরও বিষে দিয়ে দিয়েছে অনু। আর ভাইটা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথায চলে গেছে। অবশ্য যাবার আগে অনুকে জানিয়ে গেছে।

শুনে খুব ভাল লাগল। যাক মেয়েটার ওপব থেকে অনেকগুলো দায়িত্ব চলে গেল। এখন ওরা স্বামী স্ত্রী বেশ ভালই আছে তাহলে।

এখন অনু খুব বেশি আসতে পারে না। এলেও বেশিক্ষণ থাকে না। বলে, অনেক কাজ দাদা। আমাব স্বামী তো তাব ব্যবসা নিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ব্যবসার কাজে দু'চারদিনের জন্যে কলকাতার বাইরেও যেতে হয়। তাই বাড়ি ছেড়ে আসতে পারি না। আমাকেই তো সব কিছু দেখতে হয়।

জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব স্কুলের চাকবিটা কবছ তে?

অনু বললে, না দাদা, ও কাজটা ছেড়ে দিয়েছি। উনিই বললেন, এখন আর তোমার চাকরিব দরকাব কী। তার থেকে আমাব ব্যবসার ব্যাপারে চিঠি লেখা হিসেব পস্তব রাখা এইসব কাজগুলো কব। তাই ছেড়ে দিলাম স্কুলের চাকবিটা। বলে আবাব সেই হাসি।

বললাম, হ্যাঁ, দরকাব যখন নেই তখন চাকবি কববে কেন। তার থেকে নিজেদের ব্যবসাব কাজ দেখা অনেক ভাল।

এবপর অনেকদিন আব অনুব দেখা পাইনি। অবশ্য আজকাল এইবকম হচ্ছে। হয় তো আজ এল, তাবপব তিন চাব মাস আব দেখা নেই। তাবপব হঠাৎ একদিন এসে হাজির। কিন্তু এবাব প্রায় মাসছয়েক কি তাবও বেশি আসে নি আমাব কাছে। ওর কথা যখন প্রায় ভুলে যেতে বসেছি তখন একদিন এসে হাজিৰ।

কিন্তু অনুব এ-কপ আমি দেখার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সিঁথিতে সিঁদুর নেই। হাতের শাঁখা উধাও। সাদা সিম্কেব থান পবে এসেছে।

ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করাব আগেই বললে, কপালে সইল না দাদা। উনি চলে গেলেন।

কী হয়েছিল? জিজ্ঞাসা করলাম।

অনু বললে, হবে আব কী। খুন। উনি যাদেব হাত থেকে আমার ভাইকে বাঁচিয়েছিলেন তাদেবই কেউ বদলা নিল। বলে হাসল অনু।

ওর হাসিটা এবাব আমাব অন্যবকম লাগল। মনে হল যেন জোর করে হাসছে। আগের মত সরল হাসি নয়। মেকী।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কী করবে ঠিক করেছ ?

বললে, কী আর করব। স্বামীর বিরাট ব্যবসা। ব্যবসাই দেখব। টাকাব তো অভাব নেই। বাড়ি, গাড়ি সব হয়েছে। এখন আমার খুব সুখ। বলে হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল অনুপমা।

সজনের ডাঁটা

কুমারেশ ঘোষ

সহরেব বাইরে খানিকটা জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়ি তোলা গেলো। বন্ধুবা বাড়ি দেখে মনে মনে খুশি হ'লেন কিনা জানিনে, তবে মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবলেন।

দক্ষিণ খোলা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি। সামনে বারান্দা। বারান্দার থামে লতিয়ে উঠেছে মাধবীলতা। সামনে একটু খোলা জায়গা, ঘাস বিছানো। তার এক পাশে তরিতরকারিবা বাগান। আর একদিকে নানা ফুলের গাছ। একজন ভদ্রলোকের বাগান থেকে একটা সজনেরব ডালও এনে পুঁতে দিয়েছিলাম বেড়ার ধারে। সজনের ফুল আব ডাঁটা, দুই-ই ভোজন-বিলাসী বাঙালী বাড়িব পরম আদরের জিনিষ।

কথাটা গোপনেই বলি। বাড়ি তৈরী কবতে গিয়ে টাকার টান পড়েছিলো যখন, তখন হাত পাতেতে হয়েছিলো আমার এক ধনী অথচ উদার আত্মীয়ের কাছে। বিমুখ হ'তে হয়নি, সটান ধার দিয়েছিলেন বিনা আড়ম্ববেই। অর্থাৎ মুখের কথায টাকা পাওয়া গেছিলো হাতে. খং লিখে দিতে হয়নি। ঘটনাটি এ-যুগের একাটি বিস্ময়।

কিন্তু স্বাভাবিক যা, পাকে চক্রে তাই ঘটে গেলো। ভদ্রলোক হঠাৎ মাঝা গেলেন। কাজেই তাঁর ছেলেরব বলে যেতে পারলেন না এই ধাব-দেওয়া টাকার কথা। হয়তো, বেঁচে গেলাম আমি। এই নিয়ম ঃ একজন মবলে, আর একজন বাঁচে।

নাঃ বাঁচা গেল না। দিন-দুয়েক বাদে স্বর্গীয় আত্মীয়টির বড় ছেলে আমার দবজায় এসে উপস্থিত। হাতে একখানি নোটবুর্ক। বললো, বাবার নোটবুকে দেখচি তিনি আপনাকে দেড়হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। দেবেন টাকাটি ফেরত? এ সময়ে পেলো বড় উপকার হয়। বড় দরকার ছিলো।

প্রথমে হকচকিয়ে গেছিলাম। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, সে টাকা তো কবে শোধ করে দিয়েচি। লেখা নেই নোটবুকে?

— না।

— তবে বোধহয় তোমার বাবা নোটবুকে লিখতে ভুলে গেছেন।

এইবার আত্মীয়-পুত্র খতমত খেলো। হয়তো লজ্জাও পেলো সে। বললো, হয়তো তাই। বাবা অনেককেই এরকম মুখের কথায টাকা দিতেন। শুধু নোট বুকে টুকে রাখতেন। আর যাঁদের কাছ থেকে ফেরত পেয়েছেন লিখেও রেখেছেন এই বইয়ে। আপনার টাকা উল্লেখ নেই বলেই এসেছিলাম। যাক, মনে কিছু করবেন না।

হেসে বললাম, না, না, মনে করবো কেন? তিনি সে সময় টাকাটা দেওয়ায় বড় উপকার হয়েছিলো। এ বাড়িতে বাস করচি, বলতে গেলে তাঁরই অনুগ্রহে। সত্যিকথা বলতে কি, তিনিই আমাকে এখানে বসিয়েচেন।

— আচ্ছা আমি তা হলে।

— একটু চা হবে না? — ভদ্রতা করলাম।

— না। — ছেলেটি বোধহয় লজ্জা পেয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

যাক বাঁচা গেলো। আর টাকা চাইতে আসবে না কেউ।

সেইদিনই দুপুরবেলা —

খেতে বসেছি। গৃহিণী পাঁচ তবকাবি ভাত সাজিয়ে নিয়ে সামনে ধবলেন। বসলেন একপাশে হাতপাখা হাতে নিয়ে।

সজনে উঁটাৰ চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললাম, বাঃ বেশ তো কচি উঁটা।

গৃহিণী হেসে বললেন, এ তোমারই বাগানেৰ। ঐ যে সেবার একটা সজনে ডাল পুঁজেছিলে পুৰেব দিকে বেডাব ধাবে, সেই গাছের উঁটা।

— সেই গাছের?

চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে গেলো আমার। একটু যাকে জাযগা দিযেছিলাম, সে আজ প্রতিদানে দিলো তার যথাসাধ্য। আর আমি।

খাওয়া ছেড়ে একল্লাফে উঠে দাঁড়লাম।

গৃহিণী অবাক হলেন, কী হলো?

বললাম, একটা দরকাবি কাজ মনে প'ড়ে গেছে। এখনি বেরুতে হবে। তাড়াতাড়ি ব্যাঞ্চে গেলাম।

উঠালাম দেড় হাজার টাকা।

গেলাম ছুটে সেই আত্মীয়ের বাড়ি।

টাকাটা দিযেছিলাম মনে আছে, কিন্তু কি কৈফিয়ৎ দিযেছিলাম আজ আব মনে নেই।

নবীনা

রঞ্জন

ভদ্রলোক আবার বললেন, ওঁকে কি তবে কাল একবার নিয়ে আসব?

আমি বললুম, না না, তেমন তাড়া তো কিছু নেই, বিপোর্টগুলি আমি দেখলুম তো, সব কিছু একেবারে নর্মাল। কেন গোলমালই হওয়া উচিত নয়। ব'লে হাসলুম। আশা করি, আমার হাসিটা যত চেষ্টিত ছিল ঠিক ততটা অনাস্তবিক দেখায় নি। নতুন ডাক্তারের পসার বাড়তে হ'লে রোগীর প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন কববার উপায় নেই। তাই আবার বললুম, দিন পনেরো পরে একবার দেখা যাবে, এখন কিছু তাড়া নেই। আরও হেসে বললুম, ফজলুল হক কি বলেছিলেন মনে নেই? বিধি সময় বেঁধে দিয়েছেন। তাড়া ক'বে লাভ নেই। এই বসিকতাগুলি আমার ভাল লাগে না, কিন্তু রোগীরা পছন্দ কবে। পব্‌ক'চি বোল্‌না — সাফল্যের জন্যে এই মূল্য দিতেই হয়।

আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমার নিজের তাড়া ছিল। সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। রাত আটটায় তরুণের বিয়ে। তার আগে আমায় মেসে ফিরে পোশাক বদল ক'বে নিতে হবে। তারপর তরুণের বাড়ি, সেখান থেকে ববানুগমনে বালিগঞ্জ যাত্রা। দীর্ঘ পথ। সময় অল্প। আমার সতি তাড়া ছিল।

কাবও বিয়েতে আমি আজকাল সাধাবণত যাই নে। কিন্তু তরুণের কথা আলাদা। সে আমার পুরনো বন্ধু। পুরনো মানে মেডিক্যাল কলেজে আসবারও আগে। প্রথম চেনা সেই স্কটিশে আই এস-সি. পড়বার সময়। দু বছরের পরিচয়, কিন্তু দুজনের দুজনকে এমন ভাল লাগল যে পরে যখন তরুণ বিজ্ঞানের আওন ছেড়ে আর্টের ধোঁয়াব আলো খুঁজল, আব আমি ডাক্তারির মত ব্যবহারিক বিদ্যায় আত্মনিয়োগ কবলুম, বন্ধুত্ব তখনও অটুট বইল। আমি মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি মির্জাপুরে একটা মেসে উঠে এলুম, তরুণও তাই করল। যদিও তার কলেজ র'য়ে গেল স্কটিশ চার্চ। আবও পবে তরুণ কন্‌মার্স প'ড়ে আকাকউন্ট্যান্ট হ'ল। আমি তো ডাক্তার। তবু (নাকি সেই জনোই?) অস্তবঙ্গতা অক্ষুণ্ণ বইল। বস্তুত, তরুণের পরে আব আমার নতুন বন্ধুত্ব কাবও সঙ্গে হয় নি। অতএব, বিয়ে সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক না কেন, তরুণের বিয়েতে না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, না গেলে এমন কি যেতে দেরি হ'লে আমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা কবতুম না। তাই এত তাড়া।

তাড়া মানোই দেবি। তখন ট্রামের সামনে বাস এসে দাঁড়াবে। বাসের সামনে গরুর গাড়ি। ডাক্তারের সামনে পুরনো বোগী, নতুন ডাক্তার। এড়াবার উপায় নেই। কুশল জিজ্ঞাসা কবতে হয়। অন্যেব বেলায় যে প্রশ্নের উত্তরেরই প্রয়োজন হয় না, ডাক্তারের বেলায় তাব উত্তরের শেষ নেই।

যোগেশবাবু যে? ভাল তো?

তা ভালই ছিলুম। কিন্তু কাল হ'ল কি, কি জানেন, এই গলদা চিংড়ির লোড আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নে। কিন্তু কাল আমার বড় শ্যালা, ওই যে যিনি লয়েডস ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু, তা ইন্চার্জ বললেই হয়, ওপরে এক ছোকরা সাহেব এসেছে, সে কিছুই জানে না, আমার শ্যালার কথায় ওঠে বসে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, ওই শ্যালা পাতিপুকুরে গিয়েছিল মাছ ধরতে। হ্যাঁ মশাই, ওই এক বাতিক ওর। তা যা বলছিলুম, সারা দিন ব'সে ব'সে আমার নস্কব মশাই কিছু পান নি। হে-হে। শেষে বিরক্ত হয়ে ফেরবার সময় শ্যালা এক রাশ গলদা চিংড়ি কিনে আনলে। সত্যি এক রাশ। আমার গিল্লী আবার — জানেন তো? — ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসব আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়, ভান করতে হয় যে শুনতে ভাল লাগছে। সেদিনও তাই হ'ল। এমনি একজন ভূতপূর্ব (অতএব, আশা রাখি, ভবিষ্যৎ) রোগীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁর সমস্ত কাহিনী শুনতে হ'ল। ট্রামে উঠতেই সাতটা বেজে গেল।

ট্রামে উঠেও দেখি একেবারে অপর প্রান্তে আমার একজন রোগী দাঁড়িয়ে। রোগী মানে রোগীর স্বামী। দেখেই চিনতে পারলুম, তবু মুখ ফিরিয়ে নিলুম। মনে মনে বললুম, আমাব বোগীর সংখ্যা অল্প। তাই তো আমার সব রোগীর মুখ ও নাম মনে থাকে। আমি যদি কেন্দার দাস হতুম, বা বিধান রায়, — যা একদিন হবই — তা হ'লে কি আমাব মনে থাকত সব বোগীর কথা, তাদের নাম, ধাম, অসুখ — সব বৃত্তান্ত? অসম্ভব। তখন আমি আমার বোগীদের পথে চিনতে না পারলে তাঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না। আজও তাই হোক।

আমি (ডাক্তার হিসাবে) বিধান রায় হব — এই কথাটা মনে হ'লেই ভাল লাগে। কিন্তু তখন আমি আমাব বোগীদের চিনব না, তারা সবাই আর আমাব কাছে বিভিন্ন এক-একটি ব্যক্তি থাকবে না, অসংখ্য বোগীদের মধ্যে কে কোথায় হাবিয়ে যাবে, জীবন্ত মানুষগুলি সব 'কেস' হয়ে যাবে — এটা ভাবতে ভাল লাগল না। আমি সফল হতে চাই, কিন্তু হৃদয়হীনতায় সাফল্যের যে মূল্য দিতে হয় তা দিতে বাধে। পরে কি হবে জানি নে, এখন আমি চার বছর প্র্যাক্টিস করছি, কত বোগী দেখেছি বলতে পারব না, কিন্তু দেখা হ'লে আজও সবাইকে চিনতে পারি। শুধু চেনা নয়, কে কেন এসেছিল তাও সব কিছু আমার চোখের সামনে নিমেষে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে, গোপালবাবু তাঁর প্রথম পুত্রের জন্মের সময় পুত্রের জননীর চেয়েও বেশি কাতব হয়ে পড়েছিলেন। সুরেনবাবু তাঁর স্ত্রীর দুটো সীজাবিহীন হবার পরেও সাবধান হন নি। গোপালবাবু বা সুবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লেই সবটা মনে প'ড়ে যায় — যেন কাল বা পরশু তাঁদের আমি চিকিৎসা করেছিলুম। আমার এই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি একাধারে গর্বের বস্তু ও বিড়ম্বনার সূত্র। ট্রামের অন্য দিকে তাই নারায়ণবাবুকে দেখেও (স্ত্রীর নাম নাবায়ণী, মমতাজের প্রতিযোগিনী, ত্রয়োদশ কন্যার জন্মের আগে আমার কাছে এসেছিলেন) আমি না-চেনাব ভান ক'বে তাঁর দৃষ্টি এড়ালুম।

আমি ভাবছিলুম, তরুণের বাড়ি ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছতে পারব কি না! আশা ক্ষীণ। ট্রাম চলছিল আস্তে, ঘড়ি জোবে। গতিতে চিন্তা সাধারণত স্থগিত থাকে, গতির নেশাই মনকে অধিকার ক'রে থাকে। কিন্তু চলিষ্ণু যানে আরোহণ ক'রে স্থানু হয়ে থাকলে অলস চিন্তা প্রস্রয় পায়। তাই আমি ভাবছিলুম আমার আসন্ন বন্ধু হারানোর কথা। বন্ধুর বিয়ে মানেই তো বন্ধু-বিচ্ছেদ। তরুণ বিবাহিত হবে, আমি 'বিধবা' হব। তরুণ জীবনের সাথী পাবে, আমি আমার একমাত্র সাথী হারাব। ভাল লাগছিল না।

কিন্তু নিজের ক্ষতির কথা চিন্তা না করলে তরুণের কথা ভাবতে ভাল লাগছিল। ও বিয়ে করবারই মত ছেলে। ও আরও অনেক আগে বিয়ে করলেও অবাক হবার কারণ ছিল না। ও মাঝে-মাঝে ছোটগল্প লেখে। ওর জীবনের কল্পনাও ওই ছোটগল্পেরই মত। বিস্তার

নেই, অনাবশ্যক বিশ্লেষণ নেই, চরিত্রবাহুল্য নেই, সংসারের সামগ্রিকতা নিয়ে মিথ্যা মাথাব্যথা নেই — ছোট, সংক্ষিপ্ত, জমাট, জটিল, সুডৌল, সুগঠিত একটি কাহিনী। একটি, দুটি, বড় জোর তিনটি চরিত্র। নাটকের প্রথম অঙ্কের ভগিতা নেই, তৃতীয় অঙ্কের সংঘাত নেই : শুধু মাঝের ঘটনার মনোরম বিবরণ।

তরুণের স্বপ্ন ছিল জীবনকেও তার ছোটগল্পের মত নিখুঁত ও সংক্ষিপ্ত করা। তার আকাউন্টেন্টের বাল্যাল শীটের মত ডেবিট আর ক্রেডিটে মিলিয়ে দেওয়া সর্বশেষ পাইটি পর্যন্ত। সেই হিসাবে সুন্দরী স্ত্রী না থাকলে জমার ঘরে অর্ধেক শূন্য থাকত। তরুণ বেহিসেবী নয়, সে আকাউন্টেন্ট। সে যে এত শীঘ্র বিয়ে করবে তা আব বিচিত্র কি?

আমি আমার নিজেরই কাছে আমার দুঃখ গোপন ক'রে নিজেকে বললুম, তরুণ সুখী হোক, ব্যাচিলরত্বের উজ্জান-ভাঁটার নদীতে নৌকাবিহার এবার শেষ হ'ল, সে তীব্র খুঁজে পেয়েছে, এবার সে নীড় বাঁধুক। আমার শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ওদের উপব বর্ষিত হোক অজস্র ধাবায়। আমি দূর থেকে ওদের দাম্পত্যসুখ অবলোকন ক'রে ধনা হব। ঈর্ষা করব না, অভিশাপ দেব না; আর সুখের কথাই যদি বল, তরুণের চেয়ে কে বেশি তা অর্জন করেছে? আমার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও, তরুণের বিবাহপূর্ব জীবন শুধু তাব বিবাহিত জীবনের একনিষ্ঠ প্রস্তুতিই ছিল। বিবাহিত সুখে তাব সত্যি অধিকার ছিল।

যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই হ'ল। আমার মসে গিয়ে ববযাত্রীর যোগা বন্ধ পরিধান ক'বে কোনক্রমে কৌঁচা সামলাতে সামলাতে যখন তরুণের বাড়ি পৌঁছলুম, তখন সবাই চ'লে গেছে বিবাহবাসরে। বাড়ির সামনে একটাও হাঁসওয়ালা গাড়ি না দেখে তা বুঝতে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ল না। আমি ভাবলুম, ভালই হ'ল। সারাটা পথ এক-শহর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রেও এবা একা একা বিয়ে-বাড়িতে যাওয়া যাবে। বিয়েটা (এক স্বামী-স্ত্রীব কাছে ছাড়া) এমন কি একটা অসাধারণ ঘটনা যে আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে তা প্রচাব না কবলে হবে না?

বিয়ে-বাড়িতে গিয়েও আমি প্রায় সকলের শেষে পৌঁছলাম। তরুণকে তখন বিয়েব আসবে নেওয়া হয়ে গেছে। কর্ণবিদারী কোলাহলের মধ্যে ইতস্তত অতিথিবৃন্দ আহারে বাস্ত, যেমন হয়ে থাকে প্রত্যেক বাঙালীর বিয়েতে। কোনক্রমে খাওয়া সেবে ট্রাম ধরা, বিয়েটা যেন একটা উপলক্ষ মাত্র। আমি পৌঁছতেই তাই কন্যাকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন এসে বললেন, পাতা পড়েছে, এখনি ব'সে গেলেনি ভাল। আমি এসব উপরোধ উপেক্ষা ক'রে বিয়েব জায়গায়, অর্থাৎ ছাতের উপরে, যেতে চেষ্টা করলুম। আমি খেতে আসি নি, আমি আমার একমাত্র বন্ধুর বিয়েতে এসেছি।

কিন্তু বরের এক মাইলের মধ্যে আমার মত কাবও যাবাব উপায় ছিল না। চতুর্দিকে মহিলাপরিবেষ্টিত হয়ে বেচারী তরুণ যথাসাধ্য আশানুরূপ পরিহাসে ব্যস্ত ছিল। সত্য বলতে কি, তরুণ পারে এগুলি; আমি পারি নে। মেয়েদের-ভাল-লাগে এই রকমের বসিকতা ওব সহজেই আসে, আমার আসে না। রোগী নয়, আত্মীয়া নয়, এই রকম কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'লেই আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ কবি। বলবাব মত কোন কথা খুঁজে পাই না, কলারের তলায় শুধু ঘামতে থাকি। তার উপর যদি একের বদলে একঝাঁক মেয়ে হয় তা হ'লে তো কথাই নেই। আমাকে বরং এক দল ম্যান-স্টার দিয়ে ঘিবে রাখ, কম গাল দেব।

আমি তাই ছাতের স্বল্পালোকিত একটা কোণে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেখান থেকে আমি সবকিছু দেখতে পাব কিন্তু আমাকে কেউ দেখবে না। এইটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। জীবনে কখনও ক্রিকেট খেলি নি, কিন্তু ক্রিকেট খেলা দেখতে আমার ভাল লাগে। জীবনেও আমার স্থান মাঠে নয়, গ্যালারিতে। মঞ্চ নয়, বীয়াব স্টলে।

কিন্তু নাটক ও খেলায় বিরাম আছে। তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্ব'লে ওঠে, অন্যান্য দর্শকের অলস চক্ষু শিকার-সন্ধানে ব্যাধের মত ইতস্তত চতুর্দিকে বিচরণ করতে থাকে। আমিও সেই দৃষ্টি থেকে নিষ্কৃতি পেলুম না। একজন অতিবাস্তু ভদ্রলোক দ্রুতপদে এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেতে আমায় দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। সর্বাস্থে স্বৈদ ও হনুদের অবস্থিতি থেকে বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে তিনি কন্যাপক্ষের কর্তাব্যক্তি। অতিথিদের, বিশেষ ক'রে বরযাত্রীদের, পরিপূর্ণ ভূষ্টিবিধানই তাঁর একমাত্র চিন্তা। আমাকে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি কাছে এগিয়ে এলেন। আসতে আসতে বললেন, আসুন, আসুন, আর সবাই ব'সে গেছে, এব পরে ট্রাম —

ভদ্রলোক কাছে এসে আর কথাটা যেন শেষ করতে পাবলেন না। আমিও ভদ্রলোককে দেখে একটু বিব্রত বোধ করলুম। বিব্রতির পরে তিনি বললেন, ও, আপনি? তা — তা — এখনও আপনার খাওয়া হয় নি বুঝি? তা — আসুন না আমার সঙ্গে, আর সবাইয়ের খাওয়া যে হয়ে গেছে প্রায়। আসুন।

স্পষ্টতই ভদ্রলোক আমাকে চিনেছেন। আমারও মনে হ'ল, একে কোথাও দেখেছি। কিন্তু অন্তত এই একবার আমার স্মৃতিশক্তির গর্ব খর্ব হ'ল। কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, ভদ্রলোক কে, বা কোথায় তাকে দেখেছি, বা কবে আর কেন। তবু বিস্মৃতি গোপন ক'রে চেনবার ভান ক'রে বললুম, আমি এখন খাব না। যদি কিছু মনে না করেন, তরুণের সঙ্গে একবারটি দেখা ক'রে পরে নীচে যাব।

অনিশ্চিতভাবে ভদ্রলোক বললেন, ওঁকে কি আবার এখন পাবেন? বেশ, পবেই না হয় খাবেন। আমাদের কিন্তু সব আয়োজন তৈরী। সময় হ'লেই সোজা দোতালার ঘবে চ'লে আসবেন।

ভদ্রলোক বিদায় নিলে আমি মনে মনে আমার বোগীর নাম-তালিকায় তাঁর সন্ধান কবলুম। বার বার মনে হ'ল যে, তিনি আমাব কাছে এসেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ কবতে পারলুম না কেন — সন্তান হয় না ব'লে, না, কি সন্তান আসন্ন ব'লে?

আমি ওঁর কথা ভাবতে ভাবতে ছাতের অপর প্রান্তে আবাব আমাব বন্ধু তরুণকে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, বছর না ঘুরতেই সে-ও হয়তো আমাব কাছে আসবে খবর দিতে — আর কতদিন বাকি, কোন ভয়ের কারণ আছে কি না, ইত্যাদি। কিন্তু অত দূরের কথা চিন্তা করবার সুযোগ ছিল না। আমার চোখেব সামনে হিন্দু বিয়েব আগেকার নানা অনুষ্ঠান চলছিল মহাসমাবোহে। একসঙ্গে অন্তত কুড়িজন মহিলা কুড়ি রকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ওগুলি থামলে চলছিল সমবেত উল্লসনি। এই প্রথাগুলি নিশ্চয়ই এক সময়ে সুন্দর ছিল, এখনও অনেকে এর মধ্যে হিন্দুধর্মের অঙ্গেয় ঐতিহ্য ও মাধুর্য আবিষ্কার ক'রে অভিভূত হন, কিন্তু আমি ডাক্তার মানুষ। অত ক'বিত্ব আমাব আসে না। আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও গ্রাম্য ব'লে মনে হয়। আমি — কিন্তু থাক্ আমার কথা। আমি তো আর বর নই। তরুণ তার বিবাহানুষ্ঠানের সব কিছু প্রাণ ভ'রে উপভোগ করছিল, সেইটেই বড় কথা।

ক্রমে বিয়ের লগ্ন এল। রাত তখন অনেক। বেশির ভাগ অতিথিই আহা়া়ান্তে বিদায় নিয়েছেন। বিবাহবাসরে বড় জোর জন কুড়ি লোক। আমি সকলের অগোচরে পিছনেব একটা জায়গায় ব'সে যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছিলাম। অশুদ্ধ, অশ্রাব্য, অবোধ্য সংস্কৃতে পুরোহিত যা খুশি মন্ত্ৰ উচ্চারণ করছিলেন, তরুণও (যে কিনা সংস্কৃত জানে) সেগুলি ঠোঁট নেড়ে পুনরুচ্চারণ করছিল। পরে শুভদৃষ্টির সময় এল। তরুণের মুখে আশা না আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছিল বলতে পারব না। আমি তরুণকে, দেখেছি, তরুণের স্ত্রীকে দেখতে আমিও তরুণের চাইতে কম কৌতূহলী ছিলাম না।

দুজনে এসে দুটো চিত্রিত পিড়ির উপর দাঁড়াল। যে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগে আমাকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলছিলেন, তিনিই দুজনের উপর একটা চাদর না কি বিছিয়ে দিলেন। তরুণের দিকে আমি এতক্ষণ তাকাই নি, কিন্তু চাদরের অন্তরালে সে অদৃশ্য হতেই আমি কনের কথা ভুলে গিয়ে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আবার যখন তরুণকে দেখা গেল তখন তার আনন আনন্দে উদ্ভাসিত। যেন তার সব কিছু প্রার্থনার উত্তর নিমেষে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন এক মুহূর্তের মধ্যে তার এতদিনের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। আশাপূরণ নয়, ওটা সামান্য ব্যাপার। তখন তরুণের মুখ দেখে মনে হ'ল, হঠাৎ তার জীবন যেন পূর্ণতা লাভ করল। আর কিছু চাইবার নেই। এবার এক দুই হ'ল। এর পব থেকে এদের দুজনের মিলিত জীবনে দুজনের সকল চেষ্টা নিয়োজিত হবে শুধু একটি সাধনায়। দুই তখন এক হবে। দুজনের মিলিত আত্মা প্রদীপশিখার মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওদের মিলিত নীড়টিকে মন্দির করে তুলবে। ধ্যানমগ্ন সাধকের পবিত্র আনন্দের আভাস সত্যি তখন প্রতিফলিত হয়েছিল তরুণের মুখে। সে মুহূর্তে আমি সত্যিই প্রায় ক্যাথলিকদের মত বিশ্বাস করতে পাবতুম যে মানুষের বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হয়, যে কোন অদৃশ্য দেবতা এসে একটি পুরুষকে মিলিয়ে দিয়ে যান একটি মেয়েকে সঙ্গে।

কিন্তু বিবাহ স্বর্গে অনুষ্ঠিত হ'লেও, বিবাহিত জীবনটা কাটাতে হয় এই পৃথিবীর কাবাগারে। তাই আমার ভয় হ'ল যে আমার বন্ধু বোধ হয় বিয়ের কাছ থেকে বড় বেশি প্রত্যাশা করেছে। শেষে নিরাশ হবে না তো? বিয়ের পরে তো দেবপুরোহিতগণ স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন বর দেবার জন্যে অবশিষ্ট রইবেন শুধু তরুণের স্ত্রী নবীনা দেবী। তিনি কি ভাবছিলেন সেই মুহূর্তে?

পঞ্চপ্রদীপ না কি যেন একটা আলো নিয়ে একটি মহিলা বধুর মুখে চার দিকে ঘোরাচ্ছিলেন। আবার চতুর্দিকে উলুধ্বনি উঠল। এত কোলাহলে আব এত বেশি আলোয় আমি আমার বন্ধুপত্নী নবীনা দেবীকে আর ভাল করে দেখতে পেলুম না। তা ছাড়া আমি বেশ অনেকটা দূরেও দাঁড়িয়ে ছিলাম। তবু বুঝতে কষ্ট হ'ল না যে, নবীনা সুন্দরী। শুধু কপ নয়; দৃষ্টি ও শ্রুতির শত বাধা সত্ত্বেও বুঝতে পারলুম যে, নবীনীর মুখে বুদ্ধির দীপ্তি ছিল না, সারা মুখে ও দেহে এমন একটা স্নিগ্ধ নির্মল লাভগোঁড়ের আবেশ ছিল যা বোধ হয় এই বাংলা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এবারে যেন বুঝতে পারলুম তরুণের মুখের অভিব্যক্তির পূর্ণ মর্মার্থ। বস্তুত, আমিও মনে মনে তরুণের যোগ্য স্ত্রীর যে রূপটি কল্পনা করেছিলাম, নবীনা ঠিক তাই, ঠিক তাই।

কিন্তু বিবাহ-বাসর এমন নির্বিঘ্নে রূপোপভোগের প্রশস্ত স্থান নয়। তাই সেই ভদ্রলোক আবার এসে উপস্থিত হলেন, যিনি কিছুতেই আমাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। বললেন, তরুণবাবুও আপনার খোঁজ করছিলেন। কিন্তু আজ কি তাঁর দেখা হবে? দেখছেন তো কি ভীড় ওখানে গুঁকে ঘিরে। তার চেয়ে চলুন খেয়ে নেবেন, ইতিমধ্যে বিয়ের ঝামেলাটা চুকে যাবে। পরে বরং গুঁর সঙ্গে দেখা করবেন। ভদ্রলোক আমি আর দূরের বরবধুর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাই কিছুই আর দেখবার উপায় ছিল না। ভদ্রলোক আবার বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

এখনও কিছুতেই ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলুম না। কিন্তু তিনি এমন বার বার খেতে যেতে অনুরোধ করতে লাগলেন যে, কি করে এড়াব তাও ভেবে পেলুম না। যেতেই হ'ল তাঁর সঙ্গে। যেতেই হ'ল অন্যান্য জন কুড়ি অতিথির সঙ্গে। ভদ্রলোক নিজে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সহকারীদের পরিবেশন তত্ত্বাবধান করছিলেন। অপর ভোক্তাদের এ কথা মনে হয়েছে কিনা জানি নে, আমার নিজের একটু অস্বস্তি লাগছিল যে আমার দিকে যেন বড় বেশি মনোযোগ দেওয়া হ'চ্ছিল।

বিয়ে-বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে, উপরের ছাদ থেকে অনবরত কেউ না কেউ কোন না কোন অজুহাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছিলেন। আমারও বার বার সেদিকে না তাকিয়ে উপায় ছিল না। হিন্দু বিবাহের নানা জটিল উপচারের বিশদ বিবরণ আমি জানি নে। অনুষ্ঠানের কোথাও কোন ছেদ পড়ে থাকবে। হয়তো বা অনুষ্ঠানেরই অন্য কোন অংশের জন্যে কন্যাকে বিবাহবাসর থেকে নীচে আনবার দরকার হয়েছিল। আগে কয়েকজন মহিলা, পিছনে আবণ্ড কয়েকজন, মাঝখানে বধূ। চিনতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। এবারে আমি অল্পবিস্তর স্বাভাবিক আলায়ে আমার বন্ধুপত্নী নবীনাকে দেখতে পেলুম। আতিথ্যপরায়ণ ভদ্রলোককেও এবারে চিনতে পারলুম।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ ক'রে আমি বিয়ে-বাড়ি থেকে বিদায় নিলুম। তরুণের সঙ্গে আর দেখা করলুম না। ভদ্রলোককে ব'লে এলুম তরুণকে বলতে যে, আমি এসেছিলুম, জরুরী একটা কাজের জন্যে ওর সঙ্গে আর দেখা ক'রে যেতে পারলুম না।

*

*

*

এতক্ষণে আমার স্মৃতিপটে এক বছর আগেকার একটা কাহিনী কুশীলবসমেত ভেসে উঠেছিল।

মনে আছে। স্লিপে লেখা ছিল — সত্যীশ সেন উইথ সন্ধ্যা সেন।

যথারীতি অভিবাদন ও আসন গ্রহণের পরে আমি বললুম, হ্যাঁ বলুন।

আমার ঘরে তখনও বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে কি যেন একটা কাজ করছিল। ভদ্রলোক ইঙ্গিতে জানানেন যে, একেবারে একা থাকলে ভাল হয়। এটা অস্বাভাবিক অনুবোধ নয়। আমি বেয়ারাকে যেতে বললুম।

ভদ্রলোক বললেন। বিব্রত, বিপন্ন, কিন্তু নিশ্চিত যে আমি তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব না।

আমি সন্ধ্যা সেনের দিকে তখনও একবারও তাকাই নি। মহিলা — মেয়েটি বললেই ঠিক হয়, একটা কালো চশমা প'রে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমি বিবক্তি এবং ক্রোধ দমন ক'রে ভদ্রলোককে আস্তে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়, ইংরেজীতে, বললুম, আপনি ভুল দোকানে এসেছেন। ব'লেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম।

সন্ধ্যা সেন এতক্ষণে কথা বললেন, দাদা, তুমি, বরং বাইরে গিয়ে বসো, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলব।

নিতান্ত সাধারণ এই কথাগুলি। কিন্তু এই কয়েকটা সামান্য কথায় নিমেষের মধ্যে আমার ঘরের কার্বলিক সাবানের গন্ধ যেন অন্য কোন সুরভিতে পরিণত হ'ল। সমস্ত আবহাওয়াটার এমন আকস্মিক আমূল পরিবর্তন হ'ল যে, আমার ডাক্তারী সত্তা কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, আমার সামনে আমার রোগী ব'সে নেই, যে হৃদযন্ত্র আমি স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করব। সন্ধ্যা দেবীর কাঠের চেয়ারটা সিংহাসন ব'লে মনে হ'ল — সেখান থেকে সম্রাজ্ঞী সবাইকে আদেশ দেবেন আর সবাই তা নিঃশব্দে মেনে নিয়ে ধন্য হবে। সন্ধ্যার কণ্ঠেই কি যেন একটা একেবারে বিভিন্ন রকমের স্বর ছিল যা অমান্য করা আমার মত লোকের পক্ষে অসাধ্য।

কিন্তু শুধু আমার মত লোকের নয়। সন্ধ্যা দেবী যাকে অভিভাবক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, তিনিও বিনা প্রতিবাদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঘরে রইলুম সন্ধ্যা আর আমি। সন্ধ্যা বললে, বসুন।

আমি বললুম। সন্ধ্যা তার চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলতে আমি তাড়াতাড়ি তার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একটা কাগজ পড়ার ভান করলুম।

সন্ধ্যা বললে, কি আপনার আপত্তি? — জিজ্ঞাসা নয়, জেরা।

আমি জানতুম, তর্কে প্রবৃত্ত হ'লে আমার পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী। বললুম, কি কি আপত্তি হতে পারে তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।

তা ছাড়া?

নীতিবিরুদ্ধ।

নীতি? কোন নীতি?

আমি প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছিলুম যে, তর্কের ফাঁদে পা দিয়ে ভুল কবছি, নিজের পরাজয় ডেকে আনছি। হয়তো শুধু তর্কে পরাজয় নয়, আবও ভয়ানক কোন পরিণাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার স্বীয় ইচ্ছা বলে কোন কিছু আব অবশিষ্ট ছিল না। বললুম, ক্ষমা করবেন, আমাকে এমন অন্যায় অনুরোধ আপনি করবেন না।

আপনি শুধু অনুরোধ করতে বারণ ক'রে ক্ষান্ত হন নি। অনুরোধটাকে অন্যায় বলেও অভিহিত করেছেন। আমার আপত্তি সেইখানে। তাব চেয়ে সরাসরি বলেন না কেন, আপনি ভয় পেয়েছেন, আপনার সাহস নেই একজন অসহায় মেয়েকে তার জীবনের চরম বিপদ থেকে বাঁচাতে?

সন্ধ্যা সত্যি বলেছে। কিন্তু হই দুর্বল, পুরুষ তো। এক অপরিচিতা মেয়ের হাতে এমন অপমান আমিও বিনা প্রতিবাদে গলাধঃকরণ করতে পাবলুম না। নির্বোধের মত বললুম, বিপদ আপনি আসে নি।

না, তা আসে নি। আপনারই মত কাপুরুষ আব একজনের হাত ভর ক'রে এসেছে।

সন্ধ্যা আমার কাছে ভিক্ষাপ্রার্থিনী, কিন্তু তার বাক্যে যেন এতটুকু আবেদনের সুর ছিল না। বরং তিরস্কারের ঝাঁজ ছিল প্রতিটি কথায়। আমি সমগ্র পুরুষজাতির প্রতিনিধি নই, কিন্তু সন্ধ্যাকে সে কথাটা বলবার সাহস আমার কিছুতেই হ'ল না। আমি শুধু আবার ক্ষীণস্বরে বললুম, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি নতুন ডাক্তার। দরিদ্র থাকব, কিন্তু অসদুপায়ে ধনী হব না, আমার পকেট শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হোক, কিন্তু বিবেক বিক্রয় ক'রে তার স্ফীতি ঘটাবার দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়।

ঠিক এই কথাগুলি সন্ধ্যাকে বলতে পেরেছিলুম কি না মনে নেই, কিন্তু সত্যি যে মনে মনে ঈশ্বরের কাছে অসহায় ভাবে আমার ভীত আত্মার জন্য প্রার্থনা করেছিলুম তা আজও মনে আছে। সন্ধ্যা তার পরে উঠে দাঁড়াল; আমি ভাবলুম, ঈশ্বর, তুমি আমাকে মহাপাতক থেকে ত্রাণ করেছে। আমি অর্থের লোভে আত্মবিক্রয় করি নি। মোটা টাকা রোজগার করবার সুযোগ গেল কিন্তু আমার বিবেক অক্ষত রইল। ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ।

কিন্তু সন্ধ্যা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে তার ব্যাগটা খুলে একটা একটা ক'রে আটটা টাকা গুনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বললে, এটা আপনার স্বীয় চেয়ে কম নয় আশা করি।

সন্ধ্যার কণ্ঠে আবার এই সামান্য কথাগুলি এমন শ্লেষপূর্ণ ও অবজ্ঞামিশ্রিত শোনাল যে, আবার নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত মনে হ'ল। সন্ধ্যার দাদার উপর রাগ করা সহজ ছিল, সন্ধ্যার উপর রাগ করা অসম্ভব। সে যদি অসহায় ভাবে কঁাদত, জানতুম কি ক'রে তাকে তার পূর্বতন দুষ্কৃতির (বা দুর্বলতার) কথা স্মরণ করিয়ে ফিরিয়ে দিতে হয়। সে যদি চটুলা সুলভা রমণী হ'ত, জানতুম কি ক'রে তাকে অপমান ক'রে বের করে দিতে হয়। কিন্তু আবেদন নিয়ে এসেও যে দাবি করে, যার কথায় কোথাও এতটুকু অনুতাপের কোমলতা নেই — তাকে নিয়ে কি করব? দোষ স্বীকার না ক'রে যে অপরকে দোষী বলে অভিযুক্ত

করে, তার কি বিধান করব? শুধু বললুম, থাক্, ফী দিতে হবে না। আমি তো আপনার কিছু করতে পারলুম না।

পারলেন না নয়; বলুন, করলেন না।

আবার অভিযোগ। আবার আমার পৌরুষের উপর কশাঘাত নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে আর একবার সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে দেখেছি; ওই দৃশ্য চোখ দুটোর দিকে বেশি তাকাবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বুঝেছি যে সন্ধ্যার ব্যক্তিত্বের সামনে আমার সকল প্রতিরোধ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, তাই কিছু না বলে চূপ করে রইলুম। সন্ধ্যা সামান্য বিরতির পরে বললে, অর্থাৎ একটি অজাত অবাঞ্ছিত প্রাণীর বিনাশের দায়িত্ব এড়িয়ে দুটি প্রাণীর হত্যার অপরাধ বরণ করে নিলেন।

আমার কিছু বলবার উপায় ছিল না।

একটু থেমে সন্ধ্যা বললে, সেইজন্যই আপনাকে দ্বিগুণ ফী দিয়েছি।

এবারে শুধু ব্যক্তি হিসাবে আমাকে অপমান করা নয়, শুধু মাত্র পুরুষ জাতিকে অপমান নয়, পুরো ডাক্তারী পেশাটার অপমান। আমার জিহ্বায় কি পক্ষাঘাত হয়েছিল বলতে পাব না, প্রতিবাদে কোনও একটি বর্ণ উচ্চারণ করা আমার সাধ্যের অতীত ছিল।

পববর্তী সমস্ত ঘটনার স্মৃতিই আমার অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে আছে সন্ধ্যাকে বলেছিলুম, আপনার সব কথা শুনব, শুধু তার আগে আপনার দাদাকে বিদায় করে দিতে হবে। গোড়াতে বিশ্বাস কবে নি, কিন্তু পরে রাজী হয়েছিল।

তারপর স্পষ্ট কিছু মনে নেই। মনে আছে, সন্ধ্যা আমাকে স্টেফান ৎসাইগের 'এমক্' গল্পটা প্রায় পুরো শুনিয়েছিল, ওটাকে সঙ্গেই এনেছিল। মনে আছে, আমি তার পরে সন্ধ্যাকে শুনিয়েছিলুম ফবাসী নাট্যকার ব্রিয়োর 'মাতৃহ' নাটকের গল্প। আমার সংকীর্ণ ভারতীয় বিবেক ততক্ষণে সার্বজনীন উদারতাব পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। আমি তখন শুধু হিপোক্রেটিসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ চিকিৎসক ছিলাম না। আমি তখন যুক্তিবাদী। পাপপুণ্যের অবাস্তব কুসংস্কার তখন আমার প্রভু ছিল না; আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুরুষজাতির ক্রটি-স্ফালন; নীতির ভয় ছিল না, আইনের ভয় ছিল না, একমাত্র প্রার্থনা ছিল সন্ধ্যার কোনও কাজে আসা, তার শাপমোচনে সহায়তা কবা।

করেছিলুম।

কিন্তু এর আগে যা কিছু লিখেছি তাব সবগুলি মিথ্যা কথা। ৎসাইগ বা ব্রিয়ো আমাকে অজ্ঞহত জুগিয়েছেন মাত্র, আমার একমাত্র সত্যকার উদ্দেশ্য ছিল সন্ধ্যাকে আমার কাছে ঋণী করা। জটিল কোনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় নি। সামান্য অপসারণের পরে সন্ধ্যা যখন একান্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আমাব বসবাব ঘবে ফিবে এল, আমি বললুম, আশা করি এবারে আর আমাকে কাপুরুষ মনে কববেন না।

সন্ধ্যা একটু হাসল। সে হাসির অর্থ যেন এই যে সন্ধ্যার আদেশ অমান্য করবার অক্ষমতা প্রদর্শন করে আমি আমাব কাপুরুষতাই বেশি করে সপ্রমাণ করেছি। কিন্তু তখন আমার এত সব বিশ্লেষণ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না। সন্ধ্যা যে হাসছিল সেইটাই আমার সকল পবিত্রত্বের পর্যাপ্ত পুরস্কার ছিল। সন্ধ্যা বললে, অনেক — অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমি যাব।

এতক্ষণে আমার ভয় ঘুচে গিয়েছিল। সন্ধ্যার সহাস্য আনন দেখে আমার নিজেবও আনন্দের অন্ত ছিল না। বললুম, আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে?

সহসা সন্ধ্যা গভীর হয়ে গেল, বললে, আর তো দেখা হবে না। বলেই সন্ধ্যা আবার তার ব্যাগ খুলে কতকগুলি — অনেকগুলি — নোট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

এবারে যেন দাম দেবার পালা। আমি যা করেছি সন্ধ্যার জন্যে, তার মূল্য যেন একশো টাকার নোটের সংখ্যা দিয়ে গোনা যায়! যেন অর্থ ছাড়া সংসারের মূল্য নিরূপণের আর দ্বিতীয় উপায় নেই। যেন সব ঋণের শোধবোধ হয়ে যায় রাজার মার্কাওয়ালা কতকগুলি কাগজের হাতবদল হ'লে। সন্ধ্যাকে বললুম সে কথা। বললুম, আমি তীক্ষ্ণ কাপুরুষ হতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই এমন জঘন্য ধারণা আপনি করে বসেন নি যে শুধুমাত্র টাকার জন্যেই আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করেছি। আমি —

তবে?

আমি তখন ডাক্তারও নই, মানুষও নই। সন্ধ্যার বিনীত দায় মাত্র। বললুম, থাক। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।

অর্থাৎ অনেক কিছু দিতে হবে। কিন্তু তা তো পারব না ডাক্তারবাবু। তাব বদলে বরং এগুলো রেখে দিন। আমাব পাওনাও একজন এই দিয়েই শুধেছিল, আমাব দেনাও তাই দিয়ে শুধলুম। আপনার কাছে সত্যিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রইলুম।

আমি তখন কৃতজ্ঞতা চাইছিলুম না। ওই একান্ত লৌকিক অনুভূতিটাতে আমার তখন কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। আমি আমার বিবেকবিরুদ্ধ কাজ কববাব বিনিময়ে যে পুণস্কাব চাইছিলুম তা দুটো ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার দিয়ে প্রতিশোধ নয়। কিন্তু স্পষ্ট ক'বে কিছু চাইবার না ছিল সাহস, না উপায়। আমার টেবিলের উপরে এক তাড়া নোট অবহেলিত হয়ে প'ড়ে রইল।

একেবাবে চ'লে যাবাব আগে সন্ধ্যা বললে, সত্যি, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু হ্যাঁ, আমি কে বা কোথায় থাকি তা জানবার দয়া ক'বে কিছুমাত্র চেষ্টা কববেন না। তা হ'লে আমার যতখানি উপকার কবেছেন তার চেয়ে অনেক — অনেক বেশি ক্ষতি কববেন। আপনাবও লাভ হবে না। বরং—

বরং?

যাক, জানি আপনি ওসব কিছু করবেন না। আপনাকে আবাব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নমস্কাব।

নিশ্চয়ই আমাব সমস্ত সত্তা চেয়েছিল সন্ধ্যার অনুধাবন করতে জানতে যে, সে কোথায় থাকে, যেন আমাদের সেই ডাক্তারী দেখাই শেষ দেখা না হয়। কিন্তু, ওই যে বলেছিলুম আমাব সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই আমার টেবিলের কাছে প্রস্তবমূর্তির মত দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার চ'লে যাবাব শব্দ শুনলুম। প্রথমে পাশের ঘরে, তার পরে বাস্তায় গাড়ির রঙনা হবার শব্দ। কে জানি না, কোথায় গেল জানি না, আর কখনও দেখা হবে না, অথচ আমাকে দিয়ে সে সেই কাজ কবিয়ে নিয়ে গেল, যাতে এতটুকু গোলমাল হ'লে শুধু সন্ধ্যারই ভবিষ্যৎ অন্ধকাব হ'ত না, আমার নিজেবও। কেন সন্ধ্যা অপবিচিত আমার উপর এত আস্থা অর্পণ করেছিল? আমি কি ক'রে সমস্ত বিপদের কথা বিস্মৃত হয়ে অপরিচিতা এক রোগিনীর জন্যে এমন সর্বনাশা ঝুঁকি নিয়েছিলুম? কিসের লোভে? কিসের আশায়? কার জন্যে?

দ্বিতীয় উত্তর নেই। সন্ধ্যা, ওরফে, নবীনার জন্যে।

*

*

*

বলা বাহুল্য, এর পরে আমার তরুণের সঙ্গে দেখা করবার উপায় ছিল না। বিয়ের রাত্রিও না, তার পবেও না। তরুণকে আমি মিথ্যা বলতে পারতুম না কোন মতেই, এদিকে

সত্য বলবারও উপায় ছিল না। এ অবস্থায় দেখা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বন্ধুরও। এমন কি ভূতপূর্ব বন্ধুরও। আর নবীনাই বা আমাকে দেখলে কি ভাবত?

কিন্তু তরুণই একদিন, বোধ হয় বিয়ের দিন পাঁচেক পবেই আমার চেয়ারে এসে হাজির হ'ল। বিয়ের দিন এবং তার পরের দিনগুলি দেখা করি নি ব'লে অনেক অনুযোগ করল। আমি যথাসম্ভব অন্ততঃষণ এড়িয়ে সত্য গোপন ক'রে যুগপৎ ভদ্রতা ও সততা রক্ষা করলুম। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম, তারপর? লেজ কাটাবার পরে কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, এতদিন লেজটাকে কি ক'রে ব'য়ে বেড়িয়েছ? আমি দৃষ্টি এড়িয়ে হাসতে চেষ্টা করলুম।

তরুণ বললে, তা মনে হচ্ছে। তবে —

তবে? তবে কি তরুণ এখন আমায় এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে বসবে যা ডাক্তার বা বন্ধু হিসাবে আমি উত্তর দিতে পাবব না, অথচ উত্তর না দিলেও উদ্ভব দেওয়া হয়ে যাবে? আমি একবার ভয়ে ভয়ে তরুণের দিকে তাকিয়ে একটা স্লাইড নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে লাগলুম। একটু হেসে তরুণ বললে, তবে কি জান —

কি?

আমাদের দেশের মেয়েবা একেবারে বোকা, একেবারে শিশু। কিছু জানে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে তরুণ আমার একেবারে কাছে এসে কানে কানে বললে, ডু য়ু নো, নবীনাইজ অ্যান অ্যাবসলুট কিড্। শী ডাজন'ট নো এ থিং অ্যাবাউট দি ফ্যাক্টস অব লাইফ।

ব'লে তরুণ অনুচ্চ শব্দে তাব কলেজী দিনের তৃপ্ত সবল সলজ্জ হাসি হাসতে থাকল।

ব্যক্তিত্ব

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। ডরোথির মনে হয়েছিল, তাব চোখের সামনে একবাশ মৃত্যুৰ অঙ্ককার ছড়িয়ে উঠে গেলেন ভদ্রলোক। একটু বাদে তাঁর গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ কানে এলো। ডরোথি নির্বাক, নিস্পন্দ, বোবার মতো বসে। তার পবনে তখনো শোকেব বসন, বাছতে শোকেব চিহ্ন, চোখেমুখে শোকেব ছাপ। হাতে একখানা চিঠি।

শোক মিথ্যে নয়। শোক হয়েছিল। বৃকেব ভেতরটা নিঃশেষে শূন্য হয়ে গেছল। পাহাড়েব মত এক পুরুষ একটানা ষোল বছর পবে তাব জীবন থেকে বড় আচমকা বিদায় নিয়েছিল। চোখের সামনে শেষ ঘনাতে দেখেও এতবড় বিচ্ছেদ বিশ্বাস করতে পাবে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তার শোক বড় কি আর কিছু, ডরোথি জানে না।

বসেছিল চিত্রাৰ্পিতের মত। হঠাৎ সৰ্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল তাব। মনে হল কেউ তাকে দেখছে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। বিশালকায কালো লোমশ একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব ছোট চোখ মেলে সৰ্বকৌতুকে দেখছে তাকে আব হাসছে অল্প অল্প। সেই হাসির ফাঁকে তার পূক ঠোটের ভিতর দিকের লালচে অংশটুকুও যেন দেখা যাচ্ছে। ডবোথি শিউবে উঠল। আবাবও। দেহাতীত আত্মা কি আসে? দেখে? তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ঘবের মধ্যে সে একা বসে নেই, আরো কেউ আছে, নিবিস্ট কৌতুকে দেখছে তাকে, তার অনুভূতির এই সদ্য বিপর্যযটুকুও বুদ্ধি অগোচব নয় তাব।

হঠাৎ শূন্য ঘবের চার দিকে একবাব চেযে নিয়ে অস্পষ্ট স্বরে ডবোথি বলে উঠল, টনি বানডোডকার? যতদিন ছিলে তুমি একদিনেব জানোও আমাকে অসম্মান করেনি, কিন্তু আমার বৃকেব ভেতবটা ওঁড়িয়ে দিয়েও সব থেকে বড় সম্মান আজ দেখালে তুমি, তোমাব ডোবা শপথ কবছে, তোমাব এই ইচ্ছের মর্যাদা সে রাখবে, তুমি যা চেযেছ তাই হবে!

ডরোথির কাছে কোনোদিন কথাব খেলাপ করেনি টনি বানডোডকার। কেবল একবাব ছাড়া।

তাব ফল শুভ হয়নি। ডবোথি জানে সেটা অঘটন একটা। সে প্রস্তুত ছিল না। এই অঘটন বরদাস্ত করতে তার বিক্ষিপ্ত স্নায়ু অনেক সময় নিয়েছে। ববদাস্ত ঠিকমত বোষনদিনও কবতে পারেনি হযত। কিন্তু স্থির বুদ্ধিব মেয়ে সে। নিজেব সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছিল। তাছাড়া, মানুষটাও তো সুস্থ ছিল না তখন। কেন যেন হঠাৎ এক বিষাদ রোঞ্চে পেযে বসেছিল তাকে। কথা খেলাপ করার সেই অবুঝ মন্ততা তারই বিপবীত প্রতিক্রিয়া। সেটা যে এ-ভাবে আসবে ডরোথি কল্পনা করেনি। টনিকে নিয়ে হিমসিম অবস্থা তার তখন। ডাক্তাবদের একটা কমিটিই বসিয়ে দিয়েছিল সে। দরকার হলে বশ্বে থেকে আরো বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে বলেছিল সে। ডরোথি আরো ঘাবড়ে গেছল কারণ, আপদে-বিপদে যে অনুগত লোকটা মুখ বুজে টনিকে সামলাতে পারত, ব্যবসায়ের কাজে সেই শিবাং কারমালিও তখন জাপানে। কেবল করে তাকে চলে আসতে বলবে কিনা সেই চিন্তাও কবেছিল ডরোথি।

সে-অবকাশ মেলেনি। মাস দুয়েকের মধ্যে সেরে উঠেছে বানডোডকার। তার মাথা থেকে যেন একটা ভূত নেমে গেছে। কিন্তু তাকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে চিকিৎসকের থেকেও ডরোথি বানডোডকারের কৃতিত্ব কম নয়। সব থেকে বড় ঝড়টা বুঝি তার ওপর দিয়েই গেছে। তার দেহের ওপর দিয়ে, মনের ওপর দিয়ে — নিরুপায় হয়েই নিজেকে সমর্পণ করেছে সে, এক উদভ্রান্ত যৌবনের অশান্ত ক্ষুধার মুখে আত্মসমর্পণ কবেছে। তার ফলে ডরোথির দু' দু'বারের সেই আট্ট ব্যক্তিত্ব আর আত্মবিশ্বাস ধূলিসাং। সেই অতনু-নিভুতে পুরুষের সর্বগ্রাসী অধিকারের অশান্ত ব্যক্তিত্বটাই যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

আস্তে আস্তে তারপর টনি বানডোডকার ঠাণ্ডা হয়েছে, শান্ত হয়েছে। আগের থেকেও ভদ্র নড হয়েছে। ডোরার বিষয় উৎকণ্ঠার কারণ উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটিব সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে সে। কথার খেলাপের দরুন তার পরিতাপের শেষ নেই। শুকনো মুখে বার বার ডোরাকে বলেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব আর ইচ্ছাশক্তি বড় করে তোলো — দু'দুবার ঈশ্বর দয়া কবেছেন, এবারও করবেন না তোমাকে কে বলল?

তাব মুখের দিকে চেয়ে ডবোথির মাথা হয়েছে। হেসেই জবাব দিয়েছে, আয়নায় নিজের মুখখানা চেয়ে দেখো গে যাও, কে বলেছে। এই নিয়ে উতলা হয়ে ফের যদি রোগ বাড়িও আব আমাকে কাছে পাবে না বলে দিলাম।

কিছুটা নিশ্চিত্ত বোধ করেছে টনিও। ভিতবে একটা চাপা দুশ্চিন্তা তারও আছে বইকি। দু'জনেবই আছে। টনি বলেছে, ভালো মন্দ যা-ই হোক, কথার খেলাপের জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা কববে না বলো?

ডরোথি আবারও না হেসে পারে নি।

টনি বানডোডকার কথা দিয়েছিল তার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পব। আঠারো ঘণ্টা উদগীর হব্বে নার্সিংহোমে বসে থাকার পর খবর পেয়েছিল, এবাবেও ছেলে হয়েছে। উদ্ভেজনায় আরো যেন ঘাম দেখা দিয়েছে টনির সর্বাস্থে। ডোরা খানিকটা সুস্থ হবার পবেও তার কেবিনের দিকে পা বাড়াতে পারেনি। শিরায় কারমালিকে হুকুম করেছে, কেমন হয়েছে দেখে এসো তো।

চিবানুগত কারমালি মনিবের হুকুম পালন করে ফিরে এসেছে। বলেছে, ভালো স্যার।

— ভালো তো তুমি আমাকেও দেখো, কেমন ভালো? কেমন?

কাবমালি হুকুম পালন কবতে যত পটু, বাচনে তত নয়। জবাব দিল, বড্ড ছোট, ভালই মনে হল।

— আঃ! উদ্ভেজনাব ফলে দ্বিগুণ বিরক্তি, গাযের বং কেমন?

— লাল দেখলাম।

— তার মানে কালো — কেমন লাল? কালচে লাল?

— ন-না।

— আর নাক মুখ চোখ?

— তাও ভালই বোধ হয়। মিসেস বানডোডকার আপনাকে কেবিনে যেতে বলেছেন স্যাব।

উৎকণ্ঠা একেবাবে কমেনি, তবু খানিকটা স্বস্তি নিয়ে কেবিনে ঢুকেছে টনি বানডোডকার। প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও বাছাই-করা কেবিন। একদিকের শয্যায় ডবোথি শুয়ে। আর একধারেব বেবি-বেডে নবজাতক। ভীকু পদক্ষেপে টনি বানডোডকার আগে সেদিকে এগিয়েছে। নির্নিমেষে দেখেছে খানিক দাঁড়িয়ে। মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরেছে একটু একটু করে।

ফিবে দেখে ডরোথি ডাগর চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, কিন্তু ঠোঁটেব ফাঁকে মিষ্টি হাসি। চোখাচোখি হতে বিশালবপু টনি বানডোডকারের কচি ছেলের মত লাজুক-লাজুক মুখ।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, ডরোথির দু'চোখ নড়েনি তার মুখের ওপর থেকে। আবারও হেসেছে মিষ্টি করে। — নিশ্চিত্ত ?

আনন্দে টনির ওকে আদব করতে ইচ্ছে হচ্ছিল একটু। নীচু হয়ে মুখের কাছে ঝুঁকিয়েছে, তারপর মাথা ঝাঁকিয়েছে। অর্থাৎ খুব। তারপর চাপা উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছে, এটাও কোনোই হবে একটু, কিন্তু আমার মত আলকাতরার কালো নয় — নাক-মুখ-চোখ পার্ফেক্ট, জাস্ট লাইক ইউ, আমার মত হতভাগা-মার্কী হবে না, হি উইল্ বি এ জেন্টলম্যান!

ডরোথি হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, তোমার থেকে জেন্টলম্যান তামাম দুনিয়ায় নেই। আমার জিনিসের এ-ভাবে নিন্দে করলে রেগে যাব বলে দিচ্ছি।

তা নিয়ে আরো খানিক হাসাহাসির পর দু'জনেই চুপ। ডরোথি জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

মুদু হেসে বানডোডকার জবাব দিয়েছে, ভাবছি তোমার ব্যক্তিত্বের কথা, আর রেভাবেণ্ড ফার্নানডেজের কথা। হাউ লাকি আই অ্যাম!

একটু বাদে অন্যমনস্কের মত ডরোথি ডাকল, টনি —

— ইয়েস্ মাই ডিয়ার?

— একটা কথা বলব?

— হোয়াই একটা, অনেকগুলো বলো।

— বাগ করবে না?

— রাগ? তোমার উপর? বিশেষ করে এই দিনে!

আশ্বাস পেয়েও ডরোথির বিভ্রান্ত মুখ। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, দু' দু' বাব ঈশ্বর আমার মুখবক্ষা কবেছেন টনি, এই দুটিই বেঁচে থাক, এবপব আর না — লাক্ তো বরাবব একরকম থাকে না, এবপব অন্যরকম ব্যাপাব দাঁড়ালে তুমিই সব থেকে বেশি আঘাত পাবে টনি — তোমার জনোই আমার ভয়।

টনি বানডোডকারের খুশি মুখ। সেও সর্কৌতুকে চেয়ে আছে। তাবপর হেসেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে তোমার পাবসোনালিটির জোরে ঈশ্ববেব বিধান উন্টে দিতে পাবো তুমি, তোমারও ভয়! তুমি কি নিজেকে চেনো না ডোবা, নিজের শক্তি জানো না!

— ঠাট্টা নয় টনি, দু'বাবে জেমার মুখবক্ষা করতে পেবেছি, এবারে আমার এখন থেকেই ভয় ধবেছে। তুমি কথা দাও।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাস ফার অ্যান্ড নো ফার্দাব, বংশের দুর্নাম দু'বাবব খণ্ডেছে, অ্যাম দা প্রাউডেস্ট ম্যান ইন দি ওয়ার্ল্ড নাও — ঠিক আছে, তুমি ভয়-ভাবনা বেড়ে ফেলে দাও।

— কথা দিচ্ছ?

— সিওর, এ জেন্টলম্যানস ওয়ার্ড।

টনির ঠাকুরদা বলত, তাব সময় থেকেই এই পরিবাবেব ওপর অভিশাপ লেগেছে। ওই অভিশাপের সে প্রথম দূত। নইলে ঠাকুরদার বাবা-মায়ের চেহাবা নাকি তেমন খারাপ ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কেমন করে যে এলো সে, সেটাই বিস্ময় তার। টনিব আবাব্ব সেই ঠাকুরদার মা বুড়ির ওপর সন্দেহ, কেমন ছিল সেই মা বুড়ির চরিত্র কে জানে!

ঠাকুরদাকে সে দেখেছে কিনা মনে নেই। তার ফোটো দেখেছে। পাহাড়ের মত দেহ, কালো কুংসিত লোমশ আকৃতি। নাক থাবড়া, ঠোট বিসদৃশ পুরু, চোখ ছোট। গোটা অস্তিত্বটাই যেন অশুভ। নিজেকে নিজে অভিসম্পাত করত তার ঠাকুরদা, তার বাব্বও।

টাকার জোরে ঠাকুরদা সূত্রী মেয়েই বিয়ে করেছিল। বংশগতভাবে টাকার পাহাড় জমেছে তাদের। লৌহ আকবের খনির মালিক তারা — আয়বন ওর চালান দেয় জাপান, বোম্বাইয়ে, বাংলাদেশেও।

ঠাকুরদার আশা ছিল ছেলোটো অস্তত মোটামুটি সুশ্রী হোক। কিন্তু টনির বাবারও সেই রকম চেহারা নিয়েই আবির্ভাব। তেমন বীভৎস কুৎসিত, অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে ধারে কাছে ঘেঁষত না। আর টনি শুনেছে তার মা আত্মহত্যা করেছে তার জন্মের পর। আত্মহত্যার কারণ একটু বড় হয়ে সহজেই সে অনুমান করতে পেরেছে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেই পেরেছে।

ছেলে বড় হয়ে উঠতে টনির বাবা চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। ছেলোটোর মতিগতি অন্যরকম। অল্প বয়সেই তার কুৎসিত চেহারার মধ্যে বাসনার যে আওন জ্বলত, বাবা তা টের পেয়েছিল। সেই অল্প বয়সেই দুই একটা দুঃসাহসিক অঘটন ঘটিয়েছে। টাকার জোরে বাবা বিপদ সামলে উঠেছে। সমস্ত রমণী জাতটার ওপরেই যেন একটা জাতক্রোধ ছেলের।

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ তার বাবাকে বলেছে, জন্ম থেকে মায়ের স্নেহ পায়নি বলেই এমন হয়েছে। মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেলে এ রকম হত না। কিন্তু ঠিক এরকম রমণী টনির বাবা পাবে কোথায়? টাকা অনেক আছে, কিন্তু টাকা দিয়ে কি স্নেহ ভালবাসা কেনা যায়?

তবু দীক্ষার দয়ায় সেই রকম যোগাযোগই হল একটা। দেশে বিষম গোলযোগ চলেছে তখন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই কানাঘুষো বেশ জোর শোনা যাচ্ছে, ভারত এসে গোয়া দখল করবে। পর্তুগীজ আধিপত্যের অবসান হবে। দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা চলেছে তখন। এমন দিনে সে সময়ের গীর্জার প্রধান ফাদার থরম্যান টনির বাবাকে বলল, একটি বিপন্ন মহিলা আর তাব সতের আঠার বছরের একটি মেয়েকে রক্ষা করতে হবে।

ফাদাব থরম্যান ভারী স্নেহ কবে টনির বাবাকে, আর সে ভদ্রলোকও ফাদাবের কথায় প্রাণ দিতে পারত।

১৯৫০ সালের কথা। এক প্রতিপত্তিশালী পর্তুগীজ গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে একটা মেয়ে আর তার মা। মা'টি বাড়ির আয়া ছিল। দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে দেখে সেই গুণ্ডা মা মেয়েকে দেশে চালান দেবার ব্যবস্থা করেছে। উদ্দেশ্য অসং। তাদের দেশে সুশ্রী প্রাচ্য মেয়ের কদর খুব। মা-কে শাসিয়েছে কোনরকম গুণগোল করলে তাকে গুলি করে মেরে শুধু মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে।

সেই মহিলা ফাদারকে গোপনে চিঠি লিখে বিপদ জানিয়েছে। মহিলারও বয়েস তখন ছত্তিশিশ সাঁইতিবিশ — রূপ যৌবন আছে।

টনির তখন একুশ বাইশ বছর বয়েস। বাপের মতই অসম সাহসী সে। না, তার থেকেও বেশি। নিজেদের বিপদ তুচ্ছ করে বন্দুকের মুখে সেই মা মেয়েকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল তারা। সেই মেয়ে ডরোথি। তারপর থেকে ডরোথির মা এ বাড়িতে গভর্নসের মত থাকলেও, সেই কর্ত্রী।

কিন্তু তাদের বাড়িতে আনার পর টনির সুপ্ত প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ডরোথিকে ঘিরে বাসনা দানা বেঁধে উঠেছিল। বাবা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, ফাদারের গচ্ছিত অতিথির প্রতি এতটুকু অশালীন ব্যবহার করলে ছেলেকে গুলি কবেই মারবে সে। বিপদ কেটে গেলে ওই মা-মেয়েব অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থাও ঠিক করে রেখেছিল টনির বাবা।

কিন্তু তার আগেই বিপদের সূচনা দেখল ডরোথির মা। এক রাতে সোজা এসে টনির মাথায় হাত রাখল মহিলা। বলল, তুমি আমার ছেলে, ছেলে মাকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করে এনে এতবড় কলঙ্কের কাঁটা মাথায় নেবে বাবা? কি পাবে? আমি আর ডরোথি আত্মহত্যা করব। আমরা মুছে যাব, কিন্তু তোমাদের বীর বংশের এত বড় কলঙ্ক আর মুছবে কি?

সেই থেকে মাথায় যেন ধুলো পড়ল টনির। আর সেই থেকে ডরোথির মা টনিরও মা হয়ে বসল। মায়ের অধিকার নিয়ে ডরোথির সঙ্গে রীতিমত ছেলেমানুষি রেশারেশি চলত তার। আর মায়ের পক্ষপাতিত্ব টনির প্রতিই।

সব শুনে ফাদার থরম্যান হেসেছিল। রেভারেণ্ড ফার্নানডেজ তখন টনির থেকে বছর চারেকের বড় যুবক, কালো রঙ, সুস্ট্রী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সামনেই থরম্যান বলল, সব পারসোনিয়ালিটি ফ্যাক্টর বুঝলে — ব্যক্তিগত দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়। সে-রকম ব্যক্তিত্বশালী মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পারলে, তার ছেলেপুলের চেহারা পর্যন্ত অনারকম হতে পারে, অফ কোর্স তোমার ছেলের থেকেও সেই মেয়ের ব্যক্তিগত অনেক বেশি হওয়া চাই।

কথাগুলো টনির বাবার মনে ভারী ধরেছিল। ছেলের থেকেও বেশি একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ের খোঁজে হনো হয়ে উঠেছিল ভদ্রলোক। আর ফাদার থরম্যানের সেই উক্তি পরিহাসের ছলে টনিকে বলেছিল ফার্নানডেজ। চার বছরের ছোট বড় হলেও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বাবা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ের খোঁজে আছে টনি জানত। কিন্তু সে-রকম মেয়ে যে তাদের ঘরেই আছে, বাবা শুধু সে খবরটাই রাখত না। টনির চোখে ডেরোথির শাস্ত ব্যক্তিত্বটুকুই যেন আসল রূপ। ডেরোথির মা কিছু বললেও প্রতিবাদ করা যায়, অমান্য করা যায়। কিন্তু ডেরোথি কিছু বললে তা যেন পারাই যায় না। প্রতিবাদ করলে বা অমান্য কবলে সে কিচ্ছু বলবে না, দু'বার অনুরোধ করবে না। শুধু মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে যাবে। ঠোঁটের ফাঁকে তার সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা যাবে কি যাবে না। কিন্তু তারপর যেন অনুরোধ পালন না করে উপায় নেই তার। আর-তারপরেও ডেরোথি হাসতই শুধু। অর্থাৎ, সে যেন জানতই, যা চেয়েছে তাই হবে।

পরের তিনটে বছরের মধ্যে অনেক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেল। টনির বাবা আর ডেরোথির মা মরে গেল। ওদিকে চোখ বুজল ফাদার থরম্যানও। বাবার ব্যবস্থামত ডেরোথি বা অবশ্য তার আগেই ভিন্ন ডেরায় উঠে গেল।

টনি এত বড় ব্যবসার মালিক। ডেরোথি আপিসে আসে, ব্যবসা দেখে, টনিকে পরামর্শ দেয়। মোটা মাইনেও পায় সে, যোগ্যতার মর্যাদা হিসেবে টনি তাকে আরো বেশি দিতে চায়, কিন্তু ডেরোথি নেবে না। যত দিন যায়, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রমণী যেন টনি আর দুটি দেখে না।

মনের কথাটা একদিন খোলাখুলিভাবে রেভারেণ্ড ফার্নানডেজকে বললে সে। ডেরোথিকে সে বিয়ে করতে চায়। তার ধারণা যে ব্যক্তিত্বের কথা ফাদার থরম্যান বলে গেছল সেই ব্যক্তিগত ডেরোথির আছে — তার থেকে বেশিই আছে।

খুশিমুখে ফার্নানডেজ তার পিঠ চাপড়েছে। বলেছে, গো অ্যাহেড, দেখো ডেরোথি রাজি হয় কিনা। আমারও বিশ্বাস, ফাদার থরম্যান ঠিকই বলেছিলেন, পারসোনিয়ালিটি ফ্যাক্টর ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পরট্যান্ট থিং।

রেভারেণ্ড ফার্নানডেজের কালো মুখখানা সেদিন অনির্বচনীয় মনে হয়েছিল টনির।

প্রস্তাবটা পরদিনই আপিসের পর ডেরোথির কাছে পেশ করেছে সে। তার আগে ফাদার থরম্যানের পারসোনিয়ালিটি ফ্যাক্টরের মহিমার কথা বলেছে, তার বাবার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ের খোঁজের কথা বলেছে, আর রেভারেণ্ড ফার্নানডেজের বিশ্বাসের কথাও বলেছে। তবু, টনির মনে হয়েছিল, বিয়ের প্রসঙ্গ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ডেরোথি যেন চমকে উঠেছিল।

খানিক চুপ করে থেকে বিমর্ষ মুখে টনি বলেছে, থাক —

ডেরোথি তখনি বুঝেছে, কেন বলল।

তবু জিজ্ঞাসা করেছে, কেন?

— তুমি ভয় পেয়েছ।

একটু চুপ করে থেকে ডেরোথি জবাব দিয়েছে, আমার ভয় শুধু তোমার জনেই, নইলে তোমার মত এমন মানুষ হয় নাকি।

সাগ্রহে টনি বলেছে, আমার কিচ্ছু ভয় নেই, আমার স্থির বিশ্বাস তোমার ব্যক্তিগত দিয়েই তুমি আমাদের বংশের অভিশাপ মুছে দিতে পারবে — ফাদার থরম্যানের কথা মিথ্যে হবে না, ফার্নানডেজেরও বিশ্বাস মিথ্যে হবে না।

আবারও খানিক চুপ করে থেকে ডরোথি বলেছে, আচ্ছা তাই হবে। কাল আমরা একবার রেভারেণ্ডের কাছে যাই চলো, আগে তার সঙ্গে কথা বলে তার আশীর্বাদ নিয়ে আসি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে টনি। তক্ষুনি বিসদৃশ কিছু করে বসতে যাচ্ছিল। তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে ডরোথি চোখ পাকালো, এই।

হাসতে হাসতে টনি আবার বসে পড়ে প্যাক-প্যাক করে টেবিলের বেল টিপেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি শিরাং কারমালি হাজির।

— হ্যালো কারমালি, আমার বিয়ে।

— কংগ্র্যাচুলেশনস্ স্যার।

— আর ইউ হ্যাপি?

— ভেরি মাচ ইনডিড স্যার।

— কার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পেরেছ?

এবার ঠোটে হাসি ফুটিয়ে ডবোথির দিকে একবার না তাকিয়ে পাবল না কারমালি। ডরোথি'র মুখ লাল। কারমালি মাথা নাড়ল, পেরেছে।

— দেন আরেঞ্জ।

ঘটা কবে বিয়ে হয়েছে।

আড়াই বছর পর পব দুটি সন্তান হয়েছে তাদের। কালো হলেও ছেলে দুটির চেহারা সুশ্রী, ভদ্র।

টনির দুর্বীর বাসনা নিজের ব্যক্তিত্বের গুণেই সংযত করতে পেরেছে ডরোথি। তা বলে উপেক্ষা বা বঞ্চিত কবেনি তাকে। তার মুখেব দিকে তাকালে বাসনার তাপ বুঝতে পারে ডরোথি। তাই প্রস্তুত হবার অবকাশ পেয়েছে। গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেছে।

সন্তান-সন্তবা হবার সময় থেকেই স্থির, সংযত, গম্ভীর সে। কিন্তু টনি তখন বেপরোয়া, মত্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হল তোমার?

ডবোথি হেসেই জবাব দিয়েছে, চাষ করেছে।

সত্যি তখন এক আদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দেখেছে টনি তার।

দ্বিতীয় সন্তান হবার পর ডরোথি কথা আদায় কবেছে টনি'র, আর নয়, এই শেষ।

সানন্দে কথা দিয়েছিল টনি বানডোডকার।

কিন্তু বছর তিনেক না যেতে এই কথারই খেলাপ করেছিল সে। ডরোথি তাকে বিশ্বাস করত। তাই অবাক হয়েছিল সে। ঘাবড়েও গেছিল।

এই দুর্যোগ এত আচমকা এসেছে যে ডরোথি হতভম্ব। বিয়ের পবে আপিস দেখা ছেড়ে দিয়েছিল সে। ব্যবসায়ের কোন গণ্ডগালের ফলে এরকম হল কিনা জানে না। জানবে কার কাছ থেকে, কারমালি তখন জাপানে। নিশ্চিত আনন্দে কেটেছিল এই তিনটে বছর। বিজ্ঞানের যুগে নিরাপদে থাকতে চাইলে বিপদ এড়ানো সহজ। কিন্তু গোঁ ভরে এই বিপদের মধ্যেই যেন বাঁপ দিল মানুষটা। ক্ষণে ক্ষণে উদভ্রান্ত। উদভ্রান্ত যখন, তখনই অবুঝ, বেপরোয়া সে। ডরোথি তখন প্রাণপণে তাকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে, কথার খেলাপের কথা বলেছে, বিপদের সম্ভাবনার কথা বলেছে। টনি বানডোডকার কানেও তোলেনি। উন্টে বিরক্ত হয়েছে। বিরক্তি বাড়লে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

পুরুষের এই গ্রাস থেকে ডরোথি নিজেকে উদ্ধার করতে পারেনি। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ধূলিসাৎ যেন।

ঘন ঘন গীর্জায় গেছে এর পর। ফার্নানডেজের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। চিকিৎসার ঢালাও ব্যবস্থা করেছে। মানুষটাকে সুস্থ করে তোলা ছাড়া আর কিছু ভাবাব অবকাশ নেই।

টনি বানডোডকার সুস্থ হল যখন, ডরোথি তখন অস্তঃসদ্বা।

সময় যত এগিয়ে এসেছে তত যেন শান্ত নির্জীব হয়ে পড়েছে টনি বানডোডকার।
পরিতাপের শেষ নেই তার।

ডরোথিরও বিবর্ণ পাণ্ডুর মূর্তি। সে ভেবে পায় না হঠাৎ এ-রকম মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল কেন লোকটা। ভালো যে হয়ে উঠেছে এটুকুই ভাগ্য, ভাবে সে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। এটিও ছেলে। কিন্তু আগের ছেলে দুটোর মত নয়। টনির মত বীভৎস কুৎসিত নয় বটে, তবে কুৎসিতই। এই ছেলের বেলায় বংশের অভিশাপ ছ'আনা কেটেছে বলা যেতে পারে।

টনি বানডোডকার সদা বিষম। না, ডরোথি কোন দিনও অনুযোগ করেনি তাকে, ভর্ৎসনা করেনি। ঈশ্বরের এই বিধান সে মেনে নিয়েছে। প্রয়োজনে টনিকে সাহুনাও দিয়েছে।

কিন্তু সাহুনা খুব পায়নি টনি। দিনের বেশির ভাগ সময় এক নীরব যাতনা ভোগ করেছে। পরিশ্রম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ডরোথি আবার চিন্তিত হয়েছে।

ছোট ছেলে সনি দিনে দিনে বড় হচ্ছে। কিন্তু এই ছেলেটা যেন চক্ষুশূল টনির। কোনো সময় তাকে কাছে ডাকে না, আদর করে না। তার মায়া-মমতা সব বড় দুই ছেলের জন্য। ছোট ছেলে সনিকে খুব প্রীতির চোখে দেখে না ডরোথিও। কিন্তু বাপেব এতটা এক চোখামির প্রতিবাদ না করে পারে না এক এক সময়। বলে, কেন, তোমার বাপ-ঠাকুরদার মত অত কুৎসিত তো হয়নি। এর ছেলেপুলে দেখো, আরো ভালো হবে।

কিন্তু ওই ছেলেটার দিকে চেয়ে ডরোথির নিজেরই ভেতরটা আবার এক এক সময় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত।

সাত আট বছর বয়সের সময় এই শিশু যেন বাবা-মায়ের ব্যবহারের তাবতম্য বুঝতে পারত। এমনতে নিরীহ, শান্ত, কিন্তু নির্বোধ যে নয়, তাও বোঝা যেত। দৈবাৎ মেজাজ বিগড়লে বাপের দ্বিতীয় সংস্কার যেন। তখন সনিকে ঠাণ্ডা কবা এক দুর্লভ ব্যাপাব।

হঠাৎ ছোটখাট একটা স্ট্রোক হয়ে গেল টনি বানডোডকারেব।

তার এক বছর বাদে দ্বিতীয় স্ট্রোকে তার শেষ। ডরোথি চেষ্টার ক্রটি করেনি। শেষ সময়েও সে ভাবতে পারেনি টনি তাকে ছেড়ে যাবে।

একটু আগে যে ভদ্রলোক চলে গেল সে এই পরিবারের অ্যাটর্নি। সে শিলমোহব-কবা একখানা চিঠি দিয়েছে ডরোথির হাতে, আর তাকে একটা উইল পড়ে শুনিয়ে গেছে। উইলে নির্দেশ আছে, ডরোথি বানডোডকার সম্মত হলে তবে এ উইল কার্যকর হবে, অন্যথায় এব কোন মূল্য নেই। উইলে লেখা, তার যাবতীয় বিষয়-আশয় এবং ব্যবসাব একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে তার ছোট ছেলে সনি বানডোডকার। যতদিন না সে সাবালক হয়, ততদিন তার হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করবে ডরোথি বানডোডকার এবং শিরাং কারমালি। এবং এই দায়িত্বভার বহনের জন্য অবশ্যই তারা তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবে।

তড়িৎহতের মত খানিক বসে থেকে অ্যাটর্নির সামনেই ডরোথি হাতেব শিলমোহব-কবা খামটা খুলেছে। রুদ্ধশ্বাসে পড়েছে। চিঠি নয়, ছোট বস্তব্য গোছেব একটু কিছু।

তার মর্ম :

এই উইলে ডরোথিব আপত্তি থাকলে সেটা ছিঁড়ে ফেললেই হবে। ডরোথিব ভালবাসা সম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই টনি বানডোডকারের। ডরোথির এই ভালবাসা আত্মত্যাগেব মতই দুর্লভ। তবু, উচিত বিবেচনায় এই নির্দেশ বেখে গেল সে। কারণ, বিবেকের ঠাড়না থেকে মুক্ত হবার জনোই প্রথম দুটি সন্তানের যাবতীয় দায়িত্ব ডরোথি এবং শিরাং কারমালিব নেওয়া উচিত।

বাবার ছবির খোঁজে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অস্তুর বাবাব ছবিটা ছিল উত্তরবদিকের দেয়ালের বেশ খানিকটা উঁচুতে টাঙানো। বলা যায়, টঙে। ঘুলঘুলিৰ ঠিক নীচে। বাড়িটা তৈরির সময় গজালগুলো ওইভাবেই গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। তাতে ভাড়াটেদের কোনো হাত ছিল না। উঁচুকপালে হয়ে না তাকালে টঙে-তোলা এইসব ছবি সহজে নজরে পড়ার কথা নয়।

ছাপোষা মধ্যবিত্তদের ঘবে মৃত প্রিয়জনদের ছবি বড় করে ঘরে টাঙিয়ে রাখাব রেওয়াজ খুব বেশিদিনের নয়।

অস্তুরের বাড়িতে সবচেয়ে পুরোনো ফটো ছিল তার ঠাকুর্দার। পোর্ট্রেট নয়, গ্রুপফটো। ওর ঠাকুর্দা নাজির না সেরেস্তাদার—কী একটা ছিলেন। ছবিটা তোলা হয়েছিল কাছারিতে। চেহারাগুলো খুব মজার। সকলেরই চাপদাড়ি। বুকের ডানপাশে বোতাম-দেওয়া আচকান। কপালজোড়া ঢাক থাকায় ওর ঠাকুর্দাকে তবু যাহোক চেনা যাচ্ছিল।

ঠাকুর্দার চেয়ে উর্ধ্বতন কোনো পুরুষের দূরের কথা, এমন কি অস্তুরের বাড়িতে তাব ঠাকুরমারও কোনো ছবি ছিল না। অবশ্য ছবি না থাকলেও ঠাকুমা কেমন দেখতে ছিলেন সে সম্বন্ধে ওব মনে প্রায় স্পষ্ট একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। তার কাবণ, ছোটতেই ওদের বলা হয়েছিল যে, ‘তোদের ঠাকুমা দেখতে ছিলেন উপরোনো তোদের সেজো পিসিমার মতো।’ অবশ্যই আরো ঢাঙা, অবশ্যই আবো ফর্শা। ‘অবশ্যই’ওলো অস্তুর মনে তেমন ঠাই পায়নি, কেননা তার কল্পনাশক্তি কোনোদিনই খুব একটা প্রথর ছিল না। ফলে, ঠাকুমা দৈর্ঘ্যে আর গায়ের রঙে সেজো পিসিমাকে কখনোই ছাড়িয়ে যেতে পাবলেন না। দুঃখের বিষয়। কিন্তু সত্যি।

অস্তুর মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে বাটে, ক্যামেবাও এখন বলতে গেলে ঘরে ঘবে তবু কিন্তু কেউ ফটো তুললেই অস্তুর কানে কানে ‘ক্লিক’ নয় — ‘ফস্’ করে একটা শব্দ হয়।

এও এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্মৃতি জিনিশটা ভারি হেজলদাগড়া। একবার যেটা ধবে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। চোখ কানেব মাথা খেয়ে বাস্তবকে দিবা অস্বীকার কবে বসে।

অবশ্যই ‘ফস্’ শব্দ একটা ছিল। শশানে ছবি তোলাব। একটা লাঠির আগায় বসানো থাকত একটা বাটি। তাতে কী দেওয়া হত ভগবান জানে। হয়তো লোহাচূর। একটা কাঠিব মুখে আগুন দিয়ে বাটিটার মুখে ছোঁষালেই ‘ফস্’ করে জ্বলে উঠত। সেই আলোয় ছবি তোলা হতো।

অস্তুর ছেলেবেলায় সাধারণ মানুষের ছবি একবারই উঠত। বেঁচে থাকতে নয়, মরে গেলে। সেই সুবাদেই অস্তুর স্মৃতি ‘ফস্’ শব্দটা ধবে রেখেছে।

অস্ত, অস্ত, অস্ত! অস্ত কি তোমার ইয়ার?

মাপ কববেন, একজন প্রবীণ লোককে আমি এতক্ষণ বেআক্কেলের মতো শ্রেফ নাম ধরে ডেকে গিয়েছি। শুধু প্রবীণ কেন, কোনো প্রমাণ সাইজের লোককেই সচরাচর এভাবে বলাটা

ঠিক আদব নয়। যাঁকে অস্ত্র বলছি, তিনি একজন ছোকরা হলেও কথা ছিল। কিংবা লেখক যদি তাঁর গুরুজন কিংবা সমবয়সী হতেন। তা নয়। লেখক তো এখানে নৈর্ব্যক্তিক। তিনি হলেন সাংখ্যের পুরুষ। অস্ত্রত সাহিত্যে এটাই প্রশস্ত। কাজেই টেকো মাথার যে ভদ্রলোক, চুলে কলপ দিয়ে বয়স ভাঁড়ানো সত্ত্বেও সরকারি চাকরি থেকে যাঁকে অবসর নিতে হয়েছে, যাঁর আর এখন শাদা চুল ঢাকবার এবং রোজ দাড়ি কামাবার আদৌ কোন তাগিদ না থাকায চেহারাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অতি কাডাভ্যারাস, সেই অনন্তনারায়ণ দত্ত, যাঁকে পাড়ার লোকে অনন্তবাবু, আপিসের সহকর্মীরা দত্তবাবু বা বড়বাবু বলতেন এবং যাঁকে অস্ত্র বলে আজকার লোকে কমতে কমতে ঘরে বাহিবে মাত্র দুচারজনে এসে ঠেকেছে — অগত্যা তাঁকে আমি এখন থেকে অনন্তনারায়ণ বলবারই অভ্যেস করব। যদি একটু-আধটু ভুল করে ফেলি, আশা করি পাঠকেরা নিজগুণে লেখককে ক্ষমা করে দেবেন।

তা অনন্তনারায়ণ যখন উত্তরদিকের দেয়ালে একটা টিকটিকির পোকা শিকাব দেখতে দেখতে সেইসঙ্গে মনের মধ্যে কেমন একটা কির্ কির্ করার ভাব। চুনকাম-করা দেয়াল শাদা হবে না তো কী। না, তা নয়। তবে একটা যেন কী। কী যেন নেই।

আর তারপরই যে কথাটা মনে পড়ে গিয়ে অনন্তনারায়ণের বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল, সেটা হল তাঁর বাবার এনলার্জ-করা একটা বড় বাঁধানো ছবি। ছবিটা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ কপালে উঠে পশ্চিমদিকের দেয়ালে ঠিক এমন জায়গায় গিয়ে যা খেল, যেখানে আরো একটা বড় বাঁধানো ছবিতে উত্তরমুখো হয়ে আছেন স্বর্গদেবি গরীয়সী তাঁব গর্ভধারিণী মা। তাঁর মা-র চোখে কেমন যেন একটা ফ্যাল ফ্যাল করা চাহনি। সোজা পশ্চিমের দেয়ালের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে কুপুত্র অনন্তনারায়ণকে যেন তিনি ভৎসনা করছেন।

অনন্তনারায়ণ এমন ফ্যাসাদে জীবনে পড়েন নি। আরো একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে তাঁর অন্তরাঝা কেঁপে উঠল। আজ অমাবস্যা। আর চারদিন পরেই তাঁব বাবাব মৃত্যুতিথি। তাঁর এক বোন আর এক ভাই এই শহরেই থাকে। সারা বছর তেনাদের টিকি দেখা যাবে না বটে, কিন্তু বাবাব মৃত্যুতিথিতে ঠিক এসে হাজির হবে। তাও কি, একেবারে ছানাপোনাসুদু সপরিবারে। দাদাবউদিকে বিজয়ার প্রণামটাও ওই একই দিনে তাবা সেবে নেবে। সঙ্গে আনবে বাবাব জন্য দুটাকা দামের একবস্তি চিম্‌সে-পড়া মালা। ওদের লজ্জা দেবার জন্যে অনন্তনারায়ণ করকরে পাঁচটা টাকা খরচ কবে একটা মালা এনে বাবাব গলায় পরিয়ে রাখেন। কিন্তু লজ্জা পাবার মতোন বুদ্ধি ওদের ঘটে থাকলে তো। পরের বারও ফের সেই দুটাকা দামের মালা। বোন হল সেজো। তার স্বামী করে লোহালকড়ের ব্যবসা। কিন্তু স্বামীটি হাড় কঙ্কুস। অনন্তনারায়ণের ছোট ভাইটিও আর এক। অর্ডার সাপ্লাই কবে তারও আয় নিতান্ত মন্দ নয়। ও হয়তো ভাবে, বেশি টাকা দামের মালা আনলে দাদাকে হয়তো ছোট করা হবে। আহা, দাদার তো সামর্থ্য বেশি নয়। তার ওপর এখন তো পেঙ্গন একমাত্র ভরসা। ঈঃ ছাড়ো তো! তোমরা আর আমাকে ভাই চিনিও না। তাই যদি হবে, জন্মের মধ্যে কস্ম বছরে একদিন — একদিনও তো দাদাবউদির জন্যে ভালোমন্দ কিছু একটা আনতে পারে। উলটো একটা বেলা শুষ্টিসুদু এসে অনন্তনারায়ণকে ওরা খেয়ে ফতুর করে দিয়ে যায়। যাকগে যাক, যাকগে ওসব। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

তবু ভালো যে, মালার দামটা ওরা কম রেখেছে। যদি ওরা পাল্লা দিয়ে দাদাকে টেকা দেবার এতটুকু চেষ্টা করত, তাহলে আর অনন্তনারায়ণকে দেখতে হত না। সেটা হুত নির্ধাৎ মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

এখন ওরা এসে যদি দেখে (ভাবতেও অনন্তনারায়ণের গা শিউরে উঠল!) বাবাব ফটোটাইরই কোনো পান্ডা নেই, তাহলে আত্মীয়স্বজনদের কাছে অনন্তনারায়ণের আব মুখ দেখাবাব কোনো উপায় থাকবে না। সবার কাছে তাঁর পরিচয় হবে বংশের কুলাঙ্গার বলে।

পুরোনো কিছু কথা মনে পড়ে গিয়ে অনন্তনাৰায়ণের যে কী আশ্বাসে হচ্ছিল বলাব নয়। দক্ষিণেব শহরতলিতে পৈতৃক ভাড়াবাড়িতে থেকে যাওয়াটাই হয়েছে তাঁব কাল। ভাড়াটা কম বলে তিন মেয়েৰ বিয়ে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে সংসাবেব হান আজও কোনোমতে তিনি ধৰে বাখতে পেবেছেন। কিন্তু তিনি যে কোনো বিষয়-আশয় কৰে উঠতে পাবেন নি, তাবও জনো দায়ী এই কম ভাড়ার পৈতৃক ভাড়াটে বাড়ি। চলে তো যাচ্ছে, আব কেন — এই একটা ভাব তাঁব সমস্ত উদাম নষ্ট কৰে দিয়েছে। তাঁব ববসী সবাই চাকৰি কৰতে কবতে বাবসাব লাইনে নিজেদেব আখেব গুছিয়ে নিয়েছে। এখন তাবা সবাই প্রায় বাড়িগাডিৰ মালিক।

তবে এটা বলতেই হবে যে, অনন্তনাৰায়ণেব ভাইবা অন্য অনেকের ভাইদেব চেয়ে শতওণে ভালো। তাবা সবাই বিয়ে-থা কৰাব পবই যে যাব আলাদা হয়ে গেছে। পৈতৃক আসবাবপত্র সুদু ভাড়া বাড়িটা অনন্তনাৰায়ণ যে নিৰ্বাঙ্কট ভোগদখল কৰতে পাবছেন, সেও তো নেহাতই তাঁব ভাইদেব কৃপায়। তাবা অনায়াসে এ সবেব ভাগ চেয়ে বসতে পাবত। কিন্তু তাবা তা কৰে নি।

ফলে পৈতৃক যা কিছু উত্তৰাধিকাৰ তাব মালিক হয়েছেন একা অনন্তনাৰায়ণ। সেটা কম নাকি।

বাবা মাবা যাওয়াব পব অনন্তনাৰায়ণ তাঁব বাবা আব মা দুজনেবই ছবি আলাদা কৰে এনলার্জ কৰিয়েছিলেন। কিন্তু মূল ফটোটা দোকান থেকে চেয়ে নিতে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে, যেটা দাঁড়িয়েছে তা এই যে, ওই এনলার্জমেন্ট দুটোই দুনিয়ায থেকে যাওয়া তাঁদেব একমাত্র ছবি। অনন্তনাৰায়ণ এই সময় চেযাবে সবে নড়ে বসায় বোঝা গেল যে, একথা মনে কৰে তিনি বেশ বিচলিত বোধ কৰেছেন।

এতক্ষণে বাবাব ছবিটা তাঁব মনেব মধ্যে জ্বলজ্বল কৰে উঠেছে। আঁকাব হাত থাকলে তিনি এমন কি একেও ফেলতে পাবতেন। বং মযলা হলেও গুম্ফমণ্ডিত ভাবি সৌম্য চেহাৰা ছিল তাঁব বাবাব। অনন্তনাৰায়ণ তাঁব শালাব ছাপাখানা থেকে বিনা পয়সায় দুটি পঙ্ক্তি ছাপিয়ে নিয়ে ছবিব তলায় ভুড়ে দিয়েছিলেন— “পিতা স্বৰ্গঃ পিতা ধর্ম পিতা হি পবনন্তপঃ। পিতৰি প্ৰীতিমাপদে। প্রযন্তে সৰ্বদেবতাঃ।” ফাঁকা দেখালে পুৰো ছবিটাই তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন।

এনলার্জ কৰে ছবি বাঁধানো তখন কত কম খবচে হত। এখন হলেঃ অনন্তনাৰায়ণেব চাকৰে দায়ে মনসা বিকোনোব দশ। বাবা-মা ব স্মৃতি ধৰে বাখাব আত্মপ্ৰসাদ হঠাৎ এইখানে এসে অনন্তনাৰায়ণেব ঠোটেব ফাঁকে মিলিয়ে গেল। তাঁব একটিই ছেলে। কলেজে পড়ে। খুব একটা মেধাবী নয়। তাব ওপব রাজনীতিব চক্ৰে পড়ে পড়াশুনো আবো ডকে উঠেছে। কেঁবযার কবাব দিকে কোনো নজৰই নেই। তাব মানে, ভবিষ্যতে কখনো অনন্তনাৰায়ণেব ফটো এনলার্জ কৰে বাঁধানো হবে বলে মনে হয় না। তছাড়া যে ছেলে বিজ্ঞাব পৰেও বাপ-মায়েব পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কৰে না, ঠাকুৰদেবতায় যাব বিশ্বাস নেই — তাব কাছ থেকে সেসব আশা কবাই ভুল। এইখানে অনন্তনাৰায়ণ একটা দীৰ্ঘশ্বাস ছেড়ে টোক গিলেন।

ভাইবোনদেবও বলিহাবি। বাবা মা ব ছবি দুটো থেকে কঁপ কৰে নিয়ে অনায়াসে তাবা নিজেব নিজেব কাছে বাখতে পাবত। দাদাবউদিব সঙ্গে সম্পর্কেব সব পাটও তাবা এইভাবে চুকিয়ে দিতে পাবত। তা ওবা দত্তবংশেব স্মৃতিব সব বোঝা দাদাব খাড়ে চাপিয়ে নিজেবা গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে চায়। কেন যক্ষ হয়ে তাঁকেই সব আগলাতে হবেঃ পৈতৃক ভাড়াবাড়িতে থাকতে পাবাব এটা কি মাণ্ডলঃ কপালে একটা মশা বসেছিল। অনন্তনাৰায়ণ হাতেব চেটো দিয়ে সেটা মাৰলেন। দূৰ থেকে দেখলে কেউ এটাকে কপাল চাপডানো বলে মনে কবতে পাবত।

বাড়িৰ বডছেলে হওয়াৰ ঝকমারি অনেক। ভাইবোনেৰা তো জ্ঞান হয়ে ঠাকুৰদাকে দেখে নি। অনন্তনাৰায়ণ ছিলেন ঠাকুৰ্দাৰ অন্ধেৰ নড়ি। ছোটবেলায় সব সময় তাঁকে ঠাকুৰ্দাৰ ছায়া হয়ে থাকতে হত। কৃষ্ণেৰ অষ্টোত্তৰ শতনাম থেকে শুরু কৰে নানক, কবির, তুলসীদাসেৰ দোঁহা — ঠাকুৰ্দাৰ পাম্মায় পড়ে তাঁকে মুখস্থ করতে হয়েছিল।

তাৰ চেয়েও বড় কথা, উৰ্ধ্বতন সাত পুৰুষেৰ নাম, শ্ৰেণী, গোত্র — বোজ সকালে উঠে আওডাতো। এসব অত্যাচার তো আৰ কাউকে সহিতে হয়নি। তবেঃ

ওৱা তো ছবিতে বছৰে একদিন মালা দিয়েই খালাস।

আজ তিবিশ বছৰ ধৰে দাদা যে ভাৰবাহী পশুৰ মতো একা পূৰ্বপুৰুষদেব স্মৃতিৰ বোঝা বইছে, সে একবাৰ কেউ ভুলেও বলবে না। উলটে দেয়ালটা কাঁকা দেখে চোখ কপালে তুলে সবাই নাটুকে গলায় বলে উঠবে — ছবিঃ বাবাব ছবিঃ

না। সত্যিই, ব্যাপাৰটা খুবই অস্বস্তিৰ হ'বে। তাছাড়া অনন্তনাৰায়ণ জানেন, ওদেব বউদিও তখন তাৰে তালে তাল দেবেন। বলবেন আমি তখনেই বলেছিলাম, পই পই কৰে বলেছিলাম ইত্যাদি। তাতে অনন্তনাৰায়ণেৰ প্ৰেস্টিজ আৰো চিলে হয়ে যাবে।

অনন্তনাৰায়ণ বুঝলেন, এবাৰ একটা কিছু না কৰলেই নয়। আজ যখন শনিবাব, আজকেই কিছু একটা বিহিত কৰতে হ'বে। নহিলে এবপৰ খুবই দেৰি হয়ে যাবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। অনন্তনাৰায়ণ আসল কালপ্ৰিটকে চিঠি লিখতে বসলেন। 'আসল কালপ্ৰিট বলতে শঙ্কৰ। তাঁৰ এক বন্ধুপুত্ৰ। লিখলেন :

শঙ্কৰ বাবাজীবন,

তোমাৰ হয়তো মনে আছে, আজ বৎসবেক ইহঁতে চলিল তুমি এক মাসেৰ কড়াৰে আমাৰ পিতৃদেবেৰ একটা এনলাৰ্জড ফটো নিয়া গিয়াছিলে আমাকে উহা ইহঁতে একটা অয়েল পেটিং তৈৰি কৰিয়া উপহাৰ দিবে বলিয়া। তোমাৰ আবে ইচ্ছা ছিল, ওই একইসঙ্গে আমাৰ মাতৃদেবীৰ ফটোটিকেও অয়েল পেটিঙেৰে কপ দিবাৰ। কিন্তু রোগা শৰীৰে তোমাৰ নিতে কষ্ট হ'বে ভাবিয়া এবং আমাদেৰও ঘৰ দমকা হওয়াৰ ভয়ে সেদিন তোমাৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিতে পাৰি নাই। তাবপৰ বেশ কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, ওখানকাৰ কয়েকজনকে দিয়া খবৰও পাঠাইয়াছি। কিন্তু বাবা, 'আৰ আমাৰ পক্ষে তো অপেক্ষা কৰা চলে না। আগামী বৃধবাব আমাৰ বাবাৰ নৃত্যবাৰ্ষিকী। বাড়িতে লোকজন আসিবে। মঙ্গলবাব বাবেৰ মধোই ফটোটি আমাৰ চাই। তোমাৰ বাবা-মা-কে আমাৰ ভালোবাসা দিও। আৰ কি।

ইতি —

আশীৰ্বাদক

শ্ৰী অনন্তনাৰায়ণ দত্ত

চিঠিটা শেষ কৰে অনন্তনাৰায়ণেৰ মেজাজটা বেশ ভালো হ'ল। এককম হয়। অনেকদিন ধৰে কোনো কাজ কৰব কৰব ভেবে ফেলে রাখাৰ পৰ যখন সেটা কৰা হয়ে যায় তখন তাৰ একটা অদ্ভুত ভূপ্তি আছে। কাজটাৰ ফলাফল যাই হোক না কেন।

চিঠিটা লেখাৰ পৰ অম্ৰবমহলেৰ দিকে তাকিয়ে অনন্তনাৰায়ণ একটা গুৰুত্ব ভাঙলেন — 'ওগো শুনছ।'

আচল-বাঁধা চাৰিব গোছটা কাঁধেৰ ওপৰ ফেলতে ফেলতে অনন্তনাৰায়ণেৰ ষ্ট্ৰা ধৰে ঢুকলেন।

গিল্লীৰ এই চাৰিব গোছটা দেখে অনন্তনাৰায়ণ, প্ৰকাশো নথ, কিন্তু মনে মনে হাসেন। চাৰি বলতে একটা খিৰিকিৰ দৰজাৰ, একটা বাঘাঘৰেৰ, একটা সেলাইযেৰ কলেৰ টেবিলেৰ দুটো দেৱাজেৰ, একটা কাপডোপড়েৰ আলমাৰিৰ আৰ সেই সঙ্গে বৰ্হদীন আগে গত

হওয়া কয়েকটা টোপা-তালার — বাস এই হল ওর অহাবের সম্প্রদায় পাহাবাদাব। আলমাবিহ যে আখখানায় টুকিটাকি জিনিসপত্রের সঙ্গে ডুয়ারে বোজকাব খবচেব ঢাকাপয়সা থাকে, সেটাতে কোনো চাবি নেই। সব সময় খোলা। গহনাটি তো নেই। সেই বিয়েব সময় যা পেয়েছিলেন, কম নয়। তিন মেয়েকে পাব কবতেই সে-সব খবচা হয়ে গেছে। অনন্তনাবাযণ চটাস করে আরেকটা মশা মাৰলেন। এবারো সেটা নিজের কপাল চাপড়ানোব মতো দেখাল।

অনন্তনাবাযণের স্ত্রী ববাববই একটু উগ্রপন্থী। বেশ মন দিয়েই তিনি চিঠিব বযানটা শুনলেন।

এবপব দুলনেব মধোই কথোপকথনটা হল এই বকমেব

‘তেরিই বটে। তা ওব হাতুড়ি বাটালি আছে তো?’

অনন্তনাবাযণ একটু দ্বিধায় পড়লেন। শ্রেষ্ঠা ঠিক কাকে লক্ষ্য কবে বুঝতে না পেবে, বললেন, ‘আর্টিস্ট তো, কাজেই ওটা কেটে ‘আঁকিয়া’ কনাই ভালো। হ্যা, আর্টিস্টদেব আবাব বড্ড অভিমান। একটু সবে বসতে বনাব উপায় নেই।’

‘উপহার কথটা কোথা থেকে পেলেন? শঙ্কব বলেছিল তোমাকে?’

‘না মানে, কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয় সেইজনেই কাযদা কবে কথটা ভুড়ে দিলাম আব কি।’ অনন্তনারায়ণ এখানে একটু মিথোব আশ্রয় নিলেন। আসলে শঙ্কব তাঁকে ছবিটা বিনা পয়সায় ঐকে দেবে আগাগোড়া এটাই তিনি ধবে নিযোছিলেন। তাই এ বিষয়ে তাব মনে কোনো চিন্তাই ছিল না। উপহার কথটা তাব কলমেব উগায় এসে গিয়েছিল নোহাই সৌজন্যেব সূত্রে।

অনন্তনাবাযণেব স্ত্রী একটু হাসলেন। মুখে না বললেও, ভাবখানা এই — ‘তোমাকে আমি চিনি না? তোমাব যদি সেই আক্কেলই থাকবে, তাহলে এতদিনে মাথা গোজার একটা ঠাই হয়ে যেত নিজেদেব। তাহলে আব এভাবে বোজ দুবেলা বাড়িওয়ালাব লাখিবাটা খেতে হত না। পৈতৃক ভাড়াবাড়ি বলতে লজ্জা কবে না তোমাব? বাড়ি হবে হয় পৈতৃক, নয় ভাড়াটে। তা নয়, পৈতৃক ভাড়াবাড়ি। এ যেন সোনাব পাথবেব বাটি। ছিঃ!’

আব শেষটায় মুখটা একটু তেতো করে বললেন, ‘মঙ্গলবাব কত্রেব মধোই চাই। জববব লিখেছ। আমি বলি কি, চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এসে চোখ বুতে বসে থাকো। শ্বশুরবনশাহিয়েব ছবিটা আডাল থেকে উড়ে এসে ঠিক দেখাল হুড়ে বসে যাবে।

মেয়েদেব বাস্তব বুদ্ধি সত্যিই বেশি। নৈর্ব্যক্তিক ‘চাই’ লেখাটা মোটেই কাতো আসবে না। নিজের ভুল বুঝতে পেবে অনন্তনাবাযণ ‘আমার চাই’ কেটে ইলেক দিয়ে ওপবে লিখলেন, ‘এ বাড়িতে পৌছাইয়া দিবে।’ অনন্তনাবাযণেব মনে হল, ‘বাড়ি না লিখে ‘বাসা’ লেখাটাই উচিত ছিল। যাকগে মককগে, ও নিয়ে অত খুঁতখুঁত কবে লাভ নেই। এবং ওর পাশে আবেকটু জোব দিয়ে অনন্তনাবাযণ যোগ কবলেন, ‘এব অন্যথা না হয়।’

চিঠিতে অত কাটাকুটি থাকলে লেখকেব দ্বিধা বা সংশয় প্রকাশ পেতে পারে। এই আশঙ্কা করে অনন্তনাবাযণ পুরো চিঠিটা একটু না কেটে আবাব গোটা গোটা কবে লিখলেন।

তাবপব স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ‘দবজটা বন্ধ কবে দাও। আমি একটু বেবোচ্ছি। একবাব শ্যামবাজণবে যাব। ফিবতে দেঁরি হতে পাবে।’

অনন্তনাবাযণকে বাইবে বেখে দবজটা বন্ধ করাব আগে তাঁর স্ত্রী, সম্ভবত না জেনেই, হঠাৎ একটা বোমা ফাটিয়ে বসলেন।

‘শঙ্কব শুনেছিলাম নকশাল হয়ে গিয়েছিল। ছবিটিবি আঁকে ঠিক আছে। কিন্তু তোমাব সঙ্গে ও নকশা না কবে থাকলেই ভালো।’

দবজটা ভাগিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অনন্তনাবাযণ আগে থেকেই সিঁড়িব বেলিংটা শঙ কবে ধবে বেখেছিলেন। ফলে অনন্তনাবাযণেব মুখেব চেহাবায় মুহূর্তে কী পৰিবর্তন

এসেছিল তাঁর স্ত্রীৰ সেটা চোখে পড়ে নি এবং অনন্তনাৰায়ণও মাথা ঘূৰে পড়ে যাওয়াৰ হাত থেকে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই, তাঁৰ গন্তব্য সম্পর্কে অনন্তনাৰায়ণ মনস্থিৰ কৰে ফেলেছিলেন।

কালীঘাট স্টেশন বৰ্শ দূৰে নয়। টিকিট কেটে আপ ট্রেনে উঠে জনলাব ধাবে বসে তাঁৰ প্রথম কাজই হল পকেট থেকে চিঠিটা বাৰ কৰে কুটি কুটি কৰে ছিঁড়ে ফেলা।

মনে মনে তিনি হিসেব কৰে নিয়েছিলেন যে, আসা-যাওয়া নিয়ে মোট ঘণ্টাতিনেক লাগবে। তাছাড়া দেবি হওয়াৰ কথা বাড়িতে তো বলাই আছে।

স্ত্রীৰ কথা শোনাৰ পৰ থেকেই তাঁৰ ভয়টা এখন আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। ছবিটা নিয়ে আসাৰ পেছনে শঙ্কৰেবৰ সতাই কি কোনো চাল ছিল? পূৰ্বপুৰুষদেব মুছে দেওয়াৰ একটা গৃঢ় দ্বভিসন্ধি? পেছনটাকে একবাবে বৰবাদ কৰে শুধু সামনেৰ দিকে মানুষেৰ মুখ ঘূৰিয়ে দেওয়াৰ? কামপুচিয়ায় পলপতেব দল যা কৰতে চেয়েছিল? সেইজনো একই সঙ্গে বড় কৰে বাঁধানো সব ফটোই সে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? একটাৰ পৰ একটা চিন্তা স্রোতেৰ মতো বায়ে চলেছে, অনন্তনাৰায়ণ তাতে কুটোৰ মতো ভাসছে। মাঝখানে সিগনাল না পেয়ে বেশ খানিকক্ষণ আটকে পড়ায় ট্রেনটা লেট বান কৰছিল। ফলে, মাঝপথেই সন্ধে হয়ে গেল। তাৰ মানে, শঙ্কৰদেব বাড়িটা রাতিৰে খুঁজে বাৰ কৰতে একটু কষ্ট হবে। তা হোক। তাৰ চেয়েও বড় কথা, ওদেৰ বাড়িতে পৌছনো। অবশ্য কপালে যে কী নাচছে কেউ জানে না।

স্টেশনটা এসে যেতেই অনন্তনাৰায়ণ ছটপাট কৰে নেমে পড়লেন। যখন তিনি বেৰিমে যাবাৰ গেটেৰ একেবাবে মুখে, ঠিক সেই সময় ফস্ কৰে সমস্ত আলো নিভে গেল।

তীৰে এসে তবী ডুবলে যা হয়, অনন্তনাৰায়ণেৰ তখন সেই অবস্থা।

এখন উপায়? ঘুট ঘুট কৰছে অন্ধকাৰ। তাৰ ওপৰ অনন্তনাৰায়ণেৰ মনে পড়ল, আজ অমাবস্যা। লোডশেডিংব সবে শুক। কখন শেষ হবে কেউ বলতে পাৰে না। এটা তো শহবতলি। কাজেই সাবাবাত আলো না এলেও আশ্চৰ্য হওয়াৰ কিছু নাই।

অনন্তনাৰায়ণ যে অন্ধকাৰেই টুকুস টুকুস কৰে হেঁটে যাবেন তাও সম্ভব নয়। কাণণ এখনকাৰ বাস্তাঘাট তাঁৰ মোটেই সডগড নয়।

সুতৰাং পিছু হঠা ছাড়া এখন আৰ কোনো উপায় নাই। এব পৰেব ফেৰাব ট্রেন অথুনি এসে যাবে। যাতায়াতী টিবিষ্টেৰ পথসটাই যা ভলে গেল।

একেবাবে ভলে গেল না। কেননা, ফেৰাব পথে আবাৰ সেই জনলাব ধাবে বসাৰ ফলে হাওয়া লেগে হঠাৎ তাঁৰ মাথাটা খলে গেল।

আসছে বুধবাৰ তাঁৰ এক বিশেষ বন্ধু মল্লিকপুৰে আৰোগ্যভোজনেৰ নেমস্তম্ভ কৰায় বাড়িতে তানা লাগিয়ে সপৰিবাৰে তাঁকে চলে যেতে হবে। শেষ ট্রেনেৰ আগে ফেৰা যাবে না। ছেলে যদি যেতে না চায় ওব দিদিৰ বাড়িতে ও যেন খেয়ে নেয়।

নৃত্যতিথিটা কাটিয়ে দেওয়াৰ পৰ বাবাৰ ছবিৰ কথা আবাৰ ভাবা যাবে।

অনন্তনাৰায়ণেৰ স্ত্রী যা টাটা। উনি এখন বাজি হলে হয়।

একপ্রস্থ খবচ আৰ খাওয়ানো দাওয়ানোৰ হাস্যমা থেকেও বাঁচা যাবে বইকী।

তাঁৰ স্ত্রী এই টোপটা এখন গিললে হয়।

সংকেত

সোমেন চন্দ

তখনো আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই। নানাবকমের পাখি আগামী দিনেব ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে। বনগ্রামেব মবো নদীব কর্ঠম বুকো ভযানক বোড তুলিয়া কাহাদেব এক লঞ্চ তাঁবে আসিয়া ভিড়িল।

প্রথমে দেখিয়াছিল অন্ধ দশবথ। তাহাব দুই ছেলে। এক ছেলে গিয়াছে বাহিবে, আব এক ছেলে যাব বয়স অল্প — হাতেব বৈঠাটি একপাশে বাখিয়া সে তখন অন্ধ পিতাব জনা এক ভিলিম তামাক ভবিতোছিল। আব দশবথও তখন তাহাব হাতেব জালটি ওটাইয়া একটু ভিজাইবাব আশায় পশ্চিমেব প্রাযাক্কানব আকাশেব দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলেব তামাকের প্রতিক্ষা করিতোছিল। হঠাৎ কেমন একটা ওন্ ওন্ আওয়াত তাহাব কানে বাজিতো লাগিল। কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে কান পাতিয়া ওনিয়া সে ডাকিল, ‘বাম?’

দশবথ পুত্র বাম তখন তামাক ভবিতে ব্যস্ত। তাহাব কিছুই ভালো লাগিতোছে না, বাগিয়া বলিল, ‘কান?’

দশবথ বলিল, ‘কিছু হনসনি?’

বাম মুখ না তুলিয়াই বলিল, ‘না।’

দশবথ আবাব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘দাখ তো চাহিয়া, ইস্টিমাব তো — না?’

— ‘তা অইলে তুমি কিছু দেখতে পাও, না বাবা?’

বামচন্দ্রেব বিশ্বাস, তাহাব বাবা তেমন করিয়া না দেখিলেও কিছুটা নিশ্চয় দেখিতে পায়, কিন্তু দশবথ ইহা ওনিলে আব বাগ সামলইতে পারে না। এবাব হয়তো ওনিতো পায় নাই, তাই বক্ষা। কোনো উত্তব না পাইয়া আবাব সে ডাকিল, ‘বামা।’

— ‘কী।’ কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাম একবাব সেদিকে তাকাইল? দশবথেব কথা মিথ্যা নয়, সত্যই একটা ছোট জাহাজেব মতো চোখে পড়ে, এখন আওয়াত আবও স্পষ্ট —

দাকণ খুশি হইয়া সে বলিল, ‘হ, বাবা।’

— ‘দাখ আমাব কথা হাছা কিনা।’ দশবথ হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গল্প জুড়িয়া দিল? সে অনেকদিন আগেকাব কথা, বেলতলীব জমিদাব বাড়িব বড় ছেলে সদা বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই প্রথম যখন নিজ গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন আসিবাব পথে বিস্তব দর্ভোগ ভুগিয়া এত বিবক্ত হইয়াছিলেন যে তাব কিছুদিন পবেই দেখা গেল, মস্ত এক স্টীমাব ভীষণ হাঁকডাকেব সঙ্গে আশপাশের গ্রামের সমস্ত লোককে আনিয়া হাজিব করিয়াছে নদীর পারে। স্টীমাব-কোম্পানী নূতন লাইন খুলিয়াছে, তখনকাব নদী কী আব এখন আছে! দশবথ সেই দৃশ্য দেখিয়াছে তাহাব জীবনে। আজকাল কী আব সেবকম ঘটনা ঘটে। সেসব দিনেব মানুষও আজ আব নাই, তাহাদেব কীর্তিও নাই। এবং পবক্ষণেই এই অদ্ভুত খববটি শ্রীবামচন্দ্রেব মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পৰে লঞ্চৰ সিঁড়ি বাহিয়া যে লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল, তাহাব গায়ে চমৎকাৰ পাঞ্জাবি আৰু সিন্ধুৰ চাদৰ, পায়ে চকচকে পাম্প-সু, মুখে একটি সিগাৰেট আৰু মৃদু হাসি।

যাহাবা যিবিয়া দাঁড়িয়াছিল তাহাদেব কেহ দূৰে সৰিয়া দাঁড়াইল, কেহ সেখানে থাকিয়াই বুকৰ ওপৰ দুই হাত বাখিয়া এমনভাবে চাহিল, তাহাদেব মতো তাহাবাও চলিয়া যাইবে, মাৰিয়া ফেলিবে না তো আৰ। ইহাবা নবীন। যাহাবা শ্ৰীচ অথবা বৃদ্ধ তাহাবা দুবে দাঁড়িয়া হাসিল। ইহাদেব স্পৰ্ধা তো কম নয়। ব্যাপাৰ যাই হোক না কেন সবটাত্তেই একটা বাহাদুৰি দেখানো চাই। বাবু সেলাম, ইয়াসিন একটা সেলাম দিয়া বলিল। আজ জীৱনেৰ শেষ ঘণ্টাগুলি চা, চং কৰিয়া বাজিতেছে। এতকাল যে-সেলামেৰ জোৰেই সে সকলেৰ প্ৰিয় হইয়া আসিয়াছে আঃও তাহাব অন্যথা হইবে না।

বাবু সেলাম গ্ৰহণ কৰিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিলেন।

॥ ২ ॥

খবৰে যদিও জানা গেল লোকটি কোনো কাপডেব কলেব মানেজাৰ — অৰ্থাৎ একেবাৰে বড় কৰ্তা, মিলেব হুনা এখানে লোক সংগ্ৰহ কৰিতে আসিয়াছে, তবু তাহাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদেব অন্তৰ বহিল না।

শীতৰে সকল। বহমানৰ বাডি পাৰ হইয়া দুবে কাহাকে যেন দেখিয়া বলবাম পাশে সৰিয়া দাঁড়াইল। লোকটি একটু কাছে আসিলে পৰ হাসিয়া বলিল, ‘কাৰা না গো?’ ইয়াসিন বলিল, ‘হ’।

— ‘কাঁ যে হইছে, দুবেৰ থানে তোমাৰে চিনতেই পাৰি নাই। হাশে — হনছোনি? তোমাৰ যতই কও, আমাৰ কিন্তু মনটা কয় এখবৰ নিছা।’

— ‘দুবো। তোমাৰ তো হগলটাত্তেই খালি সন্দ।’ ইয়াসিন পৰম নিঃসন্দেহে অন্যদিকে চাহিয়া বহিল — এমনভাবে চাহিল যেন ইহাব পৰে আৰ দ্বিতীয় কথা নাই। সে সকলেব আগে নিজেৰ কানে যাহা শোনে, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্ৰমাণ কৰিবে, এমন হতভাগা এ অঞ্চলে কেহ নাই। ধোঁৰে ধোঁৰে সে বলিল, বাবুটি যে কোনো মিলেবই বড়বাবু, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে লোক সংগ্ৰহ কৰিতে আসিয়াছেন, একথাও মিথ্যা নহে — বলবাম তাহাব কথাৰ উপৰ বিশ্বাস স্থাপন কৰিতে পালে। তাহাব ছোটবেলায়ও যে এৰ্মনি আৰু একটা ঘটনা ঘটেছিল। সে তখন ছোট হঠাৎ এৰ্মনি একদিন কোথা হইতে এক বাবু আসিয়া সাৰাটা গা তেলপাড কৰিয়া তুলিল।

ইতিমধ্যে আকবৰ আলী আসিয়া তাহাব কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। তাহাব হাতে একটি আমেৰ কচি ডাল, সেটা দাঁত দিয়া চিৰাইতে চিৰাইতে সে মাথা নাড়িতে লাগিল। ফিক কৰিয়া কিছু থুথু ফেলিয়া বলিল, ‘লড়াইয়েব খবৰ রাখনি, ইয়াসিন! মিঞা? হেইব নেইগা ফাঁকি দিয়া লোক লিবাৰ আইছে, জান?’

আবো দুই একজন আসিয়া জুটিয়াছিল। এমন একটি কথা শুনিয়া তাহাব সকলো বিষয়ে আৰ ভয়ে তাহাব দিকে চাহিয়া বহিল। কিন্তু সকলে আকবৰেৰ দিকে আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া ইয়াসিন রাগিয়া উঠিল। হঠাৎ নিজের বড়ো আঙুলটি তাহাব চোখেৰ সামকো ধৰিয়া বলিল, ‘তুমি এইটা জানো।’ আকবৰ আলী গম্ভীৰ ভাবে বলিল, ‘তোমাৰ কুন ডব নাই, হাবা বড়ো মানুহগো নিব না।’

কগড়া ব্ৰমেই বাড়িয়া চলিল। আৰও বাড়িত। কিন্তু কে একজন বলিল, ‘বাচ্চা মৌলবী।’

সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল, ঝগড়া কিছুক্ষণের জন্য থামিল — এই আশায় যে, বাচ্চা মৌলবীই ইহাব মীমাংসা করিতে পারিবে।

বাচ্চা মৌলবী বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, তার একমাত্র কাৰণ এই যে তাহার বয়স অত্যন্ত অল্প এবং এই বয়সেই সে মৌলবী হইয়াছে। সে পাশেব গ্রামেই থাকে এবং মাঝে মাঝে কোনো পত্রিকা হাতে করিয়া আসিয়া বেলা দুইটা-আড়াইটা অবধি এ অঞ্চলের সকলকে যুদ্ধেব খবর শুনাইয়া যায়। শহরের খবর তাহার কাছে আবিদিত নাই, মাসেব মধ্যে পনেরো দিনই তো সে সেখানে কাটায়। এ কথা সবাই জানে, নবাবের সঙ্গে বসিয়া সে খানা খাইয়াছে এবং নবাব সাহেব তাহার হাতে চুমা খাইয়াছেন।

বাচ্চা মৌলবীর পবনে পাঞ্জাবি আব লুঙ্গি, গোর্ফ এখনও ভালো করিয়া উঠে নাই, হাতে একটা ঘড়ি। কিন্তু ঘড়িটা কখন চলিতে শুরুর করে, আব কখন থামে এ খবর কেউ বাখে না। ঘড়িটা একবার চোখের সামনে ধরিয়া এই শীতের সকালেও পত্রিকা দিয়া বাতাস খাইতে খাইতে মৌলবী শুদ্ধ ভাষায় বলিল, ‘ওনারে আমি চিনি’। এই বলিয়া মানোজাবাবুব সঙ্গে তাহার এক সুদীর্ঘ পরিচয়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিল, ‘তাইন লোক নিতে আইছে ঠিকই। বহমান, তোমাব ঘরে তো ঠাঁত আছে, তোমাবের নিবে আগো।’

বহমান এতক্ষণ চুপ করিয়া গুনিতেছিল, মৌলবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল। নতুন বিবাহ করিয়াছে সে, তেলে আব জলে চুলগুলি চমৎকার পরিপাটি, চোখে সুবন্দা, পবনে জামা আব লুঙ্গি — বড়ো।

বেলা হইয়া যাইতেছিল। মৌলবীর সময় নাই, একবার সূর্যের দিকে এবং আব একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে বলিল, ‘দশটা বাইজ্যা গেছে, আমি যাই, কাজ আছে, আমার একটা চৌধুরী বাড়ি যাইতে হইব।’

আকবর আলী এবু কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু মৌলবীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পাশে গিয়া ফিক করিয়া থুথু ফেলিয়া বলিল, ‘মৌলবী!’

মৌলবী পাশে তাকিল।

আকবর আলী বলিল, ‘আমাব একটা কথা বাখবা তুমি?’

— ‘ক’?

— ‘আমাব ভাই-এব লেইগা একটা কইয়া দিবা তুমি —’

মৌলবী পরিদ্রাব ভাষায় বলিল, ‘দিব, দিব।’ বলিয়া তব্ তব্ করিয়া চলিয়া গেল।

শত আনন্দ হইলেও হাসিয়া কখনো আনন্দ প্রকাশ করে না ইয়াসিন। সকলের দিকে একবার তাকিয়া সে বলিল, ‘অহনও বিশ্বাস অয় না?’

বলবাম আগে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও ইতিমধ্যে আবাব বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইয়াসিনের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল, ‘কাকাগো, তোমাব কাছেই আইছিলাম, একটা আনাপ করম।’ মণ্ডল-পুএ কিসেব পবামর্শ চাহিতে আসিয়াছে কে জানে। ইয়াসিন হাসিল।

॥ ৩ ॥

বিকালেব রৌদ্রে চানদিক ঝলমল করিতেছে। গাছের ছাবাব নীচে একটা চেযাবে বসিয়া ন্যানেজাবাবুব নুদু নুদু হাসিয়া বলিলেন, ‘হ্যাঁ তোমাদের গা-টি বেশ ভালো লেগেছে। তোমরাই দেশেব গৌবব। ফের্মিন হবাব আগে সাবা ভারতের কম্পড যোগাতে তোমরাই। এমনকি বিদেশেও ছড়িয়ে দিতে, অথচ আজ শুকিয়ে মরছ। তোমাদের কদর কতনা বোঝো?’ নদাব

দিকে আঙুল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, 'সেখানেও এমনি নদীর হাওয়া, নদীব একেবারে পাব
যেঁমৈই চমৎকাব ব্যারাক সেখানে, তোমবা থাকবে। হাতের কাছে হাসপাতাল, খেলাব মাঠ,
সিনেমা, যখন যা খুশি।' — মানোজারবাবু মৃদু হাসিলেন।

বহমান নাম লিখাইয়া ফেলিল। আজই রাত বাবোটার সময় লঞ্চে উঠিতে হইবে।

বাড়ি ফিৰিলে তাহাব বুড়া বাপ ঈঁকাটি ছেলের হাতে দিয়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি খাওন-
দাওন সাঁইরা শুইয়া পড, বাবোটা বাজলে পব আমি ডাইকা দিমুনে, যাও শুইয়া পড গিয়া।'

বহমান পিতৃআজ্ঞা যথারীতি পালন করিল।

তাড়াতাড়ি খাইয়া-দাইয়া শুইতে আব দেব কবিল না।

কিন্তু বাত বাবোটা বাজিতে আর কতক্ষণ লাগে? বুড়া রহমানের ঘবেব দরজাব কাছে
গিয়া ডাকিল, 'বাপ, সময় হইয়া গেছে, আলা ওঠ।

কোনো উত্তর আসিল না, বা কেউ বাহির হইয়া আসিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা
কবিয়া বুড়া মনে মনে হাসিল, নিজেব মৃত স্ত্রীব কথা মনে পড়িল।

অথচ এদিকে বাবোটা বাজিয়া যাইতেছে। বুড়া আবাব ডাকিল, 'রহমান ওঠ, ইন্টিমাব
ছাইডা দিতে আব কতক্ষণ।' এই বলিয়া নিজেব ঘবেব দাওয়ায আসিয়া আবাব তামাক
সাজিতে বসিল। কিছুক্ষণ এমনি কাটিবাব পরও বহমানকে আসিতে না দেখিয়া ঈঁকা হাতে
বুড়া আবাব বাড়িব ভিতবে গিয়া দেখিল, দাওয়ায় খুটি চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকাবে নিঃশব্দে
বহমান বসিয়া আছে।

ঈঁকাটি তাহাব হাতে দিয়া বুড়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া লও বাপ, আব দেবি
কইবো না।'

বহমান তের্মনি খুটি ধবিয়া বসিয়া বহিল।

এক হাতে একটি বন্ধ পূবনো লণ্ঠন, আব এক হাতে একটি প্রকাণ্ড চক্চকে লাঠি লইয়া
পথ দেখাইয়া চলিল বুড়া। বাস্তায় সাপ বা মানুষের ভয় থাক বা নাই থাক, এ দুটিকে ছাড়া
সে কখনো পথ চলিতে পাবে না। ধীবে ধীবে চলিতে চলিতে সে বলিল, 'হেইখান গিয়া চিঠি
দিও, তা না হইলে চিন্তায় থাকু।' •

বহমান আস্তে বলিল, 'আইচ্ছা।'

গোলাম আলীব বাড়ি পাব হইলেই একটা মস্ত বকুল গাছেব নীচ দিয়া হাটিতে হয়।
সেখানে বকুল ফুলেব গন্ধে চারিদিক ভবিয়া থাকে। সেই গাছেব নীচ দিয়া চলিতে চলিতে
বহমানের শবীব অবশ হইয়া আসিল, ঘুমে ভবা চোখ বুজিয়া আসিল, সে অনুভব কবিল
এখনও যেন সে কাবও ফুলেব মতো বৃকে মুখ বাখিয়া গভীর নিঃশ্বাস ফেলিতেছে।

ঠক্ ঠক্ কবিয়া এখানে লাঠি ফেলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বুড়া আবাব ডাকিল, 'বাপ!'

— 'কও?' কিন্তু কিছুক্ষণ কান পাতিয়া থাকিয়াও রহমান আব কোনো কথাই শুনিতে
পাইল না। বোধহয় যা বলিতে হইবে সব ভুলিয়া গিয়াছে বুড়া।

একটু পরেই লঞ্চেব আলো দেখা গেল। আশেপাশে অনেক লোক ভিড কবিয়া দাঁড়াইয়া
আছে। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে গল্প করিতেছে। কেহ সিঁড়ি বাহিয়া লঞ্চে উঠিবাব চেষ্টা কবিত্তেছে।
সব মিলিয়া একটা মস্ত হুন্না।

একটু নির্জনতায় ছেলেকে টানিয়া বুড়া আবাব বলিল, 'বাপ!'

— 'কও?'

— 'একটা কথা কমু। এত বুড়া হইয়া গোলাম, তুমি আমাবে ছাড়া কোনোখানে
কোনোখানে যাও নাই, কিন্তু আইজ ছাইড়া গেলা, আমাব মনটােব কী দিয়া বাফুন, তুমিই

কণ্ঠে বৃদ্ধা অনেক কষ্টে তাহার সবগুলি কথা এতক্ষণে বলিয়া ফেলিল এবং ঝব্ ঝব্ কবিতা কাদিয়া ফেলিল। এমন দশোব সঙ্গে বহমানের এই প্রথম পবিচয়, সে কী-যে কবিতা কবিতা পাইল না।

নদীৰ উপরেব ঠাণ্ডা বাতাসে লঠনের ক্ষীণ আলো কাঁপিতেছে। চাৰিদিকে জলের গন্ধ। আকাশে অজ্ঞান তাবা। পাশেই আগামী কোনো সুখের সৌভাগ্যে বিহ্বল লোকজনের হুহু। বৃদ্ধাৰ শীৰ্ণ হাতের লাঠিখানাও ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

অনেকক্ষণ পবে বহমান উপবে উঠিয়া দেখিল, সেই বাচ্চা মৌলবী সাবা লক্ষ্যময় চৰকাৰীজিব মতো ঘূৰিয়া বেড়াইতেছে। লোকটা এমনি পাতলা ছোটখাটো মানুষ, যেন হাওয়াৰ সঙ্গে উড়িয়া চলে, এক মিনিটে হাজাৰ মাইল অতিক্রম কৰে।

বহমানকে দেখিবাি ঘড়ি দেখিয়া সে এদিক-সেদিক তাহাৰ চঞ্চল দৃষ্টি বুলাইয়া তব তর কবিতা বলিল, 'এতক্ষণে আইছ। টাইম অইয়া গেছে।'

মৌলবী টাইম ধৰিয়া চলে। আবাব ঘড়ি দেখিয়া সে সামনের দিকে অগ্রসৰ হইল।

বৌলি ধৰিয়া বহমান একা দৌড়াইয়া বহিল।

কয়েকহাত নীচেই তাহাদের গ্রামের নদী, আজ ছাড়িয়া যাইতেছে, বলিয়া অত্যন্ত আপনাব বলিয়া মনে হয়। নদীৰ জলে লক্ষ্যৰ আলো পড়িয়া চিক্‌মিক্ কবিতা, লক্ষ্যৰ ভিতৰেব মানুষগুলিৰ আনন্দ ছায়াও সেখানে দেখা যায়, আনন্দকাৰেব বৃক্কে কেবল আবো কতকগুলি গভীৰ আনন্দকাৰেব মতো মনে হয়। আব তাহাদের আত্মীয়-স্বজনৰা — তাহাৰাও লঠনহাতে বিদায়েব প্রার্থনায় কাঁতৰ।

বহমানের চোখেব পাতা বুজিয়া আসিল। সে দেখিল, নদীৰ জলে কে এক নাবীমূৰ্তি, নাকেব চোখেব জলে এক হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে। তাহাৰ নাকেব উগায় ঘান, ঘৰ্মন্ত সমস্ত শব্দাবটিকে বহমান কাকিয়া দেখিল। তাহাৰ গায়ে এখনও সেই মেয়েটিব ঘামেব গন্ধ। আবও নিবিড় হইয়া সে সেই গন্ধ শুকিতে লাগিল।

ঘূমে তাহাৰ চোখ হুড়াইয়া আসিল।

কোনোরকমে একটা জায়গা করিয়া ছোট পুঁটলিখানা মাথাৰ নীচে বাধিয়া সে শুইয়া পড়িল। একটু পবেই সে স্বপ্ন দেখিল। আকাশে ঝড়ের পূৰ্বাভাস, এখন ভয়ানক বাতাস ছাড়িয়াছে, দীৰ্ঘ সুপাৰি আব নাবিকেজ গাছেব মাথায় ভীষণ মাতামাতিতে নদীৰ জলে দুবন্ত ঢেউ, বড় বড় ধান গাছেব শিষগুলি ঝড়গায় কাঁপিতেছে, আকাশে পাখিৰ কলবব, বহমান যেন গুনিতে পাইল, তাহাদের গোয়াল ঘৰেব গোকগুলি 'মা' 'মা' কবিতা কাতবস্ববে ডাকিতেছে। মনে হয় এমন করিয়া যেন তাহাৰা আব কোনদিনও ডাকে নাই। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া সে দেখিল, তাহাৰ গোক নয় তো — তাহাৰ বৌ, আর গোয়াল ঘবটা আসলে গোয়াল ঘব নয় তো, তাহাৰ শোবাৰ ঘব। বৌ তাহাকে দেখিয়া কাদিয়া ফেলিল, গলা জুড়াইয়া ধবিল, বৃক্কেব মাঝখানে তাহাৰ হাতকে টানিয়া বলিল, 'এই দ্যাখো, এহান কেন্নন বাথা। তোমাৰে ছাইড়া আমি থাকতে পাকম না বন্ধু, মইবা যান্নু।' একটু পবে বহমান টেব পাইল, তাহাৰ দুইটি পা আরও দুইটি পায়েব সঙ্গে সুতাৰ মতো হইয়া গিয়াছে।

— 'বহমান ও বহমান?'

বহমান ধড়মড় কবিতা জাগিয়া উঠিল, ভালো করিয়া চাহিবাৰ চেষ্টা কবিতা বলিল, 'কে? আজু?'

মৌলবী তাহাৰ বৌ-ব নাম জানিত, হাসিয়া বলিল, 'না, আমি তোমাৰ বৌ না, আমি মৌলবী।' বহমান চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, 'ও!'

কিন্তু মৌলবী কাজের লোক, তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ভোব অইয়া আইছে, আর কত ঘুমাইবা?'

রহমান বাহিবের দিকে চাইয়া দেখিল, সেখানে অনেক অন্ধকাবের সাবি এখনও ঠেলাঠেলি করিয়া মরিতেছে।

মানোজারবাবুব কামরায় আলো দেখা যায়।

মৌলবী গল্প কবিত্তে লাগিল, তাহার অভিজ্ঞতাৰ ইতিহাস বলিয়া যাইতে লাগিল — জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহমান কেবল হাঁ কবিয়া শুনি।

মৌলবী অনেক গল্প কবিল।

কিন্তু ভোর আব হয় না, তাহাবা উঠিয়া এধার-ওধার অনেক ঘুরিল। দুই একজনকে জাগাইয়া গল্প কবিল। ঘট্টা দুই চলিয়া গেল। তবু ভোব আব হয় না, বাহিবে তেমনি অন্ধকাব, গভীর বাত্রির নিস্তদ্ধতা, কেবল জলের শব্দ।

মৌলবীর ঘড়িব কাঁটা কখন চলিতে শুরু কবে, আর কখন গিয়া থাকে, সে তথা রহমান আজও জানিতে পাবিল না, কেবল হাঁ কবিয়া চাইয়া বহিল।

আবার সে একা-একা কিছুক্ষণ ঘুঁরিয়া বেড়াইল, লঞ্চেব এটা-ওটা উঁকঝুকি মানিয়া কতক্ষণ দেখিল, শেষে হাত পা ওটাইয়া বৌ-এব কথা ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পবে ভোব হইল। এখন মস্তবড় নদী, ওপাবেব সীমানা কুয়াশায় ভবা, সূর্যেব আলোয় জলের উপব কেহ কতকগুলি চক্চকে নূতন টাকা ছড়াইয়া বাখিয়াছে মনে হয়। নদীৰ দুইপাশে মাঝে-মাঝে ইটেব খোলা, পাটেব ওদাম।

দূৰে মিলেব চিমনি দেখা গেল। কিন্তু ধোঁয়াব চিহ্ন নাই। কোথা হইতে আসিয়া আবার মৌলবী দেখা দিল। কোনো নূতন খবব সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়। বলিল, 'আমবা আইসা পড়ছি।'

॥ ৪ ॥

সকলেব মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাবা তাহাদেব কর্মস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। সকলে সামনেব দিকে ছুটিয়া আসিল। ঐ যে কী একটা গদুজের মতো, ওটাই কি তাদের মিল? মৌলবী তাদের বুঝাইয়া দিতে লাগিল। সে সবই জানে। সকলে বিস্ময়ে আব আনন্দে এমন একটা জিনিসেব প্রতি চাইয়া রহিল।

পৌছিতে বেশী দেব হইল না। ধীবে ধীবে লঞ্চেব গতি মন্থৰ হইয়া আসিল, এখন পাড়ে ভিড়বে। মানোজারবাবু আসিয়া দেখা দিলেন। কেমন একটা সফলতাৰ আনন্দে তাহার সাবামুখ উজ্জ্বল। সকলে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। দুই হাত ছাড়িলে যদি চলে, সেখানে পাঁচ হাত সবিয়া পাঁড়াইল।

কিন্তু তখনও লঞ্চটা পারে একেবাবে ভিড়ে নাই, ধীবে ধীবে যেন একটা ভীষণ বন্ধবব, সহস্র কণ্ঠেব মিলিত টাংকাব ধ্বনি সকলের কানে আসিয়া বাজিল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, মিল দেখাব আনন্দে একেবাবে ভাড়িয়া না পড়িয়া রহমান আগেই কিছুটা লক্ষ্য কবিয়াছিল, এখন সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া শব্দটা আবও লক্ষ্য কবিত্তে চেষ্টা কবিল। মৌলবীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নাই, সে নিতান্তই নির্বিকারভাবে মানোজারবাবুর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ব্যাপাবটা সকলেব আগে বুঝিবাব আশায় তাঁহার মুখেব দিকে চাইয়া বহিয়াছে। কিন্তু মানোজারবাবুব মুখ হঠাৎ স্নান হইয়া গিয়াছে, মুখেব সেই নৃদুন্দ হাসি আর নাই। লঞ্চ-চালকদের কী একটা নির্দেশ দিতে তিনি তাড়াতাড়ি ভিতবে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই যা দেখা গেল, তা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। নদীৰ পাৰেই প্রকাণ্ড চৰ, ধু-ধু কৰে বালু। তাৰপৰে মিলেৰ সীমানা। সেই ভীষণ গোলমাল আৰও ভীষণ হওযাৰ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চৰটা মুহূর্তে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভৰিয়া গেল। সেই লোকওলি প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিতেছে— প্রাণ যাৰ কী বাঁচে। ব্যাপার দেখিয়া বহমানের চোখে বিশ্বাসেৰ অন্ত নাই— যেন একটা প্রকাণ্ড নদীৰ মুখ হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহাৰ সমস্ত জল বিপুল বেগে সারাটা পৃথিবী ভাসাইয়া লইল। রহমানের বুক কাঁপিতে লাগিল, নিঃশ্বাস দ্রুত হইয়া আসিয়াছে।

লোকওলিৰ কতক ছুডমুড় কৰিয়া জলে নামিয়া পড়িল, লক্ষটাকে একেবাৰে খিৰিয়া ফেলিল। আৰ বেষীৰ ভাগই দাঁড়াইয়া বহিল পাৰে। কিন্তু সকলেৰ মধোই ভয়ানক চঞ্চলতা, কেহ হাত নাড়িয়া কিছু বলিতেছে, কেহ কেবলই চাঁৎকাৰ কৰিতেছে, সকলেৰ মুখে-চোখে কাৰ্যকলাপে এমন একটা ভাব যেন এখনই পাবিলে লক্ষটাকে ডুবাইয়া দেয়। আৰ কী গোলমাল। আকাশকেও ফটিয়া চৌচিৰ কৰিয়া দিবে মনে হয়। এমন দৃশ্য বাগান্ধিত পদক্ষেপে তাহাদেৰ পায়েৰ নাচেৰ ভূমিখণ্ড মুহূর্তে ধ্বসিয়া যাইবে যেন, তাহাদেৰ চাঁৎকাৰ ধ্বনিতে নদীৰ জলও উল্লাস হইয়া উঠিল।

কিন্তু বহমান লক্ষা কৰিয়া দেখিল, একেবাৰে সামনে একটা লোকের মধো পেছনের সকলেৰ শক্তি যেন একত্ৰিত হইয়াছে। লোকটাৰ বয়স অল্প, চেহাৰা এই হাজাৰ হাজাৰ লোকের মধো একটা পার্থক্য ধৰা পড়ে। সে হাত নাড়িয়া ভয়ানক চাঁৎকাৰ কৰিয়া কি যেন বলিতেছিল। প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই শোনা যায় নাই, কিন্তু শেষে গোলমাল আপনাই কমিয়া আসিল। বহমান আশ্চৰ্য হইয়া গুলিল, লোকটা দৃশ্যৰে বলিতেছে : ‘বন্ধগণ, আমাদেৰ দেখে আশ্চৰ্য হবেন না। আমবা এই মিলেৰই শ্রমিক, আপনাৰা যেখানে কাজ কৰতে এসেছেন আমবা সেইখানেই প্রথম কাজ কৰতে আসি। আমরা জানি আপনাদেৰ গুৰু চাকৰিৰ কথা বলেই আনা হয়েছে, আসল কথা বলা হয়নি। এই চাকৰিৰ ভেতৰ কী বহসা তা আপনাদেৰ কাছে গোপন কৰা হয়েছে। বন্ধগণ, আমাদেৰ কথা আপনাৰা একটাবাৰ শুনুন, আমাদেৰ বিশ্বাস কৰুন। যাৰা আপনাদেৰ চাকৰিৰ দেবে বলে নিয়ে এসেছে তাৰেৰ আপনাৰা চেনেন না, কিন্তু আমবা চিনি। আমবা তাৰেৰ কাছে গুৰু আমাদেৰ অভাৱ অভিযোগেৰ কথা জানাতে গিয়েছিলাম, আমাদেৰ সামান্য কয়েকটা মাত্ৰ দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাৰা গ্রাহ্যই কৰে নি। তাৰা আমাদেৰ মুখেৰ ওপৰ লাথি মেৰেছে। কিন্তু আমবা কেন তা সহ্য কৰব? আমবা স্থাইক কৰেছি, মিলেৰ কাজ বন্ধ। আমবা তাৰ প্ৰতিবাদ জানিয়েছি।

আমাদেৰ এই শক্তিকে পিষে ফেলবাৰ জনো, আমাদেৰ মুখেৰ ভাত কেড়ে নেওযাৰ জনো তাৰা মিথো কথা বলে আপনাদেৰ এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আপনাৰা তাৰেৰ বিশ্বাস কৰবেন না। ভাই সব। আপনাদেৰ চোখে পৃথিবী যেমন, আমাদেৰ কাছেও তাই। আপনাদেৰ যতখানি শোষণ, দুঃখ-দুৰ্দশাৰ কষ্ট সহ্য কৰে চলতে হয়, আমাদেৰও তাই। আমাদেৰ ঘৰ নেই, বাড়ি নেই, আজ এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে কাল কোথাও দাঁড়াবাৰ জায়গাটুকু পৰ্যন্ত নেই। আমাব চাৰী ভাইৰা, দোহাই আপনাদেৰ, ভাই হয়ে ভাই-এৰ মুখেৰ ভাত এমন কৰে কেড়ে নেবেন না। একথা মনে বাখবেন, আজ যাৰা আমাদেৰ লাথি মেৰে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তাৰা আপনাদেৰও সেই লাথি থেকে বেহাই দেবে না। বন্ধগণ, আমবা আপনাদেৰ ভাই, ভাই-এৰ কথা একটাবাৰ মন দিয়ে শুনুন, ভাই-এৰ কথা বিশ্বাস কৰুন — আপনাৰা এ কাজে যোগ দেবেন না, দোহাই আপনাদেৰ, যুয লোক আজ আপনাদেৰ ভাই-এৰ মুখেৰ ভাত কেড়ে নিচ্ছে, তাৰ উল্লাসকে আৰ বাড়াবেন না।

বহমান স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহাব মনেব ভিত্তব সব গোলমাল হইয়া গেল, সে আব কিছুই ভাবিতে পাবে না।

মানেকজবাববর মুখে সেই হাসি আর নাই। রাগে অগ্নিমূর্তি হইয়া তিনি বলিলেন, সিঁড়ি ফ্যালো, সিঁড়ি ফ্যালো।

মৌলবী হাসিমুখে ঘূবিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বুঝাইল — ও কিছু নয়, একটা চাকরি খালি হইলে পঞ্চাশটা লোক আসিয়া যেমন পাঁড়ায়, ইহাৰাও তেমন, পঞ্চাশটা চাকরি খালি হইয়াছে তো পঞ্চাশ হাজাব লোক আসিয়া হাজিব হইয়াছে। জোব কবিয়াই লইবে আব কী, যেন মগেব মুহুক। যেন মামাব বাড়িব আন্দাব। প্রিয়নাথ, শ্রীপতি, বাদশা মিঞা, চাঁদ মিঞা এবং আবও অনেকে মৌলবীৰ কথায সায দিল, চবেব উপব বিপুল জনতার দিকে আঙুল দেখাইয়া বোকাব মতো তাহাবা হাসিতে লাগিল।

ওদিকে সিঁড়ি পড়িয়াছে। একজন দুইজন কবিয়া সকলে নামিতেছে। সকলেব শেষে নামিল বহমান। নামিয়াই সে আশেপাশে চাহিয়া দেখিল, তাহাদেব গ্রামেব কেহ তাহাব পাশে নাই, সকলে জনতাব সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সে একা একা ঘূবিতে লাগিল, একবাব গেল উপবেব দিকে। এখন জনতা আব সেই বকম ভ্রমট বাঁধযা নাই, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

একজন তাহাব জমা ধবিয়া টানিল — বলিল, ‘শুনুন।’

রহমান দেখিল তাহাকে যে জমা ধবিয়া টানিতেছে সে নিতান্ত অল্প বযসেব একটি ছেলে। বযসে ষোল-সত্বেবাব বেশী হইবে না।

মুখেব বঙ বেশ ফর্সা কিন্তু বোদে লাল ঘর্মন্ত। মাথায় বড় বড় চুল — অবিদ্যাস্ত, সাটেব বুকেব বোতাম খোলা, ফর্সা বুক আব গলা বেশ চোখে পড়ে। ছেলেটি চমৎকাব মিষ্টি গলায বলিল, ‘আপনাব বাড়ি কোথায় ভাই?’

বহমান বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বহিল। ছেলেটি আবাব বলিল, ‘বলুন না, আপনাব বাড়ি কোথায়?’ বহমান এবাব বলিল, ‘বনগাঁ।’

— ‘বনগাঁ বাঃ, চমৎকাব নামটি তো। আচ্ছা, সেটা এখান থেকে কতদূর হবে?’

বহমান হিসাব কবিয়া বলিল কতদূর হইবে।

ছেলেটি বলিল, ‘এখানে এই এলেন, না? এখানে কেন এসেছেন? এমনি বেড়াতে — না?’

তাহাব এই অনুসন্ধিৎসায় বহমান প্রথমে একটু বিবাক্ত বোধ কবিল, কিন্তু তাহাব মুখেব দিকে চাহিয়া আর মিষ্টি কথা শুনিয়া তাহা ভুলিয়া গেল। বলিল, ‘এহান কাজ কবতে আইছি।’

— ‘ও!’ ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া একটু পরে বলিল, — ‘কিন্তু কাজ যাবা এখন করছে তাদের উপায় হবে কী? ব্যাপাব কি হয়েছে জানেন? এদেব কোনো দোষ নেই তবু এদেব তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদেব সে জায়গায় বসানো হবে। যাব আব কোনো উপায় নেই এমন একজনের ভাত মারতে আপনাব ইচ্ছে হয়?’

বহমান কিছু বলিল না।

— ‘বলুন না ইচ্ছে হয় কিনা?’

রহমান তবু কিছু বলিল না। ছেলেটি বলিল, ‘মনে কববেন না, আপনিও চিবকালই ওদেব সুনজবে থাকতে পাববেন, আপনাকেও এমনি একদিন তাড়িয়ে দেবে।’ — এই বলিয়া একটু হাসিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

বহমানের ইচ্ছা হইল তাহাকে একটি বিড়ি খাওয়াইয়া দেয়, কিন্তু ছেলেটি তখন চলিয়া গিয়াছে।

বৌদ্রেব তেজ ক্রমেই বাড়িতেছে। বালুব চর চিক্চিক্ করে। নদীৰ হাওয়া বৌদ্রেব মতেই তীব্র।

বহমান এদিক সেদিক ঘূৰিয়া একবাব উপবেব দিকে গেল, দেখিল গেটেব কাছে কয়েকটি লোক হাত ধৰাধৰি কৰিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অৰ্থাৎ কাহাকেও যাইতে দিবে না, এই মতলব। একটু দূৰে তাহাদেব গ্ৰামেৰ কয়েকজন হাত ওটাৰিয়া জটলা কৰিতেছে। বহমান তাহাদেব সঙ্গে জুটিল। সেই জটলায় বাদশা মিঞাই প্রধান বক্তা। তাহাকে দেখিয়া সে এক পলক হাসিয়া বলিল, ‘বহমানাবে হাৱে তো যাইতেই দিব না, মনডা কয়।’

বহমান হাসিল। একটু পৰে কি মনে কৰিয়া হঠাৎ বলিল, ‘আইচ্ছা, বাদশা মিঞা ---’

— ‘কও?’

— ‘হাবা ভেগব কইবা গেলে কী কবত?’

বাদশা মিঞা সমসায় পড়িল। সে এমন ব্যাপাবেব কথা আবও শুনিয়াছে বটে কিন্তু ইহাব পৰবেব ঘটনা আব জানে না। আমতা আমতা কৰিয়া বলিল, ‘কী কবত আবাব। ধইবা মাইব দিত।’

বাদশা মিঞা অকূলে কূল পাইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ‘হ, মাইব দিত। ঠিক, ঠিক।’

সূতবাং স্থিৰ হইল, ওখানে ভেব কৰিয়া ঢুকিলে উহাবা খুব কৰিয়া মাৰ দিবে।

কিছু পৰে মৌলবী আসিয়া বলিল, সামনেব আব একটা গেটে তাহাদেব যাইতে হইবে। সেখানে সকলেই আছে, ওধু তাহাবাই কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছে?

সকলে তাড়াতাড়ি মৌলবীকে অনুসৰণ কৰিল।

সেই গেটেব কাছে গিয়া দেখিল সেখানেও কয়েকটি লোক তেমনি হাত ধৰাধৰি কৰিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বাদশা মিঞাব মেজাজটা খাবাপ হইয়া গেল।

যেখানেই যাই সেখানেই ইহাবা জোঁকেব মতো লাগিয়া থাকে কেন। মৌলবী তুড়ি মাৰিয়া বলিল, ‘ভাই, তোমবা হালে আস।’

এই বিপদেব সময় ভাগিাস মৌলবীৰ মতো মানুষ সঙ্গে ছিল। তা না হইলে কী যে উপায় হইত কে জানে। সকলে দল বাঁধিয়া সামনেব দিকে গেল কিন্তু ততক্ষণে সেই লোকগুলি সাবা গেট জুড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

এ আবার কোন কাযদা? বাদশা মিঞা আশ্চৰ্য হইল। মাৰ দিবে না তো। ব্যাপাব দেখিয়া বহমান দূৰে সৰিয়া আসিল, তাহাব সঙ্গে আবও কয়েকজন আসিল। মৌলবী আব শেষ পৰ্যন্ত যাইতে পাৰিল না।

এইভাবে আবও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সূৰ্য এখন মাথাব উপৰ উঠিয়াছে। চাৰিদিকে তেমনি গোলমাল। এই সমসাব কখন যে শেষ হইবে, বহমান ভাবিয়া কূল পায় না।

এদিক-ওদিক দৌড়াইয়া, এ-গেট ও-গেট কৰিয়া তাহাব ক্ষুধা পাইয়া গিয়াছিল। একটা ছোট পুৰ্টিলিতে বৌ কিছু মুড়ি-চিড়া আব ওড বাঁধিয়া দিয়াছিল। বহমান আব একজনকে লইয়া একটু নিৰ্জনে গিয়া পুৰ্টিলি খুলিয়া বসিল। খাওয়া শেষ হইলে নদীতে গিয়া হাত ধুইয়া আসিল। এখন একটা বিড়ি না খাইলে চলে না। কিছু দূৰে একটা দোকানে গিয়া এক পয়সাব বিড়ি সে কিনিল। কিন্তু একটা মুখে দিতেই আব একজন সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। এক মুহূৰ্তে এক পয়সাব বিড়ি শেষ হইয়া গেল। বহমান নূতন বিবাহ কৰিয়াছে, সে এমনি দিয়া থুইয়া খাইবে না তো কে খাইবে।

হাজার হাজার লোকের এমন বিপুল সমাবেশ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বিড়ি খাইতে খাইতে রহমান যতই ভাবিতে লাগিল ততই আশ্চর্য হইতে লাগিল।

ক্রমে বিকাল হইতে লাগিল। রৌদ্রে, অনাহারে, দৌড়াদৌড়িতে, চিন্তায় প্রত্যেকেই যেন এখন এক-একটি ভূতের মতো দেখিতে। এমন সময় আবার মৌলবাব ডাক আসিল। সে তাড়াতাড়ি আসিয়া জানাইয়া গেল যে তাহাদের এখন ঢুকিতে হইবে। আব দেরি করিলে চলিবে না, অনেক সময় পাব হইয়া গিয়াছে।

সকলে দৌড়াইয়া গিয়া আর একটা গেটের কাছে গিয়া জড়ো হইল। গোলমাল আবও বাড়িয়া গেল। আকাশ বিদীর্ণ কবিতা নানারকম ধ্বনি উঠিল। কান ফাটাইয়া ফেলিবে আব কী। বহমান সকলের পিছনে ছিল, একেবারে সামনের দৃশ্য দেখিতে পায় নাই। পবে টের পাইল। তাহাব সামনের লোকগুলি অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সে এখন একা, পাশে চাহিয়া দেখিল — আরে সেই ছেলেটি, কী একটা উত্তেজনায় তাহাব মুখ লাল, চুলগুলি এলোমেলো, প্রাণপণে সে চীৎকার করিতেছে। রহমান বুঝিতে পারিল না সেই ভাষাব অর্থ। সামনের দিকে চাহিয়া দেখিল, আশ্চর্য, এবার গেট জুড়িয়া শুইয়া কয়েকটি লোক। আর তাহাদের পা দিয়া মাড়াইয়া ভিতবে চলিয়া গেল মৌলবী, আব তাহাব পেছনে আবও কয়েকজন। রহমান নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, লোকগুলিব দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সে।

এমন হুন্মা সে জীবনেও শোনে নাই। কান ফাটিয়া গেলেও কান পার্শ্বা শুনিতে লাগিল। দেখিল, এখান হইতে সেখানে লোক ছুটাছুটি করিতেছে, কেহ ঘুঁষ দেখাইতেছে, কেহ দৌড়াইতেছে, হঠাৎ একটা লোক উঁচু ডিগব উপব দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে গুব করিল। বহমান আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে লোকটি আব কেহ নয়, তাহাদের লক্ষ পাবে ভিড়িবার সময় যে-লোকটি প্রথম জলের কাছে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়াছিল সে-ই। তাহাব তখনকার কথাগুলি রহমান এখনও ভুলে নাই। তাড়াতাড়ি সে আবও কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহাব সঙ্গে বিক্ষিপ্ত জনতা আবও ঘন হইয়া আসিল। লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল :

‘বন্ধুগণ, আমার চাষী-ভাইবা।’

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন প্রায় সাবাটা আকাশ লাল। নাচে ধ্বংসের উৎসব দেখিয়া রক্তবর্ণ আকাশ যেন বহুনেত্রে তাহাব প্রতি চাহিয়া বিস্তর অশ্রু কামনা করিতেছে। মানুষের পায়ের চাপে মাটির পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে আব বাকী নাই। এখানকার এই কলববের আওনের মতো যদি কোনো শিখা থাকিত তবে সাবাটা পৃথিবী নিশ্চয় পুড়াইয়া ফেলিত। বহু মাটিতে লাথি মাঝিয়া বলিষ্ঠ ডানহাতে শূন্য ঘুঁষ দেখাইয়া দৃপ্তসবে বলিল, ‘বন্ধুগণ, আমার চাষী ভাইবা।’

কিন্তু এমন সময় হঠাৎ গুলিব ঝাঁষণ আওগাত, আশেপাশের সব লোক পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে, কারও কোনো দিকে কোনো খেয়াল নাই, কে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল — সেদিকে কেমনো লক্ষ্য নাই, সকলেই যাব যাব প্রাণ হাতের মুঠায় লইয়া দৌড়াইতেছে। এক মুহূর্তে সাবাটি মাঠ সশস্ত্র সৈন্যে ভরিয়া গেল।

বহমান প্রথমে লক্ষ্য করে নাই, যখন খেয়াল হইল তখন তাহাব মাথা ঘুঁষিতেছে, স্বাও-পা কাঁপিতেছে, বানের ভিতব ভীষণ ঝা-ঝা করিতে লাগিল। সে কোনোবাকমে দৌড় দিল। দৌড়াইতে দৌড়াইতে গুলিতে পাইল — পেছনে কত লোকের তাঁর পার্শ্বনাদ, কত লোকের কাতব গোএনি। মুখ ঘিরাইলে দেখিতে পাইত, কেহ বহুবাহু দেহে মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে,

কেহ পড়িতে পড়িতে হাঁটিতেছে, আবার হঠাৎ বসিয়া পড়িল। শীতের দিনের গৈরিক ধূলি বস্ত্রবর্ণ হইয়া গেল।

অনেকদূর গিয়া আর দৌড়াইতে না পারিয়া রহমান তবে থামিল, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছেব নীচে সে বসিয়া পড়িল। হাত-পা তাহাব এখনো ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, বৃকের ভিতর কালবৈশাখী ব ঝড়। পেছনে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছে রহমান সেদিকে আবার চাহিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পাবিল না, চক্ষু তাহার বুজিয়া আসিল। সেখানকার কথা স্মরণ করিয়া চোখে তাহাব জল ভরিয়া আসিল। বহমান নির্জীবের মতো পড়িয়া রহিল।

যখন উঠিল তখন অনেক রাত। কোথাও টু শব্দটি নাই। বহমান ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, শরীবের সবগুলি গ্রন্থি তাহাব বেদনায় টনটন করিতেছে। তবু কোনো বকমে সে হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক পরে নদীর পাবে আসিয়া দাঁড়াইল। চমৎকার ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে এখানে, নদীতে নৌকা আর জাহাজের শব্দও শোনা যায়। রহমানের মনে পড়িল সেই লোকটির কথা : ‘বন্ধুগণ, একথা আপনারা মনে রাখবেন, আচ্ছ আমাদের যাবা শুধু লাখি মেবে তাড়িয়ে দিচ্ছে, কাল তারাই আপনাকেও লাখি থেকে রেহাই দেবে না!’

নদীর জলেব দিকে চাহিয়া বহমানের চোখ আবাব ছল ছল করিয়া উঠিল।

ড্রেসিং টেবিল

সলিল চৌধুরী

বিয়ের পর নন্দা আমাকে যত চিঠি লিখত তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শেষে পুঃ দিয়ে আকাঁকাঁকা অক্ষরে লেখা থাকত : ‘ঘর যখন নেবে আমার জন্যে একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে ভুলো না — আর আয়নাটা যেন খুব বড় আর ভালো হয়।’

বিয়ের আগে নন্দার বাড়ি যখন যেতুম প্রথমেই নজবে পড়ত দবজাব সামনের দেওয়ালে একখানি চটা-ওঠা আয়না। তাতে মুখ দেখলে — ওঃ যা দেখাত, নাক থেকে কপাল পর্যন্ত পুরো এক হাত লম্বা, আব ঠোঁট থেকে চিবুক মন্তব এক ইঞ্চি। আবাব একটু নড়লে চডলেই আয়নাটা নানাবকম ভঙ্গি করে মুখ ভাঙাত।

রীতিমত মন খাবাপ হয়ে যেত আমাব, আব নন্দা হাসত, বলতো, ‘তোমাব কাছে যখন যাব, তখন ভালো আয়না কিনে দিও।’

পববতী জীবনে নানা সমালোচকের সম্মুখীন হতে হয়েছে — তাঁদের সমালোচনায় নিজের প্রতিবিম্বও দেখেছি, — দেখে বেশিভ ভাগ সময়েই মনে পড়েছে নন্দাব বাড়িভ সেই আয়নাটির কথা। সে কথা থাক —

বিয়ের ঠিক পবে। তখন আমাব দু-তিনটে খবরের কাগজে ভালো চাকবি পাওয়াব কথা হচ্ছে। মানে এই হল বলে আব কি! সেটা না হওয়া পর্যন্ত কটা দিন নন্দা তাব বাবার কাছে থাকবে — ঠিক হল। আর চাকবি হলেই ঘবভাড়া নিয়ে নন্দাকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কেমন কবে ঘব সাঙানো হবে, কোন জায়গায় কি থাকবে — সে সব প্ল্যান দুজনে মিলে আলোচনা কবে পূবোপবি মাথায় নিয়ে কলকাতায় এসে জাঁজিভ হলাম। নন্দা বইল গ্রামে তাব বাবার কাছে। এব পবে ছ-মাসের কাহিনী যদি আপনাবা শোনেন — থাকগে — সে সব বলে লাভ নেই। কাবণ যে কাহিনী বলতে বসেছি সেটা আমাব নিজের কথা নয়। তবু বলে বাখা ভালো যে, চাকবি আমি পেয়েছি। নয়তো অনেকে মনে করতে পাবেন যে বেকাব সমস্যাব ওপব আমি কটাক্ষ কবছি। অবশ্য যে চাকরিগুলো পাবাব কথা ছিল তাব একটিও পাইনি। কিন্তু এমন একটা পেয়েছি যা ঘুণাঙ্কবে মনের ত্রিসামান্যতেও কোনদিন ঠাই পায়নি। এক কথায় জুতোব দোকানের সেনস্‌মান। আব কসবাব একেবাবে ভেতব দিকে যে এদো পুকুভগুলো আছে তাবই একটাব পাড়ে দু-খানা টিন-দেওয়া ঘব এক মামাতো ভায়েব সঙ্গে বখবা কবে ভাড়া নিয়েছি। নন্দাও চলে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে — মানে বেশ আঁচ। নন্দার একটা আশ্চর্য প্রতিভা আছে, বোধহয় সব মেয়েবই ওটা থাকে, সেটা হচ্ছে অবস্থাব সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়াব ক্ষমতা। একদিনেই জন্যেও মুখ শুকনো, দেখিনি নন্দাব, যেন কসবাব টিনের ঘব ভাড়া নেওয়াটাই তাব আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু একটা ব্যাপার, এ ঘবে আসাব পব থেকে একবাবেব জন্যেও নন্দা বলেনি ড্রেসিং টেবিলের কথা। আমিও প্রায় ভুলেই গিবেছিলাম। এমন সময় এক শনিবাবেব দুপুববেলা একটা ঘটনা ঘটল। নগদ কবকবে ষাট টাকা মাইনে গুলে নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিবিছি পথের দু-দিকে চাইতে

চাইতে। ইচ্ছে করলেই কত কী কিনতে পারি অথচ কিছুই কিনছি না, এটা যেন আমাব একটা সম্ভাটিক খেয়াল। বেশ ভালো লাগে পকেটে টাকা থাকলে। হঠাৎ ঠিক কসবাব মোড়ে দেখি এক চমৎকার ড্রেসিং টেবিল — রাস্তায় নীলেমে বিক্ৰি হচ্ছে। আৰো কত কি ফানিচাৰ আশ্চৰ্য সস্তায় বিক্ৰি হচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলেৰ ঘ্রাসের একটা কোণ কেবল একটু ফাটা। তাছাড়া প্রায় নিখুঁত। দাম উঠল তিরিশ টাকা, ভাবুন! স্বপের মাথায় যা থাকে ববাত্তে বনে কিনে ফেলে মুটের মাথায় চাপিয়ে সটান বাড়িব দিকে পা বাড়লুম। বাড়ি ভাড়া যাবে ১৫ টাকা, বাকি ১৫টি টাকায় সাবা মাস সংসাৰ চালাতে হবে। নন্দাব মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল — কত আশা কত স্বপ্ন বুকো নিয়ে বেচারী ভালবাসতে শুক কবেছিল। তাব তো কিছুই মিটল না। তিরিশ টাকা যায় যাক, কুছ পরোয়া নেই।

বাড়ি ঢুকতেই নন্দা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তাবপব কি যেন ভেবে কী ভীষণ খুশি যে হয়ে উঠল কি বলব। অন্য মেয়ে হলে হয়তো টাকার হিসেব কবে এতক্ষণ পান্ পান্ কবতে বসত, কিন্তু দরিয়াব মত দিল আছে নন্দাব। কবি না হোক, কবি-স্ত্রী হবাব নিশ্চয় উপযুক্ত। প্রায় সাবাক্ষণ নন্দা আযনাব সামনেই বসে কাটালো, ঘুরিয়ে ঘিৰিয়ে চুল বাঁধল। কাপড় ছেড়ে কপালে টিপ পবলো, মাথায় ঘোমটা টেনে অকারণে দু-একবার হাসলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খুশিতে যেন আবেশ আসছে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। বিয়েব আগেব দিনগুলো স্বপ্নে ভাসছে, কেমন যেন সার্থক মনে হচ্ছে জীবন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, নন্দা ডাকছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম, নন্দাব দু-চোখ ফুলে লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে, সারা শবীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

‘কী হয়েছে নন্দা? তুমি কাঁদছো কেন অত?’

‘ও আয়না তুমি ফেবত দিয়ে এস, ও আমাব চাই না।’ বালিশে মুখ ঢেকে নন্দা কাঁদতে লাগল। হয়তো পুবনো জিনিস বুঝতে পেবে ওব অপমান হয়েছে। কিন্তু নতুনব দাম কত! সে কি আমাদেব কেন্নার সাধি। এত অবুঝ হলে কেমন কবে চলবে? আর জিনিসটা তো প্রায় নতুনই বলা যেতে পাবে।

‘ছি! নন্দা শোন।’

‘না, না, না, আমাব চাই না। তুমি ফেরত দিয়ে এস।’ স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কেবল সংকীর্ণ একটা প্রেসটিঙ বড় হল নন্দাব। আব আমাব কোন দামই নেই ওর কাছে?

‘বেশ! তাই হবে। ফেবত দিয়ে আসব।’

নন্দা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল, খানিক পবে ফিবে এল আবাব। আমাব কোলেব ওপব এক তাড়া চিঠি ফেলে দিয়ে বলল, ‘এইগুলো পড়ে দেখ।’

নীল খামে মোড়া বাংলায় লেখা চাবখানা চিঠি।

‘কাব চিঠি এগুলো? কোথায় ছিল?’

‘আযনাব দেবাজেব মধ্যে ছিল।’

চিঠিগুলো নিয়ে বসলুম। খুলে পড়তে শুক করলুম একখানা কবে, হাত কাঁপছে। কি ব্যাপাব কে জানে? তাবিখ হিসেবে পব পব সাজালে চিঠিগুলো এই :

॥ ১১ ॥

বাগেবহাট

প্রিয়তমাসু —

আজ বাত বারোটায় এখানে এসে পৌঁচেছি। মনে হচ্ছে কতদিন যেন ছেড়ে এসেছি তোমাকে। ভাবতে অবাক লাগছে কাল এতক্ষণ তুমি কত কাছটিতে ছিলে।

জায়গাটা শহর থেকে কিছুটা দূরে। অমলেন কথামনে আছে তো? সে এখানকার কলেজে প্রফেসরি করছে। কাল থেকে তার ওখানেই উঠবে। শরীর বড় ক্লান্ত লাগছে — অবশ্য ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ট্রেনে একটা বড় মজার ব্যাপার হয়েছে শোন : আমাদের সামনের বেঞ্চেই একটি শ্রৌচ ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে আমাদের সহযাত্রী। সুন্দর স্বাক্ষরকে একটি পরিবার, ছেলেমেয়ের নিটোল স্বাস্থ্য, শ্রৌচের অমায়িক হাসি, আর খাঁটি বাংলার মা, ভীষণ ভালো লাগছিল। স্কেচ বইটা বেব করে মনে রাখার মত করে সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। একটি মেয়ে বনজবে পড়ল যে আমি ছবি আঁকছি, সে তার বোনকে বললো, বোন মাকে বললো, মা বাবাকে বললেন। শ্রৌচ ভদ্রলোক ভীষণ উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন। ‘তাই নাকি? দেখি কেমন আঁকলেন আমাদের? আরে! এমন অদ্ভুত মশাই। একেবারে জাদুকর লোক দেখছি আপনি?’ তারপর মহা হৈ চৈ। যাই কেনো তাই খেতে দেন আমাদের, কিছুতেই ছাড়বেন না। ‘আরে মশাই, বাঙালীর এত দুর্দশা কেন জানেন? তারা শিল্পীর কদর জানে না। আমাদের ও সব শখ ছিল, এককালে নামও ছিল গাইয়ে বাজিয়ে মহলে। নিন ধরুন — লজ্জা কিসেব?’

খেতে হল। ভদ্রলোক যখন কথা বলেন উত্তরের প্রত্যাশা করেন না, মনের ভাবটা যেন এই যে তার ওপরে আর কোন কথাই চলতে পারে না।

‘বিয়ে থা কবেননি তো? বেশ, বেশ! এটি যেন কববেন না। এই দেখুন না আমার — হেঁ হেঁ — সব চূলায় যাবে তাহলে—’

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমি বিয়ে কবেছি — ভদ্রলোক মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন —

‘আমার মেয়েদের ছবি আঁকা শেখান না আপনি? যা লাগে দেব। কলকাতায়ই তো থাকেন — আমার বাড়ি হচ্ছে বিডন স্ট্রীট। আসবেন নিশ্চয়। যাক তাহলে এ কথাই বইল। হাসি, খুশি! তোমরা খুশি তো? দেখ কেমন মাস্টার পেয়ে গেলে — হেঁ — হেঁ — হেঁ।’

কোন কথার উত্তর দেবার অবকাশ নেই আমার। বোন দুটি জিজ্ঞেস করে, ‘সত্যি আসবেন তো?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ আসব।’ — উপায় নেই।

ইতিমধ্যে ছোট ভাইটি আমার ব্যাগ হাতড়ে অ্যালবামটা টেনে বেব কবেছে — আঙুলে থুতু লাগিয়ে ছবি উলটে দেখছে।

মা বললেন, ‘ছি খোকা, অসভ্যতা কোব না, বেখে দাও।’

না মা। মাস্টারমশাই আমাকে দেখতে বলেছেন, বলুন না আপনি বলেননি?

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওকে দেখতে বলেছি।’ উপায় নেই, এবা সব এক জাতের। ভদ্রলোক বানাখাটে নেমে যাবেন। তোমার তৈরি লুচি বের কবলুম —

‘খেতেই হবে।’ খোকাকে দিলুম, বোনেদের দিলুম। নানা কথা হল — দেশের স্বাস্থ্য, টেনিসি আন্টি, কমনওয়েলথ — তারপর তাঁরা নেমে গেলেন। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন : ‘আবে ভালো কথা, আপনার নাম ঠিকানাটা তো জানা হল না। বলুন বলুন — তিনি কাগজ কলম বেব করলেন। একবার বললুম — শুভে পেলেন না — আবার বললুম — ‘বাহিন্দিন চৌধুরী।’

‘আঁা?’

‘বাহিন্দিন চৌধুরী।’

‘হু’

লিখে নিলেন কিন্তু হাত কাঁপলো। টোক গিলে বললেন : ‘তা বেশ বেশ। কিন্তু ধরার উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী — তাই নয় গো?’

দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী — তাই নয় গো? আমি চোঁচিয়ে বলতে চাইলাম, ‘এখন কি বুঝলেন তবে পাঞ্জাবী?’ কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না। আবহাওয়াটা সহ্য কবাব জন্যে বোন দুটি তেমনি হেসে বলল —

‘ভুলে যাবেন না, আসবেন ঠিক — বিডন স্ট্রীট’। হাসবার চেষ্টা করলুম। গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখতে পেলাম খোকার হাত থেকে মা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাবারটা। তোমাব হাতেব তৈরি সেই খাবারের টুকরোটা প্লাটফর্মে পড়ে বইল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে কবল — মনে হল কামরা শুদ্ধ লোককে ডেকে বলি : ‘দেখ তোমরা, কত বড় অবিচার হল দেখ।’ কেউ কিছু জানল না। আমি চুপচাপ বসে রইলাম — সমস্ত দিনটাই আমার মাটি।

সব কথা এখন আর মনে নেই — মনে বাখতেও চাইনে। মাঝে মাঝে বোন দুটির কথা কানে ভাসছে : ‘ভুলে যাবেন না — আসবেন ঠিক — বিডন-স্ট্রীট।’ মনে মনে বলি :

‘না, তোমাদের ভুলবো না বোন — তোমবাই নতুন বাংলা — তোমাদের মুখ চেয়েই যে আমার বেঁচে আছি — তোমাদের ভুলবো না।’

চিঠিব উত্তর দিও . .

তোমাব রহিম

খামেব ওপব ঠিকানা লেখা : আমিনা চৌধুরী, উজানীপাড়া, হাওড়া।

॥ ২ ॥

বৌ —

বাগেবহাট

আজ সকালে অমলের বাসায় এসে উঠেছি। পথে আসতে দেখছি বহু লোক যববাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুক কবেছে, থমথম কবেছে সমস্ত শহরটা — লোকে জোবে পর্যন্ত কথা বলছে না। বুঝতেই পাবছ হঠাৎ একেবারে এব মাঝখানে এসে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। ব্যাপারটা ভালো কবে বোধগম্য হওয়াব আগেই শুনি অমল চাকরিতে ইত্তফা দিয়েছে — মালপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দু-একদিনেব মধ্যেই ওবা পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় বওনা হবে। আমাকে ওবা আশা কবেনি —

অমলের বৌ একটু ফিকে হাসল।

‘ব্যাপার কি অমল? কি খবর বৌদি? তোমবাও শেষকালে চললে?’ বৌদি হাসবাব চেষ্টা করল, ‘তোমাদের দেশে তো আব আমাদের জায়গা হবে না ঠাকুরপো!’

‘আমাদের দেশ? আমাদের দেশ মানে? খুলনা তো অমলের দেশ — আমার দেশ ২৪ পবগনা — যাছ তো আমার দেশেই শুনছি।’

‘আজকাল আব তা নয় — এখন মোছলমানের দেশ পাকিস্তান আব হিন্দুব দেশ হিন্দুস্থান।’ অমল বলল বৌদিকে : ‘তুমি যা কবছিলে তাই কব গিয়ে।’ জিনিসপত্র গোছাতে বৌদি চলে গেল। চুপচাপ অমলের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অমলের বাচ্চাটা নতুন হামা দিতে শিখেছে — ফুটফুট করছে সুন্দর — সামনের দুটো দাঁত উঠেছে। সে তার বাপের পা ধবে দাঁড়াতে গিয়ে ধপ কবে পড়ে কেঁদে উঠল। অমলের ভূক্ষেপ নেই।

‘শোন রহিম, কথা আছে তোব সঙ্গে।’

‘বল, শুনছি।’ বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলুম। অমলের কাছে যা কথা শুনেছি তাব মোট কথাওলো তোমাকে জানাচ্ছি, শহর থেকে কয়েক মাইল দূবে নমঃশুদ্দের গ্রামে একটা

ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। নমঃশূদ্ররা বেশির ভাগই চাষী — নয়তো জেলে। স্বভাবতই তারা খুব গরিব। কিছুদিন ধরে জমিদারদের অত্যাচারের বিবন্ধে তারা সবাই একজোট হচ্ছিল। তাদের দুজন নেতাকে ধরবার জন্যে পুলিশ ওয়ারেন্ট বের করে। নেতাদের মধ্যে একজন হিন্দু একজন মুসলমান। তাদের ধরার জন্যে গ্রামে যখন একদল পুলিশ ঢোকে চাষীরা তাদের বলে ফিরে যেতে। তাতে কাজ না হওয়ায় কিছুটা উত্তম মধ্যম দিয়ে তারা তাদের বের কবে দেয় গ্রাম থেকে। এর পরেই ঘটনার শুরু। বহু আর্মড পুলিশ আব বে-সবকাবী গুণ্ডাবাহিনী গিয়ে হাজির হয় গ্রামে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে শুরু হয় প্রচণ্ড অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম তাবা জ্বালিয়ে দেয় — আর যা পায় লুট কবে নিয়ে আসে। সমস্ত মানুষ গাঁ ছেড়ে পালাতে শুরু কবে — আতঁ চিংকারে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। এদিকে জোব প্রচার চলতে থাকে যে হিন্দুবা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু — ওদের তাড়াও। এই সুযোগে শহবে গুণ্ডারা হিন্দুদের কয়েকটা দোকান লুটপাট করে — আগুন দেয়। সদর বাস্তায় ওরা শাসাতে থাকে হিন্দুদের। আনোয়াবকে তোমার মনে আছে? সেই যে স্কাউন্ডেলটা কলেজে একদিন তোমাকে কুৎসিত ইস্তিত করেছিল? শুনেছিলাম একজনের সঙ্গে শেযাবেব বিজনেস কবাব নাম কবে তাব যথাসর্বস্ব মেবে দিয়ে পাকিস্তান চলে এসেছে। এখন শুনি সেই নাকি এখনকাব গুণ্ডাবাহিনীর মস্ত বড় কর্তা। তিনিই নাকি লীড কবেছেন।

শুনে পর্যন্ত রক্ত টগবগ করে ফুটছে। বাসকেলটার যদি একবাব দেখা পাই তো ওর টুটি আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব, এ তুমি দেখে নিও। অমলবা চলে যাচ্ছে, কাল না গেলে পরশু যাবে — নয়তো তাব পরদিন। কি বলব ওদের বলতো? লঙ্জায় দুঃখে আমাব বুকটা খান খান হয়ে যাচ্ছে। কি যেন আমাব একটা করা উচিত বুঝতে পারছি না। অমলের দেশ ছেড়ে যদি অমলকে চলে যেতে হয়, আমার দেশকেই বা আঁকড়ে থাকব কোন্ যুক্তিতে? ভাবতে খারাপ লাগছে বড়। এখানে বিশেষ কাউকে চিনি না। একটি পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে — তাবা পিস কর্মটি করেছে বললো। সব কাজকর্ম এখানে প্রায় বন্ধ। ভাবছি কাল পরশু নাগাদ ঢাকা চলে যাব। সেখানে শুনেছি কিছু কিছু কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছুই ভেবো না। আজকের দিনে মানুষকে আর সহজে বেশিদিন বিভ্রান্ত কবে বাখা যায় না। মনুষ্যত্ব জয়ী হবেই — এই আশাতেই বুক বাঁধতে হবে। ওখানকার পরিচিতদের কাছে এখানকার সঠিক খবরটা দিও. . .

তোমার রহিম

॥ ৩ ॥

বৌ —

তোমার চিঠি পেয়ে আবো ভাবনা বাড়ল। কলকাতাব কাগজগুলো খুলনার ব্যাপাবকে যদি এইভাবে প্রচার করতে শুরু করে থাকে তাহলে তাব সাংঘাতিক ফল ফলবে। যে পয়সা লাভের আশায় ওরা দানবকে জাগিয়ে তুলেছে সেই দানবই ওদের ধ্বংস কববে। তবে ওরা বোধহয় নিশ্চিত যে, সময় বুঝে দাস্তা বাধানো বা থামানো এটা ওদেরই হাতে। এখানকার কাগজগুলোও ঠিক তাই শুরু করেছে। পরস্পরের ওপব সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে, কখন কি ঘটে সেই আশঙ্কায় সবার চোখমুখে বিষমতা দেখাছি, এমন যদি কোন শক্তি থাকত যা এই সমস্ত নোংবামিকে পায়ে মাড়িয়ে মনুষ্যত্বের ধ্বজাকে উঁচুতে তুলে ধরবে! শুধু আমি নয়, প্রায় সবাই মনেপ্রাণে এই কথাটি অনুভব করছে — কিন্তু সে কই? এখানে সয়কাবী মহলে কিছু কাজের আশায় যোবায়ুরি করতে হচ্ছে। আমি যে বাঙালী — এই কথাটাই প্রায়

ভুলতে বসেছি। তুমি তো জান আমি পয়সা খরচ করে উর্দুভাষা শিখেছিলুম। উর্দু সাহিত্যকে আমি ভালবাসি, কিন্তু যখন সেটা শাসনের দণ্ড হয়ে সোজা ঘাড়ের উপর পড়তে চায়, আমার সংস্কৃতির টুটি টিপে ধরে তখন তাকে বর্জন কবাই মানুষের কাজ। সকলের কথায় সোজা বাংলায় উত্তর দিই — বুঝলো ভালো, না বোঝে পবোয়া নেই। কাজেই কাজ যে জুটবে না বেশি তা বোধ হয় বুঝতে পার।

তোমার রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে জেনে ভারি কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে দেখে যারা কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি অন্তত বিশ্বাস করি তাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার কোন অধিকার নেই। কিন্তু এ বিশ্বাস হাবিও না যে — এরা সবাই ভালো — এদের বাদ দিয়ে একা তুমি যাবে কোথায়? দুর্ভাগ্য দেশের, তাব অভিশাপ এখনো কাটেনি, সে দুর্ভাগ্য থেকে তুমি আমি বাদ যাব কেমন করে বল বোঁ। মনুষ্যত্বের অপমান যখন দেখি — মনে হয় আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খাক করে করে দিই এই হতভাগা দেশের পচা আবর্জনাগুলোকে।

সেদিন শুনলুম কয়েকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া মিলে সদর রাস্তার ওপরে এখানকার কালেক্টর পণ্ডিতমশাইকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে — টিকি কেটে দিয়েছে, মুখে গোমাংস দিয়েছে জোব কবে। ভাবতে পাব? আমি শুনে এখানকার মাতঙ্গবাদের বললুমঃ ‘আপনাবা থাকতে চোখের সামনে এই সব ঘটছে — আপনাবা কি ঠিক জানেন যে আপনাবা এখনো বেঁচে আছেন?’ তাবা বললেনঃ কী করব — ওদের হাতে বন্দুক আছে, পেছনে পুলিশ আছে। ওবা হুমকি দিয়েছে — যে কেউ ওদের বাধা দেবে তারাই পাকিস্তানের শত্রু, তাদের ঘরদেব ওরা জ্বালিয়ে দেবে, তাদের খুন কববে — ইত্যাদি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় গোটা জাতটারই শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, নইলে কটা আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় না? আগাছাই বোধহয় জন্মাচ্ছে বেশি — বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও স্বীকার কবতে হবে।

এখানে আব মোটে ভালো লাগছে না বোঁ। এবারে এসেই বোধ হয় ভুল কবেছি — তোমাকে ছেড়ে আর এক দণ্ডও থাকতে পারছি না বোঁ। .. কাজকর্ম চুলোয় যাক, দু-একদিনের মধ্যেই পাড়ি দেব। অমলের চিঠি পেয়েছি — ওবা আগামীকাল বওনা হবে। কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা কববে লিখেছে। ওখানেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিও। কোনরকমে চলে যাবেই।

তোমার বহিম

(এব পবেব চিঠিটা প্রায় বুড়ি দিন পবে লেখা। মনে হয় এব আগে আবো চিঠি লিখেছিলেন — যে কোন কাবণেই হোক সেটা নেই।)

|| 811 ||

আমিনা —

আমি বোধহয় শিগগিরই পাগল হয়ে যাব। গত সাত দিন ধরে এক সেকেণ্ডের জনোও ঘুমোতে পারিনি। পাগলের মত সাবা শহবে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছে মনুষ্য শেষ হয়ে গেছে — বীভৎস তাণ্ডব চলছে পশুত্বের। চারদিকে চিংকাব, কানা আব পৈশাচিক উল্লাস। তার ওপর আজ আট দিন তোমার কোন চিঠিপত্র নেই। হাজার হাজার রিফিউজি এসে জডো হচ্ছে। তাবা বলছে কলকাতায় আব একজন মুসলমানও বেঁচে নেই। বিশ্বাস কবা উচিত কি না সে বিচারের বুদ্ধিও আমার লোপ পেয়ে গেছে। তুমি কোথায় আছ? তুমি এখনও আছ তো? একথা আজ আব কোন মানুষকে জিজ্ঞেস কবি না। — জিজ্ঞেস কবি সূর্যকে, জিজ্ঞেস কবি গাছপালাকে। জিজ্ঞেস করি, আমাব আমিনা কেমন আছে, কোথায় আছে?

অমলের একখানা চিঠি এসেছে। বর্ডার থেকে ওদের মারধোর করে সমস্ত লুটপাট করে নিয়েছে। বৌদিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে — অমল কোন রকমে বাচ্চাটাকে নিয়ে রানাঘাটে পৌঁচেছে। অমল লিখেছে — ‘আমার অবস্থার কথা না লেখাই ভালো, তবে এটুকু জ্ঞান এখনো আছে যে এ খবর কলকাতার কাগজওয়ালাদের হাতে পড়া উচিত নয়। যা ভালো হয় করিস। আমি দেহমনে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে গেছি।’

আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি। এখানে আর কয়েক ঘণ্টা থাকলে বোধহয় আত্মহত্যা কবে বসব। বৌদিকে খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার খবর পেলে মনে অনেকটা জোর পেলুম। জানি না আবার কবে তোমাকে দেখব — জানি না দেখব কিনা।

আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা কর। বড় অহংকার ছিল আমার দেশকে আমি চিনে ফেলেছি — সে অহংকারও চূর্ণ হয়েছে। মনুষ্যত্বকে বড় করতে গিয়ে পশুত্বকে ছোট কবে দেখেছি — তাই পশুর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। যেখানেই থাক, যেমন থাক — সাবধানে থেক। তোমাকে আমি হারাতে পারব না বৌ, অমলের মহত্ব আমাব আছে কিনা সে পরীক্ষা আমি দিতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ !.... ..

তোমার রহিম

চিঠি এই কটাই। পড়ার পর হাওডাব উজানীপাড়ায় গিয়ে খোঁজ করেছি শিল্পী বহিমুদ্দিনেব বাড়ি কোনটা। কেউ বলেছে — ‘জানি না’, কেউ বলেছে — ‘এ পাড়ায় কোন নেড়ে ফেড়ে আব নেই মশাই!’ একজন পানওয়ালা শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিল একটা একতলা বাড়ি — তার দুখানা ঘর নিয়ে ওরা থাকত। বাড়িটার শোচনীয় অবস্থা। দরজা জানলাব একটাও কপাট নেই — মাঝখানে কেবল একটা চট ঝুলছে। ডাকাডাকি করলে কেউ সাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত চট সবিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখি অস্তুত বিশজন মেয়েছেলে বাচ্চাকাচ্চা ওন্দর কেউ বসে কেউ শুয়ে রয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন চমকে উঠল। বাড়িটা চোয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। জিজ্ঞেস করলুম : ‘বহিমুদ্দিন চৌধুরী এখানে থাকেন?’

তারা কেউ নামও শোনেনি রহিমুদ্দিনের — সেইদিন সকালে খালি ঘব পেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে — পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু সব। শুনলাম এর মধ্যে চাববাব গুমকি দেওয়া হয়েছে — রাত্রৈব মধ্যে উঠে যেতে হবে। একটি মধ্যবয়সী মহিলা ঘবের এককোণে বসে বর্ম করতে শুরু করলেন, সবাই নির্বিকার। এক থামা খই মুডকি নিয়ে দুটি ছেলে ঢুকল — দেখে মনে হল স্বপ্নেব ছাত্র। তারাই ওদের এবাড়িতে জোব করে জায়গা কবে দিয়েছে — দেখাশোনা কবছে। তাদের জিজ্ঞেস কবলুম। একজন চিনত বহিমুদ্দিনকে, আমিনাকেও চিনত। তাব দিদি রহিমুদ্দিনেব কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসত — সেও আসত দিদিব সঙ্গে। তাব কাছেই সব খবব পেলুম। বলল : ‘মাস্টাবমশাই শুনেছি পাকিস্তানে আছে — কিন্তু আমিনাদিদি বোধহয় বেঁচে নেই। একদিন রাতদুপবে এই ঘরটার শিকল বন্ধ কবে আগুন ধবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আগুন নিবিয়ে ওদের উদ্ধার করতে — কিন্তু পাবিনি — তখন ভীষণ গুলি চলছিল।’ ছেলেটার চোখ ছলছল করতে থাকে। বাড়িটার দিকে চোয়ে দেখলুম — সমস্ত দেওয়ালগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে — পাশেই একটা নিমগাছ ঝলসে ঝুঁকড়ে গেছে। আগুন লেগেছিল সতিই। নন্দাকে ব্যাপারটা বলিনি — কেননা একটা সন্দেহ আমার হয়েছে — আমিনা যদি পুড়েই মরে থাকে — ড্রেসিং টেবিলটা অক্ষত রইল কি কবে? ছাত্রটি বলেছিল : টেবিলটা ছিল পাশেব ছোট ঘরটায়। — হয়তো আমিনাও সে ঘরে ছিল? কিন্তু সে গেল কোথায়?

নন্দার বিশ্বাস, কাগজে খবরটা বেরলেই আমিলা এসে নিয়ে যাবে তাব ড্রেসিং টেবিলটা —তাই এ কাহিনী লেখা। আয়নাটা নন্দা কাপড় দিয়ে মুড়ে বেখে দিয়েছে।

কাহিনীর এইখানেই শেষ। প্রসঙ্গত একটা ঘটনাব উল্লেখ কবতে চাই পাঠক-পাঠিকাৰ কাছে। হয়তো তার সঙ্গে এই কাহিনীৰ কোন সম্পর্ক নেই — কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে। গত ১লা এপ্রিলের একটি বাংলা কাগজে এই খবরটি প্রকাশিত হয়েছেঃ হাওড়া স্টেশনের নিকট গতকাল এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোবাফেরা কবিতে দেখিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার কবে। তাহার কাছে ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি তুলি ও কিছু স্বেচ ছবি পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ হয় সে হাওড়া স্টেশন ও পুলের প্ল্যান আঁকিয়া নিতেছিল। নাম জিজ্ঞাসা কবিলে সে পাগলের ভান কবে ও বলেঃ ‘একজন মানুষ।’

খবরের হেড লাইনে লেখা — “পাকিস্তানের গুপ্তচর গ্রেপ্তার।”

আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন

বিমল কর

নদীর চরায় শিবানীর চিতা জ্বলছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলগাছের তলায় বসেছিলাম। ফাল্গুনের শেষ, উলটো টান ধবে গিয়েছিল দুপুরে। বোদ পাখা ওটিয়ে নিতে শুক করেছে, নদীর ঝাঁকেব মাথায় আকাশে সূর্য হেলে পড়ছিল।

ভুবন গরুর গাড়ির উপর বসে, গাড়িটা অর্জুনগাছের ছায়ায় দাঁড় কবানো, গরু দুটো গাছগাছালির ফাঁকে শুয়ে ছিল। শিবানীর মুখাগ্নি শেষ কবে ভুবন খানিকক্ষণ চিতাব কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, বোদ আর আগুনের ঝলসানি গায়ে মাখে নি, তাবপব গাড়িতে গিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর মাথা বেখে মুখ আড়াল করে সে বসে ছিল, কদাচিৎ মুখ তুলছিল, তুলে শিবানীর চিতা দেখছিল।

চিতার কাছাকাছি, নদীর ভাঙা পাড়ের আড়ালে চাব-পাঁচটি ছেলেছোকরা আর নিত্যানন্দ। তাবা মাথায় গামছা বেঁধে, ভিত্তে তোয়ালে মুখে ঘাড়ে বুরে বুলিয়ে শব্দাহেব তদারকি কবছিল। পুরুতমশাই আর ছোটকিলাস অনেকটা তফাতে, মাটির কয়েকটি সবা ও কলসি সামনে নিয়ে গাছেব ছায়াতেও ছাতা খুলে বসে আছে।

আমরা মাঝদুপুরে এসেছি। তখন চতুর্দিক ধু ধু কবছিল। গরম বাতাস গায়ে মুখে জ্বালা ধবিয়ে দিচ্ছিল। এতক্ষণে যেন সব ক্রমশ জুড়িয়ে আসাব মতন ভাব হয়েছে। বালিভবা নদীর তাপ মরে আসছিল, শীর্ণ জ্বলেব ধাবাটি শিবানীর চিতাব পাশ দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কদাচিৎ বাতাসে কিছু শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু শিমুলতলায় বসে শিবানীর সংকাব প্রতাক্ষ কবছিলাম।

সিগারেটের টুকবোটা দূবে ছুঁড়ে দিয়ে অনাদি বলল, 'শেষ হতে হতে বিকেল পড়ে যাবে।' বলে সে শিবানীর চিতাব দিকে তাকিয়ে থাকল।

কমলেন্দু পা ছড়িয়ে আধ-শোষা হয়ে বসে ছিল, সে আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল, আকাশমুখো হয়ে বোধহয় শিমুলের ফুল দেখবে।

আমি আব একবাব ভুবনের দিকে তাকালাম। ভুবন কুঁজো হয়ে বসে, হাঁটুর ওপর মাথা, দু'হাতে মুখ আড়াল কবা। অনেকক্ষণ সে ওই একইভাবে বসে আছে। তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক? শিবানী ওব স্ত্রী। তবু আমাব মনে হলো, ভুবনের এতটা শোকভিত্ত ভাব ভাল দেখাচ্ছে না। সে জোব করে তাব শোকের মাত্রাব গভীরতা দেখাতে চাইছে। এতটা শোক পাবাব কারণ তার নেই। তবু এই শোক কেন? সে কি আমাকে ঈর্ষান্বিত করতে চায়? কিংবা আমাদের তিনজনকেই?

কথাটা আমার এখন বলা উচিত নয় বুঝতে পেরেও যেন ভুবনের শোকে খুঁত ধরাতে বললাম, 'শিবানীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে মাসখানেক আগে। ভুবনের ওপর কি জর্নো যেন রেগে ছিল। ওর শরীর স্বাস্থ্যেব কথায় দুঃখ করছিল.'

আমাব কথায় অনাদি মুখ ফিবিয়া দূবে ভুবনের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে অনামনস্কভাবে বলল, 'আমবা বোধহয় না এলেই ভাল করতাম।'

আমবা চুপচাপ অনাদির কথাটা ভাবছিলাম। সবুজ একটা বুনোপাখি চিকিব-চিকি করে ডাকতে ডাকতে চোখের পলকে আমাদের মাথাব ওপব দিয়ে উড়ে চলে গেল।

কমলেন্দু সব জেনেশুনে বুঝে হঠাৎ বলল, 'কেনঃ আমরা না এলে কি ভাল হতঃ'

অনাদি ধীবস্থির প্রকৃতিব, আস্তে আস্তে নীচু গলায় সে কথা বলে। সামান্য অপেক্ষা করে সে বলল, 'ভুবন হযতো অস্বস্তি বোধ কবাছে। ঠিক এ সময়ে সে বোধহয় আমাদের বাদ দিয়েই তার স্ত্রীকে ভাবতে চেয়েছিল।'

'ভাবুক, কে তাকে বাবণ করেছে—' খানিকটা অবহেলা, খানিকটা উপহাসেব গলায় আমি বললাম।

অনাদি আমাব দিকে তাকাল। 'আমবা ওব চোখের সামনে বসে থাকলে ভুবনেব পক্ষে আমাদের বাদ দিয়ে শিবানীকে ভাবা মুশকিল।'

কমলেন্দু শুয়ে শুয়ে বলল, 'বেশ তো, তা হলে সাত-সকালে লোক দিয়ে আমাদের বাড়িতে শিবানীব মাবা যাবাব খবব পাঠানো কেন। না পাঠালেই পাবত।'

'কিংবা বলে দিলেই পাবত আমবা যেন না আসি', আমি বললাম।

'খবব না দিলে খারাপ দেখাত, বোধহয় ভদ্রতা কবে...'

'আমবাও ভদ্রতা বক্ষা কবাছি। শিবানী আমাদের বন্ধুব স্ত্রী, তাব সংকাবে না আসাই কি ভাল দেখাত।' কমলেন্দু বলল।

'বন্ধুব স্ত্রী শুধু কেন, শিবানী আমাদের কি বলব বান্ধবী, যাই বলো... সেও তো আমাদের কিছু একটা ছিল। সে মাবা গেছে, আমবা শ্মশানে আসব নাঃ' আমি বললাম।

অনাদি আব কথা বাডাল না। পকেট হাতড়ে আবাব সিগারেট বেব কবল। আমাদের দিল। নিত্যানন্দ চিতাব কাছে গিয়ে খোঁচার্খিচি কবতে কাঠ ফেটে শব্দ হলো। সে চোঁচিয়ে বি যেন বলল, তাব সহচব দুটি ছেলে তাব কাছে গেল। ভুবন মুখ তুলে চিতাব দিকে তাকিয়ে আছে। চিতাব ওপব কয়েকটি গ্রাণ্-স্কুলিস যেন আতসবাত্তিব মতন বাতাসে উড়ে ফেটে গেল, সামান্য ছাই উড়ল। একটি ছেলে কয়েকটি কাঠেব টুকবো যেলল চিতায়।

ভুবন চিতাব দিক থেকে চোখ ফিবিয়া উদাসভাবে নদী আকাশ আব ভঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপব এক সময় আমাদের দিকে মুখ ফেবাল। আমাদের মধ্যে দূবত্ব সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাব চোখাচোখি হলো। ভুবন মুখ ফিরিয়ে নিল, নিয়ে ইঁটুব ওপব কনুই বেখে গালে হাত দিয়ে নদীব দিকে তাকিয়ে থাকল। ওব এই ভঙ্গি আমাব ভাল লাগছিল না। মনে হলো, আমাদের যেন সে আব দেখতে পারছে না, বা দেখেও দেখতে চাইছে না—উপেক্ষা কবাছে।

বাডাবাড়ি দেখলে আমাব রাগ হয়, ভুবনেব এতটা বাডাবাড়ি দেখে আমাব কেন্ন রাগ আব বিবস্তি হচ্ছিল। আতিশয্যা কেনঃ আমরা কি জানি না শিবানীব সঙ্গে ভুবনেব সম্পর্ক কি ছিলঃ তবেঃ তবু ভুবন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমবা কিছু জানি না, যেন শিবানী তাব সর্বস্ব ছিল, শিবানীর মৃত্যুতে তাব বিশ্বভুবন অন্ধকার হয়ে গেছে।

দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পাচ্ছিল। ভুবনেব বোকামির শেষ নেই। তুমি যে কাকে এত শোক দেখাচ্ছ ভুবন, তবু যদি শিবানীর ভালবাসা পেতে! শিবানী তোমায় ভালবাসে নি, যদিও শেষ পর্যন্ত তোমায় বিয়ে করেছিল। তুমি স্বামী হয়েছিলে বলে যা পাবার পেয়ে গেছ, তা ভেব না। বরং শিবানীর ভালবাসা বলতে যা, তা আমি পেয়েছিলাম।

ফাল্গুনের দমকা বাতাস এলো দক্ষিণ থেকে; নদীর তপ্ত বালির ওপর দিয়ে ঘূর্ণি তুলে ঘোলাটে বাতাস নাচতে নাচতে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। ভুবন আবার হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে হাত আড়াল করে বসল। যেন সে কাঁদছে।

ভুবনের এত আতিশয়া আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। অনাদি আর কমলেন্দুকে বললাম, ‘আমরা একটু আড়ালে গিয়ে বসি না হয়—’ বলে উপহাসের গলায় মন্তব্য করলাম, ‘ভুবনবাবুর আমাদের হয়তো সহ্য হচ্ছে না, অনাদি যা বলল।’

কমলেন্দু শিমুলফুল দেখছিল, নাকি আকাশ, কে জানে। সে বলল, ‘তাতে যদি ভুবন শান্তি পায় আমার আপত্তি নেই। ... আমার বরং শিবানীর চিতার কাছে বসে ওদিকে তাকিয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগছে।’

‘তাই বুঝি শুয়ে আছ, আকাশ দেখছ?’

কমলেন্দু কথার জবাব দিল না।

অনাদি এবাব বলল, ‘আমাবও কেমন অস্বস্তি লাগছে। একটু আড়ালে দূরে গিয়ে বসাই ভাল। তাছাড়া এবার এদিকে রোদ ঘুবে গেছে, বসে থাকা যাবে না।’

আমবা আরো অল্পক্ষণ বসে থেকে শিমুলতলা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তারপর তিন বন্ধু শিবানীর চিতা এবং ভুবনের দৃষ্টি থেকে সরে অন্য দিকে চলে যেতে লাগলাম।

খানিকটা দূবে এসে আমরা বসলাম। এখানে ঘন ঝোপঝাড় আব ছায়া, মাথাব ওপর নিমগাছ, সামনে কূলঝোপের ওপর দিয়ে নদী দেখা যায়। মাঝে মাঝে পাখি ডাক ছাড়া আব কিছু কানে যাচ্ছে না। নদীর বালি ছাড়া অন্য কিছু চোখেও পড়ছে না। এখানে যে যার মতন আবাম করে বসলাম, বসে নিশ্চিন্ত হলাম।

কিছুক্ষণ আমাদের মধ্যে ছোটোখাটো দু-চাবটি কথার বিনিময় হলো; শিবানী এভাবে, আচমকা একটা অসুখে মারা যাওয়ায় আমরা দুঃখিত। শেষে আমবা একে একে কেমন নীবব হয়ে গেলাম। নদীর দিকে অপরাহ্নের স্তিমিত ভাব নামছিল। আমবা তিনজনেই কখনো নদী, কখনো শূন্যতা, কখনো গাছপালা, কখনো পায়েব তলায় ঘাস-মাটি দেখছিলাম। এবং পরিপূর্ণ নীবব হয়ে গিয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর হঠাৎ কমলেন্দু কেমন করে যেন নিশ্বাস ফেলল। দীর্ঘনিশ্বাস নয়, ভাব চেয়েও যেন গভীরতাপূর্ণ কিছু; তার নিশ্বাসেব শব্দে আমবা ওব দিকে সচকিত হয়ে তাকলাম।

কমলেন্দু সুপকষ। তাব মুখ এখনো দু মুহূর্ত তাকিয়ে দেখাব মতন। লম্বা ধরনের কাটাকাটা মুখ, রঙ ফরসা, নাক এবং চোখ বেশ তীক্ষ্ণ। তার ফরসা সুন্দব মুখে আমবা কোথায় যেন এক বেদনা দেখতে পেলাম।

অনাদি বলল, ‘কি হলো?’

কমলেন্দু অনাদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর আমাদের দিকে তাকাল। শেষে বলল, ‘না, কিছু নয়। ... কই, দেখি একটা সিগারেট .’

পকেট থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে ওকে দিলাম। নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ও আমাদের দু’জনকে দুটো সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া গলায় নিল। তারপর আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এ দিকটায় পালিয়ে এসে ভালই হয়েছে। সামহাউ, আমার শিবানীর চিতাব সামনে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। ... হতে পাবে, তখন আমি বোকা ছিলাম, বয়স কম ছিল, তবু এ কথা তো ঠিক, শিবানী আমাকে ভালবেসেছিল। ... আমার চেয়ে বেশী সে আর কাউকে কখনো ভালবাসেনি।’

আমরা তিন বিগতযৌবন বন্ধু পরস্পরের কথা জানতাম এবং ভুবন, আমাদের চতুর্থ বন্ধুও সব জানত। কমলেন্দুর সঙ্গে শিবানীর মেলামেশা ভালবাসার কথা আমার অজানা নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সে যে দাবীটুকু জানাল তাতে আমার আপত্তি হলো না। সবচেয়ে বেশী ভালবাসার কথা উঠলে শিবানীর কাছে আমার চেয়ে আর কেউ বেশী পেয়েছে এ আমি বিশ্বাস কবি না। একেবারে সরাসরি না হলেও, কমলেন্দুকে শোনাবার জন্যে, ঠাট্টার একটু গলা করে বললাম, ‘আমাব তো মনে হয়, ওটা আমিই এক সময়ে পেয়েছি।’

ধীরস্থির শান্তশিষ্ট মানুষ হলেও অনাদি এখন হঠাৎ কেমন অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হলো। ঠোট থেকে সিগারেট সরিয়ে বলল, ‘এ সব তোমাদের মনের ধারণা, কল্পনা। আমার সঙ্গে শিবানীর ঘনিষ্ঠতা এমন সময়ে হয়েছে যখন আমরা দুজনে কেউই বাচ্চা ছিলাম না। সিরিআসলি যদি কাউকে সে ভালবেসে থাকে, আমি সে দাবী সবচেয়ে বেশী করতে পারি।’

অনাদির কথায় আমি বা কমলেন্দু, আমরা কেউই খুশী ছিলাম না। আমাদের কথায় অনাদিও হয় নি। তিনজনে আজ আমরা যে দাবী কবছি সে দাবী ছেড়ে দেওয়া কেন যেন আমাদের সাধ্যাতীত বলে আমার মনে হলো। আমাদের তিনজনেরই বয়েস হয়েছে, চল্লিশের এপাবে চলে এসেছি। আমাদের তিনজনেরই স্ত্রী আছে, সন্তান আছে। আজ শিবানীর সঙ্গে আমাদের প্রেম নিয়ে অকারণ গল্প কবার বা মনোমালিন্য সৃষ্টি কবার কোনো অর্থ ছিল না। তবু, আমবা তিনজনেই এমন এক দাবী জানাচ্ছিলাম, যেন সেই দাবী প্রতিষ্ঠা করতে না পাবলে আমাদের কোনো বিশেষ সুখ ও অহংকাব প্রকাশ করা যায় না।

কমলেন্দু ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সিগারেটে, সে অনাদির দিকে এবং আমাব দিকে বাব বাব তাকাল, তাবপর সিগারেটের টুকবোটা ফেলে দিয়ে বলল, ‘আমার সঙ্গে শিবানীব ওপব-ওপব মেলামেশা তোমবা দেখেছ, আমি তোমাদের সে-সব গল্পও বলতাম, চিঠিপত্রও দোঁযেছি, কিন্তু ভেতবে আমাদের কি হয়েছিল, তোমরা কি কবে জানবে?’

‘ভেতবে ভেতবে যা হয়েছ তাও তো পবে তুই বলেছিস,’ আমি বললাম না।

‘না, আমি সব বলি নি। কিছু না-বলা আছে, সামর্থ্য সিকবেট .’

‘সে-বকম গোপনীয়তা আমাবও আছে, কমল।’ অনাদি বলল।

আমাবও গোপনীয়তা ছিল। আমবা তিন বালাবন্ধু পরস্পরের কাছে জীবনের কোনো কিছুই বড় একটা অগোচব বাখতাম না। শিবানীর বেলায়ও কিছু রাখনি, বাখতে চাই নি, তবু শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় কিছু রেখেছিলাম, নয়তো আজ একথা উঠত না। শিবানীব সঙ্গে মেলামেশাব সময়ও আমবা কেউ কাকব প্রতি দীর্ঘাষিত হই নি। কেন না—কমলেন্দু শিবানীব সঙ্গে কৈশোবে ও প্রথম যৌবনে মেলামেশা কবেছিল, করে শিবানীব কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। শিবানীব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা একেবারে যৌবনবেলার, আমাব সঙ্গে শিবানীব ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবাব পব অনাদির সঙ্গে শিবানীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। শিবানীও আমাদের বালাকালের বান্ধবী। তার সঙ্গে আমাদের যা যা হয়েছ তা পবস্পবকে আমবা জানিয়েছি। স্বভাবতই কোনো ইতব দীর্ঘা আমাদের থাকাব কথা নয়, তবু যদি কোনো দীর্ঘা থেকে থাকে বা হয়ে থাকে তা তেমন কিছু নয়। নয়তো আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটত এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব বজায় থাকত না। এককাল যা হয় নি তা হওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। শিবানীকে নিয়ে কোনো বিবোধ আমাদের মধ্যে হয় নি, সে জীবিত থাকতে যা হলো না, আজ যখন সে আমাদের মধ্যে আব নেই—তখন তা হবাব কোনো সম্ভব কারণ থাকতে পাবে না।

আমার কি রকম যেন মনে হলো। কমলেন্দুর দিকে তাকলাম, তাবপব অনাদির দিকে। আমার মনে হলো, ওবা নিজেদের গোপনীয়তাকে তাদের প্রতি শিবানীর চরম ভালবাসাব নিদর্শন হিসেবে মনে করছে। আমি নিজেও প্রায় সেইরকম মনে করছিলাম। যদিও আমাব আরো কিছু মনে হচ্ছিল।

কেমন এক অস্বস্তি এবং কাতরতাবশে আমি বললাম, ‘একটা কথা বলব?’

ওবা আমাকে দেখল।

‘আমাদের সব কথাই সকলের জানা।’ ধীরে ধীরে আমি বললাম, ‘আমবা কিছুই লুকোচুরি রাখি নি, তবু আমাদের তিনজনেবই কিছু গোপনতা আছে। আজ সেটা বলে ফেলা কি ভাল নয়?’

কমলেন্দু অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। অনাদি চোখেব চশমাটা ঠিক কবে নিল। আমার মনে হলো ওরা অনিচ্ছুক নয়।

কমলেন্দু বলল, ‘বেশ। তাই হোক। কথাটা আজ বলে ফেলাই ভাল।’

অনাদি বলল, ‘আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবানীব চিত্তা এখন জ্বলছে, আমবা শ্রুশানে। এই সময় সে-সব কথা বলা কি ভাল দেখাবে!’

‘খাবাপই বা কি।’ আমি বললাম, ‘আমাব ববং মনে হচ্ছে, বলে ফেললেই স্বস্তি পাব।’

অনাদি আস্তে মাথা নাড়ল। সে সম্মত।

কমলেন্দুর দিকে আমি তাকলাম। সে বলুক প্রথমে। শিবানীব জীবনে সেই প্রথম প্রেমিক।

‘সব কথা বলাব কোনো দরকার নেই কমল, আমবা জানি। আমবা যা জানি না তুমি শুধু সেইটুকই বলো।’

কমলেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, ‘তাই বলব।’

কমলেন্দু বলল : ‘তোমাদের নিশ্চয় মনে নেই, আমি একবার মাস দেড়েক কি দুয়েকেব জন্যে মোতিহারিতে ছোটকাব বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিবে এলাম যখন, তখন বর্ষার ওক, আমাদের ম্যাট্রিকের বেজান্ট আউট হয়ে গেছে। বাবা পাটনায় মেসোমশাইকে আমাব কলেজে ঢোকাব সব ব্যবস্থা করতে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। পবীক্ষায় আমাব বেজান্ট কি হয়েছিল তোমরা তা জানো। কলেজে পডতে যাবাব আনন্দে তখন খুব মশগুল হয়ে আছি, বাড়িতে চব্বিশঘণ্টা আদবেব ঘটা চলছে। শিবানীব সঙ্গে আমাব তখন গলায় গলায়। মোতিহারিতে সে আমায় চিঠি লিখত। তার মা-বাবাব কথা তোমরা জান, পয়সাকড়ি থাকাব জন্যে, আর তার বাবা মনোজকাবা বেভিন-স্কীমে বিলেত ঘুরে আসাব পব আরো একটু সাহেবী হয়ে গিয়েছিলেন। শিবানীকে শাড়ি ধরাতে ওবা দেবী কবেছিলেন। আমি যখন মোতিহারিতে তখন শিবানী শাড়ি ধবেছে। চিঠিতে আমায় লিখেছিল। ফিবে এসে দেখলাম, ছিপছিপে শিবানীকে শাড়ি পরে একেবাবে অন্য রকম দেখাচ্ছে—বেশ বড় হয়ে গেছে—বেশ বড়। . . কই, আব একটা সিগারেট দাও তো . . ।’

অনাদি কমলেন্দুকে সিগারেট দিল। সিগারেট ধরিয়ে কমলেন্দু কেমন অনামনস্ক হয়ে থাকল সামান্য, তাবপর বলল :

‘একদিন বিকেলবেলা নাগাদ সাংঘাতিক বৃষ্টি নেমেছিল। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। এক একটা বাজ পড়ছিল—যেন মনে হচ্ছিল ঘরবাড়ি গাছপালায় আওন ধবিযে ছাই কবে দেবে। আর তেমনি আকাশ, পাকা জামের নতন কালো। . . দেখতে দেখতে যেন সন্ধ্যা। দোতলায় আমার ঘরে আমি দরজা-জানলা বন্ধ কবে বসে। একটা জানলা, যেটা দ্বিযে ছাট আসছিল না ভলের, খুলে রেখেছিলাম। উলটো দিকে শিবানীদেব বাড়ি। শিবানীল্ল মা—লতিকা-কাকিমার শোবার ঘরের গায়ে শিবানীর ঘব। আমার ঘর থেকে শিবানীর স্বর দেখা যায় ... কিন্তু খানিকটা দূর। আমরা আমাদের ঘরে বসে বসে জানলায় দাঁড়িয়ে হাত-টাত নেড়ে হাসি-তামাশা করছিলাম। কখনো কখনো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চোঁচিয়ে কিছু বলছিলাম, শব্দ বড় একটা পৌঁছছিল না।

‘আমি অনেকক্ষণ ধরে শিবানীকে ডাকছিলাম। ইয়ার্কি করেই। তাকে ইশা বা কবে বলছিলাম শাড়ি পবে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে আসতে। শিবানী আমায় বুডো আঙুল দিয়ে কাঁচকলা দেখাচ্ছিল। এইবকম কবতে করতে একেবারে সন্ধ্যা হয়ে এলো। পেয়াবাগাছের ডালের পাশ দিয়ে শিবানীর ঘবেব অনেকটাই চোখে পড়ে আমার। সে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে জানলায় বসে চুল বেঁধেছে, একটা শাড়িও আলনা থেকে এনে দেখিয়েছে, দূর থেকে বঙটা বুঝতে পাবি নি। . সন্ধ্যার মুখে সব যখন অন্ধকার, আমি নীচে থেকে বাতি আনতে যাব, দবজায় দুমদুম শব্দ। খুলে দেখি শিবানী, হাতে বাতি। সে ওই বৃষ্টির মধ্যে এ বাড়ি চলে এসেছে, নীচে থেকে আসার সময় মা তাব হাতে বাতি দিয়ে দিয়েছে। শিবানী এইটুকু আসতেই খানিকটা ভিজ্রে গিয়েছিল, হাত পা মাথা শাড়ির আঁচল বেশ ভিজ্রেছে। লণ্টনটা আমার হাতে দিয়ে শিবানী তাড়াতাড়ি দবজা বন্ধ করে দিল। জলের ছটি আসছিল। আমি আলনায় ঝুলানো আমার একটা জামা এনে ওর ভিজ্রে হাত মাথা ঘাড় মুছিয়ে দিতে লাগলাম। ওর মাথার চুল অনেকটা ভিজ্রে গিয়েছিল বলে শিবানী তাব লম্বা বিনুনি খুলে ফেলাছিল। ওকে আমি আমার পডাব টেবিলের সামনে চেযাবে বসিয়ে দিয়ে ভিজ্রে পা দুটি মুছিয়ে দিতে গেলাম, ইয়ার্কি করেই। ও পা দুটোতে লাগল, হাসতে লাগল। শিবানী ততক্ষণে মাথার চুল খুলে ঘাড় পিঠে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাবপব আমরা লণ্টনের আলোয় বসে গল্প করতে লাগলাম। শিবানীর গানের মাস্টাব ছিল, সে যে এক সময়ে মোটামুটি ভাল গাইত তা তোমবাও জানো। শিবানীকে একটা গান গাইতে বললাম। শিবানী যে গানটা গাইল তা আমার এখনো মনে আছে, আমি অনেকবার সে গান শুনেছি, কিন্তু সেদিনের মতন কখনো আব নয। ঝড় বৃষ্টি, বাইবেব দুর্যোগ আব অন্ধকারেব মধ্যে আমার ঘবে বসে মিটমিটে লণ্টনের আলোয় সে গাইল : ‘উতল ধাণা বাদল ঝাবে ।’ ওই গানেবই একটা জায়গায় ছিল ‘ওগো বধু, দিনেব শেষে এলে তুমি কেমন বেশে, আঁচল দিয়ে ওকাব জল, মুছাব পা আকুল বেশে ।’ বাব বাব শিবানী ওই চবণ দুটি গাইছিল, আব আমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্ট করে হাসছিল। অর্থটা আমি বুঝতে পাবছিলাম। গান শেষ হলে আমবা গল্প কবতে লাগলাম। এ গল্প সে-গল্প। শেষে আমবা ছেলেমানুষেব মতন হাতেব বেখা, কপালেব বেখা, ভাগা, ভবিষ্যৎ এইসব কথা নিয়ে মেতে উঠলাম। একে অন্যজনকে সৌভাগ্যেব চিহ্ন দেখাতে ব্যস্ত। হঠাৎ শিবানী বলল, তার বুকো নীল শিবাব একটা ক্রশ আছে। আমি বললাম, তা হলে সে মস্ত পুণ্যবতী। বলে আমি হাসছিলাম। এবকম যে হয় না, হতে পাবে না, তা আমি জানতাম। আমার হাসি দেখে শিবানী বুঝতে পাবল আমি তাকে অবিশ্বাস কবছি। সে বলল, ‘হাসছ কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?’ আমি মাথা নাড়লাম, ‘তুমি কি যীশু ?’ শিবানীর অভিমানে লাগল। বলল, ‘আহা, যীশু না হলে বুদ্ধি কিছু থাকতে পাবে না ?’ আমি তাকে আবো বাগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘যার কোথাও পাপ নেই তাব থাকতে পাবে । মানুষেব নয। যীশুব মতন তুমি মবতে পারবে ?’ শিবানী কি ভাবল জানি না, হঠাৎ যে সে তাব বুকোব জামাব ওপরের বেতাম খুলে—জামা অনেকটা সবিয়ে আমায় বলল, ‘আলো এনে দেখ।’ আমি দেখলাম। কি দেখলাম। কি দেখলাম তা তোমাদেব কাছে বলে লাভ নেই। বুঝতেই পারছ। তবে শিবানীর বুকো শিরা ছিল, নীলচে বঙের। সেটা ক্রশ কি না আমি দেখি নি। আমি অন্য জিনিস দেখছিলাম। . আজ আমার স্বীকার কবতে দোষ নেই, সেই বয়সে শিঘানীব সেই ইনোসেন্স ছিল। আমার হাতে সেটা মরে গেল।’

কমলেন্দু নীবব হলো। তাকে খুব অনামনস্ক ও অপরাধীর মতন দেখাচ্ছিল।

নদীর চরের ওপারে রোদ সরে যাচ্ছে, তাপ অনেকটা কমে এসেছে। কোথাও একটা কাক ডাকছিল, গাছের পাতায় বাতাসেব সবসর শব্দ হচ্ছিল। কেমন যেন একটা নিঃস্বাম ভাব।

আমরা তিন বন্ধুই নিশ্বাস ফেললাম। কমলেন্দু রুমালে মুখ মুছে নিল।

অনাদি আমার দিকে তাকাল। 'শিশির, তোমার যা বলার ...'

আমার বলার পালা কমলেন্দুর পর। শিবানীর জীবনে আমি দ্বিতীয় প্রেমিক, তার যৌবনের প্রেমিক। আমারও তখন যৌবন। আমাদের তখনকার ঘনিষ্ঠতার কথা কমলেন্দুদের অজানা নয়। ওরা যা জানে না, ওদের কাছে থেকে যা আমি গোপন রেখেছিলাম, এবাব তা বলাব জন্যে আমি তৈরী হলাম। কুলঝোপের মাথা ডিঙিয়ে অপবাহুর রোদ এবং নদী দেখতে দেখতে আমি গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, 'আমি খুব সংক্ষেপে সাবতে চাই।'

'শুনি...' কমলেন্দু বলল।

'বলছি ...। তোমাদের কাছে কোনো ভূমিকার দবকাব নেই। তবে তোমাদের জানা দরকার যে, তিন-চার বছর শিবানীর সঙ্গে আমার খুব মাখামাখি ছিল, এটা তাব শেষের দিকের ঘটনা—' আমি ধীরে ধীরে বললাম। 'শিবানীর বাবা তখন মাঝা গেছেন, লতিকা কাকিমারা তাঁদের নতুন বাড়িতে থাকেন। আমি আমার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ শেষ করে পাওয়ার হাউসের চার্জে বয়েছি। শিবানীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তখন এমন অবস্থায় যে, তোমরাও ভাবতে, আমি তাকে বিয়ে করব। লতিকা-কাকিমাও ভাবতেন। শিবানীরও তাতে সন্দেহ ছিল না। সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়ি গিয়ে আমাকে তখন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে হত না, সোজা ড্রয়িংরুমের পর্দা সরিয়ে বাঁদিকের দরজা দিয়ে শিবানীর শোয়ার ঘরে চলে যেতে পারতাম। গল্পওজব, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া সেবে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন বাত হয়ে গেছে। শিবানী আমায় ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত। আর প্রায় রোজই ফেবাব সময়, ফটকের কবরীঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে আমায় চুমু খেত। . শিবানীকে যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, তা আমার কখনো মনে হয়নি। তাব গায়েব বঙ, চোখমুখেব ছাঁদ আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু তাব শরীর আমার ভীষণ পছন্দ ছিল. তাদের বাড়ির আবহাওয়ায় যে স্বাধীনতা, সপ্রতিভ ভাব, খোলামেলা আচরণ ছিল, তাও আমার খুব পছন্দ ছিল। নতুন ধবনোব কচি, পবিচ্ছন্নতা, বেশবাসেব সৌন্দর্য .. এ-সবেব জন্যে, আর শিবানীর তখনকার শরীরেব জন্যে তাকে আমার ভাল লাগত। শিবানীর সেই যৌবন বয়সে, তোমরা জানো, মনে হত তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়েছে। একদিন, সেটা শীতকাল, লতিকা কাকিমা তাদের মহিলা সমিতির মিটিঙে গিয়েছিলেন। বাড়িতে চাকর আর ঝি ছিল। ঝি-টাব ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করেছে, সে শুয়ে আছে। শিবানীর শোবার ঘরে বসে আমরা গল্প করছিলাম। জানুয়ারি মাস, প্রচণ্ড শীত। ঘরের জানলা-টিনলা সবই বন্ধ ছিল। . সাধাবণ একটা কথা নিয়ে আমরা দু'জনেই হাসছিলাম, হাসতে হাসতে শিবানী বিছানায় গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। সে এমনভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে তাব একটা হাত মাথার ওপর দিয়ে বালিশে পড়েছে, অন্য হাতটা তার কোমরের কাছে বিছানায় অলসভাবে পড়ে আছে, তার মুখ সিলিংয়ের দিকে, মাথার ওপর হাত থাকার জন্যে তাব বুকের একটা পাশ আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিবানীর কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত বিছানা থেকে মাটিতে ধনুকের মতন বঁকে—কিংবা বলা ভাল—চেউয়ের মতন ভেঙে পড়েছে। বিছানাব ওপর সূজনিটা ছিল কালচে-লাল, তাতে গোলাপেব মতন নকশা, শিবানীর পরনের শাড়িটা ছিল সিল্কের, তার রঙ ছিল সাদাটে। ওর ভাঙা শরীরের বা আছড়ে-পড়া শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার আত্মসংযম নষ্ট হয়ে গেল। ঘবেব বাতি নিবিয়ে দিয়ে আমি যখন তাব গায়ের পাশে, সে আমায় যেন কেমন কবে ফিসফিস গলায় গরম নিশ্বাসেব সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, আমি কবে তার মাকে কথাটা বলব। .. আমি তখন যে-কোনো বকম ধাক্কা দিতে রাজী। বললাম, কালই বলব, কাল পবশুর মধ্যে। শিবানী যেন অন্ধকাবেব মধ্যে সুখে

আনন্দে উদ্ভাসে সর্বাস্থে গলে যেতে শুরু কবল। . সে কতবার কবে বলল, সে আমায় ভালবাসে। আমি কতবার করে বললাম, আমি তাকে ভালবাসি। তারপর ঘবের বাতি জ্বালা হয়ে গেলে আমি শিবানীর ময়লা বগু, ছোট কপাল, মোটা নাক, সামনের বড় বড় দাঁত, পুরু পুরু ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে পালিয়ে এলাম। তারপর থেকেই আমি পালিয়েছি .

আমি থেমে গেলাম। আমাব গলার কাছে একটা সীসেব ডেলা যেন জমে গিয়েছে। চোখ ফেটে যাচ্ছিল। কী যে অনুশোচনা আজ, কেমন কবে বলব।

নদীৰ ওপাৰে বনের মাথায় রোদ চলে গেছে। ছায়া পড়ে গেছে নদীর চর জুড়ে। ফাল্গুনের বাতাস দিচ্ছিল। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে আসতে শুরু কবেছে। সমস্ত জায়গাটা অপবাহুৰে বিবৰ্ণতায় ক্রমশই মলিন হয়ে আসছে।

আমাদের তিন বন্ধুর নিশ্বাস পড়ল।

আমি সিগারেটের প্যাকেট বেব কবলাম। মুখ মুছলাম কোঁচায়। তিনজনে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম। এবার অনাদির পালা। শিবানীর জীবনে তৃতীয় প্রেমিক। অনাদির দিকে তাকানাম আমবা।

অনাদি প্রায় আধখানা সিগারেট শেষ কবল, কোনো কথা বলল না। শেষে মাটির দিকে তাকিয়ে তাব কথা শুরু কবল :

‘শিবানীর সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা যখন হয়েছে তখন আমবা কেউই বাচ্চা নেই। আমাব বয়স তেরত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছিল, শিবানী প্রায় ত্রিবিশ। লতিকা মাসিমা তখন আব ঠিক বেঁচে থাকাব মতন অবস্থায় নেই। সেই আবথাবাইটিসেব অসুখে পঙ্গু, শয্যাশায়ী। আমি ব্যাংকে ‘আকাউন্টেণ্ট’ হয়েছি নতুন। তোমবা ভাই জানো, মহেশ্বরী যখন কন্টাকটাবী ব্যবসায় নামল তখন আমি তাব পেছনে ছিলাম, তাব সঙ্গে আমাব ভেতরে ভেতরে কথা ছিল, তাব লাভেব একটা পার্সেন্টেজ আমায় দেবে, আমি ব্যাংকে তাব সববকম সুবিধে কবে দেবো। প্রথম প্রথম মহেশ্বরীৰ কাছ থেকে বেংকী দু’ চাবশো পেতাম। ব্যাংকে আমি তাব সুবিধে টুবিধেব মাত্রাও বাড়াতো লাগলাম। মামা ম্যানেজাব, যদিও নিজেব মামা নয়। মামাকে আমি নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স কবতাম। কিন্তু মহেশ্বরী শেষে আমায় ডুবিয়ে দিল। বিস্ত্রী এক অবস্থায় পড়লাম। ব্যাপারটা এমন ঘোবালো হয়ে দাঁড়াল যে, আমাব পক্ষে কোথাও আব আইনেব ফাঁক থাকল না। শিবানীর সঙ্গে আমাব তখন মেলানেশা। সত্যি কথা বলতে কি, আমাব তখন এমন কাউকে দবকাব, যে আমায় অর্থসাহায্য কবতে পাবে। অস্তুত একটা জামিন থাকলেও আমাব পক্ষে একটু সুবিধে হয়। শিবানীদেব নিজেব বাড়িঘব, জমি, লতিকা মাসিমাৰ—আমি তাঁকে মাসিমা বলতাম—কিছু টাকা এবং অলংকাব ছিল। নিজেকে বাঁচাবাব জন্যে শিবানীদেব শবগাপন্ন হবাব কথা ভাবছিলাম। লতিকা মাসিমা মাবা গেলে সমস্ত সম্পত্তিই শিবানীর হবে। তাছাড়া, লতিকা মাসিমা বেঁচে থাকতেও যদি শিবানীর সঙ্গে আমাব তেমন একটা সম্পর্ক দেখতে পান, তিনি আমায় বিপদ থেকে পৰিত্রাণ কবতে পাবেন। বেশি বলে লাভ নেই, আমি শিবানীর সঙ্গে যে ধবনেব সম্পর্ক পাতালাম—তাতে মনে হবে আমবা যেন স্বামী স্ত্রী। আমি শিবানীর অঙ্গ স্পর্শ কবি নি—মানে সেভাবে নয়, আমাব তাতে আগ্রহ ছিল না। অথচ আমি শিবানীদেব বাড়িতে সাবাদিনং থেবেছি। তাদের বাড়িতে থেকেছি, থেখেছি, বিছানায় শুয়েছি, লতিকা মাসিমাৰ জন্যে ডাভাব ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করেছি, শিবানীর ও তাদের সংসাবেব তদাবকি কবেছি। আমাব ওপব লতিকা মাসিমাৰ সুনজর পড়ল, শিবানী প্রথম প্রথম আমায় কি ভারত জানি না, পরে সে আমাব উপব নির্ভর ও বিশ্বাস কবতে লাগল। তখন চাকরিতে আমার গণ্ডগোল বেধে গেছে,

মামার জোবে তখনো জেলে যাই নি, কিন্তু মহেশ্বরীকে মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। শরীর খারাপেব অজুহাতে আমি ছুটি নিয়েছি, পুজোর মুখে। আমাব বাড়ি বলতে এক মা. বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলাম। ছুটি নিয়ে শিবানীদের বাড়িতে পড়ে আছি। দৃষ্টিস্তায় খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখ-মুখ শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। এমন সময় একদিন বিকেল থেকে লতিকা মাসিব খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। ডাক্তার ডেকে আনলাম, ওষুধপত্র চলতে লাগল নতুন করে। .. সেদিন সন্ধ্যার পব লতিকা মাসিব অবস্থা যখন একটু ভাল হলো, আমি বাইবে—শিবানীদের বাড়ির বাগানে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, অন্ধকারে। এমন সময় কখন শিবানী পাশে এসে দাঁড়াল। দু'চারটে কথার পব সে বলল, আমি আব কতদিন এভাবে দৃষ্টিস্তা দুর্ভাবনা নিয়ে বসে থাকব? ... আমি তখন জামিন এবং টাকার কথা বললাম। শিবানী কিছু না ভেবেই বলল, লতিকা মাসির কাছে সে সব বলবে। আমরা দু'জনেই তখন একটা শিউলিগাছের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, অনেক দিন পবে ইঠাং আমার নাকে শিউলি ফুলের গন্ধ লাগল। আমি শিবানীর হাত টেনে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় কঁদে ফেলেছিলাম। আমার সেই কান্না কুকুবেব মতন। শিবানী আমায় সাধুনা দিল। পবে বলল, 'এই ঘববাড়ি টাকা—এ-সব মা আমাব ভবিষ্যৎ ভেবে বেখেছে। যাব কাছে আমার আশ্রয় জুটবে, এ-সবই তার। তুমি তো এ-সবই তোমাব নিজের ভাবতে পাব।' আমি সে বাত্রে অনেকটা নিশ্চিত হলাম। লতিকা মাসিমা আমাব তবফে জামিন দাঁড়ালেন, কিছু টাকাও আমায় তিন দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহেশ্বরী মামলায় এমন এক অবস্থায় পড়ল যে তাকে সবিয়ে-বাখা টাকা বেব কবে দিতে হলো। আমাব গুগোলটাও মিটে গেল। লতিকা মাসি অবশ্য আবো মাস কয়েক বেঁচে ছিলেন। কিন্তু শিবানী ভবিষ্যতের জন্যে আমাব ওপব নির্ভব কবতে চেয়েছিল, সে-ভাব আমি নিই নি, তাকে আশ্রয়ও দিই নি। শিবানীকে ঠিক বিয়ে কবাব মতন মেয়ে আমাব কোনোদিনই মনে হয় নি। . '

অনাদি চুপ কবল।

আমরা চুপচাপ। নিঃসাড় যেন। একটা সাদা ধবধবে বক নদীৰ ওপব দিয়ে গোখূলিব আলোব সীমানা পেবিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

কমলেন্দু বলল, 'লতিকা কাকিস্বাব টাকাটা তুমি ফেবত দাও নি?'

'পবে মাসিমা মারা যাবাব পব শিবানীকে কিছুটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয় নি।'

আব কোনো কথা হলো না। আমবা তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন প্রেমিক-পুরুষ নীরবে বসে থাকলাম, কেউ কাবো দিকে তাকলাম না। বসে বসে কখন যেন দেখলাম, আকাশ বন নদী জুড়ে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। আমাদের চাবপাশে সেই সীসেব মতন ছায়া ক্রমশই জমতে লাগল। আমাদের নাম ধরে চিতার কাছ থেকে ওরা তখন ডাকছে।

দাহ শেষ। চিতা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছেলেগুলোর জল ঢালা ফুবোলো। এবাব আমরা। নদী থেকে মাটির কলসিতে জল ভবে এনে কমলেন্দু শিবানীর ভিজে চিতায় জল ঢেলে দিল। তারপর আমি। কমলেন্দুর হাত থেকে কলসি নিয়ে নদী থেকে জল ভবে আনলাম। এনে শিবানীর চিতায়, তাব নিশ্চিহ্ন শরীরের ছাইয়েব বাশিতে জল ঢাললাম। তারপব অনাদি জল দিল। শেষে ভুবন।

কলসিটা ভেঙে দিয়ে ভুবন ফিরল। আমরা কেউ আব পিছু ফিরে তাকাব না।

আমরা এগিয়ে চলেছি। ওরা পুরুতমশাই আর ছেলেরা আমাদের আগে আগে, গকর গাড়িটা চলছে, চাকার ককণ শব্দ, আমরা চার বন্ধু পাশাপাশি। ভুবনকে আমাদের পাশে

পাশে হেঁটে যেতে দেখে আমাদের অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বড় ক্লান্ত, অবসন্ন। মনে হলো যেন ঠিক মতন পা ফেলতে পারছে না। আমরা তাকে গরুর গাড়ির ওপর বসিয়ে দিলাম জোর করে। সে আমাদের দিকে মুখ করে গরুর গাড়িতে বসে থাকল, উদাস দৃষ্টিতে।

এমন সময় চাঁদ উঠে গেল। গুরুপক্ষ, আজ বুঝি ত্রয়োদশী।

নদী পিছনে, দু'পাশেব জঙ্গল ওটোনো পাথার মতন দু'পাশে নেমে গেছে, সামনে উঁচু-নীচু কাঁচা বাস্তা। জ্যোৎস্না ধরেছে বনে, ঝিল্লিবব ঘন হয়ে এলো। ফাল্গুনের বাতাস বইছে, গরুর গাড়ি'ব চিকণ বরুণ শব্দ ছাড়া আর শব্দ নেই, আর আমাদের পায়ের শব্দ। মাথা'ব ওপর চাঁদ।

যেতে যেতে কমলেন্দু হঠাৎ বলল ভারী গলায়, 'শিবানী'ব চিতায় জল ঢালা'ব সময় কেমন যেন কান্না এসে গিয়েছিল। আহা, বেচারী। ভাই, আমি আজ তা'ব কাছে, তা'ব চিতায় জল দে'বাব সময়, মনে মনে ক্ষমা চেয়েছি।'

অনাদি যে কাদছিল আমরা খেয়াল ক'বি নি। সে ছেলেমানুষে'ব মতন মুখে কান্না ও লাল জড়িয়ে বলল, 'আমিও . '

চাঁদে'ব আলোয় আমরা তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিন প্রেমিক চলেছি। আমাদের সামনে ভুবন। পিছনে শ্মশান, শিবানী'ব ধুয়ে-যাওয়া চিতা।

যেতে যেতে সামনে ভুবনে'ব দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, আমরা তিনজনে—তিন প্রেমিক শিবানী'র নিষ্পাপতা, কৌমার্য, নির্ভরতা তা হরণ করে নিয়েছিলাম। নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তা'বপ'বও যাব কি অবশিষ্ট ছিল শিবানী'ব, যা ভুবন পেয়েছে। কি পেয়েছে ভুবন যাব জন্যে তা'ব এত ব্যথা?

চাঁদে'ব আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তা'র চাবপাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চবাচ'ব তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি ক'বছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।

সলিমের মা

ননী ভৌমিক

ধান কাটার পর ধু ধু কবে বিস্তীর্ণ বাদামি মাঠ। আঁকাবাঁকা আল বেয়ে মানুষের চলার পথ সাদা হয়ে তকতক করে। নিচু জমির জলজ ঘাসগুলো পেকে হলুদ হয়ে আছে কোথাও। ছোট-ছোট তামাকের সবুজ ক্ষেত। কদাচিৎ উইটিবির মত দু-একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়বে এখানে ওখানে। লম্বা দড়ি ব খুঁটুটুকু ধরে কদাচিৎ দু-একটা ন্যাংটো ছেলেকে দেখা যাবে গরু চরাতে নিয়ে যাচ্ছে।

তা ছাড়া মানুষ দেখা যায় না বড়। সাবা বছর ধবে ক্ষেতে ক্ষেতে অক্লান্ত পবিশ্রম কবে কোথায় হারিয়ে থাকে তাবা। বুদ্ধা আৰ আক্ৰোশ নিয়ে লুকিয়ে থাকে দশ হাজাৰ বিঘা মাঠের ফাঁকায়।

তার পর ধান পাকে একদিন। মেটো পথে টাল খেয়ে সাববন্দী গকব গাড়ি চলতে শুরু কবে তখন। মানুষ দেখা যায় হঠাৎ। দূৰ হাটের পথে পাড়ি দেবার চণ্ডা রাস্তাব পাশে ঘাসটুকুৰ ওপৰ বসে হাঁটুভৰ্তি ধুলো নিয়ে। অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ কবে, গবেষণা চলে ধানের দর নিয়ে। ধান বিক্রি কবে দেবে সবাই। বিক্রি কবে কাপড় কিনবে, কস্মল কিনবে। দুনো সুদে কর্ত্ত শোধ দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাইবে দু মাসেব জানো।

হাট না, মেলা। পৌষ মাসে ধান কাটা হয়, মাঝে মাঝে মেলা বসে জমজমাট। দশ-বারো ফ্রোশ এলাকা জুড়ে যত আধিয়াব চাষী, সবাই গিয়ে জোটে সেখানে, ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবাই। লজ্জার বিধিনিষেধ যাদেব শক্তি নয়, সেই সব ক্ষত্রিয় মেয়েবা পবম্পরেব আঁচলে আঁচলে গিঠ বেধে মেলা বোরে দিনেব পর দিন। মাটিতে জোয়াল নামানো গকব গাড়িৰ ছইয়েব ভেতব থেকে ছেঁড়া কাপড়েব পর্দা ফাঁক কবে মুসলমান ববেব মেঘেরা চেয়ে থাকবে উৎসুক তৃপ্তি নিয়ে। নির্বাধ উৎসব চলবে কয়েকদিন।

‘ধানকলেব পাইকালবা কিনিবার চায় না, কি করা বাপুবে—।’

‘কটকটা বুদ্ধি উঁযাদেব’

সাবা বছব মেহনত কবে যে-ধান ঘাবে উঠল সে ধান বিক্রি করে দেয অনাযাসে। তার পব বিষম্ভ ভাবে বাড়ি ফেবে এক এক করে।

মুই-মুড়কি-মোয়া, ওডের তেঁবে মিঠাইয়েব দোকান, জোলাব কাপড় গামছা, গরুহাটিব অণ্ডনতি জোয়ান-জোয়ান গক—শীত পোয়াবাব জন্য জ্বালানো সারি সারি বোলাটে আণ্ডন—অঙ্ককারে মেটো জোনাকির মত ঝিলমিল কবে মাঠ জুড়ে।

‘গরু কেনা গেল না’

‘না, কেনা গেল না—’

তার পর রিক্ত ক্ষেতের এখানে ওখানে উইটিবির মত নিঃশব্দ কুঁড়েগুলোয় ফিরে আসবে এক-এক করে। দশ হাজাৰ বিঘা জমির ফাঁকায় আবার হাবিয়ে যাবে।

মঈনুদ্দিন প্রধানও ফিরে আসে আর সকলের মত। গরু কেনে না, কাপড় কেনে না। ফিরে এসে উঁচু দাওয়ার ওপর বসে হাঁফায়।

ভাঙা দাওয়া। তিনটে ঘরের মাটি গলে দেয়াল ভেঙে পড়েছে। প্রশস্ত ফাঁকা আঙিনায় দুটিখানিক ধান শুকোয়।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চায় না ওকে। আপন মনে ধান কুটে চলে সলিমের মা। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বুড়ি দাদি আপন মনে ঘ্যান ঘ্যান করে বলতে শুরু করে এক সময়—
'তুই মববু, তুই মরবু সলিমের মা—'

একটা চাপা অস্বস্তি আর শত্রুতায় টান ধরে বুকের ভেতর। বসে থেকে মঈনুদ্দিন হঠাৎ ফাঁকা গলায় চিংকার করে ওঠে— 'ভাত দিবার হয় কি না-হয়—'

মঈনের মুখের দিকে তাকিয়ে টের পায সলিমের মা। গাইনটা নামিয়ে বেখে মাটির দিকে শক্ত হয়ে চেয়ে থেকে অপেক্ষা করে।

ভোঁতা মত চেলা কাঠ একটা খুঁজে বেডায় মঈন। হাতের কাছে যা পায তাই নিয়ে কুঁদে কুঁদে এগিয়ে যায় সলিমের মার দিকে। স্থির হয়ে নীরবে মার হজম কবে সলিমের মা। কাঁদে না, প্রতিবাদ করে না। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তার পর ভাত বেড়ে দেয় মঈনকে।

এ-রকম মার খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে সলিমের মার। মঈনুদ্দিনের কাচ মুখেব প্রত্যেকটি নির্ভুর ভাঁজ ও যনিষ্ঠভাবে চেনে। অপবাধ হোক না হোক, জানে কখন মানুষটা হিংস হয়ে উঠতে চাইবে।

অথচ এমন ছিল না মঈনুদ্দিন। এমন হালও ছিল না এ বাড়ির। মঈনুদ্দিন প্রধানের বোটা মঈনুদ্দিন প্রধানের বাড়ি এ এলাকায় সকলে চেনে। নাম ছিল, ক্ষমতা ছিল, সম্মান ছিল প্রধানদের। তবু এক পুরুষ দু-পুরুষের ভেতরেই কেমন কবে যেন সম্পন্ন কৃষক আধিযাবে পবিগত হয়ে যায়। আঙিনার ওপর গোলা দুটো ভরাট হয় না আব। কোঠা বাড়িব টিনের চালেব ওপর হলুদ হয়ে মবচে ধরে।

অনেক কাল আগে গরুর গাড়ি চেপে সলিমের মা এসেছিল এ বাড়িতে নতুন বৌ হয়ে। গাড়িব ভেতর ছিল মঈনুদ্দিন, বাকি সবাই পেছনে পেছনে হেঁটে আসছিল। মুসলমানোব বৌ, তাই ছই-ফেলা গাড়িতেও হয় নি, কাপড়-গামছা ওঁজে ঢেকে দেওয়া ছিল ছইযেব মুখটা। কাপড়ের আবরণটা অল্প একটু ফাঁক করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সলিমের মা। মাঠেব পব মাঠ আশমান ছুঁযেছে। মাঝে মাঝে বাঁশ ঝাড়, মাদার গাছ, কাঁঠাল গাছ দু-একটা।

এত জমি অথচ মানুষ নেই যেন। এক টুকরো জমি পড়ে থাকলে ছুটে আসবে না লোকে, ভিড় কবে কাড়াকাড়ি শুরু কববে না।

'তোমাদের গাঁয়ের মানুষগুলো ধনী।' নতুন বৌ বলেছিল মঈনকে। শুনে হেসে উঠেছিল মঈনুদ্দিন। রঙিন স্ফুণ্ড পবা, পাটের পিবান গাযে বয়স্ক জোয়ান মানুষটাব দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল নতুন বৌ।

'হাসেন কেনে তুমি?'

'কবম আলি, করম আলি! এত বড় ধনী তোমাব গাঁওত নাই। দশ হাজার বিঘা—তামান জমি ওঁয়ার, বুঝ?'

গাড়ি এসে থেমেছিল এ-বাড়িতে। ঘরের সামনে বেড়া-দেওয়া তামাকেব ক্ষেত। অনেক দিন আগেকার সচ্ছল অবস্থার আঁচ পাওয়া যায় নকশা-কাটা খুঁটিতে। মাটিরই দাওয়া—তবু কিছু-কিছু ইট দিয়ে বাঁধাবার চেষ্টা হয়েছিল বোঝা যায়। চওড়া আঙিনার চাব পাশে ছয়-সাতটা মাটির ঘর। এককালে হয়ত ভর্তি থাকত মানুষে, এখন অব্যবহৃত ধস-খাওয়া আব আছে প্রধানদের ঘরের আঁক বাঁচাবাব মতো য়েবাটোপ, মাটির উঁচু দেয়াল।

রাত্রে মঈনুদ্দিন সহসা গভীর হয়ে বলেছিল, ‘মানী ঘর আমাদেব। তিন হালেব চাষ ছিল বুড়ো দেওনিয়ার আমলে, এখন একটি হাল।’ কিন্তু আবার তো হবে? করম আলিব সঙ্গে মামলা চালাচ্ছে ও। মুনশেফ কোর্ট থেকে জজ কোর্ট, জজ কোর্ট থেকে চাই কি হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা চলবে বৈ কি। শহরের উকিল-আমলাবা বলে দিয়েছে—হাঁ, জয় হবে। আইন আছে, দলিল আছে, জয় হবে।

‘ভূমি হামাব ভূমি দখল করিবার আসছেন? খুঁটি গাড়ি করি দিবেন? হামার তো বন্দুক নাই। না—ই। বন্দুক নাই, পিষাদা নাই। কিন্তু আইন আছে ...।’

স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বলেছিল মঈন। গরিব হয়েছি, কিন্তু এ ঘরের ইমান বড় কড়া বৌ। ঘরের বাইরে পা বাড়িও না, অচেনা পবপুরুষের মুখের দিকে চেয়ো না—মঈনের মাও উপদেশ দিয়েছিল ওকে।

বাঁশেব তৈবি তাঁতে নকশা-তোলা ধোকব বুনতে বুনতে মাঝে মাঝে গল্প করে শোনাত পুরনো দিনের কথা। মঈনুদ্দিনের বাবা আইজুদ্দিন—তার বাবা ছিল এ তল্লাটেব সেবা লোক। ধনী, মানী। চারটা ‘বিয়া’ করেছিল মানুষটা। একটার বেশি ছেলে হয় নি। তাই খুব পেয়ার কবত ছোট বৌকে।

খুব সুন্দর নাকি ছিল বৌটা। তিন দিনেব পথ পেরিয়ে দক্ষিণ দেশ থেকে বহুত টাকা দিয়ে ঘরে এনেছিল। কিন্তু খেয়াল ভাল ছিল না সে বৌয়ের। দক্ষিণ দেশেব মেয়ে—বেসরম হয়ে তাকাত পরপুরুষের মুখের দিকে। একদিন দেওনিয়া দেখল—হাটেব পাইকারেব সঙ্গে হেসে কথা বলছে ছোট বৌ।

খুব বাগ হয়েছিল তার। ছেলেকে কেড়ে নিয়ে মাঝে মাঝে মারতে ঘবেব বাব কবে দিয়েছিল পেয়ারের বৌকে। আব কখনো ঢুকতে দেয় নি। বজ্জাত বৌটাও নাকি ফিবে আসে নি আর ..

হামাক মারে নাই, ঐ মঈনের বাপ? রাগ হলে না ভাঙলে চলবে না যে মানুষওলাব—গল্প শুনে হিম হয়ে আসত বৃকের ভেতব।

কিন্তু ভালো লেগেছিল বৈকি এ সংসাবকে। মন তাব থাকত নানান কাজে—ধান কাটা, কাঠ ফাড়া, গরুর দেখাশোনা করা? জেলাব পেশ নীল শাড়ি পবনে। শামলা হাতের কব্জি ঢেকে চণ্ডা নকশা খোদাই রূপোব চুড়, নাকে কানে সোনা, আলগা পায়ে বাঁকা মল—নানান কাজে আদরের ভেতর ঘুরঘুর করত ও।

তার পর ছেলে হল একটা। বৌঁচা বৌঁচা গোলগাল দেখতে। ছেলেব নাম দিল সলিম। সেই থেকে সবাই ওকে ডাকত সলিমেব মা বলে।

আর এক-একদিন শহরে মামলা কবে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মঈন ফিবত হাসিমুখে।

‘পড়ালিখা লাগে। কত টাকা লাগে—তবে উকিল হচ্ছে ওমরা। গুঁয় ধরিছে একটা আইন। করম আলি কেমন পার পায় মুই দেখিমু—’

তারপর গামছায় বাঁধা পোটলাটা খুলতে খুলতে ডাকত—‘সলিমেব মা’।

‘কি?’

‘দেখি যাও কেনে।’

শুধু সলিমের মা নয়, সলিমেব দাদিও আসত উৎসুক হয়ে। প্রদীপ উঁচু করে দেখত গামছায় বেঁধে কি এনেছে মঈন। কোলের ভেতর বাচ্চা সলিমও আঁকুপাঁকু করে উঠত। ‘চুড়ি আনছি, বেলোয়ারি চুড়ি। আর সলিমের একটা লাল কোট আনছি—’

‘ওগো মা, ধান যে সব বেচি দিবার ধরছিস এদিক’, কপট ধমক দিতে গিয়ে সলিমের দাদি হাসত দরাজভাবে।

মাঝে মাঝে মুখ কালো করে ফিরত মঈন।

‘কাহাকার শক্তি মামলায় ইমান রাখিবার পাবে। ইমান ঠিক রাখে কেটা?’

ঐ কেমন একটা ঝাঁক ছিল মঈনের। কাজকর্ম, দেখাশোনা সব ফেলে শহবে যেত ক্ষেপার মত। করম আলির গ্রাস থেকে সমস্ত জমি উদ্ধার না করে স্থিতি ছিল না ওর। সলিমের মাকে আদর করতে করতেও অন্যমনস্ক হয়ে যেত মামলাবাজ, সলিমের মার চেয়ে বয়সে অনেক বড় জোয়ান গড়নের মানুষটা।

‘ইটা হামার লড়াই—ঐটা মামলা।’

কিছুক্ষণ হাঁ করে শুনত সলিমের মা। কিন্তু পুরুষ মানুষের এই সব চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গি তেমন করে স্পর্শ করত না তাকে। সলিমকে উপড় কবে ঘুম দেবার জন্য কানের ওপব থাবড়াত আস্তে আস্তে।

‘সলিমটা বড় হইবে, ভাতের থালা মাথাত করি নিয়া যাইবে মাঠে। তোমবা কাজ করিবেন।’

কিন্তু একের পর এক মামলায় হেবে গিয়েছিল মঈন। নিজের হাতে হালচাষ গুরু করেছিল এ। সারাদিন ক্ষেতে খাটত, সন্ধ্যাবেলা চলে যেত ভিন গায়েব দেওনিয়াব সঙ্গে সলা-পবামর্শ কবতে। যত হেরে যাচ্ছিল তত বদরাগি হয়ে উঠছিল মঈন।

‘কোম্পানি আইন করোছে। কিন্তু আইনটা আমার হকের আইন, না বে-হকের আইন।’

ঝোলাটে চোখে গলার শিরা ফুলিয়ে বকাবকি কবত অন্য আধিযাবদের সঙ্গে। বাইবের ঘরে মাটির মেঝেতে পা ছড়িতে বসত ওবা। তামাক খেত, কাশত আব চিংকাব কবত বেসামাল হয়ে। অন্দরের ভেতর থেকে শোনা যেত ওদের তকবাব, ঝগড়া।

সেবাব ধান কাটাব সময় এল। একলা সব ধান। কেটে তোলা যায় না বলে বেহাবি ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে প্রতি বছর চুক্তি করত মঈন। তারা বাড়িতে থাকত চৌদ্দ-পনের দিন। চাব-পাঁচ জনের জন্যে বেশি করে ভাত বান্না করতে হত সলিমের মাকে। প্রতি বছরের মত সেবারও তাবা এসেছিল কাজের চুক্তি করতে। কিন্তু ধমক খেয়ে ফিবে গেল। এ বাড়িব খোলানে ধান উঠল না এবার, কবম আলির খোলানে সব ধান পৌঁছিয়ে দিয়ে এল মঈন। সেইখানে ভাগযোগ করে ন্যায্য পাওনা নেবে কবম আলি।

দাওয়ার ওপব কপাল ঠুকে ঠুকে নিঃশব্দে কেঁদেছিল সলিমের দাদি—‘হায় গে সর্বনাশ!’ মাথাটা তোর কাটা গেল..’

বাস্তুটুকু ছাড়া যে কয় বিঘা ছিল মঈনুদ্দিনের, তাও নাকি গেছে। সে আখিয়ার হয়ে গেছে করম আলির।

এক পহর রাত পর্যন্ত করম আলিব খামারে বেগার দিত মঈন, ঝাড়াই সাফাই করত, কাজ না থাকলে পাটের দড়ি পাকাত বসে বসে। তার পর বাত্রে যখন ও পুবনো ভাঙা অঙ্ককার ঘরে ফিরে আসত শুকনো চেহারা নিয়ে তখন ওকে দেখে ভয় হত কেমন।

‘কত খাটিবেন তুমি একা?’

পিদেমনটা উশকিয়ে উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল সলিমের মা। মঈন উত্তর দেয় নাই।

‘কহছি কি, ক্ষত্রিয়-বিটিছোয়াগুলোও তো খাটে। হামারা গরিব মানুষ হছি, সলিমের বাপ, হামাদের লাজ সরম নাই। হামরাও মাঠে খাটিমু—’

প্রস্তাব শুনে রেগে আশুন হয়ে গিয়েছিল মঈন। মুসলমানের বাড়ি নয় এটা? প্রধানদের ঘরের সম্মান-ইজ্জত নাই একটা? বাদশা ফকিব হতে পারে—কিন্তু এ বাড়ির বৌ তাই বলে ইজ্জত খুইয়ে ক্ষেতে খাটবে পুরুষের সঙ্গে?

প্রাক্তন সচ্ছলতা হাবিয়ে বুকের ভেতর একটা আহত জায়গা লুকিয়ে রাখত মঈন, সেইখানে হাত পড়েছে। একটা ক্রুদ্ধ সন্দেহে এক মুহূর্তে নিষ্ঠূর হয়ে ওঠে মঈন।

‘কাম কববু তুই? পরপুরুষের মুখ না-দেখিলে যে তোব সুখ নাই! হামাক দরদ দেখাবাব চাস যৈবনের গরবি? টের পাছি বিস্তর দিন—’

গলার শিরা ফুলিয়ে কুঁজো হয়ে চিংকার শুরু করে মঈন। একবার ছুটে এসে হিঁচকা টানে সেলিমকে ছিনিয়ে নেয় মার কোল থেকে। আবাব দূরে সরে গিয়ে চিংকার করে। কেমন একটা কাতর যন্ত্রণা নিষ্ঠুর মোচড় দেয় গলার আওয়াজে। ‘যব থিকা বারাবাব চাস তুই!’

‘না-মারো সলিমের বাপ’—ভয়ে মুখ শুকিয়ে অশ্রুতে মিনতি করেছিল সলিমের মা।

চওড়া বনেদি উঠোনের ওপর প্রদীপের ছায়াটা কাঁপছে দপ দপ কবে।

দূরে ভাঙা ফাঁকা অব্যবহৃত ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে কালো হয়ে। দশ হাজার বিঘা মাঠ থেকে ঝিঁঝির একঘেয়ে শীতার্ভ শব্দ মিশে যায় মঈনের ফাঁপা চিংকারেব সঙ্গে।

‘হামাক মারে নাই? হামাক মারে নাই মঈনের বাপ? পূব মুখে না যাযা হালের গকটা পছিম মুখে যাবার চাহে। না মারিলে অয় যুরিবে?’ কি জানি কেন, খানখেনে গলায় বিড় বিড় করে বকতে শুরু করেছিল সলিমের দাদি।

তারপর আকাল এল দেশে। একটানা দশ হাজার বিঘা জমিব ধাবে মাদাব গাছেব তলে কয়েকটা সাঁওতাল পবিবার এসে ডেরা বেঁধে বইল কয়েক দিন। তারপর চলে গেল আবাব

‘কুন ঠাই যাবে তোমরা?’ ঘর ছেড়ে দু-পা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কবে এসেছিল সলিমের দাদি।

‘উত্তরে যাছি - চা-বাগানের কাম আছে—’ দলেব ভেতব ভাসা ভাসা উত্তর দিখেছিল অনিচ্ছায়।

বাঁশঝাড়ের ওপাশে মুসলমান আখিয়ারদেব দুটো ঘর ফৌত হয়ে গেল একেবালে।

কর্জা বন্ধ কবে দিলে কবম আলি।

বর্ষা মাসটা কাঁঠাল খেয়ে চলেছিল, বর্ষাব পবে হাতের চূড়, নাকেব সোনা, কোমবেব গোঠ সব খুলে দিতে হল মঈনের হাঁতে।

খুলে দেওয়াব সময় বড় বড় চোখে মঈনেব মুখেব দিকে তাকিয়েছিল সলিমের মা। ও দেখে নিষ্ঠূরভাবে তেড়ে এসেছিল মঈন—‘কি দেখ জুল জুল করি? কি দেখ তুই?’

তারপর বিড় বিড় কবতে কবতে বেরিয়ে গিয়েছিল ও—‘দেখিনু আবাব, যাউক এ বংসবড়া, মামলায় হামাব হক, কি তার হক—’

বর্ষার পবে মড়ক লেগেছিল গায়ে। দুদিনেব জুবে মবে গিয়েছিল বাচ্চা সলিম। কাঁথা ঢাকা হয়ে বক্ষণ পড়ে বইল ও। হাত দুটো মুঠ হয়ে আছে, ঠাণ্ডায় বেঁকে গেছে মুখটা। দু-একজন লোক ছুটল। কাফন এল। গোর দিতে নিয়ে গেল মঈন নিজে।

তখন ধুলোর ভেতর লুটোপুটি কবে কেঁদেছিল সলিমের মা। মঈনের পেছু পেছু গিয়েছিল তামাক বেড়া পর্যন্ত। সেখানে চিংকার কবে আছড়ে পড়েছিল মাটিতে।

এক-একজন কবে লোক জুটেছিল কান্না শুনে। যে-কয়ঘর লোক ছিল মেয়েপুরুষে তারা এসে সাধুনা দেওয়ার বদলে তাকিয়ে ছিল নিষ্প্রাণ চোখে। মাঝে মাঝে কি মনে করে মাথা ঝাঁকানিচ্ছিল চিন্তিতভাবে।

‘না কাঁদো, না কাঁদো, কি করা—’

রাত্রে ঘর থেকে ছুটে বেরতে চেয়েছিল সলিমের মা। কবরের কাঁচা মাটির ওপর কাঁটা দেওয়া আছে তো খস খস শব্দ হচ্ছে—হয়ত মাটি খুঁড়ে সলিমকে টেনে বার কবছে শেয়ালে—

সাস্থ্যনাতে নয়, সলিমের মার কান্না থেমে গিয়েছিল প্রচণ্ড চাষাড়ে এক ধমকে।

‘দুনিয়ার মানুষের সামনে উদলা হয়ে কাঁদিস তুই? পরধানের বাড়ির বৌ—! কতো, ভান্ডি, কতো কাঁদা দেখি মুই আজ—’

বিমূঢ় আতঙ্কে একেবারে চূপ করে গেল সলিমের মা। নোংরা ভোঁতা একটা কাঠ তুলে নিয়ে এলোপাখাড়ি বাড়ি মেরে চলেছে মঙ্গিন। নূরের দুদিকে সারা গালে খোঁচা খোঁচা কর্কশ দাড়ি। শুকনো পুরু ফাটা ফাটা ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে একটু। থাণ্ডা নাকের দুপাশ দিয়ে গালের চামড়া কুঁচিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে বেকে গেছে।

এক বছর, দু বছর, তিন বছর—পর পর কেটে গেছে তারপব, আকালের বছর শেষ হতে চাষ না কিছুতে। প্রতি বছর মাঠে ধান পাকে, সে ধান ফুটিয়ে যায করম আলির কর্ত্তা শোধ দিতে। হাটে কাপড় নুন দিযাশালাইয়ের দব কমে না একটু।

পহব বাত পর্যন্ত কবম আলিব বাড়িতে বেগার দিয়ে হনো হয়ে ফিরত মঙ্গিন, দাওয়ায পা ছড়িয়ে বসে নিজের মনে বকাবকি কবত একতবফা, মাঝে মাঝে ছুতো কবে এগিয়ে আসত সলিমের মা'ব দিকে। মঙ্গিনে'ব মুখে'ব দিকে তাকিয়ে টেব পেত সলিমের মা। নিঃশ্বাস বন্ধ কবে কাঠে'ব মত স্থি'ব হয়ে অপেক্ষা করত। মা'ব খাওয়া'ব প'ব থিম ধাবে বসে থাকত কিছুক্ষণ, তারপ'ব ফিবে যেত গেবহালি কান্ধে।

‘বোটাক খার্মস, এলায তুই মবিবু’—মা'ব খেতে দেখলেই খান খান কবে একটানা বকতে শুক কবত সলিমের দাদি।

একদিন বাত্রে ফিবে এসে দাপাদাপি কবে বেডাল মঙ্গিন—‘হামাক শোনায়। হামাক শোনাস কেনে? পাথ'ব ইট বাখছে, লাঠিয়ালওলাক খাশি ভাত খিনাইবে—এত কথা তো'ব হামাক শোনাস কেনে?’

‘কি কহসেন?’

‘কবম আলি—কবম আলি। কেনে, ঘুবি বেডাছে না গবিবওলো? লুটপাট করি ধান নেয় কি না নেয়—তা হামাক শোনাস কেনে?’

সেইদিন মঙ্গিনের মুখে'ব দিকে তাকিয়ে একটা বহস্যাবৃত অশঙ্কায় বুকে'ব ভেত'ব হিম হয়ে এসেছিল সলিমের মা-ব। মা'ব খেতে হ'বে বলে নয়—মা'ব খাওয়া সহ্য হয়ে গিয়েছিল ও'ব। অন্য কি-একটা অপবিচিত ভয়ে ইঁফি ধবেছিল বুকে'ব ভিত'ব।

দশ হাজাব বিখা জমি। কালো মেঘে'ব মত একটানা ধানে ছেয়ে গেল। অত্নানের শুকতে হলুদে'ব ছোপ পডল জায়গায় জায়গায়, কিন্তু ধান কাটা'ব সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল, তত যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল মঙ্গিন। যাকে সামনে পেত, তার ওপবেই ঝাঁপিয়ে পড়ত ও। একদিন গায়ে'ব সমস্ত আধিয়ার এসে জুটল ও'ব বাহির বাড়িতে। মাটির উপ'ব বসে বসে তামাক খেল, কাশল আর চিংকা'ব করল এলোমেলো।

‘ধান কাটি নিজের খোলানে তুলিবার চান, কিন্তু আইনটা কুনতে পালি তুই?’

‘ইটা আমার কুমকের আইন।’

‘হাঁ, ইটা হামারই আইন—’

‘লাঠিয়াল আনিছে। কালো মাথা লাল করি দিবে। কিন্তু হামাক শোনায় কেন এত কথা?’

‘ইটা হামারই আইন। দেখিবু শক্তি’—

অন্দরের ভেত'র থেকে সলিমের মা আব সলিমের দাদি জেগে বসে থাকত কান পেতে। বুক টিপ টিপ করত ওদের।

পরদিন থেকে দল বেঁধে ধান কাটা শুরু করে দিল ও'বা।

যরের সামনেকাব তামাক ক্ষেত্বেব বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দেখা যায় দশ হাজাব বিঘা জমিব ধান পেকে শুয়ে পড়েছে মাটিতে। ধানক্ষেত্বেব মধ্যে কর্মবত আধিয়ার কৃষকদেব কালো কালো মূর্তিগুলো বিন্দুর মত নড়ে। ধানের আঁটি মাথায় ক্ষত্রিয় মেয়েরা আল বেয়ে হেঁটে আসে নিজেদের খোলানেব দিকে।

নিজেদের খোলানে ধান তুলবে আধিয়াররা। কৃষকের নাযা বিচার হোক। নাযা বিচার অনুসারে ভাগ হোক ধানের। অবাক লাগে সমস্ত জিনিসটা। ঠাহব হয় না কি হচ্ছে। শুধু অনেক দিনকার চাপা পড়া কি যেন নাড়া খেয়ে ওঠে বুকের ভিতর।

সলিমের দাদি বিড় বিড় করে বকে, আর অকারণে যোবাক্বেবা কবে ধানের পুঁজের কাছে। প্রধানদের বাড়ির পুরনো সচ্ছলতার স্মৃতি আছে প্রশস্ত খোলানটায়, সহজে ভবাট হতে চায় না, নবম মাটিতে ইদুরের গর্তগুলো বুঁজিয়ে বুঁজিয়ে নিকিয়ে বেখেছে সলিমের দাদি।

‘মুই বুড়ি হছি কি না হছি? এইটা কথা শুনিবু মুই আজ’।

‘বুড়ি হচ্ছেন তো কি করিবেন?’ জিজ্ঞেস করেছিল সলিমের মা।

‘মুই বুড়ি হছি তো হামাব সবম কবে? মুই যায়া ধান আনিবু মাথাত করি—’

বারণ না শুনে, আপন মনে বকতে বকতে বুড়ি চলে গিয়েছিল ক্ষেতের দিকে, ক্রোশ খালেক দূবে যেখানে ধান কাটিছে মঙ্গিরা।

এমন সময় হাঁক দিতে দিতে এল ওবা। একদল সিপাহি, একদল চৌকিদার, দুজনে হাতে বন্দুক, বাকি সবার হাতে লাঠি। ভাড়াটে লেঠেলও ছিল একদঙ্গল, করম আলিকে খুশি কবাব জনা লাঠি ঘুবিয়ে ঘুবিয়ে আশ্ফালন কবছিল ক্রমাগত। সবার পেছনে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল বুড়ো কবম আলি জোতদার নিজে। খালি গাড়ি নিয়ে এসেছে দুটো, ‘ধান চাপাও গাড়িতে—’

যোমটা টেনে দবজাব পাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্ববে আপত্তি কবেছিল সলিমের মা। ধানের পুঁজ-ভেঙে ছত্রখান করছিল যখন তখন এক সময় বেবিযে এসেছিল উন্মাদিনীব মতো— ‘ধান নিবেন কেনে তোমরা—কেনে নিবেন—’

ধানের পুঁজ দুই হাতে জাপটে ধবে মবিয়া হয়ে শুয়ে পড়েছিল সলিমের মা।

মঙ্গিন এসে পৌছবাব আগেই আরো অনেকে এসে জুটেছে। ধানের পুঁজ ভেঙে ছড়িয়ে বয়েছে মাটিতে, কয়েকজন তা কুড়িয়ে এনে স্থূপ করে বাখাব চেপ্টা কবছে আবার, ধান নিয়ে যেতে পারে নি ওবা। অত্যাচার করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে শত্রুদের।

মেয়ে আব পুরুষের ভিড়ে মাঝখানে হতভম্বের মতো বসে আছে সলিমের মা। কাপড় চোপড় এলোমেলো ছেঁড়াখোঁড়া। আকুর বালাই নেই। শবীবের কয়েকটা জায়গায় মাটি লেগে আছে, কয়েকটা জায়গায় রক্ত চোঁয়াচ্ছে টিপ টিপ করে।

‘হায়রে বাপ—’

মঙ্গিনকে দেখে অশ্রুট কোলাহল করে এগিয়ে এল সবাই। কি হয়েছিল, কারা হানা দিয়েছিল, সলিমের মার সাহায্যে ছুটে এসেছিল কারা, সজিনেব খোঁচা খেয়েও কের্মন করে ধান আটকিয়েছে—তাই বললে, উন্টোপাণ্টা এলোমেলো কবে। অনেক রাত পর্যন্ত মঙ্গিনের বাড়িতে রইল ওরা, তারপর চলে গেল।

অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। পুরনো নিঃসঙ্গ বাড়িটা নিখুম হয়ে আছে অশঙ্কায়। চওড়া আঙিনা পেরিয়ে একটা অবাবহাত ভাঙা ঘরের কোল যেসে জোনাক জ্বলছে কয়েকটা। মাঠ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার টানে মাঝে মাঝে ভেসে আসে শিশির-ভেজা পাকা ধানগাছের তীব্র গন্ধ।

ভীত অস্থিস্থিতে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকায় সলিমের দাদি আর অপেক্ষা করে মঈনের মুখেব
দিকে তাকায়।

অনেকক্ষণ পরে শীর্ণভাবে জিপ্তেস করে সেলিমের মা—‘তুমি মাঝিবেন
না হামাক—’

‘কেন মাঝিব মুই? কেনে বাপুবে—’ মঈনের গলার আওয়াজ ভেঙে আসে অসহা যন্ত্রণায়।

‘মোসলমানের বিটিছোয়া। . বে-ইজ্জত কবি গেল ডাকাতেবা ’

একটা বিচিত্র আবেগে কাঁদতে শুরু করে সেলিমের মা। কক্ষ চওড়া হাত দিয়ে আনাড়ির
মতো সাঙ্ঘুনা দেবার চেষ্টা করে মঈন।

‘না কাঁদো সলিমের মা। চুপ করো—’

‘সলিম . সলিমটা মরি গেল্ ’

কি বলতে গিয়ে গলায় আটকিয়ে যায়।

পিকুর ডায়রি

সত্যজিৎ রায়

আমি ডাইরি লিখছি। আমি আমার নিল নতুন নিল খাতায় ডাইরি লিখছি। আমি আমাব
বিছানার উপর বসে লিখছি। দাদুও ডাইরি বোজ লেখে কিন্তু এখন না এখন অসুখ কবেছিল
তাই। সেই অসুখটার নাম আমি জানি আর নামটা করোনানি থমবোসি। বাবা ডাইবি লেখে
না। মাও ডাইরি লেখে না দাদাও না খালি আমি আর দাদু। দাদুর খাতাবচে আমাব খাতা
বড়। ওনুকুল এনে দিয়েছে বম্মো কুড়ি পয়সা দাম মা আগেই পয়সা দিয়েছে। আমি বোজ
ডাইবি লিখবো বোজ বেদিন ইসকুল থাকে না। আজ ইসকুল নেই কিন্তু ববিবার না কিয়
খালি আজ স্ট্রাইকের জন্য ছুটি। প্রাই স্ট্রাইকের জন্য ছুটি বেশ মজা এই জন্য। ভাগগিস
লাইন টানা খাতা তাই লেখা বেকে যাচ্ছে না দাদা কিন্তু লাইন ছাড়াই সোজাই লেখে আব
বাবাতো লেখেই বাবার কিন্তু ছুটি নেই। দাদাবো নেই। মাবো নেই। মাতো কাজ করে না
আপিসে বাড়িতে খালি কাজ। এখন মা নেই মা হিতেসকাকুব সঙ্গে গেছে আব বলেছে
আমায় একটা জিনিস একটা দেবে নিউ মারকেট থেকে এনে দেবে। আজকাল মা খুব
জিনিস দেয়। একটা পেনসিল কাটার একটা বিসটাচ তাতে খালি তিনটেই বেতেছে একটা
হকিস টিক আব একটা বল। ও আব একটা বই সেটা গুম ফেয়ারি টেল তাতে অনেক ছবি।
আজ কি জানবে তা সেটা ভগবান জানে হয়তো বোধয এআবগানটান তাইতো বলেছি
দেখা যাক। ধিংড়া একটা সালিখ মেবেছে এআবগান দিয়ে আমিও একটা চড়াই বোজ বসে
বেলিংয়ে সেটাকে মাববো টিপ কর্বে দম কবে মবেই যাবে। কাল বাততিবে খুব জোবসে বম
ফটলো বাবা বম্মো বম মা বোল্ল না না ওলি বোধয পলিস-টলিস বাবা বম্মো না বম
আজকাল প্রায়ই দুম দুম আওয়াজ হয় জালনা দিয়ে। ওই যে গাড়ি হন এটা নিশ্চই
হিতেসকাকুব আমি জানি স্টেনডাড হেবাল তাহালে নিশ্চই মাই এলো।

*

*

*

কাল মা এআব গান দিলেন নিউ মারকেট থেকে সেটা হিতেসকাকু দিলো বল্ল পিকুবাব
আমি এটা দিলাম কিন্তু তোমাব মা কিন্তু না। হিতেসকাকু ঘড়িব একটা ব্যান কিনেছে ঘড়ি ব
নামটা আমি বল্লাম টিসট আব হিতেসকাকু বোল্ল উহ টিসো শেসেব টিটা উচ্চাবণ হয়না
তাই। আমার এআব গানটা খুব ভালো আব খুব বড় একটা কেটোতে ছববা আছে অনেক
একসেটারো বেসি। আমায় সিথিয়ে দিয়েছে হিতেসকাকু আমি মেবেছি এমনি আকাসে আব
ওনুকুল চমকে গেলো। চড়াইটা কাল আসেইনি আজো আসেনি বদমাইস আছে কাল আসবেই
আসবে আর আমিতো রেডি হয়ে থাকবো। বাবা আপিস থেকে এসে বল্লেন আবাব বোনদুক
কেন মা বল্লেন তাতে কি বাবা বল্লেন এমনিতেই দুমদাম লেগেই আছে আবাব কেন বোনদুক
বাড়িতে মা বোল্লেন তাতে কি হয়েছে বাবা বল্লেন তোমার কোনো সেনস নেই মা বল্লেন
চেচামেচি আপিস থেকে এসেই কেন বাবা বল্লেন না বাবা হ্যা বাবা বল্লেন ইংরেজিতে মাও
ইংরেজিতে। মা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক সিনেমার মত। আমি জেরি লুইস দেখছি আর ক্লিনট

ইসটুড আরেকটা একটা হিন্দি সেটা মিলুদিদের সঙ্গে সেটায় ফাইটিং নেই এই যা বোধহয় কলমে।

*

*

*

আমার ফাউনটেন পেনে বাবার সবুজ কালিটা যেটা কুইং সেটা ভরেছি ড্রপা দিয়ে মার মিসটেলের মার সবদি হয়ছিল সেটা দিয়ে। আজকে বাবার টেবিলে লিখছি বসে বসে ডাইরিটা। টেলিফোন একটু আগেই কিবিং কিরিং কিরিং হল আব আমি দৌড়ে এলাম আব এসে হ্যাল বলাম ওমা দেখি বাবা বাবা বল্লেন কে পিকু আমি বলাম হ্যা আমি বাবা বল্লেন মা নেই আমি বলাম না মা নেই বাবা বল্লেন কোথায় মা আমি বলাম মা হিতেসকাকুর সংগে সিনেমা বডদেব যেটা সিনেমা সেটা দেখতে গেছে তাই মা নেই বাবা বল্লেন ও বলে কড়াক কবে ফোনটা রেখে দিলেন আমি আওজ পেলাম। তারপব আমি একবার ডায়েল করলাম ওয়ান সেভেন ফোর আর তাতে টাইম বম্ম আমি টাইম মাঝে মাঝে সুনি কি যে বলে বোঝাই ছাই যায় না। আজ চড়াইটা এসেছিল। আমি জালনাব ধাবে এআরগান আর চড়াইটা ঠিক এলো আমি দম করে মারলাম আর ছররাটা দেখালে ধিংডার বাড়িব দেখালে দেখলাম একটা ফুটো। চড়াইটা খুব ভিশন ভয়পে উড়ে পালিয়ে গেলো। দাদা কাল ছাতে টিপ দাকগ টিপ ট্যাংকের উপর দইএব একটা ভাড ছোটো খুব সবচে ছোটটো ভাড রাখলো আব অনেক দূর থেকে টিপ কবে দম কবে আব ভাডটা ঢুকবো ঢুকবো কয়েকটা আবাব বাঙাঘ গিয়ে পড়ল যদি কারো মাথায় টাথায় লাগে তাহলে হয়েছে আমি বলাম। দাদা অনেক বড আমারচে বাবো বহুব তাই দাদার টিপ। দাদা কলেজে পড়ে আর আমি ইসকুলে তো। দাদা বোজ বাইবে বাব হয় আমিতো বাড়িতেই থাকি মাঝে মাঝে খালি সিনেমা দেখি আব সি এল টি একটা দেখেছি। দাদাতো কাল অনেক বাততিবে ফিরেছে আব তাই বাবাতো খুব বকলেন দাদাও খুব জোবসে বল্লো কথা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে এত জোরসে একটা তাই ভালো সপনো আর শেষ হলই না। দেখলাম আমি দেখছিলাম টগবগ টগবগ খুব জোবসে যাচ্ছি যোডায় আব ধিংড়া আমাকে ধবতেই পাবছে না আর হিতেসকাকু আমাকে নোতুন বোনদুক সেটা বিভলবার দিয়েই বম্ম এটার নাম ফিসো আব দাদু একটা কাউবয় বনছে দাদুভাই চল যাই ভিকটোরিয়া মেমোরিয়া আব তখনি সপনোটা ভেঙে গেল। এবার যাই একটু বাতকমে।

*

*

*

কাল আমাদের বাড়িতে একটা পাবটি ছিল। কিন্তু আমার জন্মদিন না কিন্তু এমনি পাবটি। সবাই খালি বড়রা তাই আমি যাইনি খালি মাঝে মাঝে একটু খালি দেখাছিলাম। খালি বাবার বন্ধু আর মার বন্ধু আব কিন্তু দাদারো বন্ধু না। দাদা নেই পবসু কিমবা তরসু থেকেই নেই তা জনি না কোথায়। দাদাতো পলিটিস করে তাই হোপলেন্স বাবা খালি খালি বলে আব মাও বলে। মাতো বাবণ কবে তাই আমি পাবটিতে যাইনা কিন্তু কাল তিনটে সসেজ খেয়েছি আব একটা কোকাকোলা। একজন সাহেব ছিল সে খুব জোবে হাসে হো হো হো হা হা হো হো হা হা হা আব আরেকজন মেমসাহেব। আর মিস্টার মেনান আর মিসেস মেনান আর সিখ একজন নিশ্চই আমি পাগড়িতেই বুঝে গেছি। একবার আমি ঘর থেকে গুনলাম খুব জোরে হাসল সবাই। একবার মা চলে এলো ঘরে আর এসে বাতরুমে গেল আর আয়নায় একবার দেখল আর একবার একজন আরেকজন মেয়ে বাতরুমে গেল আর খুব জোরে তার সেনটের গঞ্জে একটা নতুন সেনট কিন্তু মার সেটা নেই। আরেকবার মা এলো আর বম্ম একি সোনা জেগে আছে ঘুমো ঘুমো আর আমি বলাম একা একা ভয় আর মা বম্ম কিসের ভয় বোকা ছেলে ঘুমো এগারটা বাজে চোখ বোজ আপনি ঘুম আমি বলাম দাদা কোথায় মা বম্ম ঢের হয়েছে ঘুমো বলে চলে গেল। বাবা কিন্তু আসেনি ঘরে বাবা এখন

বাবা মা এখন খুব ঝগড়া ইংবিজিতে করে আর মাঝে মাঝে বাংলা। কিন্তু পারটি তেতো ঝগড়াই না তাই পারটি ভালো পাবটিতে খালি ডুং আর একদিন একজন বমি করল মা বলল অসুখ আমাকে কিন্তু ওনুকুল বলেছে মদ তাই। আমাদের ফুজের ভিতর আছে আব খালি হোলে জল রাখে ঠানডা আব যখন গন্ধো থাকে মাঝে মাঝে মা তখন বকে সুখদেওকে বলল আচ্ছা করকে ধোতা নেই। আর সুখদেও বলল মেমসাব কেন বলে মাকে মা কি মেম নাকি আর মা কি সাহেব নাকি খুব মজার বেপারটা। তারপবত ঘুম এল কখন যে এসে যায় ঘুম কেউ জানেনা দাদু বলে মরে গেলেই নাকি লম্বা ঘুম আব খালি সপনো আর যা দেখতে চাই তাই সপনো খালি।

*

*

*

আমাব ডাইবিটা একটা জায়গায় যেখানে লুকিয়ে বাথি কেউ জানে না কিন্তু। সেটা আমাদের পুবোন গ্রামোফোন সেটা হাত দিয়ে দম দেয আব যেটা আর কেউ বাজায় না কাবণ নোতুনটাতো ইলেকট্রিকে আর লং প্লেং বাজে তাই আর পুরোনটা বাজায় না সেই সেটাব মধোই ডাইবিটা আর তাই কেউ জানে না যে আমি ডাইবি লিখি। আমিতো অনেক লিখি তাই আমাব আঙুলটায় একটু বেথা তাই মা যখন নোক কাটছে আমি তখন বললাম আঃ আব মা বলল কি হয়েছে বেথা নাকি আমি বললাম না না তাহলে যে জেনেই যাবে মা আমি ডাইরি লিখি। ডাইবি দাদু বলেছে যে কেউ কাউকেই দেখাবে না খালি নিজে লেখে আব পড়ে খালি নিজেই আব কেউ না। আমাব ছববা আব বাইসটা আছে আমি ওনেছি কিন্তু চড়াইটা খুব বদমাইস আসেইনি আর। আমি ছাতে খালি টাংকে ওলি মাঝি টং টং আওযাজ হয আর ছোট ছোট ছোট গোল গোল গোল গোল দাগ হয়ে যায় তাই তাহলে ভাবছি পাযরাই মাঝব। পাযরারা চূপচাপ খুব বসে থাকে আর হাটে আব বেশি ওড়েনা। দাদা পাচদিনতো আসেনি দাদার তাই ঘবটাই খালি আব আলনায একটা সাট সেটা সাদা আব একটা নিল প্যান্ট ঝুলছে খালি আর বইটই সব। কাল আমি যখন বৃদবৃদ কবছিলাম খুব বড একটা তখন ঠিক শুনলাম হুন পেলাম আব বললাম হিতেসকাকু আব মা বল্লেন ডাবলিং তুমি ধিংড়াব বাড়ি যাওনা আজ ধিংড়ার তো ছুটি। আমি বোল্লাম ধিংড়া আমাব কানের পাশে যেটা ঝুলপি খালি উপরে টানে আর বেথা লাগে তাই বাবো না মা বোল্লেন তাহলে ছাতে এয়ার গানট নিয়ে আমি বোল্লাম তাহলে পাযবা মাঝবো মা বল্লি ছি ছি তা কেন এমনি মারো আকাসে যাও আমি বল্লাম শেত আকাসে আবাব কোথায় টিপ কবব মা বোল্ল তাহলে ওনুকুলের কাছে যাওনা আমি বল্লাম ওনুকুলতো তাসই খেলে আর দাবোআন আব সুখদেও আরেকটা লোক সব তাস খেলে আমি তাই কোথাও যাব না। আব মা তখখুনি ঠাস করে একটা মাঝলো জোরসে তাই আমি খাটের ডানডায় আমার ধাককাই লেগে গেল। আমি একটু কানলাম কিন্তু বেশি না একটু আর তারপর তো মা চলে গেলো আর আমি আবেকটু কানলাম বেশি কিন্তু না আর তারপর ভাবলাম কি তাহালে করি। তখন তারপর ভাবলাম ফুজে গিয়ে দেখা যাক কি আছে তাই দেখি দুটো লেডিকেনি আর একটা সেটা টংকাব কুম রোল সেটা সব খেলাম তারপর তো বোতল থেকে ঢক ঢক ঢক একেবারে গেলাসেই ঢালিনি। তারপর একটা ইলাসটেট উকলি সেটা বাবার টেবিলে দেখলাম তার্তে ভালো ছবিটবি নেই খালি একটা ডনেল ডাক। আর তারপর বারান্দায় দৌড়লাম আর একটু হাইজাম একটা মোড়ার উপর দিয়ে একটা আগে ছোট সেটা খুব সহজ আব তারপর বড়টা সেটায় একবার খ্যাচ করে লাগল তাই দেখলাম ছোড়ে গেছে আর একটু একটু রক্ত তাই বার্তরুমে তো ডেটোল ছিল ডেটোল লাগে না কিন্তু টিনচারাইডিনে লাগে তাই ডেটোলই দিলাম। আর তখখুনি দৌড়ে দেখলাম জেঠ প্লেনটা খুব জোরসে চলে গেল বাবা যখন গেল

জেঠে তখন দমদমে আমি গেলাম আর বাবা লানডান থেকে একটা ইলেকট্রিক সেভা আনল সেটা নিজের আর আমার জন্যে যুতো দুটো আর একটা আসটোনট সেটা খেলাব কিন্তু খুব বড় সেটা তো রনিদা খাবাপি করে দিল। তারপর যাই আর কি একটু অংকটংক কবি।

*

*

*

আমি আবার আজকে ডাইরি লিখছি। আমার ছরবা ফুরিয়ে গেছে আর পায়বাটাও গায়ে কেন লাগলো না নিশ্চই বোন্দুকটা বাজে তাহালে। আমি ভাবছি এটাকে ফেলেই দেবো তাহালে। দাদাব ড্রআরে আজ একটা দেখলাম টেক্সা দেশলাই তাহালে দাদাতো সিগারেট খায় নিশ্চই নাহালে কেন দেশলাই। কিন্তু দাদা আসেনি কোথায় গেছে ভগবান জানে কি বোধয় ভগবানো জানে না। যদি এবাব মা যদি যায় তাহলেই মুশকিল একবার কাল রাততিবে মা বসেন যে চলে যাবেন বাবাকে আমি তো দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম একটু তাই জেগেছিলাম চোখটা জোরসে বন্ধো কবে তাই মা জানে পিকুতো ঘুমোচ্ছে আব বাবাও ভাবছিলেন তাই তাই ওরা খুব জোবসে কথা বলছিলেন। এখন বাড়িতে আমি আর দাদু খালি আর ওনুকুল বোধয় নিশ্চই তাস খেলছে আব তাই বাড়ির ভিতরে আব কেউ নেই খালি আমি আর দাদু। দাদু নিচে থাকে দাদু ডকটার বেনারজিতো বলেছিলেন সিডি দিয়ে ওঠা না দাদুবত কনোবাবি থমবোসি তাই। দাদুর তাই একটা যণ্টা সেটা নিয়ে যদি টিং টিং টিং টিং কবলেই শোনা যায়। আত একবার তাই ওনলাম দাদু বাজাচ্ছে তখন আমি জালনা দিয়ে থুতু ফেলছিলাম থুক থুক থুক যাতে অনেকদূর যায় আব তখখুনি টিং টিং টিং ওনলাম আব তখখুনি বুঝলাম যে এটা দাদু তখন আমি আবো চারটে থুতু ফেললাম একটা পাচিলেব ওদিকে আব তাবপব ভাবলাম যে যাই দাদু ডাকছে। আব গেলাম সিডি দিয়ে দুম দুম কাঠেব তো সিডি তাই দুম দুম আওজ হয়। গিয়ে দেখি চুপচাপ দাদু ওয়ে আছে আব কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিন্তু কিছু বল্লনা খালি উপবেব দিকেই দেখছে পাখাটাব উসা ফ্যানটার দিকে দাদুব ঘরেই খালি উসা সবইতো জিইসি আর তখখুনি আবাব টেলিফোনটা ওনলাম বাজলো তাই দৌড়ে এসে উপরে এলাম তখন অনেকবাব বেজেছে বোল্লাম হ্যালো আব ওনলাম মিস্টার সাবমা হায আমি তখখুনি বল্লাম সাবমাটারমা নেই হায বং নান্নার বলে কড়াক করে রেখে দিলাম আব তারপব দৌড়েতো ইপিযেছি তাই সোফায় গিয়ে ওনলাম আব পাটা তুলেই দিলাম মাতো নেই পাটা তুলেই দেখলাম ময়লা কিন্তু মা তো নেই। আর এখন আবাব আমার বিছানাতে লিখছি ডাইবি আর পাতাই কিন্তু নেই এখন আব কেউ নেই খালি আমি আব দাদু আর একটা খালি মাছি আছে খালি খালি আসছে জালাতোন ভারি বদমাইস মাছিটা আর বাস এইবার পাতা শেষ খাতা শেষ বাস শেষ।

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

রমাপদ চৌধুরী

আমার একেবারেই হচ্ছে ছিলো না। বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাননি। ঐ লজ্জা কবে কবেই আমার সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় ছলে-পুড়ে মরি।' বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান বাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আব যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, 'নতুন'। তা বড় জা বললে, 'দেখ নতুন, যা কিছু ফুর্টিফুর্টি এখন কবে নে, এব পব তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি-হাসি পায়। তাই বড় জা-ব খোলাখুলি কথাওলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা কবতো। কিন্তু বড় জা দমবাব পাত্র নয়। তাব দেওরটিকে বললে, 'ছোট ঠাকুবোপো, নতুনকে নিয়ে পুখী কি দাঙ্গলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিন কয়েকেব জনো। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকাব বীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমাব দিকে যে বেশ বঝতে পারলাম এমন একটা হচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন হচ্ছেটা বুঝতে পেবে — না, আজকালকাব মেয়েদের মতো ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পাবি না, পুবোনো দিনেব বউদের মতোই আড়েচারে বুকিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওব নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে সোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড় জা-ব সামনে তো আর নাম বলতে পারি না। তাই বললাম, 'ওর হচ্ছে হয় যাক, আমি যাবো না।' বড় জা বাগ দেখিয়ে বলল, 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার হচ্ছে নেই! যা বলছি শোন নতুন, দুটিতে দিন কয়েক কোথাও গিয়ে —'

ঠেলেঠেলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আব গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেল। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল। মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন। এমন একটা কপেব পৃথিবী আছে আমি জানতামই না! আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশিব ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্টিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলমানুষের মতো আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে হচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশী হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আব ওর সুন্দর চোখজোড়ায় দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মতো বিশাল। আনন্দে আত্মা দে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে হচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে হচ্ছে হলো।

ও বলল, কি দেখছে অমন করে? ওর বোধ হয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টিমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্র দেখছি।' ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টিমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি।'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেবিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে দাঁড়লাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়েছে, সেখানে।

না, ঠিক অত দূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি। তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয় কবে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলশয্যার বাতটার মতো। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমাবই মতো তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক-একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু-একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সাবি পড়ে আছে বালির ওপর, আর বালির ওপর বসে বসে বড় বড় ডালগুলো মেবামত কবছে জেলেরা।

— এই, ওবা কি কুড়োচ্ছে, কি? আমি জিগোস কবলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ও মা, তাই নাকি! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানারকমের, সাদা আর বড়িন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সবে গেলেই সেগুলো চিকচিক কবছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমাব চোখ দুটো টানা-টানা, আমার খাড়াটা কি চমৎকাব, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমন সব কথা বলে ঝিনুকের বন্ধুরাও আমাকে খেপাতো, কলেজের মেয়েবা প্রশংসা কবতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম কপ দেখছিলো না ওবা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলাব হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিলো আমাদের সব বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম অন্যরকম লাগে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধ হয় একটু বেশী দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশী দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিলো বলে লজ্জা নয়, সব বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিলো ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সামনে ওদের মতো ঝিনুক

কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একসময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজ়ে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূৰ হয়ে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা — পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশী অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে! না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পবেব দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলো। — সমুদ্রবে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের ওপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম। এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক্, এসেছি যখন চোখ ভাবে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দৃজন। স্নান করতে কবতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়েব মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আর তাবও ওদিকে অনেক দূরের অধৈ জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে কবে মাছ ধরছে নুলিয়াবা। পাড থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বাববাব ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান কববে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

— আরে দূর, ভয়েব কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে — এমনভাবে তাক্সিলোব সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রবে সঙ্গে এত চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টাব সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

— সমুদ্র।

বললাম, উঁহ। আমি জানি।

— কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্নোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড়কাপড় —

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারী শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজ়ে এমন অবস্থা, শরীরেব কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন কাঁটাকাঁট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ারকির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম। — এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাভড্যাভ করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মতো ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না হচ্ছিলো তা নয়। এক একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে নুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝামঝাম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু'বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মতো নুলিয়াটাকে হাত ধবতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধবেই বা যাচ্ছে কেন চেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এত দূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড় জা হয়তো জিগ্যোস করবে, হ্যাঁ বে নতুন, সমুদ্রে নেমেছিঁস তো বোজ? তাবপরও অবশ্য ইয়ারকি-ঠাট্টা করবে তা জানি। বড় জা অবশ্য বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিলো একবার রথের সময়। নন্দবাও। এবার ওবা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড় জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কাবো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম চেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালি'ব ওপব হুমডি খেয়ে।

আবে, এব মধ্যে এত চড়া বোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

— কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যোস করলো।

আমি সায়াও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতবে ভেতবে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয়। গৌতম বললে, চলো, তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা আবার সেলাম করলে। — নাহাতে যাবে না দিদি? বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যেই। বললাম, থাক না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিলোর হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোনো আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুস্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুস্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখাচোখি হতেই বউটি হেসে বলল, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা — যে কাপড় ভিজ়ে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও চেউয়ের কাছে যেতো না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে সুন্দর বুকুর ওপর দিয়ে, এক রাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকলাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলোই বা কেন? না-হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশীই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেল। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেক্ষবার মুখে।

গৌতম বললে, না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মতো মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু'আনা পয়সা তো, তার বেশী আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশী হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে — তার নবপবিবীতা স্ত্রীব চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওব মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেল, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিগ্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চাঁৎকার করে বললাম, এই। বেশী দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন্ স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিলো, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজসজ্জা ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনো, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে। এ একা-একাই কত দূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো।

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চাঁৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধ হয় শুনতে পেলো না।

এ কি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এত দূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশে-পাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুস্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো উনি কত দূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মতো বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুস্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অত দূর থেকে চীৎকার এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি এদিক-ওদিক তাকলাম, কি করবো ঠিক কবে উঠতে পাবলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠাণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে তখনো। অনামনস্কভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউবে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মতো হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তাবপব মুহূর্তের মধ্যে আমার দু হাতের দুটো বালা খুলে তাব হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখ ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে।

ঠিক কি বলেছিলাম, কিভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিভ্রিড় করে কি যেন বললে, তারপব সমুদ্রের বুক ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কি উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোট্ট ছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি.....

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমার পা দুটো থরথর করে কঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চীৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল..... আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর?..... বীভৎস একটা আতঙ্কে চীৎকার করে কঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম, কিংবা.....

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম একরাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি, বাবু বাঁচ গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনো ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে, নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেল ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম, ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমবা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দুব হয়েছে, কিন্তু গৌতমেব সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত চেউয়েব সঙ্গে যুদ্ধ কবে করে পরাজিত সৈনিকের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

একসময় সাজুস্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে। — কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তারপর মাথা নিচু কবলে।

আব ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমাব মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়াব হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমবা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দুজনকে তুলনা কবে গৌতমের দুঃসাহসেব জনো গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেল। আমাদের চোখেব সামনে দিয়েই সমুদ্রেব পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখাচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো, সেলাম কবলো। তাবপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো। গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়েব পব একটা মাসও যেতে না-যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলবো।

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বাল্য দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বাল্য দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ।

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক, এত তাড়াতাড়ি কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চান্স হয়ে উঠলো। গত কালের সেই ক্লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মতো কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখাচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা, দুগাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পবতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড় জা? বলবে হয়তো, ‘দু দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালা জোড়া খুইয়ে এলি?’ বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড় জা-ব খুব পছন্দ হয়েছিলো। তাব চেয়ে একজোড়া চুড়িই বরং দেওয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওব বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ ভায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পাবলে যেন শাস্তি নেই। আমবা দুজনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মতো সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ বিনুক কুড়োতে কুড়োতে যাবাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমাদের দিকে। আব তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীষত্ব দেখাতে গিয়েছিলো, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্টিব চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়ে ছিলো। সেই দুটি টানা-টানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে চোখ প্রশংসার বিস্ময়ে বিস্ময়বিত হয়ে বলে উঠেছিলো, ‘দেখো, দেখো, উনি কত দূব গেছেন!’ সেই চোখজোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমাব আব ভালো লাগছে না।

গৌতম সায দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হলো না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বলল, বার্থ পাওয়া গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পবেব পবেব দিন সকালে নিতাদিনের মতোই সাজুন্টি আর তাব স্বামী নেমে গেল আমাব চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বৃকের ওপব গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকাবণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু মান করতে যাবো কি না সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওবা লক্ষ করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে মান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ্য করেছে? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলেই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

‘কিন্তু ওরা যখন মান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি। — শুনেছেন? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বৃড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাকে।.... কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোর কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেন্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো!..... আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো!’

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেল বউটি। আমি শুধু স্নান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেন্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

— কই, শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুস্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটানটা দিদি পছন্দ করেছিলো। দিদি। দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে। দিদির মতো আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকোরেরটার ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর-আপ্যায়ন। — বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো, দেখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো — বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাক্স, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তাহলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আব হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুস্তি যে বললে ওরা গরমেন্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তাছাড়া ডিঙি কবে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরীবও ওরা নয়। এক-একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হতো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তাছাড়া, সাবা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে — না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আব জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে! ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোন দিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক-একসময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশী ভালোবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্ট। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায় — আমি কিন্তু কোনো দিন লক্ষ করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারিনি গৌতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো — তারপরই বলেছিলো ও, বলেছিলো, তোমার ঝিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু দিন পরে, যাবার আগেই দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্রের গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন? আসলে ও বোধ হয় ভেবেছিলো আমার ফিরে

যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর। প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কিন্না, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা। ভাবলে আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলো গৌতম। বড় জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যা কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম কবছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেওয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেওয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম!

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে, কিন্তু অ্যালার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম-ভাঙলো তখন আর এক ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব নোটেতে। ফিরে এসে বিছানাপত্রের গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দুজনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম এক দিন। টুকটাকি জিনিসপত্রগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিকনি, টুথব্রাশ, পাউডার, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব ওঁছিয়ে নিতে সময় লাগলো।

আব এসব কবতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব বিকশায় তুলে সবে বিকশাওয়ালো প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনের বাস্তা ধবে হাঁটতে হাঁটতে।

রিক্শা চলতে শুক কবছে ওখন। আমাদের দেখতে পেয়ে একমুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা, সেলাম করলে। সেলাম করলো বোধ হয় বকশিশের লোভেই।

ছি ছি, একেবাবে ভুলে গিয়েছিলাম ওব কথা। এত খাবাপ লাগলো আমাব। বিকশাওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই, দেখো তো তোমার বাগটা, এব বকশিশটা দেওয়া হয়নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপব সুন্দব নকশা-কবো বটুয়াটা এখানেই কিনেছি — মন্দিবে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডব ছিড়িদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চাব-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।

কি করি, স্টেশনে পৌঁছেই তো বিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা এক টাকার নোট বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশী হয়ে সেলাম করলে। হাসলো। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড় জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার।

বড় জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভালো বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ও মা — আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমতো একটা কাণ্ড।

— কি কাণ্ড? চোখ কপালে তুললো বড় জা।

আমি বললাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু'আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কেব দৃশ্যটুকু চোখেব সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড় জা কি যেন বললে, আব আমাব তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমাব কি মাথার ঠিক ছিলো? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আব আমিই জানি। না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তাছাড়া আমাব বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা কবে ছিলো নাকি নুলিয়াটা? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

পিতা

চাণক্য সেন

দিস্মীব একত্রিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে হবনাম সিংকে ক'জনেই বা চেনে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার পরিচয় অনেকদিনের, এবং গভীর। সে আমার গাড়ি চালায়, অতএব, তার দ্বাৰা প্রতিদিন আমি চালিত হয়ে থাকি। ড্রাইভার এবং গাড়ির মালিকদের মধ্যে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে, অনেকে জানেন। তা ছাড়া মানুষ হিসেবে হবনাম সিংকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রথমত, তার ছ' ফুট দুইঞ্চি মেদহীন দেহের সোজা তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীয়ত, তার মুখে অবিবাম হাসি, প্রায়ই যা সবব এবং শিশু'ব মতো সবল, তৃতীয়ত, তার স্বভাবের আকর্ষণীয় সততা, এবং প্রধানত, তার জীবন-চেতনাব বলিষ্ঠ আশা প্রবণতা। হয়তো একটু বাড়িয়েই বলছি, কারণ হবনাম সিংকে আমি অনেকাংশে এক অসাধারণ মানুষ বলে মনে করি।

কাবণ আছে। লোকটির আনুগত্যে ফাঁক নেই। প্রয়োজনে, বিপদে সর্বদা এক পায়ে খাড়া। চুবি কাবচুপি'ব ধাব ধাবে না। টাকার চেষ্টা বেশি'ব ভাগ সময়ে ফেরত দেয়। লোভ-লালচ কম। পাংচুয়াল। গাড়িটাকে সত্যিকারের ভালোবাসে, যত্ন করে। ভালো চালায়, সাবধানে, গা বাঁচিয়ে। আপনার যদি ড্রাইভার থাকে, হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই হিংসে কবছেন। হ্যাঁ, হবনাম সিংকে ভালোবাসাব কাবণ আছে।

ওকে নিয়ে যে গল্প লেখা যায়, কখনও ভাবি নি। হঠাৎ দেখা গেল হবনাম সিং সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ ও'ব জীবনবদে এমন কিছু ধবা পড়ল, যা যুগপৎ ভাস্কর ও বাখা-স্নান। মধ্যাহ্নের সূর্যের ওপর হঠাৎ বর্ষার মেঘ নেমে আসে, দেখে থাকবেন। তেমনি।

“ছেলেটা চলে গেল,” গাড়ি চালাতে চালাতে বলল হবনাম সিং। “ছেলেটা চলে গেল।” বলে উঁচু পর্দায় হেসে উঠল। চোখ দুটো জলে ভবে এল।

“যেতে দাও,” বিজ্ঞের উপদেশ দিলাম আমি। “তুমি তো অনেক করেছ। এবাব দেখুক জীবনটা এমন সহজ নয়। দেখুক কত ধানে কত চাল।”

চোখেমুখে হেসে উঠল আবার হবনাম সিং। বলল, “চলে গেল, দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই হৃদয়, লেখাপড়া করল না। ড্রাইভারের ছেলেই রয়ে গেল। ভদ্রলোক হল না। আদমি হল না।”

পাতিয়ালা রাজ্যের যে গ্রামে হবনাম সিং-এর জন্ম হয়েছিল তেতান্নিশ বছর আগে, সেখানে থেকে চার ক্রোশ দূরে ছিল মিডল স্কুল, যেখানে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত বাল্যকালে ও পড়েছিল। বাপও গরজ করে নি, নিজেরও মন ছিল না, তাই সেদিন স্কুল যাওয়া বন্ধ ক'রে বাপের পেছন পেছন মাঠে গিয়ে হাজির হল, কেউ অবাক হয় নি, তিরস্কার করে নি, দুঃখ পায় নি। মাঠের কাজেও মন বসল না হবনাম সিং-এর, জই ষোলো বছর বয়সে একদিন হাজির হল পাতিয়ালা শহরে, কাজ পেয়ে গেল এক মোটর মেরামতের গ্যারেজে। তখন

সবেমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। গ্যারেজে কাজ করতে করতে শিখে নিল গাড়ি-চালনা। বছর খানেক পরে ভর্তি হল মিলিটারীতে। ট্রাক-ড্রাইভার। পাঁচ বছর ধরে অনবরত অসংখ্য গাড়ি চালান হরনাম সিং— ভারী লরী, জীপ, এমনি গাড়ি, ভারতবর্ষে, বর্মায়, সিংহলে। যুদ্ধের পরও বছর দুই মিলিটারীতে কাজ করার পর, দেশ যখন ভাঙল এবং স্বাধীন হল, হরনাম সিং ছাড়া পেয়ে চলে এল দিল্লীতে, কাজ পেল ভারত সরকারের এমন এক বিভাগে যেখানে দিনে শ' দুই মাইল তাকে গাড়ি চালাতে হয়, কখনও রাত্রি আটটা থেকে ভোর চারটে, কখনও ভোর চারটা থেকে বেলা বারোটা, কখনও বারোটা থেকে রাত আটটা। অর্থাৎ সফট ডিউটি। এরই মধ্যে পার্ট-টাইম কারুর না কারুর ড্রাইভারীও সে ক'বে এসেছে। এখন বছর পাঁচেক ধরে লেগে আছে আমার সঙ্গে।

চমৎকার ইংরেজী বলে। ভাষাটা যেহেতু কষ্ট ক'রে শিখেছে, যুদ্ধের সময় গোরা সৈন্যদের সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, তাই চর্চা রাখবার চেষ্টা প্রচুর, যাতে অব্যবহারে বিদ্যা হারিয়ে না যায়। অতএব, আমার ও আমাদের সঙ্গে বেশীর ভাগ কথা বলে ইংরেজীতে। অথবা হয়তো বুঝে নিয়েছে আমার হিন্দীজ্ঞান ওর, ইংরেজীর চেয়ে এমন কিছু প্রখর নয়। আমি যদি হিন্দী বলতে পারি, হরনাম সিং-ই বা কেন ইংরেজী বলবে না?

সূতবাং . “হোয়াই গো বিগ গ্যারেজ! অল চোরস্। আই নো ম্যান ইরউইন রোড। ওড মেকানিক। নো লেগ।”

“পায়ের মে কেয়া হয়্য?”

“হী হাস ভেরী ব্যাড অ্যাকসিডেন্ট। ট্যাক্সি হিট। ভেবী ব্যাড ট্যাক্সিম্যান। হী নো কনসাস। ট্যাক্সিম্যান কিপ হিম অন বেললাইন। ওয়ান লেগ গন। কাম বেলগাড়ি, সেকেন্ড অ্যাকসিডেন্ট, টু লেগ গন। বাট ম্যান অ্যালাইভ। টুক্ টু হসপিটাল। গেট ওয়েল। নাউ, বোথ আইরন লেগ। হী ওড মেকানিক অন ইরউইন রোড।”

“কাম কবতা পারতা হয়্য।”

“হোয়াট ডু? গড্ ক্রুয়েল, ম্যান মাস্ট লিভ। নো ম্যাবেজ নো বোথ লেগ, হোয়াট ম্যাবেজ?”

“উসকো কোন শাদী কবেগা?”

“দ্যাট আই সে। নো গার্ল ম্যান্নি ম্যান টু লেগ গন। ওড মেকানিক।”

গরীবের জন্যে হরনাম সিংহের প্রাণ সর্বদা দুর্বল। বড়ো কাবখানায় গাড়ি মেবামতে ভীষণ আপত্তি। যদি বলি, কারখানায় কাজ ভালো, তা ছাড়া, ওদেব দাখিত থাকে, নুস্ত হলে আবার গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়, হরনাম সিং জবাব দেয় :

“দে রীচ। মোব রীচ মোর থীভ্। পুওর মান মেক টু পাইস।”

বলেইছি তো, লোকটা ভালো। হৃদয়বান। দরদ আছে।

সরল, সহজ। বাড়িতে ঢুকে সোজা শোবার ঘরে চলে আসে চাবির জন্যে। গিল্লী রাগ করেন। আমার কিছু বলতে সবম লাগে। হরনাম সিং-এর কুহ-পরোয়া নেই। খিদে পেলে সোজা বাগ্নাঘরে গিয়ে পাচকের কাছে খাবার চেয়ে নেয়। অনুমতির অপেক্ষা না করে, টেলিফোন ব্যবহার করে। বাজার কবতে দিলে উন্টো-পাশ্টা করে আনে। বলেইছি তো, লোকটা সহজ, সরল। বাড়ি এসে প্রথমে খবরের কাগজ। কাগজখানা নিয়ে লাউঞ্জ, বেতের চেয়ারে বসবে। পকেট থেকে বার করবে চশমা। এটা আমাকেই কিনে দিতে হয়েছে। ইচ্ছে ছিল, যে ডাক্তার কুড়ি টাকা ফী নিয়ে আমার চোখ দেখে তার কাছে যাওয়ার। পাঠিয়েছিলাম সফদরজং হাসপাতালে।

“হসপিটাল ডক্টর নো ওড।” আপত্তি করেছিল হরনাম সিং।

“বহুত ওড্ হয়্য।” বলেছিলেন আমি।

“ডক্টর শেঠী ভেরী শুড।”

“বিশ রূপায়া লেতা হ্যায়।”

“হোয়াট টুএন্টি রূপি ফর আই?”

অর্থাৎ কুড়ি টাকা বড়ো, না আমার চোখ?

কিন্তু হসপিটালেই যেতে হয়েছিল। চশমার প্রেসক্রিপশন নিয়ে হাজির হল আমাদের জানাচেনা দোকানে। বিল দেখে অবাক হয়েছিলাম। বাইশ টাকা।

“আরে এতনা রূপায়াকা চশমা লিয়া?”

“অনলি টুএন্টিটু রূপি।”

সেই বাইশ টাকার চশমা চোখে চোখে লাগিয়ে হরনাম সিং কাগজ পড়ে। বেশ বড়ো গলায়। বানান করে করে। এবং টাকার সঙ্গে।

“দি প্রাইম মিনিস্টার টু ডে টেম্প্ড পার্লিয়ামেন্ট দ্যাট প্রাইসেস অব এ-এ-সে-স-ন-সিয়াল কমো-কমো-ডি-আই-টি-ই-এস উইল বি ক-নট্রোল-ড। হোয়াট সে! প্রাইস গো আপ মর্নিং ইভিনিং, পটাটো এইট পয়সা কিলো, পুত্তব পিপল হাংরি, হোয়াট প্রাইম মিনিস্টার! সী টেম্প্ড দি লোক — সভা —।”

নেতাজী নগবে হবনাম সিং-এব সবকাবী ফ্রাট। একতনায, দুখানা ঘর। পবিবাব ছোট, স্ত্রী, দুটি ছেলে। সহজ সরল জীবন, তাই দু’ঘবেব এক-খানাই যথেষ্ট, অন্যখানা হবনাম সিং ভাড়া দিয়েছে, যেমন অনেকে দিয়ে থাকে, যদিও আইন-কানুনে বাধে। চাপ দিলে যত টাকা ভাড়া পেতে পাবত তাব চেয়ে বেশি নেয নি, কাবণ তাব লোভ-লালচ কম। সুখী পবিবাব। হরনাম সিং দিন বাত্রিব তিন ভাগ সময় বাইবে, সংসাব চলে স্ত্রীর পরিশ্রমে, গোলগাল মেয়েমানুষটি মুখবা নয়, শ্রমকাতর নয়, অপ্রয়োজনে অর্থবায়ে অকর্চি। ছোট ছেলে সংনাম মাব সঙ্গে সঙ্গে থাকে, স্কুলে যায়, পাড়াব ছেলেদেব সঙ্গে খেলে। বড় ছেলে নানক।

উনিশ বছবে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলেব দশম শ্রেণীব ছাত্র। বাপেব মতোই দীর্ঘ, বডশিব-ছিপ, মুখে কিন্তু হরনামী হাসি নেই, কেমন একটা কঠোব কাঠিন্য, তবে চোখ দুটি জলেব মতো তবল। নতুন দাডি-গোঁফে হঠাৎ একটু বেশী-বয়স দেখায। ভালো কঁবে তাকালে অবশ্যি বোঝা যায় ওটা বাইবেব।

ছেলেকে নিয়েই হবনাম সিং-এব যা কিছু সমস্যা। ছেলে নিয়ে সমস্যা নেই এমন বাপ কজন আছেন ভারতবর্ষে? অতএব, হরনাম সিং-এর পুত্র-প্রব্রম এমন কিছু গুল্লেব উপাদান নয়। উপাদান এ জন্যে যে হবনাম সিং তাব সন্তান, প্রথম সন্তান এবং পুত্র, নানক সিংকে চেনে না।

“সাব্”, একদিন হরনাম সিং বলেছিল আমায়, বছর দুই আগে “সাব্, একটা অর্জি আছে।”

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে, যোগ দিয়েছিল, “মাই সন।”

“কি ব্যাপার?”

“ডিফিকাল্ট বয় মাই সন।”

“সব ‘সনই’ ডিফিকাল্ট।”

“হী শুড বয়। বাট নো রীড।”

“কোন ক্লাসে পড়ে?”

“ক্লাস এইট। একজামিন অল্ পাস। বাট নো ওয়ার্ক।”

“না পড়েই পাস করে? তাহলে তো বুদ্ধি আছে।”

“ওয়ার্ক অনলি হোয়েন একজামিন নিয়ার।”

“সবাই তো তাই কবে দেখি আজকাল।”

“নট অল সাব। বাপীসাব (আমার ছেলে) অলওয়েজ ওয়ার্ক। রীড মেনি বুক।”

“স্কুলটা পাস কবিয়ে দাও, তারপর একটা চাকরি —”

“নো সাব”, হঠাৎ অসম্ভব জোর দিয়ে বলে উঠেছিল হরনাম সিং। “আই ভেরী পুওর ম্যান। নো এডুকেশন, অনলি ক্লাস ফাইভ। মাই অল রিস্তেদার নো এডুকেশন। আই ওয়ান্ট মাই সন গুড এডুকেশন। আপ টু বি এ।”

সেদিন আমি হঠাৎ নতুন চেহারা দেখতে পেলাম হবনাম সিং-এর। লোকটা দিনরাত গাড়ি চালায়, পরিশ্রমের শেষ নেই। সবসুদ্ধ, মাইনে, বাড়ি ভাড়া, বাড়তি রোজগার নিয়ে, শ’ দুই টাকা মাসিক উপার্জন। ছেলেকে বি.এ. পাশ করানো ওর একমাত্র দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা। পাঞ্জাবী সর্দারের স্বপ্ন।

হরনাম সিং বলেছিল, “আই ভেরী পুওর ম্যান, সাব। বাট ভেরী হ্যাপী। মাই ফ্যামিলি অল পীস। আই নো বরো মানি এনিবাডি। সিম্পল্‌ লাইফ। খানা পরনা অল সিম্পল্‌। অনলি বয় ভেরী ডিফিকাল্‌ট।”

“ডিফিকল্‌ট কিসে?”

“হী নো রীড, গুড বয়। বাট নো ওয়ার্ক। অলওয়েজ সিনেমা। অলওয়েজ নিড মানি। হোয়েয়ার আই গেট মানি?”

“ঠিক তো। চাইলেই ছেলেকে পয়সা দিতে হবে?”

“হোয়াট ডু সাব? নো গিড্‌ মানি, মাচ্‌ ট্রাবল্‌। হী নো দ্রিট, গো এওয়ে ফ্রম হোম, ফাইট উইথ মাদার।”

“তুমি শাসন করতে পারে না?”

“আই টেল হিম সাব। নো হীয়ব। ভেরী ডিফিকাল্‌ট।”

একদিন যা কখনও ঘটে না তাই ঘটল। হবনাম সিং এল আধ ঘণ্টা লেট ক’বে। প্রচুর মাপ চেয়ে যা বলল তাব মানে হ’ল : রেডিযো কিনতে চাঁদনীচক গিয়েছিল। এক সর্দাব কমিশনে মারফি বেড়িয়ে দেবে বলেছিল, তাই যেতে হ’ল চাঁদনীতে।

“রেডিযো কিনলে কেন হঠাৎ?”

“হোয়াট ডু সাব। বয় ওয়ান্ট বেডিযো। নো বেডিযো, নো রীড। নো গো স্কুল।”

রেডিযো না কিনে দিলে ছেলে স্কুলে যাবে না। তাই তিনশ’ বাবো টাকা দিয়ে হবনাম সিংকে রেডিযো কিনতে হ’ল।

“রেডিযো তো ভালো জিনিস। গান শুনবে, ভালো ভালো বহুতা শুনবে।”

“হোয়াট গুড্‌ সাব? আই ভেরী পুওর ম্যান। নো লাইক রেডিযো। বাট বয় ওয়ান্ট। নো রেডিযো, নট গো স্কুল।”

এমনি ক’রে নানক সিং একদিন একজোড়া টেরিলিন শার্ট আদায় করল। পায়ের সঙ্গে কামড়ে লেগে থাকা ট্রাউজাবও। “নো টেরিলিন শার্ট নো গো স্কুল।”

বাপকে স্কুলে না যাবার ভয় দেখিয়ে ছেলেটা দিব্যি সব কিছু বাগিয়ে নিচ্ছে। এ এক নতুন ধরনের ব্ল্যাক-মেল। একদিন বলতে হ’ল :

“ও যা চায় তাই যদি দাও, পড়াশোনা মাথায় উঠবে।”

“হোয়াট ডু সাব?”

“দেবে না।”

“দেন হী নট গো স্কুল।”

“বেশ তো, না পড়তে চায়, স্কুল ছাড়িয়ে দাও। তাগড়া জোরান ছেলে, কাজকর্ম শিখে বোজগার করুক।”

“নো সাব। ইন মাই ভিলেজ, নো গ্রাজুয়েট। নো রিস্তিদার এনি এডুকেশন। হী মাস্ট পাস বি.এ.।”

“এমনি ক'বে ক'দিন সামলাবে?”

“বয় ভেরী শুড, সাব। আফটার রেডিয়ে, হী রীড। শুড রেজাল্ট ইন ইনতিহান।”

“কি ক'রে জানলে? ছেলে বলেছে?”

“আই গো টু প্রিন্সিপাল। হী সে বয় শুড। বাট নো ওয়ার্ক।”

তারপর শুনলাম ছেলের জন্যে হরনাম সিং এক মাস্টার ঠিক করেছে, মাইনে মাসে ত্রিশ টাকা। অঙ্কে কাঁচা। প্রথম চেয়েছিল আমাব ছেলের কাছে এসে অঙ্ক শিখুক। নানক রাজী হয় নি। অগত্যা গৃহশিক্ষক।

নানক এখন ক্লাস টেনে পড়ছে। প্রায়ই হরনাম সিং বলে, আব একটা বছর পরেই সে কলেজে যাবে। কোন কলেজে পাঠাবে জিজ্ঞেস করে। আমাব ছেলে সেন্ট স্টিফেন্স-এ যায়। নানক কি পড়তে পাবে ঐ কলেজে? অবশ্য যদি ভালো রেজাল্ট করে খবচ কি অনেক বেশি? বেয়াদপি মাপ ক'বে কতো খবচ হয় আমি কি বলবো? মাসে একশ টাকা? মাই গড, অত টাকা কোথায় পাবে হবনাথ সিং? বামজাস কলেজে কতো খরচ? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি কখনও আমাব ছেলেকে নিয়ে যায়, হবনাম সিং এক একটা কলেজে ঘুরে বেড়ায়। ভেতরে গিয়ে ক্লাসরুমের বাইরে একটুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের দিকে প্রলুব্ধ বিষ্ময়ে তাকায়। তাদের মধ্যে বোধ কবি দেখতে পায় নিজের ছেলেকেও।

“সাব, অল কলেজ বয় স্মোক। ভেরী ব্যাড।”

আমাকে নীবব দেখে, “বয় অ্যান্ড গার্ল অল-ওয়েজ একাঠা। ভেরী ব্যাড।”

“একসঙ্গে পড়ে যে।”

“বাট হোয়াই ওয়াক একাঠা অন বীজ?”

আমি হেসে ফেললাম।

“নো লাফ সাব। বাপীসাব অলসো উইথ মের্নি গার্ল।”

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম।

“বাট বাপীসাব ভেরী শুড। পহলে পহলে কী স্মোক। আই নট টেল ইউ, বাট ইন দি কাব হী স্মোক।”

“জানি।”

“আই আঙ্ক হিম, হোয়াই স্মোক। সাব নট লাইক ইউ স্মোক। বাপীসাব সে আই টেল মাই ফাদার। হী নট অবজেক্ট।”

“ঠিক।”

“বাট নাউ হী নট স্মোক। নেভার। আই আঙ্ক, হোয়াই নট স্মোক। হী সে ফাদার নট লাইক সে আই নট স্মোক। উইথ মানি আই বাই বুক।”

“তোমার ছেলে তো স্মোক করবে না।”

“উই শিখ নো স্মোক। বাট হী গো উইথ গার্ল।”

“ভালোই তো। নিজে বি.এ পাস করবে, বি.এ.পাস একটি মেয়েকে বিয়ে করবে।”

হরনাম সিং-এর মুখে এক গাল হাসি। যা বলল তার মানে হ'ল, সাহেব, দেশটা বদলে গেছে। কতো নতুন নতুন বাঁধ, কলকারখানা, স্কুল কলেজ তৈরি হচ্ছে। আমি চাই নানক নতুন আদমি হোক। নতুন জমানার নতুন আদমি। “আই নো এডুকেশন। বাট আই ভেরী

হাপী। আই ওয়াস্ট নাথিং ফ্রম বয়। হী লিভ আপনা লাইফ। আই টেল, ইউ ডু নাথিং ফর মি। বাট বি গুড্ আদমি। নো এডুকেশন নো আদমি, নো আদমি অফ নিউ ইণ্ডিয়া।”

“তুমি তো এভোসব বলছ। তোমার ছেলে কি ভাবছে খবর রাখো?”

হরনাম সিং কথার মানে বুঝতে পারল না।

“ছেলেকে জিজ্ঞেস করো সে কি করতে চায়।”

“নো সাব। আই নট টক টু হিম।”

“সে কি? ছেলের সঙ্গে কথা বলো না?”

কি ক'রে বলবে? হরনাম সিং দিনরাতের তিনভাগ বাইরে। বাড়িতে কতোটুকু সময়ই বা কাটায়? ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎই বা কতোটুকু! তাছাড়া ছেলে প্রায়ই বলে হরনাম সিং কিছু বোঝে না।

“আই অনলি ফিফ্থ ক্লাস, হী টেন ক্লাস। আই নো নাথিং হী সে। হাউ টক?”

সমস্যা কঠিন বটে।

“ছেলে বলে না কি করতে চায়?”

“কখনও বলে, ড্রাইভারী শিখাও, চাকরি করবো। কখনও বলে ছবি আঁকবো।”

“ছবি আঁকবে?”

“হী গুড পিকচার মেক, সাব।”

একদিন নিয়ে এল ছেলের আঁকা একগুচ্ছ ছবি। অনেকগুলি পেন্সিল স্কেচ, কাঁচা-হাত হলেও লাইনের সূক্ষ্মতা আছে, এখানে-ওখানে এক আধটু মৌলিকতাব চিহ্নও বর্তমান। বাকীগুলি রং-এব নকশা। নানাবকম শাড়ি-পাড়েব, কার্পেটের ডিজাইন। রং চেনে ছোকরা।

“এসব কখন করে?”

“হী ডু দিস মেনি টাইম। নো রীড, অনলি দিস।”

“কাজ তো ভালই কবে। আর্ট স্কুলে ভরতি ক'বে দাও না কেন?”

“হোষাট পিকচার ব্রিং মানি সাব! হী গো টু আর্ট স্কুল, হী মেক সিনেমা স্টাব পিকচার। নো গ্রাঙ্কুয়েট।”

স্কেচগুলির মধ্যে হঠাৎ একখানাব উপর চোখ পড়ল। একাটি মেয়ে, ক্ষীণাঙ্গী, মুখখানা রুক্ষ হলেও চিবুকে ও গুষ্ঠাধরে লাবণ্য লেগে বয়েছে। চোখ দুটি ড্যাবডেবে, বাঁ গালে মস্ত এক তিল। সালোয়ার কমিজ পবনে, উড়নি বুকেব ওপর নয়, গলায় মোড খেয়ে পিঠে ঝুলছে।

“এটা কার ছবি?”

“ডোস্ট নো সাব। ফ্রম হিজ মাইণ্ড।”

মিথ্যা কথা বলতে পারে না হরনাম সিং। অস্বস্তি বোধ করে।

নড়েচড়ে বসল।

“ওয়ান আর্জি, সাব।”

“বলো।”

“ইউ স্পিক টু মাই বয়।”

“কি বলবো?”

“হী পেইন্ট বাট নো রীড। হী বি বি. এ.”

“আমি বললেই হবে?”

“ইয়েস সাব।”

“আচ্ছা বলবো একদিন। নিয়ে এস আমার কাছে।”

“হী নট কাম, সাব। ইউ প্লীজ কাম মাই হোম।”

“আচ্ছা যাবো একদিন।”

যুদ্ধকালে টমীদের সঙ্গে থেকে থেকে হরনাম সিং কয়েকটি বিশেষ শব্দ রপ্ত করেছে। একটা হ’ল, ‘কারী অন, জনি’। এটা রাস্তায় চলতে চলতে সে প্রায়ই ব্যবহার করে। অন্য কোনও গাড়িকে রাস্তা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করে বলে ওঠে, ‘কারী অন, জনি’। আর একটা হ’ল, কয়েকটি ইংরেজী গানের কলি। যেমন, ‘আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড’। ‘ইংলণ্ড’ শব্দটি সম্ভবত হরনাম সিং-এর নিজের সংযোগ। ‘আই লাভ ইউ মাই লাভ’ বলতে সরম হয়। তাহি, ‘ইংলণ্ড’। এ গানটা সে প্রায়ই করে, যখন বিশেষ করে সপরিবারে আমরা দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। আর একটা গানও মাঝে মধ্যে গেয়ে ওঠে। ‘হোয়েন দি ফাওয়ার্স ব্লু’, কথটা নিশ্চয় ‘ব্লু’, কিন্তু ‘ম’ অনেকদিন ফুল থেকে বরে গেছে, ফুল এখন নীল।

আলোয়ারের রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। গাড়ি চালাতে চালাতে হরনাম সিং বার বার পেছন থেকে হর্ন বাজানো ড্রাইভারদের লক্ষ্য করে চেষ্টা করে উঠছিল, ‘কারী অন, জনি’। এক সময় গানও ধবেছিল। ‘আই লাভ ইউ মাই ইংলণ্ড’।

টুটল, আমার মেয়ে, প্রশ্ন করে বসল, ‘হরনাম সিং, তুমি ইংলণ্ডকে ভালোবাসো?’

“ভেরী মাচ লাভ আই ইংলণ্ড।”

“চলে যাও না কেন?”

“হাউ গো, পুওর ম্যান।”

বাণী বলল, “অনেক পাঞ্জাবী তো চলে গেছে ও যাচ্ছে।”

“সামটাইম আই অলসো থিংক আই গো।”

“যাও না কেন?”

“টাইম কাম, আই গো।”

“কবে?”

“হোয়েন বয় পাস বি এ. আই গো।”

“বৌ আব ছোট ছেলে?”

“দে গো ভিলেজ।”

“খাবে কি?”

“আই হ্যাভ ল্যান্ড দেয়ার। দে নো হাংগার।”

“গিয়ে কি কবে?”

“বিগ সাহেব মোটরকার ড্রাইভ। রোলস্‌রয়েস।”

“ফিরে আসবে না?”

“নো কাম ব্যাক। আই লাভ সী মেনি কানট্রি। ইয়োবোপ ভেরী গুড। ইণ্ডিয়া ভেরী ব্যাড। ভেরী পুওর। হিয়ার অল চোরস্।”

সেদিন আবার হরনাম সিংকে তাকিয়ে দেখলাম। “আই লাভ সী মেনি কানট্রি।”

মাস খানেক পর, একদিন সন্ধ্যায়, বাড়ি ফেরার সময় হঠাৎ হরনাম সিং বলে বসল :

“সাব, বয় এগেন মাচ ট্রাবল্।”

“কি হ’ল আবার?”

হঠাৎ জবাব দিল না হরনাম সিং। আমারও উৎসাহ ছিল না একটুও।

একটু পরে বলে উঠল, “হী গো আফটার গার্ল।”

চমকে উঠলাম।

“হী গো আফটার গার্ল।”

“বয়স কতো?”

“উনিশ।”

“তবে ও মেয়েদের পেছনে ঘুরবে নাকি তুমি ঘুরবে?”

হো হো ক’রে হেসে উঠল হরনাম সিং।

“দেন নো ফিয়ার, সাব?”

“মেয়েটি কে?”

পড়শী কারুর মেয়ে।

“কতো বড়ো?”

“নট স্মল। গ্রো আপ গার্ল।”

“ছেলে কি করে?”

“গো আফটার শী।”

“বারগ ক’রে দিও।”

“নট হীয়ার হোয়াট আই সে।”

“উনিশ বছরের ছেলে, একটু আধটু তো মেয়েদেব সঙ্গে মিশবেই। বাড়াবাড়ি কিছু না করলেই হ’ল।”

“নো সাব, নট দ্যাট থিং। বাট গো আউট হী অ্যাণ্ড শী।”

“বন্ধ ক’রে দিও। মেয়ের বাপকে বোলো।”

এর পরে ঘটনা ঘূর্ণিরাপ ধারণ করল। হঠাৎ এমন তেজে ঘুরল, না হরনাম সিং না আমি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারলাম।

দিন দশেক পর একদিন হবনাম সিং দপ্তবে এসে হাজির। চোখেমুখে আত ভয়ের চিহ্ন। লোকটা কেমন যেন দিশেহাবা মনে হ’ল।

“কি ব্যাপার?”

“ডেনজাব, সাব।”

“কি হয়েছে?”

“লড়কি কাম মাই হোম।”

কেমন যেন মেজাজ গরম হয়ে গেল আমার।

“ইংরেজী রাখো। বুঝিয়ে বলো। লড়কি? কোন লড়কি?”

যা বলল তা যেমন নটকীয়, তেমন সংকট-সংকুল। ছেলেটা অনেকদিন হ’ল সেই পড়শী মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসেছে। স্কুল যাবাব নাম ক’রে দুজনে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে। সিনেমায় গেছে। পাড়ার সবাই এ নিয়ে অনেকদিন ধবে নানা রকম বলছে। হরনাম সিং-এর বৌ নালিশ করেছে কিন্তু সে বড় একটা কান দেয় নি। এখন, আজ, সেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে হরনাম সিং-এর বাড়ি। নিজের ঘরে সে যাবে না। ওখানেই থাকবে।

এমন ঘটনা সচরাচর আমাদের সমাজে ঘটে না। হঠাৎ যেন বড় অসম্ভব, বড় গল্লেটে মনে হ’ল।

কিন্তু গল্প তো নয়। একেবাবে বাস্তব ও সত্য।

“হোয়াট ডু সাব?”

“তোমার ছেলে কি বলে?”

“হী ব্রিংগ গার্ল হোম —”

“হিন্দীতে বলো।”

বলল, “ছেলে মেয়েটাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। মাকে বলেছে, ও এখানেই থাকবে।”

“মেয়ের বাপ-মা কি বলে?”

“কিছু না। মেয়ের বাপের সাতটা বাচ্চা। নিজের বাড়িতে থাকতে চায় না মেয়েটা। যেতেও রাজী নয়। তারাও ডাকতে আসে নি।”

“খবর দিয়েছিলে?”

হরনাম সিং উত্তেজিত হয়ে হিন্দী ছেড়ে ইংরেজী ধরল “আই গো মাইসেল্ফ সাব। টু গার্লস ফাদাব। টেল, টেক ইণ্ডব ডটাব মাই হোম। হী সাইলেন্ট। নট সে এনিথিং।”

“এখন তুমি কি কববে?”

“কি করবো সাব তইতো ভাবছি। আমাব জীবনটা এমন সুখেব ছিল। সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেল। ছেলেটা সতানাশ ক’রে দিল।”

একটু পরেই : “এভরিথিং চেঞ্জ, সাব। হোয়াট ওয়ার্ল্ড! বয় ব্রিং গার্ল হোম। আই স্টে হিয়ার, শী সে। নট গো টু মাই হোম। ও মাই গড, হোয়াট ওয়ার্ল্ড।”

হেসে উঠল হরনাম সিং।

পরের দিন আটটা বাজতে না বাজতে বাড়িতে এসে হাজির।

“কি ব্যাপার?”

“সাব, গাড়িটা একটু পেতে পাবি?”

এমন আর্জি এব আগে কখনও করে নি।

“গাড়ি? গাড়ি কেন?”

“সাব, এভরিবডি সে গিভ দেম ম্যারেজ।”

“বল কি? বিয়ে দিয়ে দেবে?”

“হোয়াট ডু সাব? অল বডি সে গিভ দেম ম্যাবেজ।”

“তুমি রাজী হয়ে গেলে?”

“হোয়াট ডু সাব? ম্যাচ ট্রাবল! ভেরী ব্যাড।”

“ছেলে কি বলে?”

“বয় সে গিভ ম্যারেজ।”

“তোমার বৌ?”

“ওয়াইফ ভেরী সিম্পল। শী অনলি ব্রাই।”

“তাহলে বিয়েই দিচ্?”

“হোয়াট ডু সাব?”

“কবে?”

“নাউ, সাব। অল গো টু ওরদ্বারা।”

“ছেলের লেখাপড়া কিন্তু উঠল।”

“নো সাব। বয় সে গিভ ম্যাবেজ, আই গো স্কুল, পাস বি এ। নো ম্যারেজ, আই লীভ হোম।”

“তাই তুমি রাজী হলে?”

“হোয়াট ডু সাব?”

একটু পরে : “কার টেক সাব ওয়ান আওয়ার?”

“না। ট্যাক্সী ক’রে বিয়ে দিতে যাও। গাড়ি দিতে পাবব না।”

গুরুদ্বাবায নানক সিং-এর বিয়ে হ’ল। হরনাম সিং-এব খরচ হ’ল কুড়ি টাকা। মেয়েব বাপের এক টাকা পঁচিশ পয়সা। গুরুদ্বারার পুৰোহিতের দক্ষিণা। হরনাম সিং দশজন আত্মীয় বন্ধুদের ডেকে খাওয়াল। ট্যাক্সীতে খরচ করল আট টাকা। বৌ-এর জন্যে নতুন শাড়ি কিনে

আনল। মেয়েৰ বাপ বায় কবল না এক পয়সা। পাটি দিল না। মেয়েকে একখানা শাড়ি-গয়না পৰ্যন্ত না। সম্পৰ্ক রাখল না।

সাতদিন পৰ হবনাম সিং-এৰ ধৰ্মপত্নী পুত্ৰবধূকে নিয়ে হাজিৰ হ'ল কৰোলবাগেৰ এক লেডী ডাক্তাৰেৰ কাছে।

এ খবৰটা পেলাম মাসখানেক পৰে।

হৰনাম সিং বলল, “বয় এগেন ডিফিকাল্ট সাব। নট গো স্কুল।”

“স্কুল এবাব ছাডো। একটা কাজকৰ্মে ঢুকিয়ে দাও।”

“হোয়াট ওয়াক্ হী ডু?”

“কোনও কাৰখানায় —”

“আই নট ডু দ্যাট সাব। আই হোপ হী পাস বি.এ.। ইফ নট, হী গো টু হেল।”

“ছেলে বিগড়ে গেল কেন?”

“ব্যাড লাক, সাব হী অ্যাণ্ড গাৰ্ল গো আউট অল ডে। কাম ব্যাক ইভিনিং।”

“তোমাৰ ভাড়াটেকে তুলে দিয়েছ?”

“নট সাব।”

“সবাই এক ঘৰে শোও?”

হৰনাম সিং প্রশ্নটা বুঝল। বিষণ্ণ হেসে বলল, “হোয়াট ডু সাব? আই পুওৰ ম্যান। হোএয়াৰ গেট থাৰ্টি কপী?”

“কিন্তু —”

“নো, সাব। আই টেল ইউ অল থিং। গাৰ্ল পেগনেট। ওয়াইফ টেক হাৰ কৰোলবাগ ফৰ ওয়াশ। নো বাচ্চা সো সুন। বয় নট বীড।”

তিন সপ্তাহ পৰে নানক সিং নববধূকে নিয়ে ঘৰছাড়া হ'ল। ছোট একটা পৰিচি বেখে গেল বাপেৰ জনো . “তোমাৰ সঙ্গে আব থাকব না। নিজে কাজ ক'বে খাব। পড়ব না। স্কুলে বলে দিও।”

গল্পটা দিন দশেক আগে শুক কৰেছিলাম। এই দশদিনে নতুন এক ঘটনা ঘটেছে। হবনাম সিং আৰ আমাব গাড়ি চালায় না।

হৰনাম সিং এখন জেলে।

সহকৰ্মী ড্ৰাইভাৰ অনন্ত সিং তাৰ নতুন বি. এ. পাস-কৰা ছেলেকে নিয়ে এসেছিল দপ্তৰে সবাইকে দেখাতে। ইঠাং হৰনাম সিং-এৰ সঙ্গে হ'ব বগড়া বেধে গেল।

মাটি থেকে গাড়ি স্টাৰ্ট দেবাব ডাঙা তুলে হৰনাম সিং এাকে মারতে গিয়েছিল।

অনন্ত সিং এব বদলে 'ডাঙা' পড়েছিল তার ছেলের মাথায়।

হৰনাম সিং-এৰ একমাস জেল হয়েছে।

স্তন

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ

আবু তালেব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন সাহেব আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করাটা পারিবারিক ফরজ হিসেবেই দেখেন। যতদিন দুনিয়াদারীবি কাজে অকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন ততদিন সে কর্তব্যটি ইচ্ছানুযায়ী পালন করতে পারেননি। আজ তাঁর দায়িত্বে ভার অপেক্ষাকৃতভাবে লঘু হয়েছে বলে সে কর্তব্য পালনে বাধা-বিপত্তি কমেছে।

সালাহ উদ্দীন সাহেব যখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তার পূর্ব-আয়োজনটি রীতিমত সফরের আয়োজনের মতই মনে হয়। বিনা খববে ঝট্ কবে কারো বাড়ীতে তিনি উপস্থিত হন না। দেখা করতে আসবেন বলে আগাম খবর পাঠান দিন কয়েক আগে। সময়-প্রহর জানান, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি চা-মিষ্টি কিছুই গ্রহণ করেন না, পান-দোস্তা তামাকের অভ্যাসও তাঁর নেই। তাছাড়া ডাক্তারের কড়া নির্দেশে পথ্য করেন বলে থানাব দাওয়াতও গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ এক গ্লাস পানি ছাড়া অন্য কিছু তাঁকে দেওয়া সম্ভব হয় না। তবু অসিদ্ধ পানিটা বোগ-বাধির ভয়ে পান করেন না বলে তা-ও ক্লেচিং স্পর্শ করেন।

তাঁর আত্মীয়-স্বজনের চক্রটি কম বড় নয়। শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত সে পরিবারের লোকসংখ্যা অগুণ্ঠিত মনে হয়। তবু তাঁর বয়সের জন্যে এবং তাঁর সমৃদ্ধিসম্পন্ন আর্থিক অবস্থার জন্যে তিনি নিজেকে তাদের সকলেরই মুরুব্বী বলে মনে করেন এবং পদ্ধতিক্রমে বছরের মধ্যে একবার-দু'বার দেখা কবে আসেন তাদের সঙ্গে। তবে আত্মীয়-স্বজনের চক্রটি বৃহৎ বলে তাঁকে একটা সীমারেখা টানতেই হয়। যারা সে চক্রে বহির্ভূত, নিয়মিতভাবে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। সব কিছুতেই কোথাও না-কোথাও একটা সীমাবেখা টানতেই হয়।

অতএব সেদিন অপবাত্তে বিনা খবরে সালাহ উদ্দীন সাহেব যখন দেখা-সাক্ষাতের চক্রের বহির্ভূত দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কাদেরের বাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন ঘটনাটি নেহাতই বিস্ময়কর মনে হয়। তিন দিন আগে কাদেরের ষষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে বলে তিনি যে দুঃখ প্রকাশের নিমিত্তি এসেছেন তা মনে করা সম্ভব হয় না। সালাহ উদ্দীন সাহেব নিজেই গভীর শোকগ্রস্ত। প্রায় একই সময় তিন দিন আগে প্রসবকালে তাঁর অতি আদরের ছোট মেয়ে খালেদার মৃত্যু ঘটে।

ক্ষুদ্র বৈঠকঘরে একমাত্র পিঠাখাড়া চেয়ারে আসন গ্রহণ করে সালাহ উদ্দীন সাহেব লাঠির মাথায় তাঁর হাত দুটো জড়ো করেন। একটু দুবে শীতলপাটি বিড়ানো চোকিতে কাদের মিয়া বসে। তার মুখে কৌতূহলের স্পর্শ। ঘরে কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিবর্ত কবে।

অবশেষে উচ্চস্ববে গলা সাফ করে সালাহ উদ্দীন সাহেব একনজর তাকান কাদেরের দিকে। তারপর অল্পক্ষণের জন্যে তাঁর চোখ ক্ষুদ্র ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যাবেতনের কেন্দ্রীমানুষ কাদেরের বাড়ীতে সর্বত্র দারিদ্র্যের ছায়া। ঘরে অসংখ্য বসতে না-বসে, চায়াবাটি

এবং চৌকিটি ছাড়া আর কিছু নেই। ছাতাপড়া দেওয়ালে শোভার খাতিরে একটি কেলেশ্বর চাপানো। তাতে নদীর বুকে রক্তিম সূর্যাস্তের ছবি। তবে সেটি দু-বছরের পুরানো। অপরাহ্নের সূর্যের তির্যক আলোয় তাতে জমে থাকা ধূলা নজরে পড়ে। ওপাশে, ভেতরের দরজার কাছে, মাটিতে বসে একটি বহু চারেকের মেয়ে বাটি থেকে মুড়ি খাওয়ায় রত। মুড়ি মুখে যতটা না যায় ততটা ছড়িয়ে পড়ে তার চারপাশে। গায়ে তাব একটি অপরিচ্ছন্ন ফ্রক। মুখেও সর্বত্র ময়লার স্পর্শ।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব যা দেখেন তাতে তিনি নারাজই হন। যে প্রস্তাবটি নিয়ে তিনি কাদেরের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন সেটি উত্থাপন করা সমীচীন হবে কিনা সে বিষয়ে ক্ষণকালের জন্যে তাঁর মনে একটা সন্দেহ জাগে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন, সেটি উত্থাপন না করে উপায় নেই।

আবার গলা সাফ করে সোজা তাকিয়ে এবার তিনি বলেন, আপনার কাছে একটি কথা নিয়ে এসেছি। আমার নাতিকে দুধ দেবার কেউ নেই।

এইটুকু বলেই তিনি থামেন। তাঁর কথাটির মর্মার্থ বুঝতে কাদেরের বিলম্ব হয় না। তবু সালাহ্ উদ্দীন সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করেননি বলে সে নীরবে অপেক্ষা করে।

প্রস্তাবটি খুলে বলতে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব সময় নেন। কাদেরের স্ত্রীকে তিনি কখনো দেখেননি। তবে শুনেছেন, সে বড়ই স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। পাঁচ ছেলেমেয়ের মা, তবু কখনো রোগ-ব্যধিতে ভোগেনি। তাছাড়া বৃকের দুধ দিয়েই সে পাঁচটি ছেলেমেয়েকে হাঁটাতে শিখিয়েছে, তাদের মুখে কথা ফুটিয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যও ভাল। দরজার কাছে বসে থাকা মেয়েটি অতিশয় নোংরা হলেও রোগা-পটকা নয়। তাছাড়া কাদেরের স্ত্রী সম্বন্ধে একথাও শুনেছেন যে, সে নাকি অতিশয় দয়ালু মানুষ : পরের জন্য তার দয়া-মাযার শেষ নেই। এ সব অতি উদ্ভব কথা। তবু কাদের এবং তার স্ত্রীর বর্তমান শোকের কথা ভেবেই তিনি কথাটা খোলাখুলিভাবে বলতে দ্বিধা করেন। তবে সে দ্বিধা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

শুনেছি আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খোদার ফজলে ভালোই। ভাবছিলাম, আমার মা-হারা শিশু-নাতিকে তার বৃকের দুধ দিতে রাজি হবেন কি? হলে বাচ্চাটিকে এখুনি নিয়ে আসি। সালাহ্ উদ্দীন সাহেব একবার চোখ বন্ধ করেন কেবল খুলবার জন্যেই। একটু হুকুমের কণ্ঠে বলেন, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসবেন?

কাদের চলে গেলে লাঠির মাথায় হাত জড়ো করে বসেই তিনি মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তবে প্রথমে আরেকবার ঘরটির চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন। নোংরা মেয়েটির দিকেও একবার ক্ষিপ্তভাবে তাকান। তাঁর মুখে আবার অসন্তুষ্টির ভাবটি জাগে। প্রস্তাবটি করে ভাল করেছেন কি? অনিশ্চয়তার একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস পেলেন তিনি। তবে তিনি বোঝেন, প্রস্তাবটি যখন একবার করেই ফেলেছেন, তখন সে কথা ভাবার কোন অর্থ নেই।

কাদের প্রত্যাবর্তন করলে তিনি উদ্বিগ্নভাবে তাকান তার দিকে। তার মুখের ভাব দেখে পবমূর্ত্তেই তিনি নিশ্চিত হন। লাঠিটা মেঝেতে দু'-একবার ঠুকে তিনি উঠে দাঁড়ান। এ বয়সেও তাঁর পিঠ বিশ্বয়করভাবে ঝুজ।

দরজার নীচেই আধা পাকা রাস্তা। সেখানে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে তিনি কি ভাবেন। তারপর যে ব্যাখ্যা প্রথমেই দেওয়া উচিত ছিল সে ব্যাখ্যাটি এখন দেন অযাচিতভাবে।

ডাক্তার অবশ্য বোতলের দুধ দিতে বলে। ওসব আধুনিক পন্থায় আমার বিশ্বাস নেই। দুধের শিশু বৃকের দুধ খাবে, প্রকৃতির রীতিই তাই।

তারপর আচ্ছিতে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করেন। গভীর শোকেও তিনি এমন সংযম দেখাতে পারেন, তার কারণ তাঁর দীর্ঘ জীবনের উপব

দিয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে। তিনি একথা শিখেছেন যে, মানুষের জীবনে যখন নিদারুণ দুঃখকষ্ট নামে তখন মানুষকে তার কর্তব্যের কথাই প্রথমে ভাবতে হয়। তখন ভেঙ্গে পড়লে চলে না।

এ-সময় জামাইর কথা মনে পড়তে তিনি ঝুঁকি করে ওঠেন। শোকে সে দুর্বল তৃণের মত ভেঙ্গে পড়েছে। তিনি কী করেন? তাঁকেই সব কথা ভাবতে হয়, যা কববার তা কবতে হয়।

গাড়ীতে চড়বার আগে বলেন, বাচ্চার সঙ্গে একটি দাই আসবে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব তাঁর শিশু-নাতিকে নিয়ে আসেন। সঙ্গে দাই। দাই শিশুকে ভেতরে নিয়ে গেলে তিনি বৈঠক ঘরে বসে কান খাড়া করে রাখেন। কাদেরের স্ত্রীর মতটি ইতিমধ্যে বদলায়নি তো? শোকগ্রস্তা মেয়েমানুষের কথা বলা যায় না। তারপর একটু পরে দাই এসে ভেতরের দরজার পাশে নিঃশব্দে এক পাটি কাল দাঁত দেখিয়ে দাঁড়ালে তিনি বুঝতে পারেন, কাদেরের স্ত্রী শিশুকে প্রত্যাখ্যান করেনি। অবশ্য সন্দেহের কোন কাবণ ছিল না। দুধের শিশুকে কেউ কি ফেলতে পারে? যে মানুষ সদা সন্তান হারিয়ে শোকাপ্লুত, সে-ও পারে না।

গাড়ীতে চড়ে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব বলেন — আপনার স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের দরকাব হলে ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।

তাঁর কণ্ঠে গভীর তৃপ্তির আভাস। এত গভীর শোকের মধ্যেও একটু সার্থকতাব, একটু আনন্দের, একটু সুকীর্তিজাত সন্তোষের অবকাশ আছে। সব খোদারই অসীম মেহেরবানী, তিনি ভাবেন।

গাড়ীতে চড়ে তিনি ঋজু হয়ে বসেন, দৃষ্টি সম্মুখ দিকে।

কাদেবের স্ত্রী মাজেদার সতিই উত্তম স্বাস্থ্য। মানুষটি ছোটখাট হলেও তার দেহ কোথাও অসম্পূর্ণ নয়। পাঁচ ছেলের মা বটে, তবু সে-দেহ আট-সাঁট, সামান্য মেদবহুল হলেও তাতে কোথাও ঢিলেঢালা ভাব নেই।

দাই ঘরে এলে মাজেদা প্রথমে নিস্তেজ দৃষ্টিতে দাই-এব কোলে কাপড়ের বাণ্ডিলেব দিকে তাকায়। সে বাণ্ডিলেব মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মুখ। শিশুর চোখ গভীর ঘুমে নিমীলিত। তমিশ্রাময় গর্ভের নিদ্রা তার এখনো শেষ হয়নি। তাবপর মাজেদাব চোখ জুলজুল কবতে শুরু করে। হঠাৎ সে হাত বাড়িয়ে অধীরভাবে বলে, দাও, আমাকে দাও।

আজ সকাল থেকে মাজেদা বুঝতে পারে, তার স্তন যেন ভারী, স্ফীত হয়ে উঠেছে। তার সন্দেহ থাকে না যে কুচাগ্রের পশ্চাতে রহমায়মভাবে বিন্দু বিন্দু তরল পদার্থ জমছে নতুন এক জীবনের জন্য। তাই যে-শোকটা তিন দিনে কিছু স্তিমিত হয়ে এসেছিল, সে শোকটা আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কাব জন্যে তার স্তন এমন ভারী হয়ে উঠেছে? তাব গর্ভের সন্তানটি তো আব বেঁচে নেই। প্রকৃতি কি এতই অন্ধ? সে কি কিছুই দেখতে পায় না? শুধু তাই নয়, প্রকৃতি যেন শোকাপ্লুত মায়ের প্রতি বিদ্রূপ করছে। এক সময়ে তার মনে হয়, এ অন্যায, অতি নিষ্ঠুর। মনে হয় সে তার দুধভারে স্ফীত স্তন যেন সহ্য করতে পারবে না। তারপর সালাহ্ উদ্দীন সাহেব প্রস্তাবটি নিয়ে এলে সহসা সে তার ভারী স্ফীত স্তনের মধ্যে একটি গুপ্ত নির্দেশ দেখতে পায়। না, প্রকৃতি খোদার সৃষ্টি বলে তার সহস্র চোখ, মানুষ যা দেখে না বোঝে না তাও সে দেখে বোঝে।

বুকের কাছে ধরে মাজেদা নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিশুটির পানে, একটা অদমা আবেগে তার সমগ্র দেহ কঁপে ওঠে বার বার। শীঘ্র শিশুটি চিংকাব শুরু করে। প্রথমে মাজেদা চমকে ওঠে। বাণ্ডিলের শিশুটি যে কাঁদতে পারে সে কথা সে যেন ভাবে নাই। তার সন্তান একটু শব্দ না করেই যে অন্তহীন অন্ধকার থেকে সে এসেছিল, সে অন্ধকাবই

প্রত্যাবর্তন করেছিল। মাজেদা কি ভেবেছিল সে তার মৃত সন্তানকেই কোলে নিয়েছে? অদূরে মেঝেতে বসে দাই কোমরের কাপড়ের ভাঁজ থেকে পান-দোস্তা খুলে মুখে ভরে। সে বলে, — বাচ্চাৱ ভুক লেগেছে। দুধ দাও।

মাজেদার চোখ আবার জ্বলজ্বল কবে ওঠে, মুখে অস্পষ্ট কোমল হাসির রেখা জাগে। হাঁ, সে দুধ দেবে বৈকি। তার উন্নত স্মৃতি স্তনে ঝরনার মত আওয়াজ করেই যেন দুধ জমেছে। তার স্তনে সঞ্চিত দুধের বেদনা। সে বেদনা জীবনেরই বেদনা; বৃকে যা জমেছে দৃষ্টিব অন্তবালে তা স্নেহমমতার সুখ। মনে আছে তার অন্যান্য সন্তানের বেলায় যখনই শিশুর কান্না তার কানে পৌঁছত, তখনই কুচাগ্র দিয়ে দুধ বেরিয়ে আসতো, পেটের নিচে কেমন সঙ্কোচন-প্রসারণ শুরু হতো। তার এখন মনে হয়, কোলের শিশুটির কান্নায় আঙাযাঙে কুচাগ্র যেন তেমনি সঞ্চিত হয়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্কোচন-প্রসারণও শুরু হয়েছে পেটের তলে। শিশুটি যে তাব নয়, তাতে বাধা পড়েনি।

দাই আবার বলে, — বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে গেল। মা-হাবা শিশুকে দুধ দেবে না?

এবার ক্ষিপ্ৰভঙ্গীতে জীর্ণ, কিছু ঘর্মাক্ত কড়া লাল রঙের ব্লাউজের বোতাম খুলে মাজেদা একটি স্তন উন্মুক্ত করে। কুচাগ্রটি ব্রন্দনবত শিশুটির কাছে ধরলে অধীরভাবে সে তা মুখে ধরে।

কিছুক্ষণ পব শিশুটি হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীংকার শুক কবে। সে চীংকার বঞ্চনা-নিষ্ফলতাই ঘোষণা কবে। দাই ভুকুটি কবে মাজেদার দিকে তাকায। যে দৃশ্যটি সে দেখে তাতে আব ভুকুটি আবে গাঢ় হয়। মাজেদা সামনের দিকে তাকিয়ে কেমন নিস্পন্দ হয়ে বসে, কোলের শিশুটির কান্নায় তাব কান নেই যেন।

কি হল? দাই প্রশ্ন করে।

মাজেদা সহসা উত্তর দেয় না। তাবপব তাব শুদ্ধ ঠোঁট একটু কেঁপে ওঠে। ক্ষুদ্র কণ্ঠে সে বলে — দুধ জমে গেছে।

শিশুটি এক ফোঁটা দুধ পায়নি। মাজেদার মনে হয়, তার স্তন দুটি জনাদুধে হঠাৎ পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠেছে।

পবদিন ফজরের নামাজের পরই সালাহ্ উদ্দীন সাহেব খবর নিতে আসেন। কাদের বৈঠকখানায় এলে তিনি অন্যদিনের মত লাঠির মাথায হাত জড়ো কবে তাব দিকে একবার তাকান, কিন্তু সবাসরি কোন প্রশ্ন কবেন না। প্রশ্ন কবাব কোন প্রয়োজন বোধ কবেন না। শিশুটির ব্রন্দন শোনায জ্ঞানো কান খাড়া কবেন একবার। ভেতব থেকে কোন শব্দ না এলে নীরবতার অর্থ শিশুটির ভোজনতৃপ্তি হিসেবেই গ্রহণ কবেন। কাদের তাব স্ত্রীব দুধ দেবাব ব্যাপাবে অল্পমতটির কথা এখানো ভাল করে বোঝেন বলে সে-ও কিছু বলে না।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব লাঠিটা একবার সশব্দে ঝড় করেন। আত্ম তিনি আর বসবেন না। উঠি-উঠি ভাব কবে কাদেরব দিকে না তাকিয়ে বলেন, ফজরের নামাজের পর, ওজিফা খলবো এমন সময় একটি কথা মনে হল। মুদীরহাটে আমার কিছু জমি আছে, ধান-ফসলের জমি। তার একটি অংশ আপনার স্ত্রীব নামে লিখে দিতে চাই। আশা করি তিনি ঈবরাজি হবেন না।

কথাটা বলেই কাদেরকে কোন উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ান। রাত্তায় গাড়ীর ইঞ্জিন জীবন্ত হয়। শীঘ্র জ্বলা-পেট্রলের ঝাঁঝালো-মিষ্টি গন্ধে বৈঠকখানা ভরে যায়।

গাড়ীতে উঠবার আগে অকারণেই লাঠিটা আকাশের দিকে তুলে তিনি বলেন, কদিন মাছ-গোস্ত, শাক-সব্জীটা আমার বাড়ী থেকে আসবে। দাই ভালো রাঁধতে জানে।

অপরাত্নের দিকে ক্রন্দনরত শিশুকে নিয়ে দাই পিছনের সব বাবান্দায় পা ছড়িয়ে বসে, মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ। আজো বাব বার চেষ্টা করবে মাজেদা শিশুকে দুধ দিতে সক্ষম হয়নি। আজ শিশুর চতুর্থ দিন। জন্ম হবার পব থেকে তাব পেটে এক ফোঁটা দুধ পড়েনি। দাই তাকে চামচে করে পানি দিয়েছে কিছু, কিন্তু পানিতে ক্ষিধে যায় না। অবশ্য সে জানে, নবজাত শিশু না খেয়ে কয়েকদিন দিবা সুস্থ দেহেই বেঁচে থাকতে পারে। তবু চার দিনেও শিশুর মুখে একটু দুধ না পড়লে তা চিন্তাবই কথা।

ভেতবে দেয়ালের দিকে মুখ ফিবিযে মাজেদা নিখর হয়ে থাকে। তার চোখ নির্মীলিত, ঠোট শুষ্ক। একটু আগে শিশুকে আবাব দুধ দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সে ব্রাউজের বোতাম দেয় নাই। উন্মুক্ত স্তন এখন তার কাছে পাথরের মত ভারী মনে হয়। এ বিষয়ে তার মনে এখন কোনই সন্দেহ নাই যে, স্তীত স্তনে দুধ জমে গেছে বলেই কিছু নিঃসৃত হচ্ছে না। কিন্তু কেন তার স্তনের এই অবস্থা হয়েছে? এ কী সম্ভব যে, যে দুধ তাব সন্তানের জন্যেই এসেছিল, তাব স্তনটি আর নেই বলে সে দুধ জমে গেছে?

কথাটি মনে হতেই তাবই অজান্তে একটি বিজয়ের ভাব বলের মত তার ধমনীতে স্রোতশীল হয়। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যেই মাত্র। কথাটি যে অতিশয় নির্মম তা তার বুঝতে দেবী হয় না। তাই শীঘ্র একটি তাঁর অনুশোচনার জ্বালা সে বোধ করে। কি করে সে এমন নির্মম কথা ভাবতে পেরেছে? শিশুটি নিজের গর্ভের না হোক, তবু সে শিশু। তাছাড়া মা হাবা অসহায় শিশু। এমন শিশুকে কেউ কখনো দুধ থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। নিষ্ঠুর মানুষও পারে না। তাছাড়া কথাটি যে সত্য নয় তাব প্রমাণ সে নিঃসৃতই দেখতে পায়। শিশুটিকে স্তন দেবার জন্যে সে মনে প্রাণে দেহে একটি তাঁর আকাঙ্ক্ষা বোধ করে। সে আকাঙ্ক্ষা কি ভুল হতে পারে?

কিন্তু শব্দ কঠিন স্তন ভারী হলে থাকে। বাইবে শিশুটির কান্নাও শোনা যায়।

কেন তবে তার বুকে এমনভাবে দুধ জমে গেছে?

এবার আরেকটি আরো নির্মম আরো নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কথা তাব মনে জাগে। তাব মনে হয়, শিশুটিকে স্তন পান করাবার জন্যে সে যে একটি তাঁর আকাঙ্ক্ষা বোধ করে, সেটি আসল সত্যটি ঢাকবার জন্যে তাব মনেবই একটি কৌশল মাত্র। আসল সত্যটি এই যে, তাব নিজের সম্ভাবনার মৃত্যু হয়েছে বলে সে চায় না যে, পবের শিশু বেঁচে থাক। সে জনোই তাব বুদ্ধিবা দুধ এমন ভাবে পাথর হয়ে গেছে।

কথাটি কিন্তু তাব সমগ্র অস্থূল ঈশ্বরভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। ক্ষণকালের জন্যে তাব মনে হয়, বুঝি শ্বাসবোধ হবে, একটি অদম্য কান্নার বেগে এত সাবা শবীর থবথব করে কেঁপে ওঠে।

কাদের আঁপস থেকে ফিরেছে কি অননি বাইবে সালাহ উদ্দীন সাহেবের গভীর শব্দ শোনা যায়। আজ সে ঈশ্বর কানে আসতেই একটি গভীর আতঙ্কে মাজেদার ক্রান্ত মন ভেবে ওঠে। শিশুর কথা না ভেবে আজ সালাহ উদ্দীন সাহেবের কথাই সে সর্বপ্রথম ভাবে। সে যে তাঁর শিশু নাতিকে এক ফোঁটা দুধ দিতে পারে নাই, সে কথা তিনি এখনো জানেন না। দাই এখনো কথাটা প্রকাশ করেনি। কিন্তু সে কতক্ষণ আব কথাটা প্রকাশ না করে পারে? কাদের তার অক্ষমতার কথাটা এখন জানলেও সে-ও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার পক্ষেও বেশিক্ষণ নীবব থাকা সম্ভব নয়। কথাটা জানতে পেলো সালাহ উদ্দীন সাহেব কী ভাববেন? তাছাড়া, তিনি যদি শিশুকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান তবে সে কি লজ্জায় মবে যাবে না?

ক্ষিপ্ৰগতিতে উঠে বসে মাজেদা তার স্বামীকে ডাকে। গভীর উৎকণ্ঠায় তাব মুখ বীভৎসভাবে রক্তশূন্য দেখায়। কাদের এলে সে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, ওকে এখনো বলো না,

বুঝলে? শিশু আজ রাতেই দুধ পাবে। আমি জানি। বুকের ব্যাথাটা বড় বেড়েছে, আর দেবী হবে না।

কাদের স্ত্রীর অনুরোধটি বক্ষা করে। তবে সে সালাহ্ উদ্দীন সাহেবকে বলে, মাজেদাকে একটু ডাক্তার দেখানো দরকার।

সালাহ্ উদ্দীন সাহেব ঈষৎ শঙ্কিত হন।

কেন?

তার শরীরটা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর মাজেদাকে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার একটি অপ্রত্যাশিত খবর দেয়। সে বলে, মাজেদার দুধ এখনো আসেনি। সোঁটা নাকি বিচিত্র নয়। আকস্মিকভাবে গভীর আঘাত পেলে দুধ আসতে দেরী হয়। মাজেদার খেয়ালটার কোন ভিত্তি নাই। সে কথাও সে বলে। দুধ ব্যতীত স্তনের স্ফীতির কারণও ডাক্তার দুর্বোধ্য-প্রায় চিকিৎসা বিজ্ঞানেব ভাষায় ব্যাখ্যা কবাব চেষ্টা করে। ডাক্তারের আবিষ্কার মাজেদাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। দুধ একেবারে আসেনি সেকথাটি দুধ জমে যাওয়ার চেয়েও অধিকতর ভীতিজনক মনে হয় তার কাছে।

ভীতির কারণ আছে বৈকি। এবাব সে বুঝতে পাবে, তার মনের নির্মম কথাটি সে আব ঠেকিয়ে রাখতে পাবে না। এবার মনের প্রাপ্তে একটি নির্লজ্জ কণ্ঠধ্বনি স্পষ্টভাবেই সে শুনতে পায়। সে কণ্ঠ বিজয়ী ব সুরে বলে, নিজের সন্তান মরে গেছে তো বুকে দুধ আব আসবে কেন।

অবশ্য কথাটি পূর্বের মত এবাবও তার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত কবে। অবশেষে মাজেদাকে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে হয়। সে জানে তার সময় নেই। ডাক্তারের কথা শুনে সালাহ্ উদ্দীন সাহেব আর দেরী করবেন না। এবাব তাঁর শিশু-নাতিকে ঘবে ফিবিষে নিয়ে যাবেন। মাহারা অসহায় শিশুকে বুকের দুধেব জন্যে তাব কাছে এসেছিলেন কিন্তু তিনি নিবাশ হয়েই ফিবে যাবেন।

অবশ্য মাজেদা এবার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে যে, সবটাই তাব জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। তাব সন্তানের মৃত্যু, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের শিশু-নাতি নিয়ে আসা, এমন কি ডাক্তারের মত — সবই পরীক্ষা। এবার তার চোখে তার সন্তানের মৃত্যু অসত্য রূপ ধারণ কবে, সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের আবির্ভাব গূঢ় উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত হয়, এবং ডাক্তারের মতটি ধোঁকাতে পরিণত হয়। ধোঁকা নয় তো কি? তাব যে স্তনভবা দুধ, সে কথা কি সে জানে না? আজ সন্ধ্যায় তার স্তন আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে। দুধ যেন আর ধরে বাখা যাবে না। তাছাড়া তার স্তন আর তেমন শক্ত কঠিন নয়। তাতে দুধ আব জমে নেই। ববধ্ব তরল দুধে তার স্তন টলনল করছে।

তবে কূচাগ্রে কী যেন আটকে আছে বলে দুধটা সরছে না। বোতলের গলায় ছিপি আটকে গেলে যেমন কিছু সরে না, এও তেমনি হয়েছে।

মাজেদা হঠাৎ ধীরস্থিরভাবে উঠে বসে। তার মুখে একটি বিচিত্র শান্তির ভাব। সে জানে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তার মাতৃদ্বের দাবী স্থাপিত হবে, তাঁর মৃত সন্তানও ফিরে আসবে।

মাজেদা আর দেরী করে না। তার সময় নেই। দৃঢ় হাতে সে ব্রাউজের বোতল খুলে প্রথম ডান স্তন তারপর বাম স্তন উন্মুক্ত কবে। এবার বালিশের নীচে থেকে একটু হাতড়ে একটি সরু দীর্ঘ মাথার কাঁটা তুলে নেয়। তারপর নিম্নম্প হাতে সে কাঁটাটি কূচাগ্রের মুখে ধরে হঠাৎ ক্ষিপ্তভাবে বসিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ একটি সুতীক্ষ্ণ ব্যথা তীরের মত ঝলক দিয়ে

ওঠে। সহসা চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তবে সে টু শব্দটি করে না। একটু অপেক্ষা করে পূর্ববৎ দুটু নিষ্কম্প হাতে একবার শুধু স্পর্শের সাহায্যেই নিশানা ঠিক করে সে দ্বিতীয় কুচাগ্রেও কাঁটাটি বিদ্ধ করে। আবার সে মর্মাস্তিক বাথাটি জাগে। ক্ষণকালের জন্য তার মনে হয়, সে চেতনা হারাবে। কিন্তু অসীম শক্তিবলে সে নিজেকে সুস্থিত করে। দেহে কোথাও মর্মাস্তিক বাথা বোধ করলেও সে বুঝতে পারে, তাব ক্ষীণ সূড়ৌল স্তন দুটি থেকে তরল পদার্থ ঝরতে শুরু করেছে। স্তনের নালায় যে বাধাটি ছিল সে বাধা দূর হয়েছে। স্তন থেকে দুধ সরতে আর বাধা নেই।

বাইবে এবাব সালাহ্ উদ্দীন সাহেবের গাড়ীর আওয়াজ শুনা যায়। মাজেদা সে আওয়াজে এবাব আতঙ্ক বোধ করে না। তাব স্তন থেকে যখন ঝরতে শুরু করেছে তখন আতঙ্কের আর অবকাশ নেই। তাব স্তন থেকে দুধ ঝরে, অশ্রান্তভাবে দুধ ঝরে। তবে সে দুধের বর্ণ সাদা নয় লাল।

মুক্তামালা

ধৰ্মদাস মুখোপাধ্যায়

দু মাস আগেও শ্রাবণ সংক্ৰান্তিৰ মেলা কৰে আসবে বলে বসে বসে দিন গুনেছে টগৰ। আজ তার দিন গোনাব কাল শেষ যদিও সে আকৰ্ষণ আব নাই মেলায়। দুপূৰে যখন উদাস-করা মেঠো হাওয়া বয়ে আনে দক্ষিণেৰ বসন্ত-সুৰভি, যখন বউদি আব গীতা ঘূমিয়ে পড়ে ঘরের মধ্যে, একা তখন জেগে থাকে টগৰ কাব কথা মনে কৰে। মুক্তোৰ মালা না সেই মানুহটি, যে তার জনা মালার পসবা সাজিয়ে বসে থাকবে মনোহাবী দোকানে।

তাই যাবে টগব মেলায়। তার ঘরেব মানুহকে আসতে বলে দিয়েছে মেলাব নাম কৰে। সেও হয়ত আজই এসে যাবে এক সময়। এবাবে আর সঙ্গে বউদি বা গীতা নয়। এবাবে দুজনে যাবে মেলাতলায় বেড়াতে।

অথচ এই মেলাতেই টগৰ পব পব দু বছৰ গিয়েছে ওদেব নিয়ে। প্রথম বাব গিয়েছিল নিতান্তই বউদিব পাল্লায় পড়ে। সংসারেব টুকটাকি জিনিস চাই। মেলায় পাওয়া যায় সস্তায় আর নেওয়া যায় দেখে-গুনে।

বুড়ী মায়েব বায়না ছিল একখানা মুড়ি-ভাজা খোলাৰ। বাড়িব কাছে কুমোৰবাড়ি। তা হবে না বুড়ীৰ। ওদেব খোলা নাকি ভেঙে যায় তাড়াতাড়ি আব দামও দু'পয়সা বেশি। দু চাবটে পয়সা সুবিধাব জন্য দু মাইল বয়ে আনতে কোনদিন কষ্ট হয়নি মা'ৰ। বাতে পদ্ম না হ'লে হয়ত সেও যেত ওদেব সঙ্গে।

প্রতিবাবই মেলা বসে শ্রাবণ সংক্ৰান্তিৰ দিনে। এই দিনে পূজা হয় না মনসাব। মনসাব ছোট ভাঙা ঘৰটায় সেদিন ফুল আব দুধ-গঙ্গাজলেব ঢেউ বয়ে যায়। দু-চাব মাইল দূৰ থেকে মেয়ে-পুৰুষ ভেঙে পড়ে এখানে। পুৰুষেব চেয়ে ভিড বেশি মেয়েদেব।

তবু এই ভিড জেনেও গিয়েছিল সে বউদি আর বোনেব হাত ধৰে। বোনেব চাই পুতুল আব বউদিব চাই কলো, পাখা, চাকা-...নুন এই সব আব কিঃ এগুলো দু'চক্ষু দেখতে পাবেনা টগব। কেবল বয়ে বেড়াও।

মুড়ি-ভাজা খোলাব সঙ্গে ঝাঁটা বাডন কয়েকটা নিয়ে এতটা পথ যেতে যে কি কষ্ট তা টগবও টেব পেয়েছে হাতে হাতে। বউদি বেশি বয়ে মবে। ভাজা মোহমানুস। তাই শক্তিও খুব। টগব দুবাব বউদিব কষ্টেৰ কথা ভেবে চেয়ে নিবেছিল মুড়িব খোলা। পবদিন কঁকালেনেব ব্যথায় মরে যায় আব কি।

মা-বউদিৰ মত তার নিজেরও একটা শখ ছিল বৈকি। অন্য কিছুই নয়, শুধু এক ছড়া মুক্তোৰ মালা। এব জনো টগব সমস্ত মেলাটা ঘূৰেছিল বাব বাৰ। বউদিব বকুনি খেয়ে আর ঐ মুড়ি-ভাজা খোলাৰ বোঝা বয়েও নিবন্ত হয়নি। খুঁজছে আর খুঁজছে। শহবে গিয়ে কোন কলেজের মেয়ের গলায় দেখে এসেছিল মুক্তোৰ মালা। ভাবি পছন্দ টগৰেব ঐ মালা। কি চমৎকার মানিয়েছিল মেয়েটিকে।

কাদায় কাদায় একাকার। মানুষেব পায়ে পায়ে একহাঁটু কাদা। তবু কাপড় তুলে কাদা ভেঙে টগর গিয়ে কেবলই খুঁজেছে মনোহাৰী দোকান। কোথায় সে দোকান? হাড়ি-কলসির দোকানের ভিড় একদিকে। অন্যদিকে আম, লেবু, নারকেল, ফুল গাছেব দোকানের সারি। এ-ছাড়া মাছ ধরার সরঞ্জামে মেলাটা ভ্রমজমাট। বৰ্ষাকালেব মেলা তাই ছিপ-সুতো-বঁড়শি বার বিস্তিতে বোকাই। নয়ত খাবাবেৰ দোকান। তেলেভাজা পাঁপডেব গন্ধে মেলা ভবপুৰ। পোড়া ভেজাল তেলেৰ গন্ধ পাওয়া যায় দূৰ থেকে।

—ও বউদি! তোমাব মুড়ি-ভাজাৰ খোলা কিনতেই যে বেলা কাবাব। তাড়াতাড়ি কর না।

ছেট বোনটা কথা বলতে পাবছে না। সে পাঁপড় ভাজাৰ দোকানেব দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে।

—দিদি, পাঁপড় কিনবিনে? কেমন সোন্দৰ গন্ধ বেবিয়েছে।

—থাম্ মুখপুড়ি, কেবল খাই খাই।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে ওরা হাজিব হয়েছ মনোহাৰী দোকানেৰ সুমুখে। ইতিমধ্যে গীতাৰ পাঁপড় আৰ বউদিৰ ঝাঁটা মুড়িব খোলা কেনা সাক্ষ। বউদি বেজায় খুশি। তাব মনেৰ মত জিনিস পেয়েছে সে।

দু' দোকান যুবে শেষে বউদিব অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসে দাঁড়িয়েছে মনোহাৰী দোকানেৰ সুমুখে। ছোট দোকান, ভিড় কমে এসেছে বেলা পড়ে আসাব জনা।

—কি চাই? ছোকৰা দোকানী উঠে এল ওদেব কাছে।

জিনিস চাইবে কি? টগৰী দেখছে দোকানীকে। সুন্দৰ মুখ ছেলেটাৰ। সাধাবণ দোহাবা চোহাবাব মধ্যে একটা লাৰণা আছে।

বউদিব কাঁখে মুড়ি ভাজা খোলাব বোবা। বুঝি টন টন কবছে কোমৰ।

—কি নেবে নাওনা ঠাকুৰঝি, দেবী কবছ কেন?

দোকানীৰ তৎপৰতা ছিল বন্ধ। সেও এখন সচকিত।

—কি নেবে?

—পুঁথিব মালা আছে?

—আছে।

পছন্দ হয়না টগৰেব কোনটাই। যে মালা সে দেখে এসেছিল শহৰেব মেয়েব গলায় তার মত কোনটাই নয়।

দোকানী একটি একটি কৰে পৰম বড়ে তার বেসাতিৰ সব কিছু খুঁজে এনেও মন পাযনা টগৰেব।

—অন্য কিছু নেবে না?

—যা চাই তাই-ই নেই। আব কি নোবো?

—কিছু নোবে না। আলতা, সিঁদুৰ, টিপ, কুমকুম?

বউদি ততক্ষণে তার মুড়িব খোলা নামিয়ে বেখে সহজ হয়েছ।

মুখ টিপে হেসে বলে—সিঁদুৰ নাও ঠাকুৰঝি। আজ না হোক দুদিন পৰেও তো লাগবে।

দোকানেব সিঁদুৰেৰ বং লাগে বুঝি ঠাকুৰঝিব গালে। দোকানীৰ দিকে চোখ তুলেই লজ্জায় নামিয়ে নেয় দৃষ্টি। দোকানীও হাসছে মুখ টিপে।

টগৰ অপ্রস্তুত হ'য়ে আবার একগাছা পুঁথিব মালা তুলে নেয় হাতে—এৰ চেয়ে ভাল মালা আনতে পার না? মুক্তোৰ মালা?

—ভাল মালা বিক্ৰি হয়না তো এসব মেলায়, তাই আনিনে।

দোকানটাব দিকে ভাল কৰে চোখ বুলিয়ে দেখে নেয টগব। সতিাই দোকানেৰ মাল কিছুই বিক্ৰি হয়নি মনে হয়। পাশেৰ দোকানগুলো বড়। তাদেৰ জিনিস অনেক খালি হয়েছে। শুধু এব দোকানে ভৰা মাল।

—এ মালাটায় কিন্তু মানাবে ভাল। এটা তো খৰাপ নয। মালাটা তুলে দিয়েছে ওব হাতে দোকানি।

বুঝি মায়া হয় টগবেৰ। বেচাৰিৰ বেচা-বেনা হয়নি ভাল। কোথা থেকে এসেছে দুটো পয়সাৰ জন্য। ফিৰে যাবে হতাশ হ'য়ে।

—নাও না ঠাকুৰঝি, কি নেবে নাও তাতাতাডি।

কি নেবে বোঝেনা টগব। এ মালা সে নিতে পাববে না। অনেক কষ্টে মায়েৰ কাছে আদায় কৰেছে মালাৰ পয়সা। যা তা কিনে নিলে পবে আৰ পাববে না কিনতে। তাই ইতস্ততঃ কৰে।

দোকানী কিন্তু গলদঘৰ্ম। তাৰ সাবা দোকানেৰ জিনিস এনে হাজিৰ কৰেছে টগবেৰ সুমুখে। একটিৰ পৰ একটি জিনিস তুলে ধৰেছে সে। কোনটা পছন্দ কৰবে খবিন্দাব। অধীৰ আগ্ৰহে চেয়ে চেয়ে দেখছে টগবেৰ মুখেৰ দিকে। কোন জিনিসটা পেয়ে মুখে ফুটবে তাৰ হাসি।

কিন্তু এ সে মেয়ে নয। পয়সা মাত্ৰ কটা। যা দেখাছে তাৰ দোকান উজাড কৰে তা সে কিনবে কি দিয়ে।

বউদি বিবন্ত আৰ অনামনস্ক। একটা কুমকুমেৰ শিশি তুলে দিয়েছে দোকানী টগবেৰ হাতে। কৰণ মিনতিতে তাৰ আঁখি দুটি ছলোছলো। মায়া লাগে টগবেৰ।

একটা কুনকুন কিনি নিয়ে ওবা মেলাৰ বাইৰে এসে বসে। যাব যা জিনিস গুছিয়ে নেয। খিদে পেয়েছে। এবাৰে কিছু মুখে দিয়ে চলতে হবে দু'মাইল পথ। কিছু জিলাপি আৰ পাণ্ড খাওযাৰ পৰ টগব উঠে পড়ে বলে—বস বউদি আমি আৰ একবাৰ দোকান থেকে ঘূৰে আসি।

—কি কিনবে? তোমাৰ পছন্দসই জিনিস তো নেই।

—দেখি। তোমাদেৰ তো হয়েছে।

—ও ঠাকুৰঝি! বড় বড় চোখ কৰে বলে এবাৰে বউদি। বলি মানুষটাকে পছন্দ হয়নি তো?

—যা-, তবে যাব না। যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে ও।

—যাও। যাও। ঠাট্টা কবলাম তাও বুঝি বোঝনা।

দোকানী নিবঞ্জন বুঝি খবিন্দাবই খুঁজছিল এতক্ষণ। টগবকে আবাব ফিৰে আসতে দেখে উৎসুক হ'য়ে ওঠে। অন্য একজন এক কৌটো সিঁদুৰ কিনেছে। টগব আবাব কি নেবে?

যদি কিছু নাও নেয তবু খুশি ওকে দেখে নিবঞ্জন—এসো, কি নেবে বল?

—কি আবাব নেব। কি আছে তোমাৰ দোকানে?

আবাব এ মালাগুলোই হাতে নিয়ে দেখে টগব ঘূৰিষে ফিৰিষে।

—একটাও কি ভাল জিনিস বাখতে নেই? দেখি অন্য দোকানে যাই।

—তুমি বস, আমি দেখছি।

নিজে দোকানদাৰ, ঠকবে না। টগবকে যদি ঠকিয়ে নেয। তা ছাড়া দুটো পয়সা লাভ কৰতে হয় তো কৰবে সেই-ই।

—তুমি আমাৰ দোকান পাহাৰা দাও। দুজনে চোখাচোখি হতে হাসে।

দু'গাছা মালা নিয়ে আসে নিবঞ্জন কিন্তু তাৰ একটাও পছন্দ নয টগবেৰ। সে মালাই নয।

অনেক আগ্রহে ওব মুখের দিকে চেয়েছিল নিরঞ্জন যদি খুশির ধমকে কালো চোখের তারাগুলো নেচে ওঠে। না, জ্ঞ দুটো আগের মতই কুঁচকে উঠেছে। ফুলের পাপড়ির মত পাতলা ঠোঁটটা অবহেলায় উশ্টে যায় বুঝি।

মেলা শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। সবই দূরেব লোক! সন্ধ্যা লাগবার আগেই ফিবছে বাড়িব দিকে। দু-এক দোকানে কাছের লোকদের আনাগোনা।

—আর কি আছে তোমার দোকানে?

—সবই তো দেখিয়েছি, বাকী চুড়ি।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে টগরের। ঠিক হয়েছে, চুড়িই পরবে কিন্তু পয়সা! যদি দাম বেশি লাগে। তার কাছে তো তিন আনা পয়সা মাত্র। তাই ইতস্ততঃ করে। দোকানী নিরঞ্জন বুঝি ক্লান্ত আব বিষম। এ কেমন মেয়ে। কেবল দেখে সব, কিনতে চায়না কিছু। চুড়ি দেখেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে না।

টগব একবার আঁচলের খুঁট হাতড়ায় আব চুড়ির দিকে চায় আড়চোখে।

নিরঞ্জন বুঝতে পারে পয়সাব জন্য টগবের দোমনা ভাব। গ্রাহ্য কবে না। ক্ষতি তো হয়েছেই তাব। তাই তাড়াতাড়ি চুড়িব বাস্তব খুলে প্রলুব্ব করে টগবকে।

টগরের কেনা না কেনার দ্বন্দ্বের অবসান হয় এইভাবে। ঝুঁকে পড়ে চুড়িব ওপর। বং-বেব-এব নানা বকম চুড়ি। চাকচিক্য আব ঔজ্জ্বল্য বকমকে।

বোন গীতার মত বয়স কমে যায় টগরের।

—দেখি দেখি, সত্যি কেমন সৌন্দব এগুলো!

একটাব পব একটা হাতে তুলে নেয়। কাঁচের চুড়িব টুংটাং আওয়াজ ওঠে।

দুজোড়া চুড়ি বেছে নেয় টগব।

—কত দাম?

—দামেব কথা থাক, পছন্দ হয়েছে তোমাব?

ঘাড় নাড়ে ও।

আরও একজোড়া ওর হাতে তুলে দেয় দোকানী।

—না না, আব নেব না।

—নাও না, আমি দিচ্ছি ভাল জিনিস।

এবার বসে পড়ে টগর। তার নিটোল হাত দুটি বাড়িয়ে ধরে দোকানীর সুমুখে।

—পরিয়ে দাও।

নিরঞ্জনের নিজের ইচ্ছা ছিল ঐ সুন্দব আর নরম হাত দুটিতে সে পরিবে দেবে কাঁচের কঙ্কন একজোড়া। মকরমুখো কঙ্কনের মুখোমুখি দুটি মকরেরব মুখ। ঠিক তেমনি করে দুটি মুখ সামনা-সামনি ঝুঁকে পড়েছে। মুখোমুখি বসে দুজনে। দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেছে পবস্পব।

আত্মসমর্পণ কবেছে যেন টগর। হাতটাকে নিয়ে যেমন খুশি খেলা কবছে দোকানী নিরঞ্জন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চুড়ি পরাচ্ছে, না দেখছে বোকা যায় না। যেন নবম কাদার তৈরি একখানা হাত।

এক একবার ছটফট করছে টগর। মুখ ঘুরিয়ে দেখছে আর ভাবছে বউদির কথা। বড় দেরি হয়ে গেল। তাড়া দিতে ইচ্ছা। কিন্তু নিপুণ শিল্পীর মত কোন ব্যথা না দিয়ে সন্তর্পণে যেভাবে চুড়ি পরাচ্ছে নিরঞ্জন তাতে যেন আরাম পাচ্ছে টগর। ধীরে ধীরে পরম যত্নে মানুষটা হাত বোলাচ্ছে আর তার মৃদু স্পর্শে শির-শির কব্বছে টগরের সারা দেহ।

—হোলো? তাড়াতাড়ি কর না একটু।

মুখ না তুলেই জবাব দেয় দোকানী—এ সব কি তাড়াতাড়ির জিনিস!

—না না, আমার দেরি হয়ে গেল যে, বাড়ি যেতে হবে না! বউদি বকবে।

এক হাত ছেড়ে অন্য হাতটা টেনে নেয় নিরঞ্জন। যেন এ হাতের মালিক সাময়িকভাবে সেই-ই। সে কোন খরিদদারকে চুড়ি পরাচ্ছে না, পরাচ্ছে এমন একজনকে যার ওপর তার দাবি-দাওয়া অনেকখানি। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোন কথা নেই। সে যেন পুতুল, তাকে মনের মাধুরী মিশিয়ে সে সাজিয়ে চলেছে। এ সময় অন্য কোন খরিদদার এলে সে যে তার দিকে মন দেবে এমন সম্ভাবনা নেই একটুও।

ওরা চুড়ি পরায় ব্যস্ত। কোন সময় বউদি এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে জানে না কেউ।

—ওমা! আমরা খুঁজে সারা। মেয়ের এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চুড়ি পরা হচ্ছে।

যেন চোর ধরা পড়েছে এমনি মুখের ভাব টগরের।

—তা এতক্ষণ চুড়ি পরতে লাগে, আজ আব বুঝি বাড়ির কথা মনে নেই?

একটু নড়ে-চড়ে বসতে চায় টগর। নিরঞ্জন 'উঁহ' শব্দ কবে আবার মন দেয় চুড়ি পরাতে।

—এই দেখ না বউদি, তাড়াতাড়ি করতে বলছি .. আটকে যায়। একটু থেমে বলে—দোকানদারের বা কি দোষ, আমার হাতের মুঠো এত শক্ত বুঝলে বউদি? এবার কৃত্রিম বাগে চোখ রাঙিয়ে ঘন ঘন ঘাড় নাড়ে বউদি—হঁ তোমাব হাত বড় শক্ত নয় ঠাকুরঝি, তাই বুঝি নরম হাতের লোক নিয়ে এতক্ষণ ধরে চুড়ি পবছিলে?

আর বুঝি বসে থাকা যায় না। লজ্জা শুধু তাকেই স্পর্শ কবে না, দোকানীকেও বুঝি ছুঁয়ে যায় রঙেব হাওয়া।

—চল বউদি, হয়ে গিয়েছে, কত দাম?

কি বলবে ভেবে পায় না দোকানী। বউদি না থাকলে সে এক পয়সাও হয়ত দাম নিতে পাবত না। এখন তা না নিলেই নয়। তাই বলে—তিন আনা।

—ওমা! এত সস্তা এই কঙ্কন আর চুড়ির দাম? সাঁঝ না লাগলে আমিও পবতাম।

—আব আমিও—গীতাব সুবে সুব মেলায় বউদি।

এবার ফেবাব পালা। উঠে পড়েছে টগর। বউদি শুক কবেছে হাঁটতে মুড়ির খোলা কাঁখে নিয়ে। সবাব পিছনে টগর।

—আসছে বাবে আমার ভাল মুক্তোর মালা চাই। আনবে তো?

—আনব। যেখানেই থাকি তোমাব জন্য দোকান নিয়ে আসব আব চমৎকার মালা আনব।

—ঠিক তো, মনে থাকবে?

—থাকবে। তারপব দু পা এগিয়ে এসে গলাব সুর নামিয়ে বলে—তোমাব কথা কি ভুলতে পারি?

হাসিমুখে বিদায় নেয় টগর। পায়ে পায়ে পথ চলে আর চায় ফিরে ফিরে। পা যেন চলে না। যে মেলায় পথ চলা ছিল দুষ্কর, মেয়ে-পুরুষের গাদাগাদি, কোন ভেদাভেদ ছিল না, মেয়েদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে গেলেও উপায় ছিল না গায়ে গা না দিয়ে চলাব, সেই মেলাতলা ফাঁকা। কেবল দোকানীরা বসে দোকানে। বাতি জ্বলেছে অনেকেই। গ্রামের কুকুরেরা এঁটো রসলাগা শালপাতা চাটছে একমনে। গ্রাম থেকে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে গ্রামা বধুদের ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনির আওয়াজ আসছে ভেসে।

তবু পথ চলতে টগরকে কে যেন টানছে পিছন দিকে।

—কি হোলো গো ঠাকুরঝি? না হয় থেকে যাও আজকের মত। কাল মালাবদল করবেই না হয় বাড়ি যেও—খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ে বউদি।

অনেক দূরে গিয়েও টগব পিছন ফিরে দেখে দোকানী চেয়েই আছে তার যাওয়া পথের দিকে।

এবার আগে থেকেই বায়না ধরেছে টগর মেলায় যাবার। গতবারেও মুড়ির খোলা বইবার ভয়ে প্রথমে রাজী হয়নি ও। এবারে অন্য কোন কথা নেই, তাব শুধু মনে আছে একটি কথা। পুঁথির মালা আনবে দোকানী।

মেলায় দিনে সেজেগুজে টগব বউদিকে আর গীতাকে নিয়ে মেলায় হাজির। মেলায় ঢুকেই ব্রহ্মাণীব পূজা দেওয়ার ব্যাপাবটা সারতেই হয় প্রথমে। তারপব কেনাকাটা। বউদি আব বুড়ী মায়ের বায়না! সেওলো মেলায় ঢুকলেই মেলে। কিন্তু তারটা।

—কই বউদি, হোলো না তোমাব?

দাঁড়াও বাপু, অত তাড়া কিসের? দেখেগুনে নিতে হবে না। মাটির জিনিস তো।

দেবি সয় না টগবের। মনোহারী দোকান মেলায় শেষ প্রান্তে। এইটুকু যেতেই সময় লাগবে আধ ঘণ্টা।

এবারে মায়ের বায়না বেশি। টুকটাকি কত কি। বউদি কেনে আর টগর ছটফট কবে।

বউদিব কেনা শেষ হলো তো গুরু গীতার। সে এবার নিজের পয়সা জমিয়ে এসেছে মেলায়। তাব পুতুল চাই। এ দোকান ও দোকান। টগব তাড়া দেয় ওকে—যা নেবাব গ্রাডাতাড়ি নে না গীতা।

—অমন করছ কেন ঠাকুরবা? বেচারি ছেলেমানুষ বলে কি পছন্দ-অপছন্দ নেই?

সকলের সব কেনা শেষ কবে এবাব চলে তাবা মনোহারী দোকান পটিতে। তাড়াতাড়ি কবে কিন্তু উপায় নেই।

পিছল পথ। সকালে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। তাছাড়া লোকে লোকাবণ্য। সকলেই যেন তাদের পথবোধ কবে দাঁড়িয়ে।

অবশেষে অনেক কসবত কবে দুবাব পিছলে পড়তে পড়তে শাড়িতে কাদা লাগিয়ে যখন হাজির হলো মনোহারী দোকানের পটিতে তখন এই দিকটায় ভিড় কম। কিন্তু কই, কোথায় গেল তাব দোকানী? কোথায় বসেছে সে?

তন্ন তন্ন কবে প্রত্যেকটা দোকানের সন্মুখে দাঁড়িয়ে খোঁজে টগব নিরঞ্জনকেই।

—এই যে না, কি নেবে?

—কি চাই খুকি?

—দেখুন না একবাব।

কে দেখবে? টগবের দৃষ্টি তখন বুবে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকটি দোকানদাবের মুখের উপব দিখে। কোথায় তার সেই চেনা মুখ যাকে দেখবে বলে সে ছুটে আসছে দলবলকে পিছনে ফেলে উদভ্রান্তের মত।

মনোহারী পটিব সব কটা দোকান দেখা সাবা। কোথাও নেই নিবঞ্জন। গত বছর সে যে যায়গায় দোকান পেতেছিল সেখানে নতুন লোক বসেছে দোকান নিয়ে।

—আচ্ছা, গেল বছরে যে লোকটা এসেছিল দোকান নিয়ে সে আসেনি?

—কে নিবঞ্জন? দোকানীব মুখে দেখা দেয বিদ্রূপের হাসি। ভূ কুঁচকে বলে—তাকে আর দোকান করতে হবে না। সে এখন মুনিশ খটিছে মাঠে!

লোকটার নির্মম বিদ্রূপে জ্বলে ওঠে টগর। কিন্তু পরক্ষণেই নিরঞ্জনের কথা মনে করে মুখের পড়ে দুঃখে আর বেদনায়। অমন সুন্দর চেহারার মানুষটা বোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ করছে এখন মাঠে!

যে উৎসাহ নিয়ে মেলায় এসেছিল টগর তার দ্বিগুণ অবসাদে ভেঙে পড়ে। ভাল লাগে না মেলার ওই হাসি উৎসবকে। মনে হয় লোকটাকে যদি একবার সে পায় জিজ্ঞাসা করে কেমন করে উঠে গেল তার দোকান। আর কোনদিন সে আসবে না দোকান নিয়ে, আনবে না তার মুক্তার মালা। সে যে কথা দিয়েছিল মুক্তার মালা আনবে তার জন্য।

ধীরে ধীরে বাড়ি চলে। কোন আকর্ষণ নেই তার মেলায়।

—চোর, চোর! মার শালাকে।

বেজায় ভিড় জমেছে চোরকে ঘিরে। মেলার অর্ধেক লোক ভেঙে পড়েছে সেখানে।

—চোর ধরা পড়েছে। শালা যা মাব খেয়েছে সাংঘাতিক।

—কি চুরি করেছে গো?

—মেয়েলোকের গহনা নিয়ে পালাচ্ছিল।

চোরের কথা বলারও ক্ষমতা নেই। মারের চোটে চোখ দুটো ফুলে কাপড় ছিঁড়ে কুটি কুটি। রক্ত গড়াচ্ছে ঠোঁটের পাশ দিয়ে অল্পবল্ল।

যার গলার হার ছিঁড়ে নিয়েছে সেই মেয়েটি এসে হাজির। চোরের পকেট হা হুড়িয়ে বাব হয় এক ছড়া মুক্তার মালা।

—এটা কি আপনার?

—না তোঃ মেয়েটি যাড় নাড়ে।

—তবে?

—সে বোধ হয় অন্য লোকঃ চোব পালাবাব সময় ‘চোর চোর’ বলতে বলতে পালিয়েছে। এ বেচারী সামনে পড়ে চোর বনে গিয়েছে।

—ছিঃ ছিঃ ভাবী অনায়া। ঠিক হয়নি এমন কবে একটা ভাল লোককে মাবা।

—না মশাই, এই-ই চোর! দলের লোকের হাত দিয়ে পাচার কবে দিয়েছে মাল।

—যাঃ! তাই কি হয়।

—তবে এ মুক্তার মালা কাব?

ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে উঁকি মারে টগর। চমকে ওঠে হঠাৎ চোর দেখে। এ যে তাব দোকানী। চেনাই যায় না মানুষটাকে।

—মালা কোথায় পেয়েছ কত্তা, কাব মালা?

—হামাব। ভিড়ে ঠেলে একেবারে চলে গিয়েছে টগর নিবঞ্জনের কাছে। তাবপব হঠাৎ তার হাত ধবে টানতে টানতে ভিড় ঠেলে বাইরে এসেছে ওকে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ওব অত সাধেব মুক্তার মালা ছিঁড়ে টুকবো টুকবো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে।

—হামার মালা, মালা কি হলো? এতক্ষণ মার খেয়েও কথা বলেনি নিবঞ্জনে। হতভম্ব হয়ে সব সহ্য করেছে। সহ্য কবেছে টগরকে এই মেলায় খুঁজে মুক্তার মালা দিতে পাববে এই ভবসায়।

এখন মালা ছিঁড়ে যাওয়াব বেদনায় আর্তনাদ কবে ওঠে ও।

ততক্ষণে টগব ওকে নিয়ে এসেছে মেলার বাইবে ফাঁকা মাঠে। গীতাব কেনা খেলাব ভাঁড়ে করে জল এনে ওর চোখেমুখে দিয়েছে ছিটিয়ে। হাওয়া কবেছে বাড়িব জন। কেনা পাখা দিয়ে।

—জানো, আমি অনেক কষ্টে তোমার জন্য মালাটা কিনেছিলাম। এত মার খেয়েও নিরঞ্জনের চোখে জল ঝরেনি, এবারে মরদ ব্যাটাছেলে কেঁদে ফেলে।

—ছিঃ কাঁদতে নেই। তুমি আবার দোকান কর। সামনের মেলায় দোকান নিয়ে এসো আর আমার জন্যে নিয়ে এসো এর চেয়েও ভাল মুক্তার মালা।

—তুমি আসবে আবার ও মেলায়?

—আসবো! মালা না পাওয়া পর্যন্ত আমি আসবো। তুমি দোকান সাজিয়ে রাখবে আমার জন্যে।

টগবের উৎসাহে সেইদিনই খাড়া হয়ে দাঁড়ায় নিবঞ্জন। এক বছরের মধ্যে সে খেটেখুটে আবার দোকান নিয়ে আসে পৰেব মেলায়। টগব অপেক্ষা করেছিল এক বছর ধৰে মুক্তাব মালাৰ জন্য।

মেলায় এসেছে টগব। খুঁজে বাব করেছে নিবঞ্জনের দোকান। আগের চেয়েও ভাল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুখ।

—এসো, এসো।

এক মুখ হাসি নিয়ে নিবঞ্জন সাদৰ অভ্যর্থনা জনায় টগবকে।

—কই, আমার মালা কই? বলেই নিবঞ্জনের দেওয়ার অপেক্ষা না কৰেই পুথিব মালা বাঁটতে বাঁটতে পেয়ে যায় চমৎকাৰ একছড়া মুক্তাব মালা সযত্নে আলাদা কৰে বাখা এক কৌটায়।

এতক্ষণ চোখ পড়েনি নিবঞ্জনের টগবের দিকে। হঠাৎ ওৰ মুখের দিকে চেয়ে অবাক। এ তো সে টগব নয়। মাথায় তাৰ ঘোমটা, গা ভৰা সোনাৰ গহনা, পৰিপাটী কৰে বাঁধা খোঁপা, মুখের হাসিতে বাঁধভাঙা খুশিৰ বন্যা। কপালে কাঁচপোকাৰ বদলে সিঁদুৰেব টিপ। সিঁথিতে জ্বল জ্বল কৰছে বস্ত্ৰেব বং। সঙ্গে না আছে বউদি, না বোন। এতক্ষণ পিছিয়ে থাকে সুবেশ যুবকটা দাঁড়িয়েছে পাশে এসে।

—দেখ, কেমন চমৎকাৰ মুক্তাব মালাটা।

নিবঞ্জনের চোখেৰ সামনে ভেসে ওঠে এক বছৰেৰ আগেৰ আসা টগবকে। নিৰাভবণ দেহ, আৰ ময়লা কাপড় পৰনে, তেল চুকচুকে মুখ। তাৰ মাৰ খাওয়াৰ পৰ বাখা আৰ সহানুভূতিতে ছলছল দুটি কৰণ চোখ, যে চোখে ছিল বৰাভয়।

না, একে চেনে না নিবঞ্জন। এ ষড়ৈশ্বৰ্যময়ী হাসো লাসো ভৰা স্বামীসোহাগিনী নাবীকে চেনে না সে তো।

—দেখি মালাটা? নিবঞ্জন হাত বাড়িয়েছে।

টগব এগিয়ে দেয় মালাটা।

—দেখুন আমি ভাবী দুখিত। এ মালাটা অনেক আগে বিক্রি হয়ে গিয়েছে, আমি ভুলে বিক্রিৰ জায়গায় বেখেছিলাম এটা।

—সে কি? এগিয়ে আসে যুবকটি। কত দাম চান বলুন না?

—না, এটা দাম দিলেও পাবেন না।

—ওঃ, বুঝছি। বিশেষ কাৰণে জন্য, তাই বলুন? ভদ্রলোক নিজেৰ বসিকতায় হেসে ওঠেন হো হো কৰে।

কিন্তু তাৰ পাশেৰ যে মানুষটি এতক্ষণ হাসি আৰ উজ্জলতায় খুশিৰ ফোষাৰা ছুটিয়েছিল সে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। তাৰ সুৰ্মী-টানা চোখেৰ কোণটা চিক্‌চিক্‌ কৰে ওঠে অকাৰণেই।

সাগিনা মাহাতো

গৌরকিশোর ঘোষ

বসন্দা, দিন্দা, করবীদি, শরৎদা — এদের কাহিনী তো দিব্যি বলতে পেরেছি। একটুও বাধেনি। তবে সাগিনাব কথা বলতে গিয়ে বার বার হৌচট খাচ্ছি কেন?

তিন বছর ধরে চেষ্টা করেছি সাগিনাব কাহিনী বলবাব কিন্তু কিছুতেই মনের মতো কবে বলতে পাবছি। অথচ সাগিনাকে বাদ দিলে চেনামুখের উজ্জ্বল মুখটাই বাদ পড়ে যায়।

সাগিনাব কথা মনে হলোই ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসেব সেই হাড়কাপানো সকালটাব কথা আমার মনে পড়ে।

জমট কুশায় হিমালয়ের পাদ স্টেশনটা ঢেকে গিয়েছিল সেদিন। দার্জিলিঙ মেলের শার্সি তোলা ভ্যাপসা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে প্র্যাটফবমে নামাব সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয়েছিল, ঠাণ্ডা কবাত দিয়ে পা দুটো কে বুঝি কেটে নিল। শীত যে এমনভাবে কামড়ায় সে ধাবণা আগে কখনো ছিল না।

জিনিসপত্র সামান্যই। সেগুলো হাতে নিয়ে সামনেই যে পাহাড়ী কুলিটাকে পেলাম তাকে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'সাগিনাকে চেনো?'

সে আমাদের বেশ কবে দেখে নিলে, তারপব কথার জবাব না দিয়েই চলে গেল।

পকেটে পয়সাকড়ি প্রায় নেই। কাল দুপুরেব পর থেকে পেটেও বিশেষ কিছু পড়েনি। সারা রাত ট্রেনে তো প্রায় দাঁড়িয়েই কেটেছে। তার উপব সকালের শীতের এই অসহ্য বোঝা। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি যদি গবম কিছু পেটে না পড়ে, যদি আগুনের তাতে হাত-পা সঁকতে না পারি তে মরে যাব।

এই অচেনা নির্বাক্তব পুরীতে দু'জন লোককে জানি। এক কমরেড কাজিমন। সে আমার বন্ধু। আব যাব কাছে এসেছি, সেই সাগিনা। এই বছরই এপ্রিল মাসে তাকে প্রথম দেখি। ঝরিয়াব শ্রমিক সম্মেলনে। কাজিমনই তাকে এনেছিল।

কাজিমনকে এখানে পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। সে থাকে খার্সাং-এ। এখানে এক সাগিনাই আমার ভরসা।

কিন্তু কোথায় সাগিনা? যাকে শুধাই, সেই মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। স্টেশন ঘবে ঢুকে দু'একজন রেলবাবুকেও জিজ্ঞাসা করলাম। তাতে তাঁরা খেঁকিয়ে উঠলেন। কে সাগিনা? ও সাগিনা-ফাগিনা কাউকে চিনি না মশাই।

অগত্যা স্টেশন থেকে বেবিযে বাজাবে এলাম। সেখানে একটা ছোট চা-খানায় ঢুকে চা খেতে খেতে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাহাড়ী রেলের লোকো শেডটি কোথায়?

লোকটির কথায় জানলাম, একটু দূরেই হবে জায়গাটা। পাহাড়ী রেলের এই ছোট লাইন ধরে এগিয়ে যেতে হবে। একটা ছোট স্টেশন পড়বে। সেখান থেকে ডানহাতি মোড় ঘুরে একটা ছোট বাজার। বাজারের ভিতর আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেই লোকো শেড মিলবে। মহানন্দার কাছ বরাবর।

আকাশেব গতিক দেখে মনে হলো, যে-কোন সময় বৃষ্টি নামবে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো। পথ ধরে হাঁটছি। ধকস্ ধকস্ করতে করতে দুটো ইঞ্জিন খানকয়েক গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। শৈলাবাসে চলেছে। সামনের ইঞ্জিনেব বাফারের উপর দুটো পাহাড়ী বালি হাতে বসে। চৌচিয়ে চৌচিয়ে কি বলছে তারা। কমলালেবুর পাহাড় তৈরি হয়েছে এখানে-ওখানে। চৌচামেচি চলেছে বেজায়। গোটা কয়েক বাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাত্রী হুসছে পেটে। হুস-হাস ট্রাক, মোটর-কার চালিয়ে বেবিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী ড্রাইভার। আমার মন কাউকেই তেমন করে দেখছে না। যদি সাগিনাকে না পাই?

অনেকখানি হেঁটেছি। হাঁটতে ভাল লাগছে। ভিতবটা একটু গবমও হয়েছে। এই তো সেই স্টেশন। ঐ বুঝি সেই বাস্তা। হ্যাঁ, এই যে বাজাবটা।

দু-চার পা সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখি এক চা-খানার সামনে তুমুল হাঙ্গামা বেধে গেছে। একটা পাহাড়ী মেয়ে ঝাঁটা দিয়ে একটি লোককে দমাদম পিঁটছে। সেও মেয়েটাকে কিল ঘুষি লাথি চালাচ্ছে। লোক জমে গেছে চারিদিকে। মজা দেখছে সবাই। আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। হঠাৎ হৈ-হৈ বেড়ে গেল। সিটি পড়তে লাগল সুঁই সুঁই। কি হলো, দেখতে গিয়েই আমি থ। ঝাঁটার ঘায়ে অস্থির হয়ে লোকটা মেয়েটার কাপড় ধবে মেরেছে এক টান। সেই টানে বিবস্ত্রা হয়ে বেকুব বনে গেছে মেয়েটা। বিনা পয়সায এমন জমাটী খেল দেখে জনতা আহ্বাদে সিটি বাজিয়ে চলেছে।

হঠাৎ কোথেকে সাগিনার আবির্ভাব হলো। মুহূর্তের মধ্যে সব তছনচ হয়ে গেল।

‘শালে কুন্তাকে বাচ্চা’ বলে সাগিনা লোকটার ঘাড় ধবে শূন্যে তুলে ফেলল। মনে হলো একটা বায়েব থাবায় নেংটি ইঁদুব ঝুলছে। আবেকটা থাবা দিয়ে সাগিনা তাব গালে মাবলে চড়। লোকটার কশ বেয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেবিয়ে পড়ল। তারপর সাগিনা তাকে ছেঁড়া বস্ত্রাব মতো ছুঁড়ে ফেলে দিল। জটলাব দিকে চেয়ে খাপা গোবিলাব মতো হুঙ্কার ছাড়ল, ‘ভাগো শালা সব।’

মুহূর্তেব মধ্যে তামাসা মাটি। জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল।

চা-খানায় ঢুকে মেয়েটা কাপড় পবে নিল। সাগিনা তাব পাশে গিয়ে বসল। লোকটাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এল। আমিও একপাশে বসে পড়লাম। আমাব মনে হলো, বাহাদুর-মার্কী ইংবাজি সিনেমাব একটা দৃশ্য যেন এইমাত্র দেখলাম।

সাগিনা আমাব দিকে ভ্রুকুটি করে চাইতেই বললাম, ‘কমবেড সাগিনা, আমি কলকাতা থেকে আসছি।’

সাগিনা একবার শুধু বলল, ‘কলকাতাকে কামবেড? অচ্ছা, ঠিক হায, পিছু বাত হোগা।’

তাবপর আমাকে সম্পূর্ণ উন্মেক্ষা কবে পাহাড়ী মেয়েটাকে মোলায়েমভাবে জিজ্ঞাসা কবল, ‘তুই কে?’

মেয়েটি একটু হেসে বললে, ‘ললিতা।’

এতক্ষণ পবে সাগিনার স্বভাব-রক্ষ বিরাট চাকার মতো মুখখানা একটু যেন কোমল হয়ে উঠল, খপ করে ললিতার থুতনিটা ধরে ওর মুখটা একটু তুলে ধবলে, কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকলে।

তাবপর বলল, ‘বাঃ, তুই তো বেশ খুবসুরত।’

মেয়েটিখিলখিল করে হেসে উঠল। সত্যি, ভাল করে চেয়ে দেখলাম, ললিতা সুন্দরী বটে।

সাগিনা বলল, ‘ও তোর কে হয়?’

ললিতা বলল, ‘দুশমন।’

তারপর আবার খিলখিল করে গড়িয়ে পড়ল হেসে।

লোকটা এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

গর্জন করে বলে উঠল, ‘ও আমার আওরাত। পালিয়ে এসেছে ঘর থেকে।’

ললিতার দিকে চেয়ে বলল, ‘চল ঘরে। দূশমনি বার করব। জিন্দা পুঁতে ফেলব।’

রাগে অপমানে সেই পাহাড়ী মুখ আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। ললিতা সাগিনাব কাছ ঘেষে সরে বসল। তারপর লোকটার দিকে অবহেলার থুথু ছুঁড়ল। থুঃ।

সাগিনা ললিতার একটা হাত আলতোভাবে চেপে ধরল।

লোকটার দিকে কটমট করে চেয়ে বলল, ‘আগর জান কি পরোয়া হ্যায় তো ভাগ হিয়াসে। জান থাকলে বহুং আওরং মিলবে।’

লোকটা বাঘের মতো চোখে একবার ললিতাকে, আরেকবার সাগিনাকে দেখে নিল। তারপর কোনো কথা না বলে চলে গেল।

সাগিনা ললিতার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, ‘নে, হযেছে? গিয়েছে তোর দূশমন? আখন তুই কোথায় যাবি বল?’

ললিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, ‘আমি কি জানি?’

মিটমিট করে হেসে সাগিনা বলল, ‘তো যা তোর দূশমন তো ভেগেছে, এবার কোথায় যাবি চলে যা।’

ললিতা একটু অবাক হয়ে সাগিনাব দিকে চাইল। কিন্তু সে একটুক্কণ, তারপরেই তাব মুখে কেমন এক দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল। হাসতে হাসতেই উঠে পড়ল। পোশাকটা ঠিকঠাক করে নিল। তারপর দরজার দিকে পা বাড়াল।

সাগিনা খপ কবে হাতটা ধরে বলল, ‘বহুং আচ্ছা। খুব আচ্ছা জবাব দিয়েছিস। চল, তোর একটা ঠিকানা করে দিই।’

সাগিনা উঠে পড়ে দেখে আমি ওকে বললাম, ‘কমরেড সাগিনা, আমি কলকাতা থেকে আসছি। কমরেড মিত্র আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে।’

এতক্ষণ আমার কথা ওর মনেই ছিল না। যেন এইমাত্র আমাকে দেখল।

বলল, ‘হাঁ হাঁ, কলকাতাব কমরেড, ঠিক হ্যায়। হবে, তোমার সঙ্গে বাতচিত হবে। পিছে হবে। দেখছ তো, আখন ব্যস্ত আছি। কাল পরশু দেখা হবে।’

বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। খিদেয় তখন আমাব পেটে পাক দিচ্ছে। ওকে খুঁজে বার করতেই তো দম বেরিয়ে গেছে। এখন বেলা দুপুৰ। দুপুরের পর বিকাল হবে। রাত আসবে। থাকব কোথায়? ওকে ছেড়ে দিলে আর কি ওব পাক্তা পাব?

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘দেখ কমরেড, ব্যাপারটা জরুরী, ইউনিয়নের কাজে এসেছি। এসেছি তোমার কাছে, থাকব কোথায়?’

সাগিনা এবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

‘আরে বাহবা বাহবা। এর মতুন তুমাবো ঠিকানা নেই। তো ঠিক হ্যায়, তুমভি চল হামারা সাথ। ফযসালা একটা হবেই হবে।’

এতক্ষণে বুঝতে শুরু করলাম, যে পান্নায় পড়েছি, সেটি নিতান্ত সোজা নয়। পার্টব নির্দেশ, এরই সঙ্গে আমাকে এখন কাজ করতে হবে। কাজমিন রিপোর্ট দিয়েছিল, সাগিনা এ অঞ্চলে এক বিরাট শক্তি। ওর ক্ষমতা যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, তবে এ অঞ্চলে আমাদের পার্টির হবে একাধিপত্য অধিকার।

এখন সেই শক্তির খানিকটা নমুনা দেখলাম। আর দেখে আমার আক্কেল গুডুম হয়ে গেল।

অথচ সাগিনাকে দেখবার আগে আমি মনে মনে কত খুশি হয়েছিলাম। এই প্রথম আমি সত্যিকার একজন শ্রমিকের আঙ্কাবহ হতে চলেছি।

আমরা এদেশে যতই শ্রমিকের নেতৃত্ব বলে চোঁচাই না কেন, বরাবর দেখেছি, নেতৃত্বটি মধ্যজীবীদেরই হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। আর মজদুর ভাইরা কলে কারখানায় যেমন মনিবাবুর হুকুম তামিল করে, তেমনি ইউনিয়নে তামিল করে কমরেডবাবুর হুকুম।

বই পড়ে কত কি শিখেছিলাম। সর্বহারাই পারে বিপ্লবকে ডেকে আনতে, কারণ সে মরিষা, তার হারাবার কিছু নেই। শ্রেণী-সংগ্রামের সেরা সৈনিক তাই মজদুর। ওদের নেতৃত্বেই একদিন সারা দুনিয়ায় পতপত উড়বে লাল ঝাণ্ডা।

কিন্তু লেবর ফ্রন্টে কাজ করতে এসে দেখি নেতৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার রয়েছে শুধু মধ্যবিত্তের। যে পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর আস্থা না রাখবারই তামিল পেয়ে এসেছি পাটি সাহিত্যে — কারণ পাতি বুর্জোয়া নাকি সবচেয়ে সুবিধাবাদী, শিবির বদলাতে তারা মুহূর্তের বেশি সময় নেয় না, বিপ্লবকালে এরাই দল ত্যাগ করে মালিকের পা-চাটা গোলাম বনে যায় — যাদেরকে ঘণা করতে শিখেছি, এখন দেখি লেবর মুভমেন্টের তাবং লীডার তাবাই।

আমি জন্মেছি মধ্যবিত্ত ঘরে। জন্মসূত্রে আমি সেই সুবিধাবাদী পাতি বুর্জোয়াদের শবিক। আর তাই আমার লজ্জা রাখার জায়গা ছিল না। মহাপবিত্র শ্রমিকবংশে কেন আমার জন্ম হয়নি, সে আফসোসে আমি মবমে মরে থাকতুম।

তাই তো প্রথম সুযোগেই আমি চলে এসেছিলুম সাগিনার কাছে। আমার নিজের জায়গায়। আমার আপন ঘরে। মনে মনে ভেবেছিলাম আমার জন্মের ফ্রন্ট শুধরে নেব সাগিনার কাছ থেকে তালিম নিয়ে।

আব সেই সাগিনার কি এই রূপ? আমার মধ্যবিত্ত মন বলছিল, শেষে কি একটা লম্পটেব পাল্লায় পড়লে!

এ-বস্তি সে-বস্তি পার হয়ে আমবা তিনজন চলেছিলাম। আগে আগে সাগিনা আর ললিতা। পিছু পিছু আমি। পিছন থেকে সাগিনাকে এক বিবাট দৈত্যবিশেষ লাগছিল।

সাগিনার চেহারাটি বিবাট। যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। মাংসের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ যেন চলেছে। ময়লা তেল-কালি মাখা ছেঁড়া এক বেলের কুর্তি গায়, পরনে টাইট পাহাড়ী প্যান্ট। পাশে ললিতার সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। দু'জনে অনর্গল কথা বলছে, হাসছে। এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে মাঝে মাঝে।

লোকো শেড পেরিয়ে একটা জীর্ণ খোলার বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়াল।

সাগিনা কর্কশ গলায় হাঁক পাড়ল, 'গুরুং, এ গুরুং!'

একটা বুড়ো পাহাড়ী বেরিয়ে এল।

সাগিনা বলল, 'দাইবুড়ি কো বোলাও!'

গুরুং ভেতরে গিয়ে এক বুড়িকে পাঠিয়ে দিল।

সাগিনা তাকে বলল, 'এ বুড়িয়া ভুই এই ললিতাকে তোর কাছে বেখে দে। ডাগদাবাবুকে বলে হাসপাতালে ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দিব।'

ললিতাকে বললে, 'থাক আখুন তুই এখানে। পবে দুরি ব্যবস্থা হবে।'

ললিতা হাসতে হাসতে বুড়ির সঙ্গে ভেতরে চলে গেল।

ললিতার ব্যবস্থা হলো, এখন আমার একটা হিসে হয়তো করবে সাগিনা। এর মধ্যে আমি মনস্থির কবে ফেলেছি। আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই রওনা দেব খার্সাঁং-এ। এ লোকের সঙ্গে পোষাবে বলে মনে হচ্ছে না। কাজিমেনের সঙ্গে পরামর্শ দরকার।

সাগিনা আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘এসো, আমার বস্তিতে যাই।’

সেটা আবার কোথায়? খিদে-পেটে কাঁহাতক ছোট্টাছুটি করা যায়?

বললাম, ‘কমরেড কাজিমনকে ফোনে একটা খবর দিলে হয় না!’

সাগিনা আমার দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি কাজিমনকে চিনো?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, সে আমার দোস্ত।’

‘আচ্ছা!’ সাগিনা বলল, ‘তবে চল টিশন। টেলিফোনই হয়ে যাবে।’

এতক্ষণে দেখি সাগিনা একটু নজর ফেলল আমার উপর। স্টেশনে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করল দু-চারজন বড় বড় নেতার কথা।

‘কমরেড মিত্রাকে জান?’

বললাম, ‘হ্যাঁ, জানি।’

‘আচ্ছা, কমরেড মুকুর্জি, ব্যানার্জি, সেন, মহম্মদ হুসেন — সবাইকে চিনো?’

বললাম, ‘চিনি।’

সাগিনা আমার দিকে বেশ করে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যেন ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নিল আবার।

বলল, ‘তবু তো ঠিক আছে।’

স্টেশনে ঢুকতে সাগিনার যার সঙ্গে দেখা হয় এখন, সেই দেখি খানিকক্ষণ মাইডিয়ারি আলাপ কবে নেয়। অথচ এইখানে জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি সাগিনার খবর। কেউ হৃদিস দেয়নি। বড় তাজ্জব ব্যাপার! কন্ট্রোল রুমে ঢুকতেই আধঘণ্টা কাবার হয়ে গেল।

দু’-একজন স্টেশনবাবু সাগিনাকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাগিনা গ্রাহ্যও করল না। স্টান এক ফিরিঙ্গি সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল।

বললে, ‘আন্টুনি সাহাব, সালাম।’

সাহেব বিরক্ত হয়ে বললে, ‘ক্যাযা মতলব সাগিনা।’

সাগিনা হেসে বললে, ‘সালাম দিচ্ছি সাহেব, তবু ভি গৌসা করছ কেন? তবিস্যত গড়বড় হয়নি তো?’

সাহেব আরো চটে গেল, ‘দিক্ কর না সাগিনা। মতলব কি তাই বলো।’

সাগিনা এবার গম্ভীর হয়ে গেল।

বলল, ‘টেলিফোন করতে চাই। খার্সাং-এর লোকো অফিসের নম্বর লাগিয়ে দাও।’

সাহেব বললে, ‘আবি ভাগো। হোগা নেই।’

পেছন থেকে কে মন্তব্য কবলে, ‘অ্যাঁ, ব্যাটার বোয়াব দাখ। বাপের জমিদারি পেয়েছে যেন।’

সাগিনা বললে, ‘সাহেব, টাইম আমারও কমতি আছে। কাম ভি জরুরী। হজ্জাং যদি না চাও, লাইন দাও জলদি।’

এবারে ঘরসুদ্ধ বাবুরা চটে গেল। কেউ বললে বেরিয়ে যাও, কেউ বললে নিকালো, কেউ বা বললে গেট আউট। একটা মিনিয়াল বাবুদের কাছে চোখ গরম করলে। ইয়ার্কি। রিপোর্ট কর উপরে। কোম্পানিও হয়েছে এমনি, এইসব গুণ্ডাদের জেলে না প্যাঠিয়ে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে।

এক বাবু আমাকে খিঁচিয়ে উঠলেন, ‘এই ছোকরা, ভাগ এখন থেকে।’

সাগিনা সব গালাগাল নির্বিবাদে শুনল। ও সব কথায় সে একটুও বিচলিত হয়েছে বলে মনে হলো না। এগিয়ে গেল এন্টনি সাহেবের কাছে।

তারপর বললে, 'সাহাব, তোমরা ভারী অফসার আছো। তাই চটপট পুরানা বাত ভুলে যাও। বস্তিবাজার কা মামলা এতনা জলদি ভুলে গেলে? থাক, আমিও সে সব কথা তুলতে চাইনে।'

হঠাৎ বাইরে কাকে দেখতে পেয়ে চৌচিয়ে ডাকল, 'এ বাহাদুর, ইধাব আও।'

জানালা দিয়ে একটা পাহাড়ী মুখ উঁকি মারল।

সাগিনা বললে, 'তুমকো আদমি লোগ সব তৈয়ার হায়?'

পাহাড়ী মুখ জবাব দিলে, 'বিলকুল তৈয়ার। কিউ ভাই?'

সাগিনা বললে, 'এক সাহাব আর তিন বাংগালী বাবুকো দুরন্ত করনে পড়েগা।'

পাহাড়ীটা একগাল হেসে বললে, 'বহুং আচ্ছা। কব্।'

সাগিনা এবার গোটা ঘরটায় চোখ বুলিয়ে বললে, 'সামকো আ যাও বস্তিবাজারমে। বাতা দুস্কা।'

'বহোং আচ্ছা।'

সাগিনা যেন নিজের মনেই বলে উঠল, 'আব কুছ কাম হোগা মালুম পড়তা হায়। কিউ সাহাব?'

ঘরের লোকগুলো সব যেন বোবা হয়ে গেছে। এন্টনি সাহেব সাগিনার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

সাগিনা বললে, 'এবার তো লাইন মিলবে সাহাব?'

দ্বিতীয় কথা না খসিয়ে সাহেব ফোনটি তুললেন। একটু পরে 'হ্যালো খার্সাং, লোকো অফিস প্লিজ' বলেই ফোনটি সাগিনার হাতে তুলে দিলেন।

সাগিনা ফোন ধরে চৌচাতে লাগল। 'হ্যালো কাজিমন সাহাব। হাঁ হাঁ সাগিনা। আরে কলকাতাকে চিডিয়া আয়া। বোলছে কি তুমাকে চিনে। হাঁ হাঁ, বাত কবো-না।'

ফোনটি আমাকে দিয়ে বললে, 'বাত করো।'

আমার গলা পেয়ে কাজিমন খুব খুশী। বললে, আপাতত সাগিনার ওখানে থাকো। পরশু আমি যাব। তখন কামকাজের বন্দোবস্ত হবে। তুমি এখন সাগিনাকে ফোনটি দাও।

সাগিনাকে বলতে শুনলাম, 'ঠিক হায়। ওর জনো তুমি ভেবো না। পরশু রোজ তুম আ যাও, জবর। আচ্ছা আচ্ছা। হাঃ হাঃ হাঃ। ফিকিব মত কবো ভাই। কৌন? জানরল ম্যানেজার। হাঃ হাঃ হাঃ। বড়ি আছি বাত। আরে দুনিয়া বদল জায়েগি। উয়ো বড়া সাহাব, ছোট সাহাব — সব শালে কো বং জল জায়গা। শবমায়দাবি চলেগা নেহি। আচ্ছা আচ্ছা, উয়ো সব বাত পিছে হোগা। কেয়া? আওরাত? কৌন? ও হো হো। ভুখন কি বেওয়া? আবে ভাই, উয়ো তো ভাগ গয়ি। মেরা কলিজা কাটকে চলি গয়ি। দো মাহিনা হো চুকা। হাঁ। নেহি, নেহি, কসুব-উসুর কুছ নেহি থা। মাতোযালা হোকে এক বোজ ঘর পইচা। সামনে পড় গিয়া উও বেচারি, মারা দো চার ঝাপড়। তো সুবে উঠকে দেখা কি, শিঞ্জবা খালি। হায় হায়। ক্যা আফসোস। ক্যা, দুসরি কো বাত? আবে ভাই, আবে ভাই শুনো তো। মায় ক্যা মবদ নেহি হুঁ? তো? তো আওরাত ভি মিল জায়েগা। ও হাঃ হাঃ হাঃ। কামাল কিয়া ভাই, তুমনে কামাল কিয়া। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক হায়।'

খটাস করে ফোনটি রেখে দিল সাগিনা। খুশিতে চোখমুখ ভরে উঠেছে।

'গুড মর্নিং সাহাব, হা গুড মর্নিং। চলো কামরেড।'

আমার পিঠে গদা হাতের একখানা থাপড় মেরে ঠেলতে ঠেলতে বাইবে নিয়ে এল।

সাগিনার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে নানা কথা ভাবছিলাম। সাগিনা দেখলাম, সোজা পথের মানুষ। সাহেব যদি ফোন করতে না দিতে চায় তো বিচলিত হবার

কিছু নেই। ধরে পিটে দাও। মরদ হয়ে সে যখন জন্মেছে, তখন তাব আওরাত একজন চাই। একজন যদি চলে যায়, দুঃখ নেই, আরো কেউ জুটে যাবে।

যাবে কেন বলছি, জুটে তো গেছেই এর মধ্যে। সকালের ঘটনা মনে পড়ল। ললিতার স্বামীকে তাড়িয়ে সাগিনা তাকে রেখে এসেছে এক বুড়ির বাড়িতে।

এই লোককে নিয়ে পাটি গড়তে হবে! বই-এ লেখা নীতিকথায় আমার কখনো বিশ্বাস ছিল না। সুনীতি দুর্নীতির মার্কসীয় ব্যাখ্যাই আমি জানি। কিন্তু তবুও, এই লোকটার সংস্পর্শে এসে অবধি তার যা ক্রিয়াকাণ্ড সব দেখলাম তাতে আমার মনটা কেন যেন খচখচ কবতে লাগল।

সাগিনা একগাল হেসে বললে, ‘কামরেড, এবার খানাপিনা কিছু করা যাক। তুমি যে এসেছ সেটা খুব খুশির কথা আছে।’

ঘর বলতে সাগিনার একটাই। কিন্তু সেটা এত কদর্য, আগে বুঝতে পারিনি। আমার বিছানাপত্র কিছু ছিল না। সাগিনাবি বিছানাতেই শুয়েছিলাম, সাগিনার পাশেই। ওরই বোঁটকা কম্বল মুড়ি দিয়ে।

শীতের ভয়ে সেই ছোট্ট ইন্টার খুপবিব একটামাত্র দরজা বন্ধ কবে দেওয়া হয়েছে। আব অন্য কোনো ফাঁক-ফোঁকর নেই। আমরা জনা পাঁচেক লোক সেই ঘরে। ঘরটি গরম রাখতে এককোণে একটা আগুনের মালসা জ্বলছে।

প্রচুর মদ খেয়েছে সাগিনা। ভক ভক কবে তাব প্রশ্বাসেব গন্ধ আমার নাকের উপব আছড়ে পড়ছে। এইসব গন্ধ, মালসাব ধোঁয়া, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস — কোনোটাই বেফতে না পেবে সেই বন্ধ ঘবে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। ভ্যাপসা চরম পীড়াদায়ক সেই আবহাওয়ায আমার মনে হলো, আমি দম বন্ধ হয়ে মারাই পড়ব বুঝি।

এও বুঝতে পারছিলাম, আমার এ অস্বস্তি অন্যায। পাতিবুর্জোয়া বন্ধেব নাক-উঁচু সংস্কার। ফতবাব কথাটা মনে হচ্ছিল ততবাবই যেন মবমে মবে যাচ্ছিলাম। এই আমাব আপন ঘব। খাঁটি এক মজুরের আস্তানা। এমন জায়গায় থাকবাব সুযোগ পাব বলেই না এখানে এসেছি। তবে কেন এই অস্বস্তি? তবে কেন আমি এত ছটফট করছি? যুঝোতে পারছি না কেন ঐ সাগিনাদের মতো নির্বিকার ভাবে। ছিঃ? মনকে ধমক দিলাম। একটু যুঝোতে চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ সেই আবছা অন্ধকাবে দেখি সাগিনা উঠে বসল। তারপব দুই ধাক্কায আমাকে ঠেলে তুলল।

‘কামরেড,’ আমার হাত দু’খানা চেপে ধরল সাগিনা। ‘কামরেড, আমাকে মাফ করে দাও। মায় পাগী হাঁ।’

বুঝলাম, রাতদুপুরে মাতলামো চেপেছে সাগিনার। সেরেছে!

‘সচ্ বলছি কামরেড, একটা বুরা কাম করতে গিয়েছিলাম। মাফ করে দাও।’

এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

বললাম, ‘কামরেড, কথা কাল হবে। আজ যুমাও।’

‘ঠিক হ্যায। লেকিন শোনো কামরেড,’ সাগিনা বললে, ‘তোমাক যখন প্রথম দেখি তখন মনে করেছিলাম কি শালা টিকটিকি আছে। তখন তয করলাম কি শালাকে জানে মেরে ইঞ্জিনের বয়লাটে ফেলে দিব।’

সর্বনাশ! আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ল। আঁতকে উঠলাম সাগিনার কথা শুনে।

‘তারপর!’

‘তারপর’, সাগিনা বলল, ‘দেখলাম তুমি কাজিমেনের সাথে বাতচিত করলে। দেখলাম, হাঁ তোমাদের বেরাদরি পাক্কা। তখন আফসোস হলো কি তোমাকে আমি বিশোয়াস করিনি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও কামরেড।’

সত্যা বলছি, সে রাতটা খুব ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। যে সাগিনাকে চরম ভবসা বলে প্রথম রাত্তিরে নিশ্চিন্তে তার কাছ ঘেঁষে শুয়েছিলাম, এখন তাকেই সাক্ষাৎ শমন বলে মনে হতে লাগল।

সাগিনা ততক্ষণে ভৌঁস ভৌঁস ঘুম দিতে লেগেছে। যদিও ঘুমানোর আগে বার বাব ভরসা দিয়েছে যে তার ভুল ভেঙেছে। সে আমাকে কমবেড বলে মেনে নিয়েছে। তবু আমার ভয় যায়নি। সাবারাত যেন খাটের নিচে সাপ নিয়ে শুয়ে কাটলাম।

তারপর পুবো একটি বছর সাগিনার সঙ্গে কাটল। কাজিমন কিছু বাড়িয়ে বলেনি। সাগিনাব প্রতাপ সে অঞ্চলে ছিল অপ্রতিহত। পাহাড়ী বেলেব মজদুররা সাগিনা ছাড়া আব কাউকে চেনে না। আব কাউকে মানে না।

বিদেশী মালিকের বহু অত্যাচার এই রেলপথের শ্রমিকদের সইতে হয়েছে। শীতের দেশ। বর্ষার দেশ। কিন্তু কি সব ভাঙাচোরা কোয়ার্টার। বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ছে প্রতি বছর, শীতে কনকনে বাতাস ঢুকছে। রোগে ভুগে কত মজদুর মারা গেছে। তবু কোম্পানির মালিকরা কোনো প্রতিকার কবেনি। আবেদন-নিবেদন, দরকার অভ্যস্ত বার কবা হয়েছে। প্রতিবারই কোম্পানি তা নাকচ করে দিয়েছে।

এমনি অবিচারের রাজত্ব বর্ষদিন যাবৎ চলেছিল। তাবপর আবির্ভাব হলো সাগিনার। সাগিনা মজদুরদের নিয়ে দল পাকাল। গোরা অফিসার, ফিরিসি অফিসারদের দাপট আব বাঙালী ক্লর্ক বাবুদের শয়তানি সাগিনার দলকে দিনের পর দিন শক্ত কবে তুলল।

এসব খবর শুনেছিলাম সাগিনাব বিভিন্ন আড্ডায়। বিভিন্ন লোকের মুখ থেকেই। সাগিনাব আড্ডাগুলোর বেশির ভাগই ছিল মদেব আড্ডা। ওগুলো যেন সাগিনার এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের বাজধানী। ওখানে বসে সাগিনাব মুখ থেকে যে ছকুম বেবোবে, পৃথিবীর কারও সাধ্য ছিল না তা বদ কবে। চন্দ্র সূর্য ওঠার মতোই সেগুলো তামিল হতো।

‘আবে সাথী, কত বলব! ওসব শব্দ কি বাত আছে — শালে গোবা লোগ বহুত লাথ মেরেছে।’

বুড়ো ওরুং পুবানো ইতিহাস শোনাত। মদেতুল তুলু হযে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে ধরত আমাব গলা। আদব করে গেলাসে মদ ঢেলে বলত, লো পিয়ো। তারপর ওরুং-এব মুখ ছুটত।

‘হাঁ, লাথ মাবত। মর্দনাকে মারত। জেনানাকো ভি মাবত। কসুর থাকলে মাবত, না থাকলেও মারত। শালে লোগ দনাদন দনাদন জুতি চালাত। হাঁ। বহোং সাথী যায়েল হয়েছে। তো কি করব, খালি লাথ খেয়েছি। আব শালা অফসার লোগ বিবি বেটি সব বাংলোয় লিয়ে তুলেছে। ছোট ছোট অফসার — এই নিস্পেক্টর, টি টি সি লোগও এসে হারামি। ওরাও লিয়েছে। তো কি করব, শালা লোগ গোরা আছে। রিপোর্ট করবে তো নোকবি থিকে ফৌবণ বরখাস্ত। তো কি করব। আচ্ছা বাবা, লাথ মাবো, লে যাও বিবি, বেটি, বহিন। নোকবি খেয়ো না। তো কি করব। কোনো লীডার তো ছিল না। ডবকে মাবে কেউ বাবা কোনো কথা বলতো না। হাঁ। গরিব আছি, মজদুর আছি, কুলি আছি। খালি লাথ মারছে। তো গোবা হতাম কি ফিবিগি, আমিও লাথ মারতাম। আব বাঙালী ক্লর্কবাবু হতাম তো জেব্ ভরতাম গবিবের পাকিট মেবে। আচ্ছা বাবা মারো। কোনো সংগঠন তো ছিল না, লীডার ভি না। তো কি করব। আজ আমাকে লাথ মারছে সাহাব তো উ শালা হাসি কবছে। কাল ওকে মাবছে তো আমি হাসি করছি। হাঁ সচ বাত। বিলকুল সচ। তো কি করব। আমি একেলা কিছু বলব সাহাবকে তো সব শালা ভাগবে। কেউ মদত দিবে না। আমি শালাকে পাকড়াবে, সাহাব। দনাদন দনাদন পিটবে। নোকবি ভি ফৌবণ খতম।’

যখন ওদের এই অবস্থা রকম সেই সময় সাগিনা ওদের মধ্যে এল। এল একেবারে লীডার হয়ে। আর এসেই পিটতে শুরু করল। প্রথম দিকে মজদুরদেরই পিটেছিল।

‘শালে কুত্তা কি বাচ্ছে।’

এই ছিল সাগিনার প্রথম দিকের শ্লোগান। যে শালা সংগঠনে না আসবে, সাহেবদের মার মুখ বুজে থাকবে, সেই শালাকে আচ্ছা করে পেটো। আর যে শালা চুকলি থাকবে তাকে জানে মেরে দাও। যে শালা তার বিবি, বেটি কি বহিনকে সাহেবের ঘরে যেতে দেবে, ফ্যালো সে শালাকে পাহাড়ের ওপর থেকে।

এইভাবে ঢুকল সাগিনা। বছর দুয়েকের মধ্যে সব মজদুর সাগিনার দলে ভিড়ে গেল। আর তারপর শুরু হলো উলটা খেল। ‘হাঁ, সাথী’, গুরুং গেলাস উপুড় করে মদ ঢেলে দিল গলায়। একটু দম নিলে।

তারপর বলতে শুরু করল, ‘হাঁ, সাথী, বিলকুল উলটা খেল। সাহাব যদি লাথ্ মাববে তো আমিও মারব। তো কি করব, লীডারের হুকুম। মার শালে কো মার শালে কো। তো কি করবে সাহাব। নোকরি থাকে? হাঃ, আমার নোকরি যাবে তো সব মজদুর কাম বন্ধ করবে, তো কী করব, লীডারের হুকুম। আর চাক্কা বন্ধ তো কোম্পানি ভি ফুট! হাঃ হাঃ হাঃ। চাক্কা বন্ধ তো কোম্পানী ভি ফুট! শালা লোগ চার দফে নোকরি নিল আমার, বরখাস্ত কবল, তো কি হলো? চাক্কা বন্ধ। আর কি হলো? ফিন আমাকে নোকরি দিতে হলো। আর কি হলো? শালা মারপিট একদম বন্ধ হয়ে গেল। আর এসব কাবোয়ই সাগিনার। সাগিনা লীডার আছে। সর্দার।’

সঙ্গে সঙ্গে ক’জন সান্দোপান্স নিয়ে সাগিনা হৈ হৈ কবে ঢুকল সেই দোকানে।

গুরুং উঠে দাঁড়িয়ে চোঁচাতে লাগল, ‘আও আও আও, সাথী, পিয়ো পিয়ো পিয়ো।’

সাগিনা তার বিরাট দেহটা আমার পাশে দুম করে যেন আছড়ে ফেলল। আমাব পিটে মারল এক থাল্লড়।

বলল, ‘আ কামরেড। পিতা হ্যায। হাঃ হাঃ। ইতো আব ঠিক সাথী বনে গিয়েছে। লেकिन এক আফসোস। কামবেডেব জন্য একটা তো আওবাত চাই। মর্দানা হো, ইয়া নেহি? আচ্ছা, ফিকির নেহি। উও ভি মিলে যাবে।’

আমাকে সান্দুন দিয়ে এক পাহাড়ীকে ডেকে বলল, ‘এ বাহাদুব, হ্যায কেই, আচ্ছা চীজ? কামরেডের জন্য দিতে পারিস।’

বাহাদুরের ভোঁতা মুখ আমার দিকে হেসে উঠল।

বলল, ‘কাম তো কিছু মুশকিলের না আছে।’

‘তো ঠিক হ্যায’। সাগিনা হুকুম দিল, ‘কামরেডের লিয়ে এবার পিয়ে নিই, আও।’

আগে যা ছিল ‘সাগিনার গ্যাং’, এই এক বছরে আমরা তাকে মজদুর ইউনিয়নে পবিগত করেছি। অফিস হয়েছে আমাদের। আমি অফিস সেক্রেটারি। সাগিনা ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, কাজিনন সেক্রেটারি। একটা একজিকিউটিভ কমিটিও আছে। কিন্তু কার্যত সাগিনাই সব।

অতি কষ্টে কিছুটা শৃঙ্খলা আনা গেছে। ইউনিয়নকে কোম্পানি স্বীকৃতি দিয়েছে। মারপিট কমেছে। কথায় কথায় চাক্কা বন্ধও হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি আর অফিস সেক্রেটারিকে ফার্স্ট ক্লাস পাশ দিয়েছে কোম্পানি। হেডকোয়ার্টারে কোনো সিটিং হলে কোম্পানি, হলটিং এলাউন্সও দিচ্ছে। সরকারীভাবে খাতির দেখাচ্ছে সাগিনাকে। সাগিনার মাইনেও বাড়াতে চেয়েছিল। সাগিনা মুখের উপর না বলে দিয়েছে।

বলেছে, আমার একবার মাইনে বাড়িয়ে তো ফায়দা কিছু হবে না, সকলের মাইনে বাড়িও।

আমরা দু' মাস আগে একটা দাবি সনদ পেশ করেছি কোম্পানির কাছে। তাতে অবিলম্বে মজুরদের জন্য নতুন কোয়ার্টার করতে বলেছি। বলেছি, পুরানো কোয়ার্টার সংস্কার করো। অবিলম্বে শতকরা ২৫ টাকা মূল বেতন ও মূল বেতনের অর্ধেক মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি, ওভারটাইম, ছুটি, বদলি, পাশ, চিকিৎসার ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিও করা হয়েছে।

কোম্পানি এই ব্যাপারে নানা অছিলায় টালবাহানা করছে। খালি চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে দু'পক্ষে। আমাদের অফিসে চিঠির পাহাড় দাঁড়িয়ে গেছে।

সাগিনা তা দেখে আর আমাদের ঠাট্টা করে। সে এইসব ব্যাপারে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

বলে, 'বাথকে যতই দুধ গিলাও খুন সে চুষবে। ও শালাদের দাওয়াই না দিলে ওরা আমাদের বাপ বলবে কেন?'

আমি ওকে ট্রেড ইউনিয়নের মূল তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করলে সাগিনা হাঃ হাঃ করে হাসে। বলে, 'এই তো ছ' মাইনা কাবাব হলো। আমরা খেতে চেয়েছি কোম্পানির কাছে। লেकिन মিলল কি? চিঠি এইসব।'

অবজ্ঞাভরে চিঠিপত্রের ফাইলগুলো উলটে দিলে।

বলল, 'দেখ কামবেড, এই পড়া-লিখা খেলায় কাম চলবে না। ছ' মাস ধবে খুটখুট চিঠি লিখছ, ভেবজ। ও শালারাও খুটখুট চিঠি লিখছে, ভেজছে। লেकिन ফায়দা কি হচ্ছে। তোমাদের এই নয়া তবিকায় এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা যাবে না। পুরানা রাস্তা ধবতে হবে। পিটতে হবে শালাদের, চাকা বন্ধ কবতে হবে। তখন দেখবে, শালারা এসে বাপ বলছে। মিটিং বোলাও।'

প্রথমে একজিকিউটিভ মিটিং, পরে জেনারেল মিটিং। দুটো মিটিং-এই ঠিক হলো, একটা চবমপত্র দেওয়া হোক কোম্পানিকে। এক মাসের মধ্যে আমাদের দাবিগুলো যদি না মিটায় তো চবম পস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমরা যেদিন চরমপত্র পাঠালাম সেদিন কি উল্লাস সকলের মধ্যে। ভাটিখানাটা ভরে গেল সাগিনার সাস্কেপাস্‌সয়। অনেক বাত পর্যন্ত মদ খাওয়া চলল। হৈ-হুল্লোড়। ফুটি।

হঠাৎ সাগিনা আমাকে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমি ইউনিয়নের অফিস হওয়া ইস্তক সেখানেই থাকতাম।

সাগিনা বলল, 'দেখ কামবেড, যাব ঘবে খানাপিনার দানাপানি আছে তারা দেরি কবতে পাবে, ধৈর্যও ধবতে পাবে। কিন্তু ভুখা নান্দা মজদুব ধৈর্য পাবে কোথায়! খেতে দাও, পবতে দাও, কাজ নাও। গোলমাল কেউ করবে না। কিন্তু দানাপানি দেবে না, খালি বাত, খালি ওয়াদা, ওতে কাম চলে না। এবাব আথেবি লড়াই হবে। পিছু ফায়সালা। দোসবা বাস্তা আব নৈই।'

বলতে বলতে অফিসে এলাম। দুটো ঘর। একটা অফিস আর একটা আমাব শোবার ঘর। দেখি শোবার ঘরে আলো জ্বলছে।

সাগিনা আমাকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকেই বললে, 'লো, ক্যায়া পছন্দ আসছে?'

উনিশ-কুড়ি বছরের একটা মেয়েকে নিয়ে দেখি বাহাদুর আমাব বিছানায় বসে আছে। মেয়েটি বেশ দেখতে। অনেকটা ললিতার মতো। মিচকি মিচকি আমার দিকে চেয়ে হাসছে। দেখেই আমার নেশা কেটে গেল। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। কান মুখ গরম হয়ে উঠল।

বাহাদুর চোখ টিপে বললে, 'আচ্ছা হায়।'

আমার হতভম্ব ভাব দেখে সাগিনা আর বাহাদুর হাঃ হাঃ করে হেসে ঘর যেন ফাটিয়ে ফেলতে লাগল। সে হাসির ছোঁয়াট মেয়েটিরও লাগল। রিনরিনে গলায় হাসতে হাসতে সে যেন ঘরময় গান ছড়িয়ে দিতে লাগল।

মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমার গায়ে এক বছরে সর্বহারার যে পালিশটা পড়েছিল তা ভেতরকার সেই পাতিবুর্জোয়া ভূতটার গুঁতোয় ছিঁড়ে খানখান হয়ে গেল। ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই দেখি রাস্তা ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছি। একবার মনে হলো পিছনে সাগিনা আর বাহাদুর হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে তাড়া করেছে। মনে হলো, সেই মেয়েটির রিনবিনে হাসি ব সঙ্গীতও যেন আমাকে তাড়া করেছে। কামবেড, কামবেড — কারা যেন চাঁচিয়ে ডাকলও কয়েকবার।

সেই যে ছুটেছিলাম আর থামলাম এসে মহানন্দার ব্রিজের উপর। বেলিং ধরে হাঁফাতে লাগলাম। ঠাণ্ডা বাতাস চোখ মুখ কানকে অনেকটা আবাম দিল। দূরে জমার-বাঁধা অন্ধকারের এক উদ্ভঙ্গ পিণ্ড। হিমালয়। সামনেও যন অন্ধকার। শুকনার ফরেস্ট। নিচে মহানন্দার রূপালী রেখা। উপরে তারাভরা আকাশ। আর অজস্র জোনাকি। ঝিঝি অফুরান সঙ্গীত। তাব মধ্যে পাহাড়ী মেয়ের সেই সুন্দর সরল মুখখানি বার বার আমাব চোখে ফুটে উঠতে লাগল।

হঠাৎ আমার মনে হলো, তাই তো, আমি এমনভাবে পালিয়ে এলাম কেন? মেয়েটাব মুখ, তার সেই মিঠে হাসি আমাকে টানতে লাগল। সেই টানে ঘরের দিকে আবার যখন পা বাড়লাম, তখন রাত শেষ হতে আব বাকী বিশেষ নেই। ঘরের দবজায় এসেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে বইলাম। বুক যেন ফেটে যাবে, ধকধক এমন উত্তেজনা। তারপর সাহস করে, আলতো ভাবে দরজা খুলে দেখি ভেতরে কেউ নেই। হতাশা যেন বুকের মধ্যে কট কবে কামড় বসাল ইঁদুবের মতো। আমি বোকা, আমি ভীতু, আমি পাতিবুর্জোয়া।

মনে পড়ল, আবেকবার এ রকম ব্যবহার করেছিলাম বলে সাগিনা আমাকে ধমকেছিল। বলেছিল, তুমাকে দিয়ে কুচ্ছু হবে না। তুমি আওরাত দেখেই ভাগো, কোম্পানির জাঁদবেল সাহেবদেব মহড়া কি কবে নেবে।

পরদিন বিকালেই খার্সাং থেকে কাজিমিন এসে হাজির। আমাদের পার্টিব ঐ অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার তখন খার্সাং-এ। কাজিমিন স্থানীয় শাখার কর্তা।

কাজিমিন বললে, ‘একটু পবেই কলকাতাব মেল, আব দেবি নয়, চটপট তৈরি হয়ে নাও, কলকাতায় যেতে হবে, জরুরী তলব।’

কাজিমিনকে নিয়ে তক্ষুনি সাগিনার খোজে বের হলাম। সেই ভাটিখানায় গিয়ে দেখি তুমুল উত্তেজনা।

খার্সাং-এর ইউনিট সেক্রেটারি ওয়াংদি এসে গেছে। সে উত্তেজিতভাবে কি বলছে আব মন দিয়ে শুনছে সাগিনা।

ওয়াংদিব কথা বুঝলাম, ঘটনা এবাব পাকিয়ে উঠল। বার্ন বলে একটা বদমায়েশ অফিসারের বিরুদ্ধে আমরা অনেকদিন থেকে নালিশ পাচ্ছিলাম। ব্যাটা কারেজ শপেব অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান। ঘুষ নেয়, মজুরদের যত বকমে পারে জ্বালায়, মেয়েদেরকে উৎপাত করে। ওর বিরুদ্ধে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নালিশ গেছে কোম্পানির বক্সে। কোনো সুরাহা হয়নি। বদলি করার দাবি তুলেছি আমরা, পুনঃ পুনঃ বলেছি, লোকটার কন্যে হয়তো অশান্তি ঘনিয়ে উঠতে পারে। কোনো ভ্রক্ষেপ করেনি কোম্পানি। তাই লোকটার স্পর্ধাও দিন দিন বেড়ে উঠেছে।

কাল রাতে নামগিল বলে একটা মজুরের নাইট জিউটির সুযোগ নিয়ে বার্ন তার ঘরে ঢুকেছিল। নামগিল জানতে পেরে বাসায় ফিরে আসে। তারপর বৌয়ের বিছানায় সাহেবাকে

উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বেদম ধোলাই দিয়েছে। প্রাণটা কোনোমতে আছে তার। তবে হাড়গোড় ভেঙ্গে একেবারে 'দ' হয়ে গেছে বার্ন সাহেব।

ওয়াংদি বললে, 'উসকে বাদ পুলিশ আয়া। নামগিল কো পাকাড় লিয়া, ফাটকমে ডালা। আব হামিলোগ কেয়া করে?'

'হরতাল করো। কাম বন্ধ করো। আউর কেয়া করেরা?'

সবাই সমস্বরে চৈঁচিয়ে উঠল। সাগিনাও।

বলল, 'কাম বন্ধ করো। পিছু দেখা যায়েগা।'

কাজিমন বললে, 'কাজটা একটু বে-আইনি হচ্ছে সাগিনা। আমার মনে হয়, জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে তার ভেঙ্গে দিই। বলে দিই, তদন্ত সাপেক্ষ নামগিলের উপর থেকে কেস উঠিয়ে নেওয়া হোক। ওকে এখন খালাস দেওয়া হোক।'

সাগিনা কাজিমনকে ধমকে উঠল।

বললে, 'রাখ সাথী, তুমি আদমি আছা আছ, পড়িলিখি ভি আছ, লেকিন বেওকুফ। জানরল মানজার কা পাস হামলোগকো যানে হোগা, কিউ ? কি কসুর আমাদেব। এক জানোয়ার আমার ঘরেব ইজ্জৎ নষ্ট করেছে, আমি তাকে পিটেছি। কসুরটা কোথায় ? তোমাব শালা পুলিশ আছে, তুমি আমাকে পাকড়ালে। আখুন আমাদেরও কিছু তাকত দেখাতে হবে। কাল কাম বন্ধ হবে তো জানবল মানজার নিজে আমাদের বাপও বলবে, ফায়সালাও করবে।'

কাজিমন সাগিনাকে অনেকভাবে বোঝালে। বললে, গায়েব জোরের দিন আজ আর নেই কামবেড। হয়তো একটা দুটো লড়াই এভাবে জিততেও পার। কিন্তু আখেরি মামলা এভাবে জেতা যাবে না। তোমাকে ট্রেড ইউনিয়নের বীতিনীতি মেনেই লড়াই জিততে হবে।

সাগিনা বিদ্রূপ করল কাজিমনকে।

'ইয়ার, লড়াই কাগজ-কালিতে হয় না। হাতিয়ার লাগে। ছ' মাহিনা ধরে তোমাব কাগজ-কালির লড়াই দেখেছি। তার নতিজাও দেখেছি। আখুন তুমি আমার হাতিয়ারের লড়াই দেখো। আর তাব নতিজাও দেখো।'

সাগিনা তাবপব টেবিল চাপড়ে বললে, 'সাথীও, পেট ঔর ইজ্জৎ যে শালা কাটবে, তাকেও কাটতে হবে। কাল কাবেজ ডিপার্টকে কাম বন্ধ থাকবে। ফায়সালা যদি তাতেও না হয় পরশু থেকে পুরা লাইন বন্ধ হয়ে যাবে।'

সাগিনার কথা শুনে সবাই উল্লাসে চৈঁচিয়ে উঠল। চকচক করে জ্বলে উঠল ওদের চোখ।

কাজিমন আব আমি বেবিযে এলাম। কাজিমন কিছুক্ষণ কথা বলল না। মুখ বুজে হাঁটতে লাগল।

তারপর বলল, 'এ অবস্থায় এখন থেকে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। চল, কলকাতায় তার করে দিই।'

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা খুবই যোরাল হয়ে উঠল। গোটা লাইনেই ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল।

তখন পুরো যুদ্ধের সময়। শৈলাবাসে গোরা সৈন্যদের ছুটি কাটাবার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কোম্পানি প্রথমদিকে তারই সুযোগ নেবার চেষ্টা করল। সাগিনা-সমস্যার চির সমাধান করবার জন্য দমন নীতির আশ্রয় নিল। ইউনিয়ন বে-আইনী ঘোষিত হলো। আমাদেব নামে খলিয়া বেরুল। সাগিনা আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে তার অনুচরদের নিয়ে গাঢাকা দিল।

কিন্তু আশ্চর্য তার সংগঠনী প্রতিভা। আড়াল থেকে সে ধর্মঘট চালাতে লাগল। একটি মজদুরও কাজে যোগ দিলে না। কোম্পানি একখানি গাড়িও চালাতে পারল না।

এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের পার্টির উচ্চ মহলে ঘন ঘন বৈঠক বসল। সাগিনাব এই আকস্মিক ধর্মঘট আমাদের পার্টিকে একটু অসুবিধা ফেলেছিল। আমাদের শাসকবর্গ ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় আমবা তাদের সমর্থন করার নীতি নিয়েছিলাম। শ্রমিক আন্দোলনকেও আমরা সেই পথে পরিচালিত করছিলাম। গভর্নমেন্টকে চাপ দিছিলাম একটা প্রগতিশীল শ্রমিকনীতি গ্রহণ করার জন্য।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাগিনা এই গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুললে। যদিও সাগিনা আমাদের পার্টি মেম্বার ছিল না, পার্টি-ফার্মি ও বুঝত না, বুঝতে চাইতও না, তবু কার্যত ওর ইউনিয়নকে আমরা আমাদের ইউনিয়ন বলেই চালাতাম।

সাগিনার এই কাজের জন্য পার্টি আমার আর কাজিমনের কাছে কৈফিয়ত তলব করল। আমবা এ ব্যাপারটা ঘটতে দিয়েছি বলে গালাগাল খেলায় নেতাদের কাছ থেকে। জবাব আর কি দেব। আমি তবুও বলেছিলাম, এই বিশৃঙ্খলার জন্য প্রধানত কোম্পানিই দায়ী। হ' মাস কঠোর পরিশ্রম করে আমি আর কাজিমন একটা সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের পবিত্র গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু কোম্পানি সেটা বজায় রাখা কোনো চেষ্টা করেনি। যে অমানুষিক দুর্দশার মধ্যে ওখানকাব মজদুররা দিন কাটায় সে অবস্থার উন্নতি না হলে এ রকম বিশৃঙ্খলা আসা স্বাভাবিক। মজদুরবা খেতে চায়, তাদের খাবার সংস্থান করতে হবে। ভুখা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায়?

বুঝতে পারলাম, সাগিনার কথাই আবৃত্তি হবে চলছে। এও বুঝলাম নেতাবা আদৌ সন্তুষ্ট হলেন না। দুনিয়াব মজদুরেব স্বাধীনতা যেখানে ফ্যাসিস্ট হামলায় বিপন্ন সেখানে সাগিনার অনুচররা খাচ্ছে কি না-খাচ্ছে সেটা তাঁদের চোখে গুঁবত্বপূর্ণ ব্যাপারই নয়। আমবা আদর্শ নিয়ে লড়ছি। আর সাগিনাবা সেখানে থিড়ে, ইজ্জৎ এই সমস্ত স্থূল ব্যাপারে বড় বেশী মাথা ঘামাচ্ছে। নেতাবা ব্রুদ্ধ হতেই পারেন।

আমাদের পার্টির গোপন মিটিং এ ঠিক হলো, ঐ ইউনিয়নের উপর পার্টির কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হবে। তা না হলে পার্টির পলিসি অনুসারে ওটাকে চালানো যাবে না। সিদ্ধান্তটা আমাকে যখন শোনানো হলো, আমি মনে মনে হাসলাম। সাগিনা ছাড়া ওখানে আর কাউকে দাঁত ফোটাতে হবে না।

কিন্তু পার্টি সত্যিই অসাধ্য সাধন করল। কোম্পানি যখন শত চেষ্টাতেও গাড়ি চালাতে পারলে না তখন আমাদের পার্টির শবণ নিল। পার্টি আর কোম্পানির উচ্চ মহলে ঘন ঘন বৈঠক বসল। চুক্তিনামা তৈরী হলো। পার্টির পবামর্শে কোম্পানি সব মামলা তুলে নিল। ইউনিয়নকে আবার স্বীকৃতি দিল।

তবে তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার, বড় মাইনেব একজন লেবাব ওয়েলফেয়ার অফিসারেব পদ সৃষ্টি হলো। আর এই প্রথম কোনো সাহেব নয়, কোনো বাবু নয়, মজদুরদেব আত্মভাজন একজন সত্যিকারের মজদুরকে সেই পদে বসাতে কোম্পানি সীকৃত হল। মজদুরদেব জয়জয়কাব পড়ে গেল।

আমার বুক ফুলে উঠল জয়ের আনন্দে। সমস্ত শ্রদ্ধা লুটিয়ে পড়ল ব্যাবিস্টাব কমবেড বিজন দস্তের পায়ে। তিনিই এই চুক্তিনামার খসড়া তৈরি করেছেন।

শ্রমিকদের যা কিছু কল্যাণ তা কোম্পানিকে করতে হবে লেবাব ওয়েলফেয়ার অফিসারেব পরামর্শমতো। মজদুররা ভোট দিয়ে যাকে পাঠাবে সেই পাবে এই পদ। কোম্পানির কোন্ট্রোল কারচুপি এতে চলবে না।

বস্ত্রাভাষার ময়দানে মজদুরদের বিরাট সম্মেলন হয়েছিল। আমার চোখে সেদিনটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। কমরেড দস্ত ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন

তার বোন কমরেড বিশাখা দত্ত। আমাদের পার্টিতে এমন সুন্দরী কমরেড আর দ্বিতীয় ছিল না। মঞ্চ আলো করে তিনি বসেছিলেন। আর তার পাশে ছিল সাগিনা। বিজয়ী বীরের মতো মাথা উঁচু করে বসেছিল সে। আর তার দিকে ঝুঁকে বিশাখা সারাক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। সাগিনাব শ্রুতি যেন উথলে পড়ছিল।

কমবেড দত্ত সভাপতির ভাষণ দিলেন দেড়ঘণ্টা ধরে। মজদুরদের অনমনীয় দৃঢ়তা ব ভূমী প্রশংসা করলেন। বার বার সাগিনার নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌশল, তাঁর স্বার্থত্যাগেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। উল্লাসে, হাততালিতে মজদুরেরা মগুপ ফাটিয়ে দিতে লাগল। “কমরেড সাগিনা জিন্দাবাদ।” “কমরেড সাগিনা কি জয়।” শুনতে শুনতে কানে তাল্য লেগে গেল আমাদের।

কমবেড দত্ত বললেন, ‘এ জয় শুধু সাগিনাব একার জয় নয়। এটা মজদুরদের সংগ-শক্তিবই জয়। এই রেলের মজদুর তার সংগঠন শক্তিব জোরে যা মালিকদের কাছ থেকে আদায় করেছে ভারতের কোনো জায়গাব মজদুবই তা পারেনি। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আব কোথায় এমন মজদুরদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে? আব কোথায় একজন সাজা মজদুরকে সেই পদে বসানো হয়েছে? কমবেডস, সেই পদের জন্য এইবাব আপনারা একজন আপনারাব লোক ঠিক করুন।’

কমবেড দত্ত বসতে না-বসতে সব হৈ-ঠে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। সূচ পডলে শোনা যায় এমন স্তব্ধতা নেমে এল। মনে হলো কথাটা কেউ যেন ধরতে পারেনি। অমানি বিশাখা মঞ্চের উপব উঠে দাঁড়ালেন। একটা জ্বলন্ত আলো যেন ঠিকবে পডল।

তাঁব মিহি সঙ্গীতময় কণ্ঠ থেকে স্বব বেবল, ‘সাগিনা। কমবেড সাগিনাই আমাব মতে এই পদের সব থেকে যোগ্য।’

‘সাগিনা। হাঁ হাঁ সাগিনা।’

সেই উল্লাল কলবোলে আবাব বাব বাব ধ্বনিত হলো, “কমবেড সাগিনা কি জয়।”

কমরেড বিশাখা দত্ত টেবিলের উপব থেকে এক বিবট মালা তুলে সাগিনাব গলায় পবিযে দিলেন। হুডমুড করে বাহাদুব, ওয়ার্দি, নামগিল, গুরুং আবও যেন কাবা কাবা মঞ্চের উপব উঠে গেল। সাগিনাকে নামিয়ে এনে কাঁধে তুলে নাচতে লাগল।

সারাদিন ছল্লোড চলল। সন্ধ্যাব দিকে কমবেড বিজন দত্ত আব বিশাখা খার্সাঁং চলে গেলেন। যাবাব আগে সাগিনা আব আমাকে বলে গেলেন, পবদিন সকালেই যেন সেখানে চলে যাই। কাজিমন ওঁদের সঙ্গেই গেল।

খার্সাঁং-এ আমরা কমরেড দত্তদের বাড়িতেই উঠলাম। বিশাখা সাগিনাকে খুব খাতিব কবেই ভিতরে নিয়ে গেলেন। দুপুরে কাজিমনও এল। খাবার নেমন্তন্ন কবেছিলেন দত্তবা।

খাবার টেবিলে কাজের কথা উঠল। কমবেড দত্ত সাগিনাকে তাব পদের ওকত্বেব কথা বোঝাতে লাগলেন। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ এটা। মজদুবদের তাবং মঙ্গল, কল্যাণ এখন সাগিনাব হাতে। সাগিনা বিরটি কোয়ার্টার পাবে। সাহেবদের মতো কোয়ার্টার। মজদুববা সাহেবদের তুলনায় কোনো অংশেই যে ছোট নয়, সেটা যেন সাগিনা একবার কোম্পানিকে বুঝিয়ে দেয়। সাগিনাকে একটি অফিসও চালাতে হবে। তবে তার জন্য সাগিনা যেন না যাবড়ায়, কমরেড দত্ত কলকাতা থেকে একটা ভাল সেক্রেটারি পাঠিয়ে দেবেন।

খাওয়া-দাওয়ার পব দেখি সাগিনা খুব গম্ভীর হয়ে গেছে। ভাবছে খুব। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলল না।

জেনারেল ম্যানেজারের বোয়ারা এসে কমবেড দত্তকে একটা চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়ে তিনি সাগিনাকে ডাকলেন।

বললেন, ‘কমবেড, কাল বিকালে বড় সাহেবেব কাছে যেতে হবে। তোমাব আপয়েন্টমেন্ট হবে।’

সাগিনা অনামনস্কভাবে মাথা নেড়ে বলল, ‘আচ্ছি বাত।’

কমরেড বিশাখা সেজেগুজে বেরোলেন তাঁর ঘর থেকে।

জিজ্ঞাসা কবলেন, ‘তোমাদেব কাজ চুকেছে? আমি একবার শৈলাবাসে যাব।’

কমবেড দত্ত বললেন, ‘যাও।’

কমবেড বিশাখা অমনি সাগিনাকে বললেন, ‘কমরেড, যাবে আমার সঙ্গে?’

দেখলাম সাগিনার মুখটা এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

হেসে বলল, ‘জরুর।’

রাত প্রায় নটা নাগাদ সাগিনাবা ফিরে এল। আমি দেখে তো অবাক। সাগিনাকে সত্যিই চিনতে পারিনি। পবিত্রাব সুট পবেছে। টাই বেঁধেছে। নতুন জুতো দিয়েছে পায়ে। ওকে যে এত ভাল দেখতে তা এই এক বছরে কখনো তো টেব পাইনি। কমরেড বিশাখাব এক নতুন সৃষ্টি বলেই সাগিনাকে মনে হলো। দেখলাম দুপুবেব সেই গুমোট ভাবটা কেটেছে সাগিনাব। একটা নতুন ফুর্তিব উদয় হয়েছ ওব মনে। চোখ-মুখ টলটল কবছে।

বিশাখা বললে, ‘দ্যাখো দাদা, আমাদের বীব কমবেড সাগিনাকে এইগুলো আমি প্রেজেন্ট কবেছি। কাল যেন সাহেবেব সামনে সমানভাবে দাঁড়াতে পারি।’

কমবেড দত্তও অবাক হয়েছিলেন একটু, কিন্তু তিনিও খুব খুশি হলেন সাগিনাব এই পবিবর্তনে।

বললেন, ‘সত্যিই কমবেডকে ভাল মানিয়েছে।’

বিশাখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, সাগিনাব অনভাস্ত টাইটা একটু টেনে ঠিক কবে দিলেন।

খুশি হয়ে বললেন, ‘একেবাবে নতুন মানুষ। তাই না।’

হাঃ হাঃ হাঃ কবে এই নতুন সাগিনা সেই পুবনো হাসি ছাড়ল। সেই তাব ঘব-কাপানো হাসি।

সাগিনা লেবাব ওয়েলফেয়ার অফিসাব হবাব পব দু’মাস আমি শিলিগুড়িতে ছিলাম। প্রথমদিকে ঘন ঘন শিলিগুড়ি আসত সে। সঙ্গে আনত কমবেড বিশাখাকে। বিশাখা তাবপব থেকে কিছুদিন খার্সাং-এই থেকে গিয়েছিলেন। এতে সাগিনাব লাভ হয়েছিল। উনিই তাব সেক্রেটারিাব কাজ কবে দিতেন। বোধকবি সহবতও শেখাতেন। তাবপব শিলিগুড়ি আসা তাব কমতে লাগল। কাজ হয়তো বেড়ে যাচ্ছিল।

আমাকে হঠাৎ শিলিগুড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো লালমণিবহাটে। আমি আসবাব আগেই মজদুবদেব বিভিন্ন দাবি-দাওয়াব উপব ভিত্তি কবে এক স্মাবকলিপি সাগিনাব অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সাগিনা সেই দাবিগুলো উণ্ডল কববে বলে জানিয়েছিল।

তবে ভালভাবে কোনো কাজে মন দেবাব আগেই সাগিনাব ডাক পড়ল বিভিন্ন জায়গা থেকে। মুখে মুখে সর্বত্রই সাগিনার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা কাহিনীও প্রচারিত হয়েছিল। আজ মাদ্রাজ, কাল গুজবট, পরগু বিহাব — এমনি কবে তাকে যোবানো হচ্ছিল। কানপূব, ঝবিয়া, টাটানগর, আমেদাবাদে ঘটা কবে সংবর্ধনা জানানো হলো ওকে। শুনেছি প্রায় প্রত্যেকটি জায়গাতেই বিশাখা ওব সঙ্গে ছিলেন। আমাদের নিখিল ভাবত মজদুব ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হলো সাগিনাকে।

দেড়টি বছর সাগিনা শিলিগুড়ি-ছাড়া।

আর এই দেড় বছরেব মধ্যে শিলিগুড়ির ইউনিয়নে দলাদলি শুরু হয়ে গেল। কাজিমনেব কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পেতাম। কাজিমন বড় বিব্রত বোধ করেছিল। সবাই

জানত ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাদের লোক। মজদুরদের অভিযোগ পুঞ্জীভূত জমে উঠেছিল। কোম্পানিকে কিছু বলার উপায় নেই। সে সাগিনাব অফিস দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায় সাগিনা?

কাজিমন পার্টি অফিসে এ সম্পর্কে লিখে লিখে হুদ হুদ হয়ে গেল। পার্টি অফিস থেকে জবাব আসে, কমরেড সাগিনাকে পার্টিরই বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োগ করা হয়েছে। সে সাবা ভারতের মজদুরকে সংগঠন করেছে।

শেষে এক ইউনিয়ন তিন ইউনিয়ন হয়ে গেল। তার একটা ইউনিয়ন অবশ্য কাজিমনেব দখলে থাকল। আর সেটা পুরোপুরি আমাদের পার্টিরই লেবার ফ্রন্ট হয়ে দাঁড়াল। আব দুটো অংশ অন্য দুটি পার্টির কবলে চলে গেল।

সাগিনার নামে নানা বদনাম বেবতে লাগল। গুৰুং, দলবাহাদুর, ওয়াংদিরা পর্যন্ত সাগিনাব শত্রু হয়ে উঠল।

এদিকে ইউনিয়নে ইউনিয়নে বেশ মানামবি দাঙ্গা চলতে লাগল।

অবস্থা ওখানে যখন এমনি চবন, তখন পার্টি আমাদের নির্দেশ দিলে, শিলিগুড়ি যাও। কাজিমন পার্টি ছেড়ে দিয়েছে। ইউনিয়নে ফিফথ কলাম ঢুকেছে। ধর্মঘট কবতে চায়। সেটি প্রতিবোধ কবতে হবে।

শিলিগুড়ি ফিবে এসে ব্যাপাব দেখে আমরা তো চক্ষুস্থিৰ। অফিস উঠে গেছে। আমাদের সমর্থক বলতে কেউই প্রায় নেই। খার্সাং গেলাম। দেখি কাজিমন ভেঙে পড়েছে।

কাজিমন বলল, 'এখানকার কাম খতম। বিলকুল খতম। সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভাই। জোড়া দিবে কি দিয়ে?'

বললাম, 'কেন, সাগিনা আছে। তাকে আনব। পাবলে সে-ই পাববে।'

কাজিমন হতাশ হয়ে বলল, 'একদিন সে পাবত। আজ সেও পাববে না। আমরা তাকে খতম কবে দিয়েছি।'

কাজিমনেব কথা বুঝতে পাবলাম না। আমরা খতম করেছি মানে কি?

মানে কাজিমন নিজেই বলল।

'দেড় বছর আগে শিলিগুড়িতে যে সম্মেলন হয়, সেইখানেই খতম করেছি সাগিনাকে। কমরেড, তখন আমরা একটা খটকা লেগেছিল। কোম্পানি এত সহজে এ-বকম একটা দাবি মেনে নিচ্ছে, ব্যাপাব কি? তাবপব ভাবলাম, যুদ্ধেব সময় আছে। সবকান হয়তো চাপ দিয়েছে তাই কোম্পানি মেনেছে এই দাবি। কিন্তু ক'মাস পবেই আমরা ভুল ভাঙল। তুমিও এখান থেকে চলে গেলে আব পার্টি আমাদের চাপ দিতে লাগল ইউনিয়নকে পার্টির উইং কবে ফেল। ইউনিয়নেব মেম্বারদের পার্টি মেম্বার কব। ওখানে পার্টির শত্রু ঘাঁটি চাই — যত বলি — ইউনিয়নকে পার্টি কবা যাবে না, ভেঙে যাবে ইউনিয়ন — মজদুরের সংহতিতে ফাট ধববে — মজদুরেব তাকত দুবলা হয়ে পড়বে — কিন্তু কে শোনে। একদিন কলকাতা থেকে তলব এল। গেলাম। কমরেড দত্ত কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, সাগিনাব প্রভাব কমেছে না বেড়েছে! আমি তাঁব কথা ধরতে পারিনি। সবলভাবে বললাম, সাগিনাকে শিলিগুড়ি থেকে এতদিন বাইরে রাখা ঠিক হয়নি। সাগিনার বিরুদ্ধে নানা প্রচাব চলেছে। তার ফলে প্রভাব তো কমবেই।'

কাজিমন বলল, 'কমরেড দত্ত কি বললেন জানো?'

আমার পান্টা প্রশ্ন শোনবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কাজিমন।

তারপর বলল, 'কমরেড দত্ত বললেন, সাগিনা নয়, ওখানে থাকবে পার্টি। সেইটেই গড়ে তুলুন।'

কাজিমন আবার চুপ করল।

তারপর আপন মনে বলল, 'জেলে পাঠিয়ে যা না করা যেত, সাগিনাকে হিরো বানিয়ে তা করা গেল। কিন্তু ফায়দাটা হলো কি?'

কাজিমন আমার বন্ধু। খুব সত্যনিষ্ঠ কর্মী। কিন্তু সত্যি বলছি, সেদিন ওর কথা আমি বিশ্বাস করিনি। এ কি হতে পারে?

পাঁচদিন ধরে শিলিগুড়িতে ঘুরলাম। পুরনো বন্ধুরা সব জড় হলো সেই ভাটিখানায়, শুধু সাগিনা নেই। খবর পেয়েছি সে এখন বোম্বাইতে। তাকে আন্তর্জাতিক শ্রম সমাবেশে পাঠানো হয়েছে।

গুরুংকে বললাম, 'সার্থী, সবাই একাঠা না হলে ধর্মঘট করলে তো মরবে। তোমাদের ইউনিয়ন তো ভাঙা। লীডার কই?'

গুরুং মদ খেয়ে টং হয়ে ছিল।

বলল, 'তো কি করব? লীডার শালা তো ছিল, তো শালা দালাল বনে গেল। শালা সাহেব হয়ে গিয়েছে। বড় মকানে থাকে। বিবি নিয়ে রংবাজি কবে। তা কি করব। ভুখা মরব। জরুর চাক্কা বন্ধ হবে।'

'হাঁ হাঁ, হবে হবে।'

মাতালগুলো হিংস্র আক্রোশে চীৎকার করতে লাগল।

পরদিন সকালে স্টেশনে গিয়েছি। দেখি সাগিনা। পুরোদস্তব সাহেব।

আমাকে দেখে ডাকল, 'আরে কামবেড, তুমি? তুমি কোথা থেকে?'

বললাম, 'লালমগিরহাট থাকি। এখানে এসেছি দিন দশ-বারো।'

বেস্টুরেন্ট ঘবে নিয়ে গেল আমাকে। সাগিনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খবর কি, কমরেড?'

ওকে এমন সময় এখানে দেখব আশা করিনি। মনে হলো যেন বিধি-প্রেরিত।

সাগিনা বলল, সে পালিয়ে এসেছে বোম্বাই থেকে।

বলল, 'ভাল লাগে না। কি মিটিন-ফিটিন। ফালতু ঝামেলা। এত বাত কবে কি কাম হবে? আরে সংগঠন বানাও। আপনা হাতমে পাওয়ার লে লো। তবু শালা মালিক মজদুরকো বাপ বলবে। হ্যাঁ?'

'তারপব,' সাগিনা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি কাম এখানে?'

বললাম, 'তোমাদের রেল স্ট্রাইক হবে, জান না?'

'স্ট্রাইক হবে।' সাগিনা বিস্মিত হলো। 'কবে?'

'আজ বিকালে তো বস্তিবাজারে মিটিং আছে। ঠিক হবে।'

'আজ্ঞা?' অবাক হয়ে গেল সাগিনা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, তুমি জান না কিছু?'

সাগিনা কি যেন ভাবছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি জান না?'

এবার সে বলল, 'এখানে কি থাকি যে জানব। ঘুরতে ঘুরতে সত্যনাশ হয়ে গেছে। তবে কারোয়ই ঠিক হচ্ছে। চাক্কা বন্ধ আর একবার হওয়া দরকার। শালা কোম্পানি এক নম্বব দাগাবাজ আছে। দেড় সাল পুরা হয়ে গেল শালার সিমেন্ট মিলছে না। কোয়ার্টার করবে কুলিদের, কন্সট্রাক্টর মিলছে না। খালি ঘুরাচ্ছে। শালা ঝুট।'

সাগিনা ঝুঁকে পড়ল আমার সামনে।

বলল, ‘দেখো কামরেড, আমার মালুম হচ্ছে কি, এইসব ওয়েলফ্যার উয়েলফ্যেয়ার এসব বিলকুল খোঁকাবাজি আছে। আমাকে দিয়ে এ কাম আর চলবে না সাথী। আরে আমি ভাল কোয়ার্টারে থাকব তো তামাম মজুরদের ভালাই হবে? ধুর। সব গলত বাত। আমার মতুন কোয়ার্টার সব কো দো, আচ্ছা খানা দো। পুরা কাম লো। কোই শালা হুজুং করবে না। আমি খাটতে খাটতে খুন পসিনা ঢেলে দিব আর উসকে বদলা তুমি শালা দিবে শুখা বাত আর ঝুঠা ওয়াদা। ইসব তো জিন্দগী ভর চলে না। ঠিক হয়, চাক্কা বন্ধ করনা ঠিক হয়। লেবিন করবে কে?’

সাগিনাকে বোঝালাম তখন অবস্থাটা। বিশদ বিবরণ দিলাম। বললাম, ইউনিয়ন নেই। নিজেদের মধ্যে মারামিবি। এই অবস্থায় পাগলেব মতো ওরা স্ট্রাইক করতে যাচ্ছে। সব খবব ওকে দিলাম। শুধু বললাম না কাজিমন যা বলেছিল, আব বললাম না গুরুংরা ওর সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কবে।

সব শুনে সাগিনা বলল, ‘তবে তো আখুন চাক্কা বন্ধ চলবে না। আগে সংগঠন পাক্কা কবতে হবে। ঠিক হয় কামবেড, তুম ফিন হিয়া আ যাও। এসি ইউনিয়ন ফিন বানাতে হবে। আমিও আসব। এ শালার নোকবি হাম সে নেই চলেগা।’

শুনে খুব ভাল লাগল আমার।

বললাম, ‘তবে চল, বস্তিবাজারে যাই, সেখানে মিটিং আছে। তুমি বলবে চল। তোমাকে পেলে আবার সব ঠিক হবে।’

‘হাঁ হাঁ।’

জিজ্ঞাসা কবলাম, ‘তোমার সে কামবেড কোথায় গেল?’

‘কৌন?’

বললাম, ‘কমবেড বিশাখা।’

হাঃ হাঃ হাঃ নবে হেসে সাগিনা বলল, ‘আরে উও তো আউর জেণ্টিলম্যান আছে। মজদুবেব সাথে হাঃ বঃদিন থাকবে। উও ভি ছুট গিয়েছে। যেতে দাও। জিন্দগি থাকবে তো আউব ভি আওবাত মিলবে।’

কিন্তু সেইদিনই যে সাগিনার জীবন যাবে বুঝতে পারিনি।

বস্তিবাজারের সভায় গিয়ে বুঝলাম, কাজিমনের কথা কত সত্যি।

সাগিনা আমাকে বলেছিল, সে ঠিক সময়ে হাজির থাকবে মিটিং-এ। কিন্তু আমি সন্ধ্যার মুখোমুখি মিটিং এ গিয়ে যখন হাজির হলাম, তখনো সাগিনা সেখানে যায়নি। আমার মনে নতুন কবে আশা জন্ম নিছিল। সাগিনা বুঝতে পেরেছে যখন, তার মোহ ভেঙেছে যখন, তখন আর ভয় নেই। সাগিনার ব্যক্তিত্ব সমস্ত বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবে। এই টুটা-ফুটা সংগঠনকে আবার সে জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করাবে।

জানি, আমার এ মনোভাব পার্টি ববদান্ত করবে না। কিন্তু পার্টির নেতারা এই জায়গা চেনেন না, এই লোকগুলোকে জানেন না। তাই সাগিনাকে সরিয়ে নিয়ে একটা ভুল করেছেন। আমি সেই ভুল শুধরে দেব।

মিটিং শুরু হবার পব থেকেই একটা হট্টগোল চলছিল। উত্তেজনা বাড়ছিল। কোনো বিষয়েই নিজেরা একমত হতে পারছিল না। আর পারছিল না বলেই রাগ চড়ছিল ওদের। খালি গালাগালি করছিল ওরা।

হঠাৎ সাগিনা এসে পড়ল। প্যান্ট কোট টাই পরা সাগিনা। তবে ওব পোশাকের জলুস অনেক চটে গেছে। চোখমুখ দেখে মনে হলো, টেনে এসেছে বেশ। মাথার চুল এলোমেলো। বোধ হয় খুব ঘুরেছে সারাদিন।

আমি ওকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে যাবার আগেই সাগিনা বস্ত্রদের টেবিলেব কাছে এগিয়ে গেল।

ওকে দেখে হট্টগোল থেমে গেল। সভাস্থল নিশ্চুপ।

সাগিনা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কেয়া মামলা হায়, সাখীও?’

সবাই চুপ।

‘কিসকা মিটিং?’

হঠাৎ বাহাদুর চৈচিয়ে উঠল, ‘নিকালো শালে গদ্দাব। ভাগো হিয়াসে।’

কী সুতীত্র বিদ্রোহের জ্বালায় যে বাহাদুরের চোখ দুটো জুলজুল কবে উঠল, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ও দুটো যেন ঘৃণার লিকলিকে ছুরি। আমি শিউরে উঠলাম। এই সেই বাহাদুর! সাগিনার সব থেকে অনুগত অনুচব। সাগিনাব কথায় আমার যবে একদিন একটা মেয়ে এনে হাজির করেছিল।

বাহাদুরেব কথা থামতে না থামতে ঘৃণা, বিদ্রোহ চারিদিক থেকে যেন মুঠো মুঠো কবে সবাই সাগিনাব মুখে ছুঁড়ে মাবতে লাগল। দেখলাম সাগিনা ভাবাচাকা খেয়ে গেছে।

কুখলাম, যা দেখেছে তা যেন বিশ্বাস কবতে পাবছে না। আমিও বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না।

‘ভাগো ভাগো ভাগো। শালা দলাল। কুন্তিকা বাচ্চা আব সাহাব বন গিয়া হায়।’

‘দেখ শালে,’ গুরুং কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল সাগিনার দিকে। বললে, ‘দেখ শালে, কায় হালত হয়া হামলোগকা। না খানা মিলা, না পহেন্না। আউব তু বড়ে সাহাব বন গায়া। শালে কো মুহমে থুক ডাল।’

থুং করে থুথু ছুঁড়ল গুরুং।

সাগিনা চৈচিয়ে উঠল, ‘ভাইও, সাখীও —’

তার গলা ডুবে গেল তুমুল কোলাহলে।

‘মার ডাল শালাকো। পিটো।’

কে যেন চৈচিয়ে উঠল। স্তরপব মুহূর্তেব মধ্যে উন্মত্ত জনতা কাঁপিয়ে পড়ল ত্রাব উপর। কিস ঘুঁষি লাথির উত্তাল তবঙ্গে সাগিনা খাবি খেতে লাগল। কতবাব উঠতে চেষ্টা করলো, কতবার চেষ্টা কবল কথা বলতে। কিন্তু বৃথা। সেই প্রচণ্ড মাবেব বেগ তেলে সাগিনা না পারল মাথা তুলতে, না পারল টু শব্দ কবতে।

ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে উঠল যেন। ক্রোধের, ঘৃণার এমন উন্মত্ত রূপ আমি আব কখনো চোঁখে দেখিনি। আমি থরথর করে কাঁপছি তখন। সাগিনা হঠাৎ নিদারুণ আতর্জনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনেব ভিতব কে যেন বলে উঠল, পালাও। আমি দ্বিধাদিক হারিয়ে দিলাম দৌড়।

ভাটিখানার মালিক নাকছেদি সাগিনাব অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে, আমি আর পাঁচ-সাতজন আমাদের দলের লোক নিয়ে যখন ফিরে এলাম বস্ত্রবাজারে, তখন রাত প্রায় নটা ঝেঁজেছে। হিমালয়ের পাদদেশের রাত, তাই মনে হচ্ছে যেন বারোটা। খেলা মাঠে চিত হয়ে পড়ে ছিল সাগিনা। একা। তার সুট টাই ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে। মাথা ও-কপাল ফাটা। রক্ত চাপ চাপ হয়ে রয়েছে সারা গায়ে।

না, মরেনি। ধরাধরি করে ভাটিখানায় এনে তোলা হলো ওকে। দু'তিন ঘণ্টা পরে জ্ঞান হলো। উঃ আঃ কিছু করল না সাগিনা।

নাকছেদি ওকে মদ খেতে দিলে। ঢকঢক বোতলটা শেষ করে ফেলল। তারপর বসে বসে হাঁপাতে লাগল।

একটু পরে বলল, থেমে থেমে বলে চলল, 'আমাকে পিটেছে। খুব পিটেছে। কিন্তু ঠিক করেছে। বুঝতে পারছি, বেইমানি আমি করেছে। পুরা সমঝ গিয়া হ্যায হাম।'

'লেবিন কামবেড,' আমাৰ হাত চেপে ধরল সাগিনা। বলল, 'এক ধোঁকাবাজিতে আমি ফেসে গিয়েছিলাম। আমি তা বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, মজদুরের ভাল কবাব নাম করে আমি খালি মজা করে কাটিয়েছি। খালি বান্দবনাচ নেচেছি। কি আফসোস।'

সেই সাগিনার শেষ কথা। পবদিন শুকনা ফবেস্টে তার রেল-কাটা দেহটা পাওয়া যায়। বেল লাইনেব পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। কেউ বলে — সে খুন হয়েছে, কেউ বলে — আত্মহত্যা করেছে।

নন্দিতা

বাণী বসু

‘শুনছো? শুনছো? ওঠো না গো একবার!’ মাঝরাতিরে নন্দিতার ঠেলাঠেলিতে ঘুমটা একেবারে কাচের বাসনের মতো খানখান হয়ে গেল।

‘হলটা কী?’ ধড়ফড় কবে উঠে বসল শুভেন্দু। বাইবে মুম্বলধারে বৃষ্টি পড়ছে। জানলাগুলো বেশির ভাগই বন্ধ। তা সত্ত্বেও ধারাবর্ষণেব তুমুল শব্দ কাচ কাচ সমস্ত অনায়াসে ভেদ করে ফেলছে।

ভোতা, ভাবী শব্দ একটা। ভবা শ্রাবণের মধ্যরাত। জ্বালাময় মাঝ-বর্ষাব দিনাবসান। ধবিত্রীবও। তাব বুকে অবিরাম জীবন ধারণেব লড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলিবও। অস্ততপক্ষে শুভেন্দুশেখরেব তো বটেই। গতকাল সকালের ট্রেনেই ফিবেছে, তিনদিনেব ঝটিকা ট্যাব সেবে, তাবপব গেছে অফিস। সেখানে ট্যাব-ক্রান্ত বলে কোনও বিশেষ বিবেচনা স্ব্যাবতই মেলেনি। সন্ধেয বাড়ি ফেবাব লগ্ন থেকেই ঘুমটা আসছিল নেশার মতো। একটা চমৎকাব আমেজ, তাকে আবও চমৎকারভাবে জমিয়ে দিল বেশি-করে গাওয়া ঘি-ঢালা নাতিগাঢ় মুগের ডালেব খিচুড়ি আর পাটিসাপটাব মতো কি জানি কিসের পুরভবা দুর্দান্ত ওমলেট। বর্ষারাতের সেই জমজমাট ঘুম এইভাবে কেউ ভাঙায়? ঠেলে, ঠেলে। অল্প ঠেলায হল না দেখে ধাঁই ধাঁই কবে রামধাক্কা মেবে?

‘শুনতে পাচ্ছে না?’ নন্দিতা কাঁদো-কাঁদো গলায বলল।

‘কী শুনতে পাবো?’ ঘুমে ভারী, বিরক্ত গলায শুভেন্দু বলল।

‘কুকুরটা কী ভীষণ কাঁদছে!’ অন্ধকাবে মনে হল নন্দিতাও কাঁদছে। গলাব স্বরটা যেন আধা-বিকৃত।

অবিরাম বর্ষণের ভাবী আওয়াজ ভেদ কবে এই সময়ে কোনও কাতর চতুষ্পদ প্রাণীব ডাক শুনতে পাওয়া গেল। করুণ সাইরেনেব মতো ধাপে ধাপে সুরে চড়ল ডাকটা, তাবপর ত্যাবার খাদে নেমে এলো। কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ অতঃপব ভিন্ন বাগিনীতে শুব হল আলাপ।

‘ঘুমোতে না পারো, একটা কাম্পোজ খেয়ে শুয়ে পড়ো,’ শুভেন্দু আবার ঝুপ কবে শুয়ে পড়ল।

‘ঘুমোতে না পাবার কথা হচ্ছে না’—নন্দিতা আর্ত গলায বলে উঠল—‘কুকুরটা যে ভয়ানক কাঁদছে। ওকে এই দারুণ বৃষ্টিব মধ্যে ছাদে বেঁধে রেখে দিয়েছে। তা ছাড়া...’ নন্দিতার কথা শেষ হল না, শুভেন্দু প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, ‘তো আমি কী করবো?’ কথাগুলো কেটে কেটে প্রত্যেকটাতে বেশ খানিকটা বাগ ভরে ভরে সে বলল। কদিন ধরে এ এক মহা উৎপাত শুরু হয়েছে। তাদের দোতলা বাড়ির পরেই একটা ছোট জমি ঘেরা পড়ে আছে। তারপূর এক পুলিশ ইনসপেক্টরের বাড়ি। ভদ্রলোকের খুব জন্তু-জানোবারের শখ। খরগোশ, গিনিপিগ থেকে আরম্ভ করে ছাগল, গরু এমন কি বাঁদর পর্যন্ত পোষা হয়ে গেছে। তা পুষুন,

কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু পোষা প্রাণীগুলোর কোনও যত্নই ওঁরা করেন না। খরগোশ, গিনিপিগগুলোকে গুণ্ডাগুলো এসে এসে খতম করে গেল। ছাগলিটা যে কদিন দুধ দিল, দিল। তারপর ভদ্রলোক স্বহস্তে তাকে কেটে খেয়ে ফেললেন। গরুটা বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে দিবারাত্র হাষা হাষা করত, গলার দড়ি কখনো খোলা হত না, তা কী গতি হল তাদের কারুরই জানা নেই। আর বাদরটার লক্ষ্য ছিল এ পাড়ার যতেক গৃহস্থ-বাড়ি। নিজের মালিকের কাছ থেকে যথেষ্ট খেতে পেত না কিনা কে জানে, কিন্তু পাড়ার হেন বাড়ি নেই যেখান থেকে সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভোজ্য সংগ্রহ না কবেছে। ক্লাইমাক্স হল শুভেন্দুর শার্ট পাঞ্জাবি বোতাম ভক্ষণ। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। পুলিশের দারোগা, ওরে বাবা, বাঘে ছুঁলে আঠারো যা। তবে ইদানীং ভদ্রলোক যা শুরু করেছেন সতিই সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। একটাব পব একটা দারুণ সুন্দর, দামী কুকুর আনছেন আর অযত্ন-অবহেলা দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই মেরে ফেলছেন। শুভেন্দু আর অতশত জানবে কোথেকে, নন্দিতাই জানায়। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রাণপণে ইশারা করে শুভেন্দুকে ডাকে—“দেখো দেখো দেখে যাও।” দারোগার বাড়ির উঠানে একটা ছোট ডোল, তাতে গিল্লি এটো কাঁটা সব এনে ফেলে দিলেন, তারপরেই ডাক দিলেন, ‘আঃ আঃ টমি, আঃ আঃ!’ আপাদমস্তক টান-টান চব্বিশ পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু একটা গ্রে-হাউন্ড অপরূপ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। ভদ্রমহিলা তাকে এঁটোকাঁটাগুলো খাওয়াবার জন্যে ক্রমাগত তাড়না করছেন, আর অভিজাত বংশীয় গ্রে-হাউন্ডটা ক্রমাগত তার লম্বা সরু চকচকে মুখটা ফিবিয়ায় নিচ্ছে। গ্রে-হাউন্ডটা বোধহয় মরে গেল তবু পাত-কুড়োনা মুখে দিল না, এবং কুকুরটা মরে গেল তবু তার মালিকবা তাকে তাব যোগ্য খাদ্য দিলেন না। একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল গেল আপাদমস্তক যা হয়ে। চুলকোতে চুলকোতে কুকুরটা যেন ক্ষেপে যেত একেক সময়ে। সাবা শরীর থেকে খাবলা খাবলা লোম উঠে, দগদগে যা নিয়ে একদিন প্রচণ্ড লাফিয়ে উঠে সামনের খাবায় মুখ দিয়ে শুয়ে পড়ল, উঠল না আর। কোথা থেকে ভদ্রলোক এতো সুন্দর সুন্দর পেডিগ্রি-ডগ জোগাড় করেন কে জানে। পুলিশের লোক, কোথা থেকে আব! মিনি-মাগনা পায় বলেই বোধ হয় আবো এতো অচ্ছেদা। কী জিনিস পেয়েছে জানেই না। লেটেস্ট হচ্ছে একটা ডালমেশিয়ান। অপকপ কুকুর। নন্দিতা জানলার কাছ থেকে নড়েই না—‘দ্যাখো দ্যাখো, কী সুন্দর ঘুবে বেডাচ্ছে।’ সাদার ওপর কালো কালো গোল গোল ছিট, আবাব ভালো চামড়াব কলাব, এবাব বোধহয় দারোগার মক্কেল কলাব সুদুই উপহার দিয়েছে। কুকুরটা খুব সম্ভব পূর্ণবয়স্ক। পোষ মানতে চাইছে না। পোষ মানাবার উপায় হিসেবে দাবোগাবাবু থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করছেন। ‘টমি—কাম হিযাব।’ ভদ্রলোকেব সব কুকুবই টমি। টমি আসছে না, লম্বা হিলহিলে চাবুকের বাতাস কাটার শব্দ সুইশ্শ্শ্। নন্দিতা কানে আঙুল চেপে বসে পড়ে। ‘টমি, সিট ডাউন।’ এবাবও টমি আসছে না, আবাবও চাবুক নামছে। এবার নন্দিতা জ্ঞানশূন্য হয়ে জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে—‘অ মেসোমশাই, মেসোমশাই’ তার তীক্ষ্ণ সরু গলাও ভদ্রলোকেব মোটা কানে পৌঁছতে দেবি হচ্ছে। অবশেষে অবাক হয়ে দারোগা মেসোমশাই মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কন্মিনকালেও নন্দিতা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মাসি-বোনঝি সম্পর্ক পাতায়নি। অতএব অবাক।

‘মারবেন না, প্লীজ, অমন করে মাববেন না!’ আকুলি-বিকুলি করতে থাকে নন্দিতাব চোখের কোলে টনটলে জল। অতশত হয়ত দেখতে পাচ্ছেন না মেসো, কিন্তু কেমন হতবুদ্ধি হবেই হাতের বেতটা ফেলে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন। উঠান ছেড়ে ভেতবে। ঘরের আশ্রয়ে।

সেই অব্যাহ ডালমেশিয়ানেরই এখন এই দুর্গতি হয়েছে। দোতলাব ছাদে উপবৃত্ত বৃষ্টির তলায় আশ্রয়হীন। কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে তার উপায় নেই। বাঁধা। নন্দিতা

অনেক কষ্টে চোখের জল চাপতে চাপতে বলল, 'তুমি তো কদিন ছিলে না, জানো না। রোদে জলে ওকে একভাবে বেঁধে রেখে দায়। নিজেরা নিশ্চিত্তে যাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে। আমরা ঘুমোতে পারছি না। খাবার মুখে রুচছে না। ওদের দেখো হেল-দোল নেই।' কেঁউ কেঁউ, আবার বৃষ্টি ছাপিয়ে কুকুরের ডাক ভেসে এলো। নন্দিতা বলল, 'ওর নিশ্চয় অসুখ করেছে, খুব কষ্ট হচ্ছে, ওগো যাও না একবার প্লীজ।'

শুভেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওদের পাড়ায় সবাই ভয় পায়, এড়িয়ে চলে, আমি মাঝখান থেকে কুকুর ডাকছে বলে এই রাত্তিরে গিয়ে কমপ্লেন করবো?'

'ওহ বুঝতে পারছো না, কুকুর ডাকছে বলে নয়!' নন্দিতা বলল। যেন কদ্ধ হয়ে যাবে, 'কুকুরটা কষ্ট পাচ্ছে বলে! বৃষ্টিতে! রোগে! ...' সে আব কিছু বলতে পাবে না, ঝবঝব কবে কাদতে থাকে।

শুভেন্দু বলে, 'একটা কুকুর কষ্ট পাচ্ছে বলে, এই দুর্খোগের রাত্তিরে তুমি আমাকে বাড়ি-ছাড়া করবে? জানো কত জন্তু-জানোয়ার, জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে কত মানুষ নিবাস্রয় ঠিক এখন, এই মুহূর্তে। বৃষ্টিতে উড়ে গেছে কার খডো চাল, জল জমে ভেসে গেছে গেরস্থানি।'

শুভেন্দুর কথা শেষ হল না, হঠাৎ নন্দিতা দড়াম করে এক লাফ দিল বিছানা থেকে মাটিতে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দবজার খিল নামাল। তারপর বাইরে বেবিযে গেল।

অগত্যা শুভেন্দুকেও উঠতেই হয়। খোঁজ কোথায় টর্চ, কোথায় বর্ষাতি, কোথায় ছাতা! নিচে নেমে সে অবাক হয়ে দেখল সদর দরজা খোলা। হু হু করে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকছে। নন্দিতা এই রাত্তিরে দেড়টায় জলের মধ্যে একাই বেরিয়ে গেছে।

কোনক্রমে বর্ষাতি টর্চ আব ছাতা সামলাতে সামলাতে প্রতিবেশীর বাড়ির দবজায় সে যখন পৌঁছল ততক্ষণে সে বাড়ির দরজাও খুলে গেছে। চৌকাঠের এপারে সোঁপাটে ভিজ়ে নন্দিতা, ওপারে টর্চ হাতে লুপ্ত-পরিহিত ডুঁড়িয়াল দাবোগা, 'দোহাই আপনাব, কিছু করুন, কিছু করুন মেসোমশায়, কুকুবটা যন্ত্রণায় কাতবাচ্ছে, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে ওর, কিছু করুন।'

দারোগা বললেন, 'আপনি তো আচ্ছা জাঁহাবাজ মহিলা দেখছি। আমার স্ত্রী বলেন বটে জানলা থেকে যখন তখন স্পাইং করেন, আমার কুকুর, আমি মারি কাটি আপনাব কী? ইয়ার্কি পেয়েছেন?' শেষ কথাটা উনি শুভেন্দুর দিকে চেয়ে বললেন।

শুভেন্দুর ভেতরটা বাগে জ্বলে যাচ্ছে নন্দিতার ওপরও, দাবোগাব ওপরও। সে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, 'আসলে কী জানেন, আমার স্ত্রী কুকুব ভীষণ ভালোবাসে, একটু দেখুনই না! এতো করে বলছে যখন!'

কড়া চোখে তার দিকে তাকিয়ে দারোগা হাঁক দিলেন—'হাক, হাক, ঢাপলা। ছাতা নিয়ে একবার ওপরে যা দিকনি, দ্যাখ তো টমিটা কেন এতো চোঁচাচ্ছে!' দুটো ছায়ামূর্তি ছাতা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে দেখা গেল। দারোগা বললেন, 'দেখুন মশাই, এক পাড়াতে থাকি, বিপদে-আপদে নিশ্চয় একে অপরের সহায়। কিন্তু পরের ব্যাপাবে খামোখা এভাবে নাক গলালে মেয়েছেলে বলে মান রাখতে পারবো না। আসুন আপনাব! আসুন এবার ..।' গলাটা শেষের দিকে আরও কড়া।

এই সময়ে একটা ছায়ামূর্তি টর্চের আলোর বৃত্তের মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে পরম সজ্জাবের সঙ্গে বলল, 'বাবা, টমি আর চোঁচাচ্ছে না, কেমন দাপাচ্ছিল, কাটা পাঁটার মতো, এখন চুপ করে শুয়ে পড়েছে।'

নন্দিতা ফিসফিস করে বলল, 'মরে গেছে।' সে স্থলিত পায়ে পেছন ফিরে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। বৃষ্টিতে ভিজ়ে শাড়ি পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দড়াম করে আছাড় খেল

একটা। শুভেন্দু তাকে তুলে ধবে, কোনমতে বাড়ি নিয়ে আসে, সেই রাতে গরম জল করে ব্র্যান্ডি দিয়ে খাওয়ায়, পবদিন সকাল না হতেই টেট-ভ্যাকের খোঁজে ছোট্টে। হাঁটুর কাছে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। দুটো স্টিচ। সে এক কাণ্ড।

নন্দিতা ডাকসাইটে কুকুর-প্রেমিক বলেই যে এমনটা ঘটল তা কিন্তু নয়। নন্দিতা কুকুর দেখতে ভালোবাসে, পুষতে মোটেই নয়। সে কোনও জন্তু-জানোযাব পাখি-টাখি পোষবার আদৌ পক্ষপাতী নয়। ওসব আবদার তার নেই। বলতে গেলে কোনও আবদারই তার নেই। আপন খেয়ালে বই পড়ত, ক্যাসেট-ফিল্ম নিয়ে থাকে, ভালো ভালো রান্না কবে, করে দু পক্ষের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ায়। খুব মিশুক। যেখানে যায় হেসে, গল্প কবে, মজা করে একগাদা বন্ধু বানিয়ে ফেলবে। এরকম একটা স্টীমার-পার্টির জমায়েতে হাসি-খুশি উচ্ছল স্বভাবের প্রাণবন্ত মেয়েটিকে মাস্তুল ধরে পাক খেতে খেতে একটাব পব একটা কবিতা আবৃত্তি করতে দেখেই একেবারে ঘাড়মোড় ভেঙে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল শুভেন্দু। আব বিয়েব পর তো নন্দিতা একটা অভিজ্ঞতা! এতো স্বতঃস্ফূর্ত তাব আবেগ! ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষাব প্রকাশ এমন জমকালো! এমন হৃদয়ের দু কূল ভাসিয়ে নেওয়া প্রাবনের মতো উত্তাল। যে শুভেন্দু মনে মনে গোপনে জানে এমনটা বোধহয় আর হয় না। এবং সে অতি ভাগ্যবান। বিশেষত সে মা-বাপ মবা, মামার বাড়িতে এবং পরে হোস্টেলে মানুষ। স্নেহ-ভালোবাসা-আদরের জন্য কতটা কাঙাল সে ছিল, বিয়েব পর নন্দিতাব প্রবল শ্রোতে ভেসে যেতে যেতে ভালো কবেই বুঝতে পাবে। ওই এক দোষ, একে কী বলবে শুভেন্দু বুঝতে পারে না। খামখেয়ালি। না সেন্টিমেন্টাল। না ওই পবের ব্যাপারে নাক-গলানোব আদিখোতা! কী বলবে একে সে সত্যিই জানে না।

বোজাই অফিস থেকে ফেববাব সময়ে এক বুক আনন্দ নিয়ে ফেরে শুভেন্দু। সে জানে যতই কলিগেব সঙ্গে মনোমালিন্য হোক, ডিবেক্টর যতই বাঁকা চোখে তাকাক, গুচ্ছেব নীরস অর্থহীন কাজের জন্যে তাকে যতই ছোট্টাছুটি করাক এরা, বাড়িতে তার জন্যে অসাধাবণ কিছু অপেক্ষা কবে আছে। দবজা খুললেই চমকে উঠবে হলুদ শাড়ি, শাওলা সবুজ চুলেব সেই মেয়ে কাজলবিহীন কাজলা চোখে এমন চাওয়া চাইবে, দাঁত ঝিকিয়ে এমন হাসি হাসবে যে সহস্র মানুষের সহস্র বকম দুর্বাবহাব, হাজারখানা সমস্যার উদ্যত মুখ সব বাঁশির নাচনে সাপেব ফণার মতো নুয়ে পড়বে। তারপর বেতের হালকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে চা-খাওয়া, ঝুপঝুপ সঙ্গে নামছে, আলো জ্বলছে। সারাদিনের জমা কথা ফুটছে টুকটাক, দু একটা গানের কলি, একটা ধূপ জ্বলে দেওয়া। ঘাড় ফিরিয়ে একটু ভূঙ্গি—শুনতে এইটুকু কিন্তু এবই মধ্যে যে কী অসামান্য রস ভরা থাকে তা শুভেন্দু ছাড়া কেউ কি জানবে?

কিন্তু কোনও একদিন ওইরকম প্রত্যাশার সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যদি হাসির চমক না দেখে? সারা শরীরে শোকের ছাপ, যেমন-তেমন মলিন শাড়ি, বিকীর্ণ মূর্খজা, মেয়ে-ভরা আকাশের মতো বর্ষগোমুখ চোখ।

‘কী হয়েছে নন্দিতা?’

‘কিছু না। এসো।’

চা খাওয়া হয়, চায়ের সুগন্ধের সঙ্গে ফিলটার-সিগারেটের গন্ধ মিশতে থাকে। সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। যন্ত্রচালিত দুটো হাত ধূপ জ্বলে দেয়। হাতের মধ্যে যেন কোনও আগ্রহ নেই। রাত্তির হয়, খাবাব বাড়ি হয়। কথা-বার্তা, হাসি-ঠাট্টা, চোখের-আঙুলের-ঠোঁটের আদর ছাড়া খাবার বিষাদ মনে হয়। কিন্তু বারবার জিজ্ঞেস করে করেও উত্তর পাওয়া যায় না।

‘কী আবার হবে? কিছু না।’

রাত্রে বোঝে নন্দিতা জেগে আছে। কিন্তু কোনও গভীর শোকে সে অনমনীয়, তাকে এখন ছোঁয়া যাবে না।

পরদিন খবর জানল রাস্তায় বেরিয়ে। দু'তিন বাড়ি পরে থাকে অভিনাষদা, তার স্কুল-পড়ুয়া ন' দশ বছরের ছেলটি মারা গেছে। একেবারে হঠাৎ। স্কুলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বাবাকে তার অফিসে খবর দেওয়া হয়েছিল, বাবা আসতে আসতেই সব শেষ। কেন, কী বৃত্তান্ত ভালো বোঝাই যাচ্ছে না।

ক' দিন পরে শুভেন্দু বলে—‘চলো নন্দিতা, উট্টাম ঘাট থেকে ঘুরে আসি।’ উট্টাম ঘাটে যেতে, জেটির ওপর দাঁড়িয়ে আঁচল ওড়াতে, গোল রেস্তোরাঁয় খেতে নন্দিতা ভীষণ ভালোবাসে।

কিন্তু নন্দিতা শূন্য চোখে চেয়ে বলে—‘কী লাভ?’

‘কিসের কী লাভ?’

‘এ ভাবে কোথাও বেড়াতে গিয়ে? বা কিছু সে যাই হোক না কেন, করে? কী লাভ? টুবলুর মতো একটা কচি ছেলে যদি এভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ... তো কী লাভ? তুমিই বলো?’

রাস্তিরে নন্দিতা গভীর শোকে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকে, যেন তার নিজেরই সম্ভান গেছে।

আস্তে আস্তে মেঘ কাটতে থাকে, নন্দিতা স্বাভাবিক হয়, যদিও বৎসহাবা জননীৰ এক গভীর, গভীরতর অসুখ সে যেন তার জীবনযাপনের ভেতরে চিবকালই বহন কবে যাবে বলে মনে হয়। সবচেয়ে ভয় এবং আশ্চর্যের কথা, এবও বেশ কয়েক মাস পরে শুভেন্দুর মাসতুত বোনের বিয়েতে নেমন্ত্রণে গিয়ে, খাওয়া-দাওয়া হবাব আগেই সে শুভেন্দুব হাত ধরে এসে,—‘চলো, এক্ষুনি চলে যাবো।’

‘কেন? কী হল?’ সুন্দর সিন্ধের শাড়ি পরা অলঙ্কৃত বউয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শুভেন্দু।

‘শুনতে পাচ্ছে না সানাই বাজছে?’

‘বিয়ে-বাড়িতে তো সানাই বাজবেই।’

‘আমি সহিতে পারি না যে। টুবলু বেদিন চলে গেল, সেদিন সারা দিন সারা বাত দুব থেকে সানাইয়ের সুব ভেসে এসেছিল। আমার ... আমি সহিতে পারি না।’

টুবলুর মৃত্যু খুবই মর্মান্তিক। একশবার। কিন্তু টুবলুদেব সঙ্গে নন্দিতার কোনও যাওয়া-আসাই ছিল না। টুবলুর সঙ্গে সে জীবনে দুবার কথা বলেছে কি না সন্দেহ।

অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে, নন্দিতাকে আগে থেকে কিছু না বলে বাড়ি প্যাণ্ট ফেলাব ব্যবস্থা কবে শুভেন্দু। একটু শহরতলির দিকে। মস্তানি-ফস্তানি আছে নাকি একটু আধটু। কিন্তু চার ফ্ল্যাটের নতুন দোতলা বাড়ি। গেটে, নন্দিতার পছন্দের মাধবীলতা থোকা থোকা দুলছে। নির্মল আকাশ দেখা যায়। রেল লাইনের ধাবে সাঁঝের বাজাব বসে। সেখানে হরেক রকম টাটকা মাছ, সবজি পাওয়া যায়। একেবারে হাতের কাছে।

নন্দিতা প্রথমে ওঁই গাঁই করেছিল। তাব আবাব পুরনো বাড়ি, উঁচু উঁচু সীলিং, রাশি রাশি জানলা-দরজা, এ সব ভালো লাগে। সে ছাদে উঠে গনগনে রোদে কাপড় শুকোতে দেবে, আবার কালবৈশাখী এলে ঝড়ের হাওয়ায় উথালপাথাল হতে হতে কাপড় তুলে আনবে। দুমদাম দরজা জানলার আওয়াজ, ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা, পাঁচিলের ফাটলে অশথগাছ, এ সবই তার ভারি পছন্দের জিনিস। কিন্তু শুভেন্দুর এক গোঁ। সে এ বাড়ি ছাড়বেই। বউয়ের খামখেয়ালের জন্যে নতুন বাড়িতে থাকতে পাবে না নাকি সে তাই বলে?

আচ্ছা বউ তো তার! তখন নন্দিতা অগত্যা হেসে ফেলে। দৌড়োদৌড়ি করে সব শুছিয়ে তুলতে থাকে। কী ফেলে যাবে, কী নেবে, কী নতুন কিনবে তার হিসেব-নিকেশ করতে করতে একটা শালিখনী কি চড়ুইনীর মতোই মহা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে শুভেন্দুর বুকের ভেতরটা আনন্দে শিরশির করতে থাকে। 'নন্দিতা, আ-নন্দিতা, অ-নন্দিতা' সে গলা ছেড়ে ডেকে ওঠে।

আগেকার পছন্দটাকে আঁকড়ে ধরে নতুনের সব কিছু বরবাদ করে দেবে এমন মেয়েই নয় নন্দিতা। নতুন বাড়িটা তার ভারি ভালো লেগে যায়। ফিকে লাইল্যাক রঙের দেয়ালে যামিনী রায়ের গণেশ-জননী টাঙাতে টাঙাতে সে দুদাড় করে ছোট্ট প্লেনের আওয়াজ শুনে, জানলার গ্লিল ধরে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে, বলে, 'ভালোই হল বলো। আজকাল এয়ারপোর্টে ঢুকতে যা খরচ, এতো কাছ থেকে বেশ নিখরচায় প্লেন দেখা যাবে! কী আওয়াজ! যেন আমাদের বাড়িতেই নেমে পড়বে মনে হয়।' শুভেন্দু পায়ের ওপর পা তুলে মৃদু-মৃদু হাসে। বিজয়ীর মতো।

'তুমি আর বড় বড় কথা বলো না! আসতেই তো চাইছিলে না!'

'হা অবশ্য সত্যি গো!' নন্দিতা কাঁচুমাচু মুখে অকপটে স্বীকার কবে, 'আগের বাড়িটা আমার ভীষণ মায়বী বাড়ি ছিল গো। পুরনো বলে আমি কেমন খারাপ বাসতে পাবি না। অন্যো পছন্দ করছে না দেখলে আমার যেন আরও মায়্য বসে যায়। এ বাড়িটা একটু নিচুও। কিন্তু দেয়ালগুলো ৭ স্যান্টিনের মতো। আর জানলা দিয়ে মাথবীলতার ভিটটা দা-রুণ।' অতএব সে খুব চটপট নতুন বাড়ি মনের মতো করে শুছিয়ে ফেলে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, হেসে কুটোপাটি হয়ে, বরেন গাল চটকে, কান কামড়ে। খুব তাড়াতাড়ি বাকি তিন প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ-টালাপও সেরে ফেলে। সন্ধ্যাবেলায় উৎসাহেব চোখে দু চার সিঁড়ি উপকে উপকে উঠতে উঠতে শুভেন্দু আহ্লাদে আটখানা হয়ে শোনে তাব বাড়ির জানলা দিয়ে নির্ভুল ভাবে গান ভেসে আসছে—'পিয়া বিন রয়না নহী জায়।' সে বেল বাজিয়ে দরজা খুলতে না খুলতেই বলে ওঠে, 'পিয়া বিনা রয়না যাবাব কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। পিয়া হাজির।'।

কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক নন্দিতামিটা তার বউ এখানেই কবে ফেলল। এগুলোকে আজকাল শুভেন্দু নন্দিতামি বলে, আব কোনও নাম বা সংজ্ঞা খুঁজ না পেয়ে। সন্ধ্যেব শোষে এসপ্লানেড পাড়ায় ছবি দেখতে গিয়েছিল। একেবারে খেয়ে বাড়ি ফিবছে। দুজনেরই খুব মেজাজ খুশ। সারা রাত্তা বাসে বাসে বাসে ফিল্মটাব পিণ্ডি চটকেছে দুজনে আব হেসে খুন হয়েছে। তাদের বাড়ি যেতে হলে একটা পাক খাওয়া গলি পড়ে। গলিটা এড়িয়েও যাওয়া যায়, তবে তাতে ভীষণ ঘুব হয়ে যায়। গলিপথে কিছুটা এগোবার পব একটা চাপা বচসাৰ আওয়াজ শুনতে পেলো ওরা, তারপবেই সামনে যেখানে মোড়, গলিটা দুভাগ হয়ে ডাইনে বাঁয়ে চলে গেছে সেইখানে টিমটিমে আলোয় একটা জটলা, কয়েকটা তীক্ষ্ণ গালাগালি তাবপব একটা ছোরা ঝলসাতে দেখল ওবা। শুভেন্দু কিছু বুঝে ওঠাব আগেই জ্যা-মুক্ত তীর কিংবা বলা উচিত বলেটোব মতো বেগে নন্দিতা তাব পাশ থেকে ছুটে বেবিষে গেল। শুভেন্দু দেখতে পেল উদ্যত ছোবা হাতে এক বিশাল চেহারার ঝাঁকড়া চুলো মস্তান, তার পেছনে আরও কিছু দলা পাকানো লোক, অপর দিকে মাথা নিচু কবে এক হাত ওপরে তুলে আঘাত এড়াবাব ভঙ্গিতে এক ছোকরা। উভয়ের মাঝখানে লাল শাড়ি পরা নন্দিতা একটা ছোট্ট হাইফেনেব মতো, কিংবা ছোট্ট একটা ফুলকির মতো। 'না, না, খবদার না' সে চিৎকার করে বলছে, 'খবদার মাবতে পারেন না।' নিমেষেব মধ্যে ছোকরা ডান দিকেব গলি দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল, মস্তানের চোখে আগুন, ছোরা নেমে আসছে। বাস শুভেন্দু আর কিছু দেখেনি, জানে না। তাব সামনে নিকষ আঁধার। যখন আবার দেখল, দেখতে পেল

গলির মোড় শূন্য, সে বসে পড়েছে, নন্দিতা বলছে, ‘কী হল তোমার? ওঠো! শিগগির বাড়ি চलो!’ শুভেন্দু অবাক হয়ে দেখল তার বউ অক্ষত আছে।

কোনওক্রমে বাড়ি ফিরে, দরজায় ভেতর থেকে একটা তালা লাগাল শুভেন্দু। ভারী একটা কৌচ এনে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখল। নন্দিতা বলল, ‘কী করছো?’

শুভেন্দু গম্ভীর ভাবে বলল, ‘এতে কিসুই হবে না। দু চারখানা লাথিতেই ভেঙে পড়বে। তবু ডুবন্ত মানুষ তো কুটোগাছটাও আঁকড়ে ধরে!’

‘তার মানে? কে লাথি মারবে?’

‘কেন? ওই যাদের নোংরা কাজিয়ার মধ্যে তুমি তোমার নির্বোধ নাকটি গলিয়েছিলে? খুব ভাগ্য ভালো যে তোমাকেই খুন করেনি বা ...’

নন্দিতা বলল—‘তাই বলে, আমার চোখের সামনে মানুষ মানুষকে খুন কববে আব আমি কিছু বলব না তা তো হয় না, হতে পারে না!’

‘আর যদি আক্রোশে তোমাকেই খুন কবত!’

‘খুন হয়ে যেতাম, কেউ না বাঁচালে।’

‘আর যদি রেপ করত?’

‘রেপই হয়ে যেতাম। নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে বা কেউ না রক্ষা কবলে! তবে এসব ভাবিনি তখন, দেখেছিলাম দুটো মানুষ, একজনের হাতের ছুবি অন্যজনের ওপরে নেমে আসছে, মাঝখানে দু আড়াই ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা, ওইটুকু ছাড়া আব কিছু দেখিনি, কিছু ভাবিওনি।’

কী ভয়ানক! কী ভয়ঙ্কর ভয়ানক! এ মেয়েটা ভাবে না পর্যন্ত! শুভেন্দু ভাবল, এবং ভাবতেই থাকল, ভাবতেই থাকল। অফিস যাবার সময়ে বেরোতে ভাবে, বাড়ি ফেববাব সময়ে ফিরতে ভাবে। গলিতে কদাচ নয়। তথাপি ভয়। আর কিছু না হোক বাড়ি গিয়ে কী দেখবে এই ভেবে ভয়। যার জন্য এতো ভয়-ভাবনা সেই নন্দিতা কিন্তু একদম স্বাভাবিক। দোকান-বাজার যাচ্ছে, দরজা হাট করে খোলা রেখে বাসনওয়ালীব সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, হাসি গান গল্প। দিবা আছে।

কদিন পরে শ্যামবাজারে মোড় থেকে বাসে উঠছে, হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা ভাবী হাত পড়ল। একেবারে চমকে উঠেছে শুভেন্দু।

‘কী রে শুভ?’

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে শুভেন্দু খুশিতে ফেটে পড়ল, ‘আরে রমেন না?’

‘চিনতে পেরেছিস তাহলে!’

ভিড়ের মধ্যে থেকে সন্তর্পণে তাকে বার করে আনতে আনতে রমেন বলল।

‘তোকে কখন থেকে ডাকছি, গাড়ির মধ্যে থেকে, শুনতেই পাচ্ছিস না! অনেকক্ষণ থেকে তোকে ফলো করতে করতে আসছি। চল, ওই দিকে গাড়িটা পার্ক করেছি।’ শুভেন্দু একমুখ হেসে বলল—‘কবে ফিরলি?’

‘বছর খানেক। যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউয়ের মুখে চেম্বার করেছি। আয় না, দেখে যাবি। আমি অবশ্য এখন চেম্বার বন্ধ করে বেরোছি।’

শুভেন্দু বলল, ‘ঠিকানাটা দে, অন্য একদিন যাবো। আজ না। বউ বাড়িতে একা রয়েছে। জায়গাটা ভালো না।’

‘বিয়ে করেছিস? কবে?’ রমেন উৎসাহিত হয়ে উঠল।

‘বছর তিনেক হল।’

‘তো চল, তোর বউ দেখে আসি। নেমস্তন্নটা তো একেবারেই মিস করে গেছি দেখছি।’

‘যাবি? খুব ভালো হয় তাহলে।’

রমেন তার ফ্রিম রঙের মারুতি ভ্যানের দরজা সবিয়ে দিল। তারপর বলল—

‘আমি পিঠে হাত রাখতে ও রকম ঘাবড়ে ফাকাশে হয়ে গেলি কেন রে?’

‘ফাকাশে হয়ে গিয়েছিলুম বুঝি?’

‘হ্যাঁ, একেবারে চমকে উঠলি।’

‘আর বলিস না, এই বউটা আমার মাথা খাবাপ করে ছাড়বে।’

‘কী ব্যাপার?’

গাড়িতে যেতে যেতে শুভেন্দু তখন ব্যাপারটা বলল। শুনে রমেন হাসতে লাগল।

অন্যদিন শুভেন্দুর ফিরতে ফিরতে সঙ্কে হয়ে যায়। আজ রমেনের গাড়িতে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। দরজা খুলে দিল বাসনমাজার মেয়েটি। ‘কে রে?’ নন্দিতার গলা শোনা গেল। মেয়েটি চৈঁচিয়ে বললে—‘দাদাবাবু।’

‘ওমা, তুমি এতো সকালে।’ বলতে বলতে শৌ-ও-ও করে নন্দিতা এসে হাজির হল। পরনে চুড়িদার-কুর্তা, ওড়নাটা কষে কোমরের সঙ্গে বাঁধা। আঁটসাঁট কবে একটা বিনুনি বেঁধেছে। পায়ে রোলার স্কেট। এ বাড়িতে কোথাও চৌকাঠ নেই, বোলার স্কেট পায়ে চড়িয়ে নন্দিতা ঘব থেকে ঘবান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একবার শৌ কবে পেছনে গড়িয়ে আরেকবার দ্বিগুণ শৌ কবে সামনে গড়িয়ে এসে নন্দিতা বাজকীয় সালাম জানাল বোলাব স্কেটের ওপর থেকে, ‘আইয়ে জানাব।’ পবক্ষণেই পেছনে অপরিচিত মুখ দেখে ভড়কে গিয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলে নিতে নিতে তার পশ্চাদপসরণ। একেবারে রান্নাঘরের মধ্যে ‘ককী কাণ্ড!’ একটু পবে খালি পায়ে ওড়না দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে সে বলল। মুখে লাজুক-লাজুক হাসি।

রমেন বলল, ‘কেন, বেশ তো ছিলেন, বাহনের ওপর থেকে নেমে এলেন কেন?’

নন্দিতা মুখ ঢেকে হেসে উঠল।

শুভেন্দু বলল, ‘এই হল আমাদের রমেন। বমেন দা গ্রেট।’

‘বাস? ওইটুকুইতেই ইনট্রোডাকশন হয়ে গেল?’ রমেন বলল।

‘এব চেয়ে এক পয়সাও বেশি বলতে হবে না বুঝলেন?’ নন্দিতার হাসি-হাসি মুখ, ‘আপনি প্রায়ই আমাদের দুজনেব মাঝখানে বসে থাকেন, তা জানেন?’

‘সুদূর লন্ডনে বাস করে আপনাদের মাঝখানে... আমি কি ভূত-তুত নাকি?’

‘আরে, ও বলতে চাইছে তোকে নিয়ে আমাদের মধ্যে গল্প-সল্প হয়। এই আর কি!’

‘তাই নাকি, বাঃ।’ রমেন খুব খুশি হল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দিতা দশভুজা হয়ে উঠল। প্রথমেই এক দফা চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। চা-টা শেষ হতে না হতেই কিসের বড়া গরম গরম ভেজে এনেছে, তার সঙ্গে আবার চা। তার পরে ছানার পুডিং হাজির করল, সেটা শেষ হলে বলল—‘মুখটা মিষ্টিয়ে গেল না কি? কুচো নিমকি খাবেন?’ রমেন বলল, ‘তাই বলি শুভটা রোগা-প্যাংলা ছিল বরাবর, এমন গায়ে-গতরে হয়ে উঠল কী করে? এই-ই তার সিক্রেট?’

নন্দিতা বলল—‘ওসব বললে শুনছি না, আপনি আজ খেয়ে যাচ্ছেন।’

রমেনের সমস্ত আপত্তি হাওয়ায় উড়িয়ে দিল নন্দিতা। তারপর সে এই সদর দরজা খুলে ছুটে যাচ্ছে সম্ভবত বাজারে, এই আবার প্রতিবেশীর স্ল্যাটে, রান্নাঘরে যাচ্ছে একবার, পরক্ষণেই এসে বসছে, গল্পে যোগ দিচ্ছে। এমনি করে রাত নটা নাগাদ সে গা-ফা ধুয়ে একটা জমকালো পোশাকি শাড়ি পরে, কপালে টিপ, পুরো চুল খোলা খেতে ডাকল ওদেব। হাত বাড়িয়ে

বিরিয়ানি দিচ্ছে ওদের প্লেটে, তখনই শুভেন্দু এবং রমেনও লক্ষ করল জিনিসটা। ডান হাতের তলার দিকে আড়াআড়ি একটা চওড়া লালচে দাগ।

—‘ওটা কী? কী হয়েছে?’ শুভেন্দু শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলো।

হাত উন্টনন্দিতা দাগটা দেখল, একটু অবাক হয়ে বলল, ‘তাই জ্বালা-জ্বালা করছিল। ও কিছু না।’

কিছুতেই সে আর কিছু বলল না।

‘দারুণ খেলাম’ রমেন হাত ধুতে ধুতে বলল।

‘আবার যাতে আসেন তাই চেষ্টা-চরিত্র করে ভালো খাওয়ালাম।’ নন্দিতার জবাব, ‘বিরিয়ানি রাঁধলাম, জামদানি পরলাম আপনার অনারে, আর এই নিন?’ সে মুঠোভর্তি কাঁটালি-চাঁপা ফুল রমেনের দুহাতে উপুড় করে দিল। ফুলগুলো নিয়ে যাবার জন্যে একটা পলিথিনের প্যাকেটও এনে দিল রাবার ব্যান্ড সুদ্ধ।

রমেন বলল, ‘রোলার স্কেট না পরেই তো আপনি হানড্রেড মাইল স্পীডে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দেখলুম। ওটার দরকার হয়েছিল কেন?’

নন্দিতা চারদিকে কেমন বিহুল চোখে চেয়ে মৃদু হাসল, বলল—‘কেন জানেন না? শোনেন নি, সেই

“জলের কলে টিপ্ টিপ্

টিপ্ টিপ

আমরা বলেছিলাম যাবো

সমুদ্রে।

নদী বলেছিল যাবে

সমুদ্রে।

আমরা বলেছিলাম যাবো

সমুদ্রে।

আমরা যাবো।”

বলতে বলতে মুখটা উলসে উঠল তার।

নিচে গিয়ে গাড়িতে উঠতে উঠতে রমেন বলল—‘দারুণ কাটল রে স্কেটটা। চলি। আবার দেখা হবে। তারপর স্টিয়ারিঙে হাত রেখে হেসে বলল—‘তোর বউটা একটা পাগলি।’

কী বলতে চাইল রমেন? শুভেন্দু ওপরে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগল। তারপর থেকে প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাথার মধ্যে কথাটা তাকে আঘাত করে যায়—‘পাগলি, তোর বউটা একটা পাগলি!’ কেন এ কথা বলল রমেন? পাগলি কথাটা লোকে আদর কবে বলে আপনজনকে। ‘দূর পাগলি!’ আবার বিরক্ত হলে বলে ‘কী পাগলামি করছো?’ কিন্তু ‘তোর বউটা একটা পাগলি!’ কী প্রকৃত মানে এই কথা? শুভেন্দু তার বউ নিয়ে গর্ষিত। তিন ঘণ্টার মধ্যে লাফ-ঝাঁপ করে বানিয়ে দিল, বিরিয়ানি, ফিশ তনদুর, ফ্রায়েড চিকেন। নিজেই বাজার গেল, এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কী মাল মশলা সংগ্রহ করল কে জানে, কিন্তু বানিয়ে তো দিল! অরেঞ্জ-চকলেট রঙের ওই শাড়িটা পরে কপালে লম্বা টিপ, আধ কৌকড়া চুল খুলে যখন খাবার টেবিলে পরিবেশন করছিল? সম্রাজ্ঞীর মতো! ম্যাজিশিয়ানের মতো যখন হাতের মুঠো থেকে কাঁটালি-চাঁপাগুলো বার করল? কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা’টিক কথা বলার মতো করে বলে উঠে একটা চমৎকার ছোটগল্পের মতো শেষ করল শুভেন্দুর বাড়িতে বমেনের প্রথম আসার দিনটা।

অথচ প্রতিক্রিয়ায় ‘তোরা বউটা একটা পাগলি!’ এ কথা কেন বললি রমেন? কী ভেবে বললি? হঠাৎ বিদ্রোহমকের মতো শুভেন্দুর মনে পড়ে যায় নন্দিতার ডান হাতের সেই চণ্ডা কালশিটের দাগ, কদিন আগে যা লাল ছিল, মনে পড়ে যায় বৃষ্টির রাতে ছুটে যাওয়া, ‘কুকুরটা কী ভয়ানক কাঁদছে গো!’ মনে পড়ে যায় মস্তানের উদ্যত ছুরির তলায় লাল শাড়ি পরা স্মৃতিস্রবর মতো নন্দিতাকে, সানাই ভালো লাগে না যার, সানাই শুনলে যে বিষাদের অতলাস্তে তলিয়ে যায় সেই নন্দিতাকে। শুভেন্দু আর দেরি করে না।

অফিসে আজ খুবই দেরি হয়ে গেছে। তবু সে শ্যামবাজারের মোড় থেকে চট করে বাস ধরে না। চলে যায় যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ। ডক্টর রমেন বাগটির চেম্বার।

নিজের নাম পাঠিয়ে দিয়ে ওয়েটিং রুমে বসে শুভেন্দু। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি লাল-চোখ তরুণকে নিয়ে বসে আছেন। ছেলেরা যেন ঘুমঘোবে রয়েছে। ঘোর ভাঙলেই সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলবে। আরও দুজন সঙ্গী রয়েছে ভদ্রলোকের। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে এসে চুপি চুপি কথা বলে চলে যাচ্ছেন। শুভেন্দুর পাশেই বসে আরেক জন, শুভেন্দুর থেকে বড় হলেও যুবকই। তাঁর সঙ্গে একটি খুব সুন্দরী বউ। এতো সুন্দর, কিন্তু যেন বিষাদপ্রতিমা। দেখলে মনে হয় নৈরাশ্যের সিঁদুল থেকে উঠে এলো বুঝি। শুভেন্দুর বাঁ পাশে একটা অল্পবয়সী ছেলে। চোখে চশমা। ধারালো মুখ। সে শুভেন্দুর সঙ্গে যেতে আলাপ করল।—‘কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনি কার জন্যে এসেছেন?’

শুভেন্দু কী বলবে ভেবে পেল না। সে কি সত্যি-সত্যিই নন্দিতার জন্যে এসেছে? নন্দিতা কি .

‘এসেছি এক নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারে’ ধবি-মাছ না ছুঁই পানি করে বলল শুভেন্দু, ‘আপনি?’

‘আমার নিজেরই জন্যে।’ ছেলেরা খুব সুন্দর হেসে বলল, ‘অনেকের ধারণা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে খালি মনোরোগীরাই আসে। ধারণাটি ঠিক নয়। অনেক রকম ডিজঅর্ডার আছে জানেন তো? আমার কথাই ধরুন না কেন। দু’বার ডাবলু বি সি এস দিয়েছি। র্যাংক ভালো আসেনি তাই আবার দিচ্ছি। এবার বুঝলেন ... হয় এসপার নয় ওসপার! তো যা-ই পড়তে যাই মনের মধ্যে ঝামঝাম করে কবিতা বাজে, এখান থেকে এক লাইন ওখান থেকে এক লাইন, ধরুন “দাওয়ায় বসে জটলা করে পূর্বপুরুষেরা” কি তোমায় “আজি রেখে এলেম ঈশ্বরের হাতে” কি

“অবর্তমান তোমার হাসি ঝাউয়ের ফাঁকে

আমায় গভীর রাত্রে ডাকে।

ও নিরুপম, ও নিরুপম ও নিরুপম ...” বলতে বলতে ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। সটান উঠে দাঁড়িয়ে ভাবগভীর গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করে দিল, যেন এটা মঞ্চ:

মন্দ ভালো নেইকো কিছুই, আকাশ মাথায়

বাউল-বাউলি দাঁড়িয়ে থাকায়,

নিম ঘোড়ানিম আকাশ ফুঁড়ে কৃষ্ণ-কিরিচ কাঁসিয়ে রাখায়,

থই থই থই সমুদ্র জল তাঁথে তাথায়,

ওপর নিচে ডাইনে বামে আমার থেকেই তামায় ভাগায় ... আমায় ভাগায় ... আমায় ভাগায় ...

শুভেন্দু আশেপাশে তাকাল। সবাই ভয়ের চোখে ছেলেরা দিকে তাকাচ্ছে। সুন্দরী মেয়েটির চোখ ভর্তি জল। লালচোখ ছেলেরা লম্বা সীটের ওপর শুয়ে পড়ছে। রমেনের

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি এসে ডাকল ‘কৌস্তভ সেনগুপ্ত!’ কবি ছেলেটি তাড়াতাড়ি চেম্বারে ঢুকে গেল। শুভেন্দুর হঠাৎ ভয় করতে লাগল। ভীষণ ভয়। এ সব যেন তাব চেনা। এ লাল চোখ সে দেখছে ‘খবদার মারতে পারবেন না’ বলে যখন ঝলসে উঠেছিল। ওই বিষাদ-প্রতিমা, নয়ন-ভরা জল, দিনে রাতে দেখতে দেখতে এক সময়ে সে মরিয়া হয়ে গিয়েছিল। আর এই রকম মিঠে হাসি, চোখ দুটো হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া, এই বকম .. ঠিক এইরকম ... ঠিক। ভয়ে অধীর হয়ে উঠল সে। উঃ! কখন তাকে ডাকবে রমেন?

অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটি একটা ছোট্ট নোট পেপারে লেখা একটা চিঠি এনে দিল।

‘শুভ, একটু বোস ভাই। পেশেন্টদের ছেড়ে দিয়েই তোর সঙ্গে বেবোব।’

বমেন, রমেন তুই জানিস না, শুভ তোর সঙ্গে মজা মারতে, ইয়ার্কি দিতে আসেনি। তার বাড়িতে ভীষণ বিপদ। খুব বিপন্ন একজনেব জনোই আজ সে তোর কাছে ছুটে এসেছে।

ঠিক এক ঘন্টা বারো মিনিটের মাথায় শেষ রোগীটি বেরিয়ে গেলে, শুভেন্দুব ডাক পড়ল।

‘কী ব্যাপার বল? চা খাবি তো? না কফি, মায়া একটু কফি বানাও ভাই!’ অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রমেন বলল।

‘আরে দূর তোর কফি’ শুভেন্দু বলল, ‘আমি ভীষণ সমস্যায় পড়ে এসেছি।’

‘তোর আবার কী সমস্যা? ফাস্ট ক্লাস আছিস!’ রমেন পাশ্চাই দিল না।

শুভেন্দু বলল ‘তোকে পষ্টাপষ্ট জিজ্ঞেস করছি রমেন, নন্দিতা, আমার বউ কি অস্বাভাবিক মানে আননর্ম্যাল?’

রমেন ঝুঁকে বসে আশ্চর্য হয়ে বলল, ‘সে কী? একথা কেন বলছিস?’

শুভেন্দু বলল—‘সেদিন ওর ডান হাতে একটা লাল দাগ দেখেছিলি, মনে আছে? সেটা কী জানিস? স্কেলের বাড়ি। আমাদের নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলা মেরেছেন।’

‘বলিস কী রে? এফ. আই. আর. কর, এফ. আই. আর. কব। ডেঞ্জাবাস মহিলা তো!’

‘আরে, আগে সবটা তো শোন!’

‘বল, আ’গ্যাম অল ইয়ার্স।’

‘নিচের ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার একটি হাবাগোবা ছেলে আছে। বছর-বছর ক্লাসে ফেল করে। তা করবে না তো কী? ইডিঘট তো! পেনসিল পেন খাতা-বই এ সবেবও শ্রদ্ধ কবে ছেলেটা।’

‘করবেই! তার কী সেঙ্গ আছে!’

‘সেটাই। তো ভদ্রমহিলা ছেলেটাকে এরকম কিছু ঘটলেই আচ্ছা কবে পেটান। তুই যদিদি গেলি সেদিন সকালে নাকি নন্দিতার ভাষায় অমানুষিক পেটাচ্ছিলেন। ছেলেটাব চিংকাব শুনতে পেয়ে ও ছুটে যায়, দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রহারে বাধা দেবার চেষ্টা করে, স্কেলের বাড়িটা ছেলের ওপরই নামছিল, নন্দিতার হাতেব ওপর পড়ে।’

‘তাই বল।’ স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে রমেন বলল।

শুভেন্দু বলল, ‘ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা আমার কাছে গম্ভীর মুখে নালিশ করে গেছেন, আমার স্ত্রী ওদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে বলে। যখন নালিশ জানাচ্ছিলেন, তখন নন্দিতা বাজার গেছিল। ফিরে এসেছে, ওঁরা দেখতে পাননি। নন্দিতা চোখ গরম কবে বলল, ‘আপনারা যদি টুটুকে পেটানো বন্ধ না করেন আমি পুলিশে খবর দেবো, হাতে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব, জেনে রাখবেন।’ সে কী চেহারা রে, যেন বাঘিনী।

রমেন হাসতে হাসতে বলল—‘তো কী। ভালোই করেছে তো। সন্তানের দ্বারা বাবা-মাকে ডিভোর্স করার আইনটা পাশ হয়ে গেলে ভালোই হয়।’

শুভেন্দু বলল, ‘আরও শোন’, সে পূর্বাপর আজ অবধি যা ঘটে গেছে সবগুলো বলে গেল, তারপরে অভিযোগের স্বরে বলল, ‘তুইও তো প্রথম আলাপেই আমার কউটাকে পাগলি বললি।’ বলিস নি।’

—‘বলেছিলুম বুঝি।’ রমেন হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ গভীর হয়ে বলল,
‘তা তোর কী বলার আছে বল।’

‘বলবার আর কী আছে? আমি তোর কাছ থেকে প্রফেশন্যাল ওপিনিয়ন চাইছি।
অ্যাডভাইসও।’

রমেন হাতের আঙুলগুলো মন্দিরের মতো চূড়ো করতে করতে বলল, ‘দ্যাখ, শুভ, আমাদের শাস্ত্রে বলে সেন্ট পার্সেন্ট নর্ম্যাল লোক খুব কম। আসল হল ব্যালাঙ্গ। মানে ভারসাম্য। এই ভারসাম্যটা যদি এদিক ওদিক হলে একটু কমবেশি হয়ে যায় তো ... মানে বুঝেছিস? এক চুলের তফাত।’

আতঙ্কিত চোখে তার দিকে চেয়ে শুভেন্দু বলল—‘তা হলে?’

‘ধুর—ঘাবড়াচ্ছিস কেন?’ হালকা গলায় হেসে উঠল রমেন, ‘ঘাবড়াবার আছেটা কী? মেডিক্যাল সায়েন্স যে এত উন্নতি করল, প্রযুক্তি বিজ্ঞান যে আজ কোন চূড়ায় উঠে গেছে, এ সব কি ঘাবড়াবার জন্যে? ম্যান ইজ অলমোস্ট গড নাউ। সামান্য খুব সামান্য একটু মেডিকেট করলেই নন্দিতা ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে বেস্ট ওষুধ দিচ্ছি আমার সাম্পল থেকে।’ সে খসখস করে একটা প্রেসক্রিপশন লিখল, তারপর ড্রয়ার খুলে বেছে বেছে কয়েক পাতা ওষুধ বার করে দিল। দু রকম ওষুধ। খাওয়ার নিয়মটা বলে দিল। তার পর বলল, ‘তিন বছর বিয়ে হয়েছে বললি, না? এবার একটা বাচ্চা বানিয়ে ফ্যাল। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।’

অবাক চোখে চেয়ে নন্দিতা বলল—‘ওষুধ? ওষুধ খাবো কেন?’

‘আরে খাওই না। আমি তো তোমার স্বামী, না শত্রু? বিষ ফিস দেবো?’

‘না, তা নয়। তবে কন্ট্রাসেপটিভ পিল ফিল আমি আর খাচ্ছি না।’

‘সে তো নয়ই। এবার মেটানিটি হোম, কাঁথা, ভ্যাকসিনেশন, ওঁয়া ওঁয়া শুরু হয়ে যাবে, আমার দুঃখের দিন এলো বলে।’

নন্দিতা হেসে ফেলে—‘বাঃ বাঃ, কী হিংসুক!’

‘এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো ওষুধটা খেয়ে নাও দিকি।’

‘কিসের ওষুধ, বলবে তো?’

‘নার্ভের, বাবা নার্ভের, নার্ভ শান্ত রাখবে। মন ঠাণ্ডা থাকবে, হবু জননীর আদর্শ মানসিক অবস্থার সূচনা হবে।’

‘সত্যি? কই দাও!’ অনাবিল বিশ্বাসে নন্দিতা হাত বাড়ায়। সকালে, বিকেলে, রাত্রে।
সকালে, বিকেলে রাত্রে। সকালে, বিকেলে, রাত্রে।

তৃতীয় দিন অফিস থেকে ফোন করল রমেনকে।

‘কেমন আছে রে, নন্দিতা?’

‘পারফেক্ট। থ্যাংকিউ থ্যাংকিউ ভেরি মাচ।’

‘নিজেকেই থ্যাংকসটা দে। তোর ডায়গনোসিস, আমার প্রেসক্রিপশন’, রমেন বলে,
‘ঠিক আছে, চালিয়ে যা এখন কিছু দিন।’

সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরলে দরজা খুলে দেয় পরিষ্কার ফিটফাট নন্দিতা। দুজনে
চা আর ডালমুট নিয়ে গল্প করে।

‘জানো আজকে নন্দীকে খুব দিয়েছি।’

‘তাই?’

‘সোজা বললুম — আপনি ভদ্রভাবে কথা বলতে জানেন না, আগে শিখুন, তারপরে বলবেন।’

‘ওমা!’

‘একেবারে চুপসে গেল, জানো? প্রোমোশনের চিঠি আমার হাতে। কী বলবে আর।’
‘ঠিকই।’

‘এবার বাসকেও ধরব। যত রদ্দি মার্কা টুর সব আমাকেই করতে হবে। বললেই বলবে ঠেসে টি এ বিল দেবেন কম্প্যানিকে। ভালোই তো!’ যেন আমি ফল্‌স্ টি. এ বিলের এক্সপার্ট। আমার ফ্যামিলি লাইফ বলে, গ্রাইডেট লাইফ বলে কিছু থাকতে নেই। সব অপমানের শোধ এবার তুলব।’

‘দাঁড়াও, প্রেশারের তিনটে হুইশ্‌ল হয়ে গেল’ নন্দিতা চলে যায়। অনেকক্ষণ আসে না আর।

সাহ্য চান সারতে সারতে শুভেন্দুর হঠাৎ মনে হয় নন্দিতা তো কই ‘নন্দীকে খুব দেওয়ার’ প্রসঙ্গে উত্তেজিত হয়ে উঠল না। বলল না তো—‘আহা, ওরকম রূঢ়ভাবে বললে কেন?’ জিজ্ঞেসও তো করল না কিসের প্রোমোশন। কেন প্রোমোশন।

কাজের মেয়েটি চলে গেলেই গোটা ফ্ল্যাটটাতে তারা একা। সেই সময়ে নন্দিতা কোন কোন দিন এসে তার কোলের ওপর খুপ করে বসে পড়ে, গলা ধরে দোল খায়। বলে—‘জানো, তোমার ঘামে একটা কাটা ফলের মতো গন্ধ বেরোয়। প্লীজ আরেকটু পরে চান কোরো।’ কাঁধের ওপর মুখ রাখে নন্দিতা। ‘দেখো, ভিড় বাসে মেয়েদের সীটের সামনে দাঁড়ালেও, কখনও কোনও মেয়ে তোমার দিকে নাক কুঁচকে তাকাবে না। মেয়েদের আসলে নাকটাই খুব, বোধহয় সবচেয়ে জোরালো। বুঝলে?’ তারপর শুভেন্দুর নাকে নিজের নাকটা ঠেকিয়ে বলে—‘তাই বলে যেন তুমি আবার বাসের মেয়েদের কাছে এটা পরীক্ষা করতে যেও না। খবর্দার।’ চোখ পাকিয়ে তরুণী তোলে নন্দিতা।

তা সেসব তো কই কিছুই হয় না। স্নাত শুভেন্দু পত্র-পত্রিকা নিয়ে স্পোর্টস চ্যানেল খুলে বসে থাকে। সাহেবরা অক্লান্ত গল্‌ফ খেলে যায়। গল্‌ফ খেলে যায়। সামনে দিয়ে নানান কাজে যাতায়াত করে নন্দিতা। কখনও কুশনের ওয়াড় পান্টাচ্ছে, কখনও টেবিল মুছছে। টি. ভি.র গায়ে চুম্বক লাগানো ছোট্ট মূর্তিটা ওপরের দিকে ছিল, নিচে সরিয়ে দিল। হেঁকে বলল একবার—‘গান শুনবে? চালাব কিছু?’ কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়ে টেবিলে ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার। তারপর একটু টি. ভি. দেখা। নিবিড় ঘুম। রাতে কোনও দিন হয়ত ‘বলো হরি, হরিবোল’ যায়। বাড়ি কৈপে ওঠে হরিধ্বনির চোটে। শুভেন্দু জেগে যায়। এই বুঝি নন্দিতা ঝপাং করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাঃ। নন্দিতা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোন দিন মাঝ রাত্তিরে রেল লাইনের ধারে দু দলের বোমবাজির শব্দে রাত যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নন্দিতা কাছে এসে কাতর গলায় বলে না—‘ইস্‌স্—’ দেশটা দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছে, কতগুলো টাটকা তাজা ছেলে এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।’ নন্দিতার স্নায়ু খুব শক্ত শান্ত হয়ে গেছে। সে নিবিড় ঘুম ঘুমোচ্ছে।

এমন কি, অফিস যাওয়ার সময়ে খেতে বসে অনেক সময়ে শুভেন্দু টুটুর তীক্ষ্ণ টিংকার শুনতে পায়। ডাক্তার বলে দিয়েছে ওর মস্তিষ্ক অপরিণত, ও পারবে না। তবু ওর মা’ওকে ঠেঙাচ্ছে। শুভেন্দু উৎকর্ষ হয়ে থাকে। টুটুর জন্যে ততটা নয় যতটা নন্দিতার জন্যে। তার ভাব লক্ষ করে নন্দিতা নিঃশব্দে পাতে আর একটু ভাত তুলে দেয়, বলে, ‘খেয়ে নাও। শুনে কী করবে? করতে তো পারবে না কিছু। ওদের ছেলে ওরা বুঝবে।’

কাছেই কারো বাড়ি বিয়ে, সকাল থেকে সানাই বাজছে, ভয়ে ভয়ে অফিস যায়, অফিস থেকে ফেরে শুভেন্দু। চোখের সামনে সেই সুন্দরী মেয়েটির ছবি ভাসছে। বিবাদ-প্রতিমা, নয়ন-ভরা জল। ভয়ে ভয়ে দরজায় বেল দেয়। সর্বনাশ, কেদারা ধরেছে এবার। কেদারা! কেদারা সইতে পারে না নন্দিতা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, বলে ‘টুবুল, আমার টুবুল চলে গেল, উঃ, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না, নিয়ে যেও না। ফিরিয়ে দাও’ দরজা খুলে যায়। নন্দিতা। শুভেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, ‘কী হল তোমার? শবীর খারাপ করছে? ভেতরে এসো। যা গুমোট চলছে।’

শরবৎ এনে দেয়। ভিজ়ে গামছা দিয়ে কপাল, ঘাড়, হাত পা সব মুছিয়ে দায়। ফ্যানটা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে সামনে বসে থাকে। ‘কী গো? ঠিক আছে তো? না ডাক্তার বলবো?’

ওদিকে মনপ্রাণ নিঙড়িয়ে কেদারের সুর ওঠে নামে। নন্দিতা যেন বধিব হয়ে গেছে।

রমেন ফোন ধরেছে—‘হালো, হালো। শুভ? বউ ঠিক আছে তো?’—‘একদম ঠিক ভাই, একদম।’

‘তো এইবার একটা ... বুঝলি তো? শুধুই দুজন কবির কুজন আর নয় ...’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ঠিক আছে, বুঝছি, বুঝছি।’

চাঁদনি রাত। শ্রাবণের চাঁদ। যদি দেখা গেল না তো গেলই না। কিন্তু যদি দেখা গেল তো সে তার রূপোলি মদ দিয়ে তোমাকে মাতাল করে দেবে একেবারে। তখনই বোঝা যাবে এ চাঁদ নীল আমষ্টিং-এর নয়, এ চাঁদ সুকান্ত ভট্টাচার্যেরও নয়। এ সেই আদি অকৃত্রিম কবি-মহাকাবিদের রাকা শশী। চাঁদনি। হেনার উগ্র সুবাস সঙ্গে নিয়ে সেই চাঁদনি ঘরের মধ্যে ঢুকছে। একটা ফিকে রঙের ফ্রিল দেওয়া দেওয়া রাতজামা, যেন ওই চাঁদেরই ফেনা। নন্দিতা ঘুমোচ্ছে। মাতোয়াল শোভেন্দু মৃদু মথিত মস্ত্র স্বরে ডাকছে—‘নন্দিতা, নন্দিতা, কই এসো!’ নন্দিতা কি জাগবে না? এমন ডাকেও জাগবে না? আবার ডাকে শুভেন্দু, আবার, আবার।

নন্দিতা জাগছে। খুলে গেছে তাব চোখের পাপড়ি।

নন্দিতা আসছে। কিন্তু ও কী?

আসছে আহত জন্তুর মতো। ওঁড়ি মেরে। নিজেকে টেনে টেনে।

শিঙালের রাত-চেরা আকাঙ্ক্ষার ডাকে হরিণীর ঠ্যাঙের তুরুকে নয়। এবং সে আসায় কষ্টকিত হয়ে উঠছে না তো কই আশরীর হরিৎবাসের রোম! নিবে গেল বুঝি পৃথিবীর কোটরের সৃজনী আশুন। বাঁধের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে দুর্দান্ত নদী। না চাইতেই দু কূল ভরে আর দেবে না। দেবে না আর প্রেমের উপচিতি দিয়ে আত্মপরভোলা সবোদন শুশ্রূষা। তার পুরুষের বৃকের তলায় নন্দিতা যান্ত্রিক, উদাস, অসাড় হয়ে থাকে। অবিকল এই পৃথিবীরই মতো।

যষ্ঠ ঋতু

সমরেশ বসু

মেয়েমানুষটি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে।

সামনের রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সরু রাস্তা, দু-পাশে ঘিঞ্জি বাড়ি। বাস্তাব ধারে পানবিড়ির দোকানপাট। দক্ষিণে জেলেপাড়া, উত্তরে মালিপাড়া। মালিপাড়ায় মালি আর নেই। এখন নামটি বেঁচে আছে। ভাল কথায় লোকে বলে খারাপ পাড়া। মফস্বলেব ছোট শহর হলেও বেচা-কেনা হাট-বাজার—বেশ জমজমাট শহর।

মেয়েমানুষটি যে-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল, ওইখান থেকে মালিপাড়ার শুরু বলা যায়। পৌষের দুপুর। দেখতে-দেখতে রোদ কাত হয়ে গেছে কখন। পাড়াটার পুর্বের বাড়ির চালাগুলি পেরিয়ে কোঠাবাড়ির মাথায় ঠেকেছে রোদ।

মেয়েমানুষটির দরজার মাথায় একটি ছোট সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে। লেখা আছে ‘শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী, কীর্তন-গায়িকা। ভিতরে অনুসন্ধান করুন।’

দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণভামিনী নিজেই। মাজা-মাজা রঙ, দোহারা গড়ন। মধ্যস্থতু আশ্বিনের নিস্তরঙ্গ ঢলো-ঢালা শরীর। বয়সটা অবশ্য গিয়ে ঠেকেছে তলে-তলে আর-একটু দূরে। দিনের হিসেবে আশ্বিনের দিন কাবার হয়ে অগ্রহায়ণের একটু শীত ধরেছে সেখানে। একটু রাশভারী, দলমলে কৃষ্ণভামিনী। কপালের সামনে পাতা পেড়ে চুল এগিয়ে দিয়েছে। সিঁথিব সিঁদুর সামান্য। ভাগর চোখে এখনও সজাগ চাহনি, খরতা-ও আছে। কালো শাড়ি পরনে, গায়ে জামা নেই।

মুখে পান টিপে ঝুঁকুচে তাকিয়ে আছে দক্ষিণে। চোখে ঠোটে রাগ-রাগ ভাব। নাকছাঁবিটিও নড়েচড়ে উঠছে নাকের পাটায়।

পূর্ব কোলের কোঠাবাড়ির বারান্দা থেকে একটি মেয়ে জিগ্যেস করল, ‘দাঁড়িয়ে আছ যে, কেউদিদি!’

কৃষ্ণভামিনী সেদিকে না-তাকিয়ে বলল, ‘দেখছি।’

—‘কাকে?’

—‘মরণকে।’

মেয়েটি হেসে বলল, ‘বুঝছি। তোমার খোলসিকে তো? তা সে-মিনসেকে তো ঞ্খলাম, একটু আগে ভেঁপু ফুঁকতে-ফুঁকতে রিকশা চালিয়ে একটা লোক নিয়ে গেল পাড়ার মধ্যে।’

কথা শেষ হতে-না-হতেই হর্ন বাজিয়ে একটা সাইকেল রিকশা এসে দাঁড়াল কৃষ্ণভামিনীর দরজায়। রিকশায় যাত্রী নেই। রিকশাওয়ালা নেমে একটু অপ্রতিভ মুখে হাসল কৃষ্ণভামিনীর দিকে চেয়ে।

কালো মানুষ। পেটা-পেটা শক্ত চেহারা। বাবরি চুলও কালো। গৌফ-দাড়ি কামানো মুখ। এসব মানুষ একটু বয়সচোরা হয়। ধরা যায় না কিছু। কালো মুখে ধূলা লেগে কক্ষ

দেখাচ্ছে। সদ্য রিকশা চালিয়ে ফুলে উঠেছে হাত পায়ের পেশী। অপ্রতিভ হয়ে হাসলে তাকে বোকাবোকা দেখায়।

ঐ বাঁকিয়ে গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করল কৃষ্ণভামিনী, ‘কটা বেজেছে?’

সে বলল, ‘এটুস দেরি হয়ে গেছে।’

কৃষ্ণভামিনীর রাগ চড়ল তার কথা শুনে। বলল, ‘রিকশা চালিয়ে খাবে, ওই চালিয়ে মরবে। ভগবান তোমার হাতে কেন শ্রীখোল দিয়েছিল, বলতে পারো?’

অন্য মেয়েটির কথানুযায়ী বোঝা গেল, লোকটি কৃষ্ণভামিনীর খোলুঞ্চি অর্থাৎ খোলবাজিয়ে। নাম গগন। হেসে বলল, ‘ভগবানের বিষয় বলে কথা! কে যে কী হয়, কেউ জানে? পয়সার কাজটা আমাকে করতে হবে তো। না, কী বলো গো?’

বলে পূবের বারান্দার মেয়েটির দিকে তাকাল। কৃষ্ণভামিনীর কৃষ্ণচোখের তাবা জ্বলে উঠল দপ-দপ করে। চতুর্থ খতু অগ্রহায়ণেও বৈশাখের বিদ্যুৎবহি। শীতল গলায় বলে উঠল, ‘ও আবাব কী বলবে? আমিই বলছি, না-পোষায় ছেড়ে দিলেই পারো। আমার কি শ্রীখোলবাজিয়েব অভাব হবে, না তোমাকে পয়সা আমি দিতে চাইনি। বাস্তব দাঁড়িয়ে সাক্ষী মানছ লোককে, ন্যাকামো করে তবে মরতে আসা কেন এখানে?’

বলতে-বলতে ভিতরে ঢুকে গেল কৃষ্ণভামিনী। দাঁড়িয়েছিল বানীর মতো, ফিবে গেল ক্রুদ্ধা রাজেন্দ্রানীর মতো। দরজাটির পাশা নেই। নইলে বন্ধ কবে দিয়ে যেত।

বিমর্ষ হেসে গগন ফিবে তাকাল পূবের বারান্দার দিকে। সে-মেয়েটি, গগনকে নয়, কৃষ্ণভামিনীকে ভেঙে চলে গেল।

বাড়ির দরজাটি বড়। সেকেলে বড়লোকের বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা নেই। পার্টিশান আর দরজাব মাথাটা রয়ে গেছে। রিকশাটা ঢুকিয়ে দিল গগন উঠানে।

ভিতবে তখন কৃষ্ণভামিনী হাঁক দিয়েছে, ‘বাধি, ও রাধা, কোথায় গেলি?’

বাধা ছুটে এল ঘরে। ডাগরসাগর রাধা, কটা বড়। ছোট-ছোট চোখে ডাগর চোখের চুলুনি। ঠোঁটদুটি বড় লাল, একটু স্থূল। কৃষ্ণভামিনী বলল, ‘নে, হারমোনিয়ামটা টেনে নে।’

রাধা বলল, ‘খোলুঞ্চিখুড়ো এল না মাসি?’

কৃষ্ণভামিনী দেখালেব পেরেক থেকে খঞ্জনি-জোড়া পেড়ে ধমকে উঠল, ‘তুই বোস দিকনি। শ্রীখোল ছাড়াই হবে। পোষমাসের আর কটা দিন মান্ডর বাকি। নবদ্বীপ থেকে বাবাজিব চিঠি এসে পড়েছে। দোসবা মাঘ বেকতেই হবে। আমার কাজ আছে।’ রাধা চোরাচোখে মাসির মুখ দেখে আর কথা বাড়াল না। ওই মুখের কাছে মুখ বাড়ানো যায় না।

প্রতিবছর মাঘমাসেই কৃষ্ণভামিনী নবদ্বীপে যায়। মাঘ মাস ভোর-ভোর সকাল নবদ্বীপের আখড়ায়-আখড়ায়, মন্দিরে-মন্দিরে কীর্তনের আসর বসে। নবদ্বীপের চেহারা বদলে যায়। স্বয়ং বিষ্ণু অবতরণ করেন। লোকে মাঘে যায় প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, মথুরায়। ত্রিবেণীতে কল্পবাস রুদ্রে। আর নবদ্বীপে আসেন নামকবা মহাজনেরা, মহাশয়-বৈষ্ণবেরা। ব্রৈলোকা আচার্য, কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন মল্লিক এইসব বড়-বড় পণ্ডিত, লেখাপড়া-জানা বৈষ্ণব-গায়কেরা আসেন। পদ বচনা করেন, ভাঙেন-গড়েন, পুঁথি নিয়ে বসেন বড়-বড়। আসর হয়, এক-একদিন এক-এক আখড়ায়। সে-আসরে স্থূল-কলেজের ছাত্র-মাস্টারমশাইরাও ভিড় করেন এসে। ওইসব আসরে কৃষ্ণভামিনীর বড় আদর। মহাশয়েরা স্নেহ করেন মেয়ের মতো। বাবাজিরা তাকিয়ে থাকেন সতৃষ্ণ নয়নে। ভক্ত-অভক্ত জনতার রক্তেও আখরার দোলা লাগে।

পানটি নেশার জিনিস। নবদ্বীপেও ভোরবেলা স্নান করে পানটি মুখে দেয় কৃষ্ণভামিনী।
ঠোট রক্তরেখায় বেঁকে ওঠে। ধোয়া নীলাস্বরী পরে আঙুল তুলে গায় :

‘বঁধু, তোমার দেওয়া গরবে,
তোমার গরব টুটাব হে।’

নবদ্বীপ না-গিয়ে পারে না কৃষ্ণভামিনী। আজকাল শহরে বাজারে আর তাদের বড়-একটা ডাক পড়ে না। বায়স্কোপ-থিয়েটার, রেডিও-রেকর্ডে অনেক কীর্তন শোনে লোকে। যত-শত মিঠে গলায় বাহারে পদের গান। তা ছাড়া দিন গেছে বদলে। কৃষ্ণভামিনীর দেহ ও বয়সের ধারায় যুগটা পাশ কাটিয়ে গেছে অন্যদিকে। পাড়াতে তাদের ডাকতেও নাকি অসম্মান। সাইনবোর্ডটা ঝোলানো আছে এক-যুগ ধরে। ওইটি দেখে কোনও দিন কেউ ডাকতে আসেনি তাকে। সাইনবোর্ডটির বয়স বেড়ে গিয়ে টিন বেরিয়ে পড়েছে।

তাই নবদ্বীপ যেতে হয়। সেইখানে কিছু বায়না পাওয়া যায়। এখনও দুব জেলা থেকে ডাক আসে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, আরও তলায় মেদিনীপুর, উঁচুতে মানভূম—প্রবাসের বাঙালিরা ডাকেন কখনও সখনও। কীর্তনের খোঁজে সবাই নবদ্বীপেই আসেন এখনও। কৃষ্ণভামিনী কাছে না-থাকলেও বাবাজিরা ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেয় এখানে। না-গিয়ে উপায় কী।

বছর-দুয়েক আগে, রাধামাধব আখড়ার রাখহরি বাবাজি একদিন গানের শেষে এসে বলেছিল, ‘কেষ্ট, আচাষি মশাই বলেছিলেন, এবার তোমার আখেরটা একটু দেখতে হয়।’
ধক করে উঠেছিল, কৃষ্ণভামিনীর বুক—‘কেন বাবাজি? গান জমেনি?’

বাবাজি বলেছিল, ‘রাধেমাধব। এমনটি আর কার জমে গো? আচাষি বলছিলেন, কেষ্টর বয়স হল। আখেরের কিছু না-করলে শেষ বয়সটা ...’ একটু থেমেই আবার বলেছিল, ‘তোমার কথা সবাই ভাবেন। তাই বলছিলাম, সব গুটিয়েসুটিয়ে একবারে নবদ্বীপেই চলে এসো। শেষ বয়সটা রাধামাধবের সেবা করে—’

ধকধকানিটা থেমেছিল, বুকের যন্ত্রণাটা কমেনি কৃষ্ণভামিনীর। শেষ বয়স। যে-কথাটি অনেকবার তার রক্তস্রোত বলে গেছে কানে-কানে, আজ সকলে মিলে বলছে সেই কথা। সময় হয়ে এসেছে। বেলা যায়, বেলা যায়। কৃষ্ণভামিনী বুঝেছিল শুধু তার রূপ নয়, আবও কিছু আছে। বিলাপের দুই জায়গায় স্বর ছিঁড়ে গিয়েছিল। বুক ভরে দম নিয়ে, গলাব শির ফুলিয়েও শেষরক্ষে হয়নি।

বাবাজি আরও বলেছিল, ‘গলার আর দোষ কী বলো? যেখানে আছ, সেখানে থাকলে অনাচার তো একটু হবেই।’

অনাচার অর্থে নেশা-ভাঙ আর শরীর-পীড়নের ইঙ্গিত করেছিল বাবাজি। একেবারে মিছে বলেনি। কিন্তু নবদ্বীপে এসে থাকলে কি সে-সবের কিছু কমতি হবে? একে তো সে-আশ্রয় হবে পরের আশ্রয়। কৃষ্ণভামিনীর তাতে বড় ঘৃণা। আর, রাখহরি বাবাজি যখন ভালবাসবে, তখন? অমন ঢুলঢুল চোখ বাবাজির, কেষ্টকে ভাল না-বেসে তার উপায় কী।
সে-ভালবাসার আশ্রয় তো সইবে না তার।

তবে আখেরের ব্যবস্থা করেছিল কৃষ্ণভামিনী। মালিপাড়ার মেয়ে সে, নিষ্কেষ্টের জীবন তাকে শিখিয়েছে অনেককিছু। রাধাকে পেয়েছিল সে আটবছর বয়স থেকে। আরও ঝারোবছর ঝাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছে, গান গেয়ে, দেহ পণ্য করে। কীর্তনে দীক্ষাও দিয়েছে অনেকদিন। মালিপাড়ার কারবার ছেড়ে দেয়নি পুরোপুরি। মেয়েটার রং-ঢং আছে। গলাটি একটু খর, তবে মন্দ নয়। কিন্তু বড় মাথামোটা। দিন-রাত্রিই সেজেগুজে আছে। সন্ধ্যা হলেই উকিঝুঁকি মারবে এদিক-ওদিকে। মালিপাড়ার মন্ত্র পড়ছে তো কানে দিবাশি। এখন রক্তের জ্বালা।

প্রথমদিকে শেখাবার অতটা চেষ্টা ছিল না কৃষ্ণভামিনীর। গত দু-বছর থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে সে রাধাকে। তালিম দিচ্ছে চুলের মুঠি ধরে। গতবছর নবদ্বীপের জায়গায়-জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

আখেরের ব্যবস্থা করেছে সে। কাউকে বলে দিতে হয়নি। তার গান, গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, তারও যে আখের আছে, সে-কথা ভেবে কেন মন পোড়ে।

‘বঁধু পীরিতি করিয়া রাখিলে যদি,

অভিসার নিশি কাটে কেন।

না রাখিতে নিশি কাটে না যেন।’

খঞ্জনিতে দু-বার ঝুনঝুন করে কৃষ্ণভামিনী বলল, ‘নে, মানের গানটা ধর।’

রাধা উসখুস করছে। এ-বাড়িতে আরও তিনঘর মেয়ে আছে। এ-সময়ে তাদের কাছে বসে বাধা তাদের বাসরলীলার কাহিনী শোনে। বলল, ‘কোনটা?’

—‘কালকে যেটা হয়েছে।’

ভয়ে বলল, ‘আমাব মনে পড়ছে না মাসি।’

কৃষ্ণভামিনী রাগে জ্বলে উঠল। বলল, ‘তা তো তোর মনে পড়বে না। চিরকাল বারোভাতারি তোর কপালে আছে, খণ্ডাবে কে!’

তারপর এক-মুহূর্ত চুপ করে থেকে গুন-গুন করে উঠল সে—

‘তুমি সুনাগরী রসের আগরী

তেজহ দাক্ষণ মান।

সখির বচনে কমলনয়নী

ঈষৎ কটাক্ষে চান।’

বাধা গান ধরতে-না-ধরতেই গগন এসে ঢুকল। কৃষ্ণভামিনী চেয়েও দেখল না। রাধার জ্ব-দুটি নেচে উঠল শুধু।

এ-আসবে সে নিতান্ত বেমানান। ময়লা হাফশাট গায়ে, তালিমাবা ফটা ফুলপ্যান্ট-পরারিকশাওয়ালাব সঙ্গে কোনও মিল নেই এ-ঘরের। এ-ঘরের সাজানো-গোছানো অল্পসল্প জিনিস, পরিষ্কার যুগলশয্যা, সবকিছুতেই বিপরীত।

দেয়াল থেকে খোলটি পেড়ে, কপালে ঠেকিয়ে একটু দূরেই বসল সে। কৃষ্ণভামিনীর চোখের পাতা নড়ল না। কিন্তু খঞ্জনির রিনিঠিনি খোলার বোলে একান্ত হয়ে গেল। রাধারও গলা ছাড়ল।

গগন লোকটি এ-তল্লাটের নয়। বছর দশেক আগে, বর্ধমানের এক গ্রাম থেকে চলে এসেছে কৃষ্ণভামিনীর পিছনে-পিছনে। কৃষ্ণভামিনী গাইতে গিয়েছিল সেখানে।

লোকটির পিছু-নেওয়া নজরে ছিল তার। দেখেই বুঝেছিল অন্তঃসারশূন্য গঁয়ো বাউণ্ডলে। ঘর-বউ জোটেনি কপালে। রেষ্ট থাকলে একটু আশকারা দিত হয়তো কৃষ্ণভামিনী। মাগনা পিরিতে মন দূরের কথা, শখও ছিল না একটু।

লোকটি কয়েকদিন এ-দিক-সে-দিক করে হঠাৎ এসে বলেছিল, ‘তোমার সঙ্গে এটুস খোল বাজাব ভাই।’

আজকে যেমন অপরধীর মতো হেসে দাঁড়াল, সে-দিনও তেমনি করে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন কৃষ্ণভামিনীর দেহে শ্রাবণের খরস্রোত, আশ্বিনের ঢল বয়সের হিসেবে। চোখের পাতার নিঃশব্দ বাপটাতেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, পারেনি। ও-দিকে আবার গগনের একটু চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা ছিল। বলেছিল, ‘আমার রং-কাল, ট্যাকও কাল, একটু বাজাতে চাই খালি।’

বাজিয়েছিল। বাজিয়ে নিয়েছিল কৃষ্ণভামিনী। তেওড়ার ঢঙে দুঠুকি বাজাতে-বাজাতে গোলাপি নেশার মতো ফুলছিল গগন। আর চোখ দিয়ে যেন চাটছিল কৃষ্ণভামিনীকে। দেখে শুনে ভামিনী রং ফিরিয়ে কালেংড়া সুরে গেয়ে উঠেছিল—

“মতলবে তোর মন ঠাসা,
ঘরের ভাত কাগেব আশা।
নাগর পথ দেখে হে।।”

গগন দমেনি। এক মুহূর্তে তাল চড়িয়ে দিয়েছিল আড়-খেমটার। এমন বাজিয়েছিল, পথ দেখানো যায়নি একেবারে গগনকে।

তারপর বছর চলে গেছে। নানান কাজ করে গগন রিকশা কিনে বসেছে এখানে। সারাদিন দুটি কাজ এখন। রিকশা চালানো, ওইটি পেটের। কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে খোল বাজানো, ওইটি শুধু শখ, না আর কিছু টের পাওয়া যায়নি দশবছর ধরে। এখন কৃষ্ণভামিনীর দরকার হয়ে পড়েছে তাকে। তবে গগনের ওই লালা-ঝরা চোখদুটিকে কোনও আশকাবা দেখনি সে। রিকশাওয়ালার কাছে কীর্তনগায়িকা কৃষ্ণভামিনী বেচতে পাবে না নিজেকে। মাগনা মানিনী নয়, কৃষ্ণভামিনীর মান আছে।

মালিপাড়াব মেয়েরা ফুসলায় গগনকে, ‘কী আশায় আছ? না-হয় রিকশাই চালাও, আব মেয়েমানুষ নেই এ-সোমসারে।’

আছে। কার ঘরে যাতায়াত নেই। তাব বিকশাওয়াল-বন্ধুবা বলে, ‘ওবে শালা, কেউভামিনীর মধু যে চলে যাচ্ছে বছরে-বছরে। যারা খাওয়াব তাবা খেয়ে নিল। তোকে ব্যাটা পাকাচুল বাছতে হবে ভামিনীর।’

গগন বলে, ‘তা জানি। চাকে মধু না-থাক, মোম তো থাকবে। ভামিনীব পাকাচুল, সে-ও যে অনেক ভাগ্য।’

—‘এই মরেছে, শালা কুস্তা নাকি রে।’

গগন হাসে। মাথা গুঁজে সোযারি বয়। তখন বোঝা যায়, তারও বয়সে শীতেব বেলা লেগেছে।

কৃষ্ণভামিনী তাব চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘মরগ। বিকশাওয়াল হলেই অমন নোলা হয়।’

কথায় কথায় গগন দু-একবার ভামিনীর বাড়িতে থাকবার প্রস্তাব কবেছে। খাওয়াটা-থাকাটি যদি এখানেই ব্যবস্থা হত, মন্দ হত না। ভামিনী উগ্রচণ্ডী মূর্তি নিয়ে তেড়ে এসেছে, ‘বেরো, বেরো, বেরো!’

রাধার ঠেকে-ঠেকে যাচ্ছে। ভামিনী খঞ্জনির খুন-খুন শব্দ থামিয়ে বলে, ‘হল না। মুখপুড়ি, একটু হেসে গা। হারমনিয়া ছাড়, খালি গলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গা। আগে বল—’

বলে নিজেই বলে, ‘সখি, আমার মন নেই, কাকে বলো! আমার চোখ নেই, কাকে দেখাও। আমি বধির, শুনতে পাইনে সই। তবুও ওইখানে কে দেখা দেয়? কে ও? ..

‘সখি, কেন কুঞ্জের ধারে দাঁড়িয়ে কালা,
ফিরে যেতে বল।’

এদিকে গগনের হাত যেন অবশ। খোলে চাঁটি নেই। হাঁ করে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণভামিনীর দিকে। রুখে উঠল কৃষ্ণভামিনী, ‘আ মরগ!’

‘মরবার আগেই বিচ-ঘিচ করে খোল কথা বলে উঠল, ‘ফিরে যেতে বল।’

‘রাধা হাসে মিটমিট করে। জোরে হাসতে ভয় পায়। মালি গলায় পা দেবে যে।

আশ্চর্য! রাধা চোরা-চোখে বিজলী হানে গগনকে। তার কটারঙের শরীরের রেখায় বড় ঝাঁজ। নেশা করার মতো স্থূল টকটকে ঠোঁটদুটিতে যেন মনে-মনে কী বলে। দেখে-শুনে খেন্না করে কৃষ্ণভামিনীর। ছুঁড়ির রুচি বলে কিছু নেই। গগনের রকমসকমও তেমনি। রাধার হাসিতে ঢুলে-ঢুলে খোল বাজায়।

বেলা গেল। পৌষের বেলা, এল কখন, গেল কখন, কে জানে। এর মধ্যেই ঘরের মধ্যে মশার সানাই বাজছে। স্থির হয়ে বসতে দেয় না একদণ্ড। ঘরে-ঘরে ধোয়াপোছা, সাজগোজ চলছে। বাতি জ্বলছে বার-বাসরে।

গান শেখানো শেষ হল। গগন উঠতে যাবে। কৃষ্ণভামিনী বলল, ‘বাধি, রিকশাওয়ালাকে জিগ্যেস কর, ওর খোল বাজাবার কত চাই।’

গগন বলল, ‘খুব বেগে গেছ বাপু। দশবছর যখন দেওনি, থাক। সবটা একসঙ্গেই দিয়ে না-হয়।’

কৃষ্ণভামিনী বলল, ‘বাকি-বকেয়া আমি ভালবাসিনে।’ টান মেরে আঁচল নামিয়ে চাবির গোছা খুলতে খুলতে বলল, ‘আব, রাস্তার মানুষেব সামনে ছোটলোকের মুখে ছোট কথাও শুনতে চাইনে।’

কালো মুখে, হলদে চোখে গগনকে বোবা অসহায় জানোয়াবেব মতো মনে হয়। মুহূর্ত নির্বাক থেকে বলল, ‘আচ্ছা বাপু, আর-কোনওদিন কিছু বলব না। এবার থেকে সময়মতো আসব।’

বলে না-দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল। বিকশা বাব কবতে যাবে। দবজাব পাশ থেকে বাধা বলল, ‘চললে, খোলুঞ্চিখুডো?’

গগন বলল, ‘হাঁ লো! তোর মাসিব যা রাগ।’

বাধা বলল ঠোট ফুলিয়ে, ‘তা বলে আমি তো আর রাগ কবিনি।’

গগন বলল হেসে, ‘কববি কেন। তুই তো আর কেষ্টভামিনী নোস! তা, হাঁরে, রাতে কেউ আসবে নাকি তোর মাসিব গান শুনতে?’

—‘আজ? হাঁ, ওপারেব মথুব ভটচাঘ আসবে বাত দশটায়।’

—‘থাকবে বুঝি বাত্রে?’

—‘কী জানি। তুমি আসবে?’

সে-কথাব কোনও জবাব না-দিয়ে রিকশা নিয়ে বেবিযে গেল গগন। রাস্তার উপর থেকে কে-একজন শিশু দিয়ে উঠল বাধার দিকে চেয়ে। রাধা হাসল। মালিপাড়া জমে উঠেছে শীতেব সন্ধ্যায়।

জুড়িয়ে এল রাত দশটাতেই। শীতে আপাদমস্তক ঢেকে কৌকাতে-কৌকাতে এল মথুব ভট্টাচার্য। তাব পিছনে-পিছনে গগন।

কৃষ্ণভামিনী সেজেছে। শান্তিপুবেব নীলাম্বরী তার বড় প্রিয়। বংটি মাজা-মাজা হলেও মানায়। মুখে স্নো-পাউডার মেখেছে, জামার গলাটি একটু বেশি কাটা। চওড়া ঘাড় ও গলায় বয়সের ডেউ পড়েছে। ঢাকা পড়েছে একটু চওড়া বিছেহার। পান-রাঙানো ঠোট, পায়ে আলতা। ভট্টাচার্যকে দেখে অভ্যর্থনা করল, ‘আসুন ভটচাঘমশাই।’

মথুর বলল, বুড়োটে গলায়, ‘আঁ? আসব? তা আসব। কিন্তু তোমার সেই মেঘোটি, কী নাম তার? রাধা, হাঁ, রাধা! আজ তার মুখে একটু ভাব-সম্মিলনের গান শুনব। তোমাব গান তো অনেক শুনেছি, কেষ্টভামিনী।’

চকিত ছায়ায় এক-মুহূর্তের জন্য কৃষ্ণভামিনীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেক শোনা হয়েছে, অনেক। গান শুনবে লোক, কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর দিন বুঝি আর নেই। ভাব-সম্মিলনের

মিলন-কোলাকুলির রস উপছে পড়বে না বুঝি আর তার গানে। পর মুহূর্তেই হাসল। পঞ্চম স্বতুতে শীতার্ঘ শুদ্ধ হাসি যেন। ভাল, ভালই তো। সে আসল, রাখা যে তার সুদ। তারই গান শুনুক লোকে। বলল, 'বেশ তো, শুনবেন, বসেন।'

মথুর বসল। ভূতের মতো বেমানান, তালি-মারা প্যাণ্টটা পরে হাঁ করে বোকা-চোখে গগন তাকিয়ে ছিল ভামিনীর দিকে। চোখে চোখ পড়তে, চমকে খোল নামাল সে।

রাখা তখন অন্য ঘরে। ভামিনী বলল, 'বসুন ডেকে নিয়ে আসি।' রাখাকে নিয়ে তখন অন্য ঘরে টানাটানি। ছাড়িয়ে নিয়ে এল ভামিনী। মথুর বলল, 'এসো এসো।'

পৌষসংক্রান্তি গেল। উত্তরায়ণে বাঁক নিল সূর্য। সোনার মতো রোদে ছায়া বেঁকে গেল একটু দক্ষিণে। দিনের ঘোমটা খুলতে লাগল একটু-একটু করে।

দোসরা মাঘ রাখাকে নিয়ে রঙনা হল ভামিনী। গগনও এসে ঢাকা বারান্দায় তুলে দিল রিকশা। শ্রীখোল নিল কাঁধে। সে-ও যায়। না-গিয়ে পারে না। বাজাবার বড় সাধ। দশবছর ধরে নবদ্বীপে সে-ও চেনা হয়ে গেছে। 'কেষ্টভামিনীর খোলবাবাজি' তার নাম হয়েছে। গগন বড় খুশি। আর আজকাল অপরে খোল ধরলে একটু বাধো-বাধো লাগে ভামিনীর। গগনের সেখানে বেশ নাম। তবে, বেশিদিন থাকতে পাবে না। পেট চালাতে হবে তো। দু-চারদিন বাদেই ফিরে এসে রিকশা নামায়।

মালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষেরা বলে, 'কেষ্ট খেতে দিলে না বুঝি?'

গগন বলে, 'আমি কেন খাব?'

রঙনা হল তারা। পাড়ার মেয়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'মাগীর ঠাকার দেখলে গা জ্বালা করে।' স্টেশনে গিয়ে ভামিনী দুটি টিকিটের টাকা দিল গগনের হাতে। গগন তিনটি টিকিট কেটে নিয়ে এল।

নবদ্বীপে আসার জমে উঠেছে সংক্রান্তির দিন থেকেই। সকলেই অভ্যর্থনা কবল কৃষ্ণভামিনীকে। আখড়ায়, মন্দিরে, চেনাশোনা বাড়িতে। রাখাকে গতবছরই সবাই দেখেছে। গতবছর রাখা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে, রাখার কাছ-খোঁষাখোঁষির জন্যে সকলে বড় ঠেলাঠেলি করেছে। গগন-খোলুধিকেরও চেনে সকলে। রাখহরি বাবাজিও আখড়াতেই আস্তানা নিল ভামিনী।

মহাজন মশাইয়েরা এসে ঠাই নিয়েছেন এক-এক জায়গায়। আসরে দেখা হয় সকলেব সঙ্গে। সকলেই ডেকে কুশল জিগ্যেস করলেন ভামিনীর।

পবদিনই গানের আসরে বসল ভামিনীর। লোকাবণ্য হল সেই আসর। প্রথমদিন। সে কৃষ্ণরাখা ভজল, খোল-করতাল ভজল, মান্যগণ্য মহাজন-গুরুজন ভজল। তারপর ধরল :

‘প্রভু না বাঁধিয়ে টানো,
কী যে টানে টানো
আমারে জনম ভরিয়ে টানো।
পীরিতি রশিতে বাঁধিয়া টানো।
টানো হে!
ধূলায় পড়ে, কাঁটায় ফুটে
রক্ত ঝরে, জ্বালায় পুড়ে,
মরিব, তবু টানো হে নাথ।’

অনেকক্ষণ গাইল ভামিনী। কিন্তু তেমন সাড়া-শব্দ পড়ল না। নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগল ভামিনীর। চৌট শুকিয়ে উঠতে লাগল। চোখের কটাক্ষে সেই রং ফুটেছে না। সুরের দোলায়-দোলায় হাত উঠছে না তেমন করে।

এক-কঁাকে বাইরে এল। রাখহরি বলল, ‘কী হয়েছে তোমার, কেঁট?’

—‘কেন?’

—‘গলায় যে তোমার বয়সা ধরেছে।’

—‘বয়সা?’ হেসে উঠল ভামিনী। বলল, ‘এ-বয়সে আবার বয়সা কী বাবাজি? সে তো ছেলেমানুষের ধরে।’

রাখহরি বলল, ‘এ-বয়সেও ধরে গো। গলায় তোমার দো-আঁশলা জট পাকাচ্ছে কেন?’

দো-আঁশলা জট। আচমকা শীতের কাঁপ ধরে গেল যেন ভামিনীর বুকে। হেসে বলল, ‘একটু চা খেয়ে নিতে হবে।’

রাখহরি ভামিনীর আপদামস্তক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, ‘থাক না। এবাব না-হয় থাক। তোমার রাধাকে গাইতে দাও। দেখা যাক, কেমন শিখেছে।’ রাখহরির চোখের দিকে তাকিয়ে ভামিনীর রাঙা শুকনো ঠোঁটও বেঁকে উঠল। কিন্তু গাইতে বলল রাধাকেই।

রাধা জ্ঞা তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে গাইল :

‘আমাবে, অবলা পেয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
বাঁধিলে পীরিতি ফান্দে।

অতি অভাগিনী কুট নাহি জানি
ফান্দ খোলে কি ছান্দে।’

গলা একটু খরো। কিন্তু কাঁচা গলাব চড়া সুরে, আর কাঁচা বয়সের কিশোরী ঠমকে আসর ওনওন কবে উঠল। কোথায় ছিল আসরের এই হাসি ও আনন্দাশ্রু?

অন্ধকার চেপে আসছে কৃষ্ণভামিনীর মুখে। তবু হাসছে। শীত, বড় শীত গুর-গুর করে কেঁপে উঠছে বুকব মধ্য। কেন? চুলের মুঠি ধবে যাকে শিখিয়েছে, সেই রাধার গুণে বলিহরি যাচ্ছে সব। তার সুদের ঐশ্বর্য।

স্বয়ং মোহিনী মল্লিক মহাজন আশীর্বাদ করলেন ভামিনীকে, ‘বাঃ বেশ। শুধু আখেরের স্বার্থে এমনটি শিখুনো যায় না, মা। তুমি সত্যিকারের আখেরের কাজ করেছ।’

বড় সুখ, তবু মুচড়ে মুচড়ে ওঠে বুক। কীর্তন-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী আর নেই, আখেরের কাজ আছে। এমন মহাজন কেন হল না ভামিনী, যে সুদের নেশায় বঁদ হয়ে থাকে।

কেবল দুটো দিন গগন চূপচাপ খোল বাজাল। আর অপলক চোখে চেয়ে দেখল ভামিনীকে। যতবাব চোখাচোখি হল, তার হ্যাংলামো দেখে ভামিনী বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে নিল মুখ। মরলে ওকে হাড় ক-খানা চিবোতে দিয়ে যাবে।

দু-দিন পবে গগন বিদায় নিল। বলে গেল আবার আসবে মাগেই।

ভামিনী মনে-মনে বলল, পাছ ছাড়লে বাঁচি।

তারপর গান চলল আখড়ায়-আখড়ায়। রাধা এবার ভাসিয়ে দিল নবদ্বীপ। যা গায়, সবই মানিয়ে যায়। একদিন কৃষ্ণভামিনীরও যেত। যা করত, যা বলত, যা গাইত, তা-ই ভাল লাগত লোকের। খরশোতা কৃষ্ণভামিনীকে দেখছে সে বাধার মধ্য। সবাই রাধাব পিছনে-পিছনে।

রাত্রে রাধাকে বুকে নিয়ে আদর করল ভামিনী। বলল, ‘রাধি, আমার মান রেখেছিস তুই, মান রেখেছিস।’

বলতে-বলতে চোখ ফেটে জল এল। রাধা অব্যাক হল। একটু বিবক্তও। বলল, ‘এ আবার তুমি কী শুরু করলে বাপু। ঘুমোতে দাও।’

যুমোতে দিল তাকে। নিজের হাতে ভাল করে কঁষল ঢেকে দিল। হয়, এমনটি হয়। এত জনে-জনে, মহাজনে, সবাই মিলে চোখে-মুখে তাকে বন্দনা করছে—হবে না। একসময় কৃষ্ণভামিনীরও যে হয়েছিল।

আসরে আর ভাল করে ভামিনীকে কেউ সাধেও না। রোজ গাওয়াও হয় না তার। তবু আসরে-আসরে থাকতে হয়, বসতে হয়।

বায়না পাওয়া গেছে কয়েকটি। বায়নার শর্ত রাখা, তবে কৃষ্ণভামিনীকেও চাই। চাই বৈকি! সুদকে একলা ছাড়বে কী করে সে!

মাঘের শেষে এল আবাব গগন। এসে দেখল, ভামিনীর চোখের কোলে কালি। মুখখানি শুকনো। চলতে-ফিরতে পিঠে ব্যথা। যেন এতদিনে সতিই বুড়ি হয়ে গেছে সে। পা ছড়িয়ে বসে। তেমন সাজাগোজা নেই। যেন মালিপাড়ার সুকিমাসি।

গগন বলল, ‘শরীলটা তোমার খারাপ দেখছি যে।’

মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠল ভামিনী, ‘শরীলটা ছাড়া বুঝি আব-কিছু দেখতে পাও না ওই মরাখেগো চোখে?’

গগন বলল, ‘তা-ও দেখতে পাই।’

—‘কী দেখতে পাও?’

—‘তোমার দুঃখ।’

—‘মবে যাই আর কী! উনি এলেন আমাব দুঃখ দেখতে, হুঁ।’

তারপর হঠাৎ কী হল ভামিনীর। ভীষণ ক্ষেপে উঠল, বলল, ‘গতরখেগো মিনসে, আব কবে ছাড়বে পেছন? মলে? তবে আগে মরি, তাবপর ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ো।’

গগন একবারে ভাবাচাকা খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলল, ‘আচ্ছা, তাই হবে, তুমি চূপ করো এখন।’

বলে সবে পড়ল।

মাঘ-মাসের শেষ কটা-দিন কাটিয়ে যাত্রা শুক হল। গুটি-সাতেক বায়না আছে। কৃষ্ণনগবে, চোতখণ্ডে, রামপুরহাট, ধানবাদ, গোটা দেশটায় প্রায়।

সব জায়গাতেই সবাই ছুটে এল কৃষ্ণভামিনীর নাম শুনে। মুঠি ভবে পয়সা আর বাহবা দিয়ে গেল রাখাকে। তবে কৃষ্ণভামিনীকেও বাহবা দিয়েছে সবাই। সে নইলে এমন মেয়ে-শাগরেদ আর কার হয়।

চোতখণ্ড অবধি সঙ্গে রইল গগন। ওখানেই কাছাকাছি তার জন্মভূমি। সে বিদায় চাইলে ভামিনী বলল, ‘আগে বলোনি কেন? আমার খোল বাজাবে কে?’

গগন বলল, ‘পেটের ব্যবস্থা দেখতে হবে তো আমাকে। ট্যাক যে ফাঁক!’

ভামিনী বিরক্ত হয়ে বলল, ‘না-হয় খেতেই দেব।’

হলদে চোখ অন্যদিকে তাকিয়ে বলল গগন, ‘তা পারব না বাপু আমি। খোল-বাজিয়ে যোগাড় করে দিয়ে যাচ্ছি।’

সেইদিনই বর্ধমান শহর থেকে জুটিয়ে দিয়ে গেল একজনকে। ভামিনী ঠোট উল্টে বলল, ‘মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। আপদ কোথাকার! ও আবার খাবে খোল বাজিয়ে।’

পয়লা বৈশাখ ফিরে এল কৃষ্ণভামিনী আর রাখা। রোজগারে একটু ভাঁটা পড়েছিল কয়েক বছর। এবার সুদৃষ্টি আদায় করে নিয়ে এসেছে ভামিনী। কিন্তু বুকের কাঁটার মতো একটা লোক পেছন নিয়েছে বর্ধমান থেকে। যত জায়গায় তারা গেছে, সব জায়গায় গেছে লোকটা। ভাবও হয়েছে খুব রাখার সঙ্গে। রাখার আশকারাতেই এখানেও ছুটে এসেছে।

বুকে বড় ধুকপুকু ভামিনীর। গগনের মতো হলেও ভাল ছিল, কিন্তু লোকটি অল্পবয়সী পয়সাওয়ালা উগ্রকৃত্রিয় ঘরের ছেলে। সহজে ছাড়বে না। ভাব জমাবার চেষ্টা করেছে ভামিনীর সঙ্গে। রাধার সঙ্গে পিরিত হয়েছে। একেবারে দূর-দূর করতে পারেনি।

ফিরে এসে রাধা বলল, ‘মাসি, লোকটা কিন্তু দু-দিন থাকবে এখানে।’

ভামিনী গম্ভীর গলায় বলল, ‘না।’

রাধা ফুঁসে উঠল, ‘হ্যাঁ, থাকবে।’

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কৃষ্ণভামিনী। কিন্তু সে-তেজ নেই তার আর। নিস্তেজ গলায় বলল, ‘মুখপুড়ি, বেশি অত্যাচার করলে গলাটা যে যাবে।’

রাধা হুকুমের সুবে বলল, ‘যাক। গলার জন্যে কি কারুর ঘরে লোক আসা বাদ ছিল।’

অন্ধকার মুখে চুপ করে রইল ভামিনী। বুকের মধ্যটা পুড়তে লাগল চাপা আগুন। চোখের মণিতে সে-আগুন নেই, অঙ্গুলি-সংকেতের সেই নির্দেশ নেই। রাজেন্দ্রানী কৃষ্ণভামিনী নেই।

সারা বাড়ি মজা দেখল। বাধা আব তার লোকটিকে নিয়ে গুলজাব করল সবাই। মালিপাড়ার বুড়ি-ছুড়ি সবাই বলল, ‘মাগীর তেজ একটু কমেছে।’

কীসের তেজ! কেন, তেজ তো কোনওদিন ভামিনী দেখায়নি কাউকে। সে যা, তা-ই তো সকলের কাছে তেজ।

গগন এল যথাপূর্বং। আসতে লাগল বোজ আগের মতোই। রাধার লোকটি বিদায় নিয়েছে। সব সময় ভামিনীর কথা মানে না বাধা। তবু ঝগড়া কবে, টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে বসে ভামিনী। গান হয়। খোল বাজায় গগন।

রাধাকে দেখাতে গিয়ে গলা খুলতেও লজ্জা করে কেন-যেন ভামিনীর।

সপ্তমে বাঁধা রাধাব গলা টং-টং করে বাজে। ভামিনীর গলা বেসুরো ঢাবঢেবে শোনায় সেখানে। অপ্রতিভ হয়ে খাঁকারি দেয়, আবার তোলে গলা। বলে, ‘নে বল—’

রাধা বলে, ‘থাক বাবু, তুমি বরং একটু শুয়ে থাকোগে।’

বলে উঠে যায়। কথা সরে না ভামিনীর মুখে। শুধু বসে থাকে চুপ করে। হঠাৎ একসময়ে খেয়াল হয়, মুখোমুখি খোল কোলে করে বসে আছে গগন। জুঁকুচকে বলে, ‘বসে আছ যে?’

গগন বলে অপ্রতিভ হেসে, ‘যদি এটু গাও, তা হলে বাজিয়ে যাই।’

—‘কে, আমি? বস যে প্রাণে ধরে না দেখছি। গাইব এ-বার ঘাটে গিয়ে, পালাও, পালাও।’

আরও একটি বছর গেল এমনি। রাধাব সেই পিরিতের ছেলেটি এসেছে মাসে একবার করে। এ-বছরও ঘুরেছে সঙ্গে সঙ্গে। সঙ্গে মালিপাড়ায়ও এসেছে। এ-বার ফিরে এসে রাধা দু-দিন বাদেই বলল, ‘মাসি, আমি চলে যাব।’

ধক করে উঠল কৃষ্ণভামিনীর বুকের মধ্যে। চারবছর আগে রাখহরির কথায় এমনি ধক করে উঠেছিল। গানের গলা নেই, আজ কথা বলবারও গলা নেই ভামিনীর। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রাধার নির্বিকার দৃঢ় মুখের দিকে। খানিকক্ষণ পর বলল, ‘কোথায় যাবি?’

—‘ওর সঙ্গে।’

ওর, মানে সেই পিরিতের লোকটির সঙ্গে। বুকের মধ্যে কন-কন করছে কৃষ্ণভামিনীর। পঞ্চম ঋতুর দারুণ শীতে নেমেছে হিমপ্রবাহ। গলা গেছে, গান গেছে, ধমকটমক গেছে। সুদ যাচ্ছে আজ, আসল খেয়ে গেছে কবে। মথুর ভটচাঘরা কবেই ছেড়ে গেছে। টাকা-পয়সা সোনাদানা ও কিছু রানীর ঐশ্বর্যও নেই। এ-বয়সে আর কীসের বেসাতি করবে। কে আসবে এ-ঘরে?

ভামিনী বলল, ভীত করুণ চোখে তাকিয়ে বলল কীর্তন-গায়িকা কৃষ্ণভামিনী, 'যাবি মানে ? তোকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করলাম, শেখলাম-পড়লাম, আমাকে কোথায় রেখে যাবি ?'

রাধা বলল কটকট করে, 'খাইয়েছ-পরিয়েছ বলে, আইন নেই যে, তুমি আমাকে চিরদিন ধরে রাখবে। মন চাইছে যাকে, তার সঙ্গে চলে যাব।'

মন চেয়েছে। এ বুঝি ভালবাসা। থিয়েটার-বায়স্কোপে এমনি পিরিতের আজকাল নাকি বড় ছড়াছড়ি। কিন্তু দু-দিনে যে তেজ ভেঙে যাবে। ঘরের বউ না, কুলটা। তোকেও যে একদিন এমনি করে এক রাধাকে খাওয়াতে-পরতে হবে।

গভীর গলায় বলল ভামিনী, 'যা।'

এমন আচমকা আর নির্বিকারভাবে বলল ভামিনী যে, রাধাও এক-মুহূর্ত থমকে রইল। কঁকড়ে উঠল ঠোঁটদুটি।

ভামিনী বাইরের দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখল। একটা রিকশাওয়ালা যাচ্ছিল, তাকে বলে দিল, 'তোমাদের গগন-রিকশাওয়ালাকে একটু ডেকে দিয়ে তো।'

ও-দিকে যাবার তাড়া লেগেছে। আর তিন ঘরের মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। খবর রটেছে সারা মল্লিপাড়ায়। সবাই একবার করে দেখতে আসছে রাধা আর তার নাগরকে। রাত দশটায় চলে যাবে ওরা।

ভামিনী বসে ছিল বাতি জ্বালিয়ে। মনটা বড় গান করতে চাইছে, পারছে না ওদের কথার ফিস-ফিস খিল-খিল হাসিতে।

একটু পরেই এল গগন। বলল, 'তুমি নাকি ডেকেছ ?'

ভামিনী বলল, 'হ্যাঁ। বলছিলাম, আমার একটা লোক দরকার। রোজগেরে লোক। আমাকে রাখতে পারে এইরকম।'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে রইল গগন। বৈশাখ মাস। সারা গায়ে ধুলো-বালি গগনের। কালো মুখে ঘাম। তারপর হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল গগন। অন্যদিকে চেয়ে বলল, 'তা আমাকে যদি বলো, এখনও রিকশাটা চালাই, রোজগারও হয়। আমি তোমার কাছে থাকতে পারি।'

ভামিনী বলল, 'তোমার যদি মন চায়। থাক। তো নয়, আমাকে রাখাও বটে।'

গগন বলল, 'তা তো বটেই। তবে আজকের রাত থেকেই থাকি ?'

কৃষ্ণভামিনীর চোখে যন্ত্রণা ও ঘৃণা। বলল, 'এসো।'

—'খাওয়াটাও আজ থেকে তা হলে এখানেই হবে ?'

—'তা-ই হবে।'

গগন বেরিয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল। একটু খাটো হলেও কোঁচা দিয়ে আজ ধূতি পরে এসেছে গগন। গায়ে স্কারের কাচা জামা, গলায় একখানি সুতির চাদর। পায়ে অবশ্য টায়ার-কাটা স্যান্ডেলটিই আছে।

এই বেশে তাকে রিকশা চালিয়ে আসতে দেখে সবাই হইচই করে উঠল। ভামিনীর বাড়ির মেয়েরাও হেসে কুটিপাটি—'ওমা! এ কী খোলুঞ্চিখুড়ো!'

ও-দিকে যাবার সময় হল। বিদায় নিল রাধা, গগন-ভামিনীর কাছ থেকে। ভামিনী নীরব। গগন বলল, 'সুখে থাকিস, বুঝে চলিস।'

চলে গেল ওরা। তারপর সবাই উকিঝুঁকি দিতে লাগল ভামিনীর ঘরে।

ভামিনী রান্না শেষ করল। চোখ না-তুলে মাটির দিকে চেয়ে আসন পেতে খেতে দিল গগনকে। খাওয়া হলে, গা ধুয়ে খোয়া-কাপড় পরে গগনের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসবার

চেষ্টা করছে না। বুকটা বড় ধড়ফড় করছে। ঠাট-বাট করতে হবে। কিন্তু রক্তে সে-দোলা নেই। বয়সের ভারে অচল।

তবুও হেসে তাকাল। চোখের চারপাশে কঁোচ পড়েছে। সেই চোখে অসহায় ইঙ্গিত। গগন হেসে মাথা নামাল।

দরজা বন্ধ করল ভামিনী। জানালা বন্ধ করল। বাতিটা কমাল, কিন্তু জ্বলতেই লাগল। সামান্য অস্পষ্টতা। তারপর কাছে এসে হাত ধরল গগনের।

গগন চমকে উঠে বলল, ‘কই, হারমনিয়া পাড়লে না?’

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল ভামিনী, ‘কেন?’

—‘গাইবে না?’

কৃষ্ণভামিনী বলল, ‘শোবে না?’

তেমনি অপ্রস্তুতভাবে হাসতে গিয়ে আজ প্রথম গগনের মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। বলল, ‘কেষ্টভামিনী, ওইটির জন্য তোমার কাছে আসিনি। তুমি যা দেবে, সব নেব। কিন্তু কেষ্টভামিনী—’ বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ঢোক গিলে বলল, ‘তোমার কাছে থেকে বাজাব, তা-ই চাইছি এতকাল ধরে।’

বিস্মিত সংশয়ে ফিরে তাকাল কৃষ্ণভামিনী। পরমুহূর্তে চোখে জল এসে পড়ল তার। রুদ্ধগলায় বলল, ‘কেন?’

গগন বলল, ‘বাবারে! সব ভুলে গেলাম কেন্দনগায়িকা কেষ্টভামিনীর গান শুনে, সে কি ভুলতে পারি? আজ যদি ডাকলে, এটু বাজাতে বলো আমাকে।’

কে বলবে! কে কথা বলবে! হৃদয়ের সব গান আজ আর-এক গানের রসে যে গলা বুজিয়ে দিয়েছে।

হারমোনিয়াম পেড়ে নিল গগন। শ্রীখোলটিতে কপাল ঠেকিয়ে কোলে নিয়ে বসল। বলল, ‘গাও।’

হারমোনিয়ামে সুর উঠল। কৃষ্ণভামিনী সুর দিল। সুর উঠল, স্বর উঠল। সেই স্বরে পঞ্চম ঋতু পেরিয়ে ষষ্ঠ ঋতুর বাতাস লাগল।

সারা মালিপাড়াটা প্রেতিনীর মতো ফিসফিস করে হাসতে লাগল, ‘কেষ্টভামিনী আবার গাইছে গো!’

জীবন ও জীবিকা

ছবি বসু

রাধা আর সরমা।

তা নাই নাই করে একটানা চারবছর রয়েছে পাশাপাশি ঘবে। আত্মীয়তা নেই, এমনকি একদেশের সীমারেখাও দুজনের নয়, তবু কোথায় যেন অচ্ছেদ্য বন্ধন।

রাধা পূর্ববাঙলার বরিশালের মেয়ে, বালবিধবা, বাবা মা আব ছোট ভাইকে নিয়ে কলকাতা এসেছিল দেশ ভাগাভাগির পর; এধার ওধাব বাঁধভাঙা জলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। তারপর মাটি মিলেছে, নেতাজী কলোনীতে ছোট স্কুল গড়ে তুলেছিলেন বাবা, সেখানে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে রাধা। ইতিমধ্যে বাবা মারা গেছেন। ভাইটা বখে গেছে। সবকারী স্বাস্থ্যদপ্তরে চাকরি পেয়ে মা আব ভাইকে নিয়ে বেলেঘাটার এই ঘর দুখানায় সংসার পেতেছে রাধা।

আর সরমা।

ওর দেশ বীরভূম। বাবা ছিলেন ডাক্তার, ছোটবেলা থেকেই ওব নাকি স্বাস্থ্য খারাপ। মানে হার্ট দুর্বল। মা নেই। এক পিসী মানুষ করেছে তাকে। পিসী বলতেন—মেয়েমানুষের আবার হার্ট। দাদা নিজে ডাক্তার তাই মেয়ে নিয়ে যত আদিত্যতা, আরে বাবা মেয়েমানুষের জীবন—জীবন নয়, যন্ত্রণার ভোগ।

আসলে যার জন্য সরমার বিয়ে হল না সেটা অন্য কথা। এক গণংকার হাত দেখে বললেন—সরমার হাতে টানা বৈধব্য-রেখা, বিয়ের বছর ঘুরবেও না ব্যস।

পিসীমা তারম্বরে চ্যাচালেন—হ্যারামজাদা গণংকার, বেরোও আমার বাড়ি থেকে। তিনদিন উপোস করে শিবের মাথায় জল ঢালতে হল সরমাকে। শেষপর্যন্ত সরমাই ধনুর্ভাঙা পণ করলে বিয়ে কখনই নয়। বেহুলার মত মনের জোব আব তেজ তাব নেই। সরমার বিয়ে-পর্ব তাই ওখানেই ইতি।

বাবা মারা যাবার পর পিসীকে নিয়ে সরমা এল কলকাতায়। লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি, তার ওপর রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত রেডিও-সেট বানাবার একটা দিশী কারখানায় কাজ পেল সরমা।

সেই থেকে পিসীকে নিয়ে রাধার পাশের ঘরে তার সংসার শুরু। আর ওদের দুজনের একজনের মা আর একজনের পিসী ভাবেন পায়ের কাছে খড়কুটোও মিলেছে, এখন ঠাকুব মুখে তুলে চাইলে হয়ত সংসারটা যাহোক করে দাঁড়িয়ে যাবে।

সরমা কারখানার ডিউটিতে বেরবার পর কলাইয়ের বাটি করে সজনে উঁটা চচ্চড়ি নিয়ে ওর পিসী যান রাধার মার ঘরে, নয়ত রাধার মা এক বাটি শুকতো নিয়ে আসেন সরমাদের ঘরে। দুজনেই দুজনের মেয়ের প্রশংসায় মুখর।

, আপিসে মুখ তোলার এক মিনিট সময় পায় না মেয়েটা, শুধু কাজ আর কাজ। শুনছি ত সামনের মাসেই প্রমোশন, তা হবে না বলুন! ধর্ম্য ত আছে। মেয়েটার খাটুনির মূল্য দেবে

না! বাধার মার কথায় জবাব দেন সরমার পিসী—যা বলেছেন, আমিও বলি মুখের রক্ত তুলে ওভারটাইম খাটার তোর কি দরকার বাপু! দুজন মানুষের সংসার, যাহোক করে চলে যাচ্ছে। তবু দেখুন না টাকার নেশা আর এদের কাটে না; রাধার মা নিঃশ্বাস ছাড়েন—ছেলেটা যদি মানুষ হত তাহলে কি আর ওকে এত খাটতে দিতাম!

—আর ঐ মুখপোড়া গণংকার। কি যে মাথায় ঢোকালে, নইলে এতদিনে মা আমাব সাত ছেলেব মা হত। কি বল দিদি, হত না?

কথাটা দুই মেয়ের কানেও কোন সময় ওঠে। আর ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হাসে।

সরমা ক্ষমা-ক্ষমা ছোট্ট মানুষটি। এখনও বয়সের ভাব মুখে নামেনি। রাধা ওর সলজ্জ মুখের দিকে চেয়ে বলে—হ্যাঁরে সত্যি, সম্বন্ধ করব নাকি? আমাদের সেক্ষণে অনেক আইবুড়ো ছেলে আছে। ওদের সবার সঙ্গে আমার ভাব, মনে হয় কথা কেউ ফেলতে নাও পারে।

—অত ভাব ত নিজে বিয়ে কবলেই পার। চোদ্দ বছর বয়সে মানুষ আবার বিধবা হয় নাকি?

রাধা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। কথাটা সেও যে আগে না ভেবেছে এমন নয় কিন্তু একটা পরিণত বয়সে নতুন ঝুঁকি নিতে...

রাধা বলে—জানিস সেদিন আপিসেব সেই পিকনিক পার্টিতে হঠাৎ যেন অনেক কিছু আবিষ্কার করে ফেললাম।

—যেমন?

রাধার পুকখালি ঠোট বাঁকা বিদ্রূপে কঠিন হয়।—অফিসে যাদেব চোখে নেহাতই সাদামাটা বলে মনে হয়েছে তাদেরই এক-এক জোড়া মেয়ে-পুরুষ জলের ধাবে, কোপেঝাড়ের আশেপাশে কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে গল্প করছে। ঠিক যেন বায়স্কোপ দেখছি মনে হচ্ছিল।

—কি রকম বোকা বোকা লাগে তাই না? সবমা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

আসন্ন সন্ধ্যায় অফিস কাবখানা ফেরত দুজনেই বাবাদায় বসে গল্প করে। দু পোয়ালা চা নিয়ে ওদের সারাদিনের যত কথা, যত ঘটনা পরস্পরকে জানান চাই।

দুজনের মা নয়ত পিসী কাপড় ছাড়বার কথা বলে বলে আর পাবেন না। ব্যাগ, ছাতা, মেজের ওপব এধাব ওধাব ছড়ান। সাবাদিনের পর এ সময়টা ওদেব স্বপ্ন দেখার অবসর। সরমা ফস করে বলে—এ ধরনের রোমাঞ্চ তুমি ঠিক অনুভব করতে পারবে না রাধাদি, ঠিক প্রেমে পড়ার মত ভালবাসা। নিজেব হাতে গড়ছি আস্ত একটা যন্ত্রকে, সেটা মানুষের ঘরে ঘরে কোন্ সুদূবে চলে যাবে যেখানে আমাকে কেউ চেনে না কিন্তু আমার সৃষ্টিতে আনন্দ পাবে। সাত ছেলেকে জন্ম দেবার চেয়ে এর আনন্দ যে মোটেও কম নয় সে কথা পিসীমাকে বোঝাই কি করে। রাধা গম্ভীরভাবে বলে—কারখানার যন্ত্র নিয়ে আর আদিখ্যেতা কোর না। নিত্যি ওখানে গণ্ডগোল লেগেই আছে। মালিকের মাটিতে তোমাদের রুজি রুটি, আর যন্ত্র নিয়ে অত বড়াই করছিস, আমবা মানুষ হয়ে যন্ত্রের বাড়ী খাটছি, নিজের টেবিলের ফাইল ক্লিয়ার কর তারপর ফিল্ডে ছোট। জিপে চেপে সারাদিন ধুলো কাদা মেখে মুখা লোকগুলোকে বোঝাও কেন কলেরা বসন্তের ইন্জেকশন দেওয়া দরকার। টেচিয়ে টেচিয়ে গলা ব্যথা হয়ে যায়, নিজের দিকে কি আর নজর আছে?

—নিজের আবার কি হল?

সরমাব প্রশ্নে রাধা থিচড়ে যায়—ভাইটা পাড়ায় মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। কিছু বললে মা কাঁদতে বসবে।

—একটু বিশ্রামের দরকার তোমার। সরমা চাপা গলায় বলে।

—সে আর হয়েছে। ছুটির কথা বললে সেকশন-ইনচার্জ বাঁড়জ্যো ত হৈ হৈ করে উঠবেন। তাঁর ধারণা রাধাকে ছাড়া অফিস চলবেই না।

—কথাটা মিথ্যে নয়। অফিস না হলেও তাঁর ত চলবেই না।

—ফের ফাজলামি, আমি তোমার চেয়ে বড় নয়?

রাধার কপট রাগে সরমার হাসি বরফের কুচির মত ছড়িয়ে পড়ে।

পরমুহূর্তে গাঢ় গলায় সরমা বলে— ছোটবেলায় সেতার বাজাতে কী ভাল লাগত জান রাধাদি? আমাদের সেকেলে পরিবার, বাবা যা গোঁড়া জানই ত। কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে ছোটকাকা একজন মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, নাম মৈনাক সেন।

—ওরে বাবা, নামটা যে উপন্যাসের নায়কের মত। মনের মধ্যে মখমলের কৌটোয় লুকিয়ে রাখা যায়।

রাধা সরমার গলাটায় টোকা মারে। সরমার চোখের তারা মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়। তারপব বেদম কাশতে থাকে সে, কাশি থামলে বলে—শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের উনি ছাত্র ছিলেন, কিন্তু যা বলছিলাম : তখন বাজাতাম তারের মন্ত্র, এখন গড়ছি যন্ত্র। বাঁ হাতের আঙুলের কড়া মিলিয়ে গিয়ে ডান হাতে লেগেছে।

আঙুল দুটো গভীর আবেগে গালের ওপর চেপে ধরে সরমা।

—জান রাধাদি, কী ভীষণ ঈশিয়ার হয়ে যে আমাদের কাজ করতে হয় তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। একটু এদিক ওদিক অনামনস্ক হয়েছে কি সব কাজটাই ভেসে যাবে। এ তোমাদের রিপোর্ট তৈরী নয় কি ফাইলে টিক মাঝা নয় দশবার পেন্সিল চিবিযে পার্কের কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল চাঁদোয়ায় দৃষ্টিটা তোমরা যতক্ষণ খুশি আটকে রাখতে পার, কিন্তু আমাদের? অনামনস্ক হয়েছে কি নিজেকে, সেই সঙ্গে দশজনকে, বিপদে জড়িয়ে ফেললে।

বাধা বিরক্ত হয়—শুধু নিজের কাজে ডগমগ আর সবাই এমনি বসে মাইনে খায়। আমাদের একটা কবে যোগে ভুল হলে হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হয় না? ছেড়ে দেবে অফিস এমনি এমনি?

সরমা আহত হয়ে বলে—বেশ, আর বলব না তুমি রাগ করলে, বোঝাতে চাইছিলাম কি তোমাদের অফিস দপ্তরের চেয়ে আমাদের কারখানার পরিশ্রমটা অনেক বেশি।

—তা হবে। রাধা ক্ষুব্ধ গলায় শুম মেরে যায়।

আবার কখনও লঘু গলায় দুজনে দুজনকার মনের কথা বলে—কী বিপদেই যে পড়েছি রাধাদি। আমাদের মিঃ ব্যানার্জী একেবারে নাছোড়বান্দা—

—কি নিয়ে রে? কৌতুকে রাধা চোখ বড় করে।

—এই দেখ না সামনের মাসে দিল্লীতে যে শিল্পপ্রদর্শনী হবে সেখানে আমাদের তৈরী সেটের একটা স্টল থাকবে, আমাকে নাকি সেখানে মিঃ ব্যানার্জীর সঙ্গে থাকতে হবে। এইটুকু বললেই সরমা কাশতে থাকে। কাশির দমকে মনে হয় ওব বুকটা বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।

পিসীমা বলেন—ওরে সরমা, কাজ কাজ করে যে এবার মারা পড়বি। এবার বর্ষদিন ছুটি নিয়ে শরীটাকে একটু সারিয়ে নে।

সেদিন রাধার ভাই বলে—জান সরমাদি, দিদিরাও পুরী বেড়াতে যাচ্ছে।

দেখা হতে সরমা বলে— বেশ চুপি চুপি চেঞ্জ যাবার প্ল্যান করছ। আমাকে বললে কি বাগড়া দিতাম?

বাধার গলায় অপ্রসন্নতা—দূর, অফিসের কজনের ওসব প্ল্যান, তাতে আমার কী? আমার কী আর ছুটি মিলবে? সারা জীবন খেটেই মরলাম, কলকাতার বাইরে দুপা বাড়াবার বরাত আর হল কই?

—একটা সিক-লিভ নিয়ে নাও।

—দূর, সিক-লিভ আর অফিসের ডাক্তার দেবে না। সমুদ্র পাহাড় আর এ জন্মে দেখা হবে না।

—বালাই ষাট, দেখা হবে না কেন? এখন থেকে টাকা জমাও, রিটারার করে পুরীতে একটা বাড়ি কোরো রাধাদি। আমার ত এই স্বাস্থ্য। তোমার আশ্রয়েই হয়ত শেষ বয়সে যেতে হবে। রাধার চোখে স্বপ্নের ছোঁয়া লাগে। আত্মগতভাবে বলে—

—বাড়ি করলে পাহাড়েই করব রে সরমা। উঁচু টিলার ওপর কাঠের একটা ছোট্ট কটেজ। পাহাড়ী লতা জড়িয়ে থাকবে, বনমোরগ ডাকতে শুরু করবে ..

সরমা বলে, বাড়ির ডিজাইন কিন্তু আমি করব রাধাদি, বেশ কাচের জানালা দিয়ে বসে দেখব বরফের চূড়ো, ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের স্বপ্ন যে আমার ছোটবয়স থেকে। তারপর কল্লনার রাশ টেনে বলে—আমাদের কাজ কমলে তোমাদের অফিসটা একবাব দেখে আসব রাধাদি। খোকা বলছিল সাততলার তোমার ঘরে নাকি লিফ্টে উঠতে হয়।

—বেশত যাস'খন। আমিও একদিন তোদের কারখানায় যাব, তবে কাজেব যা চাপ, ফুবসত কবে মিলবে জানি না, সরমার গলায় তখন একটু ত্রস্ত ভাব—দেখবে বৈকি। তবে দিল্লীর এই প্রদর্শনীটা হয়ে যাক। এখন ত মরবারও ফুরসত নেই। একটু অবসব পাব তখন। সব ডিপার্টমেন্টই বেশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাকে দেখাব'খন।

এই ভাবে রোজ সন্ধ্যায় রোয়াকে তক্তপোশে গা এলিয়ে দুটি অবসন্ন মেয়ে অফিস কাবখানার গল্প কবে, কখনও কখনও নিজেদের ছোটখাট অনুরাগ বা আশার কথা উঠলেও শেষ পর্যন্ত ওদের কর্মজীবনটাই যেন সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় সব কিছু লুপ্ত করে দেয়। তার জন্য ওদের ক্ষোভ নেই। মনে হয় জীবন আব জীবিকা ওদের মিলেমিশে গেছে।

সরমা মনে প্রাণে জানে—রাধার অভাবে ওদের অফিস একদিনও চলবে না। সব ফাঁকিবাজ, কাজ কবে না, কেবল রাধার নিয়মানুবর্তিতায় সমস্ত অফিস তটস্থ। ওরা শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেয় রাধাদিকে। গর্বে ও সুখে সরমার বুক ভরে যায়।

আর রাধা ভাবে—যত কথাই বলুক না কেন সরমাটা সত্যি পাগলের মত খাটে। শুধু শুধু কি আর একা ওকে ডেকেছে প্রদর্শনীতে? যোগ্যতা আছে বলেই না?

তারপর একদিন রিকসা করে পাড়াব ছেলেরা সরমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। বাস থেকে নামবার সময় সে এক গঙ্গা বমি করেছে। বমি ত নয়, শুধু রক্ত।

রাধাও অফিস থেকে বাড়ি আসছিল। খবর পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসে। ওর মাথাটা কোলে তুলে নেয়। ঘনায়মান সন্ধ্যায় ভাঙাচোরা তক্তপোশের ওপর দুই বন্ধু—

ধরা গলায় রাধা বলে—কতদিন বলেছি ছুটি নিতে। এবারে কি হবে? জীবনে উন্নতি করবার একটা চান্স পেয়েছিলি, ভেস্তে গেল ত!

বালিশে মুখ গুঁজে কান্না চাপে সরমা, তারপর ফিসফিস করে বলে—তুমি সেই পাহাড়েব ক্রোথায় বাড়ি করবে বলেছিলে না? এতদিন যদি করতে হয়ত একটা চেঞ্জ হত তাহলে।

প্লান হাসে রাধা। অজ্ঞকারে ওর যন্ত্রণাকাতর মুখটা চোখে পড়ে না সরমাব—আমার ওপব যে সাসপেনশন অর্ডার জানিস না? এতকাল তোকে লুকিয়েছি কিন্তু আব পাৰি না।

—কেন কী কারণ?

—কেন সেই বারজন কর্মচারীর একজন যে আমি?

সরমা মনে মনে হিসেব করে দেখে ঠিক সাড়ে তিন মাস সাসপেনশন অর্ডার পেয়েছে রাধা, তবে এই ত সেদিন সে বলেছিল সামনেই নাকি তার মস্ত লিফ্ট হয়ে যাবে। তবে?

রাধা নিজের কামাটা গিলে ফেলে সরমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—কদিন একটু খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর। ভাল ডাক্তার ডাকিয়ে চেকআপ কর। দিল্লীতে হয়ত যেতেও পারিস, ঠাণ্ডায় শরীরটা একটু সারবে।

সরমা চাদরে-ঢাকা ওর কামা-ভেজা মুখটা এবার বাড়িয়ে দেয়, তারপর স্থির গলায় বলে—দিল্লীর প্রদর্শনীতে আমাকে পাঠাবে কেন ওরা? ওটা যে একদম মিথ্যে কথা রাধাদি। গত সাতদিন ধরে আমাদের লক-আউট চলছে জান না বুঝি? সাতদিন ধরে আমরা গেটের সামনে বসে থাকছি

রাধা ভাবে ওরা কেউই মিথ্যে কথা বলেনি পরস্পরকে! এককাল যে সব গল্পের অবতারণা করেছে সেটা ওদের আশার কথা, ভাল লাগার কথা কেউ কাউকে ঠকিয়ে ত মন্দ করেনি।

দুজনে দুজনেব খামে ভেজা জবজবে হাত ধরে চুপচাপ বসে থাকে।

অব্যক্ত

তৃপ্তি মিত্র

—‘আপনি এতদিন এখানে এসেছেন, একদিনও সাঁতার কাটতে নামলেন না তো?’
বারান্দার এক কোণে একটা বেতের চেয়ারে স্নান ক্লাস্ত চোখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসেছিল
যে মেয়েটি কিংবা মহিলা, তাকে চমকে দিয়ে এই স্বাস্থ্যে ভরপুর আর খুশীতে উজ্জ্বল
যুবকটি প্রশ্ন করে বসল।

—‘ওঃ, আপনি! সাঁতার খুব একটা ভাল জানি না।’

—‘খুব একটু কম ভাল জানেন তো!’

—‘তা জানি।’

—‘তবে ভয়টা কিসের?’

—‘ভয় না, সঙ্কোচ।’

—‘কিসের?’

—‘শাড়ী পরে ঐ একটু ডুবই দেওয়া যায়, তার বেশী—’

—‘কসটিউম আনেননি?’

—‘হ্যাঁ। না মানে ভাবছিলাম—’

—‘পোশাক এনেছেন অথচ—’

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল যুবক।

—‘ঠাট্টা করছেন নাকি?’

—‘নাঃ একেবারেই না। ভাবছি নিজেকে কি বঞ্চিতই করছেন।’

—‘একলা এসেছি—মানে তাই খুব—না একটু সঙ্কোচ।’

—‘চলুন না এই দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর। বীচ একদম ঝাঁকা থাকবে।’

—‘আমাকে ভাল কবে শিখিয়ে দেবেন তো?’

—‘শেখাব।’

স্থানটা ধরা যাক পুরীর সমুদ্রপারের কোন হোটেল। আর সময় এই বেলা দশটা কিম্বা
এগারটা।

—‘আপনি খুব ভাল সাঁতার কাটেন। আপনি যখন ব্রেকার পার হয়ে চলে যান—সবাই
আশ্চর্য হয়ে যায়।’

—‘আপনি?’

—‘বাঃ রে। আমিও তো সবার মধ্যেই।’

—‘আপনার ব্রেকার পার হতে ইচ্ছে করে?’

—‘খুব, কিন্তু—’

—‘কি, কিন্তু?’

—‘আমি যতটুকু সাঁতার জানি—তাতে কোনদিনই তো সম্ভব হবে না!’

- ‘এই যে বললেন আমার কাছে শিখবেন?’
- ‘এতটা কি শিখতে পারব যে এত বড় বড় ডেউ পেরিয়ে—’
- ‘আমি কেমন সাঁতার কাটি?’
- ‘বললাম তো এখুনি!’
- ‘তাহলে হয়তো শেখাতেও পারব ভাল! কি, বিশ্বাস হচ্ছে না?’
- ‘আমি কেমন ছাত্রী তা তো জানি না!’
- ‘দেখা যাক! আপনার নাম?’
- ‘পার্বতী—পার্বতী সরকার!’
- ‘আমার—সতীন্দ্র সোম!’

দুপুরের রোদে সমুদ্রপারের বালি এমন তেতেছে পা ফেলা দায়। ওরা দুজনে দাঁড়াল এসে, যেন স্কুল পালিয়ে এসেছে। আকাশের ঠিক মাঝখানে সূর্য তখন। সমুদ্রের ধারে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই।

—‘আশা করি, শাড়ীর নীচে সাঁতারের পোশাকটা পরে এসেছেন?’

—‘হ্যাঁ!’ পার্বতী লজ্জিত হল।

—‘আমি সমুদ্রে নামছি। আপনি শাড়ীটারিগুলো পুঁটুলি পাকিয়ে এই চালাটার কাছে রেখে চলে আসুন। ভয় নেই, কেউ নেবে না!’

জোয়ারের সময়। পূর্ণিমাও খুব কাছে এসে গেছে নিশ্চয়ই। তাই ডেউগুলো যখন প্রায় একতলা সমান উঁচু হয়ে ছুটে আসছে, পার্বতী অনেক আগে থেকেই চোখ বন্ধ কবে ফেলছে। সতীন্দ্র পার্বতীর ভয় দেখে হাসছে। তারপর হাত ধরে একসঙ্গে ডুব দিচ্ছে। ডেউ ওদব ওপর দিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে বালির ওপর।

—‘ওঃ, আপনি ডগ সুইমিং ছাড়া কিছুই জানেন না!’

—‘তাহলে তখন কি বললাম আপনাকে!’ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিল পার্বতী।

—‘এই দেখুন আমি কেমন করে সাঁতার কাটিছি। লক্ষ্য বরফ ভাল কবে!’

—‘ডেউ এসে গেছে যে!’

—‘ডুব দিন তাহলে!’

জল থেকে মাথা তুলে পার্বতী বললে—‘নাঃ আমার দ্বারা হবে না!’

—‘সত্যি হবে না, এত ভয় পেলে কিছু হয়? নিন্ আমাব হাত ধরে চেষ্টা করুন।’

চলল চেষ্টা। সূর্য হেলেছে পশ্চিম দিকে, আকাশের দিকে তাকিয়ে পার্বতী বলল,—‘চলুন এবার। এক্ষুনি তো একে একে টুরিস্টদের ভিড় শুরু হয়ে যাবে।’

—‘যান আপনি উঠুন আগে। ঐ শাড়ী-টারিগুলো জড়িয়ে নিন, আমি আসছি।’

পার্বতী যখন উঠে এল সেই চালাটার কাছে তখনও সমুদ্রতীর প্রায় তেমনি নির্জন, সমুদ্র তেমনি উদাসীন। অনেক দূরে দু-একজন নুলিয়াকে দেখা যাচ্ছে। ভাল লাগছে পার্বতীর, খুব ভাল লাগছে। অবগাহন স্নান। মুক্ত স্নান। সত্যি ভাল সাঁতার না জানলে যেন সমুদ্রকে ভালবাসা যায় না। সমুদ্রকেই তো কতদিন ধরে ভালবাসতে চেয়েছে পার্বতী।

—‘চলুন!’ পেছন থেকে বলে উঠল সতীন্দ্র; অবশ্য দুজনকে যে একসঙ্গেই ঝিরতে হবে হোটেলে এমন কোন কথা নেই।

—‘বরং না ফেরাই ভাল।’ বললে পার্বতী।

—‘ভয় করছে কে কি বলবে?’

—‘সত্যি! এখানে কেউ আমাকে চেনে না, আমিও কাউকে চিনি না। এ আজ আসছে কাল চলে যাচ্ছে। আমিও তো আর কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যাব। তবু দেখুন এত ভয়!’

—‘বাঙালী মেয়ের বিশেষত্ব! একলা এসেছেন কেন?’ একটু কি চটে উঠল সতীন্দ্র?

—‘আজ বিকেলে আর সাঁতার কাটতে আসবেন না?’ প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল পার্বতী।

—‘আপনি হোটেলের ফিরে যান, আমি বিকেলের সাঁতারটা সেরে একেবারে ফিরব।’
ফিরে চলল সতীন্দ্র সমুদ্রে।

ডাইনিং রুমের একেবারে একটা কোণে বোজ একলাই খেতে বসে পার্বতী। আজও এসে বসল। এর আগে ওর সঙ্গে কেউ আলাপ করতে আসেনি। সাতদিন ও এসেছে এখানে, বয়স হল ত্রিশ-বত্রিশ। আব ও যে এ্যাট্রাকটিভ নয় সে কথা ওর চেয়ে বেশী আর কে জানে? তাই কেউ আলাপ কবতে আসেনি বলে ও আশ্চর্যও হয়নি। আর নিজে তো পাবেই না কারো সঙ্গে আলাপ করতে। ও একা এসেছে, একা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। একা আসা ওর দরকাব ছিল। ডাইনিং রুমে এসে কোন দিকে তাকায়ও না কোনদিন। আজ চারদিকে চেয়ে ও সতীন্দ্রকে খুঁজল। না, কোন টেবিলে সতীন্দ্র নেই। তবু ঢোকবার সময় বা বেরবার সময় যেটুকু দেখেছে ঐ উন্টোদিকের কোণের টেবিলটাতেই তো দেখেছে। এখনও আসেনি বোধহয়। অনেক লোক খাওয়া শেষ করে চলে গেল। অনেক নতুন লোক এল। অনেক বিদেশীও আছে এর মধ্যে, তারা ভারতবর্ষের এই বিখ্যাত বীচ দেখতে এসেছে। আব এসেছে কোনাবকের মন্দির ইত্যাদি দেখতে। আবার কিছু লোক আসে হয়তো কেবল মদ খাবার জায়গা বদলাতে। সামনের ঐ দুটো লোককে তো পার্বতী যখনই দেখেছে মদের গ্লাস ছাড়া দেখেনি। পার্বতীর খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। কই, সতীন্দ্র এখনও এল না তো! ক্রমে ডাইনিং রুম ফাঁকা হতে লাগল। বাত নটা বেজে গেছে, খাওয়া শেষ করে পার্বতী তবু বসে বইল। শেষ দু’চাবডান যাবা ছিল তাবাও উঠল। মাতাল দুজনও। পার্বতী উঠে পড়ল।

সতীন্দ্র সারা সন্ধ্যোটা ঘরে বসে রইল, একটু মদ খেল, চিঠি লিখল দেবলীনাকে। লিখেছিল পার্বতীর কথা। কেমন একটা মেয়ে—সতীন্দ্রর চেয়ে হয়তো সামান্য বড়ই হবে বয়সে, কেমন বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকত লাউঞ্জে। সমুদ্রের ধারে কেমন অদ্ভুতভাবে শাড়ী জড়িয়ে জড়িয়ে পরে বিষণ্ণ হয়ে বসে অন্যের সাঁতার কাটা দেখত। তাকে আজ সতীন্দ্র জোব করে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে কেমন বদলে দিয়েছে প্রায়। চিঠিটা ছিড়ে ফেলল সতীন্দ্র। এমনি আবার চিঠি লিখল। সাঁতার কাটতে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে, ডাইনিং রুমে খেতে খেতে কখন না মনে পড়ে দেবলীনাকে? আজ দেবলীনীর যে চিঠিটা পেয়েছে, খুব মিষ্টি চিঠি। দেবলীনাব ঠোঁটেব মত। মাকেও একটা চিঠি লিখল সতীন্দ্র। মায়ের দেবলীনাকে পছন্দ নয়। বড্ড বেশী সুন্দরী, বড্ড বেশী কথা বলে আর বড্ড বেশী সিগারেট খায়। মাকে মানবে না। এখন মা যদি প্রি-হিস্টরিক যুগে পড়ে থাকতে চায় আই কাণ্ট হেল্প—ভাবল সতীন্দ্র। দেবলীনাকে কেন্দ্র করবেই মা আব সতীন্দ্রব বন্ধুত্বে একটা চিড় খেয়েছে। মাকে ভালবাসে ও, বাড়িতে থাকলেই সব সময় মায়ের বিষণ্ণ মুখ দেখতে হবে। তাই অফিস ছুটি নিয়েছে। যদিও ওর পজিশনের অফিসারের ছুটি নেওয়া মুশ্কিল ছিল। মাকে একটা অজুহাত দেখিয়ে এখানে চলে এসেছে সতীন্দ্র। মাকেও লিখতে গেল পার্বতীর কথা, লিখল না। লিখল—

মামণি,

‘দেখ দেবলীনা খুব খারাপ বউ হবে না। মামণি, দোহাই তোমার, তুমি খুশী হও।’

তারপর বেয়ারাকে ডেকে ঘরেই খাবার দিতে বলল। আর খেতে খেতে ভাবল পার্বতীকে। এমনি কেমন জড়ভরত লাগে পার্বতীকে। সাঁতারের পোশাকে কিন্তু মোটেই সেরকম লাগছিল না। অমন বিস্ত্রীভাবে থাকে কেন মেয়েটা?

—‘কি, কি ভাবছেন একলা বসে বসে? আরে ক্বাস! গলায় একটা মাফলার জড়িয়েছেন কেন?’ আজও প্রায় পার্বতীকে চমকে দিয়েই জিজ্ঞাসা করল সতীন্দ্র। আজও বাবান্দার কোণে সেই বেতের চেয়ারটায় গুটিগুটি হয়ে বসেছিল পার্বতী।

—‘একটু সর্দি-সর্দি লাগছে।’

—‘প্রথম দিনের পক্ষে খুব বেশীক্ষণ জলে ছিলেন তো, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। আজ দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। দুপুরে আসছেন তো?’

—‘আসব?’

—‘বাঃ, তা নইলে যা শিখেছেন সব তো ভুলে যাবেন।’

—‘কাল আপনাকে ডাইনিংরুমে দেখলাম না।’

—‘ঘবে বসেই ডিনার সেরে নিলাম। তাছাড়া দুটো দবকারী চিঠি লেখবার ছিল।’

—‘বাড়িতে?’

—‘হ্যাঁ।’

পার্বতী আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হোটেল ঝোঁটিয়ে সবাই গেছে বেলাভূমিতে। হয়তো কিছু মাতাল এখনও ঘুমিয়ে সমুদ্র-স্বাদ অনুভব করছে। কে জানে? দূরে বেয়ারার ব্রেকফাস্টের জন্য টেবিল সাজাচ্ছে। সতীন্দ্র সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বইল।

—‘আপনি আজ সকালে সাঁতার কাটতে গেলেন না?’ অবশেষে বলল পার্বতী।

—‘নাঃ, কাল চিঠি লিখতে দেরি হল, তাই খেতে দেরি, ঘুমুতে দেরি, আর আজ উঠতে দেরি। যাকগে দুপুরে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।’

—‘ওখানে সকলে আপনাকে মিস করবে। অনেকেই আপনার ব্রেকার পার হওয়া দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে।’

—‘কেন? অনেকেই তো পার হয়।’

—‘কজন আর? বিশেষ করে আপনার মত বোজ রোজ?’

—‘তাহলে আজ বিকেলে দুটো ব্রেকার পাব হব।’

পার্বতী সতীন্দ্রের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপব বললে—‘আপনার পক্ষে মোটেই শক্ত নয়।’

—‘কত ভাবে উঠেছেন? সূর্যোদয় দেখেছেন?’

—‘না, আজ দেখিনি।’

—‘এসেই গোড়ার দিকে খুব দেখে নিয়েছেন বুঝি? সকালেই তাই করে অবশ্য। প্রথমে যে উৎসাহটা থাকে—’

—‘না, আরও অনেকদিন আগে, অনেকবার অন্য সমুদ্রের মাঝখান থেকে।’

—‘অন্য সমুদ্র।’

—‘আরব উপসাগর।’

—‘কোথায়?’

—‘বম্বেতে।’

—‘বম্বেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন?’

—‘না, ওখানে থাকি, মানে .’

—‘আশ্চর্য তো, আপনি বম্বে থেকে বেড়াতে এসেছেন এখানে। অথচ আশে-পাশে যে সমস্ত দ্রষ্টব্য আছে সে-সবও তো একদিন দেখতে গেলেন না।’

পার্বতী হাসল।

—‘চিঠিগুলো পোস্ট করবেন না?’

—‘ওঃ হ্যাঁ, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছেন তো! যাই বাস্তব ফেলে দিয়ে আসি। ভুলে গেলে ওদিকে আবার ...!’ সতীন্দ্র দ্রুত চলে যায়।

মেঘে সূর্যটা ঢাকা পড়েছে। সমুদ্রের জল কালো মেঘের কালো চোখের মত গহীন কালো আব অর্থবহ হয়ে উঠেছে যেন।

—‘মাত্র চারদিনে এতটা উন্নতি হবে ভাবিনি কিন্তু আমি।’ বললে সতীন্দ্র।

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে সতীন্দ্র ভেজা বালির উপর। পার্বতীও ক্লান্ত, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওরও। কিন্তু কেমন দেখাবে? তাই জোর করেই দুই হাত দিয়ে দুটো হাঁটুকে বুকের কাছে চেপে ধরে বসে আছে ও। মুখ তুলে বললে—‘সবটাই আপনার কৃতিত্ব।’

—‘কাল গোড়াতে এসেই আপনাকে ব্রেকার পার করাব।’

—‘পারব?’

—‘সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে ভাবছি।’

—‘বলুন এমন বুড়ীটি হলেন কি করে—’

—‘ফেব যদি আপনি নিজেকে বুড়ী বলেন, তবে—’

হাসল পার্বতী।

—‘বন্ধুতে থাকেন তো জুহুতে গিয়ে সাঁতার শেখেননি কেন?’

—‘অসুবিধে ছিল।’

—‘ও! মা-বাবা পছন্দ করেন না?’

—‘এককম সব আব কি!’

এবার ঢেউটা এসে প্রায় ওদের গায়ের ওপর ভেঙে পড়ল।

—‘আমাদের আব একটু পেছিয়ে বসতে হবে বোধহয়। নইলে এব পরের ঢেউটা এসে হিড় হিড় কবে টেনে নিয়ে যাবে সমুদ্রেরে।’ বললে পার্বতী।

সতীন্দ্র উঠে বসল। মেঘ আরও কালো হয়ে এসেছে। সমুদ্রও। পার্বতী চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে। কিন্তু ভাবছে দেবলীনার কথা। দেবলীনার চিঠিব কথা। অদ্ভুত মেয়ে এই দেবলীনা। লিখেছে,

‘সেদিন মিসেস সোম-এব সঙ্গে একটা পার্টিতে—’ আমাব মাকে এখনও দেবলীনা মিসেস সোম বলে কেন? ভাবল সতীন্দ্র। ‘মিসেস মল্লিকের সঙ্গেই কথা বলছিলেন অবশ্য— মেয়েদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। বুঝতেই পাবছ, আসল লক্ষ্য ছিলাম আমি। সনু, আমি তোমাকে বলছি এসব আমার ভাল লাগে না। আমি স্ট্রুট ব্যবহার ভালবাসি। আর সেইজন্যই আমার মনোভাব আমি তোমাকে খুলে বললাম। ডার্লিং তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। সিগারেট ছাড়াও। সনু ডার্লিং, যেদিন আমাকে তুমি তোমার ভালবাসার কথা প্রথম বলেছিলে মনে পড়ে? সেদিনও সিগারেটের ধোঁয়ার মাঝখানেই তোমার কথা শুনে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ...’

সেদিন ছিল টুসকীব জন্মদিনের পার্টি। টুসকী দেবলীনার ছোট বোন। দেবলীনা কেমন কবে একবার সতীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে উঠে গিয়েছিল ছাতে। আর তখনই জীবনের একটা পরম প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা হয়েছিল, ওপরে ছিল তারা আর একফালি চাঁদ। দেবলীনা বা গায়ে ছিল বিলিতি সেটের গন্ধ। বাতাসে দামী সিগারেটের ধোঁয়া। সব মিলিয়ে অদ্ভুত মাদকতাব সৃষ্টি হয়েছিল। সত্যি তো, সেদিন একটুও খারাপ লাগেনি দেবলীনাকে। বরং ...। তবে? মা, মা তোমাকে মেনে নিতে হবে। ভাবল সতীন্দ্র।

পার্বতীর মা কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছেন।—‘পারু, তোর ডিভোর্স নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। দীপনারায়ণ একতরফা ডিগ্রী পেয়েছে। আমি বলি, এ ভালই হল। জানি এমনিতে তোর মন খারাপ হবে না। তবু যখন সব ভেঙে যায় মেয়েদের, হাজার হলেও একবার মন খারাপ হবেই হবে। একটু কান্দবেই কান্দবে। তুই জেদ কবে চলে গেলি বেড়াতে। তাই মাঝে মাঝে একটু ভয় করছে। কাল-পরশুর মধ্যে রওনা হয়ে চলে আস কলকাতায়। দীপনারায়ণ কি কাজে কলকাতায় আসছে লিখেছে। তোকে কিছু টাকা দিতে চায়। এখন টাকার কিরকম দরকার বুঝিস তো! গোঁয়ারত্বী করে টাকাটা নিবি না বলিস না যেন। হ্যাঁ, তোর বড় মাসী তোর একটা চাকরি ঠিক করেছে। ওদেরই কিণ্ডারগার্টেনে সেক্সনে পড়াতে হবে। ভাল কবে খাচ্ছিল তো?’

সতীন্দ্রর মা লিখেছে ... ‘সাঁতার তোর নেশা। কিন্তু লক্ষ্মী সনু, বেশী দূরে যাস না জানি। তুই সাবালক। নিজে বোজগাব করছিস। দুদিন পরে বিয়ে করবি। তবু আমাব কাছে তুই ছোট্ট সনু।’ ... ওঃ মাগো, দয়া করে আমাকে আর ছোট্ট বসে রেখো না মা ..

—‘সাত কোটি সন্তানেরে হে মুক্ধ জননী, বেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।’ আবৃত্তি বঙ্গীতে বলে উঠল সতীন্দ্র।

পার্বতী চমকে জিজ্ঞাসা করল—‘কি হল?’

—‘উচ্ছাস।’ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল সতীন্দ্র।

খিলখিল করে হেসে উঠে পার্বতী বললে—‘অভিনব উচ্ছাস। নির্জন সমুদ্রের ধারে বসে ববীন্দ্রনাথের আর কোন কবিতার লাইন খুঁজে পেলেন না!’

—‘স্কুলের কর্মপিটশনে ঐ একটা কবিতাই মুখস্থ করেছিলাম যে, তাই সমুদ্রে পাহাড়ে জঙ্গলে এটাই সম্বল।’

একটা ঢেউ এসে ওদের উপর ভেঙে পড়ে হিড়হিড় কবে ওদের খানিক টেনে নিয়ে গেল সমুদ্রের দিকে— হেসে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনে। সবে এল পাবেব দিকে।

—‘চলুন ফেরা যাক।’ বললে সতীন্দ্র।

—‘আর একটু বসি না!’ বললে পার্বতী।

—‘বসবেন? ঢেউগুলো কি রকম উঁচু হয়ে আসছে দেখেছেন? আজ কি পূর্ণিমা?’

—‘না, কাল পূর্ণিমা হয়ে গেছে।’

—‘আজও তাহলে খুব চাঁদের আলো থাকবে।’

—‘আসবেন ডিনারের পব?’

—‘আজ চাঁদের আলোতে হোটেলসুদ্র লোক উপস্থিত থাকবে কিন্তু এখানে।’

—‘থাকুকগে!’

—‘পাছে লোকে কিছু বলে—ওটাব কি হবে?’

হাসল পার্বতী।

বৃষ্টি শুরু হোল টিপটিপ করে, সমুদ্র হোল বাপসা।

—‘রাতে চাঁদ উঠবে তো?’ বলল সতীন্দ্র।

—‘এ মেঘ কেটে যাবে মনে হয়।’

—‘যাই, হোটলে চিঠি লেখার পর্বটা শেষ কবে ফেলিগে তাহলে বেলাবেলি।’

—‘আপনি কি রোজই চিঠি লেখেন?’

—‘রোজই।’

—‘কাকে এত লেখেন?’

—‘একজনকে কথা দিয়ে এসেছি যে রোজই চিঠি দেব।’

—‘ওঃ!’

—‘একদিন চিঠি না দিলে হয়তো এমন কাণ্ড করে বসবে!’

—‘ওঃ!’

—‘ভয় যখন কেটেছে, আসুন না ডিনারটা একসঙ্গে সারা যাক দুজনে।’

—‘বেশ তো।’

—‘আমি তাহলে এগোই—’

—‘আসুন—আমিও উঠব এখনই—।’

—‘আমি আপনাকে আপনার ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাব খাবার আগে—’ যেতে যেতে বলল সতীন্দ্র।

আবার একবার সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে হল পার্বতীর। আর একবার অবগাহন করি, ভাবল ও?

একটু সাজল পার্বতী। আইব্রাও পেন্সিলে চোখ আব ভুরু আঁকল। ভুকাটা বড্ড পাতলা সতি। লিপস্টিক লাগাল ঠোটে। হাল্কা নীলের ওপব লাল সুতোর এমব্রয়ডারী করা শাড়ি পবল। সঙ্গে হাতকাটা একটু গাঢ় নীল ব্লাউজ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজেকে দেখতে লাগল পার্বতী। আসছে না কেন সতীন্দ্র এখনও?

চিং হয়ে শুয়ে পড়ল সতীন্দ্র খাটের ওপর। দুই কবতলের ওপর রাখল মাথা। পবেছে ক্রীম বং-এর প্যান্ট। গায়ে মেরুন রং-এর শার্ট। যদিও সমুদ্রমানে একটু কালো হয়েছে তবু মেরুন রং-এর পাশে ওর ফর্সা রং উজ্জ্বল হয়েই জানান দিচ্ছে। সেজেগুজে বের হবাব মুখেই কি মনে করে শুয়ে পড়ল। তাকিয়ে রইল খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলে রাখা দেবলীনাব ছবিটাব দিকে। আসবাব সময় ফ্রেনে বাঁধিয়ে দেবলীনাই ছবিটা দিয়ে দিয়েছিল সতীন্দ্রকে। সতীন্দ্র ভাবল, এ কি করছি। এতটা কি ঠিক হচ্ছে? পার্বতী যদি অন্য কোন আশা পোষণ করে থাকে? কিন্তু কেনই বা করবে? আজ পর্যন্ত এমন কোন ব্যবহার আমি করিনি যাতে করে কোনরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে! এক নং—মিস সরকার ছাড়া অন্য কিছু বলে ডাকিনি। দুই নং—ভুলেও তুমি বলিনি। সেদিন যখন স্ট্রোকটা কিছুতেই আয়ত্ত করতে পাবছিল না তখন তো মনে হয়েছিল একবাব বলি, তোমার দ্বাবা কিছু হবে না। তুমি কেটে পড়।—তখনও মুখে বলেছিলাম, আপনাব মত মাথামোটাব দ্বারা কিসসু হবে না, তুমি বলিনি। তিন নং—দরকার ছাড়া একবারও হাত ধরিনি বা ছুঁইনি। চার নং—এমন কথা বলিনি—চলুন না শহবে দোকানে গিয়ে কিছু কেনাকাটা কবি। পাঁচ নং—দোকান থেকে কিনে এনে একটা জিনিসও উপহার দিইনি। অথচ এর মধ্যে আমি চার-পাঁচবার দোকানে গেছি, ঘুরে ঘুরে দেখেছি। মায়ের জন্য, দেবলীনাব জন্য, এমন কি বাড়ির বাচ্চা চাকরটার জন্যও বেশ কয়েকটা জিনিস কিনেছি। তবে শো-কেসে এদেশী একটা তাঁতের মালটিকালার শাড়ী দেখে মনে হয়েছিল যে শাড়ীটাতে পার্বতীকে মানাবে ভাল। এই মাত্র। তবে? আমার মন পরিষ্কার। অস্থুটে বলে উঠল সতীন্দ্র। ভালই হয়েছে, ফিরে এসেই দেখা হয়েছিল ছেলেবেলার বন্ধু সমর-এর সঙ্গে। এসেছে ভুবনেশ্বরে, অফিসের কি একটা কাজে। সেখান থেকে বেড়াতে এসেছে পুরীতে। অফিসেরই কার সঙ্গে যেন, আছে টুরিস্ট লঞ্জে। জোর করে কথা আদায় কবে নিয়েছে সমর, কাল সমরের সঙ্গে যাবে কোনারক দেখতে। সেইমত ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। কই, পার্বতীকে ছেড়ে যেতে হবে বলে একটুও কষ্ট হচ্ছে না তো! তবে?

মায়ের চিঠিটা আবার পড়তে বসল পার্বতী। দীপনারায়ণ আসছে কলকাতায়, দীপনারায়ণ শাঠে। পার্বতীর বাবা গিয়েছিল সপরিবারে বম্বেতে। অফিসেরই কাজ উপলক্ষে। ঐ অফিসেরই এক ক্ষুদ্রে অফিসার ছিল তখন দীপনারায়ণ, আলাপ হল। জুহুঘাটে বেড়ানো, দীপনারায়ণ হল পার্বতীর দীপ। দীপ। তারপর বিয়ে। জুহুতেই ছিল ওদের বাড়ি। দীপ আর সমুদ্র, সমুদ্র আর দীপ দুই-ই হয়ে উঠল পার্বতীর নেশা, দীপ চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করল। বাড়তে লাগল ব্যবসা। প্রায় প্রত্যেক রবিবার বম্বে থেকে দীপের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন আসত সমুদ্রমানব জন্য। পার্বতীকে রাখতে হোত। কতরকম রান্নাই শিখেছিল পার্বতী। একদিন দীপের বন্ধুবান্ধবই জোর করেছিল ওদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে হবে বলে। সাঁতারের পোশাক পরে গিয়েছিল সমুদ্রে। সেদিন খুব ভাল লেগেছিল ওর। ওরা সবাই সম্ভ্রান্তলো বিদেশি হবার পর দীপ বলেছিল, 'ঐ পোশাক তুমি না পরলেই পার! ঐরকম সরু সরু পায়ে ভাল লাগে না তোমাকে।' লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল পার্বতীর। সত্যি, বসন্ত-র বউ উষা বা বিজয়েব বোন সুমিত্রার মত অত ভাল গড়ন তো পার্বতীর নয়। তাই পার্বতী বালুর ওপর বসে ওদের চান দেখত। আর দেখত সমুদ্র। দীপনারায়ণের বিজনেস বাড়ল। সমুদ্র দেখা কমল। তাই একলাই বসে বসে সমুদ্র দেখত পার্বতী। আর ভালবাসত। ঢেউগুলোকে ভালবাসত। চিঠিটা পড়ে রয়েছে সামনে। একতরফা ডিগ্রী হয়েছে। পার্বতী-ব নামেই এ্যাডালটারীর কেস এনেছিল দীপনারায়ণ। হায় রে! পার্বতী কথা দিয়েছিল কোর্টে উপস্থিত হবে না। হয় নি। আজ পার্বতীর মুক্তি। মা লিখেছে, ও কাঁদবে। না, একটুও কান্না পাচ্ছে না তো! বরং ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে। মুক্তিব স্বাদটা চেখে চেখে দেখতে ইচ্ছে করছে। এখনি আর একবার সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পাবে সে। কিন্তু সতীন্দ্র আসছে না কেন? আটটা বেজে গেল। অনেক আগেই চাঁদ উঠে গেছে। ঢেউগুলো ভাঙছে আর চাঁদের আলোতে চিক চিক করছে নিশ্চয়ই। সতীন্দ্র সাঁতাব কাটলে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই প্রথম দিন থেকেই। সতীন্দ্র কাকে এত চিঠি লেখে? প্রেমিকা? হবেই বা না কেন? যাকগে। হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছে, কাল বা পরশুর মধ্যে কলকাতা ফিরে যাবার টিকিট কবে দিতে। সতীন্দ্র কি ভয় পেয়েছে? কি আশ্চর্য! কাল বা পবশু তো চলেই যাচ্ছি আমি। নাঃ, ওব ভয়টা ভেঙে দেওয়া উচিত। আমার কোন কুমতলব নেই রে বাবা!

উঠে পড়ল পার্বতী।

—'কাম ইন, গুয়ে গুয়েই বলল সতীন্দ্র। আর পার্বতীকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ে বলল—'আরে আপনি!'

—'বেশ লোক তো আপনি!' বললেন আমাকে ডেকে নিয়ে ডিনাব খেতে যাবেন, আর—'

—'এই তো যাচ্ছিলাম।' নিজের ছেড়ে রাখা আগুরঅয়ার ইত্যাদি তোয়ালে দিয়ে চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সতীন্দ্র।

—'কার ছবি ওটা?'

—'ওই যাকে রোজ চিঠি লিখতে হয়।'

—'খুব সুন্দর দেখতে তো?'

—'তা ঠিক।'

—'আপনি ভাগ্যবান।'

—'তা ঠিক। চলুন।'

খাওয়ার শেষে সিগারেট ধরাতে গিয়ে কি মনে করে সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিল সতীন্দ্র পার্বতীর দিকে।

—‘ধন্যবাদ, আমি সিগারেট খাই না।’

—‘ওঃ! কিন্তু খান না কেন?’

—‘খাইনি কোনদিন। আর মেয়েরা মানে আমাদের দেশের মেয়েরা সিগারেট খাচ্ছে আমার কেমন ভাবতে ভাল লাগে না।’

—‘এটা তো একটা কুসংস্কার।’

—‘ভাল কুসংস্কার।’

—‘তার মানে যে সব মেয়েবা সিগারেট খায় আপনি তাদের খাবাপ বলবেন।’ রেগে উঠে বলে সতীন্দ্র।

—‘হ্যাঁ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন? আমি কি তাদের খাবাপ বলেছি? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন খাই না, তাই আমার খাবাপ কথাটা আপনাকে বললাম। বসেই অনেক মেয়েকে আমি সিগারেট খেতে দেখেছি। তাদের মধ্যে অনেকেরই গলা কেমন হোস হোসে গেছে।’

—‘অনেকেরই, সকলেরই যে ওরকম হবে তাব কোন মানে নেই।’

—‘তা অবিশ্যি নেই।’

—‘আপনার বিয়েব পব আপনার স্বামী যদি চান আপনি তাঁর সঙ্গে ড্রিং করুন, সিগারেট খান, তাহলে আপনি তা কববেন না?’

—‘বড্ড মুশ্কিলেই ফেললেন দেখছি, কি উত্তর দিই বলুন তো আপনাকে? মানে—

আমি—মানে আব বিয়ে কবব না ঠিক কবেছি।’

—‘আর—মানে? বয়স হয়ে গেছে ভাবছেন?’

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পার্বতী বললে—‘আপনার বৌকে যে আপনি সিগারেট আব মদ ধরাবেন সে বিষয়ে এ্যাটলিস্ট কোন সন্দেহ নেই।’ হাসল পার্বতী।—‘দেখছেন ডাইনিং-রুম ফাঁকা হয়ে গেছে, সবাই সমুদ্র দেখতে চলে গেছে।’

—‘আমাদেরও তো যাবার কথা ছিল।’ বলল সতীন্দ্র।

—‘তাহলে এবকম বাজে ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া না কবে চলুন তাড়াআড়ি।’

—‘চলুন। আপনি কিন্তু এই কদিনেই খুব স্মার্ট হয়ে গেছেন। তা গোড়ার দিকে এমন দুঃখী-দুঃখী ভাব কবে বসে থাকতেন কেন?’

পার্বতী হাসল।

সমুদ্রের ধারে এল দুজনে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত লোকই দেখছে চাঁদ আব সমুদ্র। কত বয়সের কত বকম লোক। হাঁটতে হাঁটতে একটু দূর্বেই চলে এল ওরা।

—‘কাল আপনাকে নিয়ে ব্রেকার পাব হবাব কথা ছিল। কিন্তু—’ ইতস্ততঃ কবলে সতীন্দ্র।

—‘কিন্তু কি?’

—‘ফিবে দেখি আমার অনেকদিনের বন্ধু এসেছে। টুরিস্ট লজে উঠেছে। সে ধরেছে আমাকে নিয়ে কোনাবক যাবেই যাবে। তাই কালকের দিনটা ছুটি চাই। ব্যাপারটা অন্যবকম ভাবে নেবেন না কিন্তু আপনি।’

—‘না না, তা কেন নেব। ভালই হল, আমিও বলতে যাচ্ছিলাম আপনাকে। কাল আমিও বোধহয় আসতে পারব না। কলকাতায় ফিরতে হবে। মানেজাবকে বলেছি কালই যেন একটা বার্থ রিজার্ভ কবে দেয়।’

—‘তার মানে? আমি ফিবে আসবাব আগেই আপনি চলে যাবেন নাকি?’

—‘অগত্যা। অবশ্য যদি টিকিট পাই।’
 —‘তার মানে, ব্রেকার পার হওয়া আপনি শিখবেন না?’
 —‘কই আর হল শেখা।’
 —‘না তা হয় না।’
 —‘কি হয় না?’
 —‘কোন জিনিসই অর্ধেক শিখে ফেলে বাখা উচিত নয়।’
 —‘সমুদ্রের ধারে জীবনে হযতো আর আসাই হবে না।’
 —‘বস্বে? জুছ?’
 —‘বস্বেতে আর যাচ্ছি না।’
 —‘কোথায় যাবেন?’
 —‘আপাততঃ কলকাতাতেই থাকব।’
 —‘আর দুদিন বেশী এখানে থাকতে আপত্তি কি?’
 —‘সত্যি কথা বলি আপনাকে। কেমন একটা জেদ নিয়ে এখানে এসেছিলাম। হয়তো আর মাত্র দুদিনের হোটেলভাড়াই আছে আমার কাছে।’
 —‘আমার কাছে টাকা আছে, ধার নিন।’
 —‘শোধ দেব কি করে?’
 —‘নাই বা দিলেন?’
 —‘কলকাতায় আমাকে তাড়াতাড়ি যেতেই হবে। আমাকে একজন কিছু টাকা দিতে আসবে।’
 —‘কে? কত টাকা?’ বলেই লজ্জিত হল সতীন্দ্র। বড় বেশী কৌতূহল প্রকাশ হয়ে গেল যেন।

—‘আমার এক্স-হাসব্যাণ্ড। আন্দাজ করছি দশ হাজার দেবে অন্ততঃ।’
 আর কথা নেই। চুপচাপ হাঁটছে দুজনে। হঠাৎ পার্বতীর মনে হল, মিথো মামলায় জিতেছে বলে বিবেক-দংশনে দীপ টাকা দিতে চাইছে। আর সতীন্দ্রর কাছে সবটাই বেসুরো হয়ে গেল কি? কিন্তু কেন? সত্যিই তো, আলাপটা কোনদিনই এমন জায়গায় যায়নি তো যে এতখানি ব্যক্তিগত কথা উঠতে পারে? আর তাই তো দেবলীনার ছবি দেখাব পব পার্বতী কোন কৌতূহলই প্রকাশ করেনি। কিন্তু তবু সতীন্দ্রব কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে কেন? হাঁটছে, কিন্তু সব ভাবনার ওপর দিয়ে বার বার একটা কথাই কানে বাজছে—‘আমাব এক্স-হাসব্যাণ্ড।’

—‘কি হল, কথা বলছেন না যে? ডিভোর্স করা মেয়েদেব কি আপনি খারাপ ভাবেন?’
 —‘ওঃ, তখন সেই সিগারেট খাওয়া মেয়েদের কথাটা ফিরিয়ে দিলেন বুঝি? নাঃ তা নয়, আমার কেমন মনে হত আপনার বিয়েই হয়নি। বস্বেতে বুঝি তিনি থাকেন। মানে আপনিও থাকতেন?’

—‘হ্যাঁ জুছতে। একেবারে সমুদ্রের ধারে সেই বাড়ি। চলুন হোটেল ফেরা যাক।’
 —‘চলুন। তাহলে সত্যি ব্রেকার পার হওয়া হল না আপনাব। এ কিরকম হল জানেন? টেস্টে এ্যালাউ হবার পর পরীক্ষা না দেওয়া আর কি।’

সহজ হতে চাইল সতীন্দ্র।

—‘টেস্টে এ্যালাউ হয়েছিলাম?’

—‘নিশ্চয়ই। কলকাতার ঠিকানাটা কিন্তু আমাকে দিয়ে যাবেন।’

—‘কেন? বিয়ের সময় নেমস্তন্ন করবেন?’

—‘যদি বিয়ে করি।’

—‘যদি মানে? ছবিটা?’

—‘ওঃ হ্যাঁ!’

রাত অনেক হয়েছে। তবু চিঠি লিখতে বসল সতীন্দ্র।

.... ‘লীনা, একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম সিগারেট খাওয়া মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। গলা হোর্স হয়ে যায়। আমার বৌ-এর গলা ছেলেদের মত শোনাবে’—এই পর্যন্ত লিখে থামল সতীন্দ্র। তারপর ছিড়ে ফেলল চিঠিটা। মিথ্যে কথা কেন লিখতে হয়? আমার চাইতে দেবলীনা অনেক ফ্রাঙ্ক। নাঃ দরকার নেই লিখে—একদিন চিঠি না লিখলে আর কি হবে?

ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে গেল সতীন্দ্র সমর-এর সঙ্গে।

লাউঞ্জে তন্ময় হয়ে বসে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-পড়া দেখছিল পার্বতী। এই রকম এক সমুদ্রের ধারেই আলাপ হয়েছিল দীপনারায়ণের সঙ্গে। সে আজ কতদূরে পিছিয়ে গেছে। তবু কিছু ছবি কি স্পষ্ট হয়েই না সামনে আসে। আবার এই সমুদ্রের ধারেই আলাপ হল সতীন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু কত তফাত। ‘এ ক’দিনেই কিন্তু আপনি অনেক স্মার্ট হয়ে গেছেন।’ সত্যি, এত মুক্ত এর আগে কোনদিন মনে হয়নি নিজেকে। দীপকে ভালবাসতাম খুবই, ভয়ও করতাম। নিজের শরীর নিজের অসাবলীলতা নিয়ে হীনমন্যতা যেন কিছুতেই কাটতে চাইত না। সতীন্দ্রের সামনে কখনও ওই হীনমন্যতা ভাবটা আসে না তো। সতীন্দ্র ওকে অনেকটা বদলে দিয়েছে একথা মনেতেই হবে। আর এক জীবনসংগ্রামে নামার আগে এই বদলটাও ওর খুব দরকার ছিল।

ম্যানেজাব এসে বললে—‘আজ হল না, কালকের টিকিট পাওয়া গেছে। বার্থ রিজার্ভ কবে দিবেছি।’

—‘ধন্যবাদ।’ বলল পার্বতী। একটু হাসল। মনটা হঠাৎ বলে উঠল, ‘টিকিটটা না পাওয়া গেলেই কি চলত না! সতীন্দ্র যদি আজ না আসে? এমনও তো অনেকে করে, ঐ কোনারকেই থেকে যায় বাড়িরটা, চাঁদের আলোতে মন্দির দেখবে বলে? না, অন্য কিছু না, একটা ধন্যবাদও দেওয়া উচিত তো?’ সমুদ্রের দিকে চেয়ে কত কথাই যেন ভাবতে লাগল পার্বতী। নাঃ, যাই, শেষবাবের মত সাঁতাব কেটে আসি একবার।

সমুদ্রের ধারে এসে দেখল একটু দূরে দুটো নুলিয়া বসে বিড়ি খাচ্ছে। কি আশ্চর্য, এ সময় তো কেউই থাকে না। একটু বিবক্ত হল পার্বতী। তারপর ওদের অগ্রাহ্য আর অবজ্ঞা করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

সতীন্দ্র আর সমবেব কোনারক দেখা চলল। এক সময় সমর বলল—‘কলকাতা থেকে হঠাৎ পালিয়ে এলি কেন?’

—‘ওসব কথা ছাড় তো!’

একটু চুপচাপ আবার হাঁটল ওবা। সমর আবার শুরু করল—‘গত বোববারে পার্থদেব ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাড়িটাঘ একটা পিকনিক গোছের ছিল। জানিস তো, আজকাল ডিংকস ছাড়া আমাদের মত উচ্চ মধ্যবিত্ত অথবা বলতে পারিস মধ্য উচ্চবিত্তদের পার্টি জমে না। দেবলীনা একটু ডিংক করেছিল। তারপর গাছে কে চড়তে পারে না পারে এই নিয়ে কথা হতে হতে দেবলীনা জেদ করে গাছে চড়তে গিয়ে পা মুচকে ফেলেছে। বুঝতেই পারিস, সবাই কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঐ সময় সব দেখে মনে হল—মানে, ইয়ে—পার্থর দেবলীনাকে বড্ড বেশী ভাল লাগে।—আর—’

—‘করা করেছিল এমন মন্দির আর এমন সব মূর্তি?’ সতীন্দ্র বলল।

—‘এড়িয়ে যাসনে কথা, তোর এই প্রশ্নের উত্তর দু’চারখানা বই পড়লেই পাবি। আমার কথা শোন, অনেক মেয়ে থাকে তারা ঐ জলের মত আব কি। যখন যে পাত্রতে থাকে, সেই রকম রং ধারণ করে। তুই সেখানে নেই, পার্থ একটু চেষ্টা করলেই পার্থব রং ও ধারণ করতে পারে। তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। দেবলীনা ভাল মেয়ে, এখনও সরল। কেবল একটু ব্যক্তিত্ব কম। তবে যাই বলিস, স্ত্রীদের একটু ব্যক্তিত্ব কম থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের হয়। মীরাাকে সবাই বলে বোকা, কিন্তু মীরা আমার বউ হয়েছে বলে আমি খুব সুখে আছি। কিরে, একলা আমিই যে বকে যাচ্ছি, একটা হাঁ হুঁ দিবি তো!’

—‘হ্যাঁ, বিয়ে করাটা দরকার।’ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সতীন্দ্র।

এখন দুপুর, ঘড়ির দিকে তাকাল সতীন্দ্র। এই সময় পার্বতীকে নিয়ে ব্রেকার পার হবাব কথা ছিল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সতীন্দ্র। একদল বিদেশী টুরিস্টদের দিকে চোখ পড়ল। স্ত্রী-পুরুষের একটি এরটিক মূর্তির দিকে কেমন লোভীর মত তাকিয়ে আছে। অবশ্য কি এদেশী কি বিদেশী সবাই তাই করে আর এটা তো এক্সপেক্টেড। দেয়ালের একটা জায়গায় দৃষ্টি পড়ল ওর। ছোট্ট করে খোদাই করা—এক চাষা, তার বৌ, মাথায বোঝা নিয়ে ছোট্ট ছেলের হাত ধরে যাচ্ছে যেন।

—‘দেখ সমর, এইটে দ্যাখ, কেমন ভাল লাগছে, নারে!’ এইবার ওরা এই ধবনাব অনেক ছোট ছোট খোদাই-কবাজিনিস দেখতে শুরু করল। কোথাও একটা লোক হাঁটুতে কনুই রেখে হাতের মুঠির ওপর চিবুক রেখে চিন্তায় মগ্ন। কোথাও শাণ্ডী বৌকে ধবে মাবছে। এরকম আরও কত।

—‘কত সমস্ত বই লেখে এই মন্দির নিয়ে। এই ছবিগুলোর কথা কোথাও লেখে না রে!’ বলল সতীন্দ্র।

—‘হয়তো লেখে। আমরা আব কটা বই পড়ি বল।’ সমব বলল।

—‘তা ঠিক।’ চিন্তায় মগ্ন সতীন্দ্র, পার্বতী কি টিকিট পেয়েছে? কি যেন একটা কথা পার্বতীকে বলতে ইচ্ছে কবছে। আমি পৌছবার আগেই কি বেরিয়ে যাবে পার্বতী? এই বে, কলকাতার ঠিকানা নেওয়া হয়নি তো!

—‘এই দ্যাখ সতীন, এই দিকটার এই রিলিফের কাজটা দ্যাখ।’

—‘চল ফেরা যাক।’ হঠাৎই বলে উঠল সতীন্দ্র।

—‘কি হল?’ অবাক হল সমব।

—‘সেই একই রকম সব মূর্তি, একই প্যাটার্ন দেখতে আর ভাল লাগছে না।’

—‘হঠাৎ হল কি?’

—‘শরীরটা ভাল লাগছে না, চল।’

—‘লাঞ্চটা সেরে যাবি তো, না কি?’

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবা গাড়ীতে উঠল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। সমর আর না পেরে বলে উঠল—‘আমি বুঝতে পাবিনি সতীন, পার্থর দেবলীনাকে ভাল লাগে শুনে তোর এতটা খারাপ লাগবে। তুই একটা ছেলোমানুষ।’

—‘একুনি আমি দেবলীনাব কথা ভাবছিলাম না।’ উত্তব দিল সতীন্দ্র।

—‘তবে কি ভাবছিস অমন মুখ গোমরা কবে?’

—‘মানুষের মন বড় বিচিত্র।’

—‘তুই কি এখন ফিলজফি আওড়াবি নাকি?’

—‘ড্রাইভারটাকে বল না, আর একটু স্পীড দিতে।’

—‘মনে হচ্ছে তুই গিয়েই কলকাতার টিকিট কাটবি? তুই যে এতটা জেলাস হতে পারিস, তোকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। আমাব ধারণা ছিল তুই আমাদের থেকে অন্য রকম।’

—‘বাজে বকিসনি, হোটেল আমাব একটা দরকারী কাজ আছে।’

গাড়ি চলেছে। কখনো রাস্তাটা উঁচু হয়েছে, কখনও নীচু। কখনো দুপাশে ফাঁকা মাঠ। কখনো জঙ্গল। কখনো বা গ্রাম, আর কখনো দুপাশের বড় বড় গাছের ডালগুলো নিলে গিয়ে মাথাব ওপর খিলান সৃষ্টি কবেছে যেন। অন্য সময় সতীন্দ্র এসব লক্ষ্য কবত। এ নিয়ে দুটো কথাও বলত, কিন্তু এখন—দেবলীনা কবে চিঠি লিখেছে? সোমবার। কই, পার্থব বাগানের পিকনিকের কথা তো কিছু লেখনি। দোষ কি? তুমিও তো পার্বতীর কথা কিছু উল্লেখ করেনি। কিন্তু দেবলীনা সবসময় বলে, সে ফ্র্যাঙ্ক। আমার কোন প্রিটেনশন নেই। যদি, যদি আজকের টিকিট পেয়ে থাকে পার্বতী তবে দেখা হবে না। নাঃ, কিছুতেই কলকাতার ট্রেন ছাড়বার আগে পৌছতে পারবে না ওবা। কলকাতার হাজাব হাজাব অটালিকা, শ’ শ’ বাস্তা গলি আর লাখ লাখ মানুষের মধ্যে ঠিকানা না জানলে কি কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কাগজে ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দেব তাহলে। একটা কথা পার্বতীকে দেখা হলে বলতেই হবে—‘আপনি যা ভাবেন আপনি তা নন। আমি বলছি আপনি দেখতে খুব সুন্দর।’ এটুকু বললে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হবে না। গাড়ি ছুটে চলেছে। অন্ধকার হয়ে গেল। আজও চাঁদ উঠবে। কিন্তু একটু দেরি হবে। পার্বতীকে বলতেই হবে, ‘আপনি ডিভোর্স-করা মেয়ে বলেই আপনি বাতিল হয়ে যাননি। আপনার সৌন্দর্য পবিত্র। অনেক সুন্দরী আপনার পাশে দাঁড়ালে ম্লান হয়ে যাবে।’ আচ্ছা, কি সমস্ত আবোল-তাবোল ভাবছি!

—‘একটা সিগারেট দে তো সমব।’

সমর সিগারেট কেসটা এগিয়ে দেয়। পুরী শহরে গাড়ি ঢুকছে, সতীন্দ্রের খেয়াল হল যেন এতক্ষণে।

—‘সমর, তোকে তো ভুবনেশ্বর যেতে হবে, তাই না?’

—‘ধ্যান ভেঙেছে? হ্যাঁ, তোকে হোটেল পৌছে দিয়ে ফিবব।’

—‘না, আমাকে তুই এই বাজারের মুখটায নামিয়ে দে।’

গাড়ি থামল। সমব বলল—‘সতীন, তুই এত সেন্টিমেন্টাল ভাবিনি কখনও। তাহলে পার্থব বাগানের কথা তুলতামই না। এই সমাজে এতটুকুর জন্য কেউ এত আঘাত পায় তোকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেল, অনেস্টলি বলছি!’

সতীন্দ্র হাসল। সমরের গাড়ি চলে গেল। সতীন্দ্র দ্রুত এগিয়ে চলল সেই শাড়ির দোকানটির দিকে। সেই মালাট-কালাব শাড়িটা কিনল সতীন্দ্র। তাবপর একটা সাইকেল-রিস্তা ভাড়া করে চলল হোটেল।

লাউঞ্জে ভীড়। থমথম করছে যেন আবহাওয়াটা।

—‘কি হয়েছে?’ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল সতীন্দ্র।

‘একশ দশ নম্বরের মেমসাহেব দুপুরে সমুদ্রে স্নান কবতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। নুলিয়ারা অনেক চেষ্টা কবে এক-দেড় ঘণ্টা আগে দেহটা তুলে এনেছে।’

আরও জানল সতীন্দ্র, ব্রেকার পার হতে গিয়েছিল পার্বতী। দুটো নুলিয়া দেখেছে। খানিকক্ষণ না দেখতে পেয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। মিস সরকারের মাসীব বাড়িতে ট্রান্সকল করা হয়েছে। কাল সকালেই ওঁব মা ইত্যাদি এসে যাবেন। পুলিশ এসেছে, মর্গে নিয়ে যাবে দেহ।

একটু আগে পর্যন্ত পার্বতীর ভীতু-ভীতু ভাব কাটিয়ে দিয়েছে বলে সতীন্দ্র গর্ববোধ করেছিল মনে মনে, ভেবেছিল সম্পর্ক সহজ হলে বলবে—‘ভাগ্যিস আমাদের আলাপ হল, তোমার তাই না খোলসটা যুচে গেল। তুমি যে কত সহজ আর স্মার্ট হতে পার তা বোধ হয় তুমিও জানতে না, আমিও জানতাম না।’

আর এখন সতীন্দ্রর সারা মনটা হাহাকার করে বলতে লাগল—ভুল হয়ে গেছে, পার্বতী, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমার কি দরকার বা অধিকার ছিল তোমাকে এইভাবে হনন করবার। আমি দায়ী, তোমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী পার্বতী। মনে পড়ল,—‘সব সময় এত ভয় পান কেন বলুন তো? এত ভয় পেয়ে পেয়ে এত বড়টা হলেন কি করে?’ তুমি ঐ ঢেউ দেখে একটু ভয় পেলেন না কেন পার্বতী? তোমার সেই ভীতু-ভীতু নিড়বিড়ে ভাবটা ভাল লেগেছিল বলেই তো তোমাকে ভালবেসেছিলাম পার্বতী। হ্যাঁ, এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি তখন তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আসলে এই কথাটাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। এই কথাটাই বলবার দরকার ছিল। খুব দরকার ছিল।

পুলিশের গাড়ি পার্বতীকে নিয়ে চলে গেল। শাড়িটা কোলে নিয়ে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে রইল সতীন্দ্র। আকাশে তখন কৃষ্ণপক্ষেব তৃতীয়াব চাঁদ আর উদাসীন সমুদ্র গর্জন করে চলেছে সমানে। ঢেউগুলো বালির ওপর আছড়ে পড়ছে—আবার পড়ছে—আবার আবার।

আতশী

শাহেদ আলী

কথা আছে, আজলের লিখা নাকি পালটানো যায় না। কথাটার সত্যতা আবার নতুন করে প্রমাণিত হল মালেকাব বেলায়। দ্বিতীয়বারের স্বামীও তাকে একদিন ঘর থেকে বেব কবে দিল তালুক দিয়ে। আবার সে ভেসে পড়ে বিপুল সংসারের বিপুলতর অনিশ্চয়তার মধ্যে।

এজন্য অবশ্য বিশেষ কোন ভাবনা নেই মালেকাব। যার কিছুই নেই, সমস্ত সংসারটাই যে তার, মালেকা এ কথা বিশ্বাস করে বলে অনেকের ধারণা। নেহায়েৎ কচি বয়েস মালেকা তার বাপ-মাকে হাবায়। এক ভাই ছিল বেঁচে, সেও বছর চাবেক হল, দুনিয়ার দেনা পাওনা সব চুকিয়ে দিয়ে জন্মাতবাসী হয়েছে। যে কয়েক কেয়ার জমিজমা ছিল তাঁর ঋণের বদলে গাঁয়ের মুসলমান মহাজন গিলে ফেলেছে। সুতবাং মালেকার আব কিছুই নেই এ সংসারে। নাবীর অনিশ্চিত জীবনে মাথা ঝুঁকবাব একটু ঠাই থেকেও বঞ্চিত হয়েছে অনেক দিন।

চৌদ্দ বছর বয়েস—যৌবনের পানি দেহেব কিনাবায় ফুলে ফেঁপে উঠে চাইছে—ঠিক এমনি সময়ে প্রথম শাদি হল মালেকাব। বড় ভাই লতিফ এক কেতাব-পড়া মুন্সীর ডেকে এনে ‘দানে’ শাদি দিল মালেকাব, হাতে তাগা বেঁধে মুন্সীর সঙ্গে মালেকাব জীবনধারাকে যুক্ত কবে দেয়া হল এক শুভ মুহূর্তে।

কালো নয়, ফরসাও নয় মালেকা—মাঝামাঝি রকমের রঙ তার গায়। স্বাস্থ্য-উজ্জ্বল দেহ, স্থিৰ-ধীৰ রাশভাবি মেয়ে, কথা বলে একেবারেই কম। বহুসোব স্বাপ্নিকতায় প্রথম প্রথম কিছুদিন ভালই কাটে মুন্সীর—কিন্তু ধীবে ধীরে সহজ সমতলে বিবোধেব পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

শিশুকালে মুন্সীর মা-বাবাব মানং ছিল বেঁচে থাকলে কখনো সে লাঙলেব মুঠো ধরবে না; এর মানে এ নয় যে, জান কবজ হবাব পর সে শুধু লাঙলই ঠেলবে কেয়ামত তক্। মুন্সী তাই চাবীর ফবজন্দ হয়েও চাষবাস কবে না। কিছু আরবী পারসী পড়েছিল, তাবই বদৌলতে সে বাড়ী বাড়ী মৌলুদ আর খতম পড়ে বেড়ায়, বিমারিব জানের বদলে সদকা-দেয়া বকরিটা মুবগিটা পাকড়াও কবে নিয়ে আসে, আর অবসর সময়ে বসে বসে খালি তাবিজ লেখে। সে তাবিজ যে কত রকমের তার হিসেব দিতে গেলে কেতাব বেড়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত গাছকে কলম এবং সবগুলি সমুদ্রের পানিকে কালি করলেও নাকি আত্মার সিক্ত লিখে শেষ করা যাবে না। মুন্সীর বাংলা ছুলামানী কেতাবখানির প্রত্যেকটি হরফের ফজিলত বয়ান করেই কি শেষ করা সম্ভব? বিমার আজারি দূর করা, দূশমনকে তাবে করা, আশেক মানুককে মিলিয়ে দেয়া—এমন কোন কাজ নেই যা এই পৃথিবী দৌলতে মুন্সী পারে না। নেক ছায়েত দেখে সে পৃথিবানি খুলে বসে, সাদা কাগজে নানা রকম নকশা তুলে তাবিজ লিখে, আর জরুরং বুঝে শির্নি আদায় করে—সোয়া পাঁচ আনা থেকে পাঁচ সিকে।

একদিন সন্ধ্যার সময় মুন্সী বাড়ী ফিরল একটা লাল মোরগ আর কয়েক আনা পরসা নিয়ে। প্রায় রোজই মোরগটা না হাঁসটা নিয়ে আসে মুন্সী, এ নিয়ে মালেকা কোন ঔৎসুক্য

প্রকাশ করেনি কোনদিন। আজ কী মনে কবে সে ধীবে ধীবে প্রশ্ন করে বসে—কত দিয়া আনছো মোবগটা?

—মোরগ বুঝি আবার কিনা আনতে অয় নাকি?—মুন্সী বিস্ময় বোধ কবে,—বড় বাড়ীর একটা মইয়া বিমারে ভুগছে অনেক দিন, তারি লাইগা ছদকা দিছে।

—ছদকা?—মালেকাব সাবা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, আর মোরগটা হাত থেকে দলা হয়ে মাটিতে পড়ে যায়,—এ আমি কাটতে পারব না,—মালেকা দা রেখে হঠাৎ উঠে পড়ে।

—বানতে পাববি না? বিস্ময়ের সঙ্গে বিবক্তি মিশে মুন্সীর গলাব আওয়াজটা ঝা ঝা কবে ওঠে।

—তোমার হাত পাও নাই? কাজ করতা পার না? চলে যেতে যেতে পেছনে না তাকিয়েই ঠোট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বলে মালেকা—পরের ময়লা খাইয়া ওফা অইবো না কোনদিন।

মুন্সী এবার চটে আগুন হয়ে ওঠে,—আমি কাজ করতে পারি না! ভাত-কাপড় বুঝি এমনি জুটে, না? মালেকা এ কথাব কোন সাড়া না দেয়ায় মুন্সীর আহত বিক্ষুব্ধ পৌকষ গর্জে ওঠে। প্রথমে সে মালেকাব জটপাকান চুলের মুঠায় ধরে এক চোট কিলমোড়া দিয়ে নেয়, তারপব একটা লতান কঞ্চি নিয়ে বেদম তাব পিঠে বসাতে থাকে। কিন্তু এত কবেও মালেকার স্থিৰ অচঞ্চলতায় ঢেউ তোলা বড় কঠিন ব্যাপার, একটু আত্ননাদ পর্যন্ত সে করল না, ঠাষ দাঁড়িয়ে নীববে হজম করে গেল সব। শুধু দু-একবাব ভোতা নিস্পৃহ মুখ তুলে ভীর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীব মুখের দিকে তাকাল—এই পর্যন্ত।

মেজাজ চড়ে-যাওয়া মুন্সী তাপ বিকীৰণ কবে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এক সময়। কিন্তু মোবগেব স্বাদু গেশত আব পেটে গেল না আজ, আ-কাটা মোরগ যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকল সারা রাত। শুধু ভাত নিজে বেড়ে নিয়ে নাকে-মুখে কিছুটা গুঁজে দেয় মুন্সী, তাবপব মুখ ভোতা কবে পড়ে থাকে বাবান্দায়। মালেকার সঙ্গে তাব আড়ি, অনায্য বাবহাবেব জন্য যতদিন না মালেকা মফ চেয়েছে, ততদিন আর মুন্সী এক বিছানায় ঘুমাবে না মালেকাব সঙ্গে।

মুন্সী তাব আড়ি নিয়ে আছে—এদিকে, পরদিন সকাল থেকেই ভাত বাঁধা বন্ধ কবে দিল মালেকা। নিজে উপোষ দিতে শুরু করে, কাজেব মধ্যে ঘব-দোবটা একটু কাঁট দেয়, বাটি-বাসনগুলো ধুয়ে বার বার সাফ করে, তারপর যেখানে সেখানে নিজেকে একেবারে ঢেলে দিয়ে বসে থাকে বটগাছের মত শব্দ হয়ে, অথহীন উদাস দৃষ্টিব ঘোলাটে ধূসবতায় মৃত্যুর নিরর্থকতা যেন ছায়া ফেলে।

মালেকার মাথা খারাপ নাকি?—মুন্সী একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে। দু-একটি কথাও যদি মালেকা বলত, মুন্সী কিছু বুঝতে পারত হয়ত। কিন্তু ও একেবারে নির্বিকার নিস্পন্দ। নিরুপায় হয়ে নিজেই রান্না চড়ায মুন্সী।

কিন্তু পুরুষ মানুষের রান্না! কত যে হ্যাঙ্গাম আব ফেসাদ তাতে। হাড়ে হাড়ে তেতো-বিরক্ত হয়ে ওঠে মুন্সী। তৃতীয় দিন সকাল বেলা ভাতের মাড় খসাতে গিয়ে মুন্সী তার ডান হাতের আঙুল পুড়িয়ে ফেলল। সেই পোড়া আঙুল নিয়ে সে ছুটে যায় মালেকার কাছে। মালেকা তখন নিজীবের মত পিঠ বাঁকিয়ে হাতনেয় বসে অলস তল্লায় ঢুলছে; তার মুখের কাছে আঙুলটা তুলে ধরে মুন্সী বললে—দেখতো, হাতটা কী অইছে? মুন্সীর স্বর অসহায় মিনতিতে প্রায় কান্নার মত বেজে ওঠে—আমার না-অয় একটা ভুলই অইছে। তারি লাইগা, সারা জিন্দেগী এইটা মনে রাখবি তুই? এমন কইরাই বুঝি দিন আমরার যাইব?

বঙ্ক্যা দৃষ্টিতে ঢিলে দিয়ে মালেকা মুন্সীর হাতের দিকে তাকায়; তারপর, চোখ দুটো ছোট করে অত্যন্ত গভীরভাবে বলে ওঠে—এই হতে না তাবিজ লিখ, বাঁচাইতা পারলা না?

মালেকা আবার নিজের অন্ধকার নীরবতায় হারিয়ে যায়। তিনদিন পরে শান্ত সমুদ্রে কিছুটা বৃদ্ধ উঠে আবার মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল।

মুন্সীর সারা গায়ে জ্বালা ধরে যায়। তিন দিনের মধ্যে মালেকা এই প্রথম কথা বলল, তাও তার সারা জিন্দগীর পাক-পেশাকে বিদ্রূপ করবার জন্যে। গোঁসায় সে বাঁ হাতে চুলেব মুঠো ধবে, ডান হাতে পিঁজা দিয়ে ধরে মালেকার মুখে—হারামজাদি,—বদমায়েশ,—জাহিল,—আল্লার কালাম মুখে আইয়ে না,—আর তার বেইজ্ঞত করবার বেলা ফবফরাস।

চোখ উলটিয়ে মালেকাব দৃষ্টি আসমানের দিকে প্রসারিত হয়। আরো কিছু চড় ঝিল দিয়ে মুন্সী এবার ছেড়ে দিল মালেকাকে। মালেকা থুথু ফেলে আর তাবি সঙ্গে বেরিয়ে আসে লাল টকটকে তাজা লোহ, একটুক্ষণে মিলিয়ে-যাওয়া হাসিতে মালেকাব ভাবনাহীন নিস্ত্রভ মুখখানি মুহূর্তে আরো করুণ হয়ে ওঠে। আল্লার কালাম যে মুখে আসে না, পিঁজা দিলে সে মুখ থেকেও কিন্তু তাজা লোহ ছুটে আসে দরদব্ করে।

অদ্ভুত ব্যাপাব এই যে, বিকেল বেলা থেকে আবার বান্নাবান্নায় মন দেয় মালেকা। স্বামীব জন্য দুটো ভাত ফুটায়, বাতী নামার বিছড়া থেকে কলমি কুড়িয়ে আনে, মোবগগুলোকে কুড়ো খাওয়ায়, মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কেঁচো খেতে দেয় হাঁসেব বাচ্চা কটাকে। আর শোবাব সময়, শুয়ে পড়ে গিয়ে একেবারে মুন্সীব কাছটিতে।

মুন্সী মনে মনে হাসে—ওষুধে ঠিক ধরেছে, যেমন কুকুব তেমন মুণ্ডব। কিন্তু মাবতো আরো কতদিন মেবেছে। মালেকা তো কখনো অমন পোষা কুকুবের মত তাব পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েনি। মুন্সীব আক্কেল এবাব একেবারেই ঘুলিয়ে যায়, তবু এই নিজীবি মাংসপিণ্ডটাব ওপব করুণা হয় মুন্সীব, একটুখানি মমতাও। মুন্সীই যে মালেকাব পবম আশ্রয়, এ কথা মালেকা তার সর্বদেহেব নিবিড় এলায়িত সমর্পণে ঘোষণা কবছে আজ। মুন্সী তাব মুখেব দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে, তাবপব তার গায়েব উপব একটা হাত বেখে কোন কথা না পেয়েই যেন বলে—তুই আমাবে পিয়াব কবস্, না?

—হুঁউ—মালেকা নাকেব ভেতব দিয়ে আওয়াজ কবে।

—খব পিয়াব কবস্ বুঝি? বাঁতিমত কৌতুক বোধ কবে মুন্সী।

—হুঁম্—পেয়াবাব মতোন,—ঘবেব ধম্মার দিকে চেয়ে থেকে মালেকা জ্বাব দেয়, বোবা দৃষ্টিতে তাব কী যেন বিশেষ অর্থ ফুটে উঠল—মুন্সী তাব কিছুই বুঝল না, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে থাকে মালেকাব মুখেব দিকে।

ধম্মা থেকে দৃষ্টি টেনে এনে মালেকা এবাব আরো খেসে আসে মুন্সীব বুকেব কাছে। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে—আমারে তোমার সহি অযনা, না?

প্রশ্নটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকে মুন্সীব কাছে। একটু হেসে সে জ্বাব দেয়—আমি কেনে? দুনিয়ায় অমন কোন মরদ নাই যে তোরে নিয়া ঘব কবতে পাবে।

—তা আইলে, তুমি কেনে তালাক দেওনা গো আমারে? মুন্সীর মুখেব কাছে মুখ নিয়ে মালেকা বলে, আর দু'হাত দিয়ে আদর করার ভঙ্গীতে চেপে ধরে তার গলায়।

মুন্সী জোর করে নিজেকে মুক্ত করে নেয় মালেকাব হাত থেকে,—বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মালেকার মুখের দিকে তাকায়। বুদ্ধি তার আচ্ছন্ন হয়ে যায় মালেকার ব্যবহাবে। মালেকার দু'চোখ বেয়ে আঁসু গড়িয়ে পড়ছে, ঠোঁটে তার একটা অদ্ভুত বিমর্ষ হাসি, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে—আর কেমন যেন একটা গোপন দূরভিসন্ধিতে সে উষ্ণ নিঃশ্বাস পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।

এবার মুন্সীর বিস্ময়ের ভাব কেটে গিয়ে ক্রোধ ঠেলে ওঠে। এ মেয়ে তো সাধারণ মেয়ে নয়। শাদির পর থেকেই শরীর কেন ভাল যাচ্ছে না, মুন্সী এবার তার হৃদিস পেয়ে যায়! এবং এবার সে দু'হাতে জোর করে মালেকার গলা টিপে ধরে।

হাত পা ছুঁড়ে গৌঁ গৌঁ কবতে থাকে মালেকা। এক সময়ে তার দূষিত নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। মালেকাব গলা ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গী থর থর কাঁপতে থাকে। মালেকা বুঝি মরে গেল। বিড় বিড় করে কলেমা কালাম পড়ে মুঙ্গী ফুঁ দেয় মালেকার চোখে মুখে। হয়ত, কালামের ফজিলতেই এবার চোখ মেলে চায় মালেকা। মুঙ্গীর ঈমান আরো শক্ত হয়।

পরদিন থেকে মুঙ্গী আলাদা বিছানা করে। মালেকার দূষিত নিঃশ্বাসের অশুভ সংক্রামক হওয়া তাকে এড়িয়ে চলতে হবে। আগের মতই থোম্ ধরে থাকে মালেকা, অতি প্রয়োজনেও দু'একটার বেশী কথা তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। মুঙ্গী মাঝে মাঝে ভাবে—মালেকাব ওপর জিন-পরীর আছর হওয়াও অসম্ভব নয়। তাই, সে ছলেমান্নী কেতাব খুলে মালেকাকে তাবিজ দেয়, আর মালেকা সেই তাবিজ আঙুনে পুড়িয়ে হাসি-কান্নায় করুণ হয়ে ওঠে। তালাকের ভয় দেখাবার সাহসও মুঙ্গী আজকাল পায় না,—পারলে মালেকা নিজেই মুঙ্গীকে তালাক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তা ছাড়া বিয়ে কবাটাও তো এত সোজা নয় যে, একটা বউকে ঘব থেকে বার করে দিলেই আবেকটা সোজাসুজি চলে আসবে। নিজে বাম্বাবান্না করার কী যে ফেসাদ তার প্রমাণ এখনো পাওয়া যাবে তাব পোড়া হাতটিতে। অথচ প্রতিটি মুহুর্তেই নিরুত্তাপ নীববতা সহোব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

একদিন মুঙ্গী খতম পড়ে বাড়ী ফিবে দেখে—তাব ছনের ঘরটিতে আঙুন লেগে গেছে। বুনদা পাকিয়ে পাকিয়ে আঙুনের শিখা কৃষ্ণাভ লাল নিশানের মত নেচে নেচে আসমানের দিকে ধাওয়া কবছে, কাপড়ের খুট ধবে মালেকা দাঁড়িয়ে আছে আঙুনের দিকে চেয়ে—নীবব নিখব—বিশ্বযেব যেন অবধি নেই তার। একটা কিছু জিনিষও মালেকা ঘব থেকে বাব কবিনি, আঙুন নেভানোব জনা পাড়ার লোকদের চাঁৎকাব কবে ডাকাবও প্রয়োজন বোধ কবিনি মালেকা—যাবা এসেছে, তাবা আঙুন দেখে এমনি ছুটে এসেছে, আব মালেকা দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর হয়ে। আঙুনের আঁচ এসে লাগছে নাকে-মুখে, চুল উডছে, আঙুনের এই ঝড়ের মধ্যে কোন অতর্নী স্বপ্নে সে মশগুল হয়ে আছে—কে জানে?

সেই দিনই মালেকাব প্রথম বাসা ভাঙলো। পাড়ার লোকের সবাবই বিশ্বাস, এবং মুঙ্গীবও তাই, মালেকাই আঙুন দিবেছে ঘবে। সুতরাং এবার আঙুন লাগে মালেকাব কপালে। পবিতাত্ত মালেকা মুঙ্গীর ঘব থেকে বাব হয়ে আসে নির্বাক্তব সংসারে।

বহু দূব-সম্পর্কেব এক মামাব আশ্রয়ে মাস চারেক থাকার পর সেই মামাবই চেষ্টায়, মালেকা দ্বিতীয় বাবেব মত কনে সেজে আবার ঘর কবতে যায় মুনাওয়ারাবব সঙ্গে।

একাব সংসাব মুনাওয়ারাববও। পাশেব ঘরে থাকে তার এক বড় বোন ও বোনের সোয়ামী, দখনের হিষা তার ভগ্নিপতির বড় ভায়ের। কালো মোষেব মত বড়, চওড়া বুকের পাটা, মুনাওয়ারাব বলিষ্ঠ যুবক। সামান্য কিছু জমি আছে, তা-ই চাষ কবে,—কিন্তু তাতে সারা বছর চলে না, কাজেই দিন গুজবানের নতুন নতুন পস্থা তাকে অবলম্বন কবতে হয়।

বউ দেখে প্রথম খুশীই হল মুনাওয়ার। রঙটা মন্দ নয়, তা ছাড়া, ঢলঢলে যৌবনের প্রসাদে ঢিলা ঢালা গায়ে তার স্বাস্থ্যের জৌলুয কম নয়। শরতের আসমানের মত বৈচিত্র্যহীন দৃষ্টি মেলে সে যখন মুনাওয়ারের দিকে চেয়ে থাকে—সতি, মমতা হয় মুনাওয়ারেব। কিন্তু বহু কষ্ট করেও যখন বউকে হাসাতে পারল না—তাজ্জবও কম হয় না মুনাওয়ার।

পাড়ার বেড়িয়ে-বেড়ানো মেয়েরা ভাব জমাতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে ঝায়। কারো সঙ্গেই মালেকা বড় একটা কথা বলে না, আর বললেও এমন ভাবে বলে যে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেই কারো কারো সন্দেহ হয়। কেউ কেউ মনে করে, মেয়েটা বড় দেমাগী—আবার কেউ কেউ তার পয়লা স্বামীর মতই সন্দেহ করে, মালেকার উপর জিন-পরীর আছর হওয়াও অসম্ভব নয়।

আগে মুনাওয়ার জমিটা ভাগে চাষ করতে দিয়ে নিজে চাকুরী কবত। কিন্তু এখন আর চাকুরী করে না; কী করে যে তার দিন গুজরান চলে, গাঁর লোকের কাছে তা রীতিমত গবেষণার ব্যাপার। দিনের বেলা সে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, পাটুনী পাড়ায় তাদের আসরে বসে তাস খেলে, নাচগানের মজলিসে বসে হাততালি আব বাহবা দিয়ে সে প্রমাণ করে, তাব মত সমঝদার লোক আর নেই। কখনো কখনো সে বোজ-কামলা হিসেবেও কাজ করে, প্রায় রাতই বিছানা ছেড়ে কোথায় চলে যায় মুনাওয়ার; এটা ওটা নিয়ে সে যখন চুপি চুপি বাড়ী ফিরে তখন গভীর নিশুতি রাত! মালেকা কিছু বলে না, চোখ বুজে পড়ে থাকে বিছানায়, আর গভীর ঘুমে তার শরীরে প্রত্যেকটি গেবো যেন ঢিলে হয়ে খুলে যায়। মুহূর্তের দুঃস্বপ্নের মতই মুছে যায় তার মন থেকে।

আবেগহীন নিরুত্তাপ মালেকার গাভীর পাথরের মতই ঠাণ্ডা আব কঠিন। তবু, এ নতুন বউ-এব স্বাভাবিক লজ্জা ছাড়া আব কী? মুনাওয়ার তাকে আদব কববার চেষ্টা করে—হৃদয়ের উত্তাপ পেলে এ বরফ ভেঙে যে ধারা বয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহই নেই মুনাওয়ারের।

ধীরে ধীরে বোবা মেয়েটির বোবা চাহনীও কিন্তু অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, গভীর নিশুতি বাতে মুনাওয়ার যখন এটা ওটা নিয়ে বাড়ী ফিরে, মালেকার সন্দেহ-ভবা দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে তখন জবাবদিহি করতে হয়, “এসব জুয়ার পয়সা দিয়ে কেনা” অথবা “চিঠি-খেলার দানে” পেয়েছে। মালেকা এসব স্পর্শ করে না, মুনাওয়ার যেখানে রাখে সেখানেই পড়ে থাকে। সুতবাং বাধা হয়ে মুনাওয়ারকেই এসব সামলাতে হয়।

এ নিয়ে ক্রমেই অসন্তোষের মেঘ জমা হয়ে ওঠে মুনাওয়ারের মনের আসমানে। স্বামী-স্ত্রীর বিপন্ন করে হানা তিনিস ওধু একটু যত্ন করে তুলে রাখবে, তা-ও মালেকাকে দিয়ে হয় না।

একদিন দুপুর বেলা তাদের আড্ডা থেকে ফিরে মুনাওয়ার দেখতে পায়—বাতের বেলা যে পুনানো থালা-বাসন আব কাপড়-চোপড়গুলো এনেছিল, তাব সবগুলোই এখনো চুলো-মুখে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি করে সে তিনিসগুলো বেখে দেয় ধানের বড় ডোল্টাব মধ্যে। চওড়া বুকুর পাটার ভেতর যেন তুফান গুল হয়ে যায় মুনাওয়ারের—বিয়ে-কবা বউ-এব এত দেমাগ আব হিম্মত।

বাবান্দায় বসে, বেড়ায় হেলান দিয়ে মালেকা ঝিমুচ্ছে, চুলে টান পড়ায় সন্তুষ্ট হয়ে সে তাকায় সামনের দিকে—মূর্তিমান আজবাইলের মত মুনাওয়ার দাঁড়িয়ে। রাগে তার নাক আর ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে সে বললে—ভরব তো দেমাগ ভইছে হাবামজাদিবি। তিনিসপাতি সামলাইয়া রাখবি, তা-ও যদি না পাবস্, গলায় দড়ি দিয়া মবতে পাবস্ না?

মালেকা থোম্ ধরে বোবার মত চেয়ে থাকে মুনাওয়ারের দিকে। চুলটা ছাড়াবাব পর্যন্ত চেষ্টা করে না সে। শুধু অকারণ কৌতুকে চোখ দুটো তার বড় হয়ে ওঠে।

—এই শয়তানী—কথা ক'স না কেনে? মুনাওয়ার এবার চাপা ক্রোধে গর্জন করে ওঠে; তার ভারী হাতের চড় আব কিল অবিরাম পড়তে থাকে মালেকার পিঠের ওপর। মালেকা কাঁদে না, শুধু একেবার গোঁ গোঁ করে ওঠে যন্ত্রণায়।

শেষ পর্যন্ত মুনাওয়ারের বোন মাজেদা এসে মালেকাকে উদ্ধার করে। সহানুভূতিতে গলে গিয়ে সে বলে—মা-গো মা—কেমন পাষণী, দেখ চাই! একবার নি একটু কানল—একটু উহ্নি করল। একি মানুষ না আর কিছু?

মালেকা পরনের কাপড়টা সামলে নিয়ে ধপ করে বসে পড়ে বারান্দায়, এলোমেলো তেল-না-পাওয়া চুল মুখের উপর ঝুলে পড়ে মালেকার মুখটাকে প্রায় ঢেকে ফেলে; চুলের ফাঁকে ফাঁকে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মালেকা মাথা নীচু করে বসে থাকে— এক হাত বুকে চেপে দ্রুত শ্বাসপতনকে রোধ করবার প্রয়াস পায়—নিঃশ্বাসের চাপে ফুসফুস যেন ফেটে যাচ্ছে তার।

ঘরের এক কোণে কাঁথা বিছিয়ে মালেকা মাটিতে পড়ে থাকে অবশ হয়ে। যন্ত্রণায় সারা দেহ ছটফট করে। বিকেলে আসে প্রবল জ্বর। পানির পিয়াসে ছাতি যেন ফেটে যায় মালেকার— কোন রকমে টল্‌তে টল্‌তে ঠনার কাছে যায়, কলস থেকে ডোগ্লায় পানি ঢেলে ঢক্‌ঢক্‌ করে গিলে ফেলে।

মুনাওয়ার মালেকাকে ডেকে এনে ভাত বেঁধে দিতে বলে। মালেকার যে জ্বর হয়েছে এ কথা যেন বিশ্বাসও কবতে চায় না মুনাওয়াব। মেয়েলোকের অমন ভর-ধরার সাথে খুবই পবিচিত সে। অমন বজ্জাত মেষের সঙ্গে আর সে কথাই বলবে না কোনদিন।

দু'দিন গেল—তবু জ্বর ছাড়ে না মালেকাব। জ্বর নিয়েই মাঝে মাঝে উঠে কাঁথা-কাপড়গুলো শুকাতে দেয়, ডোগলা ভবে ভবে পানি খায়, আর হাতনেয় বসে বসে ঝিমোয়।

কিন্তু মাজেদা আব ক'দিনই বা বাম্বা-বাড়া কবে দেবে মুনাওয়াবকে? মুনাওয়ারকে সে বলে দিয়েছে—আমাব ঠেকা লাগছে আব কি! বউরে আরো মারুগা গিয়া—ভাত-সালুন এমনি অইব তখন। সুতবাং মুনাওয়াব অসুবিধায় পড়ে এবার। বাধ্য হয়ে তাকে মালেকাব কাছে যেতে হয়, মালেকাব গায়ে হাত দিয়ে তার জ্বর পবখ কববাব চেষ্টা করে। মালেকা অনাসক্ত দৃষ্টিতে মিঝিমিঝি চায় মুনাওয়ারের দিকে, শিথিল উদাসীন দৃষ্টিব মধ্যে কিছুই যেন খুঁজে পায় না মুনাওয়ার। জ্বর নেই মালেকাব গায়ে। মুনাওয়ার বলে : এ্যাই উঠ না। দুইটা ভাত রাঁধ গিয়া—আমার ভাবী খিদা লাগছে।

মালেকা কিছু না বলেই উঠে পড়ে—তাবপব, চুলোব ওপবে হাঁড়ি চড়িয়ে দেয়।

খেতে বসে মুনাওয়াব জিগ্‌গেস কবে—তুই থোম্‌ ধইয়া থাকস্‌ কেনে, অসুখ-বিসুখ করছে নাকি?

দড়মের ওপাশে চুপ করে বসে থাকে মালেকা—কোন জবাব দেয় না।

মুনাওয়ার আবাব জিগ্‌গাস্‌ হয়—রা করস্‌ না কেনে? অসুখ-বিসুখ করল নাকি তাব?

এবারও কোন সাড়া আসে না দড়মের ওপাশ থেকে। ভাত বেখে উঠে পড়ে মুনাওয়ার, হাত না ধুয়েই সে এগিয়ে যায় চুলো মুখের দিকে, সারা শবীর তার রি-রি করে ওঠে রাগে—এত দরদ, এত আন্তরিকতায়ও মুনাওয়ার পাত্রা পেল না মালেকার কাছে। তবু বাগের ভাবটা সে ঢেকে রাখে—মালেকার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করে—কী, গোঙা অইয়া গেলে নাকি। জিগাইছি, অসুখ-টসুখ করল কিনা! অসুখ করলে ওষুধ আনল লাগত না?

চুলোর প্রায় নিভন্ত আগুনে ঘরের অঙ্ককার ঈষৎ রাজা হয়ে উঠেছে। প্রায়াঙ্ককারের মধ্যে চুলোর আগুনের দিকে চেয়ে বসে আছে মালেকা, এবার সে চোখ দুটো বড় বড় করে মুনাওয়ারের দিকে তাকায়; কতকটা জমাট অঙ্ককারের মত সে দাঁড়িয়ে আছে মালেকার সামনে। মালেকা ধীরে অথচ গম্ভীরভাবে বললে—তোমার হাত দুইটারে জিগ্‌গাইতে পার না? আবার নিঃশব্দের গহন অঙ্ককারে মরে যায় মালেকা। অঙ্ককারের অতল থেকে শব্দের ক্ষীণ বৃদবৃদ উঠে আবাব অঙ্ককারেই হারিয়ে যায়।

মুনাওয়ার ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে—তবু আজ সে চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দেয়। বিমারীর ওপর হাত তোলাটা ঠিক হবে না। হাত ধুয়ে নিজেই তামাক সেজে কয়েকটা টান দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তবু, তাদের সংসার চলে যায় এক রকম। নানা প্রশ্ন করেও মুনাওয়ার যখন কোন জবাব পায় না, ত্যক্ত হয়ে সে মাৰপিট করে মালেকাকে। মালেকা আবাব থোম্ ধরে বসে থাকে—গায়ে জ্বর তোলে, এবং কয়েক দিন পর নতুন করে আবাব সংসারের কাজে লেগে যায়। মুনাওয়ার কী করবে, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না।

শীতকাল—জাল ও ফাঁদ পেতে বুনো হাঁস ধরার মওসুম। দু'একদিন পরপর দুটো চারটে হাঁস নিয়ে শেষবাতে বাড়ী ফিরে মুনাওয়ার, অনেক ঠেলাঠেলি করে ঘুম ভাঙ্গায় মালেকার, হাঁসগুলোকে জিইয়ে না রেখে তখন তখনি জবেহ করে ফেলে—কেটেকটে রাত থাকতে থাকতেই সেগুলো পাকাতে হবে মালেকাকে। অন্ধকার রাত। দোর এঁটে ছেঁড়া কাঁথাগুলো জড়িয়ে বেহুস হয়ে ঘুমিয়ে আছে মালেকা। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার ওপব সে উঠে বসে, তুষের আগুনে পাটখড়ি গুঁজে আগুন ধবাচ্ছে মুনাওয়ার, মালেকা আবাব লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

—ঘুমাইয়া পড়লি যে,—আগুন ধবিযে প্রশ্ন কবে মুনাওয়ার। হাঁসটা রাইন্থা ফেলা জলদি—সকালে আবাব বাজাবে যাওন আছে। মালেকা কোন সাড়া দেয় না।

—ঘুমাইয়া পড়লি? মুনাওয়ারের গলার আওয়াজে বিবক্তি যেন ছাপিয়ে ওঠে।

—হু, চোখ বুজে থেকেই মুখ ফুলিয়ে জবাব দেয় মালেকা, রানতে পাবব না আমি।

—পাববি না? মালেকার সাহসে বিশ্বাস প্রকাশ করে মুনাওয়ার।

—বোজ রোজ তুমি মান্বেব জাল থনি পক্ষি লইয়া আইবা, আমাব বুঝি আর ঘুমানি লাগে না?—মালেকার বলার ভঙ্গীটা আশ্চর্য রকমের জোবাল হয়ে ওঠে।

মুনাওয়ার তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে—হাবামাজাদি। রাত্রির নীববতার বুক ফাটিয়ে সে বীভৎস আওয়াজে গর্জন কবে ওঠে। বাগে কাঁপতে কাঁপতে সে সাপটে ধবে মালেকার ময়লা জটপাকানো চুলের মুঠায়।

মালেকা উঠে বসে—ধীরে ধীরে আজ যেন শক্তি সঞ্চারিত হয় তার শিবায।—চুল ছাড়ো,—অত্যন্ত গভীর স্বরে বলে ওঠে মালেকা—না অইলে, চিল্লাইয়া আইজ সব জানইয়া দিবাম মান্বেরে। মালেকা ইঁপিয়ে ওঠে, জীবনে এই প্রথম তার সমস্ত সত্তা দিয়ে সে প্রতিবাদ করলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

মুনাওয়ার তখনো তার চুলের মুঠা ধরে আছে—কী জানাইয়া দিবি? ঠোটে ঠোঁট চেপে গর্জন কবে ওঠে মুনাওয়ার—হারামজাদী, বদমায়েশ,—কমজাতেব নাড়ি—ক'না দেখি, কী জানাইয়া দিবি?

চুল ধবে মুনাওয়ার এক বকম শূন্য বুলিয়ে ফেলে মালেকাকে। মালেকা সোজা দাঁড়িয়ে যায়, মুনাওয়ারের মুখোমুখি হয়। তারপর কপাল কুণ্ঠিত করে ঘন ঘন দম নিতে নিতে বলে—তুমি চোর—তুমি শয় .. তা ..

মালেকা তার কথা শেষ করতে পাবে না—লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে মুনাওয়ার চেপে ধরে তার মুখে, আর হড়হড় করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে তাজা লোহ বেরিয়ে আসতে থাকে। মুনাওয়ার তার মুখ ছেড়ে দিয়ে চুল ধরে ঠোঁট কামড়াতে থাকে আফ্রোশে। মালেকা মাথাটা একটু নীচু করে নাকে মুখে আজলা পেতে ধরে,—রক্তময় থুথু কুলি করার মত ঢেলে দেয় মুনাওয়ারের মুখের ওপর, হঠাৎ ক্ষেপার মত অট্টহাস্য করে আজলাভরা লোহ মাখিয়ে দেয় তার গালে আর কপালে।

মুনাওয়ার এবার মালেকাকে ছেড়ে দেয়। ভাগ্যিস জেগে নেই কেউ—মালেকার ওপর আর জুলুম করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। রেগেমেগে যদি আরো জোরে জোরে চীৎকার

শুরু করে দেয়, মুনাওয়ারের কপাল ভাঙবে। গাঁর লোকেরা অনেকদিন তার গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দিহান; গত ক'মাসের মধ্যে গাঁয়ে যে ক'টা চুরি হয়েছে, মুনাওয়ার তাব প্রত্যেকটাতেই জড়িত আছে বলে অনেকের ধারণা। তাদের এই ধারণাই সত্যি হবে, যদি তারা মালেকার কথা শুনতে পায়,—ভালা চাস্, চুপ কইরা থাক কইলাম—না অইলে কইটা গাঙে ভাসাইয়া দিবাম,—চাপা গলায় মুনাওয়ার বলে আর জবেহ করা হাঁসটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে এমনি কিলমোড়া মালেকার কপালে জুটেই। দিনে দু'তিনবার কবে নিজেই নিজের মাথায় পানি ঢালে, নতুন হাড়ি পাতিল ভেঙে নিশালায় বসে করমড় কবে চাবা খায় আর রান্নার সময় পড়ে পড়ে ঘুম দেয়।

একদিন মুনাওয়ার বললে—বাতদিন খালি ঘুমাইলেই চলবো নাকি। রান্ধা বাড়া বুঝি করন্ লাগে না?

দলামুটি হয়ে মালেকা বিছানায় পড়ে থাকে—কোন সাড়াই দেয় না।

মুনাওয়ার এবার সজোরে ধাক্কা দেয় মালেকাকে—এ্যাঁই, বাতদিন যে খালি ঘুমাস, কী অইছে তোর। কাজকর্ম নাই বুঝি?

সেই অর্থহীন ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মালেকা মুনাওয়াবেব দিকে তাকায়, মুনাওয়াব কি বলেছে তাই বুঝবার চেষ্টা কবে অনেকক্ষণ, তারপর একবার পেটের কাপড়টা একটু সবিয়ে নিয়ে ডান হাতটা পেটের ওপর রেখে ধীরে ধীরে বলে—কী অইছে, জানো না বুঝি?—চোখেব তাবায় এবার স্বাপদ-আক্রোশ জ্বলজ্বল কবে ওঠে—চোখ নাই? দেখ না কী অইছে?

মুনাওয়াব বোবার মত চেয়ে থাকে। কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ একঝলক আনন্দে তাব সমগ্র সত্তা ঝলমলিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আসে সীমাহীন বিষ্ময়। সে সন্তানের পিতা হতে চলেছে। মুনাওয়াব কিছু বলতে পারে না, মালেকাব ফ্যাকাসে মুখটাব দিকে চুপ কবে চেয়ে থাকে, এ মুখও আত্ম তাব কাছে সুন্দর লাগছে।

আস্তে আস্তে মালেকা উঠে বসে—আজবাইল। অভিযোগ মুখব হয়ে ওঠে মালেকাব কর্ণে—ঘুমাইলেই এখন গা জ্বলে তোমার। কেন তুমি আমার এই সর্বনাশ কবলা? আমি আব বাঁচবাম্ বুঝি? মালেকা দম্ভব মত হাঁপিয়ে ওঠে, এতগুলো কথা এক সঙ্গে আব কোনদিন সে বলেছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ মালেকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁাদতে শুরু কবে দেয়, বহুদিন পর বাঁধ ভেঙেছে, প্রবাহ যেন এবাব থামবে না।

মালেকাকে মুনাওয়ার কঁাদতে দেখেনি কখনো। সন্তানের মা হবে মালেকা, কান্নাব কী আছে, মুনাওয়াব ভেবে পায় না। আস্তা পাগল। আস্তা পাগল!! একে নিয়ে কি আব ঘব-সংসার করা যায়?

কয়েকমাস পব এক মেয়ে এল মালেকাব শূন্য কোল জুড়ে। মেয়েকে কোলে নিয়ে মালেকা আকুল বিষ্ময়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে, আব টপটপ কবে পড়ে তাব চোখেব পানি।

মুনাওয়ার কিন্তু বিবস্ত্র হয়ে ওঠে মালেকাকে নিয়ে। সাবাদিন মেয়েকে নিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়—রান্নাবাড়ার কাজ থেকে অই মেয়ে যেন তাকে মুক্তি দিয়েছে চিবদিনেব জন্য। তা ছাড়া, রাতের বেলা মালেকা আজকাল পাহারা দেয় মুনাওয়াবকে, কোথাও 'সে যেতে পারবে না, গেলে চাঁৎকাব কবে পাড়া-পডশীকে ডেকে সব জানিয়ে দেবে। মালেকা এবাব রীতিমত মুখব হয়ে উঠেছে—একবকম তিরস্কারের ভংগীতেই সে বলে—সাত ঝায়েও তো খাইয়া ফুবািতে পারবে না। মানুষের বাড়ীও যদি কাজ কব, আম্রার দুইটা পেট চল্‌বোই।

মেয়েটা এসে সাত সাগরের ব্যবধান রচনা করে দেয় মালেকা আর মুনাওয়াবেব মধ্যে। পঁরের বাড়ীতে চাকরী করা—সে হবে না মুনাওয়ারকে দিয়ে। ছোটকাল থেকেই সে চাকরী

করেছে—সে জানে তাব খুন-ঝরানো জ্বালা কোথায়! তাহলে, মালেকাকে নিয়ে তার আর ঘর কবা হল না। অমন অলস, নিষ্কর্মা, নোঙরা মেয়েকে যত শিগগীর তাড়ান যায় ততই ভাল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। উঠেনে বসে মুনাওয়ার চাটাই বুনছে। হঠাৎ তার ছনের ঘরের চুলোব ওপর দিক্কার অংশটুকু হতে একটা আগুনের শিখা লক্কলকিয়ে ওঠে সন্ধ্যাব আসমানে। মুনাওয়ার ছুটে যায় ঘরের ভেতর, ঘরের পেছনে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে মালেকা, মেয়েটা বুকেব উপর, আর মালেকাব দৃষ্টি আগুনের শিখাটার দিকে। সেই আগুনেই মুনাওয়ার দেখতে পায়—অবাক বিস্ময়ে মালেকাব ঠোঁট দুটো আলগা হয়ে আছে; আর কৃষ্ণভ লাল শিখার মতই একটা কক্ষণ হাসিব অস্পষ্ট আভাস তার মুখে।

মুনাওয়ার তাব ঘরটিকে রক্ষে করতে পারলে না, মাজেদা এবং তার ভাসুবদের ঘরও ছাই হয়ে যায় এক সঙ্গে। সবাই বললে, আগুন মালেকাই দিয়েছে।

দ্বিতীয়বারেব মত মালেকার কপালে আগুন লাগে। ঘবপোড়া ছাই নাকে মুখে মাখিয়ে, মেয়েটিকে কেড়ে রেখে, তালাকের অধিকাব খাটিয়ে মুনাওয়ার তাকে ঘব থেকে বার করে দেয়।

যাব ঘব নেই—পথই ডেকে নেয তাকে।

অন্ধকার রাত। বাড়ীব নামার গো-পাট্টা ধবে মালেকা বেরিয়ে পড়ে। কেমন যেন হালকা বোধ হচ্ছে তাব। গাঁব একেবাবে দক্ষিণেব বাড়ীতে গিয়ে বাতেব মত আশ্রয় নেয সে। পর্বদিন সে সেই বাড়ীতেই থেকে যায়, অন্য কোন সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত সে ওদেব কাজকর্ম কববে, ওদেব বাড়ীতেই থাকবে। ওবা ততদিন খোবপোষ জেগাবে মালেকাব।

মালেকা যন্ত্রেব মত কাজ কবে যায়—কখন কোন কাজটা কববে, তা জেনে নেবাব জনা মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলে। একটা অতল স্তব্ধতায় তাব সাবা অস্তিত্ব মৌন-গম্ভীব হয়ে থাকে। দুই স্তন যখন দুধে ভবে যন্ত্ৰণায় টনটন্ কবে ওঠে তখনি মেয়েটিব জ্বালাময় স্মৃতি তাব মনে জাগে, আব দু'হাতে দুধ টিপে বেব কবে দিয়ে নিষ্কৃতি পায় সে যন্ত্ৰণাব হাত থেকে।

ভবিষ্যতের ভাবনা এলোমেলো ভাবেও মালেকাব মনে আসে না। ভবিষ্যতই যেন অচল হয়ে বর্তমানের বুক চেপে বসে আছে।

তবু, পাডায় বেবোলই নানা জনে তাকে নানা প্রশ্ন কবে, টিটকাবী দেয়, মালেকা এসব গায়ে মাখে না। পারংপক্ষে কাবো জবাব দেবারই প্রয়োজন বোধ করে না মালেকা। যখন কথা বলে, সেও অমন ভাবে বলে যে, অন্যেরা তাকে পাগল ঠাওরায়, আমোদ বোধ করে।

একদিন গোসল কবতে গিয়ে ঘাট-ভর্তি মেয়েদেব এক রসালো গবেষণার সম্মুখীন হল মালেকা। গবেষণাব বিষয়, মালেকার তিন নম্ববটা কখন জুটছে তাই নিয়ে।

মালেকাই একবাব বলল—বৈশাখী ফসল লইয়া সবাই বেস্ত। জন্টি-আষাঢ় লাগাং জুটব আব কি?

মেয়েদেব মধ্যে হাসির ছল্লাও পড়ে যায় মালেকার কথায়। মালেকা কোন কথা না বলে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে।

এমনি করে মালেকাকে নিয়ে যেখানে সেখানে নানা বকম রস গাঁজিয়ে ওঠে, মালেকা প্রায় সতি্য বলেছিল—আষাঢ়ের শেষ দিকে আবাব পয়গাম এল নিকার। পাটা-বুকার রশিদ মোড়লেব তিন নম্বরের বিবি হয়ে মালেকা একদিন মুনাওয়ারের গাঁ ছেড়ে চলে যায়।

এবারের পরিবেশটা মালেকার কাছে একেবারেই নতুন।

বেশ বড় সংসার। দু'সতীন এবং দু'সতীনের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। তাছাড়া চাকর-বাকর আছে। দেনা-পাওয়া, হিসেব-নিকেশ ও লভ-লোকসানের কোলাহলে মুখর

হয়ে আছে মোড়লের সংসার। এই নতুন পরিবেশে মালেকা যেন নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলে।

বুড়ো মোড়ল সখ করে মালেকাকে নিকে করেনি। ঘরে দু'টো স্ত্রী আছে বটে, কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়েই তারা ব্যস্ত। তা ছাড়া বড় স্ত্রী আকলিমা মেদ জমিয়ে জমিয়ে মাংসের পাহাড় হয়ে উঠেছে, নড়াচড়া করাই তার পক্ষে দায়, সংসারের কাজকর্ম চলে না। ছোট দিলারা স্তিকায় ভুগে ভুগে একেবারেই সারা, কাজেই সে এখন খবচের কোঠায়। দায়ে পড়েই মোড়ল আবার নিকে করে মালেকাকে।

এত কাজ মালেকার জীবনে কখনো ছিল না। আকলিমা থেকে শুরু করে, একপাল ছেলেমেয়ে, মায় চাকর-বাকরদের ফরমায়েশ পর্যন্ত তাকে খাটিতে হয়। কাজে কিছু ক্রটি হলে কিংবা সময় মত কাজটুকু আদায় করতে না পাবলে সবাব কাছেই সে বকুনি খায়। বকুনি খেয়েও বা করে না মালেকা, কাজেব মধ্যে ডুবে থাকে আব আপন মনে কাজ করে যায়। আকলিমা তাকে উদারি বলে ডাকে, অর্থাৎ মালেকাব মত বোকা মেয়ে আব নেই। ছেলেমেয়েরা তাকে 'বাটি' সম্বোধন করে। শুধু দিলাবাই মাঝে মাঝে তাকে ডেকে সান্ত্বনা দেয়, দু'একটা হৃদাতাপূর্ণ কথা বলে। কিন্তু সে সান্ত্বনায় উৎসাহের কোন দীপ্তি দেখা যায় না মালেকাব মধ্যে, শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে রোগজীর্ণ দিলাবার কাতর মুখের দিকে তাকায়, আব কেমন যেন একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করে সে।

মোড়লের সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না মালেকাব। ধান দিয়ে ভাঁড়ার ভববে, টাকাষ সিদ্ধুক ভর্তি কববে—এই দুই পরম ভাবনায় খণ্ডিত টুকরো টুকরো হয়ে মোড়ল তার হাঁকডাকের সংসারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মালেকার দিকে চাইবার তাব ফুরসৎ কোথায়? তবু মোড়লের কাছে মাঝে মাঝে মালেকাব ডাক পড়ে এটা ওটা কবার জন্যে, মালেকা মাথা নীচু করে কাজ করে যায়, আর সুযোগ পেলে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মোড়লেব শাদা দাঁড়ি ও চুলেব দিকে তাকায়।

কাজ সেরে মালেকা ঘরের পেছনের বারান্দায় গালে হাত দিয়ে চুপ কবে বসে থাকে। কখনো বা গিয়ে বসে শয্যা-নেয়া দিলারাব কাছে, আব তার হাজারো বকমের কাহিনী শোনে। আকলিমা মনে মনে জ্বালা বোধ কবে।

একরাতে তামাক সেজে দিচ্ছে মালেকা। হুকোটা হাতে নিয়ে মোড়ল বললে—খালি নাকি বইয়ে থাকস্ হামেশা? কাজ-কামে গাফেলতি করলে তো চলবো না।

মালেকা পায়েব দিকে চেয়ে চুপ কবে দাঁড়িয়ে থাকে।

—দ্যাখ, এত বড় সংসার— মোড়ল আবাব আরম্ভ করে, কাজ-কাম চলে না— তাইতো দুই দুইটা বিবি ঘরে রাইখা ফিরা নিকা কবলাম তোরে। না অইলে আমাব কি বিয়ার বয়েস আছে?

মালেকার উদাস দৃষ্টি আরো এলোমেলো হয়ে পড়ে, একবার সে বলে বসে—আমার বুঝি বিয়ার বয়েস নাই? বান্দী আনলে কাজ চলত না তোমার সংসারের?

—বাহ, বান্দী কোনদিন আপন অয় নাকি? মোড়ল হেসে ফেলে—নিজের ভাইবা ঘরের কাজ-কাম বউই করে।

মালেকা বেড়ায় হেলান দিয়ে দরজার ফাঁক দিয়া আসমানের দিকে চায়, কপালের উপরিভাগটা তার কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—অনাবশ্যক একটু হাসির আভাস মিলিয়ে যায় তার ঠোঁটের কোণে।

আকলিমার ছোট ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে মালেকা একদিন একটা চিনির বাটি ভেঙে ফেলে। এ নিয়ে আকলিমা তাকে মারধোর করল, টানা-হেঁচড়া কবে ছিঁড়ে দিলে তাব নাক-কান-চুল। কয়েকদিন পব আকলিমার মেজ ছেলে ঠিক সময়ে পা খোয়ার পানি না দেখার অপরাধে ডান হাতে বাঁ হাতে চড় বসায় মালেকার দু'গালে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে চোখ দুটো বড় বড় করে মালেকা বোবা আসমানের দিকে তাকায, তাবপর আবার নিজের কাজে মনোযোগ দেয়।

দিলারা পবামর্শ দেয়—বুড়ার কাছে তুই নালিশ কর না ভইন, বুড়া লোক অতো খারাপ না।

কিস্ত নালিশ? সে কি মালেকাকে দিয়ে হয়!

একদিন দিলারাই মালেকাব হয়ে মোড়লের কাছে নালিশ জানায়—ছনছো, বড়-বু আর তার ছেলেমেয়েরা মালেকারে যে মারধোর করে দেখো না বুঝি?

—তা বড় বু-ই যখন তোমরার—একটু হেসে মোড়ল জবাব দেয়, শাসন তো একটু করতেই পারে। আব অবোঝ ছেলে-মাইয়ারা যদি একটা চড়-খামচা দিযাই ফালায় তারে মাবধোর কইবো, তাব মধ্যে মান্ঘাতি আছে নাকি!

—বুঝছি গো, বুঝছি। একটা বিদ্রপাত্মক ভঙ্গী করে দিলারা থেমে যায়। বড় বিবি খান্দানী ঘরের মেয়ে, শাদিব সময় অনেক জায়গা জমি লিখে দেওয়া হয়েছিল তার কাবিনে। তাই তাব এত ভোযাজ।—আকলিমাব সামনে এলেই মোড়ল যেন নেহাৎ ভিজ্বেবেড়াল হয়ে যায়।

উঠতে বসতে সবাই মালেকাকে ফিঙের মত টেল্লাতে শুরু কবে, তবু মালেকাব পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ ওঠে না।

একদিন আকলিমাব পায়ে ধবে কাঁদতে কাঁদতে মালেকা বললে—খোযাব দেখছি বু—আমি আব বাঁচতাম না এখানে থাকলে।—তুমি আমারে বাঁচাও বু!

আকলিমা আমোদ বোধ কবে, মালেকা তাব পায়ে ধবেছে, এব আনন্দ তো কম নয়, তবুও সে পা ছাড়িয়ে নেয আর কোণা কুঁচে কবে বলে—উদারীও আযাব খোযাব দেখে। তা বাঁচন না থাকলে মবণ তো আছে লো উদারী!

মালেকা এবার হঠাৎ পাগলের মত উচ্চ হাসিতে ভেঙে পড়ে—ঠিক কইচো বু, বাঁচন না থাকলে মরণ তো আছেই। মবণেই নেউক আমারে। হো হো কবে হাসতে লাগল মালেকা, আব তার দু'চোখ থেকে নেমে এল ঝবণার অঝোর ধারা। আকলিমার মনে হল কী একটা যেন গণ্ডগোল হয়ে গেছে মালেকাব মাথায়।

কিছুদিন পর। মোড়লের কাছে শুয়ে আছে মালেকা। হঠাৎ থুথু ফেলতে ফেলতে, দু'নাক কাপড় দিয়ে বন্ধ করে উঠে পড়ে মালেকা—তারপর বমি কবার ভংগীতে গলায় আওয়াজ করতে থাকে এবং সত্যি একবার বমি করে ফেলে।

মোড়লের ঝানু মগজও যেন খেই হারিয়ে ফেলে—বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে বলে—কী অইছে তোর?

—সুদ খাইও আযো বেশী কইরা। মুখটারে যেন টাটি বানাইয়া রাখছে, ঘেন্না এবং বিতৃষ্ণা দুই যেন এক সঙ্গে ঠেলে ওঠে মালেকার হৃদয়পিণ্ড উলটিয়ে।

মালেকার মুখের দিকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে মোড়ল। সেই থমথমে গম্ভীর মুখ আর অর্থহীন চাহনীর দিকে চেয়ে মোড়লের সারা শরীরে আশুনের জ্বালা ধরে যায়।—এতো বড় অপমান।—মোড়ল বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে—হারামজাদি—বেতমিজির আব

জায়গা পাইলে না বুঝি?—তারপর ধুম্ ধুম্ করে কিল্লাতে শুরু করে, কিলিয়েও যখন হাতের সুখ মিটল না, খড়ম দিয়ে ঠাস্ ঠাস্ মারতে থাকে মালেকার মাথায়—বজ্জাত বদমায়েশ, আজ তোরি একদিন কি আমারি একদিন।

মালেকা মাটিতে পড়ে গোঙাতে থাকে যন্ত্রণায়—তবু মোড়ল তাকে ছাড়ে না, দু'হাত বাড়িয়ে মালেকা এবার সজোরে আঁকড়ে ধরে মোড়লের পায়, আর করুণায় মোড়লের হৃদয় কাণায় কাণায় ভরে ওঠে।—আহা, উদারা মেয়েটি,—দুঃখ হয় ওকে দেখলে!

কিন্তু করুণা প্রকাশ করবার সুযোগও পেলো না মোড়ল। তার ডান পায়ের গোড়ালি শক্ত করে ধরে সজোরে আকর্ষণ করে মালেকা; মোড়ল ধপ্প করে পড়ে যায় মেঝের ওপর। আর নড়াচড়া নেই মোড়লের—বেহুস, বেকারার।

এবার মালেকার চোটে কিঞ্চিৎ বিষম হাসি ফুটে ওঠে, ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে মোড়লের মুখের দিকে তাকায়, একটা অদ্ভুত অনুভূতি আসে তার মনে, হয়ত করুণা—হয়ত বা শক্তির উপলব্ধি। বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যারা মালেকার দুর্দশা উপভোগ কবছিল, তারা সবাই এবার আত্মপ্রকাশ করে এপাশে। তারপর, একটা ভীষণ বোল পড়ে যায় বাড়ীতে। দিলারা ঘুমিয়েছিল, আকলিমার চীৎকাবে সেও ছুটে এল তার দুধের বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে।

বুকে, মাজা ও মাথায় অনেকক্ষণ পানি ঢালার পর হুশ ফিরে এল মোড়লেব।

তক্ষুণি, নাক-চুল কেটে মালেকাকে বিদেয় দেবাব জন্য পরামর্শ দিলে অনেকে। অথচ, সবাইকে বিশ্বাস্যে অবাক করে দিয়ে মোড়ল মাফ করে দিলে মালেকাকে, বললে— সে অমনি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল, মালেকার কোন দোষ নেই।

এরপর থেকেই মালেকার বদর বেড়ে যায় মোড়লের কাছে। কিন্তু মালেকা তাতে উত্তপ্ত হয় না, কোন উৎসাহও বোধ কবে না। আগের মতই ভূত-মেয়ে থেকে সে যন্ত্রেব মত কাজ করে যায়।

একদিন আচমকা আগুন লেগে যায় মোড়লের বাড়ীতে। মালেকা আগুনের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। চারদিক থেকে চীৎকার করে ছুটে আসে মানুষ। হঠাৎ এক অদ্ভুত হাসিতে মালেকার সারা মুখ অসহায় করুণ হয়ে ওঠে। কেউ না দেখে মত সে চুপি চুপি ছুটে যায় ভাঁড়াব ঘরে, কেরোসিন টিন থেকে বোতল ভরে ভবে ঢালতে থাকে সারা গায়। তারপর

আগুন নেভাতে-ব্যস্ত একজন লোককে চীৎকার করে বলতে শোনা গেল—সর্বনাশ অইয়া গেছে গো, সর্বনাশ অইয়া গেছে—ছোট বিবি পইড়া গেছে আগুনের মাঝে।

মোড়ল ছটাছুটি কবে ঘর থেকে এটা-ওটা বার করছে। লোকটির চীৎকার শুনে একবাড়ী লোকের মধ্যেই মাথা খাৰড়িয়ে হয় হয় করে ওঠে মোড়ল—হায় হায়রে—কী সর্বনাশ অইলোরে আমার! দুই-দুইডা পরাণরে নষ্ট করলো পাগলী। মোড়ল যেন সত্যি উন্মাদ হয়ে গেছে আজ। কিন্তু কী-ইবা সে করতে পারে? দাউ দাউ করে আগুন উঠছে আসমানের দিকে, দুটো ঘর ছাড়া আর সবগুলোতেই লেগেছে আগুন, পাড়ার লোকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেগুলো রক্ষা করবার জন্য।

সর্বশেষে আগুনের দিকে চেয়ে মোড়ল ডুকরে কেঁদে ওঠে।

খড়ম

মুনীর চৌধুরী

মসজিদের সামনে একজোড়া খড়ম। বাড়ির অঙ্ককারে এশার নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে, সবার শেষে গেছে সবচেয়ে পরহেজগার ফজু ব্যাপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তাবই। সারাদিন পায়ে থাকে। অজু কবা দেহ মাটির স্পর্শ পায় শুধু এই এশার নামাজের পব। রাত্রির অঙ্ককারে একবার মাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু ব্যাপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করবার মত সুযোগ পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানব মণ কিনে সওয়া চার টাকা দবে বিক্রি করেও নেকবখত আলেম ফজু ব্যাপারীর মণপ্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণের কাছে এ রহস্যের সমাধান অসম্ভব। এমন কি গ্রামের মাতব্বরাও কোনদিন এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হয়নি। খোদাব যে প্রিয় বান্দা, খোদাব রহমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পারে। গ্রামবাসীবাও তাই বিশ্বাস করত। পাক শবীরে, পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে খোদা তাব উন্নতি না করেই পাবেন না। সমস্ত দিনের মধ্যেই সব সময়ে পাক থাকতেও তাবা দেখেছে এ একমাত্র ফজু ব্যাপারীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকিব ওপর পাল্লা সামনে সাবাদিনই তো ফজু ব্যাপারী ওখানে বসে থাকে। অথচ অজু নেই, এমন কথা কোন ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিই বা এক আধবাব পায়খানা-পেসাব করবাব জন্য তাকে উঠতে হয় তবু আবাব দোকানে এসে বসবাব আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রংয়ের পবিচ্ছন্ন খালি গায়ে ফর্সা লুংগি পরে, মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপি পরে হ্যাঁচকা এক টানে তুলে ধরে দাঁড়িপাল্লা। হাঁ কবে ক্রেতাব দল দেখে কি করে অবলীলাক্রমে এক হাতেব টানে পাল্লাটা উপরে উঠে যাচ্ছে। একদিকে আধমণি বাটখারা, অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান। একটুও হাত কাঁপছে না, নড়ছে না। সাদা দাড়িগুলো ফেঁপে উঠেছে, কাঁধে পিঠের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়, পেছনের সুসজ্জিত চালের বস্তার খয়েবী পাহাড়ের মত। পঞ্চাশ বছরেও অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা, এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক, নেক লোকই এ শক্তিব অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই চালের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তিব আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাঙ্করেও ফজু ব্যাপারীকে সন্দেহ করার মত পাপচিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের পরিমাপ পরীক্ষা করে দেখবার অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগেনি। আর যদিই বা দেখত, যদিই বা সে মাপে কম ধরা পড়ত— তখন ওরা হয়ত নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করত— কিন্তু ফজু ব্যাপারীকে—

হাটখোলার মধ্যখানে বিরটি একটা বটগাছ। কচি সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা, ঠাণ্ডা, আটাল মাটিতে গতদিনের হাটের ভাঙ্গা ওড়ের হাঁড়ির টুকরো, বারীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা—এমনি আরো বহু ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে রয়েছে। সূর্য তখনও পুরোপুরি ওঠেনি। মতি

ডাক্তারের ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। উন্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বসির উল্লাহ কাবী শুধু তার দোকানের সামনের জায়গাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরেব ঝাপি তুলে, শুপুরি গাছের তক্তার মাচায় বসে সূর করে কোরান শবীফ পড়ছে। পাকা বটফলের গোটা খেয়ে বটঘুঘুর ঝাঁক তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোয় ওদের নরম পাখা তেতে উঠে। পত্ পত্ করে হলুদ মাখান ছাই রংগা পাখীগুলো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের উপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপাৰ থেকে ফজু ব্যাপারী আসছে। পুলের মধ্যখানে একবার থেকে নিয়মিত গলায় জিঞ্জের করল—

ঃ কৌগা হাইলি আইজ?

ঃ অনতাই হৌগা।

পুলের নীচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার উপর লুংগি জড়ানো, উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দু'হাত দিয়ে কাঁটারোপ সরিয়ে একটা বাঁশের 'আস্তা' তুলছে। আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা শ্যাওলাপড়া পুষ্ট চিংড়িমাছ ছপছপ্ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও ববাত ফেরে। বাকী 'আস্তা'টা দেখে ঠিক করে কালা লুংগি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আঁটা চিংড়ি হয়েছে। কিন্তু শুধু চিংড়িমাছ দিয়ে কি হবে? অসুখে পড়া মেয়েটা কি খাবে? আগুনে পুড়িয়ে মবিচ দিয়ে সে নিজে না হয় এক বেলা চালিয়ে দেবে, কিন্তু মেয়েটা? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃতপ্রায় লম্বা ঠ্যাংয়ের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোশত কেটে বসিয়ে দেয়।

মেয়েটার ক্ষুধার চীৎকার ভাবরাতে তার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। বৌকে সে তাই লাথি মেবে ঘব থেকে বেবিয়েছে। বেবিয়েই মনে হয়েছে, লাথিটা তার নিজের গায়েই মাঝা উচিত ছিল। বুকো দুধ থাকলে আবফানী মেয়েটাকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু না থাকলে? মাযের গোশত মেয়ে খেলে, বোধ হয় তাও পাবতো। কালা শিউবে উঠে। আবফানী'ব বিয়ে হয়েছে মাত্র বছরচাবেক হবে, কিন্তু ওব বুকোর দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই কেঁপে উঠে। কেমন যে বাদুড়ের মত কুকুড়ে চেপ্টে আছে।

ঃ বেগুন কি ইছা নিরে?

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল, বোজকাব মত ভয়ে ভয়ে। মতি ডাক্তার কি বলবে তা সে জানত, শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। চিংড়িমাছ নাকি পানির পোকা, ওতে রক্ত নেই। চিংড়িমাছ ক্রমাগত বেশী খেলে নাকি বস্ত্র সাদা হয়ে যায়, রক্তে পোকা হয়—কিন্তু তাব ঐ 'আস্তায়' এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আব কিছুই উঠে না। সে কি করবে?

ঃ কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুইনাইন মিক্চার দিলাম হেইডাব হৈয়সা কৈরে কালা?

বলতে বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খলুই থেকে গোটা চারেক বাছাই-করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। জ্ব কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ কবে সে বলতে থাকে—

ঃ একছার গুড় গুড়া এনা। তা'আ কাইল আরও চাইরগা দিছ, হেইলেই সহিরব।

বলে ডাক্তারখানার মধ্যে পা বাড়ায়। কালা কোন রকমে উচ্চারণ করে—

ঃ ডাগদর সাব, আঁর মাইয়া বাঁইচব ত?

ডাক্তার মুখ খিচিয়ে উঠে—

ঃ বাঁইচত ন' ক্যা? বাঁইচব। খোদা বাঁচাইলে বাঁইচত ন' ক্যা।

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

ঃ হাক্করি চাই রইছত ক্যা? খাওয়া, খাওয়া। খাওয়াইলেই মানুষ বাঁচে, বুঝ্যত? তোর মাইয়া বাঁইচব।

কালার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠে। সে টলতে টলতে সরে যায়। ডাক্তার তখনও গর করছে—

ঃ বাঁচত ন' কা? বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুইনাইনের হানি আর ইছা খাই বাঁচে না।

দু'হাত দিয়ে কালা দু'কান চেপে ধরে। শেষেরটুকু সে শুনতে চায় না। নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখে সে কথা সে শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছা হয় এমন কথা বলবার আগে বাকী চিংড়ী ক'টাও ছুঁড়ে মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে—সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ। যা খেলে মানুষ বাঁচে, রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠল। কেবাসিন টিনের দোকানের কালো বেড়ার উপর চুন দিয়ে লেখা—“এখানে মওতের কাপড় বিক্রি হয়।” ছোট কালের বাড়ীর পাঠশালায় শেখা বিদ্যার উপর ও যথেষ্ট নির্ভর করতে পাবে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মওতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড়—কবর দেয়াব আগে যে কাপড়—

ভেতব থেকে দেখতে পেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে—

ঃ চাই রইছন্ কা? লইগব নাকি কোনডা?

ঃ না, না।

কালা কোন বকমে চাঁৎকার করে উঠে।

ঃ তোব মাইয়া ভালা নিবে আইজ?

ঃ আইন্যোগো দোয়া, আইন্যোগো দোয়া—বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেবিযে যায়। যাদের স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পবনের কাপড় পবিষ্কার, যাদের দেহ ‘অজুতে’ পাক—তাদের কাছ থেকে কালা পালিয়ে বাঁচতে চায়। ফজু ব্যাপারীর মুখে তাব মেয়েব অসুখের খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিয়ে আজ সে বাড়ী ফিরবে না—এ সমস্যাব সমাধান হল মুনসী বাড়ীর বৈঠকখানায়। আধখানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোবাকী ছাড়া। কালা বাজী।

সকাল গড়িয়ে দুপুরেব রোদ মাথাব উপব তেতে উঠে। ধনুকের মত বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাঁজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা আগাছা উপড়ে চলেছে। রোদে পুড়ে পিঠের চামড়া চড় করছে। হাতের টানে এক আখ ফোঁটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শিব শিব করে উঠে। মনে হয় যেন জুর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে।

দু'দিনেব অভুক্ত পেট। দু'রাত চালের দুঃস্বপ্ন-দেখা চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। কচি ধানের সবুজ আর ঘাসের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ঘাস টানতে ধানেব গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপে কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। চোখ মেলে দেখে সামনের সীমাহীন বাকী জমিটুকু। সবুজ জল-ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন? জুম্মার নামাজ তো সে কখনও বাদ দেখনি। আজ সে নামাজ পড়বে, আজ তার জীবনে উৎসব। আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে, দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায়। বাড়তি লুংগি তার শেষ হয়েছে খেঁদন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা পাঁচিশ টাকা আর ভবিষ্যতেব

অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরনে লুংগিটা পরেছে একাধারে হস্তাতিনেক ধরে। লুংগি পাক থাকবে কি করে? সেত আর ফেরেস্তা নয়? আর বৌয়ের সঙ্গে সেত ল্যাংটা হয়ে সংসার করতে পারে না যে রোজ ভোরে গোসল সেরে পাক লুংগি পরে সে ঘর থেকে বেরুবে? হাসতে হাসতে মুখ নীল হয়ে উঠে। আরো কালো হয়ে উঠে যখন অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল তার বৌ আরফানী চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পেছন ছুটে ছুটে আসছে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের দু'চারজন গণ্যমান্য লোক। আরফানীর কাপড়ের বাঁধনে না আছে ইজ্জত, না আছে আক্ৰ। কালো মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হা হা করে, কানফাটা আর্তনাদ করে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিন চার ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনিন মিক্সচারে বেরে থেকে এই ভোরবেলা কালার মেয়েটা ছটফট করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালো গুম হয়ে বসে আছে। দু'হাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জৌক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পোট ফুলে উন্টে পড়ে আছে। সেই একটুখানি স্কীণ রক্তস্রোতের চারপাশে চামড়া পচা পানিতে ভিজ়ে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানী থেকে থেকে গোংগায়—

ঃ অঁই ভাত খাইয়ুম। অঁই মইস্তামন, অঁই মইস্তামন, অঁই ভাত খাইয়ুম।

কালো পাটা একবার নাড়ে। দেখে নড়ে কিনা, মাঝবাব জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারীই দয়া কবে সব করে গেছে। মাঝ নিজের দোকান থেকে কাফনের কাপড়টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবাব সময় শুধু আবফানীকে বলে গেছে—কাফনের কাপড় বাকী বাখা ওনাহু। ওতে মূর্দার কহ কষ্ট পায। কাফনের বাবদ বাকী তিনটাকা তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানী আবার কাতরাচ্ছে।

ঃ অঁই মইস্তামন, অঁই মইস্তামন, অঁই মইস্তামন আরও কাফনের কাপড়ের দাম বাকী থাকিব। অঁই—

কালো পা মাথা সব ভারী হয়ে আসছে। কিছুই আর নড়তে চায় না। কানের কাছে আরফানীর অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোন রকমে দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়াব অবধি আসে, তাবপব সন্ধার আবহা আঁধারে পথ হাতড়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে ফালা চলতে শুরু করে দেয। দু'চোখ আটাল হয়ে বুঁজে আসে একটা অদ্ভুত, ক্লান্ত, স্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাট লেগে যখন চোখ মেললে তখন দেখে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। খালপাড়ের মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে সে শুয়ে। চারিদিকে ঝি ঝি ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা মনে করতে পারল। হাত পা সব ব্যথায় টন টন করছে।

মসজিদের কাছে এসে হঠাৎ কি মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তাব আর মাটি সিঁড়ির সামনে। এশার নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে, সকলে চলে গেছে। সামনের সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শব্দ। বড়। ফজু ব্যাপারীর বলিষ্ঠ পায়ের দাগ। মসৃণ কাঠের উপর আরো কালো হয়ে ছাপ পড়েছে। পানি আব চামড়ার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের গর্ত থেকে আঙ্গুলগুলো স্পষ্ট গোণা যায়। গুণতে গুণতে কালো মাঝির চোখ জ্বল জ্বল করে উঠে। বিড় বিড় করে উঠে : অঁই মইস্তামন, অঁই মইস্তামন।

নিবুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে কালো মাঝি ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের পিছন দিকের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত। সড়াং করে সে হাতটা সরিয়ে নিল। ভেতরে যেন কারা আছে। কারা যেন নড়ছে। কালো কান পেতে টিনের সাথে চেপে ধরে, ধানের রোঁয়া রোঁয়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ু বিবশ করে দিচ্ছে, আর ভেতর থেকে দ্রুত নিঃশ্বাসস্পন্দিত শব্দ।

ঃ আহ! করস্ কি, এমুই সরি আয়। কাফনেব উপর ছচ্ছত কা? এমুই কাইত্যাই আয়।

খিল খিল করে একটা মেয়ে হেসে উঠে—

ঃ কাফনের কাপড় হি-হি-হি-হি—বাঃ হেমুই যে আবার তাঁর চাইলের বস্তা। অঁই ইয়ানেই ছইস্তম, চাইলের বস্তার লগে ঠেস দিলে আর ডর কইন্ত, না, হি-হি-হি-হি।

আরফানীর বিকৃত হাসির কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে উঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসার তপ্ত প্রশ্বাস।

পরের দিন ভোরের বেলায় বটঘুঘুর ঝাঁক যখন বোদের আঁচ পাওয়া মাত্র উড়ে চলে গেছে, যখন সদ্যস্নাত শান্ত সৌম্য ফজু ব্যাপারী তার দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কালা মাঝি। কোমব থেকে একটা দশ টাকার নোট বেব কবে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সম্মেহে হাত বুলিয়ে ফজু ব্যাপারী প্রশ্ন করল—

ঃ কাফনের বাকী দিতে আইলা বুঝি বাবা।

ঃ জি!

ঃ আর কি দিউম? কিছু চাইল?

ঃ না, বাকী টায়া দিয়া কাফনেব কাপড় দেন।

চমকে উঠল ফজু ব্যাপারী।

ঃ কাফনের কাপড়। কার লাই?

ঃ আরফানীর লাই।

চমকে উঠেছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য,—তারপই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু করে। সাদা কাপড়, প্রমাণ মাপেব স্ত্রীমূর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবার জন্য যতখানি দরকাব।

ভাতুয়া

মহাশ্বেতা দেবী

এবার ছিল দুরন্ত খাবা, খেত-মাঠ জ্বলে গিয়েছিল। ধান তো হয়ই নি বলতে গেলে। কিন্তু কালী গরায়ের জমিগুলিতে পাকা ধানের শোভা দেখতে দেখতে কালীর ভাতুয়া পবনের মনে হল মনিব তার ডাং-পিশাচসিদ্ধ বা হবে। নইলে খাল নেই, বড় নদী নেই, এই খরা! আকাল এলো বলে—একা তার মনিবের খেতে এত ধান হল কেমন করে? মনিবের খেতে এত ধান! টাহালগুলি এবার ভরে যাবে। পবন টাহাল কেড়ে নিকিয়ে রেখেছে সেই কবে। পোষে মনিব্যান টাহাল পুজো করে রেখেছে। ধান উঠলে নবান্ হবে, তখন নোট বাঁধা হবে।

আর নবান্! আকাল বুঝি এল। বড়ান্ মায়ের অঙ্গ ফেটে বস্তু ঝরছে, নিশিন্দা বুড়ি দেখে এসেছে মায়ের ফাটা অঙ্গে লাল পিঁপড়ে বাইছে। গ্রামলক্ষ্মী দেবী তো, আকাল এলে জানিয়ে দেন।

এ সব কথা শুনলে পবনের স্কুলে বিত্তি-পড়া ছেলে ভগীরথ বলে, হাঃ! জানাযে দেয়। আকালের কথা জানায় তো আকালের উপায় কিসে তা জানায় না কেনে?

পবন বলে, মায়ের বসে লাল চুটি বায়। জানিস?

পিঁপড়ার বাসা কি চারিদিকে। তুমার মনিব মায়ের থানে দুধ ঢালে, তাতে ভিঁ পিঁপড়া বায়।

তু সব জানিস?

পিঁপড়া সরাব। দেখ কেনে?

কি করবি?

“লাও মা জনুনী” বল্যে মায়ের মাথায় কেরাচিনি ঢেলে দিব। দেখি পিঁপড়া থাকে কেমন?

পবন এ কথায় মাথা নেড়ে বলেছিল, সকল কেরাচিনি মনিবের ঘরে। উ পঞ্চায়েতে সামিল হচ্ছে, খাতিরের মানুষেরে দেয়। তু কুথা পাবি কেরাচিনি?

উ কুথা হতে পেল? মোরাদেব তরে কেরাচিনি, রসিদ দেখায হুগা পিছু দিতেছে, কিন্তুক কারো একবার মাসে, কারো দশবার, উর ঠেঙ্গে লিব।

উর সাথ বিবাদ কর্যে না ভগীরথ!

বড় কাতর শোনায় পবনের গলা, বড় আর্ত। দু চোখে ওব ভয় চমকায়, দুই যোলা চোখে। একবেলা জল খাই, একবেলা ভাত আর বছরে একশো বিশ টাকার কড়ারে যে ভাতুয়া খাটে কালী গড়ায়ের বাড়ি, সেই ভাতুয়ার মনে ‘মনিব’ শব্দটি সম্পর্কে এমন ভয় থাকে বটে।

ভগীরথের বৃকে ওই লোকটার জন্যে দুঃখ আর লোকটার চোখে ভয় দেখে রাগ একই সঙ্গে কোঁসে। ভগীরথ ঘরের জীর্ণ বানকাঠটি চেপে ধরে নিজেকে সামলায় ও বলে, না না বাবা, বিবাদ করব কেনে? কথার কথা বললাম বই তো লয়। আর—একটু হেসে পরিস্থিতিটি

হালকা করে বলে, তুমার উ বড়াম মা মরুক কেনে পিঁপড়া কামড়ে? আমার কি? আমি উবে দেখতে যাব?

ই-ভি তু আগে বলিস নাই, এখন বলিস। জামু গ্রামের জনুনী উ বড়াম মা! বান এলে উনি থামাবে, খরা এলে রসে টেনে নিবে—

উ তুমি যা শুন্যে বড় হল্যে, তাই বল বাবা। আমি ভি যা শুনছি তাই মেনে গিছি এতকাল—

এখন মান না কেনে বাপ?

মন ল্যেয় না।

উ অধর বাবু তুমারে লাচায়। উব কথায় ল্যেচে না, অ মোর বাপ, এতকাল সবারে লাচাল, লকসালীতে জেহেল গেল বুঢ়া বয়সে—তার বেত্তান্ত জানে না কে? এখন ভি ঘরে বয় না। ছাইকেল লয়ে ঘুরে বুঢ়াদেব ধরে এনে পড়াতেছে—উরে ডরে মনিব।

ডবো ডরো তু কি পোকপতংবে ভি ডর খাও বাবা। অধর বাবুরে ডবা কেনে? কুনো মন্দ কাজ কবে না সে, নিজ ঘরের ছামুতে মানুষজনরে পঢ়তে শিখায়, আইন বুঝায়।

বই হাতে ঘুরো কেনে? তখুন উর ঘরে বই দেখলে দারোগা কত লাচত মনে নাই?

বাবা। ই সকল গোরমেনের বই। আইনেব বই। বর্গাদারের হকটো বুঝি নিতে পারে আইন জানলে— খেত মজুরটো হক বুঝি নিতে পারে আইন জানলে— মোরা কিছু জানি না বাবা।

মোরা বর্গাদার লই ভগীরথ। খেত মজুব লই—ভাতুযাব তবে কুনো আইন নাই।

আমি শুধাব তবে?

আজ, মাচায় বসে মনিবের পাকা ধান পাহাবা দিতে দিতে পবনের সব-কথা আবার মনে পড়ল। নিঃশ্বাস ফেলল ও। ভাতুয়া কি মানুষ না কি? বর্গাদার বা খেতমজুর নয়—তাই তাকে বাঁচাতে কোন আইন থাকে না। ভাতুয়া আছে, ভাতুয়া থাকে, কিন্তু ভাতুয়ার কথা কোন সরকার ভাবে না। ভাতুয়া থাকতে আছে, সমাজে স্বীকার করতে নেই তার অস্তিত্ব।

একটা মানুষ কিছু জানে না, সে ছোট ছেলে। তার বাপ গরাইদের ঠেঙে আটশো টাকা ধাব নিল। না নিলে তার জমি বাঁচে না। আটশো টাকা সে শুধতে পারবে না, ছোট ছেলেকে কবে দিল ভাতুয়া। বলল একবেলা ভাত দিবেন বাবু, একবেলা জল খাই। আর বছবে একশত বিশ টাকা মাইনা।

বাবুরা বলল, সাত বছরের ছেলে তোমার। এখন ছাগল চরাবে, হাঁস চরাবে, বাড়ির কাছে। এখন মাইনে হয় না। এখন ওকে দিয়ে ক পয়সার মজুরি পাব?

বাপ বলল, ভাতে-জলপানে থাকুক। বারো বছর হল্যে মাইনা দিবেন মশায়। হাতে দিবেন না। উ টাকা কাটান দিবেন ধার হতে।

তাই হল। টিপছাপ দে।

সে আদিকালের কথা। ছাগল চরাত পবন, হাঁস চরাত। দিনে ভাত খেত, রাত হলে কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে ঘরে ফিরত।

পবন কাঁদত। বলত, মাবে বাবু! দুপার যেয়ে বিকাল হয়। তখুন ভাত দিবে। খিদে লাগলে কিছু দেয় না, চড় মাবে, লাথ মারে। আমি রব না হোথা।

বাপ প্রবোধ দিত, ক-বছর বাপ? তোর বয়স এক কুড়ি না হতে টাকা শুধে যাবে। বাস ঘরের ছেলা ঘরে রবি।

বাপ হিসেব করে নিয়েছিল অধর বাবুর বাপের কাছে। অধর বাবুর বাবা বলেছিল, বারো বছর বয়েস থেকে উনিশ বছর বয়েস অব্দি সাত বছরে আসল টাকা শোধ হবে গো। মজুরিতে সুদ কেটে যাবে। যদি ওরা শর্ত মানে।

উনিশ কেন, আজ পবনের বয়েস বিয়ান্টিশ হল। তিরিশ বছরে রাতদিন খেটে সেই আটশো টাকা শোধ হয়নি। পবনের বিয়ের সময়ে দুশো টাকা ধার নিতে হয় বাইশ বছর আগে। তাতে না কি সুদে আসলে অসাগর টাকা জমে গেছে। পবন মাইনের টাকাও হাতে পায় নি, বাপের সে জমিও গরাই বাবুদের পেটেই গেছে। বউটা গরাই বাবুদের বাড়িতেই গোয়াল কাড়ে। বাইরের পাটকাজ করে। আর খেত ওড়ায়। ঝরে-পড়া ধান ওড়ায়। মনিব্যান অনেক বলে দেখেছে, বউ ভাতুয়া হতে রাজী হয় নি।

ভাতুয়া হব নাই। ওলাম করে রেখে দিবে গ। ভগীরথের বাপ মোরে জনম দুখ দিল। খরখর করে বউ। খর দড় গতিতে কাজ করে। বউই অধর বাবুর কাছে হেঁটে হেঁটে তাঁর পা ধরে ভগীবথকে প্রাথমিক স্কুলে ঢুকিয়েছিল। মনিব তাতে রেগে যায়। কিন্তু অধব বাবুর বাবাও ছিল স্বদেশী-করা মানুষ, ছেলেও তাই। ওর বাড়িতে ভগীরথ ভাতও খেত। স্কুলে ঢোকার সময়ে ভগীরথের বয়স দশ। অধরবাবু বলল, তুমি বাপু স্কুলঘর রোজ ঝাঁটপাট দেবে, কাজ হল তোমার। পড়বে, আর হ্যাঁ, আমার বাড়িতেই থাকবে।

স্কুলও অধববাবুর তৈরি। তাঁরই বাড়িতে। আর পোড়োদেব জমির ধানের ভাত খাইয়ে ছাত্র ধরে রাখার পরিকল্পনাও তাঁর। তাঁর অশৈল কাণ্ড-কারখানায় তিতবিবস্ত হয়ে বউ অনেক দিন ধরেই বাপের বাড়ি প্রবাসী। অধরবাবু জেলে থাকতে থাকতেই বউ মবে গেল।

ভগীরথের মত অনেক ছেলেই ওই স্কুলে এল গেল। কিন্তু ভগীবথটা যেন ওঁব চেলা হয়ে গেছে। অধরবাবুকে মুকুবি ধরে কি হবে কে জানে? উনি বললে কি ভগীবথের কোন কাজকর্ম হবে কোথাও? এখন না কি ওকে টিকে ইঞ্জেকশান দিতে শেখাবেন সদরে পাঠিয়ে।

অধরবাবু ভগীবথের মানামান্যিব লোক। অধববাবু সকলকে আইন বোঝাচ্ছেন, পড়তে শেখাচ্ছেন, 'হকটো বুঝি নিতে পাবে' যাতে। ভাল। খুব ভাল। কিন্তু অধববাবুও পাবে না সব কিছু। ভাতুয়া পবনের জীবনের দাসত্ব ঘোচাতে পাবে না অধববাবু।

মাচায় বসে পবন মাথা নাড়ল বাব বাব। আঃ। কত ধান! চোখটা কেনন করে যেন, তাই সোনালী ধান মনে হয় সোনার নাচন্ত সাগর যেন। অধরবাবু অনেক পাবত এক সময়ে। গ্রামেই থাকত না তখন। কোথায় কি কবে বেড়াত কে জানে। কিন্তু গ্রামে এসে যখন মনিবকে বলল, কালীবাবু! সর্ময় খুব মন্দ। ধান কাটাচ্ছ, বেশ কবছ, সবাবে সবকারী হিসাবে মজুরী দিবে। নয় তো ধান গোলায় উঠবে না।

পবন ভয়ে চোখ বুজেছিল। বাপ রে! মনিবকে অমন তেড়ে শাসিয়ে কথা বলা? কিন্তু মনিব মেনে নিয়েছিল সব। তিন বছর মনিব খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। পবনকেও খেতমজুরদেব সঙ্গে দুপুরে ছুটি দিত। জলখাই দিত গবম ভাত।

এ সব সাহসেব কাজ অধববাবু পেরেছিল। কিন্তু ভাতুয়াটো, ওলামটো করি দিছে বাপ—ভাতুয়া জীবন হতে বাহার করি আনতে তুমি ভি পার না গ অধরবাবু। পূব আকাশ লাল হতে মনিব বাড়ি আসব আব বিহানের জলপান 'শালা কামচোর ভাতুয়া' গাল! আর পূবা দিন রাত অবধি খাটব গ। লাথ খাব, গাল খাব, ই হতে বাহার করি আনতে পার না গ অধরবাবু।

এখন চক্ষে ভাল দিশি না সি বলতে ভি ডরো যাই। এত আইন দেখতেছ ভাতুয়ার তরে আইন নাই? ধান পওরা দিতে দিতে—মনিবের ধান পওরা দিতে দিতে—আমি কত হিসাব করি।

সুদের হিসাব নয়। ভাতের হিসাব। ধানটো তো ভাতই হল, না কি বল? তা ভাতের সাগর পওরা দেই।

কত ভাত। কত ভাত—আর ই সব জমিনের মাঝে তো বাপেব তিন কুড়া ভি সামিল আছে—তা এত ভাত দুনিয়াতে—ভাতের তরে ভাতুয়া তবে কেনে পবন? কেনে এমুন বেহিসাব ই হিসাবটো? অধরবাবু! ভগীরথ মোর বেটা। তুমার কথা চিন্তো মোর বুকে ভি বান ডাকে—কিন্তুক। চক্ষে দিশে না ভাল—আব ভাতুয়া হযো কোমরটো ভাঙি গিছে, তাতে সব বুঝাতে পারি না। ডবো যাই। নিজেরে ডর খাই। ই কি। ভাতুয়া এত কথা চিন্তো কেনে? মনিব জানলে কাঁচা কঞ্চিতে চাম ছিঁড়ি দিবে যি?

আঃ! ধান দেখলে পবনের এত কথা মনে হয়। মাচায় বসে বসে ও ভাবে আব ভাবে।

২.

অধরবাবু বললেন, ভগীরথ, তোমাকে যেন চিন্তিত দেখছি ভীষণ। কেন বল ত?

ওরা হাঁটছিলেন। বনের পথ ধবে। জামু গ্রামটি খুবই ভিতরে ঢোকানো। বেলে নদীর এ-পার ও-পার জুড়ে এখনো জঙ্গল আছে। বনের পথে চলাফেরা করাই সুবিধেব। ব্রক আপিস, বড় স্কুল, পঞ্চায়েত আপিস, সবই বেলেগ্রামে। বেলে আর গ্রাম নয়, গঞ্জ এখন। থানাও ওখানে। ওঁবা বেলে থেকেই ফিরছিলেন। অধরবাবু হাঁটাইটি কবছেন যাতে এ বছর জামুর মত অরাজনীতিক, পিছিয়ে-থাকা ভাষগায় সবকাবী খেতমজুব শিবির হয়, সে জানো। সেন্ট্রালমেণ্ট আপিসে। ভগীরথ ওঁব সঙ্গেই থাকে। অধরবাবুর প্রপ্রে ভগীরথ চমকে উঠল না। অপ্রতিভ হেসে বলল, বাবাব কথাটো ভাবি।

কি ভাব?

অনেক কথা মনে উঠি গিছে।

কি হয়েছ পবনের?

আপনি তো আমাদের হক লয়ে লঢ—

কি ব্যাপাব, বল তো?

আগে আপনাব মুখে এত আইন বুঝাবাব কথা শুনি নাই। পঢ়া শিখাবাব কথা শুনি নাই—

এখন কেন শোন। তাই তো?

হ্যাঁ মাশায়, তুমি বল, আমি শুনি।

চল, নদীব পাড়ে বসি।

ঘরে চল আপনি। বাতাসটো হিম জোড়া এখন।

চল। তবু তো এখানে ঠাণ্ডা পড়ছে। ঠাণ্ডা পড়বে। কিন্তু শহবে ঠাণ্ডা নেই, জল না হইলে ঠাণ্ডা পড়ে?

হিম জাড়ায় দিনমানে বোদ সেকি। সাঁঝে কাঠলতা ছালি, আর গবাই বাবুবা শীতে সাজন কবে কত। বাবারে কুনো দিন শুধায় না, হ্যাঁ পবন, গায়ে দিতে কিছু ম্রাছে? ছিঁড়া পিঁজা লেপ একটো চেয়েছিল বাবা, বলল, কিনে লে।

ওরা বন পেরিয়ে জামু ঢুকল। ভগীরথ বলল, আপনি আগাও, আমি মায়েবে কেরাচিনটো দিয়ে আসি। না, ই ঠিক হচ্ছে নাই, কালী গরাই বড় মাতববী করতেছে। কেরাচিনি দেয় না কেনে?

ওব বা কি দোষ বল? চিবকালের বড় চাষী, চিরকালের মাতববর কেমন সুড়সুড়িয়ে ঢুকল পঞ্চায়েতে—আঁা? পার্টির দিলীপ, রাজেনবাবু সব জেনেও কেমন মেনে নিল। আব তোমরা কি দেখলে? এ সরকারের আগেও কালী গরাই ছিল মাতবব। এখনো সেই মাতবব।

ভোটো ইরাই জিতবে। না জিতলেও কালীবাবুই মাতববর র'ত হেথা। উ জামু গ্রামের সুরজ। উয়ারে না দেখে মোরাদের উপায় নাই। সরকার বদল, পার্টি বদল, কালীবাবুর রবরবা একোই থাকে।

গভীর হয়ে গেলেন অধরবাবু। বললেন, বলেও এসেছি। হাঁটছিও অনেক। কালীকে বলব না আমি, তাহলেই বলে, আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কেরোসিন এখনি। বাপরে, আপনি নিজে এলেন কেন?

ডব খায়। ভাবে তখন লকসালী উঠেছিল, মৌজা কাঁপারে দিচ্ছিল, এখন ভি আর আর মৌজা গরম, জঙ্গল মহালে বাস। তাই তখন তো পলায়ে গিছিল সেই হাওড়া।

ভগীরথ বাড়ির দিকে গেল। অধর নিজের বাড়ি ঢুকলেন। বাড়ির সামনের ঘরে স্কুল। পিছনের ঘরে গুঁর আর ভগীরথের বাস। পৈতৃক ধানজমি উনি বছকাল হল মাহিন্দারদের দিয়ে রেখেছেন। গুঁরই গুঁকে খোরাকী ধান দিয়ে যায়। পূর্বনো মাহিন্দার গোবুলের বউই রাঁধে। গুঁর, ভগীরথের ও পোড়োদের ফ্যানভাত। স্কুলের মঞ্জুরি মিলেছে, এখন মাষ্টারের মাইনেও সরকার দেয়। মাষ্টারটি গুঁরই বাড়ি থাকে ও গুঁ-বাড়ির ছেলেদের পড়ায়। অধরের গর্ব, মাষ্টারও একদিন এ স্কুলে পড়ত।

ভগীরথ ফিরে এল, দুজনে খেলেন ওবেলার ভাত ও কাঁচকলার তরকাবি। কাঁচকলা, পেঁপে, এগুলি ভগীরথের চেষ্টায় ও শ্রমে বাড়িতেই হয়।

বিড়ি ধরিয়ে অধরবাবু বললেন, তুমি তখন বললে ভগীরথ, কথটা এই বকম—তখন আন্দোলন করতে গিয়ে এটা বুঝেছি—কোন্ কোন্ হকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে তা তাকে বুঝতে হবে। আইনটুকু বাংলায় লেখা, সেটা পড়ার মত লেখাপড়া শিখতে হবে। যাদের লড়াই তারাই লড়াইয়ের কারণ-টারণ বুঝে নিক। নিজেরা লড়াইতে পারবে। খেতমজুরদের কথাই ধর না কেন—

আইনের পথে বিশ্বাস যেছ যদি, ভোটটা মানি নিছ না কেনে?

ভোট দিয়ে কিছু হবে বলে বিশ্বাস কবি না ভগীরথ। ভোটে যে জিতুক, তোমাদের হক তো বুঝে নেবে?

হাঁ, তা বুঝছি।

আইন-টাইন জানার জন্যে পড়তে শিখুক না। পড়তে শিখলে পড়ার জিনিস আরো আছে।

তা তো জানি মশায়। পড়তে জানি নাই বলে তো মোরা মালিকের হাতে মরি, আদালত যেয়ে ভি মরি।

তবে আর কি। বুঝলে তো!*

আমি শুধাই বাবাটোর কথা।

কি কথা?

খেতমজুর, বর্গাদার—হাঁ হক মিলে নাই বটে, তবে নামে চিনা যায় ই জন কারা। আর আইন ভি হচ্ছে। কিন্তুক মশায়— ভাতুয়াটো, সেও তো আছে? ভাতুয়া করি বাখে যেমুন গোলাম করি রাখে। ভাতুয়ার দিনরাত খবদ করি লেয়। ভাতুয়াটোর কথা ভি স্বীকার যেছে না কেনে গোরমেন? আইন কবি দিছে না একটো? নাই কেনে আইন?

কি বললে? আবার বল?

আইন বলে ভি হক মিলে না। খেতমজুরের মিলে না। হাঁ সাচাই কথা, কিন্তুক আইন তো করছিল? বর্গাদার লয়ে তো আকাশ ফাটায়ে দিল, ভাতুয়াগুলান কি মানুষ লয়?

ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ তুমি ভগীরথ।

ভাতুয়া লিয়মটো কলঙ্ক। তা লয়ে তো তুমরা ভি লকসালী উঠাও নাই? ভাতুয়া যি, সি জনাও তো জমি খুয়ায়ে করজের দাদে ভাতুয়া বনে, লয়? জমিন-জীয়া মানুষ সি জনা। খেতমজুর যেমুন জমিন-জীয়া। তা ভাতুয়া লয়ে কেনে আগুন জ্বলে নাই? গোলাম করতেছে মানুষের?

* দাঁড়াও, দাঁড়াও ভগীরথ—

অধরবাবু উদ্ভেজনায় ঘুরতে শুরু করলেন ঘরে, কি যেন একটা, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ। দাসপ্রথা এটা, এখনো চলছে। পশ্চিমবঙ্গে চলছে, ঠিক বলেছ। দাঁড়াও আইন ... দাসপ্রথা যদি হয় ... ভগীরথ! আমি সদর থেকে জেনে আসব। আমার মনে হচ্ছে, অথচ মনে হচ্ছে না—জেলে বসে কথা কয়েছিল কে যেন ... নিশ্চয়। কে হয় খেতমজুব, কে হয় ভাতুয়া—।

—আর ঋণমুকুবী আইন ভি তো হচ্ছে। ঋণের লেগে মানুষটো গোলাম বনি যাবে? বাবা সাত বছর হতে ভাতুয়া। দুই কুড়ি পাব করল সব, চক্ষু যায় যায়, শালো নিজে দেখাবে নাই, আমি নিব সদরে হাসপাতালে সি ছুটি ভি দিবে নাই—আর কি হিসাব কবি রাখছে, টাকা আর গুণে না। ই পিশাচ কালীবাবুরে পাটিব বাবুরা মদত দিল, পঞ্চায়েত উঠাল। সুদখিয়া মহাজন মালিক ছাড়া সি সরকারের পঞ্চায়েত চলে নাই, ই সবকাবের ভি চলে না, ইয়ার জমিতে বর্গাদার নাই, সবারে টুপি পরাল। ই ঘরে গোলাম পুষে বাহারে ফরন্ট মারায়।

দেখছি আমি, দেখছি।

তুমার কথা কে মানবে?

দেখছি। সদবে যেতে হবে।

আমারে লয়ে চল।

চল। পবনকে নিয়ে যাব।

কুথা?

কেন? হাসপাতালে?

কালীবাবু ছুটি দিবে নাই।

কালীব ঘাড় দেবে।

ভগীরথ এবাব নিশ্চিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অধরবাবুর ওপর ওর অপার বিশ্বাস। অধরবাবুর ঘুম চলে গেল কোথায়। ভগীরথ ওঁর বুক ঘা মেবে চোখ খুলে দিয়েছে। ভাতুয়া। দাসপ্রথা। জমি খুঁয়ে হোক বা ঋণের কাবণে হোক, ভাতুয়া হয় মানুষ নিরুপায় হয়ে। দেশের মাটিতে দাসপ্রথা চলে যদি, সে কথা সর্বহারাব হকের জন্যে শপথবদ্ধ পাটি জানবে না? তিনি জানবেন না?

জানবেন না কেন, জানতেন। কিন্তু এখন তিনি ভারতের মাটিতে জন্মাবার ভয়ঙ্করতা দেখতে পাচ্ছেন। তিনি বিপ্লবী। তিনি জীবন দিতেই প্রস্তুত। কিন্তু তাঁব কাছেও 'ভাতুয়া' এক স্বীকৃত, প্রচলিত প্রথা বলে এটি থাকা যে বর্বরতা, তা তিনিও ভাবেন নি। ভাতুয়া তো থাকেই, দেশে ঘবে কতই থাকে। ভগীরথ বুঝিয়ে দিল, ভাতুয়া থাকতে পারে। আছে বলেই তাদের কথাও হিসাবে রাখো। খেতমজুববা ন্যূনতম মজুরি পেল কিনা শুধু তাই নিয়ে লড়াই কোর না। সরকার তো ভাতুয়া প্রথার কথা ভাববেই না। ভাতুয়ারা সংখ্যায় কতজন বা। জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে ওরা তো সরকারী ভাষায় 'অসংগঠিত' অংশের লোক। লক্ষ লক্ষ বর্গাদার নয় যে একটা 'অপারেশন' চালিয়েই ইইচই তোলা যাবে, ভোট কেনা যাবে। খেতমজুরও নয়। তাদের কথাও সরকার মাঝেমাঝে ভাবে। ভয়, নইলে এবার নেতাদের চেষ্টিয় নয়, নিজেদের তাগিদে ওরা ক্রমে নকসাল বনতে পারে। হকের জন্মে হেঁসো ধরলেই তো আজকাল সরকারী অভিধানে সে হয় 'নকসাল'। নকসাল সংজ্ঞার বেলা সব সরকার একই অভিধান অনুসরণ করে চলে। 'তিনিই ভারত তিনি ভারতমাতা'র প্রদর্শিত পথ এটি।

ভাতুয়া মানে দাস। ঋণের দায়ে বাঁধাপড়া দাস। 'গোলামটো'—ভগীরথ বলেছে।

পবনকে আনতে কোন বেগ পেতে হয়নি অধরবাবুকে। কালীকৃষ্ণ বলেছিল বটে, কি হইছে উয়ার, যি সদরে যেয়ে চোখ দেখাবে? হাটে যায়, হাটে কত অমৃদ বিচে, চক্ষে দিলে আরাম হয় না?

অধরবাবু বলেছিলেন, নিজেও ব্যবস্থা করবে না—অপরকেও করতে দেবে না? তোমাব ঘরে তো চিরকাল গোলাম খাটছে তা চোখ দুটো গেলে কি তুমি দেবে? গন্ধ-মোষটার ব্যামো হলেও তো বদি ডাকে, একে একবার সদরে নিয়ে চোখ দেখানো উচিত ছিল না তোমার?

কৃষকসভার নিত্য আর সন্তোষ কি কাজে এসেছিল কালীকৃষ্ণের কাছে। তারাও বলল, নিশ্চয় যাবে। অধরদা নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, এব পরে আর কথা কি?

যাক না, যাক—কালীকৃষ্ণ অগত্যা বলেছিল।

সদর শহর জামু গ্রাম থেকে মাত্রই তিন ঘণ্টার পথ, এটুকু পথও পবনের আসা হয় না কখনো, শহর দেখে এমন উত্তেজিত হল ও যে চোখের কষ্টের কথাও ভুলে গেল যেন।

ভগীরথ বিব্রত হচ্ছিল, আবাব মমতাও হচ্ছিল ওব।

উ দেখ ভগীবথ, হোথা কত বড় বাড়িটো। উঃ! দালান বটে, উঁচা কত? পাঁচিলটো?

অধরবাবু মুচকি হেসে বললেন, ওটা জেলখানা। ওখানেই ছিলাম কিছুদিন।

আঁ? জেলখানা? আর ই দালানটো?

ওটা সিনেমা।

—ই দেখ ভগীবথ, কত ফলের দোকান দিছে। বন্ দেখি ওওলান্ কি? লান কত?

—আপেল, বাবা।

হাঁ হাঁ, নামটো ভুলি যাই, বাবু আনে তো। পউষ মাসে এত ফলে ঘব ভবি দিবে। এ-ত!

ভগীরথের বুকের নিচে কোথায় ব্যথা করছিল। ফলের দোকান দেখে বাবাব হাসিভবা মুখটা দেখে বুকটা ছিঁড়ে যাচ্ছিল ব্যথায়। ধুলোপড়া যেযো বিবর্ণ ফল। তা দেখেও বাবা খুশী কত। চোখ দুটি যেন ফোলাটে। বাবাঁব চেহারা দেখে মনে হয় কবেকাব মানুষ যেন, কোথা থেকে এসেছে সদর শহরে। যেন সুদূর ও ধূসব অতীত থেকে উঠে এসেছে ও বিশ শতকের ধুলোটে ও অবহেলিত সদর শহর দেখে এমন অপরিচয়ের বিষ্ময় ওব চোখে।

টিক এককথাই মনে হয় অধরবাবুবও, হত্যন্ত অস্বস্তি হয় তাঁব। ফটাচটা পা, চাটালো আর ফটা চটা হাতেব থাবা, গলায় উড়নি, কঙ্ক চুল, পবনকে দেখে কেন মনে হচ্ছে ও অন্য শতকের মানুষ! দাস বলে? কোথা থেকে আসছে ও? বঙ্গালসেনী বাংলা থেকে? শশাঙ্কের বাংলা থেকে? যে সময় গঙ্গারিডই নাম ছিল, সে সময়ের গহুর থেকে? যখন দাসবা রচনা করত সভ্যতা? অতীতেব বাংলাব কিছুই অপরিবর্তিত টিকে নেই, আজকের পশ্চিমবঙ্গে। একা পবন কালক্রয় কবে টিকে আছে, যা ছিল নিদ্রর, তা ঢাকা হয়, জমিব্যবস্থাব পরিভাষা পালটায়, রূপনাবায়ণ স্রোতপথ বদলায়, তান্ত্রলিপ্ত হয় তমলুক—কিন্তু হ্যাঁ, পাবনটো পবন থাকি যায় তা দেখলে অধরবাবু, কালী গরাইটো কালী গরাই থাকি যায় তা দেখলে নাই? উ ভি আছে, আমু ভি আছে। উ নইলে আমু এলম কুথা হতে? ভাতটো, বুঝলে অধরবাবু, বড় দুঃখ দিতেছে ভাতটো শত-শত-হাজা-র বৎসর ধরি। বড় দুখ! এখন চক্ষে সব ধূমা বন্ দেখি। জানি আগুন লাগি জ্বলে কি বা, এ-ই ধূমা বাতাসে-এ-ই ধূমা ঝাঁকশে—ধূমাকার রদুর—যা দেখি সকল ধূমাবন্, আগুন তাতে লাচতেছে।

অধরবাবুর এক পুরনো ছাত্র এখানে হোমিওপ্যাথি ওষুধ বেচে। জীর্ণ ও গরিষ দোকান। তাঁর বাসায় উঠলেন ওঁরা। হোটোলে ভাত খেলেন। অধরবাবু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

চোখের ডাক্তারের কাছে পবনকে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বাড়ীতে রোগী দেখে। ডাক্তারকে পবন ওই কথাই বলল।

চক্ষে সব ধূমাবল দেখি বাবু। যেমন ধূমা উঠতেছে আগুন তাতে। স-ব ধূমাকার। আব এই লাচে, এই চমকায়। ধানটো, মাচানটো, ভগীরথের মুখটো যেন আগুন তাতে বাতাস জ্বলে, পিথিমি লাচতেছে। চমকতেছে।

ডাক্তার অধরবাবুকে বলল, মনে হচ্ছে গ্লুকোমার পরীক্ষা করতে হবে। সে তো সময় লাগবে।

তাই করুন।

অতক্ষণ বসবেন আপনি?

না, আমার কাজ আছে।

পবনকে রেখে অধববাবু ও ভগীবথ বেরিয়ে এলেন, ভগীবথ বলল, চক্ষু সারবে? দেখা যাক।

অধরের মনে কালীকৃষ্ণের ওপর প্রজ্বলন্ত বাগ। চোখের এমন অবস্থা লোকটার তো একদিনে হয় নি। দিনে দিনে—“দিনে দিনে” শব্দ দুটি যেন এক সম্বানের বিজ্ঞাপনকে মনে কবিয়ে দেয়। দিনে দিনে, একটু একটু কবে পবনের চোখের আলো ক্ষীণ হয়েছে। ভাতুয়া মহাজনের কাজ কবতে কবতে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভাতুয়ার চোখের চিকিৎসা কবাবার জন্যে ভাতুয়াকে ছুটি না-দেবাব অধিকার মহাজন বাখে। দাস। ক্রীতদাস।

অধব ভগীবথকে নিয়ে আদিবাসী-কল্যাণ আপিসে গেলেন। জেলাটিতে আদিবাসী অনেক। আর অধববাবুবা সত্তবেব দশক পড়তে আদিবাসীদের নিয়ে ধানখেতে নেমেছিলেন। আদিবাসীকল্যাণ দপ্তর এখানে আপিস বেখেছে। ভগীবথ বলল, হেথা এলাম কেনে?

জানলে এ জানবে।

পলুস মূর্মু শিক্ষিত, চটপটে যুবক। সে বলল, ভাতুয়া বলুন, মাহিন্দাব বলুন, ব্যাপাবটা একই দাঁড়ায়। একটা লোকের সঙ্গে সময়সাপেক্ষে, বাৎসরিক একটা টাকার কড়ারে, ভাত ও জলপান দেবার শর্তে চুক্তি কবা হল। কার্যকালে সে মনিববাড়ির চব্বিশ ঘণ্টার গোলাম হল। ক্ষেত্রবিশেষ এই শ্রমিকেব নিজস্ব কিছু জমি থাকতেও পারে। তা অবশ্য কম।

এখানে ঋণেব ব্যাপাব।

বুঝলাম। ঋণ নিল একজন। সে নিজে অথবা তাব আপনজন কেউ ভাতুয়া হল। বছবে এত টাকা, দৈনিক ভাত ও জলপান।

ঋণমুক্তি তো হয় না।

হবে কি কবে? ভাতুয়া বা মাহিন্দাব হচ্ছে নিরন্ন ও নিরক্ষর লোক। সেই মুহূর্তে বাঁচাব জন্যে সে নিজেব দাসখতে টিপছাপ দিচ্ছে। আপনি বুঝছেন না, কি হওয়া উচিত ছিল?

আপনি বলুন।

পলুস মূর্মুর মুখে একটা হাসি লেগে থাকে। হাসিটা ধবে রেখেই সে বলল, ঋণগ্রহীতাকে জেনে নিতে হত সে কি ভাবে ছাড়ান পারে। ধরুন পাঁচ বছরের জন্যে চুক্তি হল, ধার ছিল এক হাজার টাকা। পাঁচ বছর সে কি কাজ করবে এবং কি হারে তার দৈনিক বা মাসিক মজুরি ধরা হবে? যদি দিন দু টাকা মজুরি হয়, তাহলে মাসে ষাট টাকা কাটান যাচ্ছে। বছবে তিনশো ষাট টাকা। পাঁচ বছরে তো মালিক আঠারোশো টাকা তুলে নিল।

বুঝলাম।

না বোঝেন নি।—হাসি লেগে থাকল পলুস মূর্মুর মুখে, গলাটা ধারালো হল। বোঝা কি অতই সহজ? কাজটা যদি খেতমজুরী হয়, তাহলে একভাবে হিসেব করা চলে। খেতমজুরের

একটা মজুরি রেট আছে বটে—পাক, বা না পাক। কিন্তু ক্ষেতমজুর তো খাটবে আট ঘণ্টা—ভাতুয়া চৌপর দিনের গোলাম। কাজ যদি হয় বাগান সাফ, কাঠ কাটা, গোয়ালের কাজ, তার মজুরি কি?

তাহলে?

সে সব হিসেব এ লোকটির আছে?

না বাবু। কুন-অ হিসাব নাই।

হিসেব-নিসেব করলে মালিককেই টাকা ফেরত দিতে হবে হয়তো! আমি যা বুঝি বললাম। দেখুন, কি বোঝেন।

খেতমজুরদের তো তবু কোন রেট হয়েছে। আর কোন কোন জায়গায় তাবা এখন তবু পাচ্ছে। পুরো না হোক, কাছাকাছি। অথচ খেতমজুররা—

শুনতে তো পাই, অনেক আন্দোলন হয়েছে তাতে এতটুকু পাচ্ছে। আপনিই ভাল জানবেন।

হ্যাঁ। আমরা আন্দোলন করেছিলাম।—অধরবাবু চোখ তুললেন। মনেব নিচে জবাব পাচ্ছেন। ভাতুয়াদের জন্যও—অধরবাবু বললেন, কিন্তু এরা তো ...

এরা শ্রমিক হিসেবে আমাদের ভাষায় ‘অসংগঠিত অংশে’ পড়ে, তাই তো? ক্ষেতমজুরও তাই। আনুর্গানাইজড সেকটর।

খেতমজুরদের চেনা সোজা।

এদের চিনে বের করা কঠিন।

এদের কোন আইনেব আওতায় ফেলা চলে না।

চলে বই কি।

চলে?

পলস মূর্মুর হাসিতে শাণ পড়ছে, ফুলকি উড়ছে। সে বলল, এরা বনডেড লেবার। বাঁধা শ্রমিক। দাস।

বনডেড লেবার! পশ্চিমবঙ্গে?

নয় কেন? দেখুন না, এখানে পরিষ্কার লেখা আছে, ‘পশ্চিমবঙ্গে পরিচিত চেহারা ব দাসত্ব অনুপস্থিত। বাৎসরিক চুক্তি-মাসিক শ্রমিক নিয়োগ এই নামের ছদ্মবেশে বনডেড লেবার প্রথা চলে।’ নয় কেন অধরবাবু? বনডেড লেবার অ্যাক্ট পড়ে দেখুন—যে যে কারণে বনডেড লেবার হয় মানুষ, সেই কারণে মানুষ হয় ভাতুয়া।

আইন আছে, আছে বাবু? ভগীরথ বলে।

আছেও বটে, নেইও বটে। পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা আছে বলে তো সবকার বলছে না। কিন্তু ভাতুয়া প্রথাই হল গে সেই প্রথা।

তাহলে?

আমি জানি না ভাই। তুমি ওঁর কাছে জেনে নিও। ভাতুয়া আর বনডেড লেবার এক, তা প্রমাণ করবে কে? প্রমাণ করে প্রথা উচ্ছেদ করবে কারা? বিহারে এমন হামেশা ঘটছে, বনডেড লেবারকে মুক্ত করা হল রামের খপ্পর থেকে। অভাব, জমিহীনতার কারণে, সামাজিক প্রয়োজনে সে ঋণ নিল শ্যামের কাছ থেকে এবং তার বনডেড লেবার হয়ে গেল। ঠেকাবে কি করে? ভাতুয়ারাই হয়তো মারতে উঠবে, আপত্তি জানাবে।

বনডেড লেবার অ্যাক্টটা পাই কি করে?

‘আপনি মশাই মার্কামারা হয়ে গেছেন। সাহায্য করাও মুশকিল।

মানতে পারলাম না।

শুনুন জিগ্যেস করলে অস্বীকার করব 'দিয়েছি' বলে—কিন্তু ছোট অ্যাক্ট, একটা কপি আপনাকে দিয়ে দেব কোন সময়ে। নিয়ে করবেন কি? সাজিয়ে রাখবেন?

বলুন, বলুন। ভগীরথ বলছে, আপনি বলুন, শুনতেই হবে। আর যাকে নিয়ে প্রশ্ন তিনি চোখ দুটি প্রায় খুইয়ে বসে আছেন। তোমাকেও বলি ভগীবথ, আগে তো দেখবে?

পলুস মূর্মুর হাসিতে যেন জ্বলন্ত রোদে ইস্পাতের ছুরি বলকে উঠল, সে কি? আপনাব চেনাজানার মধ্যে একজনই 'ভাতুয়া' না কি? 'যাকে নিয়ে প্রশ্ন' বলছেন? আচ্ছা, আবেকজন প্রাক্তন ভাতুয়ার খোঁজ দিচ্ছি! শিবচাঁদ মূর্মু, গ্রাম সলপাড়া, তাবও চোখ অন্ধ। আমার কাকা। নিন, চা খান, চা এসে গেছে।

ভগীরথ অভিভূত হয়ে তাকাল। পলুস মূর্মু বলল, হ্যাঁ, হে। ভাতুয়াবা বসন্তরোগে ম্লুকোমায়, এতে-ততে অন্ধ হয়। অন্ধ হয়ে তবে কাকা খালাস পেয়েছিল।

অধববাবু বললেন, যুগলের বাবা।

হ্যাঁ। জানেন দেখছি।

চা খেয়ে ওঁবা উঠে পড়লেন। অধববাবু মাথায় নানা প্রশ্ন, যুগলের স্ত্রী?

গ্রামেই আছে।

যুগলটা!

ভগীবথ বলল, মারি দিচ্ছিল তাবে, লয়? হ্যাঁ, আমি জানি, আমি শুনছি।

পলুস মূর্মু সে কথার জবাব দিল না। অধববাবুকে বলল, বয়স্কদের লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছেন—এই বইগুলো একজন দিয়েছিল পাঠিয়ে, নিয়ে যাবেন।

ঘাড় হেলিয়ে অধববাবু বেরিয়ে এলেন। এখন বিকেল হয়-হয়। সব ধুলোটে বিবর্ণ। ভগীরথ বলল, এখন ইরা খুব সিধাসাফা বাত কবে।

তা করে!—সদৃশে হাসলেন অধববাবু। ক্ষমতা এদের বড় কম, বড় কম।

দপ্তরটো রাখি দিচ্ছে কেনে?

বাখতে হয়। এ সবকার এ জেলায় চেষ্টা করছে, কিন্তু ক্ষমতা বড় কম এদের।

কি বুঝলে বাবু?

পবে ভগীবথ, পবে।

ডাক্তার বলল, কাল আবার আসুক। পবন, তুমি বাবান্দায় যেয়ে বোস। আমি ঐর সঙ্গে কথা বলি।

পবন বলল, অধববাবু! মোরে চশমা দিবে মশায় হ্যাঁ! চশমা লিলে স—ব স্পষ্ট দেখব যেমন। উঃ! জল খাওয়াছে আব চক্ষু দেখছে সি কত রকমে!

ভগীরথ বাবাকে নিয়ে বাইরে এসে বসল। বারান্দাটি উঁচু। পবন বলল, ফিবব কখন, আঁ ভগীরথ? নাচা কুচাতে আছে, ঘসির মাচাংটো বাঁধতে বলছিল—

এখানে বস। নাও, বিড়ি খাবে?

পবন সলজ্জ হেসে বলল, একটো ছিগারেট আনু কেনে, উ দোকানে যা? কখনো খেয়ে দেখলম না—

দেয়ালে পিঠ রাখি বস কেনে, আমি শয়ে আসি। বিস্কুট খাবে? বিস্কুট?

ডাক্তার অধববাবুকে বলল, অনেক কথা বলে লাভ নেই মশাই। কে হয় আপনার? গাঁয়ের লোক?

হ্যাঁ। বলুন না।

ম্লুকোমা ভয়ানক এগিয়ে গেছে। নার্ডগুলো ... ডাক্তার সংক্ষেপে বোঝাতে থাকল। মনে হয় প্রাইমারি টাইপের ম্লুকোমা, আর প্রাইমারি টাইপের ম্লুকোমা হবার কোন জানিত কারণ

নেই। চোখের স্নায়ুমণ্ডলী-ক্ষয়িষ্ণু পবনের। পবনের কি বহুমূত্র আছে? অধরবাবু জানেন না।
অ্যাট্রোফি বা ক্ষয়িষ্ণুতার এই কারণ দীর্ঘদিনের পুষ্টিহীনতা। পবন রোজ কি খায়? অধরবাবু
জানেন না, আন্দাজ করতে পারেন। ননকো-অপারেটিভ টাইপ। চিকিৎসায় কাজ হওয়া দুষ্কর।

অপারেশন তো হয় ঝুকোমায়?

সে কথা ভেবে দেখুন।

তাতে বিপদ আছে? মানে ...

দেখুন, বছর পাঁচেকের পুরনো ব্যাপার। প্রথম দিকে যদি আসত ...

কি করবেন?

কলকাতায় নিয়ে দেখাতে পারেন।

লাভ হবে?

মনে হয় না।

তাহলে?

আপাতত চশমা দিয়ে দিই।

অঙ্কুহ আটকানো যাবে না?

পাঁচ বছর আগে হলে অপারেশন চলত।

আজ থাকতে বললেন?

আজ তো হবে না। কাল সকালে ব্লাডসুগাবটা খালি পেটে, খাবার পব, দুবার করান।
পেছাপটাও দেখিয়ে নিন। বহুমূত্র থাকলে তার চিকিৎসা চালান। ওষুধ থাক। তাতে চোখটা
আর ক দিন থাকবে।

আপনার টাকাটা?

অধর বাবুর দিকে তাকাল ডাক্তার। অধর মাইতিদের জন্যে একসময় না কি ডাক্তাররা
দক্ষিণা কমাতে বাধ্য হয়েছিল। শোনা কথা। এখন লোকটি ভেঙে পড়েছে। খাকি, গলা
ছেঁড়া সোয়েটার, ধুতিটা আধময়লা, মোটা চটি—গ্রামের লোকদেব দেখে অবশ্য টাকা
আছে কি নেই, বোঝা যায় না। তবু, এ তো গরিব—সবাই বলে। গরিব হও যদি, ডাক্তারকে
রুগী এনে দেখাও কেন? হাসপাতালে যাও না কেন?

তিরিশ টাকা দিন।

টাকা দিল অধরবাবু। জীর্ণ ব্যাগটি চিমসে হয়ে গেল তিনটে নোট বেবোতে।

চশমা করতে কত লাগবে?

পঞ্চাশ বেকসুব।

আচ্ছা।

অধরবাবু মনে মনে আশ্বস্ত হন। হাতঘড়িটা এখনো আছে। ভগীরথই তখন সামলে
রেখেছিল। অধরবাবুর বাবাব হাতঘড়ি। ওষুধ-বেচা ছাত্রটি নিশ্চয় ব্যবস্থা করে দেবে।

ছাত্রটি বলল, রক্ত আর পেছাপ হাসপাতালে পরীক্ষা করিয়ে দিই। খরচ কম লাগবে।

তাই কর।

দুদিন থাকতে হল আরো। বহুমূত্র নেই পবনের। চশমা তৈরি ফরমাস দিয়ে গুঁরা বাসে
চাপলেন। অধরবাবু বললেন, আবার নিয়ে আসব ক দিন বাদে।

কেমন, বাবু?

চশমা পরে দেখে নিতে হয়।

চশমাতে বিস্তর টাকা লাগবে, লয়?

সে হয়ে যাবে।

ঘড়িটো তুমার—

হয়ে যাবে।

কে শুধবে বাবু এত টাকা? কত খরচ করলা?

ভগীরথ বলল, আমি। ইবার চুপ যাবে?

হাঁ। চুপ গেলম।

আর, আর তুমি গরাই বাড়ি যাবে না।

যাব নাই।

না।

কি বুঝল পবন, কে জানে। ভগীরথের কণ্ঠের স্ফোভে ও বাগে কি ছিল? ও একবার ছেলের দিকে চাইল। একবার অধরবাবুর দিকে, তাবপর ওর বুক ঠেলে কান্না উঠে এল।

বলল, ই কথা আজ তুই বলিস কেনে?

বললাম।

কেনে?

না। গরাই বাবু তুমারে বেআইনে খাটাচ্ছে, মজুরি ভি হিসাবে কাটে নাই, উর করজ দশ দফা শুধে গিছে, বুঝলা? দশবার শুধছ তুমি?

বাবু! অধরবাবু! ভগীবথ কি বলে?

ঠিক বলে পবন হ্যাঁ, ঠিক বলে।

শুধে গিছে?

সমগ্র পবিস্থিতির নির্মমতায় ভগীবথ এখন নির্ভুর, ক্রুদ্ধ। আইনেব কথা যা বুঝেছে, তাতে ওব বুকে এখন রক্তেব জোয়াব। ভগীরথ বলল, আর কখনো যাবে না, কুনো দিন নয়।

বাবু পঞ্চায়েতী, হাতে অনেক ছেলা। মারে যদি? কতদিন তো মারছে।

অধরবাবু বললেন, কেউ কিছু বলবে না।

কেনে? কেনে আমাব হয়ে বলবে? কেনে বাবুব সাথে বিবাদ উঠাবে? বল? বলবা না? বুঝি পারছি আমি অধরবাবু। বুঝি পাবছি আমি ভগীরথ। আমার চক্ষু আর ভাল হবে না— সি কথা বলবি তুবা। বলবি তুমাব কাজে পবনটো কানা হই গেল, আর সি তুমাৰ হয়ে খাটবে না। বুঝি গিছি আমি বাবু গো! আমার আর বুঝতে বাকি নাই!

পবন হো হো করে কাঁদে ও ভগীবথ তার মাথা সাপটে কাঁধে টেনে নেয়। ভগীরথও নীরবে কাঁদে ও জাপটে ধবে রাখে বাপকে। অধব বাবুর মনে চেনা-পৃথিবী ভেঙে যেতে থাকে। প্রজ্বলন্ত ক্রোধ। ভাতুয়া কতজন? কি হিসেবে কাজ করে? ভাতুয়াই বনডেড লেবার এবং তাঁর পকেটেব বাদামী কাগজটি বলে দিচ্ছে, ১৯৭৬ সালের (দি বনডেড লেবার সিস্টেম অ্যাবোলিশন) অ্যাক্ট-এর আওতায় ভাতুয়াকেও ফেলা যায় এক বিশেষ উপধারায় প্রয়োগে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বনডেড লেবার প্রথা নেই, আছে কমট্রাক্ট লেবার। সামনে অনেক কাজ। সংগ্রাম ফুরায় না।

পবন চোখ মুছল, মাথা তুলল। নাক ঝেড়ে, জামায় মুছে বাইরের দিকে তাকাল। সব ধোঁয়া ধোঁয়া। যেন আগুন জ্বলছে কোথায়, ধোঁয়ায় ধুমল বাতাস। সব দেখাচ্ছে ধোঁয়াবর্ণ, সব যেন চমকাচ্ছে, হলুকাচ্ছে, আগুন-তাতে বাতাস কাঁপে যেমন। এত আগুন লেগে গেছে, কই পবন তো বোঝেনি আগে?

আর গেল না পবন গবাইবাড়ি, একবারের জন্যেও নয়। অধরবাবু কি বললেন কৃষকসভায় নিত্য আব সন্তোষকে, কার সঙ্গে কি কথা হল তা পবন জানল না। তবে ওর বউয়ের মুখে সব কথাই শুনল। অধরবাবু নাকি নিত্যদের ডেকে রীতিমত আলোচনা করেছে। সরকারী কাগজ পড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। গ্রামের ছেলে তোমরা, পার্টিব ছেলেও বটে। মানুষকে দাস বানিয়ে ব্যবহার চলছে, তা তোমরা দেখবে না? কেমন লোককে রেখেছ পঞ্চায়েতে? পবনের চোখ দুটো যে চলে যাচ্ছে, মালিক কোনদিন পবনকে চিকিৎসা করিয়েছে? তোমাদের চেনাজানা চিরকালের মানুষ না পবন?

ছেলেরা গ্রামেরই ছেলে। তারাও আলোচনা করে থাকবে। তারা টাকা এনে দিয়েছে অধরবাবুকে। বলেছে, গরাইয়ের ঘাড় ভেঙে আমরা পরে তুলে নেব।

সব শুনেও পবন চঞ্চল হয়নি। শহর থেকে ঘুরে এসে ও সেই যে ঘবে বসেছে, বসেই আছে। এত কথা, এমন কাণ্ড, তাতেও এতটুকু বিচলিত হয়নি। বলেছে, উয়াবা টাকা দিল? ভাল।

হা তুমার চেত-ভেত নাই? যা বলি সব শুনি বসি থাক?

কি কবব? লাচব?

হা, কিছু তো কবে?

ভাবি বউ। কত খাটলম, বর্ষায় আল ভাঙলে বান্‌তাম, তাতেব কালে গবাইবাবুব মাথে ছাতা ধবে দৌড়াতাম। পায়ে যা হই গিছে ইটাপাথব বেজে।

লাও, খ্যাড়ের দড়িটো পাকাও বসি।

পারি না বউ।

অত ভাব কেনে? একটো বকনা নিব পালনি। সি হতে দেখবে সুসার হবে।

নিবি? নিস। বকনা ভি মাঙছিলাম একটো, দেয নাই। বর্ষায় মাথাল দিল, বলে, লিখে রাখলাম। ইয়ার দাম দু টাকা। কিছু দিল না কখনো। খালি গতরটো মাটি কবি দিল, চখ দুটা—

বউ ভগীরথকে বলল, ই কেমন হয়ে যেছেরে ভগীরথ? আমি তো ভাল বুঝি না। এত কাজেব মানুষ, এমন কালিমাড়া মুখে কি ভাবে? আঁ?

ভগীরথ বলল, কি ভাব বাবা?

হিসাব ভাবি।

কিসেব?

দেনাটো শুধল কবে, আমি বা কত পাব। অনেক কথা মনে উঠে ভগীরথ বে। মনিব ভি বলছে তু বিনা কাম হবার লয়, আমি ভি জাহান দিয়া কাম উঠছি। এখন দেখ, সি ধান ভি কাটা হবে, সকল কাম হবে, তা আমার চখদুটো নিল কেনে?

ভগীরথ বলল, তালপাতা ডেগো লয়ে পাখা বাজা শিখবে? আমি ভি কর্ণি, তুমি ভি কর, চালান দিবে গোকুল দলুই, কিনে লিবে নগদে?

না রে। সি কামটা দেখ, কানাতোও করে। এখনো চক্ষু আছে, টুনি দেখে নই?

‘কানা-কানা’ বল কেনে? কলকাতা লয়ে তোমার চক্ষু দেখাবে অধরবাবু।

পবন মাথা নাড়ল। বলল, কুথা হতে? কি করে? না ভগীরথ, সি জ্ঞান অনেক করেছে। আর ঋণ বাড়াস না। চক্ষে কিছু হবার লয় রে, সকল ধুমবন্ম দেখি। যেমুন ধুমা উঠতেছে বাতাসে।

সদরে চশমাটো পরি দেখবে, চক্ষে ভাল দেখ। শুন বাবা, ভাল দেখবে।

না তোরে দেখছি কুনোদিন, না তোর মা-রে। বিহান কাড়তে ছুটি চলি গিছি, আব অসাগর কাম! কেনে বা লয়ে যাই নাই তোবে, তু গাঁদাটো ছিলি, মেলায় যাবি বলে কানছিলি কত! হা!

বাবা। চেটাই বুন, পাখা বাঁধ, ঘরে বসে বা রবে কেনে? কামে ব'লে ভাল রবে মন।
ধুর! কানা হই করব।

অধরবাবুর কাছে গেল ভগীরথ। অধরবাবু সব শুনে বললেন, প্রচণ্ড একটা আঘাত পেয়েছে। চোখের ব্যাপারটা মেনে নিতে পাচ্ছে না। চশমাটা নিয়ে আসি ওকে নিয়ে।

চশমা পরে পবন বলল, হাঁ ধুমা-ধুমা বটে! লাচতেছে, ললকাতেছে, কিস্তক, স্পষ্ট দেখি।

চশমা পরে পবন বড়াম মায়ের থানে ঘুবে এল। অধরবাবুকে বলল, ভগীরথটো সাচাই বলছিল গ। মায়ের থানে লাল চুটির বাসা। তাতেই মায়ের বসে লাল চুটি বায়। গবাই বলছিল মায়ের দেহ ফাটি চুটি বাইতেছে গ।

এই তো সব ঠিক-ঠিক দেখছ।

সি কথাটোর কি হল বাবু?

কি কথাটার পবন?

আমাবে বেআইনী খাটাছে উ?

সে কথাও হবে, জবাব দিতে হবে ওকে। আমি হিসেবটা কবে নিই?

হিসেব করতে কবতে দিন গেল অনেক। বহু বছরের হিসেব। এব মধ্যে পাশেব গ্রামে ধানকাটা মজুবি নিয়ে হাংগামা বাধল। মজুববা খেত-মজুবি নেবে, জমিমালিক দেবে না। চেনা হাংগামা। মালিক বাইরের মজুব আনবে। চেনা নিয়ম। যাবা মজুবি চাইছে তাদের ক জনাকে ধববে? চেনা পদ্ধতি।

অধরবাবু সেখানে গেলেন। এক সময়ে মহল্লাটিতে ধানের নাম বন্ধে লেখা হয়েছিল, বারবাব। এখন নির্বাচনের আগে ধানকাটা নিয়ে হাংগামা বাঁধলেই আবার পুলিশ ঢুকবে গ্রামজীবনে। পঞ্চায়েতকর্মী ছেলেরা সঙ্গে গেল।

পবন বলল, ভগীরথ? তু যাস না কেনে? অধরবাবু একা, লয়?

ভগীরথ গেল।

আব পবন গেল গবাইবাবুব বর্ণশালী ধানের ক্ষেতে। ওই তো তাব হাতে বাঁধা মাচা। ওই টঙে বসে ও খেত পাহারা দিত। ধান কাটছে, পালা দিচ্ছে পতিত, সাগর, নিবারগরা। খেতমজুর সব। আঃ! অসাগর ধান গো, অসাগব ধান। এই সব কাজ তো সেও কবেছে এক সময়ে। এখন চশমা পরে সব দেখতে পাচ্ছে পবন স্পষ্ট।

তুই হেথা কেনে, পবন?—গবাইবাবু ধানকাটার কালে দেখতে আসে, পবনের খেয়াল ছিল না।

দেখতেছি বাবু।—ভয় কবছে গো, ভয় কবছে। এতদিনের অভ্যাস কি যায়? গবাইবাবুকে ভয় করা পবনের অভ্যাস। ভয় করছে।

এঃ! অধর মাইতি চশমা করি দিছে, তা পরি দেখতেছ শালো! দেখতেছ না চুরাবাব তালে আছ, বুঝি নাই? বোকাটো ভাবিস, আঁ?

চুরি? আমি?

লয় তো কে? শালো মুরুব্বি হল উ অধর মাইতি, সি মোরে আইন দেখায়, হিসাব দেখায়। কি করবে সি? ধানটো ভানায়ে লই, তা বাদে যেয়ে তুমার নাম আমি থানায় দিব।
কেনে?

চুরির লালিশ দিব শালা। তুমি মোর মুখ হাসাছ, তুমারে আমি ছাড়ব?
কি চুরি করছি আমি বাবু?
থানায় বলবে।
আমি তুমার মুখটো হাসা করাছি?
হাঁ।

আজ দেড় কুড়ি বছর খাটি, তুমার সি আটসং টাকা উঠল নাই, আমার কড়ারের টাকা
ভি দিলানা কুনো দিন—তুমি, তুমি এখন আমারে টাকা দিবে তা জান?

কে বলছে? অধর মইতি?

দিবে। বে আইনে খাটায়ে নিছ বাবু। চক্ষু চলি যায়, কুনো বেবস্তা কর নাই।

চক্ষু যায় নাই, জেহেলে বসি কাঁদি কাঁদি ইবার যাবে। তুমার গরম বড় বাড়ছে পবন।

চোর! চোর যদি হতে পারতাম বাবু। মনিব্যানের হারটো কে খুঁজি দেয়? একটো টাকা
দিছিল তারপর? তুমার টাকার ব্যাগ আমি নাই কুড়িয়ে? হাটে যখন হারাযে যায়? চোর
যদি পবন হবে বাবু, তবে তার উপর ঘর ছাড়ি পালায়েছিলে লকসালী কালে কেমন করি।
চোর আমি? চোর?

হেই, হেই পবন, ইকি?

চোর আমি?

মারা করবি?

গরাই পেছন ফেরে ও আধা দৌড়ে চলে যায়। পবন রাগে রুদ্ধ ক্ষোভে কাঁপে। কাটা
ধানের পাজা এখন চমকায়, বিলিক মারে।

ধান কাটা হতে না হতে আকাশে মেঘ জমেছিল। ধান এবার সবার খেতে হয়নি, বড়
খরা গিয়েছে। যে ধান উঠেছে তাও বুঝি জলে নষ্ট হয়। কাটা চলছিল, ঘরে তোলা হচ্ছিল
ধান।

পবন আকাশ দেখছিল। তার হাতের মেরামত করা টালে গরাই বাবুর ধান সুরক্ষিত
থাকবে। এক ফৌটা জল লাগছে না, তা পবন জানত। এও জানত, গরাইবাবুর জান ওই
ধান। আকাল আসছে। ধান কর্জ দেবে গরাইবাবু, বহু জনকে বাঁধবে ঋণের দায়ে। ধানের
বলে ওর বল।

রাতে দুর্যোগ নেমেছিল।

আকাশে বিদ্যুৎ, প্রবল বৃষ্টি, দুরন্ত হাওয়া। পবন ওর দা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। চেনা,
সব ওর রক্তে রক্তে চেনা। এমন দুর্যোগে কেউ বেরোবে না। গরাই বাবুরা সবাই লেগেব
ওমে ঘুমোবে। ওরা ভাত খায়। তপ্ত ভাতের ভারে ঘুম ঢেলে আসে চোখে।

পবন কোন বোকামি করে নি। খুব সুকৌশলে ও টালের চাল বেয়ে উঠেছিল। তারপর
ধারালো দায়ের কোণে ও টালের বেড়ার ঝাঁপের ঘন আঁটসাঁট ঢালা কেটে ফেলে দেয়। দুটি
টালেরই। ধান ভিজতে থাকে। তখন ও টালের ঘের কাটতে থাকে ও হিঁচড়ে নামাতে থাকে।
তাতেও হয়তো কারো কানে যেত না। টিনের ঘর গরাইবাবুর। ঝমঝম করে জলের শব্দ হচ্ছিল।

কিন্তু এখন পবন চোঁচাতে থাকে।

—হেই গেল তুমার ধান।

—ইবার কি করজ দিবে?

—কুন বাঁধনে বাঁধবে গ?

হড়হড়িয়ে ধান পড়ছিল। পবন লাথি মেবে ধান ফেলছিল।

তখন গরাইবাবুদের ঘুম ভাঙ্গে।

পবনকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। পবনের গায়ে কেউ হাত দেয় নি। হাতে দা ছিল ওর। চোখ ছিল লাল। অসীম, অপার ক্ষমতায় দুটি টালের বহু ধান নষ্ট করে পবন যখন অবসন্ন হয়, তখনি ওকে ধরা গেল। তার আগে নয়।

আশ্চর্য, পবন কোন বাধা দিল না। ওকে ধরতে দিল। সবাই নীরবে সভয়ে দেখছিল পবন একা কি করে এত বড় সর্বনাশ করেছে।

ধানের ছড়াছড়ি মাটিতে। বৃষ্টিতে ভিজ়ে গোবর। গরাইবাবু মাথায় হাত রেখে কাঁদছিল।

বর্ষালালী ধান মাড়িয়ে যেতে যেতে পবন চোখ তুলে ভগীরথকে দেখল। পবনের চোখ ঘোলাটে, তবুও বুঝল, ভগীরথের চোখে আজ পিতার বিপন্ন অসহায়তার কারণে দুঃখ নেই। অন্য কিছু বলছে ভগীরথের চোখ। অন্য কোন জরুরী খবর জানাচ্ছে। ভগীরথ মাথা নেড়ে “হ্যাঁ” জানাল। বাবার আচরণে ওর সম্মতি।

পবন বলল, লইলে গ্রামটো ধান বাড়ি দিয়া বাঁধি ফেলি দিত ভগীরথ।

হ্যাঁ বাবা।

উর জাহান উ করজ দিয়া কামে। বাস, কোমর ভাঙি দিছি।

জানি বাবা।

ইরাদের বুঝাস।

পবন আব একবারও পেছনে না চেয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলে গেল জামু গ্রাম থেকে।

পেয়ারা

মানবেন্দ্র পাল

বাড়িটি কোনো অভিজাত পাড়ায় তো নয়ই—বরঞ্চ এমন জায়গায় যেখানে কোনো ভদ্রলোক অসামাজিক প্রলোভনেও যেতে ইচ্ছে করে না। টিনের ছাউনি দু'খানি ঘর। সামনে খানিকটা উঠোন। ভাড়া দশ টাকা—এবং মাসের প্রথম সপ্তাহে দিতে না পারলেই উঠে যাবার নোটিশ।

চেষ্টা করলে ঐ টাকাতেই অন্য কোথাও যে অমনি একখানি ঘর পাওয়া একেবারেই যায় না, তা নয়। শচী বিশ্বাস খোঁজও পেয়েছিল, কিন্তু সরোজিনী নড়তে চায়নি। তার যে এ ভুতুড়ে জায়গার ওপর কিসের এত দম তা সেই জানে।

শচী বিশ্বাস যে একেবারেই কিছু অনুমান করতে পাবত না তা নয়, কিন্তু স্ত্রীর ঐ ছেলেমানুষি প্রশয় দিতে চাইত না। অথচ বলবারও কিছু নেই। কিছু বলতে গেলেই এখনি অশান্তি বাধবে, ঝগড়া লাগবে—বিশেষ সে যুক্তি দেখাবে—গাছ-গাছ কবি সে কি তোমাব কিছুই আয় দেয় না? বড়ো বড়ো ডাঁসা পেয়াবাগুলো যখন—

হ্যাঁ তা সত্যি কথা। গাছটায় ফল দেয় আশ্চর্য রকম। ঐ বড়ো বড়ো পেয়াবা—বসে ভরা! কোথায় লাগে কশীর পেয়ারা। এক-একটা পেয়ারা এক-এক আনা দবেও হু হু কবে উঠে গেছে। উঠোনের কোণে ঐ পেয়ারা গাছটাই এ বাড়ির একমাত্র লাভের সম্পত্তি।

কিন্তু লাভের দিকে তাকিয়েই যে সরোজিনী গাছটিকে এত যত্ন কবে তা নয়। ওটা তাব তর্কের অন্ধ। আসলে পেয়ারা সে খুব ভালোবাসে। শত দারিদ্রের মধ্যে—অনাহাবে অর্ধাহাবে থেকেও শুধু উঠোনের কোণের ঐ পেয়াবা গাছটির দিকে তাকিয়ে সে একটু হাসতে পাবে। পৃথিবীর রঙ যখন সর্বত্রই তার কাছে মকবালুকার মতো ছলে, তখন কেবল একটুখানি সবুজ ঐ পেয়ারার কচি পাতায়। বৈশাখ মাস থেকে সে চেয়ে থাকে—দাক্ষণ খরায় গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, বৃকের ভিতরটা ধু ধু করে জলে ওঠে—গাছটা বাঁচবে তো? তারপর একদিন জালি ধরে, তখন কি আনন্দ! তাহলে এবারও পেয়ারা হবে—বড়ো বড়ো রসালো পেয়াবা।

এদিক দিয়ে সরোজিনীর খুব ভাব ছেলের সঙ্গে। এক এক ছুটির দিনে—যেদিন গোপালকে ইকুলে যেতে হয় না আর গৃহকর্তা যখন খেয়েদেয়ে ফতুয়া কাঁধে ফেলে, হাতে লণ্ঠন নিয়ে দোকানে বেরিয়ে যায় তখন ঐ পেয়ারা গাছতলায় মা আর ছেলের বসে গোপন সভা। সে সভার আলোচ্য বিষয় পেয়ারা। এ বছর কত পেয়ারা হবে, প্রথম ফল ধরলে কাকে কাকে দেওয়া হবে।

সরোজিনী দেবার লোক খুঁজে পায় না। এ নির্জন বনবাসে আর প্রতিবেশী কই? চাল বাড়ন্ত হলে একমুঠো চাল দিয়ে সাহায্য করার কেউ নেই। তবু নিজের গাছের ফল-বিতরণের আনন্দ চাই! কিন্তু সামান্য ক'টি পেয়ারা কোন্ বাড়ি গিয়ে কার হাতে তুলে দেবে?

আষাঢ় মাস পড়েছে। গাছভর্তি বড়ো বড়ো পেয়ারা। এ বছরের নতুন ফল। শচী রোজই গাছের দিকে লক্ষ্য রাখছে, কেউ পাড়ছে কিনা। দেরি সহিছে না। এবার বেচে দিলে হয়।

এই সময়ে একদিন দুপুরে ঐ পেয়ারা গাছতলায় সভা বসল।

সরোজিনী বললে, তোর ইস্কুলের বন্ধুদের দিবি না?

গোপাল ভেবে বললে, দিলে হয়। পেয়ারা তো সবাই ভালোবাসে, কিন্তু সবাইকে তো দেওয়া যাবে না। বাবা শুনলে—

সরোজিনী হান হাসল।

—তবে তোদের মাস্টারদের? সব মাস্টার নয়। ঐ যে-মাস্টারের কথা বলিস—খুব ভালোবাসে তোকে?

গোপাল চিন্তা করে বললে, থাক মা, কাউকে দিয়ে দরকার নেই। সেবার এই পেয়ারা নিয়ে বাবা কি রকম অশান্তিটা করলে মনে আছে তো?

হঠাৎ সরোজিনীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। আজ ছেলের মুখে সেইদিনের কথা উঠতেই তার যেন নতুন করে লজ্জা হল। সরোজিনী মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।

সামান্য পেয়াবা—কিন্তু অসামান্য আকর্ষণ তাদের দুজনের। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী দুজনের আকর্ষণ দু'রকমের।

শচী বিশ্বাস বাজাবে একটা মুদিখানার দোকানে কাজ করে। সামান্য মাইনে। এ মাইনেতে এ বাজারে সংসার চলে না। এ নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করছে কর্তার কাছে। কর্তা স্তোকবাক্য দিয়েছেন—সুদিন আসুক। দোকান বেশ চালু হোক, মাইনে বাড়াব বৈকি। এখনি মাইনে না বাড়াবাব পক্ষে তিনি আরও যুক্তি দেখিয়েছেন, ভোলার দিকে চেয়ে দেখো দিকি। ও-ও তো তোমার সমানই কাজ কবে।—তবু তোমাব চেয়ে ওর মাইনে কম। ও সংসার চালায় কি করে?

শচীর মুখে উত্তর আসছিল, কিন্তু সামলে নিযেছিল। বলতে চেয়েছিল—তার সঙ্গে ভোলার তুলনা হয় না। ভোলাব একার ঘাড়ের সংসার নেই। তার বাবা নিজে হাতে লাঙ্গল ঠেলে—কিছু জমি আছে। আব সবচেয়ে বড়ো কথা ভোলা ছেলেমানুষ—তারই গোপালের সময়বসী, ভবিষ্যৎও আছে।

এমন উত্তর সে মনে মনে সর্বদাই আলোচনা কবে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না। জানে, বলে কিছু লাভ নেই। শুধু শুধু মালিককে চটানো।

শচী বিশ্বাস অনেক সময়ে ভেবেছে, চাকবি ছাড়া আরও কিছু করে। কিন্তু সময় কই? সকাল সাতটার মধ্যে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে, ফিরবে দেড়টা-দুটোর সময়। তাবপর নেয়ে-খেয়েই আবার তিনটের মধ্যে বেরোতে হবে, ফিরতে রাত নটা। সে যে কিছু চিন্তা কববে এ অবসরও নেই। শুধু একা একা যখন সে খররোদ্রে বিবর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়ে, কাঁধে ফতুয়া ফেলে, ছেঁড়া কেড়সের অসহযোগিতা উপেক্ষা কবে ক্লান্ত শরীরটা টানতে টানতে বাড়ি ফেরে, কিম্বা রাত্রি নটার পর হারিকেন হাতে ছাতা দিয়ে পথ ঠুকতে ঠুকতে ঘরমুখো হাঁটে তখনই যা একটু নিজের কথা ভাববার সুযোগ পায়। তার জীবনের এত দুঃখ তার গায় লাগত না যদি সে একটা মনের মতো স্ত্রী পেত। অর্থাৎ এমন স্ত্রী—যার কাছে দুঃখের কথা নিঃসংকোচে বলে ফেলে লাঘব হতে পাবত, হয়তো স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু সুপরামর্শও পেত। কিন্তু সরোজিনী সে জাতেব স্ত্রী নয়। এতে বয়েস হল তবু তার ছেলেমানুষি আর অভিমান যায় না। শচী লক্ষ্য করে দেখেছে সংসারে সরোজিনীর দুটি আকর্ষণ—একটি ঐ পেয়ারা গাছ, কবে পেয়াবা ফলবে আর ঐ গোপাল, কবে সে লেখাপড়া শিখে 'মানুষ' হবে। ঝাড়ু মারো লেখাপড়ার মাথায়। তার চেয়ে ছোঁড়াটাকে যদি কোথাও কোনো দোকানে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পাবত তাহলে দু'পয়সা আসত। আব ঐ পেয়ারা? হ্যাঁ, ফলুক—তবে তোমাদের সেবার আর বিলোবার জন্যে নয়; ফলনটা ভালোই হয়—বড়ো বড়ো সাইজ—ঠিক যেন কাশীর পেয়ারা—তা এক একটা দু'পয়সা না হোক পাঁচ পয়সায় কাটবেই।

কিন্তু পয়সা উপায়ের এই দুটি সহজ উপায় কিছুতেই সরোজিনী হতে দেবে না। সাহাদের কাপড়ের দোকানে একটা ছেলে যাচ্ছিল, সুসংবাদটা দেবার জন্যে শচী সেদিন একটু বেশি উৎসাহেই কথাটা সরোজিনীর কাছে পেড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য—সরোজিনী কথার তো কোনো উত্তর দেয়ই-নি—উপরন্তু কেঁদে কেটে উপোস করে যা-তা কাণ্ড করেছিল।

একটা ক্রুর হাসি হেসেছিল সেদিন শচী বিশ্বাস। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ‘মানুষ’ করে তুলবেন উনি!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা জেদ বজায় রাখতে পেরেছিল। ছেলের পড়া ছাড়াতে পারে নি বটে, কিন্তু ছেলেকে দিয়ে পেয়ারা বিক্রি করতে পাঠিয়েছিল। গোপাল পেয়ারার ঝাঁকা নিয়ে কিছুতেই বাজারে বসতে পারে নি। ট্রেনে ফেরি করেছে। সেটা বরঞ্চ তার পক্ষে সহজ—আর কিছুটা আনন্দও আছে। ট্রেনে চড়ার আনন্দ—বিনা ভাড়া। কাটোয়া লাইনে বিকেলের ডাউন ট্রেনে ওঠে। আবার পরের আপ ট্রেনে বুড়ি খালি করে ফেরে। স্টেশন অনেক দূর—সেখানে চেনা-শোনা বন্ধুবান্ধব কেউ যায় না, তবুও গোপাল ঘুরপথে স্টেশনে যায়। সরোজিনী খুব যত্ন করে বুড়িটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় যাতে রাস্তায় কেউ দেখতে না পায়। ট্রেনে উঠে একটা স্টেশন পার হলে গোপাল সরু মিঠেগলায় কোনো রকমে হাঁকে—পেয়ারা চাই—ভালো পেয়ারা।

আমাদের শেষ থেকে শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত এমনি করে তাকে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরতে হয় বিকেলে।

শচী খুশি হল। এখন থেকে তাবও দৃষ্টি ঐ পেয়ারা গাছটার দিকে। বৈশাখের রোদে যখন গাছগুলো ঝলসে যায় তখন সরোজিনীর মতো সেও চিন্তিত হয়। সরোজিনীর দেখাদেখি মানের সময়ে কোনো কোনো দিন সেও গাছের গোড়ায় জল ঢালে, জীর্ণ পাতার জঞ্জাল বুড়ি কবে ফেলে দেয়। আর লুক্কদৃষ্টিতে তাকায়—কবে পেয়াবা ফলবে। এক একটা পেয়াবা ছ’পয়সা! মনে মনে শচী হিসেব করে।

দেখতে দেখতে জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে যায়। পেয়ারা গাছে কালি ধরেছে। দুজনেই উৎসুকভাবে তাকায়, কিন্তু দুজনের দৃষ্টিতে ভিন্ন রকমের ভাষা। তাবপব আষাঢ়ে প্রথম বৃষ্টিব দিনে যখন সরোজিনীকে দেখে গোপালের সঙ্গে মনের আনন্দে পেয়ারাতলায় ভিজছে, তখন শচীবও ইচ্ছে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু পারে না। ভয় কবে, যদি নতুন বর্ষার জলে জ্বর হয়ে যায়। ঘরে বসেই তখন সে কল্পনা করে—এ বছরও তাহলে তাব গাছে পেয়ারা হবে, বেশ বড়ো বড়ো পেয়ারা। আঃ, এরকম যদি আব দুটো গাছ থাকত!

শচীর কিন্তু আর তর সয় না। পেয়ারাগুলো সবে একটু বড়ো হয়েছে, তখনই বেচাবার জন্যে মন উসখুস করে। কিন্তু পারে না। সরোজিনী বাধা দেয়—প্রচণ্ড বাধা। বলে, বিক্রি কববে করো, কিন্তু দোহাই তোমার, একটু ডাগর হতে দাও।

শচী বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ কী মুশকিল! ডাগর হতে হতে কী এগুলো আর থাকবে! ছেলের দল টের পেলে গাছকে গাছ শেষ করে দেবে।—বোধ হয় অনেক ঝিবেচনা করাই নিজের ছেলে আর মায়ের কথা উল্লেখ করল না। কল্পিত ছেলের দলের ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিলে।

কিন্তু সরোজিনীকে বোঝানো গেল না। সে শুধু একই কথা বলে, সব জিনিসের একটা সময় আছে।

অগত্যা শচীকে অপেক্ষা করতেই হয়। ওরা মা আর ছেলে একদিকে। বিগড়ে গেলে হয়তো আর পেয়ারা নিয়ে বেরোবেই না।

এরই মধ্যে একদিন ঘটল সেই অপমানকর ঘটনাটা।

অনেক কষ্টে স্বামীর লুন্ধ কঠোর হাতের নাগাল থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পেয়ারাগুলিকে বড়ো করেছিল। কিন্তু নিজের হাতের অতি যত্নের পেয়ারা সে কি কাউকে না দিয়ে খাওয়া যায়, না বেচা যায়। সরোজিনী গামছায় করে অনেকগুলি পেয়ারা গোপালের হাতে দিয়েছিল তার বন্ধুদের দেবার জন্যে। বাবা বাড়ি ফেরবার আগেই চুপি চুপি গোপাল বেরিয়ে গিয়েছিল। কী জানি বাবা যদি কিছু বললে।

শচী কিন্তু সেদিন একটু অসময়েই—অর্থাৎ যথাসময়ের আগেই ফিরেছিল। মুখটা থম থম করছিল—কপালের শিরগুলো ফুলে উঠেছে। যদিও কোনো দিনই বাড়ি ঢুকে সরোজিনীর সঙ্গে মধুর আলাপ হয় না, তবু শচীর সেদিনের মুখের অবস্থা দেখে সরোজিনী কেমন যেন ভয় পেল। তার যেন মনে হল, নিশ্চয় গোপালকে পেয়াবা নিয়ে যেতে দেখে ফেলেছে।

খেতে বসে শচীই প্রথম কথা বললে।

—ওখানে আর কাজ করা পোষাবে না।

সরোজিনী পাখা হাতে বাতাস করছিল। কৌতূহলী দুই চোখ মেলে তাকালো।

শচী শুকনো ভাত শাক দিয়ে মাখতে মাখতে বললে, বোজ রোজ খিটু খিটু করে, কাহাতক পাবা যায়। তাই রাগ করে চলে এলাম। বললাম, মাথায যন্ত্রণা হচ্ছে।

শচী একটু থামল। তারপর বললে, ও বেলা আব যাচ্ছি নে। একলা ঐ হুঁড়োটা দিয়ে ঠেকাক দোকান। দেখি কেমন পাবে।

সরোজিনী এবাবও কোনো কথা বললে না। সে জানে তাব কোনো কথা বলা নিবর্থক।

খেয়ে উঠে শচী বললে, গোপলা কোথায়?

সরোজিনী প্রমাদ গুনল।

—ইস্কুলে গেছেন নাকি? শচী যেন বিদ্রোপেব সুবে বললে।

এবার সরোজিনী চুপ কবে থাকতে পাবল না। গস্তীবভাবে শুধু বললে, আজ রবিবার।

শচী বললে, আজ গাড়িতে বেবোবে তো?

সরোজিনী কোনো বকমে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

শচী তামাক সাজতে সাজতে বললে, পেয়ারাগুলো সব খোলামেলা কবে রাখা আছে তো?

—হ্যাঁ।

—ওগুলো বেছে ফেলতে হবে। ছ'পয়সা আব চার পয়সা। চলো তো এখনই বেছে ফেলি।

এই বলে শচী নিজেই ঘবে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু ঘবে ঢুকতেই তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। আজ ভোববেলায় কাজে বেরোবার আগে নিজে হাতে পেয়ারাগুলি সে মাটিতে ঢেলে রেখে গিয়েছিল। দেখল এরই মধ্যে মাত্র অর্ধেক পড়ে রয়েছে।

শচীর মাথায় যেন খুন চেপে গেল। চিৎকার কবে বললে, পেয়ারা কোথায় গেল? বড়ো বড়ো পেয়ারাগুলো?

একটা ছায়ামূর্তির মতো সরোজিনী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালো।

শচী চিৎকার করে উঠল—কোথায় পেয়ারাগুলো?

সরোজিনী অশ্রুটকঠে বললে, গোপাল কয়েকটা নিয়ে গেল ওর বন্ধুদের জন্যে।

—কয়েকটা! শয়তান! তোমরা মা আর ছেলেতে মিলে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

বলেই শচী তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু গোপালের নাগাল পায় নি। সেইটেই ভাগ্য। নইলে হয়তো তার বন্ধুদের সামনেই পেয়ারাগুলো কেড়ে নিয়ে আসত।

তবু চরম লজ্জার ব্যাপারটা ঘটল পরে। বার্থ ফ্রোশে শচী বাড়ি ঢুকেই অন্যত্র পেয়ারা সন্ধান করতে লাগল। তার চেয়ে ঢের বেশি পেয়ারা নিশ্চয় কোথাও লুকানো আছে। লুকিয়ে বেখেছে সরোজিনী নিজে খাওয়ার জন্যে।

পোঁজ আরম্ভ হল। শেষে সতিই রান্নাঘরের একপাশে কতকগুলো পেয়াবা পাওয়া গেল। সেগুলো যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তারও অকাটা প্রমাণ মিলল। সেগুলো ঝুড়ি চাপা দেওয়া ছিল।

ফ্রোশে আত্মহারা হয়ে শচী সেই পেয়ারাগুলো দু'হাতে ভরে নিয়ে সরোজিনীর সামনে এসে বললে, এত লোভ! বলিই ছুটে গিয়ে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সরোজিনী শক্ত কাঠের মতো দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে তার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগল।

তবু এ ব্যাপার ততখানি মর্মান্তিক হত না যদি না গোপাল এটা দেখে ফেলত। সে তখন সবেমাত্র বন্ধুদের পেয়ারা বিলিয়ে বাড়ি এসে পৌঁচেছে। ছেলেমানুষ—মাকে সাবুনা দিয়ে বলেছিল, আমি অন্য জায়গা থেকে অনেক পেয়ারা তোমার জন্যে এনে দেব। বাবা টেরও পাবে না।

...সেই ঘটনাটাই আজ গোপাল মনে করিয়ে দিল। সরোজিনী মাথা তুলে বললে, হোক অশান্তি। আমি বলছি, তুই পেয়াবা নিয়ে যা।

সরোজিনী জানে ইন্ধুলের ঐ বন্ধুবা—ঐ মাস্টারমশাই গোপালকে শুধু ভালোই বাসে না, বই দিয়ে পড়া বুঝিয়ে অনেক সাহায্য করে। বিনিময়ে তো অন্য কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। ভগবান করুন, গোপাল যদি কোনো দিন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় তাহলে—ভাবতে ভাবতে সহসা সরোজিনীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

শচী বিশ্বাসের চাকরিটি গেল।

অবশ্য এও জন্যে তাব মালিককে খুব দোষ দেওয়া যায় না। হঠাৎ বাজার থেকে সরষেব তেল উপে গেল, কেরোসিন তেল দুখ্রাপা, খোলা বাজাবে চাল বিক্রি নিষিদ্ধ হল। এছাড়া চিনি নেই, সুজি নেই, আটা নেই। দোকানেব মালিক বললে, কি নিয়ে দোকান করব বিশ্বাসমশাই, বলুন। আমি দোকান তুলে দেব।

শচী বিশ্বাস কোনো কথা বলতে পাবে নি। শুধু কেমন এক বকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে ছিল।

দোকান অবশ্য একেবারেই তুলে দেওয়া হয়নি। শুধু দু'জন কর্মচারীবাব জায়গায় একজন রাখা হল। ভোলা থাকল—শচী বিশ্বাস গেল।

এই অবস্থাতেও যে কী করে ঐ তিনটি মানুষের জীবন যাপন সম্ভব হয়ে চলেছে সে খবর জানা নেই। তবু এখনো দেখতে পাই তিনটি প্রাণী ধুকতে ধুকতে বেঁচে আছে। আব তাবই মধ্যে মাঝে মাঝে গোপালের ক্ষীণ স্বর শোনা যায়—পড়া মুখস্থ করছে। সম্ভাব অন্ধকারে সরোজিনীকে দেখলে প্রেতচ্ছায়া বলে মনে হয়—চুপি চুপি কাপড় চাপা দিয়ে কোন্ উৎসবের বাড়ি থেকে উচ্ছিষ্ট নিয়ে আসছে। শচী বিশ্বাসকে দেখলে মনে হয়—যেন জীবন্ত কংকাল! সারারাত ঘুম নেই—উঠোনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। আর গোপাল—সে যেন শেকড়-কাটা চারা গাছ—পাতা শুকিয়ে আসছে।

তবু সে বছরেও আশাট এল। এবং বর্ষার জল পেয়ে সে বছরে পেয়ারার ফলনও হল প্রচুর। কচি কচি ছোটো ছোটো পেয়ারা। সবুজ এবং তাজা। শচী এবং সরোজিনীর নষ্টস্বাস্থ্যের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এবার যেন পেয়ারাগুলো বেশি পবিপুষ্ট এবং রসালো হয়ে ফলছে।

শচী আর সরোজিনী দুজনেই পেয়ারাগুলোর দিকে তাকালো। এখনই এমনি—ডাগর হলে এরা না যেন কেমন হবে! কিন্তু—কিন্তু ততদিন তারা বাঁচবে তো! আজ ক’দিন ভাতের মুখ দেখে নি—শুধু শাকপাতা—শুধু—!

এমনি সময়ে শচীর সেই দশ টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের জীর্ণ দ্বাবে কে যেন শেকল নাড়ল।

—বিশ্বেসমশাই, বাড়ি আছেন?

শচী বিশ্বাস দবজা খুলে দিলে।

—সাহামশাই পাঠালেন।

—সাহামশাই! একটা অবিশ্বাস্য আশায় শচী বিশ্বাসের ঘোলাটে চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল।

আগন্তুক বললে, একবার আসুন না।

গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে শচী বিশ্বাস তখনি বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরেই ফিরে এল।

না, তার চাকরি নয়, গোপালের। এমনি একটি ছোট ছেলের দরকাব তাঁব কাপড়ের দোকানে।

এ কথা শুনে সরোজিনী অন্যদিকে মুখ ফেরালো।

জৌক

আবু ইসহাক

সেদ্ধ মিষ্টি আলুর কয়েক টুকরো পেটে জামিন দেয় ওসমান। ভাতের অভাবে অন্য কিছু দিয়ে উদরপূর্তির নাম চাষী-মজুরের ভাষায় পেটে জামিন দেয়া। চাল যখন দুর্মূল্য তখন এ ছাড়া উপায় কি?

ওসমান হুকা নিয়ে বসে। মাজু বিবি নিয়ে আসে রয়নার তেলের বোতল, হাতের তেলোয় ঢেলে সে স্বামীর পিঠে মালিশ করতে শুরু করে।

ছ'বছরের মেয়ে টুনি জিজ্ঞেস করে—এই তেল মালিশ করলে কি অয় মা?

—পানিতে কামড়াইতে পারে না। উত্তর দেয় মাজু বিবি।

—পানিতে কামড়ায়। পানির কি দাঁত আছে নি?

—আছে না আবাব। ওসমান হাসে।—দাঁত না থাকলে 'কামড়ায়' ক্যামনে?

টুনি হয়ত বিশ্বাস করত। কিন্তু মাজু বিবি বুঝিয়ে দেয় মেয়েকে—ঘাস-লতা-পাতা, কচু-ঘেচু পইচ্যা বিলের পানি খারাপ অইয়া যায়। অই পানি গতবে লাগলে কুটকুট কবে। ওবেই কয় পানিতে কামড়ায়।

ওসমান হুকা রেখে হাঁক দেয়—কই গেলি তোতা? তামুকের ডিব্বা আর আগুনের মালশা লইয়া নায় যা। আমি আইতে আছি।

তেল নিয়ে এবার ওসমান নিজেই শুরু করে। পা থেকে গলা পর্যন্ত ভাল করে মালিশ করে। মাথা আর মুখে মাখে সর্বের তেল। তাবপর কাস্তে আর হুকা নিয়ে সে নৌকায় ওঠে। তেবোহাতি ডিঙিটাকে বেয়ে চলে দশ বছরের ছেলে তোতা। ওসমান পায়ের চটচটে তেল মালিশ করতে করতে চারদিকে চোখ বুলায়।

শ্রাবণ মাসের শেষ। বর্ষার ভরা যৌবন এখন। খামখেয়ালী বর্ষণ বৃষ্টিব। আউশ ধান উঠে যাওয়ায় আমন ধানের গাছগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের সতেজ ডগা চিকচিক করছে ভোরের রোদে।

দেখতে দেখতে পাটক্ষেতে এসে যায় নৌকা। পাটগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ওসমানের চোখ তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। যেমন মোটা হয়েছ, লম্বাও হয়েছ প্রায় দুই মানুষ সমান। তার খাটুনি সার্থক হয়েছে। সে কি যেমন-তেমন খাটুনি! রোদ-বৃষ্টি মাথায় কবে ক্ষেত চম্বোরে—লো ভান্ডোরে—'উড়া' বাছোরে—তাবপর বৃষ্টি হলে আর এক চাষ দিয়ে বীজ বোন। পাটের চারা বড় হয়ে উঠলে আবার ঘাস বাছো, 'বাছট' করো। 'বাছট' কবে খাটো চিকন গাছগুলোকে তুলে না ফেললে সবগুলোই টিঙটিঙে থেকে যায়। কোণ্টাই আর পাওয়া যায় না মোটেই।

এত পরিশ্রমের ফসল কিন্তু তার একার নয়। সে-ত শুধু ভাগচাষী। জমির মালিক 'ওয়াজেদ চৌধুরী ঢাকায় বড় চাকরী করেন। দেশে গোমস্তা রেখেছেন। সে কড়ায় গণ্ডায় অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেয়। মরশুমের সময় তাঁর ছেলে ইউসুফ ঢাকা থেকে আসে। ধান

পাট বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার টাকা চলে যায়। গত বছর বাইনের সময় ও একবার এসেছিল। এসে কাগজে কাগজে টিপসই নিয়ে গেছে ভাগচাষীদের। এর আগে জমির বিলি ব্যবস্থা মুখেমুখেই চলত।

দীর্ঘ সুপুষ্টি পাটগাছ দেখে যে আনন্দ হয়েছিল ওসমানের, তার অনেকটা নিভে যায় এসব চিন্তায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে ভাবে—আহা, তার মেহনতের ফসলে যদি আর কেউ ভাগ না বসাত।

ওসমান লুঙ্গিটাকে কাছা মেরে নেয়। জোঁকের ভয়ে শক্ত করেই কাছা মারতে হয়। ফাঁক পেলে জোঁক নাকি মলদ্বার দিয়ে পেটের মধ্যে গিয়ে নাড়ী কেটে দেয়।

ওসমান পানিতে নামে। পচাপানি কবরেজি পাচনের মত দেখতে। গত দু'বছরের মত বন্যা হয়নি এবার। তবু বুক-সমান পানি পাটক্ষেতে। এ পাট না ডুবিয়ে কাটবার উপায় নেই।

কতকগুলো পাটগাছ একত্র করে দড়ি দিয়ে বাঁধে ওসমান। ছাতার মত যে ছাউনিটা হয় তার নিচে হুঙ্কা, তামাকের ডিবা, আঙনের মালশা ঝুলিয়ে রাখে সে 'টাঙনা' দিয়ে।

নৌকা থেকে কাস্তেটা তুলে নিয়ে একবার সে বলে, তুই নাও লইয়া যা গা। ইঙ্গুলতন তাড়াতাড়ি আইসা পড়বি।

—ইঙ্গুল তো চাইটার সময় ছুটি অইব।

—তুই ছুটি লইয়া আগে চইলা আইস্।

—ছুটি দিতে চায় না যে মাস্টার সাব।

—কামের সময় ছুটি দিতে পারব না, কেমন কথা। ছুটি না দিলে জিগাইস্, আমার পাটগুলো জাগ দিয়া দিতে পারবনি তোর মাস্টার।

তোতা নৌকা বেয়ে চলে যায়। ওসমান ডুবের পর ডুব দিয়ে চলে। লোহাকর দোকান থেকে সদা আল কাটিয়ে আনা ধাবাল কাস্তে দিয়ে সে পাটের গোড়া কাটে। কিন্তু চার-পাঁচটার বেশী পাট কাটতে পাবে না একডুবে। এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লেগে যায়। একেব পর এক দশ-বারো ডুব দিয়ে হাঁপিয়ে-ওঠা দমটাকে তাজা করবাব জনো জিবোবার দরকাব হয়। কিন্তু এই জিরোবাব সময়টুকুও বৃথা নষ্ট করবার উপায় নেই। কাস্তেটা মুখ দিয়ে কামড়ে ধবে হাতা বাঁধতে হয় এ সময়। প্রথম দিকে দশ ডুবে তিন হাতা কেটে জিবানো দরকার হয়। কিন্তু ডুবের এই হাব বেশীক্ষণ থাকে না। ক্রমে আট ডুব, ছয় ডুব, চার ডুব, দুই ডুব এমন কি এক ডুবের পবেও জিরানো দরকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ডুবপ্রতি কাটা পাটের পরিমাণও কমতে থাকে। শুরুতে যে এক হাতা পাট কাটতে তিন-চার ডুব লাগে তা কাটতে শেষের দিকে লেগে যায় সাত-আট ডুব।

পেটের জামিনেব মেয়াদ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কাজ ভালই হয়। মাঝে মাঝে তামাক টেনে একটু গরম কবে নিতে হয় শরীরটাকে, এই যা। বেলা ঠিকের ওপর উঠবার আগেই পেটের মধ্যেব ক্ষুধা-রান্ধস খাম খাম শুক করে দেয়। ওসমান আমল দেয় না প্রথম দিকে। পাট কেটেই চলে ডুব দিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমল দিতে হয় যখন মোচড়ানি শুরু হয় নাড়ী ভুঁড়িব মধ্যে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ঝিমঝিম করে, হাত-পাগুলো নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকে।

ওসমান একবার ভাবে ঘরে যাওয়ার কথা। ডাকবে নাকি সে ছেলেকে নৌকা নিয়ে আসবার জন্যে? কিন্তু কাজ যে অর্ধেকও হয়নি এখনো। আশি হাতা পাট কাটাব সঙ্কল্প নিয়ে সে জমিতে এসেছে।

পরক্ষণেই আবার সে ভাবে—তোতা তো এখনো ইস্কুল থেকেই ফেরেনি। আর যবে এত সকালে রান্না হওয়ার কথাও তো নয়।

পাশেই কিছুদূরে একটা শালুক ফুল দেখতে পায় ওসমান। তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পেটের জামিন দেয়ার এত সহজ উপায়টা মনে না থাকার জন্য নিজের ওপর বিরক্ত হয় সে। এদিক ওদিক থেকে ডুব দিয়ে সে শালুক তোলে গোটা দশ-বারো। ক্ষুধার জ্বালায় বিকট গন্ধ উপেক্ষা করে কাঁচাই খেয়ে ফেলে তার কয়েকটা। বাকীগুলো মালশার আওনে পুড়িয়ে খেয়ে নেয়।

ওসমান আবার শুরু করে—সেই ডুব দেয়া, পাটের গোড়া কাটা, হাতা বাঁধা।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকটা। প্রত্যেক ডুবের পর জিরোতে হয় এখন। পাটও একটা দুটোর বেশী কাটা যায় না একডুবে। অনেকক্ষণ পানিতে থাকার দরুন শরীরে মালিশ-করা তেল ধুয়ে গেছে। পানির কামড়ানি শুরু হবে গেছে এখন। ওসমানের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে গালাগাল দিয়ে ওঠে, আমরা না খাইয়া শুকাইয়া মরি, আর এই শালাব পাটগুলো মোট্রা অইছে কত। কাচিতে ধরে না। ক্যান, চিক্কন চিক্কন অইতে দোষ আছিল কি? হে আইলে এক পাচে দিতাম সাবাড় কইরা।

ওসমান তামাক খেতে গিয়ে দেখে মালশার আওন নিভে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল এক পশলা। পাটগাছের ছাউনি বৃষ্টি ঠেকাতে পারেনি।

ওসমান এবার ক্ষেপে যায়। গা চুলকাতে চুলকাতে সে একচোট গালাগাল ছাড়ে বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে। তারপর ইঠাং জমিব মালিকের ওপর গিয়ে পড়ে তার বাগ। সে বিড়বিড় করে বলে, ব্যাডা তো ঢাকার শহরে ফটো বাবু অইয়া বইসা আছে। থাবাডা দিয়া আধাড়া ভাগ লইয়া যাইব। ব্যাডাবে একদিন পচা পানিব কামড় খাওয়াইতে পারতাম।

ওসমান আজ আর কাজ করবে না। সিদ্ধান্ত করবার সাথে সাথে সে জোবে ডাক দেয়, তোতারে—উ—

দুই ডাকের পর ওদিক থেকে সাড়া আসে, আহি—অ—

—আয়, তোর আহিডা বাইর করমু হনে।

পাটের হাতাগুলো এক জায়গায় জড় করতে করতে গজগজ কবে ওসমান, আমি বুইড্যা খাইটা মরি আর ওরা একপাল আছে বইসা গিলবার।

তোতা নৌকা নিয়ে আসে। এত সকালে তার আসাব কথা নয়। তবুও ওসমান ফেটে পড়ে, এতক্ষণ কি করছিলি, অ্যাঁ? তোরে না কইছিলাম ছুট্রি লইয়া আগে আইতে? ছুট্রি না দিলে পলাইয়া আইতে পারস্ নাই?

—আগেই আইছিলাম। মাই কইছিল—আর একটু দেরী কর। ভাত অইলে ফ্যানডা লইয়া যাইস।

তোতা মাটির খোরাটা এগিয়ে দেয়।

লবণ মেশান এক খোরা ফেন। ওসমান পানির মধ্যে দাঁড়িয়েই চুমুক দেয়। সবটা শেষ করে অস্ফুট স্বরে বলে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ফেনটুকু পাঠিয়েছে এজন্যে স্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানায় তার অন্তরের ভাষা। ঐ রকম খাটুনির পর এ ফেনটুকু পেটে না দিলে সে পানি থেকে উঠতেই পারে না নৌকার ওপর। এবার আউশ ধান কাটার সময় থেকেই এ দশা হয়েছে। অথচ কতই-বা আর তার বয়স! চম্পিশ হয়েছে কি হয়নি।

ওসমান পাটের হাতাগুলো তুলে ধরে। তোতা সেগুলো টেনে তোলে নৌকায়। গুণে গুণে সাজিয়ে রাখে। পাট তুলতে তুলতে ওসমান জিজ্ঞেস করে ছেলেকে, কি রান্ছে রে তোর মা?

—ট্যাংরা মাছ আর কলমী শাক।

—মাছ পাইল কই?

—বড়শী দিয়া ধরছিল মায়।

ওসমান খুশী হয়।

পাট সব তোলা হয়ে গেলে ওসমান নৌকায় ওঠে। নৌকার কাগিতে দুই হাতের ভব রেখে অতি কষ্টে তাকে উঠতে হয়।

—তোমার পায়ে কালা উইডা কী বাজান? তোতা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে।

—কই?

—উই যে। জৌক না জানি কী! আসুল দিয়ে দেখায় তোতা।

—হ, জৌকই তো রে! এইডা আবার কোনসুম লাগল? শিগগীর কাচিটা দে।

তোতা কাষ্টেটা এগিয়ে দেয়। ভয়ে তার শরীরের সমস্ত রোম কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ডান পায়েব হাঁটুর একটু ওপবেই ধরেছে জৌকটা। প্রায় বিঘতখানেক লম্বা। করাতে জৌক। বস্ত খেয়ে ধুমসে উঠেছে।

ওসমান কাষ্টেটা জৌকেব বুকেব তলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এবার একটা শক্ত কাঠি দিয়ে জৌকটা কাষ্টের সাথে চেপে ধবে পোচ মাবে সে। জৌকটা দুটুকবো হয়ে যায়। রক্ত ঝরাতে ঝবাতে খসে পড়ে পা থেকে।

—আঃ, বাঁচলাম রে! ওসমান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

—ইস্, কত বস্ত! তোতা শিউবে ওঠে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে ওসমান তাড়া দেয়, নে এইবাব লগি মাব তাড়াতাড়ি।

তোতা পাটবোঝাই নৌকাটা বেয়ে নিয়ে চলে।

জৌক হাঁটুর যেখানটায় চুমুক লাগিয়েছিল সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝবছে। সে দিকে তাকিয়ে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমন কইর্যা জৌকে ধরল তোমাবে, টেব পাও নাই?

—না রে বাজান, এগুলো কেমন কইর্যা যে চুমুক লাগায় কিছুই টের পাওয়া যায় না। টেব পাইলে কি আব বস্ত খাইতে পাবে!

—জৌকটা কত বড়, বাপপুসরে—

—দুও বোকা! এইডা আব এমুন কী জৌক! এবচে' বড জৌকও আছে।

জমি থেকে পাট কেটে ফেলাব পরেও ঝামেলা পোয়াতে হয় অনেক। জাগ দেয়া, কোষ্টা ছাড়ান, কোষ্টা ধুয়ে পরিষ্কার করা, রোদে শুকানো—এ কাজগুলোও কম মেহনতের নয়।

পাট শুকাতে না শুকাতেই চৌধুরীদের গোমস্তা আসে। একজন কয়াল ও দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে সে নৌকা ভিড়ায় ওসমানের বাড়ীব ঘাটে।

বাপ-বেটায় শুকনো পাট এনে বাখে উঠানে। মেপে মেপে তিন ভাগ কবে কয়াল।

ওসমান ভাবে, তবে কি তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেছে? তার মনে খুশী ঝলক দিয়ে ওঠে।

গোমস্তা হাঁক দেয়, কই ওসমান, দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দ্যাও।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—আরে মিয়া, চাইয়া রইছ ক্যান? যাও।

—আমারে কি এক ভাগ দিলেন নি?

—হ।

—ক্যান?

—ক্যান আবার! নতুন আইন আইছে জান না? তে-ভাগা আইন।

—তে-ভাগা আইন! আমি তো হে আইলে দুই ভাগ পাইমু।

—হ, দিব হনে তোমারে দুই ভাগ। যাও ছোড হুজুরের কাছে।

—হ এখনই যাইমু।

—আইছা যাইও যহন ইচ্ছা। এখন পাট দুই ভাগ আমার নায় তুইল্যা দিয়া কথা কও।

—না, দিমু না পাট। জিগাইয়া আহি।

—আরে আমার লগে রাগ করলে কি আইব? যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন না হয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।

ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ বৈঠকখানায় বারান্দায় বসে সিগারেট ফুকছে। ওসমান তার কাছে এগিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। তার পেছনে তোতা।

—হুজুর, ব্যাপারডা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওসমান বলে।

—কী ব্যাপার? সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ইউসুফ।

—হুজুর, তিন ভাগ কইর্যা এক ভাগ দিছে আমারে।

—হ্যাঁ, ঠিকই তো দিয়েছে।

ওসমান হাঁ করে চেয়ে থাকে।

—বুঝতে পারলে না? লাসল-গরু কেনার জন্যে টাকা নিয়েছিলে যে পাঁচশ'।

ওসমান যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—আমি টাকা নিছি? কবে নিলাম হুজুর?

—হ্যাঁ, এখন তো মনে থাকবেই না। গত বছর কাগজে টিপসই দিয়ে টাকা নিয়েছিলে, মনে পড়ে? গরু-লাসল কেনার জন্যে টাকা দিয়েছি। তাই আমরা পাব দু'ভাগ, তোমরা পাবে একভাগ। তে-ভাগা আইন পাশ হয়ে গেলে আধা-আধা সেই আগের মত পাবে।

—আমি টাকা নেই নাই। এই রকম জুলুম খোদাও সহ্য কবব না।

—যা-যা ব্যাটা, বেরো। বেশী তেড়িবেড়ি করলে এক কড়া জমি দেব না কোন ব্যাটারে।

ওসমান টলতে টলতে বেরিয়ে যায় ছেলের হাত ধরে।

ইউসুফ ক্রুর হাসি হেসে বলে, তে-ভাগা। তে-ভাগা আইন পাশ হওয়ার আগে থেকেই রিহার্সাল দিয়ে রাখছি।

সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার সে বলে, আইন। আইন করে কি আর আমাদের আটকাতে পারে। আমরা সুচের ফুটো দিয়ে আসি আর যাই। হোকনা আইন। কিন্তু আমরা জানি, কেমন করে আইনকে 'বাইপাস' করতে হয়। হুঁ হুঁ।

শেষের কথাগুলো ইউসুফের নিজের নয়। পিতার কথাগুলোই ছেলে বলে পিতার অনুকরণে।

গত বছরের কথা। প্রস্তাবিত তে-ভাগা আইনের খবর কাগজে পড়ে ওয়াজেদ চৌধুরী এমন করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো।

আইনের একটা ধারায় ছিল—“জমির মালিক লাসল-গরু সরবরাহ করিলে বা ঐ উদ্দেশ্যে টাকা দিলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পাইবেন।” এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহারের জন্যে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে কাগজে কাগজে টিপসই আনিয়েছিলেন ভাগ-চাষীদের।

ফেরবার পথে তোতা জিজ্ঞেস করে, বাজান কেমন কইর্যা লেইখ্যা রাখছিল? টিপ দেওনের সময় টের পাও নাই?

ছেলের প্রশ্নের উত্তর দেয় না ওসমান। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে তার মুখ থেকে শুধু উচ্চারিত হয়—আহ-হা-রে।

তোতা চমকে তাকায় পিতার মুখের দিকে। পিতার এমন চেহারা সে আর কখনো দেখেনি।

চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান দেখে—করিম গাজী, নবু খাঁ ও আরো দশ-বারোজন ভাগচাষী এদিকেই আসছে।

করিম গাজী ডাক দেয়, কি মিয়া, শেখের পো? যাও কই?

—গেছিলাম এই বড় বাড়ী। ওসমান উত্তর দেয়।

—আমারে মিয়া মাইর্যা ফলাইছে এক্কেরে। আমি বোলে টাকা নিছিলাম পাঁচশ'।

কথা শেষ না হতেই নবু খাঁ বলে, ও, তুমিও টিপ দিছিল কাগজে?

—হু ভাই, কেমন কইর্যা যে কলমের খোঁচায় কি লেইখ্যা থুইছিল কিছুই টের পাই নাই। টের পাইলে কি আর এমনডা অয়। টিপ নেওনের সময় গোমস্তা কইছিল, “জমি বর্গা নিবা তার একটা দলিল থাকা তো দরকার।”

—হু, বেবাক মাইনষেরেই এমবায় ঠকাইছে। করিম গাজী বলে, আরে মিয়া, এমুন কারবারডা অইল আর তুমি ফির্যা চলছো?

—কি করমু তয়?

—কি কববা! খেঁকিয়ে ওঠে করিম গাজী, চল আমাগ লগে দেখি, কি করতে পারি।

করিম গাজী তাড়া দেয়, কি মিয়া, চাইয়া বইছ ক্যান? আরে এমনেও মরছি অমনেও মবছি। একটা কিছু না কইর্যা ছাইড়া দিমু?

ওসমান তোতাকে ঠেলে দিয়ে বলে, তুই বাড়ী যা গা।

তার ঝিমিয়ে-পড়া রক্ত জেগে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে সে বলে—হু, চল। রক্ত চুইষা খাইছে। অজম করতে দিমু না, যা থাকে কপালে।

আজ কাল পরশু

মিহির আচার্য

Capitalism violates the world as a senile old man violates a young, healthy woman whom he is impotent to impregnate with anything besides the diseases of senility.
—Gorky

মাসাধিককাল ধরে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন সত্যেনকে উৎপীড়িত কবছে। স্বপ্নের চেহাবাটা এইরকম : একটি জরদগব বৃদ্ধ যুবতীকে ধর্ষণ করছে।

এবং আরো আশ্চর্য, সত্যেন এই স্বপ্নদৃশ্যটি প্রত্যক্ষদর্শীর মতন ছব্ব বর্ণনা কবতে পাবছে। অথচ ধর্ষণ সে দেখে নি, সে সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতাই তাব নেই। অবশ্য পিকাসোব ক্লাসিক ছবি ‘বেপ’ সে এক ধনী বন্ধুর বাড়িতে দেখেছে। তাব সঙ্গে ওব স্বপ্ন-দর্শনের কোনো মিল নেই।

এই তো এখন চোখ বন্ধ করে ঘবে শুয়ে আছে, আব সেই সুযোগে সমস্ত দৃশ্যটা সে আনুপূর্বিক দেখতে পাচ্ছে।

বৃদ্ধের দন্তহীন মুখ থেকে লালার বার হচ্ছে, ঠোঁটেব কিনারে জমা থুতু, অক্ষিগোলক যেন ঠিকবে বেরুচ্ছে, সমস্ত শরীর গ্রীষ্মের কুকুরেব মত ভয়াবহ ওঠা-নামা করছে, আব দেহ-গলা ঘাম, ঘামের নদী।

বুকের তলায় যুবতী মেয়েটি, নগ্নদেহ, বৃদ্ধের স্বেদে জবজবে বাসী ভিজে জবাফুলেব গন্ধ, ঈষৎ বিস্ফারিত অধব, নিশ্বাস নিয়মিত পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। আশ্চর্য যৌবনসমৃদ্ধ শরীর, কঠিন স্তনচূড়া, বিবৃত জঙ্বাপ্রদেশ, ভাবি নিতম্ব, ঈষৎ স্ফীত নাভিমূল।

এই বিচিত্র দৃশ্যটি সত্যেনকে অহবহ প্রেতের মতন তাড়া কবছে। অথচ এ-স্বপ্নেব কোনো ব্যাখ্যা নিজের কাছে খুঁজে পাচ্ছে না। তার নির্জ্ঞান মনের কোনো বঞ্চিত কামনাব ছবি বলেও সে মনে করে না।

কারণ সত্যেন প্রথমত বৃদ্ধ নয়, ত্রিশের শিক্ষিত কচিশীল যুবক। যদিও সে এখনো অবিবাহিত তাব কাবণ সময়াভাব। একটা গবেষণার কাজে সে গভীরভাবে নিযুক্ত।

তার পরিচিত দু’একজনকে এ-দৃশ্যটা সে বলবে ভেবেছে, কিন্তু পারে নি। ভাবতে গেলে সমূহ বিষয়টা এত কুৎসিত যে রুচিবোধে অটকেছে।

এতদিন মনে কবছিল সময়ে এই বিশ্রী ঘটনার ব্যাপারটা সে ভুলে যেতে পারবে। কিন্তু চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারল না। বরং বিষয়টা ক্রমশ জটিল হতে লাগল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সত্যেন স্পষ্ট মনে কবতে লাগল : এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে। এবং কয়েকশ’ বছর ধবে দেখছে। নিজের ব্যক্তিগত কাজকর্মে ডুবে থাকার জন্যে সব সময় মনে থাকে নি। ‘কয়েকশ’ বছর ধরে’ কথাটা কেমন তার নিজের কানেই বেসুরো

শোনাল। না, নিজেকে সে জাতিস্মর ভাবে না। তবে সে বুদ্ধিমান যুবক, একটা যুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে। যেমন ঃ একেকজনকে দেখলে মনে হয় যেন কতযুগের চেনা!

এই বৃদ্ধ তার তেমনি স্পষ্ট পরিচিত।

এর একদিন যৌবন ছিল, যেমন সব মানুষের থাকে। এবং সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যস্বরূপ এই মহিলা তার অনেকগুলি সন্তানের গর্ভধারিণী।

এই ভদ্রলোক সেদিন অযুত বাহুবলের সাহায্যে নিজস্ব একটি ভুবন গড়ে তুলেছিল। এই পৃথিবীকে যেই দেখেছে সৃষ্টিকর্তার তারিফ করেছে; তার বিপুল ঐশ্বর্যের ভাঁড়ারের চাবি ছিল তার হাতে।

সত্যেন বেশ স্পষ্ট মনে করতে পেরে উৎসাহিত হচ্ছে।

তাবপব বোধহয় শক্তির নেশায় ঘুন ধরল। ওই ভদ্রলোকের তখন মধ্যবয়স।

এবপরের ঘটনা আশ্চর্য জনদগতিতে বদলে গেল।

একদিন দেখা গেল লোকটি কেবল শয্যা নিদ্রাসুখ দিচ্ছে, মার্জারবের মতন বিমোচ্ছে। এবং কখন একদা তাব সম্ভিত শক্তিরানি দেউলে হয়ে গেছে।

সেই সময়ই এই চূড়ান্ত দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল।

এক গভীর রাত্রিতে তার ভাঁড়ারের চাবি চুবি গেল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সে দেখল ভাঁড়ারের সমস্ত চুরি গেছে।

পর পর বউ মরল। পটপট করে ছেলেমেয়েরা মরল। আব ওই লোকটা পাগল বনে গেল।

তার ভাঁড়ারের ঐশ্বর্য নিয়ে তস্করবেবা কোথায় গেল? সেই দস্যুদলের গতিবিধি অনুসরণ কবেছে সত্যেন। দূরে বহুদূরে তাবা আকাশের তলায় শিবির পেতেছে। অসুরের মতন একদল মানুষ খাটছে। উঁচু উঁচু টেউতোলা ছাউনি রচনা করেছে, আর ছাউনি ফুঁড়ে নলের মতো দাঁড়ানো ঠাঁ-করা মুখ। সে-মুখ ড্র্যাগনের মতন অগ্নি উদগার কবেছে। আগুনের কালো ধোঁয়ায় আকাশ মসীমাখা।

ছাউনিব কিছু দূবে মৃত্তিকা, তাব মুখ বিদীর্ণ, আর মুখ থেকে টেনে বাব করা হচ্ছে রাত্রিব মতন কালো অঙ্ককার। আর একটা বেরুচ্ছে পুঁজের মতন তরল পদার্থ।

দস্যুরা ওই লোকটির ভাঁড়ার চুরি কবে এই সমস্ত রাজসূয়ের আয়োজন কবেছে।

তারপর ওই লোকটি একদিন দেখল কাতারে কাতাবে মানুষ বন্যায় ভেসে যাওয়া কুটোর মতন কোথায় ছুটেছে। তার ভুবন বিজয়ার মণ্ডপের মতন খাঁ খাঁ কবছে।

উদভ্রান্ত দিশেহারার মতন একদিন সেও জনশ্রোতে ভেসে এল।

দেখল সেই ছাউনি, সেই অগ্নিবমনকারী আকাশস্পর্শী নল। সেই মৃত্তিকাগর্ভের অঙ্গার, আর তরল পুঁজ। এগুলি যে তারই ঐশ্বর্য থেকে ছিনিয়ে নেয়া, বুঝতে পাবল না।

মধ্যবয়স এবং অভিজ্ঞ দেখে দস্যুবা তাকে কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করল। লোকটা পরের সম্পত্তিকে নিজের বলে মনে করে রক্ষণা-বেক্ষণ করতে লাগল।

এখানেও এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন বসতি। নতুন নতুন মানুষ। পাকা মজবুত ইমারত গড়ে উঠল। ইমারত ছাড়িয়ে একটু দূবে ব্যাবাকের সঙ্গে ভাটিখানা। ভাটিখানাব গায়ে ছেনাল মেয়েমানুষ। যেন দিনান্তের খাটনিব পর কালোকালো মানুষগুলো একটু বিশ্রাম পায়, সন্তোষ পায়। কিন্তু পাপকে তো উলঙ্গ করে দিলে চলবে না। তাই ত্রিশূলমার্কী গম্বুজ ধরনের বাড়ি বানাতে হল। সেখানে সারা সপ্তাহের পাপ ধুয়ে ওরা আবার পরেব সপ্তাহের জন্যে পাপে নোংরা হতে পারবে। আর যারা নাচ গান ভালোবাসে তাদের জন্যে মৃদঙ্গ-ত্ৰীখোলেরও বন্দোবস্ত রইল।

একদিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। লোকগুলো ভাটিখানায় গেলনা, কী-এক দুর্বোধ্য গান গাইতে গাইতে দলবদ্ধ পা ফেলে ছাউনিতে এসে ঢুকল, আর তালাগুলি দিল বন্ধ করে।

কী ব্যাপার? ছুটে এল লোকটি।

ওরা বললে : চাকা আর ঘুরবে না।

কেন, কেন?

রোটি দাও। চারখানা রোটিতে পেট ভরে না মশায়।

লোকটি চিংকার করে বলল : অধ্যক্ষ হবে। ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না তোদের। নে, হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরের কাছে মার্জনা ভিক্ষে কর।

ওরা ঘোঁত ঘোঁত করে বললে : ঈশ্বর ব্যাটা কটা রোটি খায়?

চুপ, চুপ অভিশাপ লাগবে, মূর্খের দল—

আমাদের মূর্খতার ওপরে তোমবা টিকে আছ।

চুপ চুপ।

হাটে গম নেই।

আকাশে বৃষ্টি নেই।

আমাদের ঘবে আশুন নেই।

কয়লা বাড়ন্ত।

তোমবা দশ জাহাজ গম কয়লা নিয়ে মাঝগাঙে গেছ। জাহাজের খালাসীবা ফিরে এসে বলেছে তোমরা গম কয়লা গাঙে ঢেলে দিয়েছ।

কে? কে বললে? তাব জিভ খসে পড়বে।

চাকা ঘুরবে না। ঘুরবে না।

তত্ত্বাবধায়ক ছুটল গলফরুাবে যেখানে ওরা খেলছিল। হজুর, বিপদ। ওরা চাকা বন্ধ করে দিয়েছে।

দিক।

দিক! আশ্চর্য হল লোকটা।

আমাদের স্টোরে অটেল মাল। আমরা চালিয়ে যেতে পারব। ওবা পাববে না। রুজিতে টান পড়বে, পেট জ্বলবে। আবার নিজেরাই ওরা চাকা ঘোরাবে।

কিন্তু চাকা ঘুরল না।

এরা অবাক : ওরা ক্ষুধা জয় কবেছে।

তাহলে চাকায় একটু তেল দিয়ে দাও। পিছল হবে।

তেল।

হ্যাঁ : সাড়ে চারখানা রুটি, আর এক টুকরো কয়লা।

চাকা ঘুরল।

তারপর একদিন মানুষগুলো দেখল আর একটা লোহার ইমারত গড়ে উঠল। আর, লোহার শিরদ্বাগ-পর্য্য একদল সিপাহী দিনরাত কুচকাওয়াজ করতে লাগল।

এরা কী করবে?

অধার্মিক ইবলিসদের সংপথে ফেরাবে।

লোকটির তনুখা বেড়ে গেল।

সন্তোন বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল : লোকটা ক্রমশ তার সম্পদ-হারানোর দুঃখ ভুলে গেল! এবং বর্তমান কাজটাকেই সে একমাত্র ধ্রুব বলে জ্ঞান করল।

একসময়ে সে হুজুরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থকেও অভিন্ন বলে চিনতে শিখল। সে যে পরের বাগান পাহারা দিচ্ছে এ চেতনাও তার রইল না। লোকটিকে ওরা খাতিরযত্ন করে, শুধু খাতির নয়, তনুখার পরিমাণও বাড়ে। লোকটি শৌখিন হয়, গোঁফে সুগন্ধি মাখে, হাতে ফুলছড়ি, আর বার্ডস-আই খায়। অবশ্যই এই সৌভাগ্যকে সে তার যোগ্যতাব পুরস্কার বলে ভাবে।

সতোন এক যুগ ধবে এই সকল পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করেছে। তাব নোটবইয়ে লিখে রেখেছে।

আর সবচেয়ে বিস্ময় জেগেছে ওই 'লোকটিকে দেখে। কেমন বয়সটাকে মধ্যসীমায় আটকে রেখেছে। বাইরে থেকে কেউ ওকে বুঝতে পারে না ওর আসল বয়স কত। খুন্দো নারকেলের মতো নির্দিষ্ট আকৃতিতে শক্ত হয়ে দানা বেঁধে গেছে।

লোকটা বার্ডস-আই খায়, ফুলছড়ি নিয়ে হাঁটে। কানে-গোঁজা তুলোয় আতরের গন্ধ।

ওর বউ মরেছে, ছেলে নেই, সে-সব স্মৃতি আর তার মনে দাগ কাটে না। বরং সে এখন বিশ্বাস কবে : ওদের এই আত্মত্যাগ সার্বিক মঙ্গলের জন্যে। এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ কবে নি, সেটাও আর-এক ধরনের ত্যাগব্রত বইকি। সে এখন একটা ব্যক্তিমানুষ, ছোটোখাটো সুখদুঃখ সে জাগতিক হিতের কারণে বলি দিয়েছে। এবং সে আশা করে জগৎ তার এই আদর্শ গ্রহণ করবে।

মাঝে মাঝে তাকে বক্তৃতা দিতেও যেতে হয়। ফোটাোগ্রাফার হরেক পোজে ছবি তোলে। কাগজে সে সব ছবি বেবোয়। একথা সে বুঝেছে বোজাই একটা-না-একটা অজুহাতে তার ছবি কাগজে বের করতে হবে। যাতে সাধারণের সামনে তার উপস্থিতিটা অভ্যাসে পরিণত হয়। এটা বড় দবকাবি।

এ সকল ব্যাপাবের সমন্বয় কবতে-করতে সে অদ্ভুত এক আজাদীব স্বাদ পায়। এবং কী কবে নিজের শক্তিকে অতীত বৃহৎভাবে অনুভব কবে।

সতোন বেশ মনে করতে পাবে। এই সকল সন্ধান-সূত্র সে তাব নোট-বইয়ে পরিশ্রম করে টুকে রেখেছে।

তারপর যুগসন্ধিক্ষণে এক গোখুলিলগ্নে হঠাৎ আকাশটা লাল হয়ে উঠল। দিগন্তে বারুদের গন্ধ। সমুদ্রের নীল জল উথাল-পাথাল।

একটা প্রকাণ্ড-শরীর ঈগল হঠাৎ ডানার পাখসাটে সমস্ত বায়ুস্তবকে মথিত করে উঠল।

আর, দ্যাখো দ্যাখো, সেই গানের আওয়াজে সমুদ্রের জল তাণ্ডবনৃত্য করতে-কবতে ধেয়ে এল। অরণ্যের পাইনগুলো পায়ের শিকল ভেঙে উর্ধ্ব বাহু মেলে এগিয়ে এল। বিরাট পাহাড় তার জলপ্রপাত বুক নিয়ে ওঁড়ি মেবে এগিয়ে এল।

উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম চারদিক থেকে প্রাচীর তুলে একযোগে ওরা ধেয়ে এল।

প্রত্যুষে উঠে ওরা দেখল প্রাচীরের চাপে তাদের ইমারতগুলো আর্তনাদ তুলে কাঁপছে। লোহার শিরস্ত্রাণ ভেঙে ওঁড়োওঁড়ো হয়ে গেল। আর গম্বুজের ত্রিশূলের ধার ঘেঁষে বিরাট ফাটল।

ইমারতের কক্ষে ডাক পড়ল তত্ত্বাবধায়কের।

ওরা বলল : আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে এই শিবির।

লোকটি বললে : হুজুর তাহলে এদের কি হবে? এদের ভার কে নেবে?

ওরা বললে : সব ভার তোমার ওপর দিয়ে যাব। ওরা তোমাকে চেনে। চেষ্টা কবলে তুমি 'ওদের লোক' হতে পারবে।

লোকটি বললে : ওরা আমাকে মানবে কেন?

মানবে। এই নাও আমাদের বেটন। আমাদের সাধের বেটন তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। কিন্তু মনে রেখো, যে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা এতদিন পাকা করে রেখেছি তা যেন ঠিক থাকে। রদবদল করবাব চেষ্টা কোরো না। কারণ এটা জেনো তোমার শক্তি আমরাই, ওই কালোকালো মানুষগুলো নয়।

এক মধ্যরাত্রির অন্ধকারে লোকটির হাতে স্টোরের চাবি দিয়ে ওরা ডুবো জাহাজে করে পাড়ি দিল।

পরদিন স্টোরের চাবি খুলে লোকটি দেখলঃ শূন্য ভাণ্ডার। কতিপয় খাড়ি ইঁদুর মেঝেতে দাপাদপি করছে। কেবল একটি রুম থেকে বেরুল স্ত্রীপাকার কিছু অবাবহাত সম্পদ।

রাইফেল ৩০ হাজার, ১০,০০,০০০ কার্তুজ, ১০,০০০ হাতকড়া, ৫০০ টিয়ার গ্যাসেসব শেল, ৭০০০ লোহার শিরজ্ঞাপ। আরও কিছু রাবার গুডস—গোশ্‌ডলার, গোশ্‌ডকয়েন, থ্র নাইটস্।

উত্তরাধিকারসূত্রে এই সম্পদগুলি অর্জন করল লোকটি।

তারপর পূর্ণোদ্যমে চাকা ঘুরতে লাগল।

এবং যাতে কালো লোকগুলো কাজে প্রচুর উৎসাহ পায় মাইকে গানের ব্যবস্থা হল। উচ্চাসের গান, বামধুন জাতীয়। অনর্গল বক্তৃতার টেপ রেকর্ডিং ওদেব কানেব কাছে বাজতে লাগল। ‘দোস্ত, বন্ধুগণ—কর্মই নাবায়ণ, কর্মেব চেয়ে পবিত্র বস্তু আব কিছু নেই। দেখ বন্ধুগণ, জমানা বদলেছে, আগেব দিনেব মতন চাকা বন্ধ কবা চলবে না। এখন তোমাদেব শ্রম মানেই দেশেব সম্পদবৃদ্ধি। দেশ মাটি নয়, মানুষ। এখন গঠনমূলক কাজ কবতে হবে, দেশকে গড়তে হবে। ভাঁড়াব শূন্য। লক্ষ্মীকে আবার ফিবিয়ে আনতে হবে।’

চাকা বন্বন্ কবে ঘুরতে লাগল।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কাঁচামালে দেশ ছেয়ে গেল।

দু’একজন নিম্নক ওনওন কবে উঠলঃ এত কাঁচামালে কী হবে? এগুলোকে শিল্পে কপ দেয়া দরকার।

লোকটি নিন্দা শুনে চমকে উঠল। ইমাবতে ফিবে নাকে চশমা দিয়ে আবাব চুস্তিপত্রটা আলোয় তুলে ধবল। সর্বনাশ! শিল্প মানেই দেশেব সন্হ ক্ষতি। আমাদের আরো, আবো কাঁচা মাল উৎপন্ন কবতে হবে।

কাঁচামাল কোথায় যাবে? ভিন্দেশে। অবশ্য আবার ফিবে আসবে শিল্পের উজ্জ্বল আকারে বলমল হয়ে।

‘বন্ধুগণ জেনো শ্রমেব বিভাগ আছে। কোনো শ্রমই ছোটো নয়। আমবা ক্রমাগত কাঁচামাল তৈরি কবে ভিন্দেশে পাঠাব। পরিবর্তে ঘবে বসে তৈরি শিল্প পেয়ে যাব।’

এবং—

‘ভুলে যেওনা, আমাদের দেশ কাঁচামালেব বাজার। আমবা এর জন্যে গর্বিত, আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্য।’

লোকটি চুস্তিপত্রের চাব নন্দর অনুচ্ছেদটি আবার পড়ল।

ইদানিং লোকটির কাজ বাড়ল। দৈনিক পাঁচটা উদ্বোধন, বক্তৃতা, সাক্ষাৎকার, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, রেডিও ভাষণ।

প্রবলবেগে দেশ এগোতে লাগল।

আর দেশের শোভাও বাড়তে লাগল। মাঠকোঠাগুলোকে ঢেকে ফেলে আকাশচুম্বী দালান উঠল। চণ্ডা মসৃণ রক্তপথ। আলোর প্রপাত।

যে দেখল সে-ই স্বীকার কবলঃ নিঃশব্দ রক্তপাতহীন বিপ্লবই বটে।

এবপব একদিন ঘুম থেকে উঠে আয়নায় দাঁড়িয়ে লোকটি আবিষ্কার কবল সে বুড়ো হয়ে গেছে। চুল শনের মতন শাদা, দাঁত পড়েছে, গায়েব চামড়া শ্লথ, চোখে ছানি।

এত শীঘ্র কী করে সে বৃদ্ধ হয়ে গেল। রোজ ভোরে একটা আস্ত কাঁচা বেল খায়। আগে আস্ত দুটো মুরগিব বোস্ট খেত। কিছুদিন ডাক্তারি পবামর্শে আমিষ বাদ দিয়েছে। ফলমূল তার আহাব। আব ছাগিদুগ্ধ সারা দিনে সের দুয়েক মাত্র।

অথচ কত কাজ বাকি। কতকগুলি যোজনার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্টোরের দিকে এগিয়ে এল লোকটি। ভেতরে পা দিতেই অবাক।

এ কী! ওদের ফেলে-রাখা সেই সম্পদগুলি কোথায়।

স্টোবকীপাব বললে ঃ সার, ওগুলো তো ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যবহার কবা হয়েছে!

এত বাইফেল, কার্তুজ, টিয়াবগাস, হাতকড়া, রাবাব-ওডস্ সব ব্যবহার কবা হয়েছে।

হ্যাঁ সার। আপনাব নির্দেশমত কাজ হয়েছে। গড়ে আমবা দৈনিক ছ'জন করে লোককে শাসন কবেছি, দৈনিক ত্রিশটা করে কার্তুজ ব্যবহার করেছি, হাতকড়াও দুডজন কবে কাজে লাগানো হয়েছে।

আব, আব এই রাবাব-ওডস্

আপনাব প্রয়োজনেই লেগেছে দশ প্যাকেট। বাকি অস্ত্র লোকদেব ব্যবহার কবতে বাধা কবেছি।

স্টোবকম থেকে দ্রুত ফিবে এল লোকটি।

আপনকক্ষে অনেকক্ষণ ওম হয়ে বসল। এখন তাকে গম্ভীর চিন্তাশীল দেখাল। অনেকক্ষণ সে চিন্তা কবল, কিন্তু কী যে চিন্তা কবল নিজেই মনে কবতে পাবলনা।

বাইরে প্রচণ্ড নিদাঘ। নু বইছে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণটি কিছুক্ষণ আগে যান্ত্রিক গোলযোগে বিবল হয়ে গেছে।

লোকটি বিবস্ত্র হয়ে বাথ-টবে গিয়ে বসল। গায়ে ঠাণ্ডা জল ছুঁল। শবীব শীতল হয় না। সারবা শবীব বৈশাখের প্রান্তরের মতন জ্বলছে। অস্বচ্ছ চোখে মনে হল দিগন্তে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে আকাশে উড়ছে। মস্তিষ্কেব ভেতরে কী বকম হু হু বাতাস, হুপিও ওঠানামা কবছে।

কাপতে কাঁপতে লোকটি উঠে দাঁড়াল। আপাদমস্তব জল বাবছে, যেন সদা জল থেকে তোলা একটা বাঘব বোয়াল।

লোকটি উচ্চকণ্ঠে হাঁকল ঃ কে-আর্হিস্

খাস ভূতা ছুটে এল—হুহুব।

লোকটি বললে ঃ আমার বাঁশি নিয়ে আয়। আনি এই যমুনাপুলিনে বাঁশি বাজাব।

ভূতা বাঁশি এনে দিল।

লোকটি চিৎকার কবে উঠল ঃ বেতর্মিঙা। উল্লুক।

হুহুব।

এ বাঁশি শোনাব বাব কাছে। এই বিপিন যমুনাপুলিনে—

ভূতা দ্রুত প্রস্থান করল।

দবজায় পদশব্দ।

এসো, এসো সখি। বাঁশি ধরো, মালা পবো।

কষ্টপাথর ছেনে একটি শব্দ কঠিন মূর্তি। নিতম্ব আবৃত কালো চুলের বনায়। কঠিন ত্রিশূলের মত ঈষৎ স্তোকনম্র স্তনচূড়া, স্মীত উচ্ছ্রিত নাভিদেশ, কৃশ কাটি এবং প্রশস্ত শ্রোণীদেশ।

কী নাম তোমার ?

সীতা।

সীতা! সে তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। আর এতো পঞ্চবটী বন নয়, এ যমুনাপুলিন।
তুমি আমার দবস্ত রাখা।

আমি সীতা।

লোকটি চোখের সামনে দেখল মেয়েটার শরীবটা একটা উঁচু দেয়ালের মতন ওর দৃষ্টিকে আটকে দিয়েছে। তাবপর মনে হল দেয়াল নয়, প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা আর গুচ্ছগুচ্ছ মুকুলে ছাওয়া একটা বৃক্ষের মতন মন্দমন্দ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। আব, তীক্ষ্ণ বর্ণাব মতন অসংখ্য সূর্যকিরণ ওর অঙ্গে বলসাচ্ছে।

মেয়েটি বলল : সাহেব তুমি আমাব বাপ।

লোকটি বললে : তোর ছেলের বাপ হতে ইচ্ছে করি। আমাব উত্তবাধিকার নেই, আমাব শোণিতের ধাবা আমি তোর মধ্যে বহন কবে দিতে চাই।

মেয়েটি বলল : সাহেব তুমি তা পারবে না। তুমি বুডো হয়ে গেছ।

তাবপবই স্বপ্ন-দৃশ্যাটি সত্যোনেব চোখে আন্দোলিত হয়ে উঠল।

সে দেখল বৃদ্ধ লোকটির বাঁধানো দাঁত-জোড়া মেঝোতে ছিটকে পড়েছে। দন্তহীন মাড়ি থেকে লালাশ্রাব, ঘন আঠালো থুতু। মেয়েটির মুখ গলা বুক লালায় থুতুতে ভরে উঠেছে। অস্বচ্ছ কোটরে-টোকা বৃদ্ধের অক্ষিগোলক গোল হয়ে বেবিযে আসছে, হাপবেব মতন বুকটা ওঠানামা কবাছে। আব, ঘামের নদীতে ভাসছে।

এবপবই স্বপ্ন-দৃশ্যাটি ছিঁড়ে গেছে। সত্যেন আব স্বপ্নটাকে বিশদ কবতে পারে নি।

একশো-কি দুশো বছর পর অশনি নামে আর এক যুবক স্বপ্ন-দৃশ্যাব একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিল। অবশ্য তখন দৃশ্যাটি স্বপ্ন ছিল না, নিকট বাস্তবে পবিণত হয়েছ।

এখনো শহবেব মধ্যাখানে চৌবাস্তাব মোড়ে উঁচু একটা মঞ্চে সেই বৃদ্ধকে তাবা বুলিয়ে বেখেছে। বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তার শরীর পচে যায়নি। বোদেজলে কেবল গায়েব চামড়া হলদে আব কঁচকে গেছে। ক্রান্ত পাখিবা কখনো কখনো ওব মাথায় এসে বসে। মুখটাকে নোংবা কবে দেব।

কালোকালো লোকগুলো যখন ইমাবত থেকে ওব উলঙ্গ শরীবটাকে তুলে নিয়ে এল তখনো তাব প্রাণবায়ু নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কিন্তু লোকটা কেবল ধূসর চোখে চেয়ে থাকে, কথা বলতে পারে না।

ওবা ওকে দীর্ঘদিন মঞ্চেব খুঁটিব গায়ে বুলে থাকতে দেখেছে। অনেক দিন সে বেঁচেছিল।

দয়াল কেউ কেউ বলেছিল : ওকে ছেড়ে দাও।

অন্যোবা বাতি হয় নি। তাহলে ওকে চোখের আড়ালে বাখতে হবে। চোখেব আড়ালে গেলে ওকে আমবা ভুলে যাব। ও যে একদিন ছিল এই স্মৃতিকে আমাদের ঙ্গাগ্রত রাখতে হবে, শুধু আমাদেরব জন্যেই নয়, আমাদের পরে যারা আসবে, তাদের জন্যেও। কাবণ চেতনা মূল্যাবান সম্পদ, তাকে পবিত্র বহিব মতন সতর্ক হয়ে বক্ষা কবতে হয়।

রৌদ্রদীপ্ত

মৃণাল চৌধুরী

অবশেষে সোমা-দীপেনেব ঘরখানা ভাড়া দেওয়া স্থির হয়েছে।

ভাড়াটেবা আসবে আগামী মাসের দোসরা। পয়সা নয়। কেননা সেদিন শনিবার, তাই কৃষ্ণ-চতুর্দশী। জেনে শুনে কোনো মতেই আধুনিক একটি বাঙালী পবিবার ৩-দিন 'ঠাই নড়া' হতে পারে না। দোসবা হতে কটা দিন মাত্র বাকী। ঘরটা পবিদ্ধার করা দরকার। করলি ফেব্রুয়ারি হবে। প্রথমে স্থির হয়েছিল—বাল্লাব একটা ঘর, অর্থাৎ চিলতে একটা খালি জায়গা ঘিরে দিয়ে, সারা বাড়ির করলি ফিবিয় দিতে হবে। অনেককাল তো করলি-ফেরানো হয়নি। এই উপলক্ষে হবে শুনে সবাই খুশি। বিশেষ করে এ বাড়ির বড় বৌ শেফালী। কিন্তু বাড়ির বড় ছেলে নবেন, দু'দিন পব ভাবনা-চিন্তা করে জানালো—আপাতত ভাড়া দেওয়ার ঘরটাব জন্য যা প্রয়োজন তাই কবা হবে। কথা শুনে শেফালীর মুখ গোমড়া হলো। হেতু আছে। তার ঘরখানির অবস্থা কহতবা নয়। লোকজন এলে সে খুব লজ্জায় পড়ে। নবেন ফাঁপবে পড়ে। শেফালী এগিয়ে না এলে বাড়িতে কোনো কাজ হতে পারে না। এক সকালে অফিস যাবার আগে সে বললো—কাল মিস্ত্রিবিবা আসবে। ও ঘরবের ঝিটিমিটি যা বাখবে, সেটা তো সবিয়ে নিতে হয়। এখনো গা কবছ না!

—আমাকে নাচতে হবে নাকি?

প্রশ্নটাব ঝাঁঝ গায়ে না মেখে, হাসিমুখে নবেন বললো—নাচবে? তাহলে অফিস নাই-বা গেলাম।

—গা জ্বালানো কথা বলো না তো।

কথাগুলো ঝংকাব দিয়ে বললেও শেফালীর গোমড়াভাব হালকা হলো। ফালি একটু হাসিও ফুটল। নবেন সিগারেট ধরিয়ে অফিস যাত্রা কবল। অফিসযাত্রী নরেনেব দিক থেকে মুখ ফিবিয় শেফালী দেখল—বাড়ির কাজের মেয়ে যশো'ব মা বসে বসে পান চিবুচ্ছে।

—যশো'ব মা, একবার এদিকে এসো তো।

যশো'ব মা আসে।—কি গো বৌদিদিমনি?

—ছোট দাদাবাবুর ঘরটা পবিদ্ধার কবতে হবে।

—আ্যতো বেলায়! রাজাব কাজ পড়ে বয়েছে।

—থাক। এ কাজের জন্য আলাদা পয়সা পাবে।

—একখান ঘর সাফাই কবতি কম টাইম যাবি?

—এসো একবার কাজ দেখে যাও। দরকার হলে অন্যলোক ডাকবে। তাকেও পয়সা দেবো।

—আব কেউ বলতি তো যশোর বাপ। সে পোড়ারমুখো এ্যাতক্ষণে—ইয়ের দোকানে গিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে—কথাগুলো বিড়ি বিড়ি করে বলতে বলতে যশো'ব মা ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ায়। শেফালী দরজা খোলে। থানা থেকে আসা তল্লাশী-বাহিনী যেমন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে তেমন ভাবে পরিদর্শন করে যশো'ব মা। ঘরবের এককোণে রয়েছে একটি তক্তাপোশ। ও-খানা বড়ই সুনজরে দেখে যশো'ব মা।

—এাই চৌকিখানি তোমাদের কুন কাজে লাগবি?

আচমকা, যশো'ব মাৰ তাচ্ছিল্যভবা প্রশ্নের জবাব দিতে দেবি হয় শেফালীর।

—বাড়িতেই থাকবে। কখন কাজে লাগে।

—আমি টানতে পারবনি।

—তোমার একা টানতে হবে কেন? কয়েকজনে ধবধরি কবে নিয়ে যাবে। কেন জানি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যশো'ব মা।

খানিক পরে বলে—ওটার যা দশা! তোমাদের কুনো কাজে লাগবে না। দেখি, সারায়ে সুবায়ে যদি দু'চারদিন শোয়া যায়। বাতের বেথা, মাটিতে শুতে পারি না।

তন্তুপোশটি অনেক দিনেব পূবনো। তবে এখনো বেশ জববদস্ত। হাতছাড়া কবতে ইচ্ছে হয় না শেফালীব, ভাবে—ভাড়াটেরা এলে এ-ঘর থেকে নিয়ে কোথায় বাখা হবে সে এক সমস্যা। জিনিসটা নষ্টই হবে। যশো'র মাকে দিলে ক্ষতি নেই। তবু গালে হাত বুলোতে বুলোতে শেফালী মতলব ভাঁজে।

—তন্তুপোশ যদি নাও তাহলে পয়সাকড়ি পাবে না।

—সে তোমার খুশি। দিলে দেবে, না হয় না দেবে।

খানিকপর একজন লোকসহ যশো'ব বাপ আসে। তন্তুপোশ নিয়ে যায়। যশো'র মা ঘব বেঁটিয়ে পবিস্কার করে। দবজা বন্ধ কবতে এসে শেফালী দেখে—ঘরের দুই দেওয়ালেব চাবটে থাক জুড়ে বোবাই হয়ে আছে বইপস্তব আর পত্রিকা।

—তাকগুলোয় হাত দাওনি?

—অতো ওপরে আমি কি নাগাল পাই? পুরানা কাগজওলা ডেকে ওগুলো বেচে দিও। আমি এসবো। ঝাঁটায়ে দেবো। কথাগুলো বলে যশো'ব মা দ্রুতপায়ে চলে যায়। তাব কথাগুলো মনঃপূত হয় না শেফালীব। মেজ-বৌ অমিতাকে গিয়ে বলে—গাদা গাদা বই আব কিছু ঝিটিমিটি আছে। আমবাই সবিয়ে দেবো। কি বলিস অমু?

মেজ-বৌ অমিতাব মুখে হাসি লেগেই থাকে। হাসিমুখেই সে বলে—খুব পাবব।

দুপুর গড়ায। সোমা-দীপেন-এব ঘবের দবজা খুললো শেফালী। তাব পেছনে দাঁড়িয়ে আছে অমিতা। ঘবটা গত তিন বছব থেকেই বন্ধ। ইদানীং সম্ভাব্য ভাড়াটেকে দেখানোব সুবাদে বার বাব খুলতে হয়েছে। কোনোবাব শেফালী, কোনোবাব অমিতা খুলেছে। এখন আর বন্ধ হাওযাব দমকা বেরিয়ে আসে না। তথাপি তালা খুলে থমকে দাঁডায় শেফালী। স্বভাব-কৌতূহলী অমিতা, যাব মুখে সর্বদা হাসি লেগেই থাকে, তাব মুখখানিও থমথমে। ঘবখানিব শূন্যতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তন্তুপোশ সবানো দৃশ্য। আর দিন কয়েকের নধোই অন্য এক দম্পতি এসে বাস কববে এটা যেন তারই মহড়া। ওদের দুজনেব অবচেতন মহাশূন্যতার এক আদল গড়ে তোলে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেফালী। অমিতা চোখ মোছে।

তাক থেকে এক গোছা বই টানতেই শেফালীর হাত থেকে একটা চিঠি লেখাব প্যাড খোলা অবস্থায় মেঝেতে ছিটকে পড়ে। তিনটি পাতা যেন ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে। কুড়িয়ে তোলে শেফালী। সুন্দব ইস্তাক্ষরে লেখাওলোব মাঝখানে উঁকি দেয় সোমাব নিষ্টি-মধুব মুখচ্ছবি। জ্ঞানালয় হেলান দিয়ে চিঠি পড়ে শেফালী ...

“... কলম থামল। মনে পড়ছে ববীন্দ্রনাথের এক নায়িকাব কথা। সেই ভদ্রমহিলা স্বামীকে চিঠি লিখবার সুযোগ পাননি। আমাকেও তুমি চিঠি লিখাবাব অবকাশ দাওনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বছর থেকে আমরা কতটুকু সময় বিচ্ছিন্ন থেকেছি? আমি ভেবে পাই না। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ—মত, পথ, কর্ম, দুঃখ-বেদনা, সুখ-শান্তি এক ডোরে বাঁধা ছিল। ববীন্দ্রনাথের নায়িকার সঙ্গে আমার অমিল এখানে।

“ববীন্দ্রনাথের নায়িকা স্বামীকে ছেড়ে, সমুদ্র-সৈকতে পৌছে চিঠি লিখল। বিনাবিচারে বন্দী করবার ‘সুসভা’ আইন জারী কবে শাসক তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। বোধহয় আমাকে পত্র-লেখিকা বানাবার জন্যই অতটা কষ্ট স্বীকাৰ করেছেন সবকাৰ বাহাদুর। ভাবছি, সরকারকে ধনাবাদ দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাব।

“মাত্র তিনটে পয়সাৰ অভাবে দেশপ্ৰিয় পাৰ্ক থেকে বালিগঞ্জ বেল লাইন পেরিয়ে প্ৰতিদিন নিতাবাবুর কাছে যেতে হচ্ছে। একটী গার্লস স্কুলের টিচাৰ কবে দেবেন বলেছেন তিনি। অতএব এখন এটা আমার নিতা যাওয়া-আসা।

“তোমাকে হিংসা কবতে ইচ্ছে হয়। খোলা কাবাগাব থেকে তুমি নিরাপদ দূৰছে। বাজাব জামাইয়েৰ সোহাগ যত্নে বয়েছ। আব আমি খুচবো, খেলো অথচ জীবন অতিষ্ঠকাৰী সমস্যার খানাডোবায় ডুবে আছি। হিংসে কবছি বলে আবাব মুখখানা তোলো হাঁড়ি করে তুলো না। তুমি কি আবাব দাড়ি বাখতে আবস্ত করেছ? তবে যত্ন নিও। উড়ু-ঘুক করে রেখো না। নিতাবাবু কাজটা পাইয়ে দিলে, একমাস পর একবার আমি যাব, গরাদেৰ এপাশে-ওপাশে দাঁড়াব। কারোই মনোবেদনা বিন্দুমাত্র কববে না। তবু চোখেব দেখাটুকু মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। তুমি কিন্তু মানা কববে না। যাতায়াতেব ধকল সহিতে পাৰব।

“তোমার বাবা আৰ কতদিন বাঁচবেন, বলা যায় না। দেশের নিরাপত্তার জন্য যদি দীৰ্ঘদিন কিংবা দু-এক বছৰ তোমাকে আটকে বাখে, তাহলে তাঁকে আব দেখতে পাৰে না। মা দিনবাত খিটিমিটি ব্যাধিয়ে তুলছেন। মা যে এমনধাৰা হবেন, দুঃস্থলেও ভাবিনি।

“তোমার কলেজ থেকে নিৰ্ম্মিত মাইনেব টাকা আসছে না। অনেক খোঁচাখুঁচি কবে মাঝে-মাঝে আদায় করে আনাছি। ভাবলাম, তোমাব আমার ঘবটা ভাড়া দিয়ে দেব, মায়েব কাছে শোব। মা বললেন— তোমার কষ্ট হলে বাপেব বাড়ি চলে যাও। নীরবে শুনলাম। উনি ফুপিয়ে কাঁদলেন। নিজের ঘবে এসে আমিও কাঁদলাম খানিক সময়। বড়দা, বড়দি, মেজদা মেজদিব কাছে প্ৰস্তাবটা বাখলাম। বড়দা বললেন—বাবস্থাটা কবলে সংসারবব কিছুটা সুরাৰা হয়। সকলেই তাব কথাটা মানলেন। কিন্তু ঘব-ভাড়া দিতে গেলে বাম্মাব জায়গা কবে দিতে হবে, কলি ফেবাতে হবে। কৰ্দ্দিন কটিল। ভাবলাম আবাব কথাটা তুলব। একদিন মেজদি আমাব ঘবে এসে বসল। পা দোলাতে লাগল। জানই তো মেজদি কেমন হাসিখুশি। তখন কিন্তু সে গভীর। বললো—ছোট, তুই আব ঘর-ভাড়াব ব্যাপাবে থাকবি না। কোনো কথায় থাকবি না।

---“কেন?”

—“বড়দি বলছেন, তুই লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তোব পেটে জিৰ্জিপিৰ পাঁচ। মা তো আজকাল বাবাৰ ঘবেই থাকেন দিনবাত। মাৰ ঘবটা তোব দখল হয়ে যাবে। তোব নিজের ঘরটা ভাড়া দিয়ে টাকা জমাৰি। ফাঁকতালে দুটো ঘবই তোব হয়ে যাবে।

“অতএব প্ৰস্তাবটি ঢোক গিলে নিয়েছি। এদিকে বড়দা-বড়দি আখের দেখতে চাইছেন। সংসারে টাকাব অল্প কমিয়ে দিয়েছেন। মেজদা-মেজদিৰ ওপৰ চাপ সৃষ্টি কবছেন। মতলব—বেশি বোজগেবে মেজদা বাড়ি থেকে বেরুলে তিনখানা ঘব ভাড়া দেওয়া যাবে। মেজদা সংসারে বেশি টাকা দেবেন না। অফিস-কোয়ার্টাৰ্সে চলে যেতে পাৰবেন। বাবা বেঁচে থাকতেই এ কাজ সেরে নেওয়াব ভীষণ তাগিদ বোধ কবছেন বড়দা। এখন আৰ উনি অফিস থেকে এসে তাসের আড্ডায় যান না। তবে মতলব হাসিল করা দুরূহ ব্যাপাব। কেননা যশোর মা দুপক্ষেৰই উকিল। সব কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। মা সব শুনছেন। কপালে কবায়াত কবছেন। সকলকে পরামৰ্শ দিচ্ছেন—মাৰা যেতে। আৰ দীৰ্ঘশ্বাস ফেলে বলছেন—দীপুটা যদি এ

সময়ে—! মায়ের শেষ কথায় আমার সায় আছে। তুমি থাকলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াই না। আমি চেষ্টা করিনি তা নয়। কারো ভাবনায় প্রভাব ফেলবার ক্ষমতা আমার নেই। কোথায় যেন মৌলিক ত্রুটি রয়ে গেছে। নইলে এমন সহজ কথাগুলো, মিলেজুলে বাঁচবার কথাগুলো, কাউকে গ্রাহ্য করাতে পারছি না। ঠেকে শিখলাম, কোলে চড়ে বসলেই আপন হওয়া যায় না।

“সুবীর, তোমার ভাইপো, পরম আদরে গড়া সে। বয়ঃসন্ধির সীমানা পেরনোর আগেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের পাণ্ডাদের ভাষায়—জীবনযন্ত্রণায় ভুগছে। কলেজে যায় কি যায় না, ও জানে। যা সব শুনছি তাতে দিশেহারা বোধ করছি। আমাদের মতো রাজনীতি কিংবা সমাজবোধের পোকা ওর মাথায় নেই। অথচ বিশেষ এক ধরনের রাজনীতির পাণ্ডাদের সাক্ষেদ হয়েছে। সেদিন রাত তখন সাড়ে দশটা (ওটাই তার বাড়ি ফেবার প্রভাতলগ্ন), ঘরে এসেই সজোরে, সগৌরবে ঘোষণা করল— সে প্রেমে পড়েছে। প্রেমে পড়তেই পাবে। ভুবনময় প্রেমের ফাঁদ পাতা। বড়দা মিনমিন কবে বললেন—বিয়ে করলে খাওয়াবি কি?

“বিয়ে করার কথাই উঠছে না। যখন উঠবে তখন দেখা যাবে। কথাগুলোর চাইতে সুবীরের বলার ভঙ্গিটাই চমকে দেবার মতো। তোমরা যেমন কথা বলতে বলতে, সিগারেটের ছাই আনমনে হেলায় ঝেড়ে ফেলো, তেমনি ভঙ্গি।

“মেজদা তিরিক্ষি হয়ে বলেন—তাহলে এমন পবিত্র সংবাদটি সকলকে শোনাবাব কি দরকার ছিল?

“না জানালেও পাবতাম। জানিয়ে দিলাম—বাড়ি ফেবার দেবি হলে গ্যাজব গ্যাজব করা, ট্যাক ট্যাক করে কথা শোনানো বন্ধ হবে। যদি কোনোদিন বৈশাখী এ বাড়িতে আসে সে অপমানিত হবে না। ...

“সুবীরকে কথা শেষ কবতে না দিয়েই বড়দা গর্জে ওঠেন—এ বাড়িতে ঢুকলে, ঠাং ভেঙে দেব। মেজদিব কনুই-এব ঠেলা খেয়ে মেজদা তড়াক কবে উঠে বসেন। বড়দাকে লক্ষ্য কবে বলেন—কথাটা মনে রেখো। এ বাড়ির মান-ইজ্জতে টান পড়লে কাউকে ছাড়া হবে না। তখন আবাব বাৎসল্যে ধূতরাণ্ট্র হয়ে যেযো না। বাড়ি-ছাড়া কবব সকলকে।

“—তেমন পবিত্রিহীত আসুক। আগেই তড়পাস কেন? কথা কটা বলে বড়দা ছাদে উঠে গেলেন।

“বড়দি ফুঁসে উঠলেন—বাড়ি ছাড়তে বলাব তুমি কে ঠাকুর-পো?

“মেজদা কি বলতে চাইলেন বোঝা গেল না। শোনা গেল না। কেননা সুবীরটা শব্দেব চাইতে আওয়াজ জোবালো করে কুৎসিত কথার ঝড় বইয়ে দিল। মেজদা বগেভঙ্গ দিলেন।

“মাঁ আদবেব নাতিকে নিয়ে যবে গেলেন। দুই বণ বঙ্গিনীকে বেখে আমি ঘবের দোব এঁটে দিলাম।

“তবু রেহাই পেলাম না। দুদিন পরে গুনলাম—বড়দি সুবীরেব ব্যাপাবটাব জন্য তোমাকে আমাকে সরাসরি দায়ী করেছেন। এ বাড়িতে বিয়েব চল ছিল। কিন্তু ভাব-ভালবাসার (ওনাব ভাষায় ঢলানির) বিয়ে হয়নি। সে রেওয়াজ আমরা আমদানি করেছি। আমি রা কার্ডিনি। কিন্তু যখন বড়দি বললেন—তুমি কীসব বই-পস্তর পড়িয়ে, শিখিয়ে ওর কচি মাথা খেয়েছ, নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না।

“—দোহাই বড়দি, অন্তত আপনার ঠাকুরপোকে সুবীরের স্তরে নামাবেন না।

“আগুন-ঝরানো চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন।

“—শুছিয়ে কথা বলতে পারিস, তাই ভেবেছিস তোকে চিনতে পারিনি? আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি? অমিতার ছেলেমেয়ে হয়নি। ডাক্তার বলেছে হবেও না। সুবীরকে জেলে

পাঠিয়ে দাগী আসামী বানালি। পাট্টি কবিস—ওকে ছাড়িয়ে আনতে পারলি না? তা যাবি কেন? এ ছেলোটা গেলেই তো এ বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। বাবা-মা তো তোর হাতের পুতুল। সব লুটেপুটে খাবি। কালসাপ হয়ে ঢুকেছিলি ..

“আর একটা কথাও শুনি। ছুটে চলে এলাম ঘরে। খিল লাগিয়ে শুয়ে থাকলাম। ক্লাস্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। জাগলাম। আলো জ্বালিয়ে দেখি হাত বাড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা। দরজা খুলে দেখি সারা বাড়ি নিঃশব্দ, গভীর রাত। প্রথমেই মনে হলো আজ সারাদিন খাওয়া হলো না। এক বাড়িভরা লোকের কারো মনে হলো না কথাটা। ভাবলাম রাত পোহালেই বাপের বাড়ি চলে যাব। পরক্ষণেই চোখের সামনে ভেসে উঠল তোমার মুখ। লজ্জায় সে মুখ কালো হয়েছে। না, পালাব না।

“পবদিন গেলাম বৈশাখীদের বাড়ি। ঠিকানা দিয়েছেন মেজদি। মেয়েটি বসতেও বললো না। ওর পোশাক, কথার ভঙ্গি-ভাষা ভালো লাগল না।

“তবু বললাম—জানই তো সুবীব লেখাপড়া শিখছে না। কোনো কাজ শেখেনি। আমাদের বাড়িতে কোনো ঘরও নেই। এ অবস্থায় তোমরা ঘব বাঁধবে কি করে?

“ডান চোখ কুঁচকে, বাঁ চোখে তেবছা ভাবে তাকাল বৈশাখী নামের মেয়েটি, যাব নাহী হিসেবে সম্বল পুষ্ট দেহ। ঠোট ওলটালো।

“তাবপব বললো—ঘর বসাতে কোনো শালা হেলপ করে না। বসাতে হয়। আব একটা কথাও না বলে বেরিয়ে এলাম। বৈশাখী পাড়া-জানানোর মতো গলা চড়িয়ে বললো—আমাব আব সুবীবের ব্যাপাবে নাক না গলিয়ে, যা করে বেড়াচ্ছেন, তাই করুন গে।

“কথাগুলো পিঠ দিয়ে ঠেকালাম। মুখ না ফিবিযে জোবে হাঁটতে থাকলাম।

“বাত এখন গভীরতব। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ? জানি, তুমি ঘুমোতে পাবনি। দিন গড়িয়ে গড়িয়ে মাস, বছরও পেরিয়ে গেছে। কতদিন যে যাবে। চিঠি লিখছি। জিনিচি চিঠি পাঠালে তুমি পাবে কিনা। পেলোও কতটা জখম হওয়া চিঠি পাবে তাব ঠিক নেই। আমলাদের হাতে হেনস্তা হবে তোমাকে লেখা আমাব চিঠি—তা আমাব সহিবে না। ডাকে ফেলব না। থাকবে আমাব কাছে। চিঠি লিখব। অনেক, অনেক চিঠি। চিঠি লিখতে বসলে অনুভব কবি তুমি আমাকে ঘিরে বয়েছ। হাসিভবা গালে টোলপড়া, তোমাব নিঃশ্বাসেব হাওয়াটুকু আজ আব লিখব না গো। ঘুম পায়নি। তবু চেষ্টা করব। নিত্যবাবু ছাঁটার আগে যেতে বলেছেন কাল কাজটা পেয়ে যাব।

সোমা

নভেম্বর, ১৯৪৮”

ববীন্দ্রনাথ নামটিতে শেফালীৰ আপ্ত হওয়ার কোনো ব্যাপাব নেই। নামটি তার চোখের সামনে ভাসিয়ে আনে এক ঋষির মুখচ্ছবি। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় বাড়ি দুনিযে মুখস্থ-কবা গুটিকয়েক কবিতাব ছত্র। আপাতত তাব মনে পড়ে—

“আমাদের ছোটো নদী চলে ঐকে বেঁকে

বৈশাখ মাসে তাব হাঁটুজল থাকে।”

ববীন্দ্রনাথের “স্বীর পত্র” গল্পেব নাথিকা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ জানে না শেফালী। সোমাকে সে জানে। চিঠির মর্ম বুঝতে তার অসুবিধে হয় না। একা সে কখনো বাঁচতে চায়নি। প্রবলভাবে সকলকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল।

মনের অগোচর পাপ নেই। শেফালী তাকে আপন করে নিতে পাবেনি। এই মুহূর্তে সোমা, তার হৃদয়ের বড় কাছের মানুষ মনে হয়। ওরা লড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সে লড়াই শেফালীদের জন্যও। তার মর্যাদাটুকু দিতে পারেনি সে।

—বড়দি, কি ওটা?

—সোমার চিঠি। এই নে।

অমিতা চিঠিখানা হাতে নেয়। শেফালী দ্বিতীয়খানার ভাঁজ খোলে ...

“... সকালে উঠতেই কান্না শুনলাম। বড়দির ব্যাকুল কান্না। কাবণ বুঝলাম না। বড়দি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মেজদি—ছোট, চলে আয়। সবই তো জানা ছিল। এখন ন্যাকামি করে লাভ।

“বড়দির কাছে বসে রইলাম। মেজদি, বুঝলে বাইরেই হাসিখুশি। মনটা বড় ছোট। পরিবারের এতবড় অসম্মান—পেটের ছেলে নয় বলেই গায়ে লাগবে না!

“আসল খবর শোনো। সুবীর গত রাতে হাতেনাতে ধরা পড়েছে, মুখুঞ্জেরদেব ছোট বৌ-এর গলা থেকে হার ছিনতাই করতে গিয়ে। ওরা পুলিশে দিয়েছে। এখন হাজতে আছে।

“এক সময় বড়দির কান্না থামে। চোখ মুছতে মুছতে আমাকে দেখেন। কর্কশ গলায় বলেন—কাটা ঘায়ে নুন ছেটাতে এলি?

“—কি বলছেন, মেজদি?

“—ঠিকই বলছি, এ সংসারে এসেই আমার হাতেগড়া ঠাকুবপোকে পব করে দিলি—(ইচ্ছে হলো বলি, সে কাজটা বিয়েব আগেই করে নিয়েছি)। বললাম না। আবার বললেন—তোমার বাবা-মা নাকি আমার হাতের পুতুল। মেজদি নিঃসন্তান। সুবীরকে শেষ করে সব লুটেপুটে নেবো। দেবি না করে এসো, জমিদারী অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। আমি গডছি।

“ঝগড়া করবার, দুটো ঝাঁঝাল কথা বলবার ইচ্ছেব টুটি টিপে বাইরে গেলাম। চারুদিদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ঘরে এসে শুলাম। খেয়ে এসেছি গীতাদের বাড়ি থেকে।

“নিত্যাবা কথ্য বেখেছেন। আত্ম থেকে আমি বামাসুন্দরী বিদ্যালয়ের প্রাথমিকবিভাগে শিক্ষিকা। যে টাকা সেই করব তার চাইতে মইনে কম পাব। হোক। বাবাব চিকিৎসা চালিয়েও সংসারকে কিছু দিতে পারব।

“বহুবনপুর জেলে বাজবন্দীদের উপব লাঠি-চার্জ করা হয়েছে। আমাকে এড়িয়ে শোভন রায় বাণীদিকে বললেন—তোমরা জেলে অনশন করছ। আড়ি না পেতেও কানে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে সত্যমিথ্যা জানিয়ে দিও লক্ষ্মীটি। চরম একটা কিছু না ঘটলে তোমাদের কথা তো সংবাদপত্রে উঠবে না। তোমাদের অস্তিত্ব, বাস্তব পবিত্রিহিত প্রচাৰ কববার জন্য তো ওরা কাগজ ছাপে না।

“অমানবিক দণ্ড আব বন্দুকে-বারুদে জনঅসন্তোষ দমনেব চেষ্টায় জনহীন অতিষ্ঠ। পর পর তিনদিন ছাত্রদের উপব সশস্ত্র হামলা হয়ে গেল। আইনেব টেকনিক্যাল মর্যাদা রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি তরুণ তাজাপ্রাণ বলি হলো।

“পারিবারিক শোচনীয় দুর্দিন সঙ্গে নিয়ে ইতিহাসেব যাত্রাপথ থেকে পিছিয়ে পড়িনি। আমি কিন্তু এখন আর দেশের রামা-প্যামার মতো নই। অনন্যা, কেউকেটা। পথে বেরুলে কিংবা ঘরের কোণে, পেছনে থাকে কারো না কারো সদা-সতর্ক দৃষ্টি। কোনো এক মুহূর্তে দেখবে, আমাকে তোমার পাশে হাজিব করেছে। মনে হয় না ওরা এতটা কবণাময় হবে।

“সারাটা দিন বড় ধকল গেছে। চোখে জুড়ে আসছে ঘুম। .”

এরপর বোধহয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল সোমা। চিঠিখানা অসমাপ্ত। শেফালীষ বুকের মধ্যে দুঃখ-দহন-জ্বালা এমন প্রবল হয়, মনে হয় এখনই দমবন্ধ হবে যাবে। ভাবে—ধকল, সারা জীবনভর ধকল ছাড়া আব কি সয়েছে সোমা-দীপেন?

বধূবরণ করেছিল শেফালী। সোমার মুখখানি, মুখের সেই মধুর হাসি এখনো জ্বলজ্বল করে। চোখের উপর ভেসে ওঠে তার টানটানা কাজল-কালো দুটো চোখ। কান-ভাঙানো,

ঝগড়া করা, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার—এজাতীয় কোনো ঘটনা ঘটায়নি সোমা। অথচ তার সঙ্গেই চরম নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে শেফালী। অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে সে। শেষ দিকে অমন কাজল-কালো বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি বিবর্ণ আব নিশ্চ্রভ হয়ে উঠেছিল। শ্যামলা দেহত্বক কর্কশ কালো হয়েছিল। মানুষের কত পরিশ্রম সহ্য হয়! স্কুলে পড়ানো, রাতদিন সভা-সমিতি-প্রতিবাদে মিছিল—এই নিয়ে মেতেছিল সোমা। শেফালীর দূ'চোখ জ্বলে ভরে ওঠে। ইচ্ছে করে, যে-শত্রুরা এমন মেয়েকে কেড়ে নিয়েছে, তাদের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়।

—দেখি ওখানা, অমিতা হাত বাড়ায়।

শেফালী তৃতীয়খানার ভাঁজ খোলে। এ-খানার দু'পাশে লেখা। এক পাশে গুটি কয়েক লাইন। শেফালী পড়ে ..

“ . আমাদের ঘরখানা বাস্তবমুখো। ঘরের কাগজ দিয়ে যায় জানালা গলিয়ে। প্রতিদিনের মতো আজকেও দিয়েছে। ঘুমভাঙা চোখে দেখলাম বড় হবফে লেখা . জ্বলে অনশনবত তিন রাজবন্দী নিহত। সংঘর্ষে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। নিহতদের মধ্যে আছেন দীপেন সান্যাল—পরের নামটি চোখেব সামনে থেকে সরে সবে যায়।”

তারপর আর কিছু লেখেনি সোমা। দৃশ্যটা চোখেব সামনে আসে, শেফালীর। ছুটতে ছুটতে এলো যশোব মা। বললো—বৌদিদি, শীগগির এসো দেখিনি। ছোট বৌদিদি খপরের কাগজ খিনছে ধবে কেমনভাবে খাটে হেলান দিয়ে রয়েছে—বুকটা ধড়াস করে উঠল . একবারটি চলো . শেফালী ছুটে যায়। সাবা বাড়িবে চেহারা বদলে যায়। পরিচর্যা চলে সোমার। শোকে মুহামান বাড়িটা ভরে যায় অসংখ্য লোকে। সোমাব আত্মীয়স্বজন, পণ্ডিত নেতা ও কর্মীরা আসে।

শেফালী সে দৃশ্য ভুলতে চায়। বলা উচিত ভুলে যায়। এতক্ষণ কোনোমতে সে লেখাগুলো পড়েছে। আর পড়তে পারে না। চোখের জল বাঁধ মানে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, অমি, তুই পড়। বাকীটুকু পড়। অমিতা হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নেয়।

“তখন ভরসন্ধ্য। আলো জ্বালিনি। গতকাল সকাল থেকে অচেতন হয়ে ছিলাম গভীর বাত অবধি। আমাকে আমাব মতো একা থাকতে দিতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু। তাই বয়েছি। তোমাকে বিলীন আমাব সত্তা, অস্তিত্ব। মৃত্যুব চাইতে তুমি বড়। আমাব জীবনে তুমি কেবলমাত্র দীর্ঘশ্বাস নও। তাই বাস্তবেব নিবেট দেওয়াল বাব বার ধসে যাচ্ছে। মনে পড়ছে তোমাব সঙ্গে প্রথম দেখা . তারপর ফিবে ফিরে দেখা . এক গোধূলিবেলায় পরস্পরের কাছে পবস্পরের ধবা পড়ে যাওয়া ..

“দবজাব কাছে পা ফেলাব আওয়াজ। উঠলাম। আলো জ্বাললাম। সুকোমল। বড় বড় স্বপ্নাল চোখঅলা সুকোমল। চিন্তায় গভীর, দরদে গভীর। ঝাঁকড়াচুলো, যাকে তুমি বলতে জাতকবি, সেই সুকোমল আর বকবাকে নেই। তাকে চিনতে কষ্ট হয়। ওর নামে ‘খলিয়া’ বুলছে। কোথায় থাকে ঠিকঠিকানা নেই। খায় কি খায় না, ঠিক নেই। তবু এসেছে। না এসে পারেনি। অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে এসেছে। কোনো কথা না বলে চেযাবটায় বসে থাকল সুকোমল। সময় কাটতে লাগল নীরবে।

“—বসো। খাবার নিয়ে আসি—ওব শুকনো মুখ দেখে বললাম। তবু ও নির্বাক। আমার মুখের দিকে তাকাল না।

“যশোব’র মা খাবার নিয়ে এলো। আমাব দিকে অভিমানী চোখে তাকাল। কোনো কথা না বলে খেয়ে নিল। ও কি বোবা হয়ে গেছে।

“ব্যথায় কবিকেই তো মুখ খুলতে হবে। ভাষা দিতে হবে রুদ্ধ আবেগের। কিন্তু .. পর পর দুটো বিড়ি টানল ও। তাবপর বললো—যাই। চিন্তা করো না সোমাদি। দীপেনবাবুর

কিছু হয়নি। আমি খবর নিয়েছি। দমকা হাওয়াব মতো বেরিয়ে গেল সে। ফিবে ডাকলাম। বুঝলাম, আমার বেদনা কমিয়ে দিতে কবি মিথ্যে কথা বলছে। ও কেন ভুলে গেছে—সংবাদপত্রের পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে তোমার নাম—আবো দু'জনের সঙ্গে। আর কোনোদিন তোমবা তো সংবাদ ছিলে না জাতীয়তাবাদী পত্রিকায়। কিন্তু এখন তো রক্তের স্বাক্ষরে অন্যদিন।

“এমন বীভৎস অন্যান্য অবিচারে স্তম্ভিত সারাদেশ। থমথমে আবহাওয়া। আগামীকাল প্রতিবাদ জমায়েত আর বিক্ষোভ মিছিল। তার প্রস্তুতিতে সারাক্ষণ কাটিয়েছি দুপুর্বের পর থেকে। চারুদিরা আমাকে ফিবিয় দিতে পাবেননি। অনেক চেষ্টা করেছেন। অনেকেই ভুলে যান—তুমি আর আমি পরস্পরের কাছে এসেছিলাম ২১ নভেম্বরের প্রতিবাদ-মুখর, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-নিষ্কিণ্ত গুলিবেঁধা ধর্মতলার মোড়ে!..”

অমিতাব চোখ ঝাপসা হয়। চোখের জল মোছে। আজ তারা ঘর খালি করছে—ভাড়াটেরা আসবে। বছর তিনেক আগে এক দুপুরে জেলেবন্দী দীপেন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে। তাব দুদিন পর কলকাতার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে সোমা। ঘব তো খালি হয়ে গেছে—সেদিনই। বড় বেদনার মতো সেই স্মৃতিব ভাব এই মুহূর্তে ব্যাকুল করে তোলে অমিতাকে।

নীববে কাটে খানিক সময়।

শেফালী বলে—ঠিক সর্বনাশের আগের বাতে হতভাগিনী এখানা লিখেছিল। ঘাড় কাত কবে সায দেয অমিতা। তারপর শেষ অংশ পড়ে ভেজা গলায়

“ . তুমি নেই। এই মহাশূন্যতা আমাকে গ্রাস করতে চায়। আমি মানব না। আমার সন্তা, আমার অস্তিত্ব, তোমাব সঙ্গেই নিশে থাকবে। মানুষকে ভালোবেসেছিলে তুমি। ভালোবেসেছিলে শ্যামল বাংলা তথা ভারতের শোষিত মানুষকে এবং তাব এক ‘শ্যামলা’ মেয়েকে। তোমার শত্রুব সঙ্গে লড়াই কবে, আমৃত্যু তোমাব এ ভালোবাসাব মর্যাদা আমি বাখবই কমরেড ..”

কমরেড

ঋত্বিক ঘটক

পাড়েব দোকানের মোড়টা ঘুরছে ঝাক্সু।

চট করে গাছের আড়ালে চলে গেলাম। ও যেন আমাকে দেখতে না পায়। ও হন্ হন্ কবে হেঁটে চলে আসছে চারিদিকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে। একবার ক্ষণতরে দাঁড়াল, একটা হাত তুলে বাড়টা মুছে নিল। এতদূর থেকেও আমার মনে হয়, তার হাতটা কাঁপছে। ... ও চলে এলো এদিকে, আমার অন্তরালের গাছটিকে অতিক্রম করে গিয়ে উঠল বস্তির সামনের বাঁধানো চাতালটিতে। বস্তির বেশীভাগ দরজাই বন্ধ, লোকগুলো সব মুষড়ে নিরুৎসুকভাবে ঘবেব মধ্যে পড়ে আছে, অনেকে চলেও গেছে। ছেলেপুলের কান্না শোনা যায় না, নেড়ী কুকুরগুলো পর্যন্ত অন্যত্র জীবিকাব সন্ধানে বওনা দিয়েছে। মানুষ থেকেও নীরব, অন্ধকার, পরিত্যক্ত মনে হয় সমস্ত মহল্লাটাকে।

আমাব পবমবন্ধু ঝাক্সু। আমার জঙ্গী ইউনিয়নের প্রিয় নায়ক ঝাক্সু। কতদিনকার সুখ-দুঃখের সাথী ঝাক্সু—সে চকিত চাহনিতে দেখে বস্তিটাকে, তারপর দ্রুতপদে গিয়ে ঢোকে তাব ঘরে। দরজা বন্ধ করার শব্দ নীরব সন্ধ্যায় আমাব কানে এসে বাজে।

আমি বেরোলাম গাছের আড়াল থেকে। হাতে এখনো কাপড়ের পোঁটলাটা। আমার সাধের পাগড়ি, বৌ-এর জঙ্গলা শাড়ি, আবও কী কী যেন ধরে দিয়েছে বৌ। বিক্রি কবতে চলেছিলাম সদববাজারেব লখিম মাদোযাবীর ঘরে, হঠাৎ ওকে দূর থেকে দেখে আমার যাওয়া আব হলো না।

ও ঢুকছিল কলেব মালিক শ্রীবাস্তবেব নতুন বড় বাড়িব খিড়কিব দরজা দিয়ে। সঙ্গে আব যে দুজন ছিল, তাদের আমি চিনি। একজন নয়া তাঁবেদার ইউনিয়নেব নতুন আসা ওগুটা, আব একজন মানোজাবেব পেটোয়া চুকলিখোব নন্দ মিস্ত্রী, শিকাবেৎ করার এক নম্বব ওস্তাদ। প্রথমে আমাব ভয়ই লেগেছিল, দোকান ছাড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়েছিলাম যদি কোন সাহায্য লাগে ঝাক্সুব, তারই জন্যে। ওবা কেন নিয়ে যাচ্ছে ওকে? কিন্তু গিয়ে দেখি ঝাক্সু হাসছে, ভীষণ আনন্দিত মুখে হাসছে। তখনই আমি দৌড়ে চলে এসেছি সোজা মহল্লাতে। মাথাব মধ্যে সব কেন জানি বেহিসেবী হয়ে গিয়েছিল। থেকে থেকে প্রাণেব ভেতবটা চমকে চমকে উঠছিল।

আমিও গিয়ে চড়লাম চাতালে। ওব ঘবেব দিকে অগ্রসর হলাম। বস্তিব সামনেটা আব দরজাগুলো দেখলে কান্না পায়। গত একচল্লিশ দিন ধরে কলে লক আউট, দুর্দশাটা একেবাবে চবমে এসে উপস্থিত হয়েছে। মজুরদেব এই সংঘবন্ধ প্রতিবোধে ভাঙ্গন ধবানোব জন্যে কত চেষ্টাই তো কবল মালিকপক্ষ, কিছুতেই কিছু হয়নি। কত মজুব দেশে চলে গেছে, বহু সংসারে নেমে এসেছে মহা বুভুক্ষাব ছায়া, কত মজুরকে এরই মধ্যে তাব সব সম্বল বিক্রি করে ফেলে একবেলা আধাপেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে, তবু জনসংহতি অচল বিদ্রোহে উঠু হয়ে থেকেছে। নয়া ইউনিয়নেব মুষ্টিমেয় সভাকে দিয়ে টিম টিম কবে কাজ চালু বাখাব

ব্যবস্থা ক'বা হয়েছিল, তারা নিজেরাই ভয় পেয়ে রাজী হয়নি। মালিক নাকি বলেছে, তাব টাকার আর দরকার নেই, কল সে বন্ধ করেই দেবে বেশী ঝামেলা হলে। অথবা বিলাসপুর না কোথা থেকে নতুন মজুর আমদানী করে কল চালাবে। গুণা লাগিয়ে ঝগড়া বাধাবারও চেষ্টা করেছিল একবার। সব কিছুকে যুগান্তের উপেক্ষা করে আমবা অনমনীয় থেকে গেছি।

কিন্তু কষ্ট হয়। এইসব তিল তিল কবে ম'বা শহীদদের অবর্ণনীয় কৃচ্ছসাধন মনকে বিচলিত করে তোলে। এদের সহিষ্ণুতার তুলনা কোথায়? চোখের সামনে অল্পে অল্পে জীবনীশক্তি নিভে আসছে প্রিয়জনের, এ দেখেও যাদের মুখ ফেবাতে হয়, চোখের জনকে দাবিয়ে দিয়ে দিবারাত্র লড়াই-এর প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর কবে তুলতে হয়, সেই ভাস্কী ফৌজের থেকে বড় কী আছে?

ঝাক্সুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িলাম। বন্ধ দরজা। মানুষ যেন ও'ব ও'দিকে থাকে না, এমন শব্দহীন ঘরটা। আলো নেই, আলো'ব বিলাসিতা ক'বাব সুযোগ কার আছে? ঝাক্সুর গলা পাই না... ঠক ঠক করে দবজায় যা দেই।

দরজার ওপাশে কার পায়ে'ব আওয়াজ জেগে ওঠে। দরজা'ব খিল খোলা'ব শব্দ হয়। ঝাক্সু পাল্লা খুলে দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত সকলের নেতা ঝাক্সু। শোষিত-শ্রেণী'ব সংগ্রামী সৈনিক ঝাক্সু।

আমাকে দেখে ছাই-এ'ব মতো যার মুখ হয়ে গেল, সে কি সেই ঝাক্সু? হতে পারে না। আমি সর্বহা'বা ভুখা মজুর, আমাকে দেখে ও'ব মুখ ছাই হ'বে কেন?

হাসার চেষ্টা করে ও। “এসো লালবাহাদুর, বোসো। তারপর, কী মনে কবে?” আনন্দ এ'ব উৎসাহে'ব অভাব ও'র গলা দিয়ে যেন ঝরে ঝবে পড়ছে। একটা হাত পাল্লা থেকে সরিয়ে কোণের তেলচিটে বিছানাটা দেখিয়ে দেয়।

ধূসর অঙ্ককা'ব ঘরটাতে ভ্যাপসা গন্ধ। অভাব যেন হা-হা কবে এসে মুখে সজো'বে চড় মা'বে। ও বলে,—“দাঁড়াও, বাতিটা জ্বালি। জানো তো, ওপাট চুকিয়েই ফেলেছি প্রায়।”

আমি বাধা দেই—“থাক ভাই। আলোর দবকার নেই। এসো বসি।” আমি বসলাম বিছানার ওপ'ব হাতের পের্টালাটা পাশে বেখে। ও বসে কমিজে'ব পকেট হাতায়, যেন একটা কিছু না কবে ও হি'ব থাকতে পা'বছে না।

—“বিড়ি খাবে?”

—“দাও।”

বিড়িটা মুখে নিয়ে মাথাটা নীচু ক'বি। দেশলাই বের কবে নিজেরটা ধবায়, তা'বপ'ব আমার মুখের কাছে জ্বলন্ত কাঠিটা অগ্রস'ব করে দেয়। ধবাতে ধরাতে ও'ব চোখের দিকে তাকাই। দুটো শিখা জ্বলছে ও'ব চোখের তা'বা দুটোতে, চোখ কিন্তু নিশ্চ'ভ, ভগ্নাশায় ভর্তি। আমার ধরানো হয়ে গেলেও মুখ ঝুকিয়েই তাকিয়ে থাকি। ও কেমন অস্বস্তি বোধ ক'বে, চোখটা সরে যায় অন্যদিকে। আবার আমার মুখের ওপ'র আসে। আবার আমার মাথা'ব ওপরের জানালা দিয়ে বাইবে নাস্ত হয়।

মুখ তুলে আমি বলি—“বিড়ি কেনা'ব পয়সা এখনো আছে তোমার?”

—“না।” ও কাঠিটা ফেলে দেয়—“হঠাৎ ভয়ংক'ব ইচ্ছে হলো বিড়ি খাবার। তাই কিনে নিলাম দু'পয়সা'ব। থাকতে পারলাম না।”

—“বেশ।” একমুখ ধোঁয়া ছাড়ি আমি—“জ'ক কোথায় তোমার? ছেলেপুলে কা'বো তো গলা পাচ্ছি না আমি।”

—“ওদের সব আজ সকালেই ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। ক'দিন এমন থাকবে কে জানে ক'লো! সেখানে তাও দু'মুঠো খেতে পা'বে দু'বেলা। তুমি তো গত ক'য়দিন এদিকে আস না, আজ হঠাৎ?”

“বলছি”—মনে মনে হিসেব কবি আমি। তাহলে আর বিকেলের ঘটনাই প্রথম নয়, অন্তত দু’ তিনদিন ধরে শলা-পরামর্শ চলছে। ... ছোট ছেলেটা হবার পর থেকে ঝাক্স নরম হয়ে পড়েছিল, বৌ-ছেলে পার করে দিয়েছে গুণগোল আশঙ্কা করে।

মুখে বলি—“কাল আমেদ সাহেবের আসার কথা আছে। আজই সকালে আপিসে খবরটা এসেছে। তুমি দু’তিনদিন ধরে ওপখই মাড়াওনি, অথচ ব্যবস্থা করা দরকার—”

ও ইতস্তত করে—“মানে শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে ক’দিন থেকে। কোথাও যাচ্ছি না। খালি সকালে ইস্টিশনে ওদের তুলে দিতে গিয়েছিলাম। জানো, বাসনকোসন বেচে তবে ওদের যাবার পয়সা জোগাড় করতে হয়েছে। আর পথে বেরোলেই তো পয়সা।”

আমি বলি—“তবে ঘরে কামিজ পাবে বসে কী কবছ?”

—“উ”—চিন্তাপূর্ণ চোখে ও আমার দিকে চায়—“এমনি। বেরোব ভাবছিলাম। একা ঘরে যেন দম আটকে আসছিল।”

—“ওঃ”, আমার কৌতুহল যেন নিবৃত্ত হয়—“কিন্তু বিড়ি কিনলে কখন ভাই?” চমকে উঠল ঝাক্স। সোজা হয়ে বসল।

“সকালে, বৌকে উঠিয়ে দেখার সময়। এসব প্রশ্ন কেন করছ ভাই বলতো?”

উত্তর দিই না। চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। ও রুঢ় হবার মতো সাহসটুকুও সঞ্চয় কবতে পারল না। হঠাৎ উঠে ঘরের অন্ধকার কোণ হাতড়ে কুঁজো থেকে এক গলাস জল ঢেলে ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়। আমি বিড়িটাকে মেঝেতে দাবিয়ে দাবিয়ে নিভিয়ে দিই। ও ঘুবে আসে।

বলি—“হ্যাঁ, যে জন্যে আসা। আমেদ সাহেব এলে কালকে একটা জমায়েতের আয়োজন কবতে হবে। এ কাজ তুমি ছাড়া—”

—“জমায়েত?” প্রশ্ন কবে সে।

—“হ্যাঁ, জমায়েত তো ডাকতে হবে। দেখ।”

হঠাৎ ও ঝুঁকে পড়ে আমার কাছে—“লালবাহাদুর, একটা কথা বলব?”

—“হ্যাঁ, বলবে বৈকি। লড়াই-এব এই নতুন ধাপে, যখন মানুষের মনের বল পেটের ভুখ নবম করে দিচ্ছে, তখন ঝাক্স ছাড়া আর কারো কথায় তো কোন ফল হবে না ভাই।”

ঝাক্স উদাত ভাবটা সংবরণ করে নেয়। খানিক চুপ করে থাকে। আমি বলি—“কী বলতে যাচ্ছিলে?”

ঝাক্স মুখ না ঘুরিয়ে আড়চোখে আমাকে লক্ষ্য করতে থাকে। তাবপব শাস্ত গলায় বলে—“লালবাহাদুর, তুমি আমার সবচেয়ে বড় দোস্ত। কিন্তু সে সম্পর্ক ভুলে একবার সাধারণ মজুর হিসেবে আমার গোটাকয় কথা মন দিয়ে শোন।”

কথা বললাম না। একটু চুপ থেকে আবার ধরে ও—“আমার ওপর মজুবদের বিশ্বাস আছে। আমার কথাগুলো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা তারা নিশ্চয়ই করবে, আর মানবে।”

সেই-ই আমার ভয়। সেই আমার গৌরবও। হঠাৎ ঘরের মধ্যে তেরুছা হয়ে একম্বলক আলো এসে লুটিয়ে পড়ে, সামনের দোতলাটায় কে যেন আলো জ্বলেছে।

ঝাক্স বলে চলে। আমার কানে ওর উদগ্রীব, প্রায় মিনতি-ভরা গলাটা কেমন বিস্তীর্ণ লাগে।

ও বলে—“দেখ, এই ধাওড়া,—এ মহল্লার সব কটা ধাওড়া আমি ঘুরে দেখলাম। এটা কী অবস্থা হয়েছে! মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা আছে।”

—“তুমি কী বলতে চাও?” নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করি আমি।

—“আমি বলি, এভাবে চলবে না। চলতে পারে না। মানুষগুলোকে এ যন্ত্রণার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবার আমার কোনো অধিকার নেই। আমিই ডাক দিয়েছিলাম, তাই কল বন্ধ হয়েছিল। এত লোকের দায়িত্বভার আমি আর বইতে পারছি না। তাই বলছি, আমাদের দাবী সম্বন্ধে মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটা ফ্যাসালা করে ফেলা যাক।”

জানলার টুকরো আলো ওর গালে পড়েছে। কত উঁচু হয়ে গেছে হাড়টা! মুখ ভাঙ্গা, চোখ কোটরে। ঝাকু কত রোগা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন করি—“ফ্যাসালা? আপস বলো। তুমি বলছ এ কথা?” চুপ করে ভুকুটি করে। নিজের কানে নিজের গলাই একটা দূরগত বাজের ডাকের মতো হয়ে এলো।

ঝাকু বাগ্রভাবে বলে—“কথাটা ওভাবে নিও না। আমার মনে হয়, আমি জানি—আমাদের কিছু কিছু দাবী ওবা মেনে নেবে। তবে তো এ লড়াই করার কোনো মানে থাকে না।”

বলি আমি—“দাবী মানবে? ... তুমি কী করে জানলে কথাটা?” দ্রুত বলে যাই শেষ বাক্যটা সোজা ওর দিকে তাকিয়ে।

ও জিভ দিয়ে ঠোট চাটে। তারপর বলে—“আমার মনে হয়।” গলাটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর।

জিজ্ঞাসা করি—“পরকাশ ভাইয়াদের যে ছাঁটাই কবেছিল, তাদের বহাল কববে ফের? তন্থা বাড়িয়ে দেবে কারিগরদের? সব মানবে?”

কিছুক্ষণ ধরে ভাবল কথাটা। তারপর বললো—“চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমার মনে হয়, কিছু কিছু মানবে ওরা।”

—“কিছু কিছু!” আমার কথা বলার ইচ্ছেটা ক্রমেই কমে আসে।

ও বলে—“কিন্তু তবু দেখ, এভাবে তিলে তিলে মরা আর দেখা যায় না। কাল আমেদ সাহেব এলে তাঁকেও বলব, জমায়েতকেও জানাব আমার সিদ্ধান্তের কথা। আমাদের ফের যোগ দেওয়া উচিত।”

হঠাৎ ক্ষেপে উঠি। উত্তেজিত কণ্ঠে বলি—“এগোবার পথটা নষ্ট করে দিতে চাও? এতদিন জানের খুন দিয়ে যে সংহত শক্তি জমে উঠেছে, তার মূলে আঘাত করবে?”

ও বোঝায়—“ভুল করছ। আবার লড়াই হবে, আবার হবে। একটু সামলে উঠতে দাও। অল্প তাগ করে এখন এতগুলো লোকের প্রশ্ন তো বাঁচাই।”

ওর দৃষ্টি আমার চোখের ওপর পড়ে। চোখ দুটো বোধহয় আগুনের ভাঁটা হয়ে উঠেছিল। বলে করুণভাবে—“আমাব পরম বন্ধু হয়ে তুমি এ কী সুরে কথা বলছ লালবাহাদুর? এতদিনের বুকঢালা ভালোবাসা—”

—ভালোবাসা। চীৎকার করতে ইচ্ছে করে। আমার সঙ্গী ঝাকু। আমাদের সবচেয়ে বড় গৌরবের বস্তু জঙ্গী সিপাহী। ... তাই-ই এই মুহূর্ত পর্যন্ত আছে সমস্ত মজুরের চোখে। আমার নবলব্ধ-জ্ঞান এখনও অংশীদার পায়নি। ঝাকুর নামে এখনও সব পাগল।

ঝাকু বোধহয় আমার চোখকে নরম হতে দেখেছিল। গায়ে হাত দেয়। ঘাড়টা শির্ করে ওঠে। হাতটাকে সরিয়ে দিই না। বলে—“ভাই, আমাব অনুরোধ, ভালো করে বুঝে দেখ ...”

ওর গলাটা আমার কানে ছোট হয়ে আসে। মনে পড়ে কতদিনকার কত কথা। কতবাব দেখেছি, নিষ্পেষণের যন্ত্র চালু হলেই ঝাকুর গলা বজ্রকণ্ঠে রণধংকাব দিয়ে উঠেছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে সে সময় আমরা সব ভুলে যেতাম। সত্যিকারের অগ্নিহোত্রী। কোনোদিন কোনোখানে পাপের সঙ্গে সন্ধি করে নি।

আজ এত নরম হলো কী করে? পুরনো বহু পোড়-খাওয়া যোদ্ধা আজ তার পৌরুষ হারিয়ে ফেলেছে। কেন? অর্থের কাছে শেষটা বিক্রি হয়ে গেল? এতই বড় পতন হলো ওর!

আমার ডুকরে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। ওকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ওর দুহাত মুঠোয় নেই—“মাথা তোমার খাবাপ হয়ে গেছে। কি ভালো, কি মন্দ, তা বোঝাব জ্ঞানও কি তোমার লোপ পেল? বিচার করে দেখ, আপন মানে মৃত্যু। এ চেষ্টা ছেড়ে দাও। সবাই কী বলবে?”

—“সবাই?” আমার মুখের থেকে ঘন অন্ধকারের দিকে চোখ ঘোরাল সে। মুখে অপরিসীম দৃঢ়তার ভাব। “আপস কবতে হবে .. এতদিনকার নেতা আমি তোমাদের, আমার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।”

নেতা! চাবুক এসে পড়ল আমার মুখে। ঝাক্সু নেতা, সেই কথা তার শেষ যুক্তি! আমি ভাবতে পারছি না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ভালো লাগে না, হাঁপ ধবে আসে যেন বুক। এ কী নতুন প্রকাশ, কল্পনা কবলেও মনে হয় পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। অন্ধকারটা যেন দুলে দুলে ওঠে। আমাব মনে যে আশঙ্কা জাগছিল বিকেলবেলা সদরবাজারে ওকে দেখার পব থেকে, সেটা সত্যে পরিণত হলো। সত্যি! কী ঘৃণ্য, জঘন্য বাস্তব।

ঝাক্সু কথা বলছে। কি বলছে কে জানে? কে তোয়াক্কা বাখে। মরা মানুষের ভুতুড়ে কথা। আমার খালি মনে হচ্ছে, সেবাব হাস্যমায় সে মবল না কেন? গত বছরের আগেব বছব যে গোল বের্ছেল মালিকের সঙ্গে, তখন সে এগিয়ে গিয়েছিল অত্যাচারের বুলেটের মুখে। একটা গুলি এসে কেন ওকে শেষ করে দেয় নি? কেন ও বেঁচে থাকল?

অমঙ্গল চিন্তা করছি না। ওব সম্বন্ধে কোনো খারাপ কথা চিন্তা কবা এখনও আমার পক্ষে অসম্ভব। ও চলে গেলে বেঁচে যেত! আমরা ওর শব কাঁধে করে মিছিল করতাম, দু'চোখ বেয়ে আমাদের জল ঝরত, ঝাক্সু বেঁচে থাকত তাব প্রতিটি ফৌঁটায়, জলকে আগুন করে দিতে সে পারত। বেঁচে থাকত আমাদের আশায়, আমাদের নৈবাশো, আমাদের শেষ অবশ্যাস্তাবী পরম জযে। আমাদের শোকে সান্ত্বনা পেতাম তার কথা ভেবে, লড়াই-এ বল পেতাম তার কাছ থেকে, মৃত্যুকে তুচ্ছ কবতাম সে মুখ স্মরণ করে। তাকে মনে পড়িয়ে দিয়ে ডাকতাম নবীন দলকে, প্রতিশোধেব আগুনে তাদের ধরিয়ে নিতাম মশালের মতো, সেই হতো প্রেবণা। ... তাবপব, সমস্ত ঘটনার পর, নয়া দুনিয়ার বনেদ গাড়তাম যখন, তাব স্মৃতি হাওয়া হয়ে আমাদের চুলে নাড়া দিয়ে যেত। সমস্ত মজুর-কিষাণ জমায়েতে তাব হাসিমুখ জেগে উঠত। সেদিন সবচেয়ে বড় হয়ে বাঁচত সে।

সারাজীবন সংগ্রাম কবা সেই তো আমাদের ঝাক্সু!—এ লোকটা কে? নেতা। আমাদের কেউ নয়, অন্যাজাত। এর চোখে রয়েছে ভীতি, বুকে রয়েছে লাভের লাভ, আর কামিজের জেবে রয়েছে টাকা। লোকটার চোয়ালটা বাগ্রভাবে নির্লজ্জ হয়ে বেশ্যাবৃত্তির বেসাতির কাজ হাসিল করে যাচ্ছে, তাতে বাইরের টুকরো আলো পড়ে তেলতলে চক্চকে লাগছে আর খালি নড়ছে। ওব মতো বেইমান এ তল্লাটে আর একটা নেই। একে আমি চিনি না। আমার পয়লা নম্বর দূশমন, আমার ঝাক্সুর সারাজীবনের যোর শত্রু, হাস্যরো ভুখা মজুরের রক্তচোষা ভাড়াটে নেতা।

হাত নেড়ে ও খুব বোঝাচ্ছে। এতক্ষণ স্থানুর মতো বসেছিলাম, এবার নড়ি। পাশের পৌঁটলা থেকে আমার সাধের মখমলের নরম পাগড়িটা বের করতে থাকে আমার হাত। ...

না। ও আমার বন্ধু। আমার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু। কতবার ওর নেতৃত্বে আমাদের দুঃখদুর্দশার জন্যে লড়েছি, কতবার কতভাবে ওর কাছে ঋণী হয়েছি। দুর্বল লাগে নিজেকে, এ আমার

সাধ্যাতীত। পালিয়ে যাই বরঞ্চ, কেন এলাম আমি? তলের ঠোঁটটা আমার অবরুদ্ধ কান্নাকে
রুখতে গিয়ে থব্ থব্ করে কাঁপে, মাথার পেছনটায় চাপ ধরে আসে।
তারপর ওর কথা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। রাত্রি গভীর হলো।

আমি প্রাণপণ শক্তিতে পৌঁচিয়ে দিয়েছিলাম কাপড়টা। ওর মুখটা আমার খুব কাছে চলে
এসেছিল। জিভ বেরিয়ে গেছে, কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা, চোখ রক্তাভ। ভালো করে
কাপড়টা আর একবার মুঠিয়ে নিয়ে জোর দিলাম। হাতপাগুলো ছড়িয়ে পড়ে, একটা হাত
আমার জামাকে খামচে ধরে টানতে থাকে, পড়পড় শব্দে খানিকটা ছিঁড়ে যায়। সব আমি
লক্ষ্য করি লালচে-কালো একটা পর্দার ভেতর দিয়ে যেন। আব আমি যেন সমস্ত ঘটনাটাব
একজন দর্শক, এমনি ঠাণ্ডা-নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছে মনের ভেতরটা।

ছটফট করতে করতে ও নেতিয়ে পড়ল। ক্রমে ওর হাত-পা-এব আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে
এলো। ছেড়ে দিলাম।

গাড়িয়ে আমার কোলের ওপর ওর মাথাটা এসে পড়ে। জানলা দিয়ে আসা বাইরের
আলো এবার ওর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। মুখের বীভৎস সঙ্কোচন কমতে কমতে থেমে
এলো। ওর হাতটা আমার বুকের কাছে ছেঁড়া জামা ধরেই থাকে। এক টানে কাপড়টা খুলে
নেই গলার প্যাঁচ থেকে।

ওর কপালে কয়গোছা চুল এসে পড়েছে দেখছি তখন থেকেই। আর চওড়া কপালময়
বড় বড় স্বেদবিন্দু। কেমন ধীর, কেমন তৃপ্ত দেখতে লাগছে ওকে, ঘুমের প্রশান্তি যেন ওকে
ঘিরে নেমে এসেছে। চোখ দুটো ধীরে আনমিত করে বন্ধ কবে দেই।

তখন থেকে দেখছি ঝুঁকে পড়ে, জলে ভেসে যাচ্ছে আমার সারা মুখ। তাবপব কম্পিত
মৃদুহাতে ওর ওচ্ছ ওচ্ছ চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিতে থাকি সযত্নে।

**Click Here For
More Books>>**